ছোট জীবন বড় জীবন

প্র কা শ ন

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক : অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা :
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ : গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : বিজন কর্মকার

মুদ্রক : অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

এক

ইঞ্জিনের ঘস্‌ঘস্‌ আওয়াজ তুলে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়ল স্টেশনের একটু আগে। কী হল আবার? একেই তো লেটে চলছে গাড়ি। স্টেশনে প্রায় পৌঁছে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল! রেল কোম্পানির পারফরম্যান্স দিন দিন জঘন্য হয়ে উঠছে। মনে মনে গজগজ করলেন নীরদবরণ। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনটাতে উঠে অব্দি মেজাজ বিগড়ে আছে নীরদবরণের। প্রথমে তো কামরাতে উঠেই বিপত্তি। ট্রেনে কোথাও যেতে হলে বরাবর ফার্স্ট ক্লাশেই যান নীরবদরণ। তিনি উচ্চপদস্থ চাকুরে। অনেক টাকা মাইনে পান। সরকারি চাকুরে অবশ্য নন। সরকারি চাকরি ভদ্রলোকে করে নাকি? ছ্যা! ছ্যা! ওসব ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালিবাবুরা করে। কেরানি বাবুরা। অফিসে উঠতে বসতে লালমুখো সাহেবরা যাদের বাপান্ত করতে ছাড়ে না। চাকর-বাকরের মতন ব্যবহার করে। কথায় কথায় ডার্টি নিগার বলে গালাগাল দেয়। নীরদবরণের নিজের অফিসেও এরকম কিছু বাঙালিবাবু আছে। তারা একেবারে ইংরেজি লিখতে জানে না। কিংবা বলা উচিত হাস্যকরভাবে ভুল ইংরেজি লেখে। বাবুদের সেই ইংরেজির বহর দেখে সাহেবরা হাসাহাসি করে। বাবুদের ইংরেজিকে তারা একটা বিচিত্র নাম দিয়েছে।...বেঙ্গলিশ, বেঙ্গলি আর ইংলিশ মিশিয়ে এরকম একটা শব্দ তৈরি করেছে নীরদবরণের অফিসের রসিক সাহেবরা, যাদের প্রধান পান্ডা হচ্ছেন ফস্টার—এম. জি. ফস্টার। নীরদবরণ যে কোম্পানিতে চাকরি করেন তার জেনারেল ম্যানেজার হল ফস্টার সাহেব। এছাড়া আরও অনেকে আছেন। ম্যাকেঞ্জি, ফিলিপ, হপকিনস। কোম্পানিটাই তো সাহেবদের। সাইকেল তৈরির কোম্পানি। সাইকেল বিক্রিরও। প্রোডাকশন এবং সেলস দুটোই হয় কোম্পানিতে। সাইকেল তৈরির বিশাল কারখানা আছে দিল্লিতে। সেই সাইকেল পাঠানো হয় কলকাতায়। ভারতবর্ষের ক্যাপিটাল কলকাতায়। কলকাতার মার্কেটে কোম্পানির সাইকেল বিক্রি হয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই অবশ্য কোম্পানির মার্কেট। কিন্তু প্রধান বাজার কলকাতাতেই। আর সে কারণেই প্রধান সেলস অফিসও কলকাতায়। নীরদবরণ সেই অফিসেরই একজন কর্মচারী, তবে কেরানি নয়। তাঁর পদের নাম হল অ্যাসিসটেন্ট সেলস ম্যানেজার। তাঁকে ম্যাকেঞ্জির অধীনে কাজ করতে হয়। ম্যাকেঞ্জি লোকটা খারাপ নয়। অন্তত নীরদবরণের তো ভালই লাগে। লোকটা মার্কেটিং অর্থাৎ বিপণন ব্যাপারটা বোঝে ভাল। কোম্পানির তৈরি সাইকেল বিক্রি কীভাবে আরও বাড়ানো যায় সেসব নিয়েই দিনরাত মাথা ঘামান ম্যাকেঞ্জি। নীরদবরণেরও কাজটা তাই। কোম্পানির বিক্রি বাড়ানোর দিকে নজর রাখা। বিক্রি বাড়াতে হলে প্রথম যেটা জোর দেওয়া উচিত, সেটা হল বিজ্ঞাপন। কোম্পানি যে মাল উৎপাদন করে সেই মালই যে সব থেকে উৎকৃষ্ট, এই বার্তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে ক্রেতাদের কাছে যাতে তারা তা কিনতে আগ্রহী হয়। কীরকম বিজ্ঞাপন দিলে ক্রেতাদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করা যাবে সে ব্যাপারে ম্যাকেঞ্জির বেশ চিন্তাভাবনা আছে। এসব নিয়ে তিনি পড়াশোনাও করেন। প্রায়ই ম্যাকেঞ্জি নীরদবরণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তাঁদের অফিস ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। সেখান থেকে পার্ক স্ট্রিট আর কতটুকু। হেঁটে বড়জোর মিনিট সাত। খুব লম্বা মানুষ ম্যাকেঞ্জি। তুলনায় নীরদবরণ এতটুকু। ম্যাকেঞ্জির উচ্চতা হল ছয় ফুট এক ইঞ্চি। কিন্তু তাঁর চেহারা

যে খুব নধর তা বলা যাবে না। বরং বেশ রোগা-পাতলা ম্যাকেঞ্জি। লম্বা এবং লিকলিকে রোগা। কিন্তু ওই চেহারাতেই প্রচুর খেতে পারে লোকটা। খাবার যেমন খেতে পারে, তেমন মদও গিলতে পারে। নীরদবরণ মাঝে মাঝে ম্যাকেঞ্জির দিকে তাকিয়ে থাকেন আর মনে মনে ভাবেন, এত খায় লোকটা, এত যে মদ গেলে, সেসব আসলে যায় কোথায়। অনেক বছর দেখছেন লোকটাকে। একসঙ্গে কাজ করছেন। ম্যাকেঞ্জিরও বয়স কম হল না। পঞ্চাশের ওপরে তো বটেই। চেহারাটা রোগা বলে বয়স বোঝা যায় না ঠিক। তো একদিন ম্যাকেঞ্জিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নীরদবরণ। নিখুঁত ইংরেজি বলতে পারেন তিনি। সাহেবি কোম্পানিতে হঠাৎ কাজ পাওয়া এবং তা নিয়ে উন্নতি করার অন্যতম কারণ হল নীরদবরণ ভাল ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারেন। ম্যাকেঞ্জিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। এত যে খাওয়া-দাওয়া করো তুমি, পেগের পর পেগ মদ গেল, তো যেসব খাবার দাবার পানীয় সব যাচ্ছে কোথায়? ম্যাকেঞ্জি হেসে বলেছিলেন—আমার হজমশক্তি দানবের মতো তাই। তারপর বলেছিলেন—দিস জাইগানটিক পাওয়ার অব ডাইজেসন অব মাইন ইজ আ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর মি ইউ নো? নীরদবরণ বলেছিলেন— হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্রিভিলেজ? প্রশ্নটা শুনে খুব হেসেছিলেন ম্যাকেঞ্জি। তারপব ইংরিজিতে যা বলেছিলেন তার মানে করলে এরকম দাঁড়ায় যে, আমি ভেবেছিলুম 'নীরোডবরণের' মতো বুদ্ধিমান লোক সেটা বুঝতে পারবে। তথাপি নীরদবরণ জানিয়েছিলেন তিনি সাহেবকে 'ফলো' করতে পারেননি। খেয়েও যে মানুষ মোটা হয় না তার পক্ষে খাওয়াটা 'প্রিভিলেজ' কেন হবে? বরং চিন্তার কারণ।.... মে বি দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ ম্যাকেঞ্জিস ফিজিক। নীরদবরণের কথা শুনে আবার কিছুটা হেসে ছিলেন ম্যাকেঞ্জি। হাসতে হাসতে বলেছিলেন—নো নো নো। নট দ্যাট। আসলে তুমি বুঝতে পারছ না নীরোডবরণ? মানুষের যত বয়স বাড়ে তার খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। বয়স্ক মানুষকে সর্বদা ক্যালোরির পরিমাণ নিয়ে ভাবতে হয়। সতর্ক থাকতে হয় তাকে যাতে শরীরে চর্বি না বেড়ে যায়। আমার বয়স হয়েছে। কিন্তু আমার সেরকম কোনও সমস্যা নেই। তাই আমি ইচ্ছেমতন খেতে পারি। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আমাকে কোনও নিষেধাজ্ঞা মানতে হয় না।

ম্যাকেঞ্জির উত্তর শুনে নীরদবরণের মনে হয়েছিল কথাটা সে ঠিকই বলেছিল। শরীরের সমস্যায় নীরদবরণ হাড়ে হাড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন। একে তিনি মাথায় খাটো। রীতিমতন বেঁটেই বলা যায়। তার ওপর তাঁর শরীরের ঝোঁক স্থূলত্বের দিকে। আজকাল বেশ ভুঁড়ি হয়েছে নীরদবরণের। তিনি প্রায় নিয়মিত মদ্যপান করেন। কমবেশি ভোজনরসিকও। কোমর তাঁর বেড়েই যাচ্ছে যেন। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই নিজেকে দেখতে বিচ্ছিরি লাগে। ছোটখাটো শরীরটা ফুটবলের মতো হয়ে যাচ্ছে। শেলী নীরদবরণের চেহারা নিয়ে হাসাহাসি করে। আর সেটাই সবথেকে খারাপ লাগে নীরদবরণের। পৃথিবীর মানুষ তাঁর চেহারা দেখে যাই মনে করুক, তাঁর কিছু আসে যায় না। কিন্তু শেলীর মুখ থেকে কোনও ব্যঙ্গের উক্তি শুনতে তিনি রাজি নন। শেলী নিজেও অবশ্য বেশ খর্বকায়। অন্তত নীরদবরণের থেকে লম্বা নয়। হাইহিল জুতো পরেও সে নীরদবরণের সমান নয়। সেটা বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করে দেখে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু অস্বস্তি হয় তাঁর অন্য কারণে। বিছানায় যখন পাশাপাশি শুয়ে আছেন দুজনে, তখন আচমকা আদর-টাদর ভুলে শেলী হঠাৎ তার সমুদ্রের মতন সাদা ডান হাত তুলে দেয় নীরদবরণের ভুঁড়িতে। মিচকে হেসে বলে—ইউ আর গ্রোয়িং আ পটবেলি। আই লাইক ইটস প্রামপনেস। কথাটা বলে হি হি হাসে শেলী। তার হাসি যেন থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলে— ভেরি সুন, আই উইল স্টার্ট কলিং ইউ আ ফুটবল—মাই ডিয়ার মি. ফুটবল। শেলীর এরকম রসিকতা একেবারেই পছন্দ নয় নীরদবরণের। তখনকার মতো তিনিই শেলীর সঙ্গে সমান তালে হেসে পরিস্থিতি সামলে নেন বটে, কিন্তু মনে মনে চটে থাকেন। কত চেষ্টা করেন শরীরটাকে

বাগে আনতে। সকালে বাড়ির কাছে পুলিশ ব্যারাকের মাঠে মর্নিং ওয়াক। শুধু মর্নিং-ওয়াক কেন-ছুটোছুটি। ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম। কিন্তু ভুঁড়ি কমে কোথায়? দিনদিন যেন বেড়েই যাচ্ছে। এর একটা কারণ হতে পারে নিয়মিত মদ্যপান। নিয়মিত কমপক্ষে তিন পেগ মদ্যপান না করলে নীরদবরণের মেজাজের ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে অফিস-ক্লাবে ম্যাকেঞ্জি এবং অন্যান্যদের পাল্লায় পড়লে মাত্রা বেশিও হয়ে যায়। কিন্তু রোগা হবার জন্যে মদ কীভাবে ছাড়বেন তিনি? সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। নিজের মোটা হওয়া নিয়ে যখন ভাবতে বসেন নীরদবরণ, ভেবে ভেবে বিষণ্ণ হতে থাকেন। যখন মনে হয় ঈশ্বর অনেক কিছু দিয়েছেন তাঁকে। মেধা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, পরিশ্রম করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কিঞ্চিৎ লেখালেখি করার গুণও দিয়েছেন। কিন্তু এত সব দিয়েও শরীরের বা চেহারার দিক থেকে তাঁকে মেরে রাখলেন কেন? আর একটু লম্বা হলেন না কেন তিনি? এরকম বেঁটে হলেন কেন? পাঁচফুট দুই ইঞ্চি হল কেন তাঁর উচ্চতা? পাঁচফুট ছয় বা সাত ইঞ্চি হলেই বা কী ক্ষতি ছিল? বেঁটে বলেই আসলে বেশি মোটা দেখায় নীরদবরণকে। একটু লম্বা হলে অতটা গোলগাল লাগত না। কিন্তু কী আর করবেন? সব দিয়েও ঈশ্বর যেন তাঁকে এক জায়গায় মেরে দিয়েছেন। আর তখনই নীরদবরণের মনে পড়ে যায় ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কথাগুলো—দিস জাইগানটিক পাওয়ার অব ডাইজেসন অব মাইন ইজ আ গ্রেট প্রিভিলেজ ফর মি।... প্রিভিলেজ? হ্যাঁ প্রিভিলেজই তো বটে। সারাজীবন রোগা থাকা যে কী সুখের তা নীরদবরণ ছাড়া আর কে বুঝবে? ম্যাকেঞ্জি কথাটা মুখে বললেও অতটা হয়তো বোঝেন না। শেলীর মতন ম্যাকেঞ্জির তো কোনও গার্ল-ফ্রেন্ড নেই। কেন নেই? সত্যি সেটাও বিচিত্র লাগে নীরদবরণের। ম্যাকেঞ্জি এখনও ব্যাচেলরই রয়ে গেলেন। বিয়ে করলেন না। আবার তার কোনও সঙ্গিনী নেই। অফিসের লাগোয়া একটা বড়সড় বাড়িতে ম্যাকেঞ্জি একাই থাকেন বরাবর। তাঁর সেই বাড়িতে যাতায়াত আছে নীরদবরণের। সেখানে দুজন কাজের লোক। একজন ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখে। একজন রান্না করে। ম্যাকেঞ্জির বাড়িতে আর যা আছে তা হল বই। অনেক বই-এর মালিক তিনি। মাঝে মাঝেই হুটহাট বই কিনে ফেলা তাঁর অভ্যাস। বিজ্ঞাপন শিল্পের ওপর কত বই আছে ম্যাকেঞ্জির! সেসব বই পড়ে তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজের কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যকে কীভাবে ক্রেতাদের কাছে আকৃষ্ট করে তোলা যায়। যখনই সময় পান পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুক স্টোরে গিয়ে ম্যাকেঞ্জি বই কেনেন। নীরদবরণকেও মাঝে মাঝে সঙ্গী করেন। নীরদবরণও বই কেনেন টুকটাক। তিনি উপন্যাসের ভক্ত। চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস তাঁর পছন্দ। ডিকেন্সের উপন্যাস পেলেই তিনি কিনে নেন। এ ছাড়া ভিক্তর হুগোর নভেল তিনি পড়তে ভালবাসেন। সেদিন ম্যাকেঞ্জির পাল্লায় পড়ে ঐ দোকানে গিয়ে তিনি একটা বই পেয়ে গেলেন—'দ্য হানচব্যাক অব নোতরদাম'। হুগোর লেখা। কিনে ফেললেন। হুগো ফরাসি লেখক। বইটা অনুবাদ ইংরিজিতে। সুন্দর বই। ঠিক বাইবেলের মতন সিল্ক-মসৃণ দামি পাতা বইটার। ম্যাকেঞ্জি আবার কবিতার বই পড়তে ভালবাসেন। কবিতার বইও কেনেন। নিজে কবিতা লেখেন। সেটাও জেনেছেন নীরদবরণ। তাঁর লেখা কিছু কবিতা ম্যাকেঞ্জি শুনিয়েছেন নীরদবরণকে।...

কিন্তু এই ট্রেনটার হলটা কী? আর কি এগোবে না ট্রেন? কাটোয়াতে পৌছবে কখন? নীরদবরণ নিজের সিট থেকে উঠলেন। ট্রেনের দরজার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কেন দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেনটা। আরও অনেক যাত্রী নানা কামরা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। চেষ্টা করছে বোঝার কেন ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে স্টেশনের আগেই। কিন্তু কেউ নামতে সাহস করছে না। নেমে পড়ার পর যদি হঠাৎ আবার ট্রেন চলতে শুরু করে। তাহলে তো আর এক বিপত্তি। মাটি থেকে ট্রেনের কামরা অনেক উঁচুতে থাকে। প্লাটফর্ম ছাড়া উঠতে

ভীষণ অসুবিধে হয়। নীরদবরণ দূরের দিকে তাকালেন। এখন মে মাস। গরমকাল। সেই দুপুরবেলা ট্রেনে উঠেছেন। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। হাওড়া থেকে কাটোয়া পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল। প্রায় সব স্টেশনে থেমে ধিকিয়ে ধিকিয়ে আসছিল ট্রেন। দেরি তো হবেই। নীরদবরণের কোটের পকেটে চেন-লাগানো দামি ঘড়ি ঝুলছে। এই ঘড়িটা বিদেশি। সুইজারল্যান্ডের। ওই দেশে উৎকৃষ্ট ঘড়ি তৈরি হয়। নীরদবরণ এই ঘড়িটা উপহার পেয়েছিলেন ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত ধরনের এক বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। প্রায় তিন বছর তিনি মেলামেশা করছেন পাগল-স্বভাবের এই সাহেবের সঙ্গে। গতবছর ম্যাকেঞ্জি এক মাসের ছুটি নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁর দেশে। খাস লন্ডন শহরের মানুষ। দেশ থেকে ফেরার পর ম্যাকেঞ্জি একদিন নীরদবরণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার বাংলোয়। খাওয়াদাওয়া ভালই হয়েছিল। ম্যাকেঞ্জির বাবুর্চিটা রাঁধে খুব ভাল। পর্কভাজার সঙ্গে অনেক মদ খাওয়া হয়েছিল। ওরকম উৎকৃষ্ট পর্ক-ভাজা নীরদবরণ পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তোরাঁতেও কোনওদিন খাননি। মদ খেতে খেতে ম্যাকেঞ্জি অনেক কবিতা শুনিয়েছিলেন বন্ধু নীরদবরণকে। ম্যাকেঞ্জি কবিতাটা খারাপ লেখেন না। ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা ম্যাকেঞ্জির খুব প্রিয়। একজন হল ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আর একজন হল কীটস। সে যাই হোক, নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন—বাবু আই হ্যাভ অ্যা প্রেজেন্টটেশান ফর ইউ। নীরদবরণ জিজ্ঞেস করেছিলেন—ফর মি?— ইয়েস ফর ইউ। অ্যা ওয়াচ। আ পকেট-ওয়াচ। সুইস মেড। লেট মি প্রেজেন্ট দ্যাট টু ইউ। এই ঘড়িটা সেভাবেই পাওয়া। নীরদবরণও অবশ্য ফিরতি উপহার দিয়েছেন সাহেবকে। তাঁর খুব ইচ্ছে এই কবি-স্বভাবের, আধ-পাগলা সাহেবকে তাঁর জন্মদিনে কিছু উপহার দেন। কিন্তু মুশকিল হল, বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও ম্যাকেঞ্জি তাঁর জন্ম তারিখ, বছর-এসব কিছুই বলেননি তাঁকে। তোমার জন্ম কবে সাহেব? এই প্রশ্ন করলেই ম্যাকেঞ্জি তাঁকে অদ্ভুত একটা উত্তর দ্যান। সেই ইংরেজি কথাটার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—আমি প্রতিদিন একটু একটু করে জন্মাই। এই কথাটা বেশ হেঁয়ালির মতো মনে হয় নীরদবরণের। কিন্তু ম্যাকেঞ্জি বারবার বেশ গম্ভীর এবং সিরিয়াস মুখ করে বলেন—বিলিভ মি। আমি প্রতিদিন একটু একটু করে জন্মাই। বড় হই। আর বেশি সাধাসাধি করলে হঠাৎ হাত নেড়ে আবৃত্তি করে—আই গ্রো গুলড আই গ্রো ওলড, আই শ্যাল উইয়্যার দ্য বটম অব মাই ট্রাইজার্স রোলড্.......। এটা আবার কার কবিতা? তোমার নিজের? জিজ্ঞেস করেছেন নীরদবরণ। ম্যাকেঞ্জি হাত নেড়ে জানিয়েছেন—নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। টি. এস. ইলিয়ট হ্যাজ কমপোজড দিজ ইম্‌মেমোরেবল লাইনস। .... টি. এস. ইলিয়ট? সে আবার কে? এরকম কোনও কবির নাম নীরদবরণ শোনেননি। অবশ্য তিনি কবিতাটাই কম পড়েন। ওই কিছুটা শেলী, কীটস, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যা পড়েছেন। কবিতা নীরদবরণের চায়ের কাপ নয়। তিনি ভক্ত ফিকশনের। নীরদবরণের প্রশ্ন শুনে ম্যাকেঞ্জি হেসে বসেছিলেন ইলিয়ট ইজ আ গ্রেট পোয়েট। হি বিলংস টু দ্য ব্লুমসবেরি গ্রুপ। হি ইজ আ বিট ডিফিকান্ট পোয়েট। বাট ভেরি মডার্ন অ্যান্ড ভেরি কনটেমপোরেরি।..... ঘড়িটা খুবই পছন্দ হয়েছিল নীরদবরণের। তিনি যখন কোথাও বেড়াতে যান তখন এই উপহার-পাওয়া ঘড়িটাই ব্যবহার করেন। যেমন আজ। বহুদিন পর আজ কলকাতার বাইরে মফস্বলে বেরিয়েছেন নীরদবরণ। তিনি একা নন। তাঁর সঙ্গে আছে সাধের নাতনি শুভ্রা। নাতনিকে নিয়ে নীরদবরণ চলেছেন কাটোয়া এক বিয়েবাড়িতে।

দুই

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে নীরদবরণ সময় দেখলেন। বিকেল সাড়ে চারটে বেজে গেছে। কিন্তু মে মাস বলে বাইরে রোদ এখনও বেশ কড়া। আকাশ পরিষ্কার। কোথাও কালো মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। থাকার কথাও না। মে মাসে বৃষ্টি প্রায় হয় না। দূরে সম্ভবত কাটোয়া স্টেশনের প্লাটফর্মের ওপারে সিগন্যালের চোখ এখনও লাল হয়ে আছে। তার মানে এখনও ট্রেন এগোতে পারবে না। কিন্তু কেন? বেমক্কা ট্রেন এরকম দাঁড়িয়ে থাকলে হয় নাকি? নীরদবরণ কিন্তু খুব কড়া ধাতের মানুষ। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি জেনারেল ম্যানেজারকে কড়া চিঠি দেবেন। ইস্টার্ন রেলওয়ের সার্ভিস দিনকে দিন খাবাপ হচ্ছে। যেখানে সেখানে ট্রেন থেমে যাচ্ছে। সময়ে স্টার্ট করছে না। সময়ে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছে না।

কিন্তু একেবারে বিনা কারণে কি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে? সামনে লাইনের ওপর কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে। কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ওপর। নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছে। কী হয়েছে? কী বলাবলি করছে ওরা? নীরদবরণ কিছু বুঝতে পারছেন না। এমনকি শুভ্রাও এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার পর যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। দরজার কাছে নীরদবরণের কাছটিতে এসে শুভ্রা জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে দাদু? ট্রেন আর যাবে না বুঝি? নীরদবরণ বললেন—যাবে নিশ্চয়ই। যাবে না কেন? তুমি স্থির হয়ে বোসো। সিট ছেড়ে উঠছ কেন?—বড্ড খিদে পেয়েছে দাদু।—শুভ্রা বলল। খিদে পেয়েছে?—নীরদবরণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—অতগুলো যে বিস্কুট ছিল খেয়ে ফেলেছ? —সব খেয়ে ফেলেছি।—শুভ্রা সুন্দর হেসে বলল। — ও মাই গড!—নীরদবরণও হাসলেন।—কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর বললে—আর তো এসে গেছি মা। সামনেই কাটোয়া স্টেশন। তারপর বিয়ে বাড়ি। সেখানে যত পারো খেও। ব্যবস্থা ভালই থাকবে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু ট্রেন আর যাচ্ছে না কেন দাদু?—শুভ্রা জিজ্ঞেস করল। শুভ্রা বেশ শিক্ষিতা। সে কোনও ইস্কুলে পড়ে না বটে। কিন্তু নীরদবরণের কাছে পড়াশোনা করে। নীরদবরণ তাকে নিজে ইংরেজি শেখান। অনেকের মতন নীরদবরণের ধারণা যে, ইংরেজি শিক্ষাই হল আসল শিক্ষা। তা না হলে চিরকাল হাস্যকর সব সংস্কার এবং কুসংস্কারের পাল্লায় পড়ে মেয়েদের মূর্খ হয়ে থাকতে হবে। শুভ্রার বয়সী মেয়েরা অধিকাংশই ট্রেন বলতে পারে না। টেরেন কিংবা রেলগাড়ি বলে। শুভ্রা উচ্চারণ করে ট্রেন।

কারণ শুভ্রা ছোটবেলা থেকে দাদুর কাছে ইংরেজিতে শিক্ষিত হয়েছে। নীরদবরণ সত্যিই নিজের হাজার ব্যস্ততা সত্ত্বেও নাতনির ছোটবেলা থেকে তাকে নিজের হাতে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। বাংলা তো শিখিয়েছেনই। এমনকি ইংরেজিও। শুভ্রা ইংরেজি পড়তে পারে। লিখতেও পারে। অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, গ্রিম ভাইদের রূপকথা, অ্যারাবিয়ান নাইটস্—এসব তার প্রিয় কতকগুলো বই। বই পড়তে খুব ভালবাসে শুভ্রা। আর সে কারণেই নীরদবরণ খুঁজে খুঁজে নাতনির জন্যে ইংরেজি ক্লাসিকস বই কিনে আনেন।

—তুমি স্থির হয়ে বোসো। আমি দেখছি। কী জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।...সুবু ডোন্ট বি সো ইমপেশেন্ট।—নীরদবরণ বললেন। শুভ্রা বিরস মুখে নিজের আসনে গিয়ে বসল। লাইনের ওপর ট্রেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওর কিছুটা তফাতেই মাটির পায়ে-চলা রাস্তা। আরও ওপাশে ধানজমি। এখন অবশ্য ধানজমি ফাঁকা, শুনশান। জুন-জুলাই নাগাদ বর্ষা নামবে। তারপর জমিতে ধান রোয়া শুরু হবে। মাটির রাস্তা ধরে একজন দেহাতি মানুষ হাঁটছে। তার কাঁধে একটা ঝোড়া। হাতে কোদাল। মুনিষ-টুনিষ হবে। লোকটার গায়ের রং কুচকুচে কালো। পেটাই চেহারা।

পরনে ময়লা কাপড়। নেংটির মতো করে পরা। হাঁটু অব্দি কাদা। শরীরও অপরিষ্কার। এই ধরনের লোক দেখলেই নীরদবরণ সিঁটিয়ে যান। এইসব গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে কোনও ভদ্র-সভ্য জ্ঞান নেই। পরনের কাপড়টাও এরা একটু ভালভাবে পরতে পারে না। কিন্তু তবুও এই লোকটার সঙ্গে এখন দু-একটা কথা বলতে হবে। কারণ ট্রেন যেখানটা থেমে গেছে সেই জায়গাটা পেরিয়েই আসছে দেহাতি মানুষটা। ও জানতে পারে ঠিক কী কারণে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে ট্রেনটা। নীরদবরণ ডাকলেন লোকটাকে—এই যে ভাই এই যে! শুনুন একবার। লোকটা আপন মনে হেঁটে যাচ্ছিল। নীরদবরণের ডাকে মুখ তুলে তাকাল। একটু ঘাবড়ে গেল বোধহয়। রীতিমতো সাহেব এই লোকটা তাকে ডাকছে কেন? তাড়াতাড়ি হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে যেতেই চাইছিল লোকটা; কিন্তু নীরদবরণ আবার ডাকলেন—এই যে আপনাকে বলছি। ও ভাই— লোকটা সেই ডাক অগ্রাহ্য করতে পারল না। নীরদবরণের ডাকের মধ্যেই এমন একটা জোর ছিল যে, দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। দূরে আঙুল দেখিয়ে নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন—ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে কেন? সামনে কী হয়েছে?

—গরু কাটা পড়েচে যে আইগ্গা।—কথাটা বলেই লোকটা আর দাঁড়াল না। হন হন করে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারপর ছুটতে শুরু করল। নীরদবরণকে সে এত ভয় পেল কেন কে জানে।, নীরদবরণকে সে সাহেব তো ভেবেইছে। এমনকি বড় রাজপুরুষও ভাবতে পারে। মাথায় খাটো এবং বেশ স্থূল হলেও নীরদবরণের চেহারাটি বেশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। রং টকটকে ফর্সা। পরনে কোট, প্যান্ট, টাই। মাথায় হ্যাটও ব্যবহার করেন। এই মুহূর্তে অবশ্য হ্যাটটি তাঁর মাথায় নেই। কামরার মধ্যে হুকে সেটি ঝোলানো আছে। এটি প্রথম শ্রেণির কামরা। এখানে যাত্রীদের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা থাকে। নীরদবরণকে সুপুরুষ বলা যায়। এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

লোকটা যা বলেছে তা থেকে নীরদবরণের বুঝতে অসুবিধে হয়নি ট্রেন কেন দাঁড়িয়ে আছে। সামনে লাইনের ওপর গরু কাটা পড়েছে। তা পড়তেই পারে। তবুও তো কমের ওপর দিয়ে গেছে। মানুষ কাটা পড়েনি যে ভাগ্য ভাল। মানুষ কাটা পড়লে অনেক হ্যাপা। থানা থেকে পুলিশ আসবে। ডেড বডি মর্গে নিয়ে যাবে। তবে রাস্তা ক্লিয়ার হবে। গরু কাটা পড়লে রাস্তা কিংবা রেললাইন পরিষ্কার হতে কতক্ষণ লাগে সে সম্বন্ধে অবশ্য নীরদবরণের কোনও ধারণাই নেই। কাদের গরু মারা পড়ল? আশেপাশের কোনও গ্রামবাসীর হয়ত। আবার সম্পূর্ণ বেওয়ারিশ গরুও হতে পারে। এখন প্রশ্ন হল গরুটা কোন ট্রেনে কাটা পড়ল। এই ট্রেনে কি? তাহলে তো ঝামেলা বাড়বে। কাটোয়ায় পৌঁছে গিয়েও যে পৌঁছনো হল না। ব্যাপারটা সত্যিই বিরক্তিকর। কপালে বিরক্তির ভাঁজ পড়ল নীরদবরণের। লাইন যতক্ষণ না ক্লিয়ার হয় বেকুবের মতো বসে থাকতেই হবে। কিছু করার নেই। কু রু-রু-রু-রু নকুলদানা চাই!—লাইনের ওপাশে সেই সরু মাটির রাস্তাটা দিয়ে এখন ফিরিওলা যাচ্ছে। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা খেঁকুরে চেহারার একটা লোক। গায়ে গার্ডদের মতো খাকি জামা। মাথায় একটা টুপি। সম্ভবত কাগজের। মুখে একটা চোঙা।..... কু.....রু.....রু.....রু....আবার মুখে চোঙা লাগিয়ে হাঁক দিচ্ছিল লোকটা। আর শুভ্রা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। লোকটাকে দেখছিল। এখন ঠিক তাদের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল নকুলদানাওলা।

—দাদু খাব।—শুভ্রা বায়না করল।

—ধ্যাৎ!—নীরদবরণ ধমকে উঠলেন।—ওসব ডার্টি জিনিস কেউ খায় নাকি? ইউ মে হ্যাভ স্টমাক ট্রাবল।

—নকুলদানা খাব।—একেবারে বাচ্চার মতন বায়না করল চোদ্দ বছরের মেয়েটা।

—আবার ওটা বলে!—নীরদবরণ ধমকের সুরে বললেন। হ্যাভ পেশেন্স। আর কিছুক্ষণ

বাদেই আমরা অপরেশের বাড়িতে পৌঁছে যাব। তখন মন্ডা-মেঠাই যত ইচ্ছে খেও। চোঙাতে সুর করে হাঁক পাড়তে পাড়তে নকুলদানাওলা চলে যাচ্ছিল দূর থেকে আরও দূরে। শুভ্রা যতটা পারে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে লোকটাকে করুণ চোখে দেখছিল। শুভ্রা কোনওদিন নকুলদানা খায়নি। তার দাদুর বড় শাসন। বাইরের কোনও কিছু একেবারেই খেতে দেয় না।

কী আর করা যাবে। বসেই থাকতে হবে। যতক্ষণ না কাটা গরুর লাশ রেল কোম্পানির লোকেরা এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। দরজার কাছ থেকে সরে এলেন নীরদবরণ। ট্রেনের গদি-মোড়া, চওড়া সিটে হতাশভাবে বসে পড়লেন। নাতনির দিকে একবার তাকালেন। তারও অবশ্য বিরসমুখ। সেটা অন্য কারণে। নকুলদানা খেতে দেওয়া হয়নি বলে। নীরদবরণ হাসলেন মনে মনে। মেয়েটা বুঝছে না নীরদবরণ তার কত উপকার করলেন। এই গ্রামে-গঞ্জে ডাক্তার কিংবা বদ্যি পাওয়া মুশকিল। এদিকে বোধ হয় পাস করা ডাক্তারও পাওয়া যায় না। হাতুড়ে ডাক্তার মিলতে পারে। রাস্তার বাজে খাবার খেলে শুভ্রার মারাত্মক পেটের অসুখ হতে পারে। এদিকে আবার প্রায়ই খুব কলেরা হয়। সে রকম কিছু হলে একরত্তি মেয়েটাকে নিয়ে অথৈ জলে পড়বেন নীরদবরণ। শুভ্রার মা-বাবা তাকে দুষবে। এরা কেউ বুঝল না যে নীরদবরণ তাদের ভাল চান। নাতনি শুভ্রারও ভাল চান। কবে বুঝবে কে জানে!

চুপচাপ অসহায় ভাবে বসে থেকে ভাবতে ভাবতে এক্ষুণি নীরদবরণের মনে পড়ে গেল হাওড়া থেকে ট্রেনে ওঠার পর সেই লালমুখো গোরাটার সঙ্গে ঝগড়ার কথা। বর্ধমানে নেমে যাবার সময় গোরাটা তার দিকে তাকিয়ে যা বলে গিয়েছিল সেটাও মনে পড়ল নীরদবরণের। সেই ব্যাটা লালমুখোটার কথা কি সত্যিই ফলে গেল? বর্ধমানে নেমে যাবার সময় ইংরেজটা এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল নীরদবরণের সামনে এসে। নীরদবরণ ভেবেছিলেন, সে বুঝি কিছু বলতে চায়। ভদ্রতা করেই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন —ইয়েস মিস্টার—উড ইউ লাইক টু সে এনিথিং?

—ড্যাম ইট।—লালমুখো বলেছিল।—ইউ উইল হ্যাভ আ ব্যাড ডে বাবু। — এই কথা বলে সে আর নীরদবরণের প্রতিক্রিয়ার জন্যে দাঁড়ায়নি। গট্ গট্ করে নেমে গিয়েছিল। নীরদবরণ প্রথমে কিছুক্ষণ গুম হয়ে ছিলেন। তারপর হা হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। লালমুখো সাহেব বোঝাই যাচ্ছে একেবারে ছিটগ্রস্ত। একেবারে না হলেও কিছুটা তো বটেই। নীরদবরণের ওপর সে খেপে ছিল। তাই নামবার সময় নিজের মনের ঝাল মেটাতে বলে গেল নীরদবরণের দিনটা খারাপ যাবে। এ তো একেবারে ছেলেমানুষি। এতে হাসি পাবারই কথা। সাহেবের বলার ধরনে শুভ্রাও হেসে উঠেছিল। সে ইংরেজি বোঝে। সাহেব তার দাদুকে কী বলে গেছে শুভ্রা শুনেছে। সে তার দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল, সাহেব ওরকম বলে গেল কেন। নাতনিকে নীরদবরণ বললেন যে লোকটা খুব রেগে ছিল তাঁর ওপর। সেই রাগের ঝাল মেটাতে ওরকমভাবে অভিশাপ দিয়ে গেল। ওটা অভিশাপই তো। ইংরেজেরা কারোর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে অভিবাদন জানায়। সচরাচর তারা খুব ভদ্র এবং কেতাদুরস্ত হয়। ইংরেজদের ভদ্রতা কিংবা সৌজন্যবোধ তো প্রবাদ প্রতিম। কারোর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যাবার পর যখন কোনও ইংরেজ বিদায় নিচ্ছে তখন সে বলে থাকে 'গুড ডে;' যে কথাটা আসলে হল 'ইউ উইল হ্যাভ আ গুড ডে'—। এরকম বলাটা এক ধরনের শিষ্টাচার। আপনার সারাদিন ভাল কাটুক'—এটা কাউকে বলা মানে যার উদ্দেশে বলা তাকে উৎসাহিত করা, প্রীত করা। কিন্তু কেউ যদি উলটোটা করে। যেমন লালমুখো নীরদবরণের ক্ষেত্রে আজ করেছে, তাহলে সেটা তো অভিসম্পাতের সমতুল। খুব চটে না গেলে একজন আর একজনকে এরকম বলে না।

লালমুখো সাহেবের নীরদবরণের প্রতি চটার অনেক কারণ আছে। দুপুরবেলা ট্রেনে নির্দিষ্ট কামরায় উঠে নীরদবরণ বসেছেন। সঙ্গে শুভ্রা। হঠাৎ কাটোয়াতে যাবার একটা কারণ আছে।

কাটোয়ার মতন মফস্বল এলাকায় যাবার কী কারণ ঘটল নীরদবরণের? সঙ্গে নাতনিকেই বা নিলেন কেন? কলকাতা ছেড়ে নীরদবরণকে প্রায়ই এখানে সেখানে যেতে হয় বটে। কিন্তু সে যাওয়া কাটোয়া কিংবা কালনাতে অথবা মেদিনীপুরে নয়। অফিসের কাজে তাঁকে প্রায়ই দৌড়তে হয় দিল্লি কিংবা বোম্বাই অথবা বিহারের হাজারিবাগ। ওই সব জায়গায় তাঁদের সাইকেল কোম্পানির অফিস আছে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে হল প্রধান অফিস। দিল্লিতে হল প্রধান ফ্যাক্টরি বা কারখানা। যাবতীয় সাইকেল তৈরি হয় দিল্লির কারখানায়। সেই ফ্যাক্টরি থেকে কলকাতার প্রধান অফিসের নির্দেশমতো সাইকেল চালান যায় ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। শুধু ভারতবর্ষে নয়। নীরদবরণের কোম্পানির তৈরি সাইকেল এমনকী বিদেশেও চালান যায়। খোদ লন্ডনে তো বটেই। এছাড়া ইতালি এবং জার্মানির কয়েকটি সংস্থাও সেই সাইকেল আমদানি করে। দিল্লির কারখানা থেকে রপ্তানির কাজ কেমন চলছে। সেখানে নানা জায়গা থেকে কেমন ডিমান্ড আসছে। সাইকেল তৈরি করার ব্যাপারে কোনও প্রশাসনিক সমস্যা আছে কিনা;- -এসব ব্যাপারে বিশদভাবে খোঁজ নিতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের আদেশে নীরদবরণকে প্রায়ই ছুটতে হয় ঐসব জায়গায়। কোম্পানির সেলস ম্যানেজার হলেন জি. এম. ম্যাকেঞ্জি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার নীরদবরণ চৌধুরী। আসলে ম্যাকেঞ্জিরই ঘনঘন বাইরে যাওয়ার কথা। একটা কোম্পানির উন্নতি কিংবা প্রতিপত্তি নির্ভর করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের ওপর। যত বিক্রি হবে তত মুনাফা। আর মুনাফা যত বাড়বে কোম্পানির ব্যবসাও তত এগোবে। সুতরাং নীরদবরণের কোম্পানিতে সেলস ম্যানেজার খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ। ম্যাকেঞ্জি বহুদিন সেলস ম্যানেজার আছেন। নীরদবরণ কোম্পানিতে ঢোকা ইস্তক দেখে আসছেন ম্যাকেঞ্জিকে এই পদে। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হল আর এক সাহেব। পিটার উইলিয়ামস। আরও নানা পদে আরও অনেক সাহেব আছে। কিন্তু যেই থাকুক, সবাই জানে ওই সাইকেল কোম্পানিতে নাকি উইলিয়াম আর ম্যাকেঞ্জি দুজনেরই পারিবারিক সূত্রে শেয়ার আছে। আসল মালিক যারা তারা সবাই লন্ডন শহরেরই বাসিন্দা। ম্যাকেঞ্জি খোদ ইংরেজ নন। তাঁর বাবা ইংরেজ। মা অস্ট্রেলিয়ান মহিলা। উইলিয়ামস সাহেবের বাবা আর ম্যাকেঞ্জির বাবা দুজনে পার্টনারশিপে লন্ডন শহরে একটা ছোট সাইকেল কারখানা শুরু করে। তারপর ক্রমে তা এত বড় হয়েছে। এই কোম্পানির সাইকেল ভারতের কলকাতায় এবং নানা প্রদেশে সত্যিই খুব বড় বাজার পেয়েছে। ম্যাকেঞ্জির বাবা বহুদিন আগেই গত হয়েছেন। উইলিয়ামসের বাবা এখনও বেঁচে আছেন বটে। কিন্তু অনেক বয়স। রোগে শয্যাশায়ী। এদেশে ছিলেন অনেকদিন। তারপর নিজের ইচ্ছেতে লন্ডনে ফিরে গেছেন। হয়তো বুঝেছেন মৃত্যু আসন্ন। নিজের জন্মভূমিতেই মরতে চান।

সেলস ম্যানেজার হিসেবে ম্যাকেঞ্জি খুবই দক্ষ। তিনি নিজের কোম্পানিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন।

শুধু ম্যাকেঞ্জি কেন। উইলিয়ামসও তাঁকে খুব পছন্দ করেন। কারণ বোধহয় নীরদবরণের দক্ষতা, সততা, অগাধ পরিশ্রম করতে পারার ক্ষমতা, তাঁর স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে পারার ক্ষমতা, ব্যবসায়িক চাতুর্য ইত্যাদি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই ম্যাকেঞ্জি তাঁর সহকারী সেলস ম্যানেজার অর্থাৎ নীরদবরণের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও সিদ্ধান্ত নেন না। কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য কীভাবে বাজারে আরও ছড়িয়ে দেওয়া যায়; শুধু শহর নয়, শহরতলিতে এবং গ্রামে গঞ্জেও কীভাবে সাইকেলের বিক্রি আরও আরও বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে নীরদবরণের পরামর্শ খুবই গুরুত্ব পায় ম্যাকেঞ্জির কাছে। শুধুমাত্র খবরের কাগজে কিংবা কোম্পানির ক্যালেন্ডার অথবা পার্ক স্ট্রিটে এবং কলকাতার অন্যান্য এলাকায় হোর্ডিং-এর মাধ্যমে সাইকেলের বিজ্ঞাপন দিলে চলবে না। গ্রামের কজন মানুষ আর ১৯৪০-৪১ সালে খবরের কাগজ পড়ত।

সুতরাং কাগজের বা রাস্তাঘাটের বিজ্ঞাপন তাদের চোখে তো তেমন পড়বেই না। তাহলে উপায়? উপায়ের কথা নীরদবরণের মাথাতেই প্রথম এসেছিল। শহরের পাড়ায় পাড়ায় এবং গ্রাম থেকে গ্রামে নিত্যদিন ঘোরাফেরা করত শাঁখারি এবং আলতা বিক্রেতারা। কোম্পানির সাইকেলের বিজ্ঞাপনের কাজে সেসব লোককে ব্যবহার করলে কেমন হয়? এই প্রশ্ন প্রথম এসেছিল নীরদবরণের মাথাতেই।.......বাট নীরোড হাউ?.....হাউ দ্যাট ইজ পসিবল?—ম্যাকেঞ্জি জিজ্ঞেস করেছিলেন।—পসিবল পসিবল। আই হ্যাভ সাম প্ল্যান স্যার।—বলেছিলেন নীরদবরণ। তাঁর সেই পরিকল্পনা ঠিক কীরকম ছিল?

পরিকল্পনাটা ছিল এরকম। ছোট ছোট হ্যান্ডবিল ছাপানো হবে। সেই হ্যান্ডবিলের ভাষা হবে বাংলা। তাতে লেখা থাকবে সাইকেল কেনার আবেদন। হ্যান্ডবিল একসঙ্গে অনেক ছাপানো হবে। শাঁখা কোম্পানি এবং আলতা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সেই কোম্পানিকে টাকা দেওয়া হবে নির্দিষ্ট হিসেবে। তারা তাদের এজেন্ট এবং বিক্রেতাদের মাধ্যমে সাইকেল কোম্পানির হ্যান্ডবিল বাড়ি বাড়ি ছড়িয়ে যাবে। শাঁখা এবং আলতা কেনে বাড়ির বউরা। শাঁখা এবং আলতা বেচবার সময় বিক্রেতা কৌশলে নীরদবরণের কোম্পানির সাইকেলেরও একটু গুণগান করবে। বাড়ির গৃহিণীদের হাত দিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডবিল পৌঁছে যাবে কর্তার কাছে। নীরদবরণের পরিকল্পনা শুনে ম্যাকেঞ্জিসাহেব প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন।

—মার্ভেলাস! মার্ভেলাস বাবু!......এক্সট্রিমলি সেনসিবল অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ। ইটস রিয়েলি অ্যা সেপ্লনডিড আইডিয়া। ইউ হ্যাভ অ্যা ক্রিয়েটিভ ব্রেন বাবু।.......আমি কথা বলব উইলিয়ামস এর সঙ্গে, আমার মনে হয়েচে তুমার আইডিয়া তাহার পছন্দ হোবে।—ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন। অনেকদিন ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় থাকা হয়ে গেল ম্যাকেঞ্জির। তিনি অনেকদিন ধরে বাংলা শেখার চেষ্ঠা করছেন। বাংলা বলতে পারেন কিছুটা। কিন্তু লিখতে পারেন না। লেখার দরকারটা কী। অফিসের কাগজপত্রে তো আর বাংলায় লেখার দরকার নেই। ম্যাকেঞ্জি বাংলা বলে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন মোটামুটি। কিন্তু মুশকিলটা হল, তাঁর কথ্য বাংলা সাধু আর চলিত বেমালুম মিশে থাকে। আর হিন্দি শব্দও ঢুকে থাকে। তা কী আর করা যাবে। ম্যাকেঞ্জি কী বলতে চাইছেন সেটা বোঝা গেলেই হল। তা সেটা তো বোঝা যায়। ম্যাকেঞ্জির বিচিত্র উচ্চারণে বাংলা বুঝতে অন্তত নীরদবরণের কোনও অসুবিধে হয় না।

সাইকেলের ব্যাপক প্রচারের ব্যাপারে নীরদবরণের পরিকল্পনা কিংবা প্রস্তাব কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের পছন্দ হয়ে গেল। এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। সুপার! সাইকেলের মহিমা বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে পারলে তো আসল কাজটাই করা যাবে। কিন্তু হ্যান্ডবিলটা হবে কীরকম? আবেদনের ভাষা কী হবে? বেশি কথা তো লেখা যাবে না। বিজ্ঞাপনের ভাষা হবে অতি সংক্ষিপ্ত, যথাযথ আবার আবেদনময়। তো হ্যান্ডবিলে কী লেখা থাকবে সেটা আবার দায়িত্ব দেওয়া হল নীরদবরণেরই ওপর। প্রাথমিক অনুমোদন পাবার পর নীরদবরণ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেলেন। ভাবতে থাকলেন। তারপর যে ম্যাটার তৈরি করলেন তা হল এরকম—

মহাশয়

আপনি কি পক্ষীর মতো
ডানা মেলিয়া উড়িতে চান?
তাহলে কিনুন;
উইলিয়ামস-ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির সাইকেল....

হ্যান্ডবিলের নকশা এবং ভাষা খুবই পছন্দ হয়ে গেল কোম্পানির মালিকদের। শয়ে শয়ে ছাপানো হল হ্যান্ডবিল। শাঁখার দোকান এবং আলতার দোকানের মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নীরদবরণ কমিশনের রেট ঠিক করলেন। তারপর যেমন ভাবা হয়েছিল সেভাবে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সবুজ, নীল আর হলুদ রং-এর হ্যান্ডবিল। শুধু এখানে থেমে থাকলে তো চলবে না। এভাবে হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে দেওয়ার পর সাইকেলের বিক্রি আগের থেকে বাড়ছে কি না সেটাও তো খতিয়ে দেখতে হবে। ম্যাকেঞ্জি আর নীরদবরণ দুজনেই কলকাতায় এবং শহরতলিতে যেখানে বিক্রয়-কেন্দ্র আছে সব জায়গায় দু-তিন দিন পরেই নিয়ম করে খোঁজ নিলেন হল। খোঁজ করে আহ্লাদে আটখানা ম্যাকেঞ্জি। হ্যাঁ বিক্রি সাইকেলের উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। আর কী চাই?

সে কারণেই ম্যাকেঞ্জি সেলস-এর ব্যাপারে সবকিছু যেন নীরদবরণের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। দিল্লি কিংবা বোম্বাই যেতে হলে ম্যাকেঞ্জি খুব কমই নিজে যান। যেতে হয় নীরদবরণকে। খুবই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটে নীরদবরণের দিনগুলো। প্রতি মাসেই প্রায়, অন্তত একবার দিল্লি যেতে হয়। ছমাসে নমাসে বোম্বে। সুতরাং কাটোয়া কিংবা কালনায় কোথাও যাবারই ফুরসত থাকে না নীরদবরণের। কিন্তু তবুও আজ আদরের নাতনি শুভ্রাকে নিয়ে হঠাৎ নীরদবরণ কাটোয়া কেন যাচ্ছেন? নিশ্চয়ই বেড়াবার জন্যে নয়। বেড়াবার জন্যে না হতে পারে। বন্ধুকৃত্য করতে। হ্যাঁ—তাইতো। নীরদবরণের কলেজ-ফ্রেন্ড অপরেশের মেয়ের বিয়ে আজ। সেই বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তিনি নাতনি শুভ্রাকে নিয়ে যাচ্ছেন কাটোয়া।

তিন

হাওড়া থেকে ট্রেনে ওঠার পরই একটা বিপত্তি ঘটল। নাতনিকে নিয়ে প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে বসেছিলেন নীরদবরণ। ট্রেনে উঠে মনটা বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কারণ কামরা ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। এত বড় একটা সুসজ্জিত কামরাতে নাতনিকে নিয়ে একেবারে একা যাবেন এটা ভেবেই নীরদবরণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। ফাঁকা কামরাতে নাতনির সঙ্গে গল্প করতে করতে এবং বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে অনেকটা রাস্তা, তা প্রায় ঘণ্টা দু-আড়াই তো বটেই, যাবার মজাটাই আলাদা। কিন্তু তবুও খটকা লেগেছিল। একেবারে কি কোনও প্যাসেঞ্জার নেই? অনেকে পুরো কামরাই রিজার্ভেশন করে যায়। নীরদবরণ সেরকম কিছু করেননি। করার প্রয়োজনের কথা মনেও হয়নি! রেলের কর্মচারী এখনও এই কামরাতে কতজন যাত্রী যাচ্ছে তার তালিকা ঝুলিয়ে দিয়ে যায়নি। নীরদবরণ বেশ আগেই উঠে পড়েছেন ট্রেনে। প্রথমে গাড়িতে স্টেশনে এসেছেন। সঙ্গে তেমন জিনিসপত্র কিছু ছিল না। একটা ঢাউস ট্রাভেলার্স ব্যাগ। এরকম অনেক ব্যাগ আছে নীরদবরণের। মাত্র দুদিনের জন্যে নাতনিকে নিয়ে কাটোয়াতে যাওয়া। বেশি জিনিসপত্র নেওয়ার আর কী আছে? ঐ গ্রামে-গঞ্জের পোশাক আশাক। অপরেশের বাড়ি পৌঁছে খুলে রাখবেন। ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়েছেন একসেট। আর চটি। বিয়ে বাড়িতে ধুতি-পাঞ্জাবিই ভাল চলবে। ফেরার সময় আবার স্যুট-টাই ঝুলিয়ে নেবেন। ট্রেনে সাহেবি পোশাক থাকাই ভাল। কিন্তু তবুও ঢাউস ব্যাগটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। বেশ ভারীও লাগছিল। একবার তুলতে গিয়ে দেখেছেন নীরদবরণ। মনে হচ্ছে ব্যাগের মধ্যে যেন পাথর ঢোকানো হয়েছে। এত ভারী কেন? কেন আর। শুভ্রার জামাকাপড় চলেছে ব্যাগে। অন্তত তিন রকমের শাড়ি নিয়েছে শুভ্রা। তার সঙ্গে মানানসই অনেকগুলো পেটিকোট। তারপর হরেক রকম সাজের জিনিস। সাজতে

খুবই ভালবাসে শুভ্রা। তাকে দেখতে খুবই সুন্দরী। গায়ের রং দুধে-আলতার মতন। নাতনির নাম শুভ্রা রেখেছেন নীরদবরণ নিজেই। সরস্বতী প্রতিমার মতন রং তার। মুখশ্রীও ঠিক প্রতিমারই মতন। তাঁর বড় মেয়ে সুনীতির প্রথম সন্তান হল শুভ্রা। সুনীতির স্বামীর নাম বিশ্বদেব। সে হাওড়ায় কিংবা কলকাতায় থাকে না। থাকে অনেক দূরে মানভূমে। সেখানে ঝালদা নামে একটা জায়গায় গালা কারখানার কর্মচারী বিশ্বদেব। সাহেবি কোম্পানি। বিশ্বদেব বি. কম পাস। অ্যাকাউন্টস-এর কাজকর্ম ভাল বোঝে। ভাল জানে। তার সম্বন্ধে নীরদবরণের ধারণা হল এককথায়, বিশ্বদেব বড় অস্থিরচিত্ত। সে কোনও চাকরিতে কিংবা অফিসে দীর্ঘদিন একটানা থাকতে পারে না। কলকাতায় থাকতে একের পর এক চাকরি ছেড়েছে বিশ্বদেব। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাকি তার বনে না। তার আত্মসম্মানবোধ বড় তীব্র। কোনও অফিসে মাস ছয় কাজ করার পরই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার মনোমালিন্য শুরু হয়। এরকম মনোমালিন্যের চূড়ান্ত ফল হল বিশ্বদেবের চাকরি ছেড়ে দেওয়া। মাঝে মাঝেই সে বেকার হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাকাউন্টসের কাজটা ভাল বোঝে বলে আবার কোনও না কোনও অফিসে চাকরি জুটেও যায় তার। প্রায় একবছব হল বিশ্বদেব ঝালদাতে আছে। তার পবিবারও সেখানে আছে। প্রায় পনেরো বছর হল বড় মেয়ে সুনীতির বিয়ে দিয়েছিলেন নীরদবরণ। ইতিমধ্যেই বিশ্বদেব তার পরিবারটিকে বেশ বড় করে ফেলেছে। তার দু মেয়ে দু ছেলে। আর একটি সন্তান আবার আসবে সুনীতির কোলে। নীরদবরণকে চিঠিতে বিশ্বদেব খবর পাঠিয়েছে যে সুনীতি সন্তানসম্ভবা। তা বেশ ভালই। নীরদবরণ নিজেও তো পাঁচ সন্তানের জনক। তাঁর তিন ছেলে। দু মেয়ে। নিজের ছেলেদের নাম নীরদবরণ নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছেন। সবথেকে বড় হল ছেলে ক্ষীরোদবরণ। তারপর মেয়ে সুনীতি। তারপর সুজাতা। সুজাতার পর আরও দুই ছেলে। তাদের নাম হ'ল— বারিদবরণ আর অসিতবরণ। সুনীতি যে সন্তানসম্ভবা, তার এবারে কী হবে? ছেলে না মেয়ে? তা কী করে বলা যাবে? সেতো পরমেশ্বর জানেন। কিন্তু নীরদবরণের মনে খটকা আছে অন্য কারণে। জামাইয়ের চিঠিতে মেয়ের সন্তানসম্ভবা হবার খবর পেয়ে নীরদবরণ লিখেছিলেন সুনীতিকে হাওড়ায় তার বাপের বাড়ি রেখে যেতে। এ সময় মেয়েদের মায়ের কাছে থাকা ভাল। তা ছাড়া ঝালদার মতন অনুন্নত, দেহাতি এলাকায় কি ডাক্তার-বদ্যি ভাল আছে। সেখানে সুনীতির প্রসব করা বোধহয় বেশ ঝুঁকিরই হয়ে যাবে। নীরদবরণ চিঠিতে বিশ্বদেবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন স্ত্রীকে হাওড়ায় তার কাছে রেখে যেতে। সেই চিঠির উত্তরের আশা করে করে নীরদবরণ যখন মনে মনে জামাইয়ের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন, ভাবছেন যে নিজেই সেই সুদূর ঝালদায় গিয়ে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন; ঠিক তখনই একদিন বিশ্বদেবের চিঠি এসে হাজির। সে শ্বশুরকে জানিয়েছে যে তিনি বৃথাই দুশ্চিন্তা করছেন। সন্তান হবার ব্যাপারে সুনীতির তার কর্মস্থলে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। কারণ গালা কোম্পানির বিরাট কলোনিই শুধু ঝালদাতে নেই, সাহেবদের তৈরি এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত একটা ভাল হাসপাতালও আছে। সেই হাসপাতালে অনেক ইংরেজ মহিলারও সন্তান হয়ে থাকে। বিশ্বদেব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তার পরবর্তী সন্তানও ঐ সাহেবদের হাসপাতালে হবে। জামাইয়ের চিঠি পড়ে নীরদবরণ রেগেছিলেন খুব। কিন্তু কী আর বলঁবেন? তিনি জানেন, তাঁর এই জামাইবাবাজি স্বভাবে ভীষণ একরোখা আর অনড়। সে নিজের সব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্তে নিয়ে থাকে। কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না। স্ত্রীর সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সে নিজে যা ভেবেছে তাই করবে। নীরদবরণের মতামত সে হয়ত শুনবে। কিন্তু গ্রহণ করবে না। আর তাঁর দ্বিতীয় কন্যা সুজাতার স্বামী শ্যামসুন্দব হল আর এক ধরনের। মাঝে মাঝে নিজের ভেতরে কৌতুক বোধ করেন নীরদবরণ। তাঁর দু-জামাই হল দু-ধরনের। একজন একগুঁয়ে স্বভাবের। আর

দ্বিতীয়জনের হল সন্দেহবাতিক। দুজনকেই একটু অন্য রকমের মনে হয় নীরদবরণের। দুজনেই যেন কীরকম অস্বাভাবিক, ছিটগ্রস্ত।

তো কাটোয়ায় বিয়ে বাড়িতে যাবে শুনে শুভ্রা নিজেই নিজের জামাকাপড় গোছাতে শুরু করে দিয়েছিল। গতকাল অফিস থেকে ফিরে স্ত্রী যূথিকার কাছে শুনলেন যে, শুভ্রা ইতিমধ্যে নিজেই তার ব্যাগ গুছিয়ে ফেলেছে।

—তাই নাকি?—নীরদবরণ শুনে হেসেছিলেন। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—ওর এত উৎসাহের কারণ আছে। বেচারি তো বাড়ির বাইরে খুব একটা যায়নি। ঐ যা আমাদের সঙ্গে জুড়িগাড়িতে জু-গার্ডেন কিংবা সার্কাস। বড় জোর হোটেলে খেতে যাওয়া। কাটোয়াতে যাবে শুনে ও নিশ্চয়ই খুব উৎসাহ পেয়েছে।

—তা তো বটে।—যূথিকা বলেছিলেন—সকাল থেকে শুধু একটা করে শাড়ি বের করচে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরচে সেই শাড়ি। তারপর আবার খুলে ফেলচে। এভাবে পরপর যে কত শাড়ি পরল আর খুলল। আমি তো খাটে শুয়ে শুয়ে মজা দেখে যাচ্ছি। কোন্ কোন্ শাড়ি নিয়ে যাবে কিছুতেই আর ঠিক করতে পারচে না বেচারা। তারপর অবশ্য নিজেই ঠিক করতে পেরেচে কী কী নিয়ে যাবে। তোমার অত বড় ব্যাগটা তো সুবুর জামাকাপড়েই ভরে গেছে। তুমি আবার জামাকাপড় নেবে? তাহলে তো আর একটা ব্যাগ ভরতে হবে।

—নাহ। দুটো ব্যাগ আমি কিছুতেই নেব না।—যেন আঁতকে উঠেছিলেন নীরদবরণ।—লাগেজ বেশি হয়ে গেলে আমার অসুবিধে হয়। আই ফিল কনফিউজড। সবসময় মনে হয় কটা ব্যাগ-ট্যাগ কী নিয়ে যাচ্ছি, সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তুমি যাচ্ছ না। তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে না হয় কথা ছিল। সব গুছিয়ে টুছিয়ে নিতে পারতে। আমি তাই একটা ব্যাগই নেব। সেই আমার বড় ট্রাভেলার্স ব্যাগ। আচ্ছা আমি হাত-মুখ ধুয়ে নি। স্থির হয়ে বসি। লেট মি টেক মাই টি। তারপর না হয় ভাবা যাবে লাগেজ গুছোনোর কথা।.....তোমার জ্বর কেমন?

—এবেলা আর আসেনি মনে হচ্ছে। ওবেলা এসেছিল। এখন জ্বরটা গেছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

—ভোলানাথ কবিরাজের দেওয়া ওষুধ খাচ্ছো তো?

—হ্যাঁ। খাচ্চি তো।

—কেন যে জ্বরটা পুরোপুরি যাচ্ছে না। বুঝতে পারছি না।

—যাবে এখন। অত ভাবছ কেন?—যূথিকা হেসে বলেছিলেন। ভোলানাথ কবিরাজের ওষুধ তো আমার খুব কাজ দ্যায়।......তুমি এখন কলঘরে যাও। হাতমুখ ধুয়ে নাও। হাবুর মাকে আমি বলেছি লুচি ভাজতে। আলুর দম করা আছে। তারপর চা।

নীরদবরণ চিন্তিত মুখে কলঘরের দিকে এগিয়েছিলেন। যূথিকার জ্বর হয়েছে আজ পাঁচদিন। আসছে আর যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে ছাড়ছে না। এ আবার কী ধরনের জ্বর? ম্যালেরিয়া নয় তো? আজকাল চারদিকে বড় ম্যালেরিয়া হচ্ছে। যূথিকা প্রায়ই ভোগেন। বরাবর রুগ্ণ আর কমজোরি। সর্দি-কাশি-জ্বর কোমরে ব্যথা সারাবছর লেগেই থাকে। যূথিকার অসুখ নিয়ে নীরদবরণের মনে বরাবরের অশান্তি আছে। যূথিকা একজন গোছানো স্ত্রী হতে পারেন। এত বড় সংসারটা তিনি নিজের হাতে গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এটাই কী সব? স্ত্রীর থেকে আরও অনেক কিছু আশা করেছিলেন তিনি। পার্টনার বলতে যা বোঝায় তা বোধহয় যূথিকা নন। মানসিক আশ্রয় নীরদবরণ যূথিকার কাছ থেকে পাননি। শারীরিক ভাবেও যে যূথিকা তাকে তৃপ্ত করতে পেরেছেন এমন নয়। কিন্তু সে তো অন্য গল্প। নীরদবরণের অবৈধ জীবনের গল্প।

যূথিকা তা জানেন না। কিছু কিছু আঁচ করেন হয়তো।

কিছু বলতে সাহস পান না। নীরদববণের ব্যক্তিত্বের কারণে। কিন্তু যূথিকা যে অসুখী সেটা নীরদবরণ বুঝতে পারেন। শুধু যূথিকা কেন। নীরদবরণ নিজেও কি দাম্পত্য-জীবনে সুখী নাকি? এই পৃথিবীতে একজন মানুষও কী সুখী? সংসারে অসুখ থাকবেই। এটা নীরদবরণ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছেন। একমাত্র যারা সংসারেব মোহ ত্যাগ করে, সব ধরনের মায়া বিসর্জন দিয়ে পরমার্থকে সাধনার জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন তাঁরাই বোধহয় সুখী। কিন্তু তা তো নীরদবরণ পারবেন না। তিনি জীবনকে এবং সংসারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। নিঃসঙ্গ সাধকের জীবন তাঁর জন্যে নয়। তিনি জীবনকে তিল তিল কবে ভোগ করতে চেয়েছেন। সংসারের প্রতি তাঁর যে কর্তব্য তা তিনি সাধ্যমতো পালন করার চেষ্টা করেন বরাবর। যূথিকা কী বলতে পারবেন কোনওদিন যে তিনি স্বামী হিসেবে তাঁর প্রতি অমনোযোগী। বরং একটু বেশিই মনোযোগী বরাবর। ছেলেমেয়েদের প্রতিও তো তিনি সমান মনোযোগ দিয়েছেন বরাবর। বড় ছেলে ক্ষীবোদবরণ অবশ্য পড়াশোনাতে বেশিদূর এগোতে পারেনি। ম্যাট্রিক পাস করেই তার দম শেষ। তার অদ্ভুত নেশা থিযেটার কবার। ঐ নেশাই তার বারোটা বাজিয়েছে—এটা নীরদববণের বিশ্বাস। ছেলেব বিয়েও দিয়েছেন তিনি ঠিক সময়ে। ক্ষীরোদের স্ত্রী বন্দনা কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি এলাকার মেয়ে। তার বাবা অবশ্য নীরদববণের মতো চাকুরে নয়। হোসিয়ারির ব্যবসা সেই ভদ্রলোকের। বন্দনা দেখতে খারাপ নয়। রীতিমতো সুশ্রী। নীরদবরণ তাকে নিজে দেখে এবং পছন্দ করে এ-বাড়িতে এনেছেন। বন্দনা ভাল গান গাইতে পারে। রান্নার কাজও ভালই পারে। নীরদবরণ বন্দনার হাতের রান্না পছন্দ করেন। বিশেষত পাঁঠার মাংস বন্দনা বেশ চমৎকার রাঁধে। কিন্তু বন্দনার একটিই ত্রুটি। সে কথায় কথায় বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে। একবার বাপের বাড়ি গেলে আর যেন ফিরতেই চায় না। এসব নিয়ে প্রায়ই বড় ছেলে ক্ষীরোদ এবং বন্দনার মধ্যে অশান্তি লেগে থাকে। চিৎকার-চেঁচামেচি, ঝগড়াও হয়। তবে সেটা নীরদবরণের অনুপস্থিতিতে। তিনি আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকেন। সকাল অটটাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। আর ফেরেন সাধারণত রাত দশটা নাগাদ। মাঝে মাঝে ফেরেন না। রাত্রিবাস করেন অন্যত্র। যখন বাড়িতে ফিরতে পারেন না নীরদবরণ, তখন যূথিকা এবং অন্য সবাই জানতে পারে যে অফিসে তাঁর কাজের চাপ পড়ে গেছে খুব। তিনি রাতটা কোম্পানির গেস্ট-হাউসেই কাটাতে বাধ্য হবেন। কিন্তু এটা মিথ্যে কথা। অত্যন্ত গোপনে নীরদবরণ তাঁর ইচ্ছেমতো অন্য একটা জীবন যাপন করেন। সে জীবন অবৈধ।

বড় ছেলে এবং বড় পুত্রবধূর মধ্যে মাঝে মাঝে নানা অশান্তির খবর নীরদবরণ যূথিকা মারফতই জেনেছেন। তিনি অবশ্য বন্দনাকে খুব একটা দোষ দেন না। ক্ষীরোদ বরাবরই জীবনযাত্রায় এলোমেলো, ছন্নছাড়া। নাটকের নেশাই তার বারোটা বাজিয়েছে, এটা নীরদবরণের বিশ্বাস। নাটকের দলের সঙ্গে ওঠাবসা করে ক্ষীরোদ অন্য দোষগুলোও পেয়েছে। রাত করে বাড়ি ফেরে। আরও কী কী করে আড়ালে—আবডালে সেটা অবশ্য নীরদবরণ খোঁজ নেননি। আসলে ক্ষীরোদকে সংসারে স্থিত করতেই তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে মেয়ে খুঁজলেন এবং তার বদভ্যাসগুলো পালটাল না। সেই দিনরাত নাটকের দলের সঙ্গে মেলামেশা করা। রাত করে বাডি ফেরা। সবই চলছে নিয়মিত। বন্দনার হয়তো এসব ভাল লাগে না। তাই সে বাপের বাড়ি গিয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চায়। নীরদবরণের ধারণা, ক্ষীরোদ নিজে থেকেই তার সংসারে অসুখ ডেকে আনছে। বন্দনা ভাল মেয়ে। সে সংসার করতে চায়। কিন্তু ক্ষীরোদ সংসারি হল না। সে বেহিসেবি, অগোছালো, বোহেমিয়ান রয়ে গেল। নাটকেও যে সে খুব উন্নতি করতে পেরেছে এরকম মনে হয় না নীরদবরণের। তিনি বড় ছেলের নাটক দেখতে

গিয়েছিলেন দু-বার। প্রথমবার যে নাটকটি দেখতে গিয়েছিলেন সেটি ছিল পৌরাণিক নাটক। সম্ভবত কর্ণার্জুন। তিনি ভেবেছিলেন ক্ষীরোদবরণ বোধহয় বড় কোনও রোলে অভিনয় করবে। হয় কর্ণ নয়তো অর্জুনের ভূমিকায় থাকবে সে। কিন্তু নাটক শুরু হওয়ার পর নীরদবরণ অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে, ঐ দুটি মূল চরিত্রের কোনওটিতেই তাঁর ছেলে অভিনয় করছে না। সে অভিনয় করছে নেহাতই এক পার্শ্বচরিত্রে। মাত্র দুটি দৃশ্যে ক্ষীরোদের পার্ট ছিল। নীরদবরণের মনে হয়েছে ওরকম পার্ট না থাকলেও হত। 'প্রফুল্ল' নাটকে অবশ্য ক্ষীরোদ রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। কিন্তু খুব যে উঁচুদরের অভিনয় করেছে ক্ষীরোদ এটা মনে হয়নি নীরদবরণের। রমেশের চরিত্রের যে শঠতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ এবং বিষয়বুদ্ধির প্রখরতা তা যেন ঠিক ক্ষীরোদের অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি। তার একটাই কারণ, নাটকের নায়ক কিংবা খলনায়ক হবার মতন চেহারা এবং স্বর এ দুটির কোনওটিই ক্ষীরোদের নেই। সে মোটেও দীর্ঘকায় নয়। বেশ খর্বকায়ই বলা যায়। সেরকম হবারই কথা। কারণ নীরদবরণ নিজেও লম্বা নয়। যূথিকাও বেশ খাটো। তাহলে তাঁদের ছেলে ক্ষীরোদবরণ কীভাবে লম্বা হবে? এছাড়া ক্ষীরোদের স্বরও কোনও নাটকের মুখ্য চরিত্র হবার পক্ষে বেশ বেমানান। তার স্বর গুরুগম্ভীর নয়। বরং ফ্যাঁশফেঁশে। খুব উঁচু পর্দায় ডায়ালগ বলতে গেলে ক্ষীরোদবরণের যেন অসুবিধে হয়। গলা ভেঙে যায়। ক্ষীরোদের অভিনয় দেখে নীরদবরণের মনে হয়েছিল সে বেশিদূর এগোতে পারবে না। এগোতে পারেও নি। আগে ক্ষীরোদ হাওড়ার একটা নাটকের দলে ছিল। সেই দলটি এলাকায় বেশ পরিচিত। প্রায়ই নানা জায়গায় নাটক করতে যায়। যদিও দলটা পেশাদার নয়। অ্যামেচার দল। সে যাই হোক ঐ দলটির বেশ পরিচিতি আছে। কিন্তু সেই দল থেকে নাকি ইদানীং ক্ষীরোদ বেরিয়ে এসেছে। সে অন্য একটা দলে গেছে। এবং অভিনয় ছেড়ে ইদানীং নাকি ক্ষীরোদ নাটক লিখছে। এসব ক্ষীরোদ নিজে কোনওদিন বাবাকে জানায়নি। জানার ইচ্ছে হয়নি নীরদবরণের। ক্ষীরোদ বিষয়ে এসব কথা তিনি যূথিকার মুখ থেকেই শুনেছেন।

নীরদবরণের অন্য দুই ছেলে বারিদবরণ এবং অসিতবরণ দুজনেই পড়াশোনায় বেশ ভাল। দুজনেই পিঠোপিঠি ভাই। বারিদবরণ পড়ে কলেজে। অসিতবরণের ক্লাশ টেন। সে ফার্স্ট হতে পারে না বটে, তবে প্রতি বছরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম এক থেকে দশজনের মধ্যে থাকে। এই দুই ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নীরদবরণ যথেষ্ট আশাবাদী।

চার

চানঘর থেকে বেরিয়ে জলখাবার খেয়েছিলেন নীরদবরণ। সেদিন তিনি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছেন। কারণ পরের দিন কাটোয়া যেতে হবে নাতনিকে নিয়ে। কিছু গোছগাছ করে নেওয়া দরকার। নীরদবরণের জলখাবার খাওয়াটাও বেশ আড়ম্বরের। ফুলকো লুচি তাঁর বরাবরের প্রিয়। খাঁটি গাওয়া ঘি-এ ভাজা লুচি। বাজারের আজেবাজে ঘি খান না কোনওদিন। তিনি ঘি কিনে আনেন হগসাহেবের বাজার থেকে। সেখানে রহমানের দোকানের ঘি সবথেকে উৎকৃষ্ট। সাহেবদের অধিকাংশ ঐ দোকান থেকে দুগ্ধজাত খাবার-দাবার কেনে। সাহেবরা আবার ঘি তেমন পছন্দ করে না। তাদের পছন্দের জিনিস হল বাটার, চিজ, চিজ-বিস্কিট। এরকম আরও কত কী। নীরদবরণেব মতো আরও অনেক বাঙালি 'সাহেব' রহমানের দোকান থেকে দুগ্ধজাত জিনিসপত্র কেনে। চিজ নীরদবরণের খুব প্রিয়। বিশেষত চিজ-স্যান্ডউইচ। দু-পিস পাঁউরুটিব মাঝখানে পুরু চিজের খন্ড। খেতে দারুণ লাগে। অফিসের টিফিনে তিনি এই বস্তুটি প্রায়ই

বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে খান। বাড়িতে চিজের টিন কয়েকবার এনে দেখেছেন নীরদবরণ। কেউ তেমন খেতে চায় না। যূথিকা তো ওসব মুখেই দিতে চান না। প্রথমত সাহেব পাড়ার খাবার-দাবারের বিষয়ে তিনি ভাষণ খুঁতখুঁতে। তাঁর ধারণা সাহেবরা সব খাবারেই কোনও না কোনও ভাবে গরুর মাংস মিশিয়ে দ্যায়। এছাড়া ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারও আছে। আমিষ-নিরামিষ এসব বাছবিচার সাহেবদের আছে নাকি। ওরা তো যা খায় তাই আমিষ। ওদের খাবার বাড়িতে ঢোকানো মানে সবকিছু অশুদ্ধ হয়ে যাওয়া। নীরদবরণ প্রথম প্রথম চিজ খাওয়ার জন্যে যূথিকাকে খুবই পীড়াপীড়ি করেছিলেন। অনেক বুঝিয়েছিলেন। অনেক অনুরোধ। এরকম অনুরোধের সুরে সাধারণত নীরদবরণ স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন না। বাড়িতে তিনি সর্বদাই একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি যা বলবেন সেটাই চূড়ান্ত। তাঁর ওপর কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না। কেউ কথা বলতে সাহসও করে না। কিন্তু চিজ বস্তুটির ব্যাপারে নীরদবরণ স্ত্রীকে একটু সাধাসাধি করেছিলেন তার একটা কারণ আছে। নিজের রসনাব স্বার্থে তিনি ওরকম করেছিলেন। চিজ যূথিকার পছন্দ হয়ে যাওয়া মানে বাড়িতে তা চালু হয়ে যাবে। নিজের ইচ্ছেমতো যখন-তখন চিজ-স্যান্ডউইচ খেতে পারবেন। নীরদবরণ পেটুক নয়। বলা যায় ভোজন রসিক। পৃথিবীতে নানা দেশের যত উপাদেয় খাবার আছে সব, যতটা সম্ভব খেয়ে দেখতে চান তিনি। যতটা সম্ভব ততটা। খাওয়া তো জীবনেরই কিংবা প্রবলভাবে বেঁচে থাকারই অঙ্গ। এটাই অনেকে বুঝতে চায় না।

নীরদবরণের পীড়াপীড়িতে যূথিকা 'চিজ' খেয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুটা মুখে দিয়েই যূথিকা বলেছিলেন—নাহ্ এ আমি খেতে পারব না। কীরকম নুন-নুন। এ খেলে আমার বমি হয়ে যাবে। ওয়াক!—বমি পাচ্ছে এরকম ভঙ্গীও করেছিলেন যূথিকা। নীরদবরণ পিট্‌পিট্ করে দেখেছিলেন স্ত্রীকে। তারপর বলেছিলেন—প্রথম প্রথম ওরকম মনে হয়। খেতে খেতে হ্যাবিট হয়ে যাবে। জিনিসটা কিন্তু শরীরের পক্ষেও পুষ্টিকর। একেবারে খাঁটি দুধ জমিয়ে বানানো। যূথিকা প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—নাহ। নাহ। এ আমি খেতে পারব না। ওগো তোমার পায়ে বাড়ি। তুমি আমাকে এটা খাওয়া নিয়ে জোর কোরো না। জোর করে খেতে গেলে আমার ঠিক বমি হয়ে যাবে।......নীরদবরণ আর জোর করেননি। তবে তিনি মনে মনে এটাও জানতেন যে, চিজ মুখে দিলে বমি হয়ে যেতে পারে অন্য কারণে। আসলে যূথিকার সন্দেহ হল এটাই যে ঐ পনির খন্ডেও গরুর কিংবা শুয়োরের মাংস মেশানো আছে। তাই তাঁর ও বস্তুটাতে এত আপত্তি। অনেক চেষ্টা করেছেন নীরদবরণ। কিন্তু নিজের এই 'গ্রাম্য' স্ত্রীকে তিনি আজও একটু সভ্য-ভব্য, একটু 'আরবানাইজড' করতে পারলেন না। বাঁকুড়ার সোনামুখী অঞ্চলের মেয়ে যূথিকা। সোনামুখীতে ঢুকলেই একটা ছোটখাটো শহর। শহরটা মোটামুটি ভদ্রস্থ। কিন্তু যূথিকার বাড়ি অর্থাৎ নীরদবরণের শ্বশুর বাড়ি তো সোনামুখী শহরে নয়। বেশ ভেতরে। অজ গাঁয়ে। গাঁয়ের নাম জিওড়দা। চল্লিশ বছর হল নীরদবরণের বিয়ে হয়েছে। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি শ্বশুরবাড়িতে গেছেন মাত্র দু-বার। একবার বিয়ের সময়। আর একবার শ্বশুরমশাই গত হওয়ার পর। সেই অজ গাঁয়ের মেয়েকে আর কতটা মানুষ করা যায়। নীরদবরণের ভাগ্যটাই এরকম। তাঁর মনের মতন ঘরণী তিনি পেলেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-জীবনে তাঁর স্ত্রী পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বটে। কিন্তু মনের মিল হয়নি দুজনের মধ্যে। হতে পারেও না। নীরদবরণ একজন শিক্ষিত এবং ঝকঝকে চেতনার মানুষ। ইংরেজি নভেলের পোকা। নিজে ইংরেজি লিখতে পারেন ভাল। আর যূথিকা প্রায় অশিক্ষিত। বই-কাগজের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনও সম্পর্কই নেই। তবুও সেই গেঁয়ো স্ত্রীকেও মেনে নিতে হয়েছে। এর জন্যে তিনি কাকে দোষ দেবেন? নিজের ভাগ্যকে? না নিজের জেদি পিতাকে। দুজনকেই দায়ী করেন তিনি মনে

মনে। ভাগ্যে নীরদবরণ বিশ্বাস করেন অবশ্যই। তিনি একজন অদৃষ্টবাদী। গ্রিক নাটকের ভক্ত। যেখানে অদৃষ্টবাদেরই প্রাবল্য। মানুষ হল ভাগ্যের হাতে ফড়িং-এর মতন। কিংবা বাচ্চা ছেলের হাতে ফড়িং-এর মতন। একটা ফড়িং-কে ধরে কোনও বাচ্চা ছেলে যেমন যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মারতে চায়। প্রথমে তার একটা ডানা কেটে নেয়। তারপর আর একটা ডানা কেটে নেয়। তারপর পা-গুলো একটা একটা করে কাটে। যন্ত্রণায় ছটফট করে সেই অসহায় কীট। আর সকলে তা দেখে উল্লসিত হয়। যেন ঠিক তেমনই ভাগ্যের হাতেও মানুষ অসহায় অবস্থায় তিল তিল করে কষ্ট পায়। ভাগ্য সহায় থাকলে মানুষ জীবনে অনেক দূর যেতে পারে। আর ভাগ্য যদি বিরূপ হয় তাহলে আর রক্ষে নেই। জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যাবে। ভীষণ কষ্ট পেতে হবে তাকে। কিন্তু নীরদবরণের সঙ্গে যূথিকার অসম বিবাহ শুধু কী দুর্ভাগ্যের কারণে? নীরদবরণের বাবার জেদও সেখানে অনেকটা কাজ করেছিল অনুঘটকের মতন। সেই জেদের বিরুদ্ধে একুশ বছরের নীরদবরণ কোনও প্রতিবাদ জানাতে পারেননি। আর বাবার সেই জেদ নীরদবরণের নিজের চরিত্রে যেন প্রবলভাবে মিশে আছে।

বেশি নয়। গুনে গুনে ঠিক দু-খানা লুচি খাবেন নীরদবরণ। শর্ত একটাই। প্রতিটা লুচিকেই হতে হবে পুরোপুরি ফুলকো। বড় একটা কাঁসার রেকাবিতে খাচ্ছিলেন। লুচিব সঙ্গে আছে লম্বাটে করে বেগুন ভাজা। দুটি। এবং নারকেল কুচি দিয়ে বানানো চাপ চাপ ছোলার ডাল। জলখাবারের ডাল কিন্তু চাপ-চাপ কিংবা রসা-রসা হতে হবে। তরল একেবারেই নয়। বিন্দুমাত্র তরল হলে ডালের বাটি উলটে দিয়ে চলে যাবেন নীরদবরণ। আর খাবেন না সেদিন। এরকম কত হয়েছে একসময়; অনেক আগে, যখন যূথিকা নিজের হাতে রান্না করতেন, রান্না পছন্দসই হয়নি বলে তাঁর রাগী ও জেদি স্বামী খাবার না খেয়ে কিংবা কিছুটা খেয়ে ছড়িয়ে ছত্রাকার করে ফেলে রেখে উঠে গেছেন। এখন অবশ্য যূথিকা নিজে বান্না করেন না। তাঁর বয়স হয়েছে। তার ওপর তিনি অসুস্থ। এখন রাঁধুনি রান্না করে। সেই রাঁধুনি একজন বয়স্কা ও বিধবা মহিলা। সে যূথিকার দেশেরই লোক। বাপের বাড়ি একবার গিয়ে যূথিকা ঐ মহিলাকে পাঁচ বছর আগে এই বাড়িতে এনেছিলেন। সে এখন ঘরের লোক হয়ে গেছে। তার ডাকনাম হল হাবুর মা। হাবু কে তা জানেন না নীরদবরণ। ঐ মেয়েটার ছেলে-টেলে হবে। তার কী নিজের কোনও নাম নেই? ওরকম অদ্ভুত নামে সে পরিচিত? হাবুর মা? নীরদবরণের হাসি পায় মাঝে মাঝে। তবে কাজের লোক নিয়ে আর অত ভাবার কী আছে?

স্বীকার করতেই হবে হাবুর মায়ের রান্নার হাতটি খাসা। কোনওদিন নীরদবরণ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন নি। বস্তুত তাঁকে ধারে-কাছে দেখলেই সেই মহিলা পাঁচহাত ঘোমটা টেনে একপাশে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নীরদবরণ যতক্ষণ সেখান দিয়ে যাবেন সে গণেশের কলাবউ হয়ে দাঁড়িয়েই থাকবে। খাওয়াদাওয়া এবং রান্নার ব্যাপারে সবরকম নির্দেশ হাবুর-মা পেয়ে থাকে যূথিকার কাছ থেকে। মহিলা বেশ চালাক চতুর বলতে হবে। শুধুমাত্র যূথিকার কাছ থেকে। সব শুনেই সে এমন রান্নাবান্না করে যে নীবদবরণেব অপছন্দ হওয়ার কোনও কারণ থাকে না। মুখে কোনওদিন প্রকাশ করেন নি তিনি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী হাবুর মায়ের রান্না নীরদবরণের অত্যন্ত পছন্দ।

প্রতিদিনই যে লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল থাকবে তা নয়। কোনওদিন আলুর দম। সেটাও চাপ-চাপ। ঝাল দেওয়া থাকে তাতে। যূথিকা বাঁকুড়া জেলার মেয়ে অর্থাৎ রান্নায় মিষ্টি পছন্দ করেন। নীরদবরণ ঠিক বিপরীত স্বভাবের। বরিশাল জেলার মানুষ। রান্নায় রীতিমতো ঝাল না হলে তাঁর চলেই না। তা সেটাও হাবুর মা বেশ ভালই বুঝেছে। 'কত্তাবাবুর' রান্নায় সে কষে ঝাল দ্যায। ডাল কিংবা আলুরদম এবং বেগুনভাজার সঙ্গে লুচি খাওয়ার পর আর যেটি

পছন্দ করেন নীরদবরণ সেটি হল একবাটি ক্ষীর। প্রতিদিন বাড়িতে তিন সের দুধ আসে। তার মধ্যে এক সের দুধই বোধহয় প্রয়োজন হয় নীরদবরণের জন্যে ক্ষীর বানাতে। প্রতিদিনই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এই জলখাবার খান তিনি। এখানেও একটা ব্যাপার আছে। যেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন যেমন আজ, সেদিন তিনি সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে 'জলখাবার' 'সেবা' করেন। আব যেদিন বেশ রাত করে বাডি ফেরেন, (সপ্তাহে অন্তত চারদিন) সেদিনও এই খাবার খান। সেসব দিনে পরে আর কিছু খান না। বড়জোর এক কাপ কফি খেয়ে শুয়ে পড়েন। আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার দিনগুলোতে নীরদবরণ রাতের দিকে, শোবার আগে আবার বড় জামবাটিতে দুধ খান। শুধু দুধ নয়। সেই দুধে মিশিয়ে নেন খই। এভাবেই চলছে অনেক বছর।

নীরদবরণ খেতে বসলেই বাড়ির পোষা বেড়াল বুঁচি এসে ঠিক হাজির হবে তাঁর পাতের একটু দূরে। এই বেড়াল স্বয়ং নীরদবরণের প্রশ্রয়েই এ বাড়িতে থাকে। তার গতরটি বড় নধর। সে তো হবেই, ঘি, দুধ, চিজের টুকরো, বড কাতলা বা রুই মাছের ল্যাজা এবং কাঁটা ও আরও অনেক কিছু প্রতিদিন তার পেটে পড়ছে। সন্ধে হোক আর রাতই হোক বুঁচি ঠিক গুটিগুটি এসে নীরদবরণের পাতেব অদূরে এসে বসবেই। ওরকম যে রাশভারী মেজাজের মানুষ নীরদবরণ বুঁচি কিন্তু তাঁর কাছে ভীষণ পাত্তা পায়। তিনি যখন খেয়ে উঠে যাবে, পাতে পড়ে থাকবে আধখানা লুচি। এবং বাটিতে কিছুটা ক্ষীর। বলাই বাহুল্য সেসব নীরদবরণ ইচ্ছে করেই ফেলে রেখে যান বুঁচির জন্যে। হাবুর মা এঁটো থালাবাসন রান্নাঘরে নিয়ে যায়। তারপর না-খাওয়া খাবার ছুড়ে দ্যায় বুঁচিকে। যূথিকা মারফত তাকে সেরকমই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন নীরদবরণ।

সেদিনও নীরদবরণ যখন খেতে বসেছেন বুঁচি এসে অদূরে বসল এবং ম্যাও ডেকে জানান দিল। খেতে খেতে নীরদববণ মুচকি হেসে বুঁচিকে বললেন—'জানি জানি। বোস। চুপ মেরে বসে থাক। আমাকে খেতে দে। বেড়ালরা কিংবা প্রাণীরা কী মানুযের কথা বোঝে? বুঁচির মুখটা বেশ গম্ভীর ছিল। মনিবের কথা শুনে বেশ হাসি-হাসি হয়ে গেল যেন। সে অল্প জিভ বের করে নিজের শাঁসালো গোঁফ বেশ চাটল। তারপর আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে রইল অদূরে। নীরদবরণ যতক্ষণ খেতে থাকবেন, বুঁচি ওভাবেই ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। একটিবারের জন্যেও আর ম্যাও ডাকবে না। এ বাড়িতে সকলের মধ্যে (সকলের মধ্যে কি? অনেকের মধ্যে। ক্ষীরোদ তো তাঁর কথা মতন চলেই না) বেশ একটা শৃঙ্খলাবোধ আনতে পেবেছেন নীরদবরণ। এমনকী বুঁচির মধ্যেও। ফুলকো লুচির কানা ভেঙে, ডালের বাটিতে ডুবিয়ে তারপর হাঁ-এর মধ্যে ফেলে নীরদবরণ খানিক তফাতে বসে থাকা যূথিকাকে প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ সারাদিন সুবু কী নিয়ে ব্যস্ত যেন? বিয়ে বাড়ি যাবে তাই জামাকাপড় গোছাতে?....

যূথিকা হাসলেন। বললেন—সকাল থেকে মেয়ের ব্যস্ততা যদি দেখতে! আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করছে, দিদু কী শাড়ি নিয়ে যাব বলে দাও না। আমি কী আর করি। বললুম এটা ওটা যাহোক কয়েকটা ভাল শাড়ি। তা সেগুলো আর মেয়ের পছন্দ হয়? বাক্স-প্যাঁটরা যেখানে যা শাড়ি বেলাউজ ছিল সব বের করেচে। আর তারপর ভাবতে বসেচে কোন শাড়ি কোন বেলাউজের সঙ্গে যাবে। যেন নাওয়া খাওয়ার আর সময় পায় না মেয়ে...।

ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে লুচি খাওয়া শেষ। নীরদবরণ তারপর টেনে নিয়েছিলেন ক্ষীরের বাটি। লুচির টুকরো ভেঙে জমাট বাঁধা ক্ষীরের মধ্যে ডুবিয়ে তিনি মুখে ফেললেন। তৃপ্তিতে চোখ বুজে চিবোলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—কত বয়স হল যেন সুবুর?

—এই তো। সামনের আশ্বিনে ষোলো বছরে পড়বে।

—সেকি? ষোলো বছর বয়স হয়ে গেল মেয়ের?

—তা নয়তো কী? মেঘে মেঘে বেলা কম হল? তারপর সুনু (সুনীতি) নয় নয় করে চারটে বাচ্চা বিয়োলো।

—আচ্ছা বিশ্বদেবের কোনও চিঠিপত্র এসেছে?

—চিঠি?........এসেছে কি? এলে তো ক্ষীরোদ দিয়ে যেত। চিঠিপত্তর তো সব ঐ প্রথমে খোলে।

—এত গোঁয়ারগোবিন্দ বিশ্বদেবটা। আমি যে একটা চিঠি লিখলুম আজ এক মাস হয়ে গেল। তার কোনও উত্তর দিলে না?— নীরদবরণের স্বরে অসন্তোষ। তাঁর খাওয়া প্রায় শেষ। শেষ গ্রাস মুখে ফেলে তিনি থালা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। বেড়াল বুঁচিও বুঝেছে কর্তামশাইয়ের খাওয়া শেষ। কেননা সে এতক্ষণ ঘাপটি মেরে শুয়েছিল। মানুষের মতন প্রাণীরাও বোধহয় ভাণ জানে। নীরদবরণ থালা সরিয়ে দিতেই বুঁচি চোখ পিটপিট করে দেখে নিল। আড়মোড়া ভাঙল একবার। তারপর মৃদুভাবে ডাক দিল—ম্যাঁও। যূথিকা বললেন—অ্যাই বুঁচি। এখেনে কী করতে ম্যাও ম্যাও করচিস? যা রান্নাঘরে যা। হাবুর মা আঁশ তুলে নিয়ে যাবে। যা পাবার সেখেনে পাবি।...কী আশ্চর্য! বুঁচি কি এদের সঙ্গে থেকে থেকে এদের কথাবার্তাও বুঝতে পারে? সে মৃদুভাবে একবার গা ঝাড়া দিয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে গেল এই দালান থেকে। রান্নাঘরে হাবুর মা-এর কাছে দরবার করতে।

—কী লেখা হয়েছিল চিঠিতে? যূথিকা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন। বেশ ভয়ে ভয়ে। ভয় তো করবেই। যা মেজাজ কত্তামশাইয়ের। কখন যে কোন কথায় রেগে উঠবেন বুঝতে পারা মুশকিল। সে কারণেই কোনওদিন গলা তুলে কথা বলতে পারলেন না যূথিকা স্বামীর সঙ্গে। ভয়ে ভয়েই কেটে গেল তাঁর সারাজীবন। এ বাড়িতে নীরদবরণের 'কত্তামশাই' নাম দিয়েছে ক্ষীরোদবরণ। এসব ব্যাপার অন্দরমহলে। আড়ালে-আবডালে সবাই নীরদবরণকে কত্তামশাই ডাকে। তাতে কি কিছু ভুল আছে? নীরদবরণ এ বাড়ির কর্তা। আর তাঁর কাজে, কথায়, ব্যবহারে তিনি প্রতিমুহূর্তে সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন। অবশ্য স্ত্রীর প্রশ্নে তেমন রাগলেন না নীরদবরণ। হয়ত আহার মনোমতন হয়েছে বলে মেজাজটাও বেশ প্রফুল্ল ছিল।

—কী আর লেখা হবে?.....কিছু পরামর্শ দিয়েছিলুম জামাই বাবাজিকে। বয়স হল আর কী? এবার তো সুবুর বিয়ের কথা ভাবতে হবে। তা মেয়ে তো তাঁর। তিনি নিজে উদ্যোগ না নিলে আমি কী করব? তা ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েরাও তো বাড়ছে। তাদের লেখাপড়া শেখাতে হবে তো। ঐ ঝালদায় চিরকাল পড়ে থাকলে হবে? যত বিহারি জংলিদের বাস সেখানে। না আছে একটা ভাল স্কুল। না কোনও ভাল কলেজ। গতবার যখন এসেছিল এখানে কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে গেলুম, তা কথাগুলো ওঁর যেন পছন্দ হল না। বিশ্ব কী বলল জানো?

—কী?

—আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দিন। শুনে গা-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। যূথিকা কিছু বললেন না। কী বলবেন? শ্বশুর আর বড়-জামাইয়ের মধ্যে এই মানসিক রেষারেষি, এই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের খবর তিনি রাখেন। নীরদবরণ আজীবন সকলের ওপর কর্তৃত্ব করতে চান। বড় জামাইদের ওপরও সে চেষ্টা যে তিনি করেননি তা নয়; বড় জামাইয়ের সঙ্গে সুবিধে করতে পারেননি এখনও। বিশ্বদেবও বেশ অহঙ্কারী এবং মেজাজি মানুষ। সে নিজে যা ভাল বোঝে তা করে। বিশেষত নিজের সংসারের ব্যাপারে সে কারোর পরামর্শ গ্রহণ করতে পছন্দ করে না। শ্বশুরের সঙ্গে বিশ্বদেবের খটাখটি সে জায়গাতেই। নীরদবরণ প্রায়ই বিশ্বদেবের সংসারের ব্যাপারে উপযাজক হয়ে নানা পরামর্শ দিতে চান। বিশ্বদেব সেসব শুনে যায় শুধু। শ্বশুরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে সে বরাবর সচেতনভাবে নিরুৎসাহ দেখিয়ে এসেছে।

সেখানেই ক্ষোভ এবং বিরক্তি নীরদবরণের। তিনি বিশ্বদেবকে এখনও বাগে আনতে পারলেন না। মেজ জামাই শ্যামসুন্দরের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম। শ্যামসুন্দর তার শ্বশুরমশাইকে বেশ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে থাকে। তাই নীরদবরণের তাকে বেশ পছন্দ করেন।

—কথাগুলো অনেকবার বলা হয়েছে বিশ্বদেবকে। কান না দিলে কী করব।...ছেলেমেয়ের পড়াশোনার কথাটা তো ভাবতে হবে। গালা কারখানার ম্যানেজারি করে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে চাইলে ছেলেমেয়ে তো আর মানুষ হবে না। ঐ ঝাল্লদার জংলিদের মতন হয়ে থাকবে। আর সুনীতিটাও হয়েছে সেরকম। বিশ্বকে একটু বোঝাতে-টোঝাতে পারে না? কলকাতায় কি চাকরির অভাব? এটা তো ঠিক যে বিশ্বদেব অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম ভাল জানে। ভাল বোঝে। ও যদি চাকরি করতে চায় কলকাতার অনেক বড় বড় ফার্ম ওকে ডেকে ডেকে চাকরি দেবে। কী যে দূরে দূরে পড়ে থাকে। গোঁয়ার্তুমি করে নিজের জীবনটাকে তো মিডিওকার করে তুলেছে। এবার ছেলেমেয়েগুলোকেও জংলি বানিয়ে রাখবে সারাজীবন।— একটানা কথাগুলো বলার পর নীরদবরণ থামলেন। যূথিকা চুপ। তিনি আর কী বলবেন? কথাগুলো যে তাঁর স্বামী খুব খারাপ বলছেন তা তো নয়। আহা সুনীতিকে কতকাল দ্যাখেননি। বড় দেখতে ইচ্ছে করে। বড় মেয়ে সুনীতি। বরাবরই চুপচাপ। নরম স্বভাবের। চেহারাটাও যূথিকার মতন। ছোটখাটো। মুখ বুজে সংসারের কাজ করে যাবে সুনীতি। নিজের অসুবিধে কিংবা কষ্টের কথা কোনওদিন মুখ ফুটে কারও কাছে প্রকাশ করবে না। সুনীতির মতন নরম স্বভাবের মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে বড় জামাইয়েরও যেন সুবিধে হয়েছে। তার কর্তৃত্বের চাপে সুনীতি যেন আরও চুপচাপ হয়ে গেছে আজকাল। বড় মেয়ের ভাগ্য যেন তাঁর নিজেরই মতন! একমুহূর্ত ভাবলেন যূথিকা। সুনীতিকে নিয়ে কী যেন এইমাত্র বললেন কর্তামশাই। অন্তত সেটুকুর মৃদু প্রতিবাদ করা উচিত এই বোধে যূথিকা নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বললেন—সুনীতি আর কী বলবে? বিশ্বদেব কী চাকরি করবে কোথায় চাকরি করবে সেসব ব্যাপারে ওর কী বলার আছে? না কি বললেই জামাই শুনবে।... নীরদবরণ তাকালেন স্ত্রীর দিকে। মেয়েকে টেনে যে কথা বলছেন যূথিকা তা কী আর বুঝতে বাকি রইল তাঁর। এদিকে খাওয়া বেশ কিছুক্ষণ শেষ হল। এঁটো হাত শুকিয়ে আসছে। কড়কড়ে লাগছে। এঁটো হাতে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না নীরদবরণ। ঘেন্না করে। অতএব উঠতে হবে। তবুও আসন ছেড়ে উঠে পড়ার আগে তিনি বললেন—ওসব কথার মধ্যে যেতে চাই না। আমি শুধু এটুকুই বুঝি যে, বিশ্বদেবকে কতকগুলো ডিসিসান খুব তাড়াতাড়ি নিতে হবে। প্রথম হল, তার বড় মেয়ে সুবুর বিয়ে। তার পাত্র খোঁজাও সহজ হবে না। প্রথমত, দেখতে শুনতে সে বেশ ভাল। দ্বিতীয়ত, আমার পাল্লায় পড়ে সে দু-পাতা বাংলা আর ইংরেজি পড়তে শিখেছে। যার তার সঙ্গে বিয়ে হলে সে সুখী হবে না। অতএব তার পাত্র খোঁজার জন্যে এখন থেকেই উঠে-পড়ে লাগতে হবে। দ্বিতীয়ত বিশ্বদেবকে ডিসিসান নিতে হবে সে কতকাল ঐ জংলি জায়গায় পড়ে থাকবে। সুবুটা না হয় আমার কাছে থেকে কিছুটা সভ্য-ভব্য হয়েছে। কিন্তু ওর অন্য ছেলেমেয়েগুলোকেও তো মানুষ করতে হবে যাই হোক। এখন উঠে পড়ছি। চা ও-ঘরেই পাঠিয়ে দিতে হবে।—কিঞ্চিৎ থলথলে, চর্বি বোঝাই শরীর নীরদবরণের। মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসলে উঠতে সময় লাগে। এবার একটা ডাইনিং টেবিল কিনতে হবে। অবশ্য এ-বাড়িতে তিনি ছাড়া আর কে ডাইনিং টেবিলে বসে খাবে। এ বাড়ির লোকজন, মানে যূথিকা এবং ছেলেরা সবাই মাটিতে আসনপিঁড়ি হয়ে খেতেই অভ্যস্ত। এ পাড়ার কারও বাড়িতে খাবার জন্যে টেবিলের ব্যবহার নেই। এটা জানেন নীরদবরণ। তিনি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন। পায়ের পাতায় ঝিন্‌ঝিন্ ধরে গেছে। আজকাল বেশিক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসলে হাঁটু দুটো টন্‌টন্ করে। এই অসুবিধেটা নীরদবরণ সবথেকে বেশি অনুভব করেন পায়খানা বসার সময়। ওহ

সে যে কী কষ্ট! তাহলে বাড়িতে কী একটা কমোড বসিয়ে নেবেন? সেটাও বাড়ির লোকজনের পক্ষে বেশ বিস্ময়ের কারণ হতে পারে। রবারের চটি পায়ে নীরদবরণ কয়েকবার। তারপর শুভ্রা যে ঘরে ব্যাগ গুছোতে ব্যস্ত সেদিকে এগোলেন।

ঘরে ঢুকে নীরদবরণ যা দেখলেন তাতে তাঁর প্রথমেই বিকট হাসি পেল। সারা ঘরময় ছড়িয়ে আছে শাড়ি আর ব্লাউজের ডাঁই। অদূরে পড়ে আছে নীরদবরণের ঢাউস ভ্রমণ-ব্যাগ। এই ব্যাগটা তিনি দিল্লি থেকে কিনেছিলেন। সত্যিই ফরেন মেড। নানা জায়গায় যেতে খুব কাজে লাগে। সুটকেশ নিয়ে যেতে হয় না। সব সময় ঘাড়ে করে সুটকেশ নিয়ে যাওয়া ঠিক পছন্দের নয় তাঁর। বরং ব্যাগ নিয়ে যাওয়াটা বেশ স্মার্ট ব্যাপার। সকালবেলা অফিস যাওয়ার সময় নীরদবরণ বলেছিলেন, যে, কী কী নিতে হবে সেসব তিনি দিদিমাকে (যূথিকা) বলে গেলেন। দিদুই সব গুছিয়ে দেবেন। শুভ্রা যেন তাঁকে সাহায্য করে। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি শুনেছেন যে ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক উলটো। শুভ্রা তার দিদুকে বুঝিয়েছে যে, সে তো যথেষ্ট বড় হয়েছে। দাদুর জামাকাপড় কী কী যাবে যূথিকা তাকে দেখিয়ে দিক সে নিজেই সব গুছিয়ে নেবে। নীরদবরণের জামাকাপড় যে খুব বেশি যাবে তা নয়। তিনি যূথিকাকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর কী কী ভরতে হবে ব্যাগে। তিনি সুট ছাড়া অন্য কিছু পরে কোথাও যান না। এ ব্যাপারে নীরদবরণ পুরোপুরি সাহেবি। এ বাড়িতে তিনটে আলমারি আছে নীরদবরণের পোশাকে ভর্তি। সুট, ঝকঝকে পালিশ করা জুতো আর কখনও সখনও মাথায় টুপি। এই হল তাঁর বাইরে যাবার পোশাক। মাত্র তিনদিনের জন্যে যেতে হচ্ছে কাটোয়া। বিয়ের আগের দিন যাবেন নাতনিকে নিয়ে। রাত কাটাবেন। বিয়ের দিন থাকতেই হবে। সেদিন ফিরতে পারবেন না। তার পরদিন অপরেশের মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি রওনা হয়ে গেলে নীরদবরণও নাতনিকে নিয়ে দুপুরের ট্রেনে ফিরবেন। টাইম-টেবিল তিনি দেখেছেন। হাওড়া থেকে যেমন দুপুরের দিকে কাটোয়াতে যাবার ট্রেন আছে। তেমনি কাটোয়া থেকে ফেরার ট্রেনও দুপুরের দিকে আছে। সেটা আসে মালদা থেকে।

কাটোয়াতে হলট দ্যায়। তাতে উঠলে সন্ধে ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসা যাবে। নীরদবরণের নির্দেশ মতন যূথিকা তাঁর সফরের জামাকাপড় বের করে দিয়েছিলেন। একটা নাইটগাউন। নীরদবরণ রাতে গাউন পরেন। বিছানাতেও যান গাউন পরে। আর একসেট পাজামা-পাঞ্জাবি। সোনার বোতামের ছোট্ট কৌটো একটা। একজোড়া চটি। চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি নকশাকাটা। বাস্ আর কী লাগবে মাত্র তিনদিনের জন্যে? ঠিক তিনদিন কী পুরোপুরি বলা যাবে? আসলে দু রাত। আর যাবার সময় যে সুট পরনে থাকবে নীরদবরণের, ফেরার সময়েও সেটাই।

কিন্তু নিজের শাড়ি আর ব্লাউজ গোছাতে শুভ্রা পড়েছে ঝামেলায়। সে যে কোন শাড়ি নেবে আর কোনটা নেবে না সে ব্যাপারেই প্রায় সারাদিন ধরে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। যূথিকা কয়েকটা শাড়ি পছন্দ করে দিয়েছেন। শুভ্রার সেগুলো পছন্দ নয়। আবার সে নিজেও সে সেসবের বদলে অন্য কিছু চূড়ান্তভাবে পছন্দ করতে পেরেছে তা নয়। দাদুকে দেখে যেন শুভ্রা আশ্বস্ত হল। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর দাদুকে বলল—এই তো তুমি এসে গেছ। এবার তুমি পছন্দ করে দেবে।

—তোমার সমস্যাটা কী মা? —মুচকি হেসে নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।

বিয়েবাড়িতে আমি কী কী শাড়ি নিয়ে যাব ঠিক করতে পারছি না।

—কেন? পারছ না কেন? শাড়ির তো তোমার অভাব নেই।

—প্রথমে মনে হয়নি ডিফিকাল্ট। কিন্তু শাড়ি বাছতে বসে মনে হচ্ছে একবার এটা নিয়ে যাই, আবার ওটাও নিয়ে যাই। কয়েকটা শাড়ি ব্যাগে ভরে ফেলেছিলুম। আবার সেগুলো বের

করে রেখেছি। মনে হচ্ছে অন্য রকম শাড়ি নিয়ে যাই। কী যে করি। আই অ্যাম টোটালি অ্যাট এ লস দাদু!

—ইউ শুড নট হ্যাভ বীন অ্যাট এ লস উইথ সাচ্ আ্য ট্রাইফল ম্যাটার।—নীরদবরণ বললেন। শুভ্রা সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে ইংরেজি শিখছে তাঁর কাছে। সে ইংরেজি উপন্যাস পড়তে পারে। মোটামুটি ইংরেজিতে কথাও বলতে পারে। এই নাতনিটি হল তাব বড় মেয়ে সুনীতির প্রথম সন্তান। তার জন্মও এ বাড়িতে। ছোটবেলা থেকে শুভ্রার এ বাড়িতেই কেটেছে বেশি। দাদুর নিবিড় সান্নিধ্যে। নিজের বাবা-মায়ের কাছে বরং সে কম থেকেছে। এমনকী তাঁর অবুঝ এবং গোঁয়ার-গোবিন্দ বড়জামাই বিশ্বদেব যখন গালা কারখানার ম্যানেজারি চাকরি নিয়ে সেই সুদূর ঝালদা প্রদেশে চলে গেল, তখনও তিনি আদরের নাতনিকে বাবাব সঙ্গে অতদূর যেতে দেননি। ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, শুভ্রা এখানে তাঁর কাছে থাকবে। বিশ্বদেব যে শ্বশুরের প্রস্তাবে খুব প্রীত হয়েছিল তা নয়। যথেষ্ট গাঁইগুঁই করেছিল। প্রথমে শাশুড়ির কাছে। তারপর শ্বশুরের কাছেও। শ্বশুরকে বিশ্বদেব বলেছিল যে সে বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। কারণ ওর ফর্মাল এডুকেশানটা হচ্ছে না। নীরদবরণের কাছে মেয়েটা দুপাতা ইংরেজি পড়তে শিখেছে বটে। ফরফর করে হয়ত কিছুটা ইংরেজিও বলতে পারে। কিন্তু সেটাই কী সব? হাওড়ারই (মামাবাড়ির কাছে) একটা মেয়েদের স্কুলে ক্লাশ এইট অব্দি পড়াশোনা করে শুভ্রা পড়া ছেড়ে দিল এটা কী ঠিক হয়েছিল? ক্লাশ এইট পাশও করেনি। পড়তে পড়তে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আর স্কুলে গেল না শুভ্রা। সে নাকি বাড়িতে দাদুর কাছে পড়াশোনা করে। এটা কী রকম ব্যাপার? এতদিন নিয়মিত ফর্মাল এডুকেশানটা নিলে শুভ্রার তো ম্যাট্রিক পাশ করা হয়ে যেত। তাই বিশ্বদেব ঠিক করেছে সে তার মেয়েকে এভাবে মামাবাড়ির দেশে রাখবে না। সেই ঝালদাতেই নিয়ে যাবে। চাকরিটা নেওয়ার সময়েই সে খোঁজখবর নিয়েছে। ঝালদাতে গিয়ে দেখেও এসেছে। গালা কারখানা সাহেবদের। সেই সাহেবদেরই পরিচালিত এক স্কুল আছে সেখানে। ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। তবে বাংলা পড়ানোরও ব্যবস্থা আছে। গালা কারখানার বাঙালি এবং অন্য প্রদেশের কর্মচারীরাও তাদের ছেলেমেয়েদের সেখানে ভর্তি করতে পারে। বিশ্বদেব ভেবেছে তার ছেলেমেয়েদের সে সেই স্কুলেই পড়াবে।

বড়-জামাইয়ের কথা শুনে নীরদবরণ প্রথমে গুম হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে তাদের বাবারই ডিসিসান নেওয়া উচিত এটা আমিও মনে করি। কিন্তু শুভ্রার ব্যাপারে আমি তোমাকে ডিসিসান নিতে দেব না। ওর ব্যাপারে যা ভাববার আমিই ভাবব। তোমার কোনও প্রস্তাবই আমার কাছে গ্রাহ্য হবে না।

—কেন? সেটা কি ঠিক? আমি তো বাবা?—বিশ্বদেবও বেশ সাহসী এবং দুর্মুখ। শ্বশুর সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করেন। শিক্ষিত, দাম্ভিক এবং রাশভর্তি। চলনে, বলনে, মেজাজে যেন পুরোমাত্রায় সাহেব। তাঁকে এ বাড়ির সবাই ভয় করেই চলে। তাঁর মেজ-জামাই শ্যামসুন্দর তো শ্বশুরেব সামনে মাথাটি তুলতে সাহস পায় না। কেঁচো হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্বদেব সে রকম নয়। সব ব্যাপারে সে উচিত কথাটাই বলতে চায়। ন্যায়-অন্যায় বোধ তার অতি প্রখর। সুতরাং সে শ্বশুরের কাছে সেদিনও উচিত প্রশ্ন করতে ভয় পায়নি।

বিশ্বদেবের প্রশ্নটা নীরদবরণের মাথায় যেন গুলতিতে নিক্ষিপ্ত ঢিলের মতন সাঁই করে এসে লেগেছিল। রাগে গা-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর মনেও অনেক কথা ঘুলিয়ে উঠেছিল। আজ তুমি খুব বাবাগিরি ফলাতে এসেছ। তাই না জামাইচন্দর? আর যখন শুভ্রার একবছর বয়স, তোমাব (বিশ্বদেবের) চাকরি-বাকরি কিছু নেই; কারণ তোমার আত্মসম্মান এতটাই তীব্র যে তুমি কথায় কথায় এবেলা-ওবেলা চাকরি ছাড়ো! তুমি মনিবের গোলাম হবে। অথচ মনিবের

থেকে কথা শুনতে রাজি নও! শুভ্রা হয়েছে সবে একবছর। তোমার প্রথম সন্তান। তুমি চাকরি করতে এক অবাঙালির মার্চেন্ট অফিসে। মালিকের সঙ্গে কী নিয়ে কথা কাটাকাটি হল আর তুমি ছেড়ে দিলে চাকরি! একবার ভেবে দেখলে না তুমি পরিবারকে, প্রথম সন্তানকে খাওয়াবে কী! নতুন বিয়ে করেছিল তুমি। চাকরিও তোমার নতুন ছিল। পকেটে রেস্তও তেমন কিছু ছিল না। সংসারে হাঁড়ির হাল। তখন—সেই দুঃসময়ে কে তোমার স্ত্রীকে, তোমার বছরখানেকের মেয়েকে আর তোমাকেও খাইয়েছিল?...তোমার এই শ্বশুর না? মেয়ের অসুখ করলে ডাক্তার দ্যাখাবার কিংবা ওষুধ কিনে দেবার সামর্থ্য ছিল না তখন তোমার। চাকরি পেতে তোমার লেগেছিল প্রায় দু-বছর। ততদিনে শ্বশুর না দেখলে বাঁচত তোমার মেয়ে? যখন বাবার দাবি ফলাতে আসো, তখন সে কথাগুলো কি মনে থাকে তোমার?...এইসব কথা দুরন্ত ভোমরার মতন যেন বোঁ বোঁ করে উঠেছিল নীরদবরণের মনে। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেননি। চেঁচামেচি করেননি। নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলেন—তুমি তার বাবা হওয়া সত্ত্বেও কেন সুবুর ভালমন্দর ব্যাপারে আমিই শেষ কথা বলব তা আমি তোমার কাছে এক্সপ্লেন করার দরকার আছে বলে মনে করি না। তুমি তোমার উইশডম দিয়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করবে।

বিশ্বদেব তাকিয়ে ছিল নীরদবরণের দিকে। সে দৃষ্টিতে জ্বালা ছিল। যন্ত্রণা ছিল। সুবু যখন খুব ছোট্টটি, তখন তার নিজের চাকরি ছিল না। আর্থিক অনটন ছিল। এটা সে ভোলেনি। শ্বশুরমশাই দু-বছর নিজের বাড়িতে মেয়েকে, নাতনিকে আর জামাইকে আক্ষরিক অর্থেই ভরণ-পোষণ করেছিলেন; সেটা সে, বিশ্বদেব ভুলতে পারে? কিন্তু শুধু সেই কারণে এবং 'বড়' হওয়ার অধিকারে নীরদবরণ বরাবর তাকে ডোমিনেট করে যাবেন এটাও তো ঠিক নয়। উচিত কথা আরও দু-একটা হয়তো বলত বিশ্বদেব। কিন্তু তার আগেই নীরদবরণ আবার বলতে শুরু করেছিলেন—সুবুর পড়াশোনার ব্যাপারেও তোমাকে বেশি ভাবতে হবে না। আমি যখন ওকে বরাবর নিজের কাছে রেখেছি, তখন সে ব্যাপারটা নিয়েও আমি চিন্তাভাবনা করেছি।...তোমাকে নতুন করে আর বলার কী আছে বিশ্ব?...যে সুবু তার বয়সের অন্য মেয়েদের থেকে অ্যাডভান্সড। তার নিজের ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, পছন্দ-অপছন্দের জ্ঞান এই টেন্ডার এজেও কিন্তু খুব তীব্র। বলতে পার সেটা হয়তো একটু আন-ন্যাচারাল। কিন্তু জীবনে আন-ন্যাচারাল ব্যাপার অনেক থাকে। এখানকার স্কুলে তো ভর্তি করে দিয়েছিলুম ওকে। পড়ছিলও। কিন্তু স্কুলের পরিবেশ, টিচারদের টিচিং মেথড এসব যদি ওর পছন্দের না হয় তো আমি কী করব? এখন ওর দাদুর টিচিং-মেথডই যদি ওর কাছে সবথেকে ফেভারিট হয় তো আমি কী করতে পারি বলো তো? (এই কথাটা বলার সময় গম্ভীর নীরদবরণের মুখে বিচিত্র এক হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। সেটি বিদ্রূপের হাসি হতে পারে। আত্মশ্লাঘার হাসি হতে পারে। আবার আত্মপ্রসাদের হাসিও হতে পারে।)...তবে তুমি চিন্তা করবে না একেবারে। আমি মনে করি ফর্মাল এডুকেশান ওর না হোক। কিন্তু আমার কাছে ও লেখাপড়া ভালই শিখেছে। ম্যাট্রিক পাস ওকে আমি করাবই।..

—ম্যাট্রিক পাস করাবেন? কীভাবে? ও তো কোনও স্কুলে পড়ে না?

—ওহে বিশ্ব! তুমি অ্যাকাউন্টসের কাজ ভাল বুঝতে পার। কমার্স গ্র্যাজুয়েট হতে পার। কিন্তু এডুকেশান ওয়ার্ল্ডের লোকজনের সঙ্গে তোমার থেকে আমার বেশি জানাশোনা।

—জানাশোনা তো থাকবেই। আপনার স্ট্যাটাসের জোরে অনেকের সঙ্গেই আপনি পরিচিত। কিন্তু তাতে সুবুর কী লাভ?

—ম্যাট্রিকুলেশান বোর্ডের সেক্রেটারি কে. কে. সান্ন্যালের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। সে বলেছে সুবু ষোলো পড়লেই প্রাইভেট ক্যানডিডেট হিসেবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্যে অ্যাপ্লাই

করতে পারবে। কোনও অসুবিধে হবে না। আর ম্যাট্রিকটা পাস করলেই আমি সুবুর বিয়ে দেব ঠিক করেছি। মেয়েকে বেশি বয়স অব্দি বাড়িতে বসিয়ে রাখা ঠিক নয়।—নীরদবরণের এই কথার পর বিশ্বদেব আর কী আপত্তি করবে? দাদু তো নাতনির সবরকম ইজারা নিয়ে বসে আছেন। সে আর এগোতে সাহস করেনি। ঝালদাতে চাকরি নিয়ে যাবার সময় বড় মেয়েকে মামার বাড়িতে রেখে গিয়েছিল। ঝালদাতে বিশ্বদেবে এই চাকরিটাতে সে বেশ টিকে গেছে। চাকরি ছাড়ার মতন অবস্থা এখনও উদয় হয়নি।

ঘরময় শাড়িতে ছত্রাখান। আলমারির দরজা হাট করে খোলা। আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় নাতনি। নীরদবরণ কী করবেন দেওয়া ঠিক হবে না। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আটটা বেজে গিয়েছিল। নীরদবরণ বিশ্রামের সময়। শুভ্রারও স্থির মনে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়া উচিত। পরের দিন বেশ অনেকক্ষণের ট্রেনজার্নি অপেক্ষা করে ছিল তার জন্যে। নীরদবরণ নাতনির দিকে তাকিয়েছিলেন। বেশ রূপসী তার নাতনি এটা তিনি জানেন। সুনীতি যে খুব ফর্সা তা নয়। আবার কালোও বলা যাবে না তাকে। কিন্তু বিশ্বদেব তো বেশ কালোই। তবুও তাদের প্রথম সন্তানের গায়ের রঙ ঠিক যেন দুধে আলতার মতন। ঘন, কালো চুল কোমর ছড়িয়ে নেমে গেছে। টিকালো নাক। ছোট কপাল। তেকোনা চিবুক। পাতলা ঠোঁট। সব নিয়ে নাতনি বেশ সুন্দরী যে দেখতে এ ব্যাপারে নীরদবরণের অন্তত কোনও সংশয় নেই। ওর গায়ের রং দেখে শুভ্রা নাম তো নীরদবরণই রেখেছেন। দ্বিধাগ্রস্ত, কিছুটা যেন বিরক্ত সিদ্ধান্ত না দিতে পাবার কারণেই, ছেলেমানুষ নাতনিটিকে দেখতে বেশ মজাই পাচ্ছিলেন নীরদবরণ।

—ও দাদু বলো না!

—কী বলব?

—আমি কী করব?

—কী ব্যাপারে কী করবে?

—কোন্ শাড়ি নিয়ে যাব বিয়ে বাড়িতে ট্রেনেই বা কী পরে যাব?

—সারাদিন ধরে এই সামান্য ব্যাপারে ডিসিসান নিতে পারলে না মা?

—দুর বাবা! ভাল্লাগে না। তুমি বলে দাও আমি কী নিয়ে যাব।

—দিদুকে জিজ্ঞেস করনি?

—করেছিলুম। দিদু সাজেস্টও করেছিল। আমার পছন্দ হয়নি।

—তাহলে?...হোয়াট টু ডু?—নীরদবরণ হাসলেন।

—বেশ। ওয়েট অ্যা বিট। লেট মি লাইট মাই পাইপ।—নীরদবরণ পাইপ জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর আবার বলেছিলেন—আমি যে শাড়িগুলো সিলেক্ট করব সেগুলোই তুমি নিয়ে যাবে?

—ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট?

—নো। হোয়াই শুড আই?...আচ্ছা আমি যে শাড়িগুলো বলছি তুমি ব্যাগে ভরে নাও।

—বলো। —শুভ্রা উদগ্রীব।

নীরদবরণের পাইপ নিভে গিয়েছিল। অন্যসময় হলে আবার জ্বালিয়ে নিতেন। এখন তা করলেন না। নিচু একটা টুলের উপর পাইপটা রাখলেন। তারপর নিচু হয়ে বসলেন। ছড়ানো শাড়িগুলো মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। কপাল কুঁচকে রীতিমতো ভাবতে লাগলেন কোন শাড়িগুলো নেবার জন্যে নাতনিকে পরামর্শ দেওয়া যায়। নাহ, আর পরামর্শই বা দেবেন কেন? একেবারে শাড়িগুলো ব্যাগে পুরে নিতে বলবেন। তা না হলে হয়তো আরও ঘণ্টাখানেক তাঁর আদরের নাতনি শাড়িগুলো নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে। মোট চারটে শাড়ি পছন্দ

করে দিলেন নীরদবরণ। দুটো সিল্কের। দুটো বেনারসি। একটা সিল্ক শাড়ি পরে শুভ্রা কাটোয়া যাবে। আর একটা পরবে এখন। লাল রং শুভ্রার খুবই পছন্দ। টকটকে ফরসা মেয়েকে লাল রং-এ মানায়ও ভাল। যে দুটো বেনারসি বেছেছিলেন নীরদবরণ, তার একটার রং, গাঢ় লাল। আর একটার রং কিছুটা গোলাপি। দুটো বেনারসির আঁচলে জরির নিবিড় কাজ। ভেতরেও জারির বুটি। নীরদবরণের পছন্দ দ্যাখা গেল শুভ্রারও পছন্দ। ঝামেলা মিটল। ভ্রমণ-ব্যাগ গুছিয়ে ফেলা হল। যূথিকা স্বামীকে বললেন—ভাগ্যিস তুমি এটা করলে। তা না হলে শাড়ি শাড়ি করে মেয়ের আজ ঘুমই হত না। কিছু গয়নাও নিয়ে যাবে শুভ্রা। সবই যূথিকার গয়না। তার মধ্যে একটা সীতাহার। গয়নাগুলো নীরদবরণ তাঁর হাতব্যাগে ভবে নিলেন। রাস্তায় চোরডাকাতের ভয় আছে।

পাঁচ

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠে নীরদবরণ যখন প্রায় ভেবেই ফেলেছেন যে, প্রথম শ্রেণির এত বড় কামরাতে তাঁরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই; ঠিক তখনই তৃতীয় যাত্রীর আবির্ভাব হল। ...সেই যাত্রী লালমুখ এক সাহেব। রীতিমতো লম্বা। এবং দশাসই চেহারা। মাংসের একটা ছোটখাটো পাহাড়। অতিকায় এক জলহস্তির মতন দেখতে লোকটাকে। নীরদবরণ তার মুখের দিকে তাকালেন। ঘন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে প্রকৃত মুখটা বোঝা মুশকিল সাহেবের। একমাথা ব্যাকব্রাশ চুল। তবে সমস্ত চুল পাকা। ধবধবে সাদা। নীরদবরণের অভিজ্ঞ চোখ বুঝে গেল যে, সাহেবের বয়স বেশ। তা অন্তত পঞ্চাশ পেরিয়েছে তো বটেই। তার মানে তাঁর নিজেরই বয়সি। কারণ মেঘে মেঘে বেলা তো বেশ হল। নীরদবরণের এখন ফিফটি-থ্রি চলছে। সাহেবের নামটি কী? সেটা এখনই জানা যায় অবশ্য। তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে একটু কষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ নিজের গদিমোড়া আসনে তিনি যে বেশ জমিয়ে আরাম করে বসেছেন, সেই আরাম ছেড়ে উঠতে হবে এবং কামরাতে ঢোকার মুখে যাত্রীদের যে তালিকা আঠা দিয়ে সাঁটা আছে তাতে চোখ বোলাতে হবে। মনে মনে রেল-কোম্পানির কাজের আবার একটু সমালোচনা করলেন নীরদবরণ। তিনি তাঁর নাতনিকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়েছেন। মানে, ট্রেন যখনই ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক করতে করতে এবং রাশি রাশি ঘন এবং কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়তে ছাড়তে স্টেশনে 'ইন' করে খানিক বাদে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তখনই কালবিলম্ব না করে তিনি শুভ্রার হাত ধরে উঠে পড়েছিলেন নিজেদের জন্যে নির্দিষ্ট প্রথম শ্রেণির কামরাতে। হরবখত ট্রেনে হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াতে হয় নীরদবরণকে। তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে প্রথম শ্রেণির কামরা স্টেশনের ঠিক কোন জায়গাটায় এসে দাঁড়াবে। প্রতিবার সেই অভিজ্ঞতা, সেই ধারণা ভালই কাজ দেয়। এবারও দিয়েছিল। পবপর মাত্র কয়েকটা প্রথম শ্রেণির কামরা। তার একটি টিকিটের নম্বর অনুযায়ী খুঁজে পেতে আদৌ অসুবিধে হয়নি। আর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। ট্রাভেলার্স ব্যাগ মাথায় নিয়ে যে কুলি নীরদবরণদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছিল, দ্যাখা গেল সেও কামরাটা কোথায় পড়বে (সুবিধা হবে ভেবে নীরদবরণ তাকে কামরার নম্বর বলে রেখেছিলেন) সেটা ভালই জানে। ট্রেনটা আসছিল সাঁতরাগাছির কার-শেড থেকে। ফাঁকা ট্রেনের দরজা বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু বন্ধ তো ছিল না। দরজা খোলাই ছিল। দরজা খোলা পেয়ে নীরদবরণ দেরি করেননি। নাতনির হাত ধরে উঠে পড়েছিলেন কামরায়। তার আগে অবশ্য কুলি উঠে পড়েছিল। ঘাড় থেকে ভ্রমণ-ব্যাগ বাঙ্কের ওপর তুলে দিয়ে ঈষৎ হাঁফাচ্ছিল। হাঁফাবেই তো। ওই ব্যাগ

কী কম ভারী? ভাবা হয়েছিল যে মাল তেমন কিছু থাকবে না। হাওড়া থেকে কাটোয়া কী আর এমন জার্নি? যাচ্ছেন তো বিয়েবাড়ি। অন্য কোনো গুরুতর কাজে নয়। আর মাত্র দুয়েকদিনের থাকা। ঠিকমতো বলতে গেলে তাঁরা কাটোয়াতে অপরেশের বাড়িতে থাকবেন মাত্র দু-রাত। যেদিন পৌঁছবেন সেদিন। বিয়ের দিনও রাত কাটাতে হবে। অপরেশের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল তাতে তিনি, নীরদবরণ, জেনেছিলেন যে বিয়ের লগ্ন পড়েছে বেশ রাত করে। রাত নটা নাগাদ। সুতরাং সেদিন ফেরা সম্ভব নয়। তখন নীরদবরণ ঠিক করেছিলেন যে, তার পরদিন দুপুরবেলার ট্রেনেই ফিরবেন। অর্থাৎ বরপক্ষ কনেকে নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে রওনা দেবার পর তিনি ফিরবেন নাতনিকে নিয়ে। সেটাই শোভন হবে। নিজের মেয়ে বিয়ে হয়ে পরের বাড়ি চলে গেলে প্রথম প্রথম বুকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অপরেশের এবং তার গিন্নিরও সেরকম লাগবে। এটাও নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেন নীরদবরণ। তাঁর দু-মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। অপরেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম। তার একটি সন্তান- নীরদবরণ তাকে খুব ছোটবেলাতে দেখেছিলেন। যখন তিনি কলেজের প্রিয় বন্ধু অপরেশের এই কাটোয়ার বাড়িতে কয়েকবার এসেছিলেন। তারপর অনেকদিন আর আসা হয়নি। অপরেশের সেই ফুটফুটে এবং ছোট্ট মেয়েটা যে ক্রমশ বিয়ের বয়সে পৌঁছে গেছে সেটা তাঁর তেমন খেয়ালই ছিল না। নীরদবরণ ভেবেছিলেন, দুপুর দুপুর করে তিনি হাওড়াগামী ডাউন ট্রেনে উঠবেন। টাইম-টেবিল নেড়েচেড়ে সেই ট্রেনটির হাল-হকিকত জেনে রেখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানী মানুষ। তবে স্বাভাবগত দিক থেকে একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়তো। সাহিত্য-পড়া মানুষেরা বোধহয় একটু বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণই হয়ে থাকে। ফেরার ট্রেনটা হল এক্সপ্রেস। ধানবাদ থেকে হাওড়া ফেরার সময় কর্ডলাইন হয়ে কাটোয়ায় দাঁড়ায় তিন মিনিট। তাতে অসুবিধে হবার কথা নয়। নাতনিকে নিয়ে নীরদবরণ ঠিক উঠে পড়তে পারবেন সেই ট্রেনে। নির্দিষ্ট তারিখে সেই আবার প্রথম শ্রেণিতেই দুটো ফেরার টিকিট কেটে রেখেছেন নীরদবরণ।

প্রথমে ভেবেছিলেন বড়সড় ভ্রমণ-ব্যাগটিতে কী আর এমন মালপত্র যাবে। কয়েকটা শাড়ি, মেয়েদের সাজের এটা-সেটা আর নিজের কয়েকটা জামাকাপড়ে কী আর এমন ভারী হবে লাগেজ। কিন্তু নাতনির পাল্লায় পড়ে যখন তাঁকে নিজেকেই হাত লাগাতে হল লাগেজ গুছোনোয়; তখন দেখলেন নেব না নেব না করেও বেশ কিছু মালপত্র নিতে হল। অবস্থাটা শেষমেশ এমনই দাঁড়াল যে, কতটা মাল রাখবেন আর কতটা ভরে নেবেন ব্যাগে, সেটা তিনি নিজেই যেন ঠিক করতে পারছিলেন না।

সমস্যাটা তাঁর নিজের জামাকাপড় নিয়ে নয়। তিনি বিয়েবাড়িতে কী কী নিয়ে যাবেন সেসব তো ভেবেই রেখেছিলেন। যে দামী সুট পরনে থাকবে যাবার সময়, সেই একই সুটে তিনি ফিরে আসবেন। সচরাচর অবশ্য সেটা তিনি করেন না। একই সুট একদিনের বেশি পরেন না নীরদবরণ। রবিবার ছাড়া সপ্তাহে ছদিন ছ-রকম সুট পরে অফিস যাওয়া কিংবা বাইরে বেরনো তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। এখনও অব্দি তাঁর সংগ্রহে সুটই আছে কম করে হলেও কুড়ি রকম। অত্যন্ত পোশাক সচেতন মানুষ নীরদবরণ। বেশ বিলাসীও। দামি পারফিউম ব্যবহার না করলে তাঁর স্বস্তি হয় না। যখন সাহেবি ভঙ্গিতে গটগট করে হেঁটে যাবেন তখন সুগন্ধ ম ম করবে চারপাশে। সেই সুগন্ধ নাকে যাবার পর পথচারীরা বারবার ফিরে ফিরে তাঁর দিকে তাকাবে এটা তিনি মনেপ্রাণে চান।

অনেকের মধ্যে মিশে যেতে দারুণ অনীহা নীরদবরণের। তিনি সবসময় তাঁর উপস্থিতি বুঝিয়ে দিতে চান, যখন যেখানে যাবেন। কিন্তু বন্ধু অপরেশের মেয়ের বিয়েতে কাটোয়াতে যাবার সময়

তিনি ঠিক করেছিলেন যে খুব একটা বাবুগিরি করবেন না। কাটোয়ার মতন মফস্বলে কে আর অত বুঝবে। কে আর অত দেখবে। যে পোশাক পরে ট্রেনে যাবেন কাটোয়া, সেই পোশাকেই আবার ট্রেনে ফিরবেন। এরকম ভাবার অন্য একটা কারণও ছিল। শুধুমাত্র নাতনিকে নিয়ে কিছুটা দূরে যাচ্ছেন। মালপত্র যত কম থাকবে ততই ভাল। একে বিয়েবাড়ি। তার ওপর তাঁর নাতনিটি আসলে ভীষণ অগোছালো। একেবারেই স্ব-নির্ভর নয়। নিজের জামাকাপড় গুছিয়ে নিতে জানে না। গুছিয়ে রাখতেও পারে না। সব কিছুর জন্যেই সে তার দিদু অর্থাৎ যূথিকার মুখাপেক্ষী। বিয়েবাড়ি থেকে যখন সে ফিরবে তখন জামাকাপড় এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস যে শুভ্রা মনে করে ব্যাগের মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে পারবে তা মনে করেন না নীরদবরণ! অর্ধেক জিনিস আনবে। অর্ধেক হয়তো সে ফেলে আসবে। সুতরাং ফেরার সময় সবকিছু ঠিক ঠিক গুছিয়ে নেবার ব্যাপারে নীরদবরণকেই হাত লাগাতে হবে। কিছু পড়ে থাকছে কি না সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে নিজেদের মালপত্র যত কম নিয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল যূথিকা সঙ্গে থাকলে অবশ্য তিনি এসব ছোটখাটো গেরস্থ ব্যাপারে তেমন ভাবতেন না। এই বয়সে যূথিকা শুধু নিজের সবকিছু নয়, সংসারেরও খুঁটিনাটি যতটা পারেন গুছিয়ে রাখেন। বাড়িতে যদিও সবসময়ের কাজের লোক আছে। তবুও বলতেই হবে, যূথিকা যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করেন নিজেই সংসারকে নিখুঁত রাখতে। কিন্তু যূথিকা নিজের অসুস্থতার কারণে যাচ্ছেন না। নীরদবরণকেই সব খেয়াল রাখতে হবে। তাই অতিরিক্ত আর এক সেট স্যুট নিয়ে তিনি মালপত্র বাড়াতে চাননি। আর ভ্রমণ-ব্যাগটিও রাখতে চেয়েছিলেন যতটা পারা যায় হালকা।

কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল যে, ব্যাগটি মালপত্রে বেশ ভারী হয়ে গেল। শুভ্রার আবদারে তার অনেক জিনিস বোঝাই করতে হল ঢাউস ব্যাগটাতে। মেয়েদের ব্যাপারটাই বোধহয় এরকম। নীরদবরণের এত বছরের দাম্পত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যাবার ব্যাপারে সব মেয়েই বোধহয় সমান। তাদের সম্পদ (আলঙ্কারিক ও শারীরিক) যা কিছু আছে তারা সব উজাড় করে দেখাতে চায় পুরুষকে। আর পুরুষও দেখে। দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে পুরুষেরা কোনও কোনও মেয়েকে পছন্দও করে ফেলে। তারপর চলে উদ্দাম এবং গোপন প্রেম। সব ক্ষেত্রেই কি সেই প্রেম বিবাহে পরিণতি পায়? কে জানে। পায় হয়তো। আবার হয়ত পায় না। সেখান থেকেই তো বিরহের উৎপত্তি। প্রেম থাকলেই অবধারিতভাবে থাকে বিরহ। এখনকার ছোকরা লেখকরা বাংলাভাষায় যেসব নভেল লেখে তার অধিকাংশের বিষয়ই তো হল বিয়েবাড়িতে প্রেম, লদকালদকি; আর তারপর বিরহ। দুর দুর! আজকালকার বাংলা নভেল পড়া যায় নাকি? পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ভীষণ নাক-উঁচু। তাঁর পড়াশোনার মান বাঁধা হয়ে আছে সেইসব ক্লাসিক নভেলিস্টদের কাছে। হেনরি ফিলডিং, জেন অস্টেন, চার্লস ডিকেনস, টমাস হার্ডি, ডি. এইচ লরেন্স। আর ফরাসি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ফ্লবেয়ার, ভিকতর য়ুগো। একসময় নভেল গোগ্রাসে গিলতেন নীরদবরণ। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র নন। কিন্তু তা না হলে কী হবে? ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রীতি বরাবরের। ছাত্র ছিলেন যখন, তখন কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে সারি সারি পুরনো বইয়ের দোকান থেকে নামমাত্র দামে কত নভেল যে কিনেছেন। ওই ফুটপাতের দোকান থেকেই তো কেনা হেনরি ফিল্ডিং-এর টম জোনস। এই নভেলটিকে বলা হয় ইংলিশ লিটারেচারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা। তারপর বাকি লেখক কিংবা লেখিকাদের বইও অধিকাংশই রহমানের দোকান থেকে কেনা। আর এখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে একটা বেশ ভাল বুকশপে নীরদবরণ প্রায়ই যান। যখনই সময় পান যান। ম্যাকেঞ্জিও তাঁর সঙ্গে যান। বুকশপটির নামও বেশ। হরাইজন। দিগন্ত। ঠিকই তো। ভাল বই পাঠকের মনের দিগন্তকে বাড়িয়ে দ্যায়। ম্যাকেঞ্জি কবিতা পড়তে পছন্দ করেন। নিজে কবিতা লেখেন।

অনেক কবিতা লিখেছেন ম্যাকেঞ্জি। বেশ বড়সড় এক ডায়েরিতে খুদে খুদে হস্তাক্ষরে ম্যাকেঞ্জি বহু কবিতা লিখে রেখেছেন। যখন তার বাড়ি যান নীরদবরণ, তখন ম্যাকেঞ্জি তাঁকে প্রায়ই কবিতা শোনান। শুধু কবিতাই যে শোনান তা নয়। খাওয়ানও প্রচুর। স্বীকার করতেই হবে খুবই হসপিটেবল ম্যাকেঞ্জি। অবশ্য তার খাওয়ানোর বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকে পানভোজন। দামি হুইস্কি ম্যাকেঞ্জির বাড়ি গেলে পান করা যায়। জনি ওয়াকার কিংবা হোয়াইট হর্স কিংবা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট। পানের ফাঁকে ফাঁকে ম্যাকেঞ্জি কবিতা পড়েন। তার সব কবিতাই বিরহের। কাউকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তাকে পাওয়া হয়নি। মোটামুটি এটাই হল ম্যাকেঞ্জির প্রায় সব কবিতার থিম। শুনতে শুনতে কীরকম একঘেয়ে লাগে। কেন শুধু বিরহের কবিতা লেখেন ম্যাকেঞ্জি? তাঁর বুকের গভীরে কী কোনও দুঃখ আছে? কোনও নারীকে এখনও বিয়েও তো করলেন না ম্যাকেঞ্জি। ওদের সোসাইটিতে কি মেয়ের অভাব? সবসময় যে ওরা বিয়ে করে তাও নয়। লিভ-টুগেদার করে। ম্যাকেঞ্জি তো তাও করেন না। কারণ কী? দুঃখটা কী? একদিন শুনতে হবে ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে।

বাংলা নভেল যে একেবারে পড়েননি নীরদবরণ তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব নভেল পড়েছেন একসময়। দ্য গ্রেট রাইটার। দ্য ফার্স্ট বেঙ্গলি নভেলিস্ট! তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও নীরদবরণের একটা অবজারভেশন আছে। নীরদবরণ মনে করেন, বঙ্কিমের নভেল মানে ওয়ালটার স্কটের অনুকরণ। স্কটের থিম এবং স্ট্রাকচারকে প্রায় অন্ধের মতন অনুকরণ করেছেন বঙ্কিম। সুতরাং তিনি, নীরদবরণ মনে করেন ওয়াল্টার স্কট সব পড়ে ফেলতে পারলে আর বঙ্কিম পড়ার দরকার হয় না। অবশ্য যারা ইংরেজি পড়তে পারে না তাদের কথা আলাদা। গড়পড়তা বাঙালি সেরকমই। ইংরেজি জানা এবং ইংরেজি পড়তে পারা বাঙালি তো হাতে গোনা। যেমন নীরদবরণ। সেই হিসেবে তিনি নিজেকে গড়পড়তা বাঙালিদের থেকে আলাদা করে দেখেন। হ্যাঁ, এটুকু অহঙ্কার নীরদবরণের আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর যে বাঙালিকে লেখক মনে করেন নীরদবরণ তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র? আরে দুর! ও আবার লেখক নাকি? যেমন তরল ভাষা। তেমনই তরল বিষয়। অশিক্ষিত কিংবা আধা-শিক্ষিত ছেলে-ছোকরারা ওই লেখককে পড়ে। গৃহবধূরা পড়ে। নীরদবরণ পড়েন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের পোয়েট্রিকেই শুধু পছন্দ করেন না, তাঁর কিছু কিছু নভেলও বেশ পড়েন। যেমন চোখের বালি, গোরা কিংবা চতুরঙ্গ। ঘরে-বাইরে তাঁর ভাল লাগেনি। ইংরেজকে সেখানে অহেতুক ছোট করে দেখানো হয়েছে। এক ধরনের আদর্শবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যা তিনি সুযোগ পেলেই করে থাকেন। কিন্তু নভেলে অত আইডিয়ালিজমের বাড়াবাড়ি চলে না কী? নভেলে থাকবে প্লট, ক্যারেকটারাইজেশন, ঘটনার ঘনঘটা। আর নিজের নাতনিটিও নভেলের রীতিমতো পোকা। এই বয়সেই নীরদবরণের মত দাদুর পাল্লায় পড়ে সে শেষ করে ফেলেছে অনেকটা বঙ্কিম, অনেকটা রবীন্দ্রনাথ, বেশ কিছুটা জেন অস্টেন এবং চার্লস ডিকেনস।

ভ্রমণ-ব্যাগটি যখন নাতনির জিনিসপত্রেই বেশি ভারী হয়ে গেল তখন নীরদবরণ ভেবেছিলেন কুলি নেবেন। এই একটামাত্র ব্যাগের জন্যে কুলি? তাতে কী হয়েছে? দরকার পড়লে একটা কেন দশটা কুলি নিতে হবে। আর দামি সুট, টাই পরনে, মাথায় হ্যাট, মুখে পাইপ নীরদবরণ স্টেশন-চত্বর দিয়ে হেঁটে যাবেন, কিন্তু তাঁর পাশে পাশে মাথায় মাল চাপিয়ে কুলি যাবে না সেটা আবার হয় নাকি?

বিশাল মাংসের পাহাড়, লালমুখো, রাগি চেহারার সেই প্রবীণ সাহেব কামরাতে ঢুকেই এমন বিশ্রী দৃষ্টিতে নীরদবরণ আর নাতনির দিকে তাকাল যে মেজাজটাই খাপ্পা হয়ে গেল নীরদবরণের।

হতে পারে নীরদবরণের মতো ওই সাহেবও হয়তো চেয়েছিল কামরাতে সে একা একাই যাবে। তারপর দুজন যাত্রীকে দেখে সে বিরক্ত। কিন্তু তাই বলে বারবার কপাল কুঁচকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে সেই বিরক্তি বুঝিয়ে দেবার কী আছে? নীরদবরণের ইনটুইশান কাজ করে ভালই। তিনি ঠিকই বুঝেছেন। সহযাত্রী হিসেবে তাঁদের দুজনকে সাহেব পছন্দ করছে না। তা কী আর করা যাবে? রেল কোম্পানি তো কারোর একার বাপের সম্পত্তি নয়। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট তুমিও কেটেছ। আমরাও কেটেছি। বলার কী আছে?

নীরদবরণ আড়চোখে লক্ষ্য করলেন নাতনিকে। সে এতক্ষণ বেশ হাসিখুশি ছিল। টুকটাক কথা বলছিল দাদুর সঙ্গে। তারপর যেন কীরকম থম মেরে গেছে। আড়চোখে মাঝে মাঝে দেখছে বুড়ো সাহেবকে। তিনি ভাবলেন শুভ্রাও নিশ্চয়ই সাহেবের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকানো দেখে বুঝেছে যে, এই কামরাতে 'নিগার' যাত্রীদের পেয়ে সাহেব খুবই অসন্তুষ্ট। চুপচাপ বসে থাকলে আবহাওয়া আরও ভারী হয়ে থাকবে। কিছু কথাবার্তা বলা উচিত।

—কীরে সুবু খিদে পেয়েছে? খাবি কিছু?

—খিদে এখনই? কী যে বলো দাদু? এখনও ট্রেন ছাড়ল না আর খিদে পাবে?

—ও তাহলে ট্রেন ছাড়লেই খিদে পাবে বলছিস?

—পেতে পারে। আমার তো ট্রেনে উঠলে, ট্রেন চলতে থাকলেই খিদে পায়।

—তা বেশ বেশ। টিফিন-ক্যারিয়ারে তোর দিদু কী খাবার দিয়েছে বলতো?

—তুমি দেখনি দাদু?

—নাহ। কোথায় আর দেখলুম। বেরনোর তোড়জোড় করতেই তো সময় চলে গেল। তারপর বেলার দিকে হরেনবাবু এল। বাড়িভাড়া নিতে। বাড়িভাড়া নিতে আসা তো ছুতো। আসলে আমাকে আজ বাড়িতে দেখে গল্প করতে এসেছিল। বকবক বকবক। বুড়ো বকতেও পারে বটে!

—হরেনবাবু জানলেন কী করে যে তুমি অফিস যাওনি। বাড়িতে আছ? উনি টেলিফোন করেছিলেন বুঝি?

—হরেনবাবুদের বাড়িতে টেলিফোন নেই। এতগুলো ভাড়াটের থেকে প্রতি মাসে গুনে গুনে ভাড়া নেয়। তেলের মিল আছে। তবুও বাড়িতে একটা টেলিফোন নেয়নি। আমাদের পাড়াতে কার বাড়িতে আর টেলিফোন আছে? আমাদের বাড়ি ছাড়া?

—আরও দু-চারজনের বাড়ি আছে হয়তো। ... তাহলে কী হরেনবাবু আজ বেলার দিকে আন্দাজে চলে এলেন? এসে তোমাকে পেয়ে গেলেন?

—আরে নাহ। আমাদের বাড়িতে একটা গেজেট আছে জানিস না? তাঁরা মুখ থেকেই হরেনবাবু নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে।

—গেজেট?

—হ্যাঁ। ... দ্য গ্রেট বেঙ্গলি গেজেট।

—ওহ বুঝেছি। তুমি ক্ষীরোদমামার কথা বলছ?

—আর কার কথা? হরেনবাবুই তো বলল। আজ সকালে ক্ষীরু বাজারে যাচ্ছিল। তখন হরেনবাবু তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে আমি বাড়িতে আছি কী না। তো ক্ষীরু বলেছে যে হ্যাঁ আছে। শুধু বলেই যে ক্ষান্ত দিয়েছে তা নয়। নাড়িনক্ষত্র সব বলেছে। আমি যে আজ তোকে নিয়ে কাটোয়াতে বিয়েবাড়ি চলেছি তা বলেছে। অফিসে সে কারণেই তিনদিন ছুটি নিয়েছি সেটা শুনিয়েছে। হরেনবাবু দেখলুম সবই তো জানে।

—জানো দাদু ক্ষীরোদমামা আবার নতুন একটা পালা লিখেছে। আমাকে বলেছে। এটা

নাকি বেশ জমাট পালা। থিমটা সোশ্যাল। পাবলিক খুব খাবে।

—হা হা হা হা ! —নীরদববণ একচোট হেসে নিলেন খুব।—ক্ষীরু পালা লিখবে। আব সেই পালা পাবলিক খাবে। পালা লেখা অতই সোজা নাকি? শুধু ঘুরে ঘুরে থিয়েটার দেখে বেড়ালেই হবে? পেটে কিছু বিদ্যে থাকা চাই। জন গলসওয়ার্দি কিংবা ইবসেনের নাম শোনেনি ক্ষীরু। বার্নাড শ-এর কোনও প্লে সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই। সে লিখবে নাটক? ছোঃ ছোঃ!

—ক্ষীরোদমামাকে তুমি সবসময়ে আনডারএসটিমেট করো দাদু।

—আনডার এসটিমেট? —নীরদবরণ নাতনির এরকম আলটপকা মন্তব্য শুনে বেশ বিরক্ত বোধ করলেন। তারপর অবশ্য সামলে নিলেন নিজেকে। সফরে বেরিয়ে অপ্রীতিকর বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সফরের ফুরফুরে মেজাজটাই চলে যাবে। তা ছাড়া ক্ষীরোদের বিষয়ে নাতনির সঙ্গে আলোচনা করাও ঠিক নয়। মনের ঝাল যা মেটাবার তা ক্ষীরোদের সঙ্গেই মেটান। কারও পেছনে সমালোচনা করা তার মতে ঠিক ভদ্রতা নয়। প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন নীরদবরণ। কী কথা থেকে কী কথা এসে যায়।

—তোর দিদু খাবার কী ভরে দিয়েছে টিফিন-ক্যারিয়ারে বল দেখি?

—বলব? ... তাহলে শোনো। ... হিংয়ের কচুরি, আলুরদম, পাটিসাপটা আর মোতিচুর।

—উরে ব্বাস! গ্র্যান্ড! গ্র্যান্ড! ব্যান্ডেলের আগেই আমার খিদে পেয়ে যাবে।

—আমারও! —হাততালি দিয়ে বলল শুভ্রা।

আর ঠিক তখনই কামরার আর এক যাত্রী সেই লালমুখো মাংসের পাহাড় চেঁচিয়ে উঠল। ধমকে উঠল রীতিমতো। ঘড়ঘড়ে গলায় স্কটিশ উচ্চারণে ইংরেজিতে যা বলল সাহেব তার মর্মোদ্ধার করা অনভ্যস্ত শুভ্রার পক্ষে সম্ভব না হলেও নীরদবরণ ভালই বুঝলেন। সাহেব বলছে যে সে কানের কাছে গোলমাল একেবারেই পছন্দ করে না। তখন থেকে নীরদবরণ আর তাঁর সঙ্গী; —(দ্যাট ইয়ং লেডি—সাহেব বলেছিল) উঁচু গলায় যে কথাবার্তা বলে যাচ্ছে এতে সাহেবের 'ডিসটারবেন্স' হচ্ছে। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বসে প্যাসেঞ্জাররা কথা বলবে এটা মোটেই বরদাস্ত করবে না সাহেব। প্রয়োজন হলে নীরদবরণরা নেমে যেতে পারেন। লোকটা যে এরকম বলবে, বিরক্তি প্রকাশ করবে তাঁদের প্রতি এতটাই অভদ্রভাবে তা ধারণাতেই ছিল না নীরদবরণের। অপমান বোধে তাঁরা কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তিনি রেগেমেগে জুতসই ইংরেজিতে কিছু একটা বলতে যাবেন ঠিক সেসময়ে তাঁদের কামরাতে টিকিট-চেকারের আবির্ভাব হল। ট্রেন যে কখন ছেড়ে দিয়েছে। রীতিমতো গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে তা নীরদবরণ খেয়াল করেননি।

ছয়

টিকিট-চেকার লোকটির চেহারা অদ্ভুত ধরনের। মাথায় অত্যন্ত খাটো। নীরদবরণ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। এই লোকটি তাঁর থেকেও বেঁটে। বড় জোর চার ফুট দশ ইঞ্চি হবে। আর শরীরের আয়তন হাস্যকরভাবে বেঢপ। একেবারে যেন একটা রক্তমাংসেব ফুটবল দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে। নীরদবরণ নিজেও যথেষ্ট বেঁটে এবং মোটা। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের দিকে তাকাতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছে করে না। দিন দিন ভুঁড়িটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা কি মেটাবলিজমের সমস্যা? অনেকেরই এরকম থাকে। স্থূলত্বের সমস্যা।

দিনের পর দিন শরীর মোটা হতে শুরু করে। শরীর নিয়ে নীরদবরণের দুর্ভাবনা আর দুশ্চিন্তা আছে।

কিন্তু এই টিকিট-চেকার ভদ্রলোক তো তাঁর থেকেও অনেক মোটা। নাকের নীচে মোটা গোঁফ। ঠিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো। সেই গোঁফ যে সবটাই ঘন কালো তা নয়। মধ্যবয়সী মানুষের কী তা হয়। কাঁচা এবং পাকা গোঁফের মিলমিশ হয়ে এক বিচিত্র শুঁয়োপোকা যেমন ছবিতে যেমন দ্যাখা যায় তেমন স্থির হয়ে আছে চেকারের নাকের নীচে। আর তার ওপর মাথা জুড়ে চকচক করছে টাক। ওকে দেখেই নীরদবরণের তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুঝল যে এই টিকিট-চেকার ভদ্রলোকের যেটা সব থেকে বড় অভাব, —সেটা হল ব্যক্তিত্বের। নীরদবরণের ধারণাই ঠিক। কারণ ফুটবল বুড়ো সাহেবের কাছে গিয়ে একবার চকিতে 'বাও' করে খুব বিনীতভাবে বলল—গুড আফটারনুন স্যার। হাউ ডু ইউ ডু? টিকিট-চেকার কেন? যে কোনও মানুষই অপরিচিত অন্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে ভদ্রতা করতেই পারে। কিন্তু টিকিট-চেকার এই কামরার সাহেব যাত্রীটিকে যেন একটু বেশি পরিমাণে ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে। নীরদবরণ এবং শুভ্রা দুজনের চোখের সামনে লোকটা সাহেবের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিল যেন মনে হচ্ছিল রেলযাত্রী নয় সে তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছে। রাগে গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল নীরদবরণের। এমনিতেই তিনি ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে আছেন একটু আগে অভদ্র সাহেবের দুর্ব্যবহারের জন্যে।

ওদের মধ্যে যে কী কথাবার্তা হচ্ছে তা নীরদবরণ শুনতে পাচ্ছেন না। চেকার এতটাই বেঁটে যে সে দাঁড়িয়ে থাকলেও সাহেব নিজের আসনে বসে তার সমান। নীরদবরণ দেখলেন সাহেব চেকারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে উত্তেজিতভাবে ঘড়ঘড়ে গলায় কী সব বলছে। খুব নিচু স্বরে বলছে। নিজের দু-কান খাড়া করেও তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না সাহেব কী বলছে। তবে এটুকু বুঝলেন যে সাহেব এই কামরাতে আরও দুজন সহযাত্রীর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে অভিযোগ জানাচ্ছে।

নীরদবরণের ধারণা সত্যি। কারণ টিকিট-চেকার সাহেবের মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিল নিজের কান। বারবার অত্যন্ত বাধ্যতার সঙ্গে সে বলছিল—ওকে ওকে...ডোন্ট ওরি স্যার......আই উইল টেল দেম স্যার...উই আর অলওয়েজ হিয়ার টু কো-অপারেট উইথ রেসপেকটেবল প্যাসেঞ্জারস লাইক ইউ। এবার ফুটবল চেহারার লোকটি যা করল তাতে নীরদবরণ রাগের পারা আরও চড়ছে এটা অনুভব করলেন। টিকিট চেকার এসে তাঁকে বেশ গম্ভীরভাবে বলল—ইওর টিকেটস! নীরদবরণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। তাকিয়েই থাকলেন কিছুক্ষণ। তিনি বুঝে গেছেন রেল কোম্পানির এই কর্মচারীটির কোনও ব্যক্তিত্ব নেই। অনেক পরাধীন বাঙালির মতো সে সাদা চামড়ার মানুষ দেখলে ভিরমি খায়। তাদের সামনে বিনয়ে গদগদ হয়ে যায়। পা-চাটা কুকুরের মতন ব্যবহার করে।

লোকটা আবার বলল বেশ রুক্ষভাবে—টিকেটস? শো মি ইওর টিকেটস। নীরদবরণ এবার চিবিয়ে (খুব রেগে গেলে তিনি এভাবেই বলেন) চিবিয়ে চেকারের দিকে তাকিয়ে বললেন—চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে ভেতো বাঙালি। তাহলে আর বাঙালির সঙ্গে কষ্ট করে ইংরিজি বলা কেন? বাংলাতেই বলা হোক। আর ইংরিজি ভাষাটা তো শেখাও হয়নি দেখছি ভাল করে!

—মানে?...হোয়াট ডু ইউ মিন?

—ভদ্রলোকের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলার সময়, তাঁকে কোনও অনুরোধ করতে গেলে প্লিজ কিংবা কাইন্ডলি বলতে হয় এটাও শেখা হয়নি? শো মি ইওর টিকেটস বলতে নেই। বলতে হয় প্লিজ শো মি ইওর টিকেটস। কথাটা মনে রাখবেন। বুঝেছেন? শুভ্রা এতক্ষণ চুপচাপ

বসে মজা দেখছিল। এবার দেখা গেল সেও কম যায় না। দাদুর যোগ্য নাতনি সে। ফুটবলকে সে বলল—আপনি আমাদের টিকিট দেখতে চাইছেন। ওই সাহেবটার টিকিট তো দেখতে চাইলেন না? সাহেব বলে ওর সাতখুন মাফ না কী?

—নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ব্রাভো! ব্রাভো! ভাল বলেছিস সুবু!— নীরদবরণ তাকে সায় দিলেন এবং তারিফ করলেন। চেকার যে প্রায় ব্যক্তিত্বহীন এটা নীরদবরণের বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু এই সামান্যতেই সে যে এভাবে ভেঙে পড়বে সেটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। মুহূর্তে টিকিট-চেকারের কালো মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বেশ বিনীতভাবে বলল—দেখুন স্যার আপনাকেও দেখে মনে হচ্ছে আপনিও একজন রেসপকটেবল প্যাসেঞ্জার। কিন্তু দয়া করে আমার চাকরির ক্ষতি করবেন না!

—মানে? আমি আপনার চাকরির ক্ষতি করতে যাব কেন?

—কী আর বলব স্যার?—লোকটা ঢোঁক গিলে বলছিল—এই সাহেবটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব রাগী আর বদমেজাজি। বেশ কয়েক বছর আগে এরকম একজন সাহেবের পাল্লায় পড়ে আমার চাকরিটা প্রায় যেতে বসেছিল।

—ব্যাপারটা কী? শুনি একবার?—নীরদবরণ নড়ে-চড়ে বসলেন। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। ট্রেন ছুটছে। জোরকদমে।

—বছরখানেক আগে স্যার। এরকম একজন রগচটা সাহেবের কাছে টিকিট দেখতে চেয়ে মহা অপরাধ করে ফেলেছিলুম।

—সে আবার কী? প্যাসেঞ্জারদের টিকিট চেক করা তো আপনার কাজ?

—সেই কাজ করতে গিয়েই তো বিপদ। ট্রেনটা আসছিল দিল্লি থেকে। মোগলসরাই স্টেশন থেকে আমি উঠেছিলুম। তখন লং ডিসট্যান্স ট্রেনে টিকিট চেক করাব দায়িত্ব ছিল আমার। এরকমই একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরাতে সাহেবের সঙ্গে আমার লেগে গেল........

—হাতহাতি?.....ডুয়েল?—শুভ্রা প্রশ্ন করল।

—নাহ বোন। ডুয়েল নয়। ঈশ্বর আমাকে যা চেহারা দিয়েছেন তাতে এ-জন্মে কোনও সাহেবের সঙ্গে মারামারি করা আমার সাহসে কুলোবে না।

—তাহলে? ব্যাপারটা কী? খুলে বলুন। ওপাশ থেকে সাহেব বারবার আমাদের দিকে দেখছে। ও বোধহয় সন্দেহ করছে আমরা যা আলোচনা করছি তা অন্তত ওর পক্ষে খুব প্যালেটেবল নয়।

—সাহেব আমার কানে কানে কী বলেছে জানেন স্যার?

—সেটা জানার জন্যেই তো উদগ্রীব হয়ে আছি। নিশ্চয়ই নিন্দে করেছে আমার?

—নিন্দে হলেও কথা ছিল। নালিশ!

—কী নালিশ?

—আপনারা নাকি এই কমপার্টমেন্টে এত গোলমাল শুরু করেছেন, নিজেদের মধ্যে উঁচু গলায় কথা বলছেন যে ওর খুব ডিসটারবেন্স হচ্ছে। আমাকে ও এতক্ষণ ধরে বলল আপনাদের এ ব্যাপারে ওয়ার্নিং দিতে। যদি আপনারা আরও ডিসটারবেন্স করেন ও রেল-কোম্পানির কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে।

—তাই নাকি? কিন্তু ও ব্যাটা এখনও জানে না যে হাওড়া ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজার ম্যাকফারসন সাহেব আমার খুবই পরিচিত।

—তাই নাকি? জি. এম. সাহেব আপনার পরিচিত? তাহলে তো আপনি স্যার গ্রেট ম্যান!

—রেলের জি. এম. এর সঙ্গে পরিচয় থাকলে গ্রেটনেস অর্জন করা যায় কিনা জানি না।

আমি শুধু একটা কথা আপনাকে বলি মিঃ...

—মিঃ দোলগোবিন্দ সামুই স্যার। আমার নাম। নিবাস হরিপাল।

—ভেরি গুড দোলগোবিন্দবাবু। এটা মনে রাখবেন আমি মিথ্যে কথা বলি না। যা বললুম সেটা সত্যি। আপনাদের জি. এম. ডব্লিউ ম্যাকফারসনের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তিনি আমাকে চেনেন। আমিও একটা সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করি। উইলিয়ামস অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি।

—উইলিয়ামস অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি? সেটা তো সাইকেল কোম্পানি স্যার! আমি জানি।

—ঠিক বলেছেন। আপনাকে দেখে যা মনে হয়েছিল তা নয়। আপনি বেশ ভদ্র এবং সচেতন একজন নাগরিক। দ্যাটস গুড।

—চেহারা দেখে কি মানুষকে বোঝা যায় স্যার? আমি জানি আমার এই বিচিত্র, বেঢপ চেহারা দেখে লোকে আমাকে একটি আকাট হাঁদা-গঙ্গারাম মনে করে।

—নো নো ইটস অল রাইট। ডোন্ট মেনশন সো ক্রুডলি।... তো যা বলছিলুম। আমাদের সাইকেল কোম্পানির আসল মালিক গ্রেগর উইলিয়ামসের সঙ্গে ম্যাকফারসন সাহেবের খুব ফ্রেন্ডশিপ। উইলিয়মস পার্টি থ্রো করলে উনি ইনভাইটেড হন। এরকম একটা পার্টিতেই আমার সঙ্গে ম্যাকফারসনের আলাপ হয়েছিল।

—বুঝলুম স্যাব।...আসলে এই কমপার্টমেন্টে আপনারা মানে দুজন বাঙালি প্যাসেঞ্জার যাচ্ছেন এটা সাহেবের পছন্দ নয়। আমি লোকটাকে বুঝেছি স্যার। উনি বাঙালিদের মানুষ বলে জ্ঞান করেন না

—ঠিক আছে। ওর ভাবনা আমাকে ভাবতে দিন। ও যাবে কদ্দূর?

—বর্ধমান। ঠিক আছে বর্ধমান অব্দি যাতে ব্যাটার খুব ডিসটারবেন্স হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। আপনি ভাই কিছু ভাববেন না। হেসে নীরদবরণ বললেন। তাঁর বেশ মজা লাগছিল। হাওড়া থেকে কাটোয়া অব্দি জার্নিটা তিনি ভেবেছিলেন ঘুমিয়ে কাটাবেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে তো শুধু ধানজমি আর গাছপালা। আর দূরে দূরে গ্রাম। সেই দৃশ্য কিছুক্ষণ দ্যাখার পরই একঘেয়ে লাগবে। প্রথমে ভেবেছিলেন ট্রেনে পড়ার মতন একটা বই নেবেন। বেশ জমাটি বই একটা। যেমন আর্থার কোনান ডয়েলের কোনও উপন্যাস। দ্য হাউন্ড অব বাসকারভিলস। ছোটবেলা থেকে নভেলটা যে কতবার পড়েছেন? কিছুতেই আর পুরনো হয় না। শুধু কী কাহিনি? জমজমাট রহস্য। আর কোনান ডয়েলের ভাষার জাদু! ইংরেজি ভাষার যে কী গরিমা, কী সৌন্দর্য তা কোনান ডয়েল পড়লে বোঝা যায়। কিন্তু মুশকিল হল তাড়াহুড়োতে তিনি বইটা ব্যাগে গুছিয়ে নিতে ভুলে গেলেন। যদিও তিনি জানেন সুবুর ভুল হয়নি বই নিতে। তবে সুবু বোধহয় ইংরেজি নভেল সঙ্গে আনেনি। ও এখন টেগোরের নভেল খুব মন দিয়ে পড়ছে। পড়ুক পড়ুক। নীরদবরণ এসব ভেবে তৃপ্তি পান। সুবু সত্যিই একজন ভাল পড়ুয়া হয়ে উঠছে। অনেক ইংরেজি ক্লাসিক পড়েছে। অনেক বাংলা ক্লাসিকও। তবে সুবু যে বই সঙ্গে নিক সেটা বোধহয় বাংলা বইই হবে। চলন্ত ট্রেনে নীরদবরণের বাংলা বই পড়তে ভাল লাগে না। তাই তিনি ভেবেছিলেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, ঢুলতে ঢুলতে একসময় কাটোয়াতে ঠিক পৌঁছে যাবেন। কিন্তু এখন ভাবলেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাবেন কেন? বর্ধমান পর্যন্ত এই সাহেবটাকে জ্বালাতে জ্বালাতে, বিরক্ত করতে করতে যাবেন। সেটা কীভাবে করা যাবে সেটা তাঁর মাথায় এসে গেছে...।

—মোগলসরাই থেকে ট্রেনে আসতে আসতে কী ঘটেছিল সেটা তো শোনা হল না? —নীরদবরণ বললেন।—বলুন তো কী ঘটেছিল?

—সেই ফার্স্ট ক্লাশ কমপার্টমেন্টে সবাই ছিল সাহেব। আমি একজনের টিকিট দেখতে চাইলে সে বলল টিকিট দ্যাখার দরকার নেই। আমি যেন তাকে শান্তিতে থাকতে দিই। আমার মেজাজ

বিগড়ে গেল। তোরা নিয়ম করেছিস। তোরাই তা ভায়োলেট করবি? আসলে আমি একজন ডার্টি নিগার। সাহেবের কাছে টিকিট চেয়েছি এটাই তার রাগ। সাদা চামড়ার টিকিট-চেকার হলে হয়ত অত খাপ্পা মেজাজ দেখাত না। কিন্তু আমিও ছাড়ার পাত্র তখন ছিলুম না। আমি ইংলিশে তাকে বলেছিলুম যে প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে টিকিট দেখা আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে। তখন সাহেব আমাকে বলেছিল—ইউ গো টু হেল! অন্য সাহেবদের সে কী বোঝাল। তারাও আমাকে তেড়ে প্রায় মারতে আসে আর কি? তখন আমি কী আর করব? ভয়ে ভয়ে কমপার্টমেন্ট থেকে নেমে পড়লুম। অন্য কমপার্টমেন্টে উঠে ডিউটি করতে লাগলুম। পরে হাওড়াব অফিসে যে সেই সাহেব আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কমপ্লেন করবে তা কী করে জানব? দোলগোবিন্দ জানাল।

—কমপ্লেন করেছিল?—নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন।

—হ্যাঁ কমপ্লেন। বাট দ্যাট ওয়জ ফলস। আমি নাকি টিকিট চেক করবার নামে ইংলিশ প্যাসেঞ্জারদের হ্যারাস করেছি। বাস। আমার কোরিয়ারের ক্ষতি হয়ে গেল...

—কী ক্ষতি?

—আমার প্রমোশন ছিল, আটকে গেল।.... আমি এখন অন্য কমপার্টমেন্টে চলি স্যার। আপনাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছি লালমুখো কটমট করে তাকাচ্ছে। সেই থেকে সাহেবদের আমি খুব ভয় করি। ওদের শাসনে আছি। কখন চাকরির কী ক্ষতি করে দ্যায়...।

—হ্যাঁ আপনি যান ভাই। ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে।—নীরদবরণ হাসলেন।

যখন চেকার এই কামরা থেকে ট্রেনের ইনসাইড করিডর ধরে পাশের কামরার দিকে পা বাড়িয়েছে তখন সাহেব হাত নেড়ে ডাকল তাকে। নিচু গলায় কী যেন জিগ্যেস করল। নীরদবরণ শুনলেন দোলগোবিন্দ বলছে—ইয়েস স্যার। আই হ্যাভ ওয়ানর্ড দেম...সাফিসিয়েন্টলি ওয়ার্নড দেম। দে ওন্ট-ডেয়ার টু ডিসটার্ব ইউ ফারদার...।

সাত

নীরদবরণ বুঝে গেলেন যে, তাঁদের সহযাত্রী ইংরেজটি বাংলা ভাষা একেবারেই বোঝে না। ইংরেজদের সঙ্গে তিনি মেলামেশা কম করেন না। তিনি জানেন যে, তাদের মধ্য প্রায় সকলেই বাঙালি জাতটাকে অশিক্ষিত এবং অনুন্নত বলেই মনে করে। জীবনের প্রতি মুহূর্তে তারা বোধহয় মনে রাখে যে তারা এই জাতটাকে শাসন করছে বহুদিন। স্বাভাবিকভাবেই সেই জাত যে ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ বাংলা ভাষা, সেই ভাষাটির প্রতি তাদের কোনও আগ্রহ থাকার কথা নয়। ইংরেজ খুবই অহঙ্কারি জাত। তারা মনে করে তাদের ভাষা হল পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তারা বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহী হবে কেন? ঐ ভাষা শিখতে যাবেই বা কেন? কিন্তু সেরকম ভাবাটাও বোধহয় ঠিক নয়। অনেক ইংরেজি পন্ডিতেরই বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং টেগোরকে তাঁরা মনীষী হিসেবে খুব মান্যগণ্য করেন। অবশ্য সেটা হল ইংরেজ পন্ডিত, সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপার। অনেক সাধারণ ইংরেজও আছে যারা এদেশে যখন এসে পড়েছে তখন সেই দেশের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। ইংরেজ খুব বুদ্ধিমান জাতও। তারা বুঝেছে বাংলা ভাষা একটু আধটু বলতে পারলে বা শুনে বুঝতে পারলে আখেরে তাদের লাভই। কারণ তারা এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছে। শোষণ করতে এসেছে এ দেশের মানুষকে। ব্যবসা-বাণিজ্য

এবং শোষণের কাজ আরও ভালভাবে চলতে পারে যদি যে ভাষায় এবং যে ডায়ালেক্টে স্থানীয় মানুষ কথা বলে সেসব বুঝতে পারা এবং বলাও যায়। অন্তত যে দুজন খাস ইংরেজের সঙ্গে চাকরির খাতিরে খুবই মেলামেশা করতে হয় নীরদবরণকে তারা, উইলিয়মস ও ম্যাকেঞ্জি, বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে এবং ভাঙা ভাঙা হলেও কিছুটা বলতেও পারে। কিন্তু এই সাহেবটা মনে হচ্ছে একেবারে আনকোরা। বেশ অসভ্য এবং জংলি টাইপের। ও যে টিকিট-চেকারের সঙ্গে কথা বলছিল তখন কান পেতে তা শুনেছেন নীরদবরণ। অ্যাকসেন্ট শুনে মনে হয়েছে লোকটা স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। স্কটিশ উচ্চারণের ধাঁচ আছে যেন ওর কথায়। আর একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে নীরদবরণের মনে। এই লোকটা বোধহয় খুব বেশিদিন ভারতবর্ষে আসেও নি। তাই এখানকার যা কিছু তার চোখে পড়ছে সবকিছুই খারাপ লাগছে। বাঙালিদের মনে হচ্ছে জন্তু-জানোয়ার। তা না হলে এখনও এই ১৯৪১ সালেও কোনও ইংরেজ কী মনে করে যে সে ট্রেনে, বাসে কিংবা ট্রামে কোনও বাঙালি বা ভারতবাসীর সঙ্গে পাশাপাশি জার্নি করতে পারবে না? সাহেব বারবার নীরদবরণদের দিকে তাকাচ্ছিল। যেন বুঝতে চাইছিল যে টিকিট চেকার সত্যিই ঠিকমতো 'বিহেভ' করার জন্যে তাদের 'ওয়ার্নিং' দিয়ে গেছে কিনা। নীরদবরণের মনে হল এই অসভ্যটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। তা না হলে এ দেশের মানুষদের সম্বন্ধে ওর ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ভাব যাবে না। কিন্তু কীভাবে শিক্ষা দেবেন? ঐ মাংসের পাহাড়ের সঙ্গে ছোটখাটো নীরদবরণ তো আর মারামারি করতে পারবেন না। রেগে গিয়ে হাতাহাতি হ'লে নীরদবরণের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। দৈত্যের মতন লোকটা ইচ্ছে করলে নীরদবরণের কলার ধরে ট্রেনের মেঝেতে আছাড় দিতে পারে। অতএব এমন কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে। সাহেব বিরক্ত হবে, রেগে যাবে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারবে না কী হচ্ছে। সুতরাং গোলমাল করতেও ভয় পাবে।

দাদুকে চুপচাপ দেখে নাতনিও চুপচাপ হয়ে গেছে। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কী দেখছে কিংবা কী ভাবছে কে জানে।

নীরদবরণের মাথায় এতক্ষণে একটা মতলব এসেছে। বেশ ভাল মতলব। সাহেবটাকে এবার বেশ জব্দ করা যাবে। তোর সাহস তো কম নয় রে সাহেব। তুই হাওড়ার বেলিলিয়াস লেনের নীরদবরণ মখুজেকে অবজ্ঞা করিস? তুই জানিস এই লোকটা কী চাকরি করে? কত টাকা মাইনে পায়? কত নিখুঁত ইংরেজি বলতে পারে? তুই জানিস যার সঙ্গে আজ এই কামরায় চলেছিস সে একটা সুট কিংবা একটা টাই এক সপ্তাহে দুবার পরে না?

—কী ভাবছ গো নাতনিদিদি?—নীরদবরণ মুচকি হেসে ডাকলেন।

—ভয়ে ভয়ে আছি দাদু। —শুভ্রারও রসিকতাবোধ কম নয়। হবেই তো। 'ফর্মাল' এডুকেশান তার ততটা হয়নি বটে। ক্লাশ এইট অব্দি পড়ে সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে বটে। কিন্তু নীরদবরণ মনে করেন 'রিয়েল' এডুকেশান শুভ্রার তার বয়সী অন্য মেয়েদের থেকে অনেক বেশি। নীরদবরণ নিজে তাকে বাংলা লিখতে এবং পড়তে শিখিয়েছেন। শুধু বাংলা কেন? ইংরেজি ভাষাও দাদুর কাছে তালিম পেয়ে সে ভালই রপ্ত করেছে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে পড়ে ফেলেছে জেন অস্টেন এবং চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস। এডগার অ্যালান পো-এর ছোটগল্প। এসব পড়ে তার ভাল লেগেছে। এসব উঁচু মানের সাহিত্যের যথাযথ রসাস্বাদনে সক্ষম হয়েছে সে। আর বাংলা নভেলও শুভ্রা খুব কম পড়েনি। বঙ্কিমবাবুকে সে পড়েছে। শরৎচন্দ্র শুভ্রা পড়ুক এটা নীরদবরণ নিজেই চাননি। তাঁর মতে শরৎচন্দ্র তেমন কোনও লেখক নয়। ওর লেখা মানেই শুধু মানুষের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি। যদিও নীরদবরণ জানেন না শুভ্রা লুকিয়ে-চুরিয়ে ঐ লেখকের নভেলও বেশ কিছু পড়ে ফেলেছে। শ্রীকান্ত বইটার প্রথম দিকটা তার ভাল লেগেছে। রাজলক্ষ্মী ও

শ্রীকান্ত পর্ব তার কীরকম ন্যাকা-ন্যাকা মনে হয়েছে। 'দেবদাস' সে পড়েছে। ভাল লেগেছে। কিন্তু সেই ভাল লাগার কথা সে দাদুকে জানায়নি। শুভ্রা জানে দাদু শরৎবাবুকে তেমন লেখক বলে মনেই করেন না। শরৎবাবুর নভেল তাকে লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছে ক্ষীরোদমামা। নীরদবরণ সে কথা জানেন না। নীরদবরণ জানেন শুভ্রা ইদানিং রবি ঠাকুরের নভেল পড়ছে। নীরদবরণের আলমারিতেই তো কয়েকটা রবি ঠাকুরের নভেল আছে।' 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', যোগাযোগ', 'চোখের বালি', 'চার অধ্যায়'। শুভ্রা তার কয়েকটা পড়েছে। ভাল লেগেছে। কবি হিসেবে রবি ঠাকুর তো খুব বড়। তিনি যে এত উৎকৃষ্ট উপন্যাস লেখেন তা জেনে শুভ্রা ঐ বইগুলোর দু-একটা একাধিকবারও পড়েছে এটা নীরদবরণ জানেন। এসব জেনে নীরদবরণের খুব আত্মপ্রসাদ হয়। নিজের স্ত্রী যূথিকার সঙ্গে ঘরকন্না করতে হয় তাই করেছেন। কিন্তু মনের মিল হয়নি। যূথিকার সঙ্গে কথা বলে মনের আরাম পাননি কোনওদিন নীরদবরণ। যূথিকা একেবারেই লেখাপড়া জানা মেয়ে নন। নভেল পড়ার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তিনি রান্না ভাল জানেন। সংসার গুছিয়ে রাখতে পাবেন। ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে পারেন। কিন্তু স্বামীর মনের সঙ্গী তিনি কোনওদিন হতে পারেননি। পারবেনও না। সে কারণেই বোধহয়, মনের অবরুদ্ধ কোনও বাসনা থেকেই হয়তো-বা, তিনি, নীরদবরণ তাঁর কাছে ছোটবেলা থেকে মানুষ হওয়া নাতনিকে নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিল তিল করে প্রকৃত শিক্ষার আলো যেন জ্বালিয়ে চলেছেন তিনি এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটির মনে। নীরদবরণ তার সঙ্গে কথা বলে বেশ আনন্দ পান। কারণ সুবুর উইট এবং হিউমার দুটোই বেশ ভালভাবে কাজ করে।

—কেন? ভয়ে ভয়ে আছিস কেন দিদি?

—ঐ সাহেবটার ভয়ে।—শুভ্রা চোখ ঠারল সহযাত্রীর দিকে।— জানো দাদু আমি বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝতে পেরেছিস?

—এই কমপার্টমেন্টে আমাদের প্রেজেন্স লোকটা একেবারেই লাইক করছে না।

—ওরকম ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করিস নি। তাহলে লোকটা বুঝে যাবে আমরা কী আলোচনা করছি। তাছাড়া তোমাকে একটা ব্যাপার তো শিখিয়েছি।

—কি?

—যখন বাংলায় কথা বলবে তখন চেষ্টা করবে যেন তার সঙ্গে ইংরিজি শব্দ না মিশে যায়। যারা দুটো ভাষাই ভাল জানে তারা এরকম করে না। বাংলায় বললে পুরোপুরি বাংলা বলে। ইংরিজি বললেও তাই।

—চেষ্টা তো করি। হয় না দাদু। আমি আর ইংরিজি কতটা জানি? বাংলাও তো তেমন জানি না। আজকাল বাংলা কথা বলতে গিয়ে দেখি ইংরিজি শব্দ দু-একটা ঢুকে যাচ্ছে। এটা খারাপ। তাই না দাদু?

—হ্যাঁ খারাপ।...বেটা বুড়ো সাহেব আমাদের দিকে আবার কীরকম কটমট করে তাকাচ্ছে দেখছিস?

—তাই তো দেখছি। কেন বলো তো দাদু? আমাদের ওপর ওর এত রাগ হচ্ছে কেন?

—প্রথমত, আমাদের মতন ভেতো বাঙালিকে ও সহযাত্রী পাবে এটা ওর ধারণাতেও ছিল না। দ্বিতীয়ত, ও চাইছে আমরা ওকে দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে বসে থাকি। একেবারে স্পিকটি নট হয়ে বসে থাকি। আমরা কথা বললেই ও রেগে যাচ্ছে। ওর ইগোতে লাগছে। তাই ওরকম কটমট করে তাকাচ্ছে।

—আমার ভয় করছে দাদু।

—কেন? ভয় কীসের?

—পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে লোকটা আমাদের নামিয়ে দেবে না তো?

—নামিয়ে দেবে মানে? এটা কি ওর বাবার ট্রেন? নীরদবরণের কথা শুনে শুভ্রার হাসি পেল। সে হাসছিল হি হি করে। ওপাশ থেকে সাহেব এবার স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করল। কপাল কুঁচকে ফোঁস করে কী যেন বলল। নীরদবরণের অভিজ্ঞ কান শুনল সাহেব বলছে—ডিসগাসটিং। ডিসগাসটিং।...

ট্রেন আবার দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এইসব মফস্বলগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো এরকমই। একটানা জোরে ছুটতে পারে না। বেতো ঘোড়ার মতন লাইনের যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে থাকে। এখন ট্রেন কেন দাঁড়িয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। কাটোয়া অব্দি এভাবেই যেতে হবে। নীরদবরণ জানেন। সমস্যা হল বর্ধমান পর্যন্ত অনেক এক্সপ্রেস ট্রেন আছে। যা দুর্গাপুর যায়। আসানসোল যায়। রানীগঞ্জ যায়। ধানবাদ যায়। এছাড়া, আরও অনেক দূরে দূরে যায়। দিল্লি-কালকা মেলেও তো বর্ধমান যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ধমান তো আর নীরদবরণের গন্তব্য নয়। তাঁকে যেতে হবে কাটোয়া। সেটা হল বর্ধমান জেলারই এক মহকুমা। বর্ধমান শহর থেকে অনেক ভেতরে। মেল লাইনের ট্রেনে সেখানে যেতে হয় না। কর্ড লাইন দিয়ে যেতে হয়। একটা উপায় অবশ্য আছে। কোনও মেল ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত যাওয়ার পর সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে কাটোয়া যাওয়া। কিন্তু সেই লোকাল ট্রেনের বর্ণনা বন্ধু অপরেশের মুখে যা শুনেছিলেন তাতে শিউরে উঠেছিলেন নীরদবরণ। সেই ট্রেনে নাকি যত রাজ্যের কুলি-কামিন এবং অন্যান্য নিচু শ্রেণির প্যাসেঞ্জার ওঠে। খুব ভিড় হয় ট্রেনে। বসার জায়গার জন্যে যাত্রীদের মধ্যে রীতিমতো ধাক্কা ধাক্কি, মারামারি হয়। কারণ ঐ ট্রেনে টিকিটের দাম কম। সাধারণ মানুষ সঙ্গত কারণে ঐ ট্রেনেই যেতে পছন্দ করে। সে ট্রেনে উঠলে নীরদবরণের সুট-টাই আর অক্ষত থাকবে না। তাহলে কী করা যাবে? কীভাবে যাবেন কাটোয়া? নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে না গেলেই তো নয়। পুরনো বন্ধু অপরেশ। খুব ধরেছিলেন তাঁর 'নীরদ' কে। নিজের মেয়ের বিয়েতে তিনি এই 'সাহেব' বন্ধুটিকে নিয়ে যাবেনই। অপরেশ বলেছিলেন খুব ভাল হয় যদি নীরদবরণ হাওড়া থেকে একটানা গাড়িতে কাটোয়া যান। কিন্তু অতদূর গাড়িতে যাবার কোনও সাধ ছিল না নীরদবরণের। তিনি একা গেলেও হয়ত হত। কিন্তু নাতনিকে নিয়ে প্রায় দেড়শ মাইল রোডজার্নি করার কোনও ইচ্ছেই ছিল না তাঁর। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়িতে তিনি কিছুদিন আগেও এখানে ওখানে গেছেন। সেই রাস্তার অবস্থা যে খুব ভাল তা বলা যাবে না। প্রায়ই গাড়ি উলটে যায়। তাহলে উপায়? মেল ট্রেন দু-একটা যায় কাটোয়ার ওপর দিয়ে। কিন্তু থামে না। তখন অপরেশ এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটার হদিশ দিয়েছিলেন। এই ট্রেন দুপুর নাগাদ ছাড়ে। সন্ধের আগেই পৌঁছে যায়। কিন্তু যেতে যেতে প্রায়ই যে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেয় ট্রেনটা সেটা আর বলেননি অপরেশ তাঁর বন্ধুকে।

সিগন্যাল সবুজ হল। কারণ ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। নীরদবরণ নাতনিকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাগে নভেল কিছু আছে?

—হ্যাঁ আছে। বিয়েবাড়ির হইচই যখন একঘেয়ে লাগবে তখন পড়ব বলে এনেছি।

—বিয়েবাড়িতে কি আর বই পড়া হয়? বল ট্রেনে পড়বি বলে এনেছিস।

—সেটাও একটা কারণ। কিন্তু ট্রেনে আর পড়া হচ্ছে কোথায়? এই সাহেবটাই তো মেজাজটা কীরকম খারাপ করে দিল।

—আমাদের মেজাজ সাহেব খারাপ করেছে। এবার ওর মেজাজ আমরা খারাপ করব।

—মানে?

—ব্যাগে কী কী বই আছে বের কর সুবু। —নীরদবরণ নাতনিকে বললেন।

—খুব বেশি বই তো আনিনি। দুদিনের জন্যে যাচ্ছি। তার ওপর বিয়েবাড়ি। পড়ার সময় পাব কোথায়?

—তা বটে। ঠিকই বলেছিস। কটা বই এনেছিস?

—একটা। রবি ঠাকুরের নভেল। চোখের বালি।

—বাহ! ওটা একটা মাস্টার পিস বটে।—কথাটা বলে নীরদবরণ আড়চোখে সাহেবের দিকে তাকালেন। খুব বিরক্ত মুখে এবং কপাল কুঁচকে সাহেব তাঁদের দিকে বারবার তাকাচ্ছে। বিড়বিড় করছে নিজের মনে কীসব। আসলে নীরদবরণ যে নাতনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছেন সেটা সাহেবের পছন্দ নয়। সে প্রথমে ভেবেছিল সে যে কামরাতে উঠবে সেখানে কোনও বাঙালি কিংবা ভারতীয় যাত্রী থাকবে না। সাহেবদের এরকম মনোভাব তো, যতদূর নীরদবরণ জানেন, বহু আগে ছিল। ট্রেনের বা ট্রামের যে কামরাতে সাহেবরা যাবে, সেখানে কোনও ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার ছিল না। হোটেলেও এরকম ছিল। হোটেলের দরজায় লেখা থাকত—স্ট্রিকটলি ফর ইউরোপিয়ানস। নিজের বাবার কাছে একটা গল্প শুনেছিলেন নীরদবরণ। তাঁর বাবা—অবনীমোহন ছিলেন নীরদবরণের মতো বেঁটেখাটো নয়। বেশ লম্বা এবং স্বাস্থ্যবান। যে বয়সে বাঙালি সচরাচর বার্ধক্যের বারাণসীতে পৌঁছে যায়, সেই বয়সেও নিয়মিত ভোরবেলা উঠে ব্যায়াম করতেন এবং মুগুর ভাঁজতেন। ইয়া চওড়া ছিল তাঁর দু-কাঁধ। বুকদুটো ছিল কপাটের মতন। লম্বায় ৫ ফুট এগারো ইঞ্চি। নীরদবরণ ভেবেই পান না এরকম একজন পালোয়ানের মতন চেহারার বাবার ছেলে হয়ে তিনি কী করে এতটা খর্বকায় এবং নাড়ুগোপালের মতন দেখতে হলেন। সত্যিই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছেন নীরদবরণ। কারণ সত্যিই বেঁটে হবার একটা অশান্তি এবং লজ্জা আছে। সেটা তিনি প্রায়ই অনুভব করেন। ভেবে ভেবে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন নীরদবরণ। অবনীমোহন যেমন দীর্ঘকায় ছিলেন। তেমনই খর্বকায় ছিলেন তাঁর মা গিরিজাদেবী। একেবারে যাকে বলে গুড়গুড়ে সেরকমই ছিলেন গিরিজা। গায়ের রং ছিল টকটকে ফর্সা। দুধে-আলতার মতন। মুখশ্রী যেন পানপাতা। কিন্তু উচ্চতায় অত্যন্ত কম। অবনীমোহন এবং গিরিজাকে পাশপাশি দেখলে এবং জানলে যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, যে কোনও লোকেরই হাসি পাবে। সত্যিই সে এক দৃশ্য! ভীমের মতন চেহারার অবনীমোহনের পাশে জড়োসড়ো গিরিজা। তাঁর মাথা স্বামী কাঁধের থেকে অনেক নিচুতে। দুজনের ফোটো আছে নীরদবরণের বাড়িতে। কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা একবার। গিরিডি না কোথায় যেন। সেখানে একটা ঝরনার ধারে দুজনে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশাপাশি। তখন ওঁদের বয়স কম। বড় ছেলে নীরদবরণ হয়েছেন সবে। উনিশ শতকের শেষ দিক সেটা। ক্যামেরার তেমন চল ছিল না তখন। বিশেষত গিরিডির মতন জায়গায় ঝরনার ধারে ক্যামেরা, ফোটোগ্রাফার এসব যোগাড় হবে কীভাবে? আসলে ছবিটা ছিল শিল্পীর আঁকা। গিরিডি স্বাস্থ্যকর জায়গা। সেখানে আগেকার বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাতে যেতেন। কেউ কেউ বাড়ি-টাড়িও করতেন সেসব জায়গায়। এভাবেই বেশ কিছু বাঙালিদের পত্তন হয়েছিল গিরিডি, ঘাটশিলা, মধুপুর এসব জায়গায়। এখন তো বাঙালিদের পত্তন ঐসব জায়গায় আরও বেড়েছে। তো যাই হোক, তখনকার গিরিডি-বাসী বাঙালিদের মধ্যেই হয়ত কারও ছবি আঁকার দক্ষতা ছিল। তিনি এঁকেছিলেন ঝরনার ব্যাকগ্রাউন্ডে অবনীমোহন এবং গিরিজার ছবি। পেন্সিলে আঁকা ছবি। পরে তা ফ্রেমবন্দি করে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। সে ছবি ফেলেননি নীরদবরণ। এখনও টাঙানো আছে তাঁর বাড়ির দেওয়ালে। যদিও এখন কবেকার সেই পেন্সিলে আঁকা ছবিকে কীরকম ঝাপসা লাগে। তবুও একজন দীর্ঘকায় পুরুষ এবং একজন হাস্যকরভাবে খর্বকায় মহিলা যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে সেটা বেশ বোঝা যায়।

ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝরনা-টরনা অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। চেহারার এত গরমিল সত্ত্বেও নীরদবরণের বাবা ও মায়ের মধ্যে মনের মিল ছিল খুবই। নীরদবরণের এখনও মনে পড়ে তার বাবা মাঝে মাঝ তাঁর মায়ের উদ্দেশে বলতেন—দ্যাট নোবল লেডি। শি ইজ আ গুড কুক অ্যান্ড হাউসওয়াইফ।

তো অবনীমোহন একদিন কলেজের দুজন বন্ধুর সঙ্গে ট্রামে চড়েছেন। সময়টা হল উনিশ শতকের শেষ দিক। ট্রামে উঠে দেখলেন চারজন গোরা যাত্রী। শুধু চারজন যাত্রী ছিল। আর কেউ ছিল না। তখন কলকাতায় সাধারণ মানুষ খুব একটা দায়ে না পড়লে ট্রামে উঠত না। অবনীমোহনদেরও ট্রামে উঠে যাতায়াত করার তেমন ফুরসত বা সামর্থ ছিল না। পড়াশোনা করেই দিন কাবার। তারপর হস্টেলে গিয়ে মেস-জীবনে ঢুকে পড়া। ট্রামের টিকিট যদিও তিন পয়সা। কিন্তু তিন পয়সাও নিজের পকেট থেকে খরচা করতে পারা তখন বেশ দুঃসাধ্যই ছিল, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করা একজন ছাত্রের পক্ষে। অনেক ভেবে-চিন্তে, পকেটে কিছু রেস্ত নিয়ে, মজা করে ট্রামে চড়বেন ঠিক করেছিলেন তিন বন্ধু। কিন্তু ট্রামে উঠে যে এক বিপত্তি হবে সেটা ভাবেননি। মালকোঁচা মেরে ধুতি আর সোডা-সাবানে কাচা শার্ট পরনে তিনজন ভারতীয়কে দেখেই চারজন গোরা যাত্রীর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। কপাল কুঁচকে, ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে তারা তাকিয়েছিল ঐ ছোকরাদের দিকে। একজন মুশকো চেহারার গোরা তো তাদের বলেই দিল—হে বয়েজ! গেট ডাউন!.... অবনীমোহনের আর দুজন বন্ধুও ছিল বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। ডাকাবুকো স্বভাবের। তারা তিনজনেই রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজিতে বলেছিল—কেন? নামব কেন? আমরাও প্যাসেঞ্জার। ভাড়া দিয়ে ট্রামে চড়তে এসেছি।.... তখন গোরাদের এবং ছাত্রদের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি বেধে গেল। একজন গোরা বলেই ফেলেছিল—এই ট্রামে আমরা যাচ্ছি—দ্য ব্রিটিশ পিপল। ইন্ডিয়ানস আর নট অ্যালাউড হিয়ার। ছাত্রেরাও ছাড়ার পাত্র নয়। তারা সমানে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ পিপল ট্রামে গেলে ভারতীয়রা যেতে পারবে না এই অন্যায়, ইনজাসটিস তারা মেনে নেবে না। তারাও পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে ট্রামে যাচ্ছে। ট্রামের কনডাকটরটি একজন গোবেচারা বাঙালি ছিল। সে অবনীমোহনদের পরামর্শ দিল ভালয় ভালয় ট্রাম থেকে নেমে যেতে। তা না হলে ঐ ইংরেজগুলোর হাতে মারই খেতে হবে। এসপ্ল্যানেড থেকে ট্রাম ছেড়ে কালীঘাটের দিকে যাচ্ছিল। ঐ ছাত্ররা ট্রামে ওঠার আগে আরও কয়েকজন বাঙালি ট্রামে উঠতে চেয়েছিল। ঐ ইংরেজগুলো তাদের উঠতে দেয়নি। সব ইংরেজরই যে এরকম অভদ্র তা নয়। কিন্তু এই লোকগুলো অভদ্র। তারা ভারতীয়দের সহ্য করতেই পারে না। কনডাকটার অবনীমোহনদের পরামর্শ দিয়েছিল ট্রাম থেকে নেমে যেতে। তা না হলে হয়ত গোরাদের হাতে তাদের মার খেতে হবে। সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার হবে।...তিনজন সাহেবের মধ্যে মারমুখী সাহেবটি সত্যিই অভদ্র। অবনীমোহনরা যখন ট্রাম থেকে নামার কোনও চেষ্টাই করছেন না, তখন সে নিজের সিট থেকে উঠে এল। তিনজন ছাত্র দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক দরজার কাছটিতে। লম্বা এবং বেশ বলিষ্ঠ চেহারার সেই সাহেব এবার কনডাকটরের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল—সামনেই একটা স্টপ আছে। ট্রাম থামিয়ে এদের নামিয়ে দিন তা না হলে আমিই এদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব। ডার্টি নিগারস এবং আমরা ইংলিশ পিপল, একসঙ্গে এই ট্রামে যাব না। কনডাকটর লোকটি নেহাতই ছাপোষা এবং নিরীহ। সে সাহেবের রাগে অগ্নিশর্মা চেহারা দেখে বেশ ঘাবড়ে গেছে। সে আবার অবনীমোহনদের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা সামনের স্টপে নেমে যাও ভাই। শুধু শুধু ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী? অবনীমোহন ভেতরে ভেতরে রাগছিলেন। এবার সত্যিই তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তাঁর অন্য দুজন সঙ্গীও মনে হয় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবনীমোহন ঘাবড়াননি! তিনি এবার সাহেবের দিকে এগিয়ে গেলেন। বুক চিতিয়ে কঠিন গলায়, অবশ্যই ইংরিজিতে বললেন—এই শহরে কোনও কিছুই ইংলিশ পিপলদের জন্যে সংরক্ষিত নয়। সেরকম

কোনও আইনও দেশে নেই। এই ট্রামকারও সংরক্ষিত নয়। ভাড়া পে করে যাত্রীরা যাবে। সুতরাং নেমে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই।...একজন সামান্য বাঙালি ছোকরার এই ঔদ্ধত্য দেখে সাহেবের বোধ হয় ভিরমি খাবার যোগাড়। সে তখন তার লম্বা হাত বাড়িয়ে অবনীমোহনের শার্টের কলার চেপে ধরেছিল। হয়তো ছোকরার গালে একটা থাপ্পড় কষাতেই চেয়েছিল, কিন্তু অবনীমোহন তাকে সে সুযোগও দেননি। সেই কলেজ-জীবন থেকেই তিনি প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজতেন, ভেজানো ছোলা এবং আদার কুচি খেতেন। তিনি এক ঝটকায় নিজের জামার কলার সেই সাহেবের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তারপর সেই সময় যে কোনও বাঙালি যে কাজটা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না, সেই কাজটাই করেছিলেন। প্রবল এক ঘুঁষি ঝেড়েছিলেন সাহেবের নাকে। এতই জোর ছিল সেই ঘুঁষির যে ওরকম দানবের মতন সাহেব টাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে পড়ে গেল! সঙ্গীর ওরকম অবস্থা দেখে বাকি দুজন সাহেব আর কি করে চুপচাপ, হাত গুটিয়ে বসে থাকে? তারা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অবনীমোহনের ওপর। তখন অবনীমোহন মরিয়া হয়ে কিল-ঘুঁষি-চড়-লাথি হাঁকাচ্ছেন। আর তাঁর দুজন বন্ধুও তাই করছিল। রীতিমতো মারমারি বেধে গেল বাঙালি যুবক এবং সাহেবদের মধ্যে। অবনীমোহনের ঘুঁষি খেয়ে যে সাহেব মাটিতে পড়ে গিয়েছিল তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল রীতিমতো। সে চেঁচিয়ে বলছিল—স্টপ দ্য ট্রাম। স্টপ ইট। আই উইল কল দ্য পুলিশ অ্যান্ড হ্যান্ড ওভার দিজ রোগস্ টু দেম। অবনীমোহনরা দেখলেন বেগতিক। সাহেবদের সঙ্গে মারামারিতে তাঁরা পিছপা হতে চান না। কিন্তু ছাত্র বয়সে হাজতবাস করার ইচ্ছে তাঁদের একেবারেই ছিল না। বিশেষত সেই ব্রিটিশ আমলে হাজতে একবার ঢোকা মানে জীবনটাই বরবাদ হয়ে যেত। হয়তো স্বদেশি বলে মামলাতে ঝুলিয়ে দিত পুলিশ অবনীমোহনদের। সুতরাং...। সুতরাং আর কী? অবনীমোহনরা বুঝেছিলেন যে আর সাহস দেখাতে যাওয়াটা বেশ বোকামি হয়ে যাবে। ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কনডাক্টর চেঁচাচ্ছিল—গালিফ স্ট্রিট! গালিফ স্ট্রিট!...সাহেবরা চেঁচাচ্ছিল পোলিশ! পোলিশ! রীতিমতো জমজমাট এক নাটক! রাস্তার লোকজন তাকিয়ে দেখছিল। বুঝতে চাইছিল বোধহয় কী ঘটছে ব্যাপারটা।...আর কিছুক্ষণ দেরি করলে বোধহয় সত্যিই অবনীমোহনরা ইংরেজ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতেন। সুতরাং রণে ভঙ্গ দিয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাম থেকে নেমে সামনের গলি ধরে দে ছুট! মারামারিটা অবশ্য একতরফা হয়নি। সাহেবদের কিল-ঘুঁসিও তিনজন ছাত্রকেই খেতে হয়েছিল। সাহেবদের গায়ে এমনিতেই বোধহয় বেশি ক্ষমতা। তাদের মারের দমকে ওদের শরীরও বেশ জ্বলছিল। কিন্তু তাতে কী হল? একতরফা মার খেয়ে তো আর ফিরে আসতে হয়নি। ওরকম দৈত্যের মতন চেহারার সাহেবদের সঙ্গে সমানে যুঝে গিয়েছিল তিনজন বাঙালি ছোকরা।

অবনীমোহনের সাহসের এই কাহিনি কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছেন নীরদবরণ। সেই অবনীমোহনের ছেলে হয়ে তিনি কামরায় যাত্রী এই সাহেবের ঔদ্ধত্যকে বরদাস্ত করবেন নাকি? তিনি নিজে সাহেবদের অনেক কিছুই পছন্দ করেন। দীর্ঘ দিন সাহেবি কোম্পানিতে কাজ করেন। অনেক খাঁটি সাহেবের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হয় তাঁকে। সব সময় সাহেবদের মতোই ফিটফাট, সুটেড-বুটেড থাকেন। স্বভাবে বেশ উন্নাসিক। কিন্তু তা বলে একজন বাঙালি হিসেবে তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগলে তিনি তো চটে যাবেনই। এই যে এতক্ষণ তিনি নাতনির সঙ্গে বই-টই নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন সেটা ঐ মাংসের পাহাড়ের একেবারেই যে পছন্দ হচ্ছিল না এটা নীরদবরণ বেশ বুঝেছেন। সাহেব মারামারি করতে হয়তো সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু তার হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে সে বেশ বিরক্ত। থেকে থেকে রাগী চোখে তাকাচ্ছিল নীরদবরণ আর শুভ্রার দিকে। দাঁত কিড়মিড় করছিল। বিড়বিড় করে কীসব গালাগাল দিচ্ছিল। নীরদবরণ শুনতে

পাচ্ছিলেন না। শুধু একটা কথাই তাঁর কানে আসছিল—ডিসগাসটিং...ডিসগাসটিং! নাহ, সাহেবের এই অসভ্যতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ...মুখে তোরা নিজেদের খুব সভ্য-ভব্য বলিস। ভাবসাব এমন করিস যেন তোদের মতন সিভিলাইজড্ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু আসলে তো তোরা বেনিয়ার জাত! ব্যবসা করতে এসে 'রুল' করতে লাগলি আমাদের। আমাদের এক্সপ্লয়েট করছিস আর নিজেদের রেভিনিউ বাড়াচ্ছিস। আমাদের শোষণ করে যে রসদ ঘরে তুলছিস তাই দিয়ে তোদের নবাবি, বিলাসিতা, লাম্পট্য এখনও চলছে। আর সেই আমাদেরই তোরা এখনও সহ্য করতে পারিস না! কীটপতঙ্গের মতন ভাবিস! ...নাহ!...নীরদবরণ ভাবলেন এই সাহেবটাকে তিনি, আরও বিরক্ত করবেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন। তখনও বর্ধমান আসতে অনেক দেরি। সাহেবকে বিরক্ত করতে হবে। ডিসটার্ব করতে হবে আরও। শুভ্রার বোধহয় খিদে পেয়েছিল। সে বলেছিল—দাদু টিফিন- ক্যারিয়ার খুলব? নীরদবরণ মুচকি হেসে বললেন—নাহ এখন খাওয়া নয়। এখন বই পড়া হবে...।

আট

দাদুর কথা শুনে শুভ্রা বেশ অবাকই হল। তার সত্যিই বেশ খিদে-খিদে পাচ্ছিল। সেরকম পাওয়ার অবশ্য কথা নয়। কারণ আদরের নাতনি কয়েকদিন বাড়িতে থাকবে না। তাকে আশ মিটিয়ে দুপুরের খাবার খাইয়ে দিয়েছিলেন যূথিকা। মাছের মুড়ো (যা খেতে ভালবাসে শুভ্রা), দুটো বা তিনটে বেগুনভাজা (এই বস্তুটিও শুভ্রার প্রিয়), সরু চালের ভাত, মুড়িঘণ্ট, পায়েস অনেকরকম পদ হাবুর মাকে দিয়ে রাঁধিয়েছিলেন যূথিকা। তাঁর স্বামীও খেতে ভালবাসেন। আর ফুটফুটে নাতনিটিও এই বয়সেই বেশ ভোজনরসিক। দিদু যা দিয়েছিল পেট ভর্তি করেই খেয়েছিল শুভ্রা। কিন্তু কোথাও গেলে কিংবা চলন্ত ট্রেনে উঠলে তার বরাবরই ঘন ঘন খিদে পায়। তখনও পাচ্ছিল। টিফিন-ক্যারিয়ারে যূথিকার যত্ন করে গুছিয়ে দেওয়া লুচি, আলুরদম এবং রসালো পাটিসাপটার জন্যে তার মন ছটফট করছিল। কিন্তু দাদুর কথা শুনে সে বেশ অবাক হল। এখন বই পড়বে মানে? দাদু নিজে বই পড়বে? তা পড়ুক না! কিন্তু বই তো এই ঢাউস ব্যাগটাতে মাত্র একটাই আনা হয়েছে। দাদু কোনও ইংরেজি নভেল তো ব্যাগে নেয়নি। শুভ্রা একটা বই নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নভেল। চোখের বালি। সে বই তো দাদুর পড়া। সেই পড়া বই আবার চলন্ত ট্রেনে পড়বে দাদু? কী যে বিচিত্র খেয়াল! শুভ্রার হাসি পেল। এই সাহেবী পোশাকের ছোটখাটো বুড়োটাকে সে ঠিক যেন বুঝতে পারে না। কখন যে দাদুর মনে কী খেয়াল চাপে! অবশ্য তাতে অসুবিধে নেই। দাদু যদি বই পড়তে চায় তো পড়ুক না। কিন্তু সে এখন কিছু খাবে। তার সত্যিই খিদে পাচ্ছিল। ভ্রমণ-ব্যাগের ভেতরে কিছুক্ষণ হাতড়ে শুভ্রা 'চোখের বালি' বের করে আনল। তারপর নীরদবরণের দিকে বইটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল— এই নাও দাদু। পড়ো...।

—আমাকে দিচ্ছিস কেন? তুই তো পড়বি?—নীরদবরণ বললেন।

—মানে?—শুভ্রা দাদুর কথা কিছুই বুঝছিল না।

—ঐ নভেলটা থেকে তুই চেঁচিয়ে পড়বি। আমি শুনব।

—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমি পড়ব? আর তুমি শুনবে?

—ইয়েস মাদমোজয়েল...।—নীরদবরণ হাসছিলেন। দুষ্টুমির হাসি। এবার শুভ্রা আড়চোখে এই কামরাতে তাদের আর এক সহযাত্রীর দিকে তাকাল। একটু আগে তারা কথাবার্তা বলছিল, ঐ সাহেব যে সেটা পছন্দ করছিল না সেটা শুভ্রাও বুঝেছিল। দোলগোবিন্দ সামুই নামে সেই

বাঙালি টিকিট চেকারকে দিয়ে সাহেব যে তাদের কিছুটা সমঝে দিতে চেয়েছিল সেটাও বুঝেছিল সে। চেকার অবশ্য বাঙালি বলেই হয়ত তাদের ওর্য়ানিং দ্যায়নি; সাহেবের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে সারা রাস্তা মুখে তালাচাবি দিয়ে বসে থাকতে হবে এরকম কথাও দোলগোবিন্দ বলেনি তাদের। বরং অন্য এক গল্প শুনিয়েছিল। সাহেবদের ওপর সেও বেশ চটা এরকম মনে হয়েছিল শুভ্রার। কিন্তু তাই বলে সাহেব যেটা পছন্দ করছে না সেটা করা কি ঠিক? যদি ঝগড়াঝাটি বেধে যায়? যদি সাহেব এমন চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যে শুভ্রাদের রেল-কোম্পানী নামিয়েই দিল কামরা থেকে! তাহলে কী হবে? তাই সে দাদুকে জিজ্ঞেস করল—এই বই থেকে এখন চেঁচিয়ে পড়ব? তাতে ঐ সাহেবটা যদি রেগে যায়?...

—আমি তো এই অভদ্র সাহেবটাকে রাগাতেই চাই।— হেসে বললেন নীরদবরণ।—ও বেটা ভদ্রতা জানে না। আমাদের মানুষ বলে যেন ভাবেই না। দেখছিস না আমাদের সঙ্গে ও এক কমপার্টমেন্টে যাচ্ছে বলে কীরকম বিরক্তি প্রকাশ করছে?

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আমারও কী কম রাগ হচ্ছে।—আড়চোখে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল শুভ্রা।—কিন্তু দাদু একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কী রে?

—তুমি তো প্রায়ই বল ইংরেজ জাতটা আমাদের শাসন করছে বটে। কিন্তু ওদের অনেক গুণ আছে। যেটা আমাদের নেই।

—ঠিকই তো বলেছি। সাহেবদের যেগুলো আছে, আমাদের যদি সেগুলো থাকত, তাহলে ওরা আমাদের এভাবে রুল করতে পারত না। আই বিলিভ ইট সিনসিয়ারলি।...

—সাহেবরা খুব ডিসিপ্লিনড। তুমি এটাই বারবার বলো।

—হ্যাঁ। সেটাই ওদের সবথেকে বড় কোয়ালিটি। ডিসিপ্লিন-দ্য ভেরি ওয়র্ড!...দ্য অ্যাপ্রোপিয়েট ওয়র্ড!...শৃঙ্খলা। একটা জাতির যদি শৃঙ্খলাবোধ না থাকে তাহলে সেই জাতি সারভাইভ করতে পারে না।

—সারভাইভ করতে পারে না?...তার মানে আমাদের কোনও ডিসিপ্লিন নেই। আমরা এক্সটিঙ্কট হয়ে যাব?

—নাহ...। আই শুড কারেক্ট মাইসেল্ফ-মাই ডিয়ার। আমি ঠিক এক্সটিঙ্কট শব্দটা ব্যবহার করতে চাইনি। বরং আমি বলতে চাই—আ নেশন ক্যানট প্রসপার উইদাউট ডিসিপ্লিন। আমাদের বাঙালিদের কোন ডিসিপ্লিন আছে? সময়কে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা জানি না। দি ইংলিশ পিপল নো ইট। এটাই তো আসল কথা। ইউ হ্যাভ গট ওনলি ওয়ান লাইফ। অ্যান্ড ইউ আর টু মেক ইট মিনিংফুল বাই প্রপার ইউটিলাইজেশন অব ইওর টাইম এভরিডে। আমি এভাবে ভাবতে ভালবাসি খুব...।—নীরদবরণ এবার পকেট থেকে পাইপ বের করলেন। ধরালেন। সহযাত্রী সাহেব চোখ কুঁচকে তাকাল। সে এতক্ষণ নিজেও পাইপ খাচ্ছিল। একজন 'বেঙ্গলি বাবু' তার সামনে সমান তালে পাইপ টানবে এটা বোধহয় সে ভাবতে পারেনি। তার চোখে, মুখের ভাব-ভঙ্গিতে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। সে ঘন ঘন তীব্র দৃষ্টি হানছিল নীরদবরণের দিকে।... নাহ এই সাহেবটা সত্যিই আনকোরা। লন্ডন থেকে বোধহয় কিছুদিন হল, সে এদেশে এসেছে। এ বেটাকে সত্যিই একটু বিরক্ত করা দরকার।

—যা বলছিলুম সুবু।—নীরদবরণ আবার শুরু করলেন।—দি ইংলিশ নেশন মে বি ডিসিপ্লিনড বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি ইংলিশম্যান ইজ গুড। যেমন এই লোকটা। খুব খারাপ। মনে হচ্ছে খুব একটা শিক্ষিতও নয়।

দাদুর এই কথাতে শুভ্রা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সহযাত্রী সাহেবের

এতক্ষণ ধরে চেপে রাখা বিরক্তির প্রকাশ ঘটল। সে তার ডান হাত তুলল নীরদবরণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। নীরদবরণ তার দিকে তাকালেন। কী বলতে চায় সাহেব?

—লুক বাবু!—সাহেব দুর্বোধ্য স্কটিশ উচ্চারণে ঘোঁৎ ঘোঁাৎ করে ইংরেজিতে যে কথাগুলো বলেছিল তার বাংলা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়— ট্রেনের এই কমপার্টমেন্ট তোমার ড্রয়িং রুম নয় যে তুমি ইচ্ছেমতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে যাবে। তোমরা এভাবে কথা বলছ আমার অসুবিধে হচ্ছে। আমার শান্তি নষ্ট হচ্ছে।...

সাহেবের কথা শুভ্রা কিছুই বোঝেনি। ইংরেজি সে পড়তে পারে। কিছুটা বলতেও যে পারে না তা নয়। তার বয়সের বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যে প্রচুর ইংরেজি বই পড়ে ফেলেছে। তার কথাবার্তাতেও, বিশেষত যখন সে দাদুর সঙ্গে কথা বলে, প্রায়ই নানারকম ইংরেজি শব্দ চলে আসে। বাড়িতে যখন দাদু আর নাতনির এরকম কথাবার্তা হয়, তখন যূথিকা অবাক হয়ে শোনেন। ইংরেজি কথাগুলো কিছুই বোঝেন না। শুধু বোঝেন যে, ওগুলো ইংরেজি শব্দ। আর ভাবেন, সাহেব-মেম-ঘেঁষা এই মেয়ের বিয়ে হবে কোন্ ঘরে? মেয়ে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে তো? নীরদবরণের পাল্লায় পড়ে মেয়েটা যেভাবে মানুষ হচ্ছে তাতে ভয় হয় যূথিকার। শ্বশুরবাড়িতে তো একদিন যেতেই হবে। সেখানে কতরকম আচার-বিচার, বয়স্ক মহিলাদের নানা ধরনের শুচিবাই। হাজার সংস্কার। সেসবের সঙ্গে এরকম ফটর ফটর ইংরেজি বলতে পারা মেয়ে ঠিক তাল মিলিয়ে চলতে পারবে তো?

কিন্তু এই সাহেব ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বিচিত্র উচ্চারণে কী বলে যে ধমকাচ্ছিল দাদুকে তা কিছুই বুঝতে পারেনি শুভ্রা। সে তাকিয়ে ছিল দাদুর মুখের দিকে। সে দেখছিল দাদুর গোঁফ-দাড়ি কামানো, ফর্সা মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। নীরদবরণ সাহেবের কথার উত্তরে ইংরেজিতে যা বলেছিলেন তা হল এইরকম—এই কমপার্টমেন্ট তোমারও ড্রয়িংরুম নয় যে তুমি একা নিজের ইচ্ছামতো যা ইচ্ছে তাই করবে। তুমিও রেল-কোম্পানিকে ভাড়া দিয়েছ। আমরাও ভাড়া দিয়েছি। আর এই কমপার্টমেন্ট হল বস্তুত পাবলিক প্লেস।... আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। যেরকম যাত্রীদের মধ্যে কথা হয়। আমরা হইচই করিনি। চেঁচিয়ে গান-বাজনা করিনি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করিনি। তবুও তুমি বলছ তোমার ডিসটারবেন্স হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।

নীরদবরণের উত্তর শুনে সাহেব যেন আরও রেগে গেল। সে এবার রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আগের থেকে আরও চেঁচিয়ে বলল—লুক বাবু! তোমরা যদি চুপচাপ না যাও তাহলে আমি তোমাদের নামে ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে কমপ্লেন করব। তোমাদের নাম-ধাম প্যাসেঞ্জারস-লিস্ট থেকে আমি পেয়ে যাব। আমি তোমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে কমপ্লেন করব যে তোমাদের পেনাল কেসে ঝুলতে হবে।...

সাহেবের এই হুমকিতে একটুও না দমে নীরদবরণও ফিরতি হুমকি দিলেন। তিনি ইংরিজেতে বললেন—ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার আমার পারসোনাল ফ্রেন্ড। তুমি তাকে আমাদের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পার আর আমরা বুঝি তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পারি না? আমরাও তোমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাব যে, তুমি তুচ্ছ ব্যাপারে বারবার আমাদের থ্রেটেন করেছ। আমাদের নামিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছ। আমাদের শান্তিপূর্ণ যাত্রায় বারবার ব্যাঘাত ঘটিয়েছ। আমার অভিযোগ পেলে জি. এম. সেটা নিশ্চয়ই ওয়েস্ট-পেপার বাসকেটে ফেলে দেবেন না। তিনি অভিযোগের তদন্ত করাবেন। তখন তদন্তের রায় তোমার বিরুদ্ধেও যেতে পারে।

নীরদবরণের সঙ্গে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের আলাপ আছে এটা শুনে স্পষ্টতই সাহেব বেশ ঘাবড়ে গেল। সাহেব আসলে বেশ ভিতু। নীরদবরণ মনে মনে হাসলেন। ইস্টার্ন রেলওয়ের ডেপুটি জেনালের ম্যানেজার ম্যাকফারসন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ আছে

বটে। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারকে তিনি সত্যি চেনেন না। একটু গুল মেরেছেন। কিন্তু তাতেই বেশ কাজ হল। সাহেব সেটা শুনে মনে হল বেশ চুপসে গেল। কিন্তু তবুও গজগজ করতে ছাড়ল না। আসলে সে দুজন ভারতীয়ের উপস্থিতিই মেনে নিতে পারছিল না। নীরদবরণের মনে হল, এই সাহেবকে সহজে অব্যাহতি দিলে চলবে না। ও যতদূব যাবে ওকে ডিসটার্ব করতে হবে। দেখা যাক না কী হয়।...

ঘন ঘন পাইপ টানছিলেন নীরদবরণ। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছিলেন। কড়া তামাকের গন্ধ কামরার আবদ্ধ বায়ুতে। তিনি ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। এটা সে উত্তেজনারই বহিঃপ্রকাশ। পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে নীরদবরণ বললেন—শুবু তুই 'চোখের বালি' থেকে চেঁচিয়ে পড়ে যা। আমি শুনে যাই।

—'চোখের বালি' থেকে চেঁচিয়ে পড়ব দাদু?..ঐ নভেল তো তোমার পড়া?

—তাতে কী হয়েছে? আবার শুনব। একটু চেঁচিয়ে পড়বি। এই সাহেবটা অসভ্য। ও ইন্ডিয়ান-হেটার। ওকে আমি ডিসটার্ব করব। আই ওনট স্পেয়ার হিম।

—কোন্ জায়গাটা পড়ব দাদু?

—কোন জায়গাটা... কোন্ জায়গাটা...?—নীরদবরণ কয়েন মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন—আই লিভ দ্যাট চয়েস টু ইউ।

—মানে?

—'চোখের বালির' যে জায়গাটা পড়তে তোর ভাল লাগবে সেখানটাই পড়।

—বেশ। পড়ছি। শোনো...।

শুভ্রা আড়চোখে সাহেবের গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে বেশ উঁচু গলায় পড়তে লাগল:—

"হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শখ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিখিতে আবম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আর কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর—বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোখের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বললি, "আচ্ছা"।

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, "না"।

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর আগোচরে রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহ্নে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেন্দ্র সেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য সখীকে উপযুক্তরূপ জব্দ করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সেদিন তাহার চোখ ঢুলিয়া পড়িল। গায়ে একখানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এমনই সুন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, ঠিক মনে হইতেছে, যেন ছবি লইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।"

এই পর্যন্ত পড়ার পর শুভ্রা তাকাল দাদুর দিকে। মৌজসে পাইপ টানছেন নীরদবরণ। তাঁর দু চোখে ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক। তিনি মনে মনে আহ্লাদিত এটা ভেবে যে নাতনিকে তিনি যেভাবে তৈরি করতে চেয়েছেন সে ঠিক সেভাবেই তৈরি হয়েছে। তার সেন্স অব হিউমার যে এত প্রখর এবং যথাযথ হয়েছে তা আগে বোঝেননি তিনি। 'চোখের বালি' তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অসাধারণ উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসের যে জায়গাগুলো তাঁর খুব পছন্দের,

তাদের মধ্যে একটা হল এই অংশটি যেটা শুভ্রা এখনই পড়ল। এরপর আরেকটু আছে। সেখানে মজাটা আরও জমেছে। আশা এবং মহেন্দ্র জানে যে, বিনোদিনী ঘুমিয়ে আছে। তার অজান্তে বিনোদিনীর ফোটো তুলছে মহেন্দ্র। কিন্তু মজাটা হল এই যে, বিনোদিনীর কাছে আশা এবং মহেন্দ্রর এই চাল ধরা পড়ে গেছে। সবটাই অভিনয় করছে বিনোদিনী! সে জানে তার ঘুমিয়ে থাকার ফোটো মহেন্দ্রকে মুগ্ধ করবে। একজন পুরুষকে রূপজব্দ করার চাতুরি এটা বিধবা বিনোদিনীর। চিরন্তন লাস্যময়ী নারীকে রবীন্দ্রনাথ হাজির করেছেন এখানে কী অসাধারণ বর্ণনায়! এই তো হল আর্ট, শিল্প। এসব চকিতে ভাবলেন নীরদবরণ। সেই সঙ্গে এটা ভেবেও তাঁর বুকটা ভরে গেল যে শুভ্রা আর্টের সেই মাহাত্ম্য বুঝেছে। উপন্যাসের ঐ জায়গাটা তারও ভাল লেগেছে। শুভ্রার মন যে এভাবে তৈরি হয়েছে তার সব কৃতিত্ব তো নীরদবরণেরই। নিজের বাবা-মা এর কাছে শুভ্রা ছোটবেলা থেকে থাকলে, সেখানে মানুষ হলে কী তার মন শিল্পের সূক্ষ্মতাকে এত বুঝত? এরকম একটা সংবেদনশীল মন তৈরি হত কী শুভ্রার? ওর বয়সের গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের তো ওর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাদের হেঁসেল ঠেলতে হয়। বইপত্রের সঙ্গে তাদের তেমনি যোগই থাকে না। বাড়ির অন্দরমহলে দুপুরে বউ-ঝিদের মজলিশই হল তাদের একমাত্র বিনোদন। সেখানে পরনিন্দা, পরচর্চা, রান্নাবান্নার গালগল্প, প্রতিবেশীদের বাড়ির নানা কেচ্ছা-কাহিনি;—এসব চর্চা করেই তাদের, সেইসব ষোড়শী কিংবা সপ্তদশীদের দিন কাটে। এছাড়া সারাদিন হেঁসেলে কাটে তাদের। রাতে স্বামীর পাশে শুয়ে স্বামীর পিঠের ঘামাচি মেরে দিতে হয় বউদের। তারপর স্বামীর সম্ভোগের জন্যে নিজেদের অবাধে মেলে দিতে হয় বিছানায়।

এত লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে মেয়েটার? নীরদবরণের মাঝে মাঝে খুব আশঙ্কা হয়। একটু অন্যভাবে মানুষ করতে গিয়ে তিনি কী শুভ্রার ক্ষতিই করলেন? এই বয়সেই সে বড় স্বাধীনচেতা। নিজের পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই সে নভেল পড়ে কাটায়। ঘরকন্নার কাজ প্রায় কিছুই শেখেনি শুভ্রা। কিন্তু বিয়ে তো তাকে দিতেই হবে। সারাজীবন নীরদবরণও থাকবেন না। আর শুভ্রা অবিবাহিতও থাকতে পারবে না। তাহলে কী হবে? কীভাবে তার পাত্র খুঁজবেন নীরদবরণ? কোথায় খুঁজবেন? এসব নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয় নীরদবরণের। এবার কী শুভ্রাকে তার বাবা ও মা-এর কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত? ওদের মেয়ে ওরা যা ভাল বুঝবে করবে। বিশ্বদেবের ছাপোষা ও গেরস্থ সংসারে গিয়ে হয়তো প্রথম প্রথম শুভ্রার অসুবিধেই হবে। কিন্তু যত অসুবিধেই হোক, শেষমেশ সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের বাবা-মা-এর কাছে মেয়ে মানিয়ে নিতে পারবে না তো কোথায় পারবে।

—কী দাদু আর শুনবে না?

নীরদবরণের ভাবনা—জাল ছিঁড়ে যায়। পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে তিনি দ্রুত বলেন—হ্যাঁ। শুনব বইকি। এটা তো তুই ঐ নভেলটার থার্টিন চ্যাপ্টারের লাস্ট পার্ট পড়ছিস। আর কিছুটা পড়লে মজাটাও জমবে আর চ্যাপ্টারটাও শেষ হয়ে যাবে।... গো অন রিডিং...

—সাহেব কিন্তু খুব তাকাচ্ছে দাদু। ওর মুখটা দেখেছ? রাগে অগ্নিশিখা। আমার ভয় হচ্ছে শাপ-টাপ না দিয়ে দেয়।

—এই সাহেবটা আসলে খুব ভিতু বুঝলি সুবু। ও ভয় পেয়ে গেছে। আর কিছু বলবে না। শুধু নিজের মনে গজরাবে।

—ভয় পেয়ে গেছে কেন?

—ঐ যে একটা গুল মেরে দিলুম? যে ইস্টার্ন রেলওয়ের জি. এম. আমার খুব পরিচিত। আসলে কথাটা ঠিক বলিনি। জি. এম. এর সঙ্গে আমার কোনও চেনাশোনা নেই। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আছে। ম্যাকফারসন সাহেব। কিন্তু এই গুলেই কাজ হয়েছে। ও তো

জানে কো-প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে মিসবিহেভ করে ও ঠিক কাজ করেনি। তাই নিজেই এখন প্রেসারে আছে। আর তাছাড়া...। নীরদবরণ থামলেন। গোমড়া মুখ করে বসে থাকা সাহেবের দিকে তাকালেন।

—তা ছাড়া কী দাদু?—শুভ্রা জিজ্ঞেস করল।

—এতক্ষণে সাহেবও বুঝেছে যে আমিও একজন হোমরা-চোমরা কেউ কেটা লোক। তাই আমাকেও আর ঘাঁটাতে সাহস করছে না।

—তাহলে দাদু লাস্ট পার্টটা পড়ি?

—ইয়েস।

আড়চোখে সাহেবের দিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে শুভ্রা আবার পড়তে শুরু করল:—

"মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বিনোদিনীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা দিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন-কী, আর্টের খাতিরে, অতি সন্তর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল,—পছন্দ না হওয়ায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, "পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ দিকে সরাইয়া দাও।"

অপটু আশা কানে কানে কহিল, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব—তুমি সরাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্য ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি যেন কিসের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আশা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল—তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু দুইটি হইতে মহেন্দ্রর প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, 'ভারি অন্যায়।'..."

শুভ্রা থামল।

নীরদবরণ বলে উঠলেন—ওহ মার্ভেলাস!..কথাটা বলার পরই তাঁর খেয়াল হল ট্রেন একটা বড় স্টেশনে ঢুকছে। দুপাশের চওড়া প্লাটফর্মে অনেক লোকজন। ভেন্ডারদের চিৎকার চেঁচামেচি। ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘট্ আওয়াজ উঠছে ট্রেনের চাকা থেকে। ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে ট্রেন। শুভ্রা জিজ্ঞেস করেছিল-—এটা কোন স্টেশন এল দাদু?

—বর্ধমান।

মোটা সেই সাহেব তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠেছে নিজের আসন ছেড়ে। বাঙ্ক থেকে নিজের মালপত্র নামাতে হবে। কিন্তু সে তো নিজে নামাবে না। কুলি লাগবে। ছিটকিনি খুলে সে ওপেন করল দরজা। ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সাহেব ঘড়ঘড়ে সর্দি-বসা স্বরে ডাকতে লাগল—কোলি—অ্যায় কোলি...। একজন নয়। তিন-চারজন কুলি একসঙ্গে দৌড়ে এসেছিল। একজনের দিকে তর্জনি তুলে সাহেব হুকুম করল—কাম ইনসাইড। মুশকো চেহারার একজন কুলি লাফিয়ে উঠেছে কামরাতে। বাঙ্ক থেকে টেনে নামিয়েছে সাহেবের বিশাল ব্যাগ। ঘাড়ে চাপিয়ে নেমে যাচ্ছে। সাহেবও নামবে। ঠিক নামার মুহূর্তে সাহেব এগিয়ে এল নীরদবরণের সামনে। নীরদবরণ সোজা হয়ে বসলেন। আবার কী বলতে চায়? ইংরেজিতে খারাপ গালাগাল দিয়ে নেমে যাবে না তো? সেরকম হলে তিনিও ফিরতি গালাগাল দেবেন।

—ইয়েস?—ভুরু কুঁচকে নীরদবরণ সাহেবি কায়দাতেই তাকালেন।

—বাবু!—সাহেব বলল।—ইউ হ্যাভ ডিস্টার্বড মাই পিস অল অ্যালঙ দ্যা ওয়ে। ইউ উইল হ্যাভ আ ব্যাড ডে!

কথাটা বলেই সাহেব গট্‌গট্‌ করে নেমে গেল। নীরদবরণ হেসে উঠলেন হা হা করে। সাহেবের অস্পষ্ট উচ্চারণে কথাটা শুভ্রা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাকে বাংলায় তর্জমা করে কথাটা শোনালেন নীরদবরণ। শুভ্রাও হাসল হো হো করে। নীরদবরণ তারপর বলেছিলেন—খুব জব্দ করা গেছে ব্যাটা সাহেবটাকে। এবার খিদে পাচ্ছে। সুবু টিফিন-ক্যারিয়ার বের কর। আমরা এবার খাব।

শুভ্রা টাউস ব্যাগের পেট থেকে টিফিন-ক্যারিয়ার বের করল। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছিল। সেই ফার্স্ট ক্লাশ কামরাতে আর কেউ ওঠেনি। পাটিসাপটায় কামড় দিয়ে নীরদবরণ বলেছিলেন—এবার ট্রেন কর্ড লাইনে যাবে। কাটোয়া তো কর্ড লাইনেই পড়বে...।

নয়

সাহেবের অভিসম্পাত যে এভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ট্রেনজার্নিতেই ফলে যাবে তা ধারণাতেও ছিল না নীরদবরণের। কাটোয়া স্টেশনের কাছাকাছি এসেও ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছিল তা প্রায় আধ ঘণ্টা হতে চলল। শুভ্রা ছেলেমানুষ। তার তো অধৈর্য লাগবে। কিন্তু নীরদবরণেরও ধৈর্য প্রায় তলানির মুখে। কী ব্যাপার? লাইনে যদি একটা গরু কাটা পড়েই থাকে তাকে সরাতে এতক্ষণ লেগে যাবে? এখানকার স্টেশনমাস্টার তো বেশ অপদার্থ দেখা যাচ্ছে। শুভ্রার দিকে তাকালেন নীরদবরণ। তার মুখ হাঁড়ির মতন। হবেই তো। তেমন কোথাও যেতে পারে না মেয়েটা। বিয়ে বাড়িতে পৌঁছবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। সে আর ট্রেনে বসে থাকতে পারছে না। খিদে কি পেয়েছে ওর? বর্ধমান স্টেশনে যখন ট্রেন দাঁড়িয়েছিল, তখনই টিফিন ক্যারিয়ার থেকে যূথিকার গুছিয়ে দেওয়া খাবার বের করা হয়েছিল। অনেক খাবার ছিল। দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। হয়ত তিনজনের পক্ষেও। হাবুর মা-এর রান্নার হাত সত্যিই বেশ ভাল। যূথিকা পারেন না। তাঁর শরীর, তাঁর দুর্বলতা, মাঝে মাঝে হাঁফানির বাড়াবাড়ি তাঁকে কাহিল করে রেখেছে সর্বক্ষণ। তাই ইচ্ছে থাকলেও তার পক্ষে সম্ভব হয় না রান্নাঘরে গিয়ে হেঁসেল ঠেলার। কিন্তু সেটা না পারলেও আগাগোড়া রান্নাঘরের কাজকর্ম তিনি নিজের কর্তৃত্বের মধ্যে রেখেছেন। হাবুর মা রান্নার পদ যা যা তৈরি করে পুরোপুরি যূথিকার নির্দেশ মতোই করে। সকালে কী পদ বাঁধা হবে, রাতে কী রাঁধা হবে, জলখাবার কী হবে সব কিছু যূথিকার কাছ থেকে জেনে নেয় হাবুর মা। নীরদবরণ সংসারের মধ্যে তেমন জড়ান না বটে। কিন্তু খবর তাঁর কানে ঠিকই এসে যায়। যূথিকার কথাবার্তা থেকেই তিনি আঁচ করতে পারেন সব।

এই যে ট্রেন-জার্নির জন্যে নীরদবরণ ও তাঁর আদরের নাতনির জন্যে খাবার-দাবার এসেছে টিফিন ক্যারিয়ারে; এই সামান্য ব্যাপারেও যূথিকার একটা পরিকল্পনা ছিল। আর সামান্য ব্যাপার হবে কেন? যূথিকার কাছে এটা সামান্য ব্যাপার আদৌ নয়। নীরদবরণের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। নিজের স্বামীকে যূথিকা তাঁর ওপর নির্ভরশীল, করার ব্যাপারে কোনওদিনই তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। নীরদবরণ সারাজীবন নিজের খেয়ালেই চললেন। জীবনের বা সংসারের ব্যাপারে তাঁর যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজেরই। তাঁর একটা বাইরের জীবন আছে। সেই জীবনে নীরদবরণ হয়ত একটু বেহেসেবী, বেসামাল হতেও পছন্দ করেন। নীরদবরণের সেই বাইরের জীবনের বিশদ খোঁজ যূথিকা রাখেন না। কিছু জিজ্ঞেস করতে বা জানতে তাঁর সাহসে কুলোয় না। স্বামী অনেক শিক্ষিত। সাহেবদের মতো চলন-বলন। ইংরেজি বলতে পারেন ফরফর করে। সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করেন। সাহেবদের সঙ্গে তার ওঠাবসা। তা তিনি মদ-টদ তো একটু খাবেনই। কাজের খাতিরে তাঁকে মাঝে মাঝে বাইরে রাত তো কাটাতে হতেই পারে। যূথিকা এসব মেনে নিয়েছেন।

নীরদবরণের বাইরের জীবন নিয়ে কোনও কথা বলতে বা জিজ্ঞেস করতে তাঁর সাহস হয়নি কোনওদিন।

নীরদবরণ বাইরে, লং জার্নিতে তেমন কিছু খেতে পছন্দ করেন না। এটা যূথিকা ভালই জানেন। তিনি খাবার পাঠিয়েছেন নাতনির কথা ভেবে। আহা কচি মেয়ে! উঠতি বয়স। শরীর বাড়ছে। যৌবনের নানা উপহারে ক্রমশ সুন্দর হয়ে উঠছে মেয়েটার শরীর! এখন ঘন ঘন খিদে পায়। নিজেরও তো এই বয়সটা ছিল। কিশোরী তো তিনিও ছিলেন একদিন। তিনি জানেন এইসময় একজন কিশোরীর শরীরে কী সব অসম্ভব পরিবর্তন আসে। আর তাছাড়া সাধের নাতনির একটু খাই-খাই বাইও আছে। সোয়াদ সোহাগী মেয়ে। এটা ওটা খেতে পছন্দ করে সে। তাই যূথিকা হাবুর মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন টিফিন ক্যারিয়ারের মোট চারটি বাক্সে কী কী খাবার দিতে হবে।

এত খাবার দিয়েছে কেন যূথিকা? নীরদবরণ অবাক হয়েছিলেন। এই তো ক-ঘণ্টার জার্নি। হাওড়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত মেন লাইন। তারপর কর্ড লাইন। সেই কর্ড লাইনে পড়ে গেলে ট্রেনটা আর বেশি দাড়ায় না। হু হু করে যায়। অবশ্য দাঁড়িয়ে যে পড়ে না তা নয়। তবে স্টেশনে দাঁড়ায় না। সিগন্যাল ক্লিয়ার না পেলে দাঁড়ায়। যেমন এখনই তা ঘটেছে। কাটোয়া স্টেশনের কাছাকাছি এসেও ট্রেন ঢুকতে পারেনি গন্তব্যে। দাঁড়িয়ে আছে। সামনে লাইনে গরু কাটা পড়েছে। সেই লাশ না সরলে ট্রেন যাবে কী করে?

খাবার ছিল নানারকম। লোভনীয়। লুচি, আলুব দম, মাছের চপ আর পাটি সাপটা। লুচি ও আলুর দম নীরদবরণের প্রিয় খাবার। আর নাতনি ভক্ত পাটিসাপটার। মাছের চপ বস্তুটা কমন। ওটা অ্যালজেব্রার এক্স। দাদু ও নাতনি দুজনেই ভাল খায়। সেই বুড়ো, রগচটা সাহেবকে চটিয়ে দেবার জন্যে বেশ বকবক করতে হয়েছে নীরদবরণকে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে খিদে পেয়েছে। সচরাচর বাইরে খাওয়া পছন্দের নয় নীরদবরণের। কিন্তু আজ তিনি নাতনির পাল্লায় পড়েই হয়তো চলন্ত ট্রেনে টুকটাক ভালই সাঁটালেন। লুচি খেলেন দুটো। কিছুটা আলুরদম। মাছের চপও দুটো। দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তু বলতে তিনি ছানা এবং ক্ষীর পছন্দ করেন। ছানায় তিনি চিনি মিশিয়ে খান না। আর ক্ষীরে থাকে অল্প চিনি। যেটুকু না হলে নয়। যূথিকা এসব জানেন। হাবুর মাকে সেরকমই নির্দেশ দেন। আসলে চিনি নীরদবরণ ইচ্ছে করেই কম খান। এটা উইলিয়মস ম্যাকেঞ্জি সাইকেল কোম্পানির অন্যতম অংশীদার ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পরামর্শ।...বাবু ডোন্ট টেক মাচ সুগার; ইট ইজ নট গুড ফর হেলথ। টু মাচ সুগার মে কজ ডায়াবেটিস হুইচ ইজ ভেরি ডিসটার্বিং।...ম্যাকেঞ্জির এই পরামর্শ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন নীরদবরণ। ডায়াবেটিসে তাঁর বড় ভয়। ঐ রোগটা খুব পাজি। অবশ্য একটা বাঁচোয়া। তিনি কিঞ্চিৎ পড়াশোনা করে জেনেছেন যে, ঐ মধুমেহ রোগটি নাকি হেরিডিটারি। বংশানুক্রমিক ভাবে আসে। তিনি জানেন, তাঁর বংশের কারোরই ডায়াবেটিস ছিল না। তবে সুগার তো নানাভাবে শরীরে যায় তাই না? মদ্যপান করেন তিনি। অ্যালকোহলেও তো সুগার আছে কিছুটা? ...ম্যাকেঞ্জি- সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

৬টা পাটিসাপটা সব শুভ্রাকে একাই খেতে হল। তাতে সে অবশ্য খুশি। অতগুলো পাটিসাপটা খাওয়ার ফল যেটা হল লুচি, আলুর দম এবং মাছের চাপ বেশ কিছু পড়ে রইল। অনেক খাবার দিয়েছে দিদু। এত কেউ দেয়?

—দাদু তুমি আর কয়েকটা লুচি আর চপ নাও?

—না রে ভাই। আর কিছু খাব না। শুধু...থেমেছিলেন নীরদবরণ।

—কী দাদু?

—তোর দিদু সব দিয়েছে। শুধু আর একটা জিনিস দিলে ভাল করত। সেটা কী বল তো?

—ফ্লাস্কে একটু চা। খাবারগুলো খেয়ে এখন মনটা একটু চা-চা করছে।

—চা তো বর্ধমানে বিক্রি হচ্ছিল। আমি দেখেছি দাদু। খাকি হাফ-প্যান্ট আর শার্ট পরা একজন লোক হাতে একটা বড় কেটলি নিয়ে হাঁকছিল—চা-চা চা!...টি বাবু টি? তো বর্ধমান কখন পেরিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ। রেল কোম্পানির হকার। ঐ খাকি পোশাকটা লোকটা রেল কোম্পানি থেকেই পেয়েছে।

—রেল কোম্পানিতে হকারের চাকরিও পাওয়া যায়?

—আরে নাহ।—নীরদবরণ হেসেছিলেন।—হকার বলে কোনও পোস্ট নেই রেল কোম্পানিতে। আসলে রেল কোম্পানি প্রতি বছর টেন্ডার ডাকে। টেন্ডার বুঝিস?

—ঠিক বুঝিনা।

—আচ্ছা পরে বুঝিয়ে দেব। শুধু একটা কথাই জেনে রাখ। বড় বড় স্টেশনে কিংবা জংশনে যেখানে ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, সেখানে প্লাটফর্মে কারা চা বিক্রি করবে, কারা হোটেলে ভাত তরকারি মাছ.মাংস বিক্রি করবে এসব ব্যাপারে প্রতি বছর রেল কোম্পানি প্রাইস ইনভাইট করে। যারা কম প্রাইস বা দর দেয় কিন্তু খাবার দাবার এবং চা ভাল কোয়ালিটির দেবে এটা প্রমিস করে তারাই স্টেশনে স্টেশনের প্লাটফর্মে চা বিক্রি করে, কেটারিং-এর বিজনেস করে। সেইসব হকারদের ইউনিফর্মটা রেল কোম্পানি সাপ্লাই দেয় যাতে ভিড়ের মাঝে তাদের ইজিলি আইডেনটিফাই করা যায়।

—ও। এতক্ষণে কিছুটা বুঝলাম।...তা ট্রেন তো এখন চলছে। চা আর কীভাবে পাওয়া যাবে?

—আর পাওয়া যাবে না। তাছাড়া হকারের চা আমি তেমন লাইক করি না। এবার একেবারে অপরেশের বাড়ি গিয়ে উই উইল টেক টি...।

এভাবে কথা বলতে বলতে কখন সময় বয়ে যাচ্ছিল। তারপর কাটোয়া স্টেশনের কাছাকাছি এসে সিগন্যালের রক্ত চোখ দেখে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন। তাদের অপেক্ষা করতে হল বহুক্ষণ।

লাইন ক্লিয়ার হয়েছে মনে হয়। একবার জোরসে সিটি দিল ট্রেন। ধোঁয়া একরাশ। তারপর ঘস্ ঘস্ ঘস্ চলতে শুরু করেছিল। নীরদবরণ বাইরে তাকিয়েছিলেন। বিকেলের রোদ পড়ে আসছে। চারপাশে যেন এক বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে। লাইনের দুধারে গভীর ঘাস—জমি। সরষে-ফুল। মফস্বলে কতকাল আসা হয় না। চোখ ভরে দেখাও হয় না এসব। অনেক দূরে দিগন্ত রেখা। মাটি আর আকাশ একাকার যেন। কাক উড়ছে। পাখিও উড়ছে নানারকম। নীরদবরণ বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। শুভ্রাও বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বেশ ভাল লাগছে। কতদিন পরে সে বাইরে বেরিয়েছে। বিয়েবাড়ি যাচ্ছে। সেখানে কতরকম আমোদ, হই-হুল্লোড়, মেয়েদের হরেক রকম সাজগোজ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। শুভ্রা সব উপভোগ করতে চায়। কখন বিয়ে-বাড়ি পৌঁছবে এটা নিয়ে সে ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজিত।

আর নীরদবরণ ভাবছিলেন, কাটোয়ার অপরেশের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই তিনি জানেন। এই গরমে তাঁদের বেশ অসুবিধে হওয়ারই কথা। বিশেষত সুবুর। সে বরাবর ইলেকট্রিক বাতিতে অভ্যস্ত। ফ্যানের বাতাস ছাড়া তার ঘুম আসে না। তারপর অপরেশের বাড়িতে থাকা এবং শোয়ার ব্যবস্থা কীরকম কে জানে। ন্যূনতম আরাম ছাড়া নীরদবরণেরও বেশ অসুবিধে। তবে তিনি নিজের কথা তেমন ভাবছিলেন না। দুটো রাত হই-হট্টগোলে যাহোক করে কেটে যাবে হয়তো। বিয়েবাড়িতে অপরেশের একজন হোমরাচোমরা বন্ধু হিসেবে তাঁরও তো কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। বরযাত্রীদের এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কেমন করা আছে সেটা দেখে নিতে হবে। নীরদবরণ মনে মনে ঠিক করেছেন তিনি ভিয়েনের এবং ভাঁড়ার ঘরের

দায়িত্ব নেবেন। বিয়েবাড়িতে মনে হয় ওটাই সব থেকে বড় দায়িত্ব। সুযোগ পেলেই হালুইকর চুরি করে, যারা পরিবেশনকারী তারাও অনেকসময় খাবার দাবার সরায়। ফলে অনেক সময় নিমন্ত্রিতদের খাবার-দাবার কম পড়ে যায়। যে গৃহস্থের বাড়ির কাজ সে লজ্জায় পড়ে। সুতরাং ভাঁড়ারের দায়িত্ব নীরদবরণ নেবেন। অপরেশ তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। একসময়ের প্রিয় বন্ধু। সে যাতে কোনও কারণে অতিথি অভ্যাগতদের সামনে অস্বস্তিকর অবস্থায় না পড়ে সেটা দেখার দায়িত্ব নীরদবরণ স্বেচ্ছায় নেবেন। তবে মনে হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটির অভাবে নাতনির কয়েকদিন এখানে কাটাতে অসুবিধে হবে। তা কী আর করা যাবে? সবরকম অবস্থার সঙ্গে তো মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে? ধর সুবুর, বিয়ে হল কোনও গাঁয়েই। হয়তো বর্ধিষ্ণু ঘর। কিন্তু গাঁয়েই। সেখানে বিদ্যুৎ তো থাকবে না। পরমুহূর্তেই তিনি ভাবলেন, তা কেন, আদরের নাতনির বিয়ে তিনি দেবেন কলকাতা শহরে। ওরকম ইংরেজি-পড়া মেয়ে কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও মানিয়ে নিতে পারবে না।

—দাদু আমরা এসে গেছি?—শুভ্রা বলল।

—তাই তো দেখছি।—নীরদবরণ বললেন।—এবার নামতে হবে। এই তো কাটোয়া। তিনি উঠে কামরার দরজা খুললেন। এখানে ধারে কাছে কুলি দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ঢাউস ব্যাগটা কি নিজেকে নামাতে হবে? নীরদবরণ ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন।...অপরেশ বলেছিল যে স্টেশনে গাড়ি থাকবে। সম্ভবত মোটরই থাকবে। তার নিজের গাড়ি নেই। কিন্তু মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে স্থানীয় কোনও গাড়ি ভাড়া করবে সে। সেই গাড়িই নীরদবরণের আনতে পাঠিয়ে দেবে স্টেশনে। এসব বলেছিল অপরেশ। এখন মনে পড়ছে। প্রথমে অবশ্য ঠিক ছিল যে, নীরদবরণ, যূথিকা এবং শুভ্রা—তিনজনেই আসবে কাটোয়া। বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কিন্তু পরে পরিকল্পনা একটু পালটে গেছে। যূথিকার জ্বর, সঙ্গে বাতের ব্যথার বাড়াবাড়ি হওয়ায় নীরদবরণ আর শুভ্রার যাওয়াই ঠিক হয়েছিল। কাটোয়া মফস্বল জায়গা। ছোট্ট একটু শহরের মতন। তারপরই গ্রাম শুধু গ্রাম। অজ পাড়া-গাঁ। এখানে টেলিফোনের চল এখনও তেমন হয়নি। নীরদবরণের বাড়িতে একটা টেলিফোন থাকলে কী হবে, অপরেশের বাড়িতে তা নেই। ফলে নীরদবরণ টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা দুজনে কাটোয়া যাচ্ছেন অমুক তারিখে। কোন ট্রেনে যাচ্ছেন সেটাও জানিয়েছিলেন। অপরেশের তো স্টেশনে গাড়ি পাঠানোর কথা। সে গাড়ি পাঠিয়েছে তো? কিন্তু সেটা জানা যাবে কী করে যতক্ষণ না নীরদবরণরা প্লাটফর্ম এবং ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে আসতে পারছেন? নীরদবরণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই ঢাউস ব্যাগটা মালপত্রে বোঝাই হয়ে বেজায় ভারী হয়েছে। আসবার সময় অসুবিধে হয়নি। মেজছেলে বারিদবরণ একটা ট্যাক্সি ডেকে এনেছিল। আর ছোট ছেলে অসিতবরণ ব্যাগটা তুলে দিয়েছিল ট্যাক্সিতে। তারপর তো হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখেই কুলি মিলে গিয়েছিল।...ক্ষীরোদবরণকে বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে আসতে বলার কোনও কারণ নেই। সে নিজের নাটক-থেটার, যাত্রা-পালা এসব নিয়ে আছে। তাকে আসতে হলে তো আবার সস্ত্রীক আসতে হবে। অর্থাৎ বন্দনারও আসা উচিত। তাহলে বাড়িতে থাকবে কে? যূথিকার কাছে থাকবে কে? নীরদবরণ নিজেই যেখানে বাড়িতে থাকছেন না। অপরেশ কিন্তু নিমন্ত্রণ করতে এসে বারবার বলেছিল—সকলকে নিয়ে যেও ভাই। অপর্ণা তো তোমারও মেয়ের মতন। কিন্তু সকলকে নিয়ে আসা তো আর সম্ভব নয়।

ট্রেন তো এবার ছেড়ে দেবে। হুইসিল শোনা যাচ্ছে। এখানে একটু বেশি দাঁড়ায় ট্রেন। মিনিট পাঁচ। নীরদবরণ এসব জানেন। শুভ্রা-জিজ্ঞেস করল—নামবে না দাদু?

—নামব তো। কিন্তু এমন নচ্ছার জায়গা। একটা কুলি নেই। অত ভারি ব্যাগটা এখন টেনে নামাই কী করে বল দিকি?

—আমি নামাচ্ছি।

—তুই নামাবি? পারবি? ভীষণ ভারী হয়েছে ব্যাগ।

—কেন পারব না? তুমি আমাকে কী ভাব?—নীরদবরণ অবাক হযে দেখলেন শুভ্রা এক হেঁচকা টানে অতবড ব্যাগটা বাঙ্ক থেকে নামাল। তারপর ঠিক কুলির কায়দাতে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে হেসে বলল—এসো দাদু—ফলো মি—। বাব্বা! নীরদবরণ ভাবলেন। শুভ্রা তো বেশ তৈরি হয়েছে। যে কোনো অবস্থাতেই বেশ মানিয়ে নিতে পারে। অত ভারী ব্যাগটা নামিয়ে নিল! কুলি-টুলির পরোয়া করল না।

ঢাউস ব্যাগ কাঁধে শুভ্রা আগে আগে যাচ্ছে। নীবদবরণ তার ঠিক পেছনে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি জানেন সামনের ঐ ওভারব্রিজে উঠতে হবে। ওপারে নেমে তারপর স্টেশনের বাইরে যাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ ঢাউস ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সুবুকে কি ওভারব্রিজে উঠতে হবে? নাহ, সে বড় ধকল হয়ে যাবে মেয়েটার ওপর। কিন্তু অপরেশের কান্ডটা কী? সে তো প্লাটফর্ম পর্যন্ত একজন কাউকে পাঠাবে। ব্যাটা এখনও সেই কলেজ-জীবনের মতোই গাড়ল রয়ে গেল। বুদ্ধি শুদ্ধি আর হল না।

—সুবু—একটু ধীরে চল মা। অতবড় ব্যাগ নিয়ে তো তোর রাস্তাঘাটে বেরোনো অব্যেস নেই। শেষকালে প্লাটফর্মের মোরাম আর সুরকির ওপর হোঁচট খেয়ে পড়বি? শুভ্রা উত্তর দিল—কোনও চিন্তা কোরো না দাদু। আমি ঠিক যাচ্ছি। স্টেশনে তো ওরা গাড়ি পাঠাবে, তাই না?

—হ্যাঁ। তাই তো পাঠাবার কথা। স্টেশনের বাইরে না গেলে তো ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।—চিন্তিতমুখে নীরদবরণ বললেন। তারপর দেখলেন, দুজন মানুষ দ্রুত পায়ে হেঁটে তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। একজনের বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক। আর তার একটু পেছনে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরনে লোকটাকে দেখে বাড়ির কাজের লোক মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটি নীরদবরণের সামনে এসে হাতজোড় করে বলল— নমস্কার। আমি অপরেশ চক্কোতির ভাই। সমরেশ...!

দশ

নীরদবরণ তাকিয়ে দেখলেন। অপরেশের মতোই মাঝারি উচ্চতা। মুখের আদলও অনেকটা অপরেশের মতন। দেখে মনে হল, বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। অপরেশের মুখে শুনেছিলেন বটে তারা তিন'ভাই। এক ভাই তো বাইরে থাকে। সেটি অপরেশের দ্বিতীয় ভাই। এ তাহলে ছোট। নাম বলল সমরেশ। অপরেশ যে মনে ক'রে, মেয়ের বিয়ের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও, নিজের ছোট ভাইকে স্টেশনে পাঠিয়েছে তাঁদের রিসিভ করতে এটা ভাল লাগল নীরদবরণের।

—ভাল হল। আপনারা এসেছেন।—নীরদবরণ বললেন।—আমরা তো ভাবছিলুম রাস্তা তো চিনি না। কীভাবে যাব....।

—নাহ। আমি এসেছি গাড়ি নিয়ে। দাদা নিজেই আসতেন। কিন্তু বুঝতেই পারছেন...সমরেশ ইঙ্গিতপূর্ণ হাসল।

—সে আব বুঝব না? আমারও তো মেয়ে আছে। আমি তাদের বিয়ে দিয়েছি। দুই মেয়ে। একজনের বিয়ে দিয়েছি যোলো বছর আগে। আর এক জনের চোদ্দো বছর আগে। অতএব আমি জানি মেয়েব বিয়ের দিন কিংবা বিয়ের আগের দিন মেয়ের বাপের কী ধরনের ব্যস্ততা

থাকে। ও. কে. লেটস গো।...কোন্‌দিকে যেতে হবে? ওভারব্রিজ পেরোতে হবে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐটুকু কষ্ট করতে হবে। ওভারব্রিজ পেরোলেই স্টেশনের বাইরে যাওয়া যাবে। সেখানে গাড়ি রাখা আছে। হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছিল সবাই। লুঙ্গি ও শার্ট পরনে লোকটি ইতিমধ্যে সমরেশের চোখের ইঙ্গিতে শুভ্রার হাত থেকে ঢাউস ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়েছে। সে বেশ হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে। বোঝা যায়, মালপত্র বইতে লোকটি বেশ অভ্যস্ত। সমরেশ, নীরদবরণ এবং শুভ্রা সমান্তরাল ভাবে পাশপাশি হাঁটছে। শুভ্রা তাকিয়ে দেখছে স্টেশনের চারপাশ। যতদূর চোখ যায় দূরে ধানজমির অবাধ বিস্তার। এখনও অবশ্য জমির পর জমি শূন্য, খাঁ খাঁ করছে। বৈশাখ মাস এটা। চাষবাসের সিজন নয়। কিন্তু আর দু-তিন মাস পর থেকেই, বর্ষা যখন নামবে, এসব জমি ভরে যাবে সবুজ ধানগাছে। হাওড়ার বাড়ি থেকে অনেকদিন বাদে কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছে শুভ্রা। সে দু-চোখ ভরে তাকিয়ে সব দেখছিল। এখানে আকাশ কত বিশাল মনে হচ্ছিল। অনেক দূরে দিগন্তরেখা। সূর্যের বিভা বিদায় নিতে চলেছে আজকের মতো পৃথিবী থেকে। শুধু তার রেশটুকু যেন এখনও ক্ষীণভাবে জেগে আছে মেঘেদের প্রান্তে। চাপা রক্তাভ আলোর বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে আছে আকাশে আকাশে। স্টেশনের দুপাশের প্লাটফর্মেই বেশ গাছগাছালির ভিড়। পাখিদেরও ঘরে ফেরার, নিশ্চুপ হয়ে যাবার সময় এখন। তাই বোধহয় তারা আজকের জন্যে শেষবারের মতো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, ঝগড়া সেরে নিচ্ছে। সত্যিই পাখির কলকাকলিতে ভরে আছে চার পাশ। সে দেখল সামনের গাছে অজস্র টিয়ার ঝাঁক। এত টিয়া একসঙ্গে কোনওদিনই বোধহয় দেখতে পায়নি শুভ্রা। সে উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল—বাহ কত টিয়া! দাদু দ্যাখো? নীরদবরণ আর সমরেশ নিজেদের মধ্যে টুকটাক কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। শুভ্রার ডাকে নীরদবরণও তাকালেন সামনের গাছটার দিকে। সত্যিই একঝাঁক টিয়া। এত টিয়া একসঙ্গে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। নীরদরণেরও হঠাৎ বেশ ভাল লাগার অনুভূতি হল। তিনি পুরোপুরি একজন নাগরিক মানসিকতার মানুষ। হাওড়ার ঘিঞ্জি শহর আর ঝাঁ-চকচকে, আলো-ঝলমলে, ফিরিঙ্গি অধ্যুষিত পার্ক স্ট্রিট, এই তাঁর দৈনন্দিন যাতায়াতের সীমানা। মাঝে মাঝে কোম্পানির কাজ পড়লে যখন বাইরে যেতে হয় তাঁকে সেটাও তো সেই অন্য কোনও বড় শহরে যান। দিল্লিই যেতে হয় বেশির ভাগ সময়। কালে ভদ্রে-বোম্বাই কিংবা বাঙ্গালোর। সত্যিই মফস্বলে আসা হল অনেকদিন পর। উদোম এবং খোলামেলা প্রকৃতির কাছে আসা হল অনেক, অনেকদিন পর। তাঁরও বেশ ভাল লাগছিল। সামনের নাম-না-জানা গাছটার পাতার ভিড়ে ঝাঁক ঝাঁক টিয়ার উজ্জ্বল-সবুজ বিচ্ছুরণ দেখে নীরদবরণও অস্ফুটে বললেন—বাহ! রিয়েলি স্প্লেনডিড!

সমরেশ জানাল—আমাদের কাটোয়াতে কিন্তু টিয়ার ঝাঁক একটু বেশিই দেখা যায়।

—একটা টিয়াপাখি নিয়ে যাওয়া যাবে কাকু?

--টিয়াপাখি? নিয়ে যেতে চাও?...হ্যাঁ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমরেশ বলল।

—দূর! তুমি ছাড়ো তো?—নীরদবরণ হাসলেন। বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসে ও টিয়াপাখি নিয়ে যাবে? তুমি কি পাগল হয়েছ?

—যদি নিয়ে যেতে সত্যিই চায় ব্যবস্থা করা যেতে পারে।—হেসে বলল সমরেশ।—ঐ তো নিতাই আছে। ও কাজ করে আমাদের বাড়িতে। আবার চাষবাসের সময় মুনিষও খাটে। ওকে বললেই হল। একটা টিয়াপাখি ঠিক ধরে ফেলবে। খাঁচাও বানিয়ে দেবে একটা। তারপর ট্রেনে যাবার সময় আপনারা সেটা কলকাতায় নিয়ে যাবেন। সমরেশ হাঁটতে হাঁটতে বলল। শুভ্রা খুশি হয়ে বলল—আপনি ঠিক বলেছেন কাকু। তাহলে আমার সঙ্গে কথা রইল। যখন আমরা ফিরে যাব তখন একটা খাঁচাতে টিয়াও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে?

সমরেশ হেসে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবেখন। নীরদবরণ কিছু বললেন না। সমরেশ

আর শুভ্রার মধ্যে কী কথা হচ্ছে সেদিকে যেন এই মুহূর্তে তাঁর ঠিক মন নেই। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তাঁর কপালে ফুটে উঠেছে কয়েকটা রেখা। একটু দূরে ওভারব্রিজের ঠিক সামনে এক ঝাঁক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে কেন? বেশ কয়েকজন লাল পাগড়ির সমাবেশ। ব্যাপারটা কী? সমরেশকে নীরদবরণ কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ওপাশে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মালগাড়ি আচমকা ভুস্ ভুস্ ভুস্ ভুস্ শব্দ তুলে রাশি রাশি গাঢ় কালো ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। তারপর শম্বুক গতিতে চলতে শুরু করল। মালগাড়ির দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ক্রমশ কমে এলে নীরদবরণ ভুরু কুঁচকে সমরেশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এত পুলিশ দেখছি সামনে! কী ব্যাপার?...শুভ্রাও দেখল তাকিয়ে। সত্যিই তো? এত পুলিশ কেন? খাকি হাফপ্যান্ট, সাদা ইউনিফর্ম আর লাল পাগড়ির পুলিশগুলোকে দেখলেই শুভ্রার হৃৎকম্প হয়। এখানে কী হয়েছে? খুন? না ডাকাতি? কাকে ধরার জন্যে এখানে ওত পেতে আছে পুলিশ? হাঁটতে হাঁটতে ওরা ওভারব্রিজের প্রায় সামনেই চলে এসেছিল। সমরেশ কী যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। সামনেই বোধহয় একজন অফিসার। গোলগাল, ভুঁড়িসর্বস্ব ইউনিফর্ম পরনে লোকটার দিকে তাকালেন নীরদবরণ। তিনি বুঝেছেন। এই লোকটা অফিসার। সাব-ইনসপেকটার কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনসপেকটরও হতে পারে। এখানকার থানার অফিসার ইন-চার্জ হয়ত এই লোকটাই। ওর নেভি-ব্লু টুপি আর কাঁধে পোশাকে আঁটা স্টার চিহ্ন দেখেই নীরদবরণের অভিজ্ঞ চোখ বুঝেছে লোকটা অফিসার। কাটোয়ার মতন মফস্বলি এবং ম্যাড়মেড়ে স্টেশনে কোট-প্যান্ট-টাই সজ্জিত রাশভারী চেহারার একজন প্রবীণ মানুষ ও তার সঙ্গে শহুরে বেশভূষার এক কিশোরীকে দেখে পুলিশ অফিসারের ভুরু কুঁচকে গেল। এরা বোধহয় কলকাতা থেকে আসছে। কাটোয়ার বাসিন্দা তো নয়। পুলিশ-অফিসার নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—একটু দাঁড়িয়ে যাবেন স্যার। দু-একটা কোয়েশ্চেন ছিল।

নীরদবরণরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। গা-পিত্তি জ্বলে গেল নীরদবরণের। তাঁদের প্রশ্ন করার কী আছে? তাঁরা কি চোর-ডাকাত নাকি? রেগেমেগে তিনি বোধহয় সেরকমই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমরেশ বলল—স্যার আমি অপরেশ মুখার্জির ভাই। আমাদের বাড়ি আগামিকাল একটা ম্যারেজ সেরিমনি আছে। এঁরা আমাদের ইনভাইটেড গেস্টস।

—অপরেশ মুখুজ্যের মেয়ের বিয়ে? ও হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিনই তো অপরেশবাবু থানায় এসেছিলেন ইনভাইট করতে। ঠিক আছে আপনারা যান। কিছু মনে করবেন না স্যার। শেষের বাক্যটি নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বলা। নীরদবরণের বেশভূষা, হাঁটাচলার ভঙ্গি আর ব্যক্তিত্বের আভাস পেয়ে পুলিশ অফিসার বুঝে গেছে তিনি একজন কেউ কেটা। নীরদবরণের রাগও গলে জল। তিনজনে ওভারব্রিজে উঠছেন। ভাঙাচোরা সিঁড়িগুলো তাকিয়ে দেখে সাবধানে উঠতে উঠতে নীরদবরণ আবার জিজ্ঞেস করলেন সমরেশকে, এত পুলিশ কেন সেটা তো বললে না? কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে?...ওপাশ থেকে দুজন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। তারা স্টেশনে যাবে। তদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সমরেশ। তারা নীরদবরণদের পেরিয়ে নীচের দিকে আরও নেমে গেলে সমরেশ চাপা স্বরে জানাল—আজ দুপুরের দিকে কাটোয়া শহরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে।

—ডাকাতি হয়েছে?—নীরদবরণ কৌতূহলি হলেন।

—হ্যাঁ। স্বদেশিদের কাজ।

—তাই নাকি?...দোজ প্যাট্রিয়টস! দে হ্যাভ স্ট্রাক এগেইন?

—হাঁ। বেশ কয়েক হাজার টাকা লুঠ হয়েছে।

—স্বদেশিরা আজকাল চারদিকে খুব গোলমাল পাকাচ্ছে। তাই না দাদু? —শুভ্রা বলল।

—চুপ। ওভাবে বলতে নেই।—সমরেশ সতর্ক করল শুভ্রাকে। — কে কোথায় আছে শুনে ফেলবে। স্বদেশিদের চর চারদিকে ওত পেতে আছে...।

এগারো

স্টেশনের বাইরে এসে নীরদবরণ আশ্বস্ত হলেন। একটা অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অপরেশ কাটোয়াতে তাঁর সাহেববন্ধুর অভ্যর্থনার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। স্টেশনে তাঁদের রিসিভ করার জন্যে নিজে আসতে পারেননি, আসা হয়তো সম্ভবও ছিল না। নিজের মেয়ের বিয়ে। কত রকম চিন্তা। দুশ্চিন্তাও থাকে। কত দিকে নজর রাখতে হয়। মাথায় কত ধরনের হিসেব ঘোরে। তার মধ্যেও ঠিক খেয়াল করে নিজের সহোদর ভাইকেই শুধু পাঠাননি। একটা গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নীরদবরণের অভিজ্ঞ চোখ অবশ্য বুঝল যে গাড়িটা বেশ পুরনো। বডিটা ধুলোয় ধূসরিত। হবেই তো। মফস্বলের ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত আসতে প্রচুর ধুলো খেতে হয়েছে নিশ্চয়ই গাড়িটাকে। এক মুহূর্ত তাঁর হাসি পেল। গোয়েন্দা শার্লক হোমসের কথা মনে পড়ল। কোনও ব্যক্তির হাতের লাঠির গড়ন দেখে ঐ গোয়েন্দা প্রবর বলে দিতে পারেন যে, সে কোথায় থাকে; শহরে না মফস্বলে। এরকম খুঁটিনাটি সূত্র থেকে অনেক বড় রহস্যের সমাধান করতে পারেন হোমস। নীরদবরণ এখানে গোয়েন্দার কাজ করতে আসেননি। বিয়ের নেমতন্ন খেতে এসেছেন। কিন্তু এখন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই গাড়িটার সর্বাঙ্গে ধুলোর বহর দেখে তিনি অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারছেন, যে রাস্তা কিংবা সড়ক ধরে, এই গাড়ির যাত্রী হয়ে, তাঁদের বন্ধুর বাড়ি পৌঁছতে হবে; সেই সড়কের অবস্থা কেমন। নিশ্চয়ই খানা-খন্দে ভরা। আর পিচও রাস্তায় নাও থাকতে পারে। হয়তো এখনও মাটির রাস্তাই আছে। পিচ দেওয়া হয়নি। তাহলে তো হয়ে গেল। নিজের ধোপধুরস্ত সুটের অবস্থা কী হবে তা অনুমান করে মনে মনে বেশ আতঙ্কিত হচ্ছিলেন নীরদবরণ। আবার মুশকিলটা হল তিনি যে পোশাক পরে এসেছেন তাতেই ফিরে যাবেন কলকাতা। যখন ফিরবেন, যূথিকা এবং অন্যেরা তাঁকে চিনতে পারবে তো?

—গাড়িতে উঠে পড়ুন আপনারা।—সমরেশ বলল।

—এটা কি তোমাদের মানে অপরেশেরই গাড়ি?

—আজ্ঞে না। এটা লোকাল গাড়ি। ভাড়াটাড়া খাটে। বিয়ে বাড়ির জন্যে দুদিনের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়েছে।—ও...।

এই গাড়ির পরিসর এত অল্প যে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে আলাদা ডিকি জাতীয় কিছু নেই। সাধারণত এই গাড়ির চালে মালপত্র দড়ি দিয়ে ভালভাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়াই রীতি। গাড়ির চালক হল ধুতি আর শার্ট পরনে রোগা চেহারা একজন মাঝবয়সী মানুষ। সমরেশ তার দিকে এবং মুনিষটার দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বলল—এঁদের লাগেজটা দুজনে মিলে গাড়ির চালে বেঁধে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি যেতেও হবে। দাদা চিন্তায় থাকবে। কথাটা শুনেই নীরদবরণ আঁতকে উঠলেন। বললেন—গাড়ির হুডের ওপর ঐ ব্যাগ বাঁধবে নাকি? না না। সেটা করা যাবে না। ধুলোতে ধুলো হয়ে যাবে সবকিছু। ওতে আর হাত দেওয়াই যাবে না। আমার আবার ধুলোতে ভীষণ অ্যালার্জি। সমরেশ চিন্তায় পড়ে গেল। সে বলল—আমাদের এখানে গাড়িতে মালপত্র তো এভাবেই যায়।

—সে যেতে পারে।—নীরদবরণ বললেন।—কিন্তু আমার লাগেজ ওভাবে যাবে না।

—তাহলে কী ভাবে যাবে স্যার?—চালক ফস্ করে প্রশ্ন ছুড়ল। নীরদবরণ তার দিকে একবার রাগী চোখে তাকালেন। লোকটা ভীষণ অভদ্র তো? তাঁর আর সমরেশের কথার মধ্যে কথা বলছে। তিনি সমরেশের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—আমি গাড়িতে বসার পর এই ব্যাগ আমার কোলের ওপর থাকবে।

—তাতে আপনার অসুবিধে হবে না দাদা? দেখে তো মনে হচ্ছে ব্যাগে অনেক মালপত্র আছে। বেশ ভারী।—সমরেশ বলল।

—কিছু অসুবিধে হবে না। কতক্ষণের রাস্তা?

—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক।

—আমি তো তোমার পাশেই বসব। ব্যাগটা তোমার আর আমার দুজনের কোলেই থাকবে দাদু। তাহলে অসুবিধে হবে না। শুভ্রা বলল।

—হ্যাঁ দ্যাটস আ গুড সাজেশান।—বললেন নীরদববণ।

সেভাবেই বসা হল। গাড়ির পেছনের সিটে শুভ্রা, নীরদবরণ আর সমরেশ। তিনজন অনায়াসে বসতে পারে এই গাড়ির পেছনেব সিটে। অসুবিধে হবার কথা নয়। ব্যাগটার কিছুটা অংশ নীরদবরণের কোলে। আর কিছুটা অংশ শুভ্রার কোলে। ব্যাগটা যে বেজায় ভারী তা দুজনকেই টের পেতে হচ্ছিল। আর নীরদবরণের হাতে যে একটা ছোট হাত-ব্যাগ ছিল যাতে তাঁর শেভিং সেট, শুভ্রার দু-একটা গয়না, পাইপ, তামাকের পাউচ ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে, সেটা সমরেশের হাতে দিয়েছেন নীরদবরণ। অপরেশের বাড়ি পৌঁছে খেয়াল করে ওটা আবার সমরেশের হাত থেকে নিয়ে নিলেই হল।

গাড়ি ভরর ভরর-ভরর হর্ন বাজিয়ে চলতে শুরু করেছে। এই হর্ন শুনলেই হাসি পায় নীরদবরণের। তাঁর মনে হয় ওটা তো হর্ন নয়। যেন ঘোড়ার কাশি। কিংবা কোনও বয়স্ক মানুষের ঘড়ঘড়ে, সর্দি-বসা গলার আর্তনাদ। গাড়ির দুপাশের জানলার কাচ নামানো। এদিক দিয়ে ধুলো ঢোকার তেমন সুযোগ নেই। কিন্তু সামনে চালকের ডানপাশের জানলা খোলা। সেখান দিয়ে মাঝে মাঝে দমকা বাতাসের ঝাপট যেমন নীরদবরণ অনুভব করছেন, তেমনই বিনবিন করে যে ধুলো ঢুকছে গাড়ির ভেতরে সেটাও বেশ বুঝতে পারছেন। আর সামনের আসনে চালকের পাশে, বাঁ-দিকে বসে আছে সমরেশ স্টেশনে যাকে সঙ্গে করে এনেছে সেই মুনিষ লোকটা। সেও পাশের জানলার কাচ নামিয়েই রেখেছে। ফলে সেখান দিয়েও ধুলো ঢুকবে চলন্ত গাড়ির ভেতরে। ইতিমধ্যে কখন যেন ঝপ্ করে অন্ধকার নেমে গেছে। রাস্তার দুপাশে তেমন কিছু দেখার নেই। দেখার উপায়ও নেই। শুভ্রা চুপচাপ বসে আছে। সমরেশও চুপচাপ। সবাই চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে গাড়ির সেই বিকট হর্ন। মানে ঘোড়ার কাশি। কথাবার্তা তো কিছু বলতে হবে। তাই নীরদবরণ শুরু করলেন—যে রাস্তা দিয়ে এখন গাড়ি চলছে সেটা ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা?

—সরকারি রাস্তা।—সমরেশ জানাল।—স্টেশন থেকে এই রাস্তা গেছে অনেকদূর। সেই পানাগড় পর্যন্ত।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাও আছে। গ্রামের ভেতরে। আমাদের বাড়ির কাছেও আছে। সেতো পুরোপুরি মাটির রাস্তা। আর আমরা এখন যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেটা তো পিচ-রাস্তা।

—মেনটেনান্স বোধহয় খুব খারাপ। যা ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে মনে হচ্ছে গর্ত আছে জায়গায় জায়গায়।

— সে তো হবেই।--সমবেশ বলল।—এই রাস্তায় লাস্ট কবে পিচ পড়েছে আমার অন্তত

খেয়াল নেই। গভমেন্টের এসব দিকে নজর আছে নাকি? ব্রিটিশ যতদিন আমাদের শাসন করবে ততদিন আমাদের ভাল থাকার কোনও সুযোগ বোধ হয় নেই।—সমরেশ মন্তব্য করল।

—কাকু আপনি টেররিস্টদের কথা কী যেন বলছিলেন? আজ বিকেলে এখানে কী একটা ঘটনা ঘটেছে?

—ইয়েস।—নীরদবরণের মনে পড়ল।—স্টেশনে অত পুলিশ দেখলুম। ব্যাঙ্ক-ডাকাতি না কী যেন বলছিলে?

—হ্যাঁ। আজ দুপুরের দিকে কাটোয়া বাজারের কাছে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। মনে হচ্ছে ডাকাতরা টেররিস্ট।

—কী ভাবে বোঝা গেল ডাকাতরা টেররিস্ট?—শুভ্রার প্রশ্ন।

—একটা ডিটেলসে বলো না শুনি?—নীরদবরণ বললেন। সেই মুহূর্তে গাড়ির চাকা বোধ হয় গর্তে পড়ল। বেশ ঝাঁকুনি খেতে হল আরোহীদের। একদিকে হেলে গেল গাড়ি। পরমুহূর্তেই অবশ্য চালক গিয়ারের পরিবর্তন করে সামলে নিল। গাড়ি আবার সোজা হল। যেমন ছুটছিল ছুটতে থাকল।

—ঘটনাটা তো আমার চোখের সামনে ঘটেনি। আমি অন্যের মুখে শুনেছি। যা শুনেছি তাই বলছি। বাজারের কাছে একটা ব্যাঙ্ক আছে। বেশ বড় ব্যাঙ্ক। ওখানে আমরাও টাকা-পয়সা রাখি। আজ দুপুরের দিকে তিনজন ছোকরা ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢোকে। ওরকম কত লোকই ব্যাঙ্কে আসছে আর যাচ্ছে। টাকা রাখছে। টাকা তুলছে। কে কাকে সন্দেহ করবে? তিনজনের মধ্যে একজন সোজা ক্যাশিয়ারের কাছে চলে যায়। টাকা-পয়সা তার কাছে আর লকারে যা আছে সব দিয়ে দিতে বলে। ভয় পেয়ে সেই ক্যাশিয়ার লোকটি চিৎকার করে ওঠে। তখন সবাই বুঝতে পারে ডাকাত পড়েছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং দু-চারজন কাস্টমারও ছুটে যায় কাশিয়ারের কাছে। হইচই বেধে যায়। তখনই তিনজনের একজন যুবক পাঞ্জাবির পকেট থেকে পিস্তল বের করে উঁচিয়ে ধরে। পিস্তল দেখে সবাই ঘাবড়ে যায়। কেউ আর এগোতে সাহস করে না। টাকা পয়সা, সিন্দুকে গচ্ছিত রাখা গয়না-গাটি যা হাতের কাছে পেয়েছে নিয়ে পালিয়েছে ওরা। যাবার সময় একজন পিস্তল থেকে একটা গুলি ছোঁড়ে...

—গুলি ছুঁড়েছে? কারোর লেগেছে?—শুভ্রা জানতে চাইল।

—নাহ। কারোর গায়ে গুলি লাগেনি। আকাশের দিকে ছুঁড়েছিল।

—বুঝেছি।...ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। ভয় দেখাবার জন্যে এটা একটা কায়দা। যাতে কেউ কাছাকাছি ঘেঁসতে না পারে। ওদের ধরতে না পারে।—নীরদবরণ মন্তব্য করলেন।

—তারপর ঐ ছোকরা তিনজন বন্দেমাতরম বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যায়।

—সেই কারণেই তাহলে স্টেশনে অত পুলিশ দেখলুম? এদিক দিয়ে কে আসছে, কে যাচ্ছে সব ওরা এখন তন্নতন্ন করে সার্চ করবে।—নীরদবরণ বললেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কারণেই। —সমরেশ সায় দিল।

আবার থেমে গেল আলোচনা। গাড়ি ছুটছে। চারপাশে ধুলোর গন্ধ অনভুব করছেন নীরদবরণ। তাঁর অনুভূতি শক্তি বড় প্রখর। আকাশে বোধহয় ফুটফুটে জ্যোৎস্না আছে। সেই জ্যোৎস্নার বিভা বাইরের চরাচরে ছড়িয়ে আছে। সামনের জানলা দিয়ে যতটা দেখা যায় দেখতে পাচ্ছেন নীরদবরণ। চুপচাপ যেতে যেতে তাঁর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। প্রায় দু-সপ্তাহ আগে অপরেশ নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন নীরদবরণকে। সেদিনটা ছিল রবিবার। নীরদবরণ বাড়িতেই ছিলেন। দুপুর নাগাদ অপরেশ গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। বহুদিন যোগাযোগ ছিল না অপরেশের সঙ্গে। কলেজের বন্ধু। গ্র্যাজুয়েট হবার পর নীরদবরণ সাইকেল কোম্পানির চাকরিতে ঢোকেন।

আর অপরেশ কাটোয়ার গ্রামে ফিরে যান। এক স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কলকাতায় চাকরি করে কাটোয়াতে বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল না নীরদবরণের পক্ষে। কিন্তু অপরেশ তাঁর দিক থেকে যোগাযোগ রাখতেন। মাঝে মাঝে কোনও কাজে কলকাতায় এলে দেখা করে যেতেন নীরদবরণের সঙ্গে। হয় তাঁর বাড়িতে। না হলে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে নীরদবরণের অফিসে। যাই হোক, সেদিন দুপুরে অপরেশ এসে জানিয়েছিলেন সামনের বৈশাখে তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চলেছেন। শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন নীরদবরণ। খুব বেশি বয়সে অপরেশের স্ত্রী মেয়েকে গর্ভে ধারণ করতে পেরেছিলেন। সেই মেয়ে বড় হয়েছে। বিয়ের বয়সে পৌঁছে গেছে। সেদিন অপরেশ অনেক গল্প করেছিলেন। ভাল লাগছিল নীরদবরণের। কতদিন পরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। অপরেশ আর নীরদবরণ কলেজ-জীবনে সত্যিই গলায় গলায় বন্ধু ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে অপরেশ চুপিচুপি জানিয়েছিলেন যে তিনি চান মেয়ের বিয়েটা ভালয় ভালয় উতরে যাক। এমনকী বিয়ের দিনটা নিয়েও তাঁর চিন্তা আছে। যদি অশুভ কোনও ঘটনা ঘটে যায়। নীরদবরণ অবাক হয়েছিলেন এরকম কথা শুনে। তিনি বুঝতে পারেননি অপরেশ ঠিক কী বলতে চাইছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিয়ের দিন অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে। এসব কী বলছ তুমি অপরেশ?

—বলছি তার কারণ আছে। মেয়েটা যে এরকম সর্বনেশে কাজ করে বসবে কী ভাবে জানব বলো?

—কেন কী হয়েছে?

—মেয়ে আমাদের গাঁয়েরই এক ছেলের লভে পড়েচে!—খুব চাপা স্বরে জানিয়েছিলেন অপরেশ।

—সেই ছেলের কী পরিচয়—নীরদবরণ কৌতূহলি হয়েছিলেন।

—সে একজন টেররিস্ট।...স্বদেশি করে...।...

বারো

নীরদবরণ আর অপরেশ দুজনেই সমবয়সী। তা না হলে আর বন্ধু কীভাবে হবে? হয়তো নীরদবরণ অপরেশের থেকে দু-এক বছরেব বড় হলেও হতে পারেন। প্রি-ইউনিভার্সিটি এবং গ্র্যাজুয়েশন একই কলেজে দুজনে একসঙ্গেই করেছেন। অপরেশ তার পরও পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এম. এ. করেছেন ইতিহাস নিয়ে। নীরদবরণ অবশ্য পড়াশোনা আর করেননি। বি. এ. পাস করার পর তিনি চাকরিতে ঢোকেন। প্রথমে একটা জুট মিলে। সেখানে নানা প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব ছিল। তারপর কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একদিন নিজের খেয়ালে আবেদনপত্র পাঠিয়ে ছিলেন সেই সাইকেলের কোম্পানির উদ্দেশে। উইলিয়ামস অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি সাইকেল কোম্পানি। তারা লোক নিতে চেয়েছিল। এরকম কোনও সাহেব কোম্পানিতে চাকরি করার সাধ নীরদবরণের বরাবরই ছিল। একদিন ইনটারভিউয়ের চিঠি এসেছিল বাড়িতে। তারপর চাকরিটা হয়ে গেল। কলকাতার খোদ সাহেবপাড়ায় পার্ক স্ট্রিটে অফিস। সর্বক্ষণ সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা। আর কী চাই? সেই ব্যারাকপুরে জুট মিলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নীরদবরণ সাইকেল কোম্পানির চাকরিতে ঢুকলেন। সে অনেক বছর আগের কথা।

অপরেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সাধারণত এরকম হয় না। স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে পরবর্তী জীবনে কারই বা তেমন সম্পর্ক থাকে? আর নীরদবরণ নিজের চাকরি নিয়ে খুবই ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যোগাযোগটা আসলে রাখতেন অপরেশই। এম. এ. পড়াকালীনই তিনি মাসে একবার দুবার আসতেন নীরদবরণের বাড়ি। থেকে গেছেন কখনও কখনও। পরে অপরেশ যখন কাটোয়াতেই স্কুল-মাস্টারের চাকরি নিলেন তখনও প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন কলেজ-ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে। কলকাতায় এলেই পার্ক স্ট্রিটে চলে আসতেন নীরদবরণের অফিসে। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে চা-টা হত। তারপর চলে যেতেন।

কিন্তু প্রশ্নটা হল অপরেশ যদি তাঁর সমবয়সী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মেয়ের বিয়ে এতদিন বাদে হচ্ছে কেন? অপরেশের মেয়ে কি তাঁর নাতনি শুভ্রার বয়সী? অপরেশের মেয়ের নাম অপর্ণা। সে শুভ্রার বয়সী ঠিক নয়। তার থেকে বড়। অন্তত অপরেশ বন্ধুকে সেটাই জানিয়েছিলেন। আসলে সে অপরেশের অনেক বেশি বয়সের সন্তান। অপর্ণার জন্ম হয় যখন অপরেশের বয়স তেত্রিশ। বিয়ের এগারো বছর পর। এত বেশি বয়সে সন্তানলাভের কারণ বন্ধু নীরদবরণ কিছুটা জানেন। অপরেশের স্ত্রী সুপর্ণার কীসব সমস্যা ছিল। তিনবার গর্ভবতী হওয়ার পরও জরায়ুর কোনও জটিল অসুবিধার কারণে তার প্রতিবারই নির্দিষ্ট সময়ের আগে গর্ভপাত হত। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। কিন্তু কী আর করা যাবে? নীরদবরণ নিজে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একসময় শেকসপিয়র পড়েছেন। কয়েকটা নাটক তো বারবার পড়েছেন। যেমন জুলিয়াস সিজার, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার আর হ্যামলেট। কিং লিয়রের কয়েকটা লাইন তাঁর স্মৃতিতে সর্বদা যেন জ্বলজ্বল করে।...'As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sports'. যখনই জীবনে নিজেকে কিংবা পরিচিত কাউকে ভাগ্যের হাতে মার খেতে দেখেছেন নীরদবরণ, তখনই তিনি মনে মনে এই লাইনকটি আওড়েছেন। ঠিকই তো। দুরন্ত বালকের হাতে যেমন অসহায় ফড়িং, ঠিক সেরকম ভাগ্যের হাতে মানুষ। নীরদবরণ উপলব্ধি করেছেন যে এভাবে ভেবে নিতে পারলে অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নিশ্চিন্তও থাকা যায় হয়তো।

মেয়েকে বেশ অনেকদূর পড়াশোনা করিয়েছেন অপরেশ। কাটোয়ার মতো মফস্বলের মেয়ে হইলেও অপর্ণা ম্যাট্রিক পাস। ঐ একটাই সন্তান অপরেশের। আর কোনও সন্তান তাঁদের হয়নি। অন্তত চার সন্তানের জননী হতে পারতেন সুপর্ণা, যদি প্রথম তিনটি সন্তান বাঁচত। তবুও তো সৌভাগ্য তাঁদের যে অপর্ণা হয়েছিল। সেও তো প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে এই পৃথিবীতে নাও আসতে পারত। ভাগ্যের হাতে পরপর মার খেয়ে অপরেশ অবশ্য দমেননি। বন্ধু নীরদবরণকে তিনি সবকিছুই বলতেন। সুপর্ণা যাতে ঠিকমতো সন্তান ধারণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে চিকিৎসা চলছিল। অনেক ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়েছেন। এমনকী বন্ধু নীরদবরণের সহায়তায় তিনি কলকাতার মেডিক্যাল কলেজেও স্ত্রীকে দেখিয়েছিলেন। সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করেন নীরদবরণ। তাঁর পরিচিতির ক্ষেত্রটা অনেক বড়। স্ত্রী-রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ মতো ওষুধপত্তর চলছিল। কিন্তু সুপর্ণার নাকি ধারণা যে, এক সাধুর আশীর্বাদই নাকি তিনি অপর্ণাকে পুরোসময় গর্ভে ধারণ করতে পেরেছিলেন। কাটোয়াতে গাজনের মেলায় নাকি তাঁর দেখা পেয়েছিলেন সুপর্ণা। তাঁর সমস্যার কথা শুনে সাধু নাকি কি এক শেকড় খেতে দিয়েছিলেন সুপর্ণাকে। বিনিময়ে সুপর্ণা অবশ্য সাধুকে দান-ধ্যান করেছিলেন প্রচুর। পেতলের বাসন দিয়েছিলেন অনেক। পাঁচশো এক টাকা। ফলমূল, মিষ্টি। টাকা এবং জিনিসপত্তর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অপরেশও গাজনের মেলায় কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। স্ত্রীর অনুরোধ তিনি ফেলতে পারেননি। টাকাকড়ি এবং উপচার পেয়ে সাধু নাকি খুশি হয়েছিলেন খুব। নিজের ঝুলি থেকে শেকড়ের মতো কি একটা বস্তু বের করে দিয়েছিলেন সুপর্ণাকে। যে ভাষায় সেই সাধু কথা বলেছিলেন সেটা নাকি হিন্দি। ওর প্রথমে তাঁর ভাষা বোঝেননি। শেকড়টা সুপর্ণাকে দিয়ে সাধু বলেছিলেন—মাসের নিয়মমাফিক ঋতুস্রাব

শুরু হবার ঠিক প্রথমদিন-ঐ শেকড় বেটে জল খেতে হবে সুপর্ণাকে। সেবারের মতো মাসিক শেষ হয়ে গেলে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে হবে। অপরেশই পরে সাধুর কথাগুলো বুঝিয়ে বলেছিলেন স্ত্রীকে। সাধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন সুপর্ণা। এবং কি আশ্চর্য! তারপর যে গর্ভবতী হয়েছিলেন সুপর্ণা, তারই ফল পেয়েছিলেন। দশ মাস নির্বিঘ্নে গর্ভধারণ করতে পারায় অপর্ণা হয়েছিল। নর্মাল ডেলিভারি। সুপর্ণার উদরে আদৌ ছুরি চালাতে হয়নি কোনও ডাক্তারকে।

বন্ধুর মুখে তার মেয়ে হওয়ার এই অলৌকিক কাহিনি শোনার পর হো হো হাসিতে গাড়িয়ে পড়েছিলেন নীরদবরণ। সে অনেক বছর আগেকার কথা। অপরেশ সেবার এসেছিলেন নীরদবরণেব হাওড়ার বাড়িতে। নিজের কন্যাসন্তান হওয়ার আনন্দসংবাদটা বন্ধুকে এবং কলকাতায় থাকা কিছু আত্মীয়স্বজনকে দিতে। সব শুনে নীরদবরণ যখন হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন, তখন অপরেশ খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—হাসছ যে?

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মহাশয়ের ঠাকুমার ঝুলি যেন হুবহু আওড়ে যাচ্ছো তাই...। সে কারণেই হাসছি।

—মানে? বুঝলুম না?

—তুমি একজন মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তোমার মুখে এসব কথাবার্তা শুনলে হাসিই তো পাবে।—হাসি থামিয়ে বলেছিলেন নীরদবরণ।

—আজগুবি নয়। বিশ্বাস কবো—সব সত্যি। আমি নিজে সুপর্ণাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেই সাধুর কাছে। সত্যিই সেই সাধু শেকড় দিয়েছিল। সেই শেকড়বাটা জল খেয়ে...

—স্টপ দিস ননসেন্স—নীরদবরণ চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। অপরেশ থমকে থেমে গিয়েছিলেন। নীরদবরণ হঠাৎ ওরকম মেজাজী ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠায় সত্যিই গিয়েছিলেন ঘাবড়ে।

—আমি যা বললুম সেসবকে ননসেন্স বলছ ভাই?—রীতিমতো আহত স্বরে অপরেশ বলেছিলেন।

—শোনো ভাই।—পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেছিলেন নীরদবরণ—ওসব সাধু-টাধুর মাহাত্মের জন্যে তুমি যে এতদিন পর বাবা হয়েছ তা ঠিক নয়। মেয়ে তোমার হয়েছে মেডিক্যাল সায়েন্সের গুণেই। হয়তো এতদিন ডাক্তারের ডায়াগনসিস হয়নি। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওষুধও পড়েনি। তাই তোমার স্ত্রীর ফুল টার্ম গর্ভধারণ করতে অসুবিধে হয়েছিল।...অনেকদিন বাদে হয়তো ডাক্তারের ওষুধ ঠিকমতো পড়েছে। আবার সেই সময়ে সাধু বাবাজির শেকড়ও তোমার স্ত্রী খেয়েছেন। কিন্তু সেটা তোমার সন্তানলাভের কারণ হতে পারে না।...মে বি ইটস আ মিয়ার কো-ইনসিডেন্স।

এরকম কথা শোনার পর অপরেশ দমে গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, তিনি নীরদবরণের যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা একেবারেই বিশ্বাস করেননি। বারবার বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিলেন—আজগুবি ঘটনা নয়। আমার নিজের ধারণা মেডিক্যাল সায়েন্স নয় ভাই। সাধুর ঐ শেকড়ের গুনেই আমরা সন্তান পেয়েছি।...

বন্ধুর নাছোড়বান্দা মনোভাব দেখে নীরদবরণও অবশ্য আর বিশেষ কিছু বলতে চাননি। তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছিল 'হ্যামলেট নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তি। পাইপ দাঁতে কামড়ে বিড়বিড় করে নীরদবরণ সামনে বসে থাকা বন্ধু অপরেশ চক্রবর্তীকে নয়; নিজেকেই যেন শুনিয়েছিলেন—"There are more things in heaven and earth, Haratio, than are dreamt of in your philosophy."

তেরো

থেকে থেকেই পুরনো অস্টিন গাড়ি বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে জানান দিচ্ছিল যে, গাড়ি রাস্তার খোলে গর্তে। তা মফস্বলে তো এরকমই হওয়ার কথা। তাঁদের হাওড়া শহরও তো মফস্বল। কলকাতার কাছে হলেও তা মফস্বল ছাড়া আর কী? সেই হাওড়ার রাস্তাঘাটই কি খুব ভাল অবস্থায় আছে? হাওড়া শহরে এগোতে না এগোতেই গলি। আর সেইসব গলি দিয়ে কোথায় না পৌঁছনো যায়। রাস্তাঘাট খানা-খোঁদলে ভর্তি। যেন সারা বছর রাস্তার শরীরে খোস-পাঁচড়া হয়েই আছে। তা যেন সারাবার কোনও উপায় নেই।

বাইরে এখন সন্ধে ঘন হয়ে নেমে এসেছে। চারপাশে ধান-জমি, ঝোপঝাড, মাঝে মাঝে পল্লী এলাকা। মাঝখান দিয়ে পিচের ভাঙা রাস্তা। আরোহীদের নিয়ে গাড়ি চলেছে। অন্ধকার তার জাল বিছিয়ে দিচ্ছে নিঃশব্দে। গাড়ির তীব্র হেডলাইটের আলোতে সামনের দিক দৃশ্যমান। দুপাশে ঠিক কী যে আছে তা বুঝতে পারছেন না নীরদবরণ। মাঝে মাঝে বুনো ফুলের গন্ধ নাকে আসছে। গাড়ি চলেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। সমরেশ এতক্ষণ এটা সেটা কথা বলে যাচ্ছিল। অতিথিদের সঙ্গে ভদ্রতাবশত যেমন বলতে হয়। নীরদবরণ উত্তর দিচ্ছিলেন টুকটাক। শুভ্রা চুপচাপই আছে। সে অনেকদিন পরে বাড়ির বাইরে, এতদূরে বেড়াতে এসেছে। তার কাছে এখন প্রতি মুহূর্ত কৌতূহলের এবং বিস্ময়ের। নীরদবরণ-এর হঠাৎ মনে হল, নাতনির খিদেও পায় অবশ্য। কেন যে পায় বলতে পারা যাবে না। তবে পায়। ট্রেনে আসতে আসতে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার-দাবার বেশিরভাগটাই খেয়েছে শুভ্রা। নীরদবরণ তেমন কিছু নেননি। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত হিসেবী এবং সতর্ক। বয়স বাড়ছে। হজমশক্তিতেও টান পড়ার কথা। শরীরটাও বেড়েছে কম না। এখন তো খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবেই। তা না হলে শরীর ফিট রাখা যাবে না। তবে মোটা তিনি যতই হন, একটা অভ্যাস তিনি বোধহয় কোনওদিনই ছাড়তে পারবেন না। সেটা হল, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ মদ্যপান। কলকাতায় থাকলে বন্ধু ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে তিনি মদ্যপান করেন। হয় পার্ক স্ট্রিটের কোনও পানশালায় নয়তো ম্যাকেঞ্জির বাসায়। আর যখন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির কোনও কাজে কলকাতার বাইরে পাড়ি দেন, একা হয়ে যান নীরদবরণ, তখন তিনি কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আসেন তাড়াতাড়ি। সেদিন বাড়িতেই পান করতে হয় একা একা। তাঁর নর্মালি যা লিমিট সেভাবেই—গুনে গুনে ঠিক তিন পেগ। যূথিকাকে নির্দেশ দেন নীরদবরণ মুচমুচে কিছু ভাজাভুজি পাঠাবার জন্যে। হাবুর মা দিয়ে যায় ফিশ চপ কিংবা ডিমের বড়া। বাড়িতে মাংস থাকলে মাংসের বড়াও মিলে যেতে পারে কোনওদিন। আজও নীরদবরণের মন উসখুশ করছে দু-এক পাত্তর চড়াবার জন্যে। কিন্তু এখানে অপরেশের বাড়িতে কি সেটা সম্ভব? অপরেশ কি মদ্যপান করে? কে জানে। পাড়াগাঁর লোকজন মদ-টদ খাওয়াকে বেশ ঘৃণার চোখে দেখে। যারা মদ খায় তাদের পাড়াগাঁয় লোকজন কাঠগড়াতে দাঁড় করিয়ে রাখে যেন বরাবর। নীরদবরণ ব্যাগের মধ্যে অবশ্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের একটা ছোট পাঁইট ঠিকই সঙ্গে করে এনেছেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহ আছে তিনি আজ, এখানে, অপরেশের বাড়িতে, সেই পাঁইটের সদব্যবহার করতে পারবেন কী না।

সকলকে সচকিত করে হঠাৎ হুক্কা হুয়া...হুক্কা হুয়া...শিয়ালদের সম্মিলিত ডাক কানে এল। শুভ্রা হাওড়ার বাড়িতে খুব যে শিয়ালের ডাক শুনেছে তা নয়। নীরদবরণরা যে পাড়াতে থাকেন সেখানে ঝোপঝাড় কম। ঘন ঝোপঝাড় না থাকলে শিয়ালরা সেই জায়গায় থাকতে ঠিক পছন্দ করে না। তাই কিছুই না বুঝে শুভ্রা বলে উঠল—ওসব কী ডাকছে দাদু? নীরদবরণের বদলে সমরেশ বলল—শেয়াল ডাকচে। এই যে অন্ধকারে গাড়ির শব্দ পেয়েচে। ভেবেচে কি না কি..।

নীরদবরণ বললেন—শেয়ালকে কাছ থেকে ভালভাবে লক্ষ করেছিস সুবু?

—না দাদু। শেয়াল আর তেমন দেখলুম কোথায়?

—কেন? এই তো ঝালদাতে তোর বাপের কাছে ঘুরে এলি। দিন পনেরো ছিলি সেখানে একদিনও শেয়াল চোখে পড়েনি?...স্ট্রেঞ্জ!

—শেয়াল চোখে পড়েনি দাদু। কিন্তু শেয়ালের ডাক প্রতিদিনই শুনতে হয়েছে। সন্ধে হলেই ওদের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হত। ঝালদাতে আবার অন্যরকম ডাকও শুনেছি দাদু।

—অন্যরকম ডাক? শেয়ালের?

—হ্যাঁ শেয়ালের। ঝালদাতে বাঘ বের হয় মাঝে মাঝে...

—ওরে বাবা বাঘ?—সমরেশ যেন আঁতকে উঠল।—ঝালদা কোতায় বেশ? বাঁকুড়া জেলায়?

—না মানভূমে।—নীরদবরণ জানালেন।—সেখানে সুবুর বাবা, মা আর অন্য ভাইবোনেরা থাকে। জামাই সেখানে চাকরি করে। গালা ফ্যাক্টরিতে।

আলোচনাটাই অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল, তাই নীরদবরণ নাতনিকে প্রশ্ন করলেন—বাঘ বের হবার কথা কী যেন বলছিলি সুবু? বাঘের ডাকও শুনেছিস বুঝি?

—বাঘের ডাক আমি শুনিনি দাদু।...আমি শুনেছি ফেউয়ের ডাক।

—ফেউ? সেটা আবাব কী বস্তু?—নীরদবরণের স্বরে কৌতুহল ফুটে উঠল। বিশ্বদেবের কর্মস্থলে তাঁর একবারও যাওয়া হয়নি। একবার গেলে হয়।

—ফেউ কী জানো না দাদু?—শুভ্রা প্রশ্ন করল।

—নারে দিদি জানি না। তুই তো আগে বলিসনি। এই প্রথম শুনছি।

—তোমাকে বলিনি হয়তো। দিদুর কাছে গল্প করেছি।

—ফেউ বোধহয় মানভূম ডিস্ট্রিক্টের কোনও স্পেশাল জন্তু?— প্রশ্ন করে সমরেশ।

—না কাকু।—শুভ্রা হেসে বলল!—ফেউ আসলে শেয়ালকেই বলা হয়। কখন বলা হয় জানেন?

—কখন?

—যখন বাঘ বের হয়। বাঘ বের হলে শিয়ালেরা খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা নিজেদের লেজ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেউ ফেউ করে অদ্ভুতভাবে ডাকে। তখন ওখানকার মানুষ বলে যে ফেউ ডাকছে।

—তাই নাকি? জানতুম না তো।—নীরদবরণ বললেন।

অনেকটা পথ আসা হল। শিয়ালের ডাক কখন যেন মিলিয়ে গেছে। এখন কানে আসছে কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনও মন্দির আছে। সেখানে আরতি হচ্ছে।

—কাছাকাছি কোনও কালীমন্দির আছে বুঝি?—নীরদবরণ জানতে চাইলেন।

—কালীমন্দির নয়। রাধাকৃষ্ণের। —সমরেশ জানাল।—আর এই মন্দিরেই পরেই হল আমাদের বাড়ি।

—তাই নাকি? তাহলে কি আমরা এসে গেলুম?

—হ্যাঁ। আমরা এসে গেলুম।

মন্দির পেরিয়ে গাড়ি এখন জমিতে নেমেছে। আকাশে অল্প চাঁদ। সেই চাঁদের ম্লান আলোতে নীরদবরণ দেখলেন তাঁরা আসলে ঘাসে ঢাকা একটা মাঠের ওপর দিয়ে চলেছেন। কিছুটা গিয়ে গাড়ি থেমে গেল। সামনে বাড়ির ফটক। ফটকের ওপারে দোতলা বাড়িটাও অস্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে। গাড়ি বারবার হর্ন দিচ্ছে। কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের অনেকেরই হাতে হেরিকেন জ্বলছে। লুঙ্গি আর ফতুয়া পবনে সামনের লোকটিই অপরেশ। বন্ধুকে অভ্যর্থনা

জানালেন অপরেশ। এসো নীরদ এসো। শুভ্রার দিকে তাকিয়ে অপরেশ বললেন—এসো মা-মণি। খুব খুশি হয়েচি তুমি এসেচ...।

চোদ্দো

অপরেশরা কাটোয়া শহরের খুবই বর্ধিষ্ণু পরিবার। অপরেশের বাবাও ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি রাজনীতিও করতেন। এখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন একবার। এখন অবশ্য তিনি পৃথিবীতে নেই। বেশ কয়েকবছর আগে তিনি গত হয়েছেন। অপরেশ সেই দুঃসংবাদ চিঠিতে জানিয়েছিলেন বন্ধুকে। শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন। কিন্তু নীরদবরণের আসা হয়ে ওঠেনি। তিনি কাটোযাতে অপরেশের এই বাড়ি একবাবই এসেছিলেন। সে অনেক বছর আগে। তখন তিনি কলেজে অপরেশের সহপাঠী। কী খেয়াল হয়েছিল নীরদবরণ বন্ধুর সঙ্গে চলে এসেছিলেন। এ বাড়িতে একদিন থেকেছিলেন। তখন অপরেশের বাবা বেঁচেছিলেন। তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেই তখনই নীবদবরণের মনে হয়েছিল, তিনি নিপাট ভদ্রমানুষ। সুজন। এবং অমায়িকও। একদিনেব জন্যে এসে খুবই খাতির-টাতির পেয়েছিলেন নীরদবরণ। অপরেশ খুবই অল্প বযসে তাঁর মাকে হাবিয়েছিলেন। বাড়িতে অতিথিকে আপ্যায়ন করার মতো মহিলার অভাব চোখে পড়েছিল নীরদবরণের। দুজন মহিলাকে অবশ্য দেখেছিলেন সে সময় তিনি। তারা ছিল এ বাড়ির কাজের লোক। অপবেশের স্বজন নয়। হেঁসেলের কাজে ব্যস্ত ছিল তারা। বাড়িতে মহিলার অভাব ছিল বলেই বোধহয় অপরেশের বাবা পরমেশ নিজে সামনে বসে নীরদবরণকে খাইয়েছিলেন। মহিলাদের মতোই বাববাব 'এটা খাও সেটা খাও' বলে অনুরোধ করছিলেন। বাড়ির কর্তার সেই অমায়িক ব্যবহার আজও বেশ মনে আছে নীরদবরণের।

এখন অবশ্য অপরেশের বাড়িতে মহিলাদের অভাব নেই। অপরেশের স্ত্রী, সমরেশের স্ত্রী, ওদের ছোট ভাই ত্রিদিবেশের স্ত্রী সকলের সঙ্গেই অল্প সময়ের মধ্যে আলাপ হয়ে গেল। এ বাড়িতে অপরেশ আর সমরেশ নিজেদের পরিবার নিয়ে থাকে। একান্নবর্তী পরিবার। সকলের ছোট ত্রিদিবেশ থাকে কলকাতায়। সে একজন ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞেস করে নীরদবরণ জানলেন যে, সে ভবানীপুর অঞ্চলে থাকে। ত্রিদিবেশেব বউটিও বেশ। দেখে মনে হল কলকাতারই মেয়ে। তার কথাবার্তায় কোনও আড়ষ্টতা নেই। ত্রিদিবেশের এক ছেলে. এক মেয়ে। তারা স্কুলে পড়ে। তারাও এসেছে। সমরেশের দুই ছেলে। মেয়ে নেই। আব অপরেশ মাত্র এক সন্তানের পিতা। সকলের সঙ্গেই ধীরে ধীরে আলাপ হয়ে যাচ্ছে। অপরেশই সবাইকে ডেকে ডেকে আলাপ করাচ্ছেন। তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু যার বিয়ে উপলক্ষে আসা সেই অপর্ণা কোথায়? তাঁকে কোনওদিন দেখেনি নীরদবরণ। তার কথা জানতে চাইলে অপরেশ জানালেন—মেয়ের শরীরটা ভাল নেই। তার নাকি খুব মাথা ধরেছে। সে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সে কথা শুনে নীরদবরণ রীতিমতো উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন কী অসুখ করেছে অপর্ণার। অপরেশ জানালেন যে তেমন কিছু নয়। সামান্য মাথা ধরেছে। তাকে একটু ঘুমোতে বলেছেন অপরেশ। ঘুম থেকে উঠলে মাথা ধরা ঠিক চলে যাবে। নীরদবরণ বললেন—ঠিকই পরামর্শ দিয়েছ ভাই। আগামিকাল সারাদিন ওর খুবই ধকল যাবে। আজ একটু বিশ্রামের মধ্যেই থাকা ভাল।....

বর্ধিষ্ণু পরিবার হিসেবে অপরেশের বাড়িটা বেশ বড়। নীরদবরণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। আসলে অপরেশই আগ্রহ নিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন। একটু একটু করে এত বড় বাড়িটার অন্দরমহল দেখতে দেখতে সব মনে পড়ে যাচ্ছিল নীরদবরণের। তিনি তো এ

বাড়িতে আগেও এসেছেন। একতলাতে তিনখানা ঘর। দোতলাতে চারখানা। একতলার ঘরগুলোর সাইজ বড়। দোতলার ঘরগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। একতলাটা প্রায় পুরোটাই নিয়ে থাকে সমরেশ। তারও পরিবার খুব বড় নয়। দুই মেয়ে এক ছেলে। দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। জাঠতুতো বোনের বিবাহ উপলক্ষে তারা অবশ্য দুদিন আগেই এসেছে বাপের বাড়িতে। সমরেশের ছেলের বয়স বারো বছর। সে স্কুলে পড়ে। দোতলার তিনখানা ঘর নিয়ে সংসার অপরেশের। আর একটা ঘর ত্রিদিবেশের জন্যে অবশ্য রাখা আছে। ত্রিদিবেশ তো এই অজ মফস্বলে প্রায় থাকেই না। সে ভবানীপুরে ইতিমধ্যেই নিজের বাড়ি করে নিয়েছে। ডাক্তার হিসেবে তার পসার ভাল বোঝা যায়। বনেদী বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী বড় এবং বেশ ছড়ানো উঠোন ঘিরেও আরও কয়েকটা ঘর। পাকা ঘর। কিন্তু তাদের চাল টালি কিংবা টিনের। এ বাড়িতে এখনও হাঁড়ি আলাদা হয়নি। অপরেশ ছোট ভাইকে নিয়ে একসঙ্গেই থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলো করেই বেড়ে উঠেছে। দুজন চাকর এবং একজন রাঁধুনি আছে এ বাড়িতে। তারা উঠোনের ধারে ঐ চালাঘরগুলো দখল করে থাকে। সংসারের যাবতীয় খরচ দু-ভাই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে বহন করেন। যদিও এ বাড়ির কর্তা যদি কাউকে বলা যায় তিনি সকলের বড় হবার কারণে অপরেশই।

চাকর এবং রাঁধুনির ঘর ছাড়াও উঠোনের একপাশে বেশ বড় রান্নাঘর। মফস্বলি ভাষায় হেঁসেল ঘর বলা হয়। ১৯৪১-৪২ সালে বাংলার পাড়াগাঁয়ে কয়লায় রান্নার চল ততটা হয়নি। অপরেশদের বাড়িতে কাঠ-জ্বালা আগুনেই রান্না হয়। কলকাতার কাছাকাছি বাস বলে নীরদবরণের বাড়িতে অবশ্য আলাদা সিস্টেম। হাওড়া শহরে কয়লার সাহায্যে রান্না তখন চালু হয়ে গেছে। কয়লা ছাড়াও আছে গুল। গুঁড়ো কয়লার মিক্সচার করে ছোট ছোট বলের মতো গোলা করা বস্তু। কয়লার দোকানেই তা মেলে। কেউ কেউ বাড়িতেও গুল তৈরি করে নেয়।

অপরেশের বাড়ির উঠোনের প্রায় মাঝখানে বড়সড় এক কুয়ো। ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম জলের উৎস। নীরদবরণ দেখছিলেন কুয়োটার পাড় সিমেন্ট বাঁধানো। এছাড়াও কুয়োর চারপাশে সিমেন্টের চাতাল।

কাটোয়ায় এসে ইস্তক একটা ব্যাপারে অবশ্য মনটা খচ্‌খচ্ করছিল নীরদবরণের। সেটা হল চানঘর এবং পায়খানার ব্যবস্থা। পাড়াগাঁর লোকেরা চানঘর বস্তুটিকে এখনও যেন ঠিক বোঝে না। বাড়ির পুরুষ এবং মহিলারা পুকুরে চান সারতেই অভ্যস্ত। যদিও চান করার সময় পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে আলাদা। বয়স্ক মহিলারা খুব ভোরবেলা, যাকে কাকভোর বলা যায়, প্রায় চুপিচুপি বাড়ির লাগোয়া পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে আসে। তারপর তারা পুজো-আর্চা এবং রান্নাবান্নার কাজে লেগে যায়। পুরুষদের, বিশেষত যারা চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, এবং অন্যান্য কাজে বাড়ির বাইরে যেতে অভ্যস্ত, তাদের পুকুরঘাটে দেখা যায় বেলা আটটা সাড়ে আটটা থেকে। ছেলেছোকরারা পুকুরের জলে সাঁতার কেটে, নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি করে চান সারে আরেকটু বেলায়। তারপর দুপুরবেলা, যখন ধারেকাছে পুরুষদের চিহ্ন তেমন থাকে না, আবার পুকুঘাটে মহিলাদের ভিড় শুরু হয়। কাপড়-কাচা, চান এসব কাজের সঙ্গে মহিলাদের নিজেদের মধ্যে মজলিশও চলে। সেই মজলিশে গ্রামের আর পাঁচটা বাড়ির খবরাখবর, আলোচনা-সমালোচনা, নিন্দে-মন্দ সচরাচর মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। আর পায়খানার কাজটা পুরুষ এবং মহিলারা নিজেদের সুবিধাজনক সময় মতো মাঠে সারতেই অভ্যস্ত।

এখানে আসার পর হাতমুখ ধোয়ার কাজটা দোতলার বারান্দাতেই কোনওক্রমে সারলেন নীরদবরণ। সাবান ছিল। বিলিতি সাবান। পরিষ্কার গামছা—তাও ছিল। সাহেবি মেজাজের বন্ধুর কথা ভেবে অপরেশ সাবানটা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে কিনে এনেছেন। পেতলের ছোট

সাবানদানিতে সাবানটা ছিল। গোলাপি রং। কেকের মতো। আসলে তো তাই। সাবানকে সাহেবরা তো কেকই বলে। ম্যাকেঞ্জিকে তিনি বলতে শুনেছেন—ওয়াশিং কেক। সেটা সাবানই। সাবানটা ব্যবহার করার সময় নীরদবরণের মনে হয়েছিল এটা বেশ দামি। হগ সাহেবের মার্কেটে পাওয়া যায়। বন্ধুর আপ্যায়নের ব্যাপারটা নিয়ে অপরেশ সত্যিই অনেক ভেবেছেন।

হাত ধোওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কোনও অসুবিধে বোধ করলেন না নীরদবরণ। কিন্তু গা ধোওয়া? কিংবা পায়খানায় যাওয়া? এসব ব্যাপার নিয়েই তো বেশ চিন্তিত ছিলেন তিনি। প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় ছাড়ার পর তাঁর কাজই হল চান ঘরে যাওয়া। শুধু চান কেন? পায়খানাতেও একবার যেতে হয় নীবদবরণকে। তাঁর হাওড়ার বাড়িতে আসল পায়খানাটা অবশ্য খাটা। মাঠে যায় না বাড়ির লোকজন। শহবের বাসিন্দাদের মাঠে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। কিন্তু খাটা-পায়খানা? বাপরে! সে তো নরক! পায়খানা করতে বসে নিচের দিকে চোখ চলে গেলেই দেখতে হবে মলের বড় মাটির সরায় ক্রিমিরা কিলবিল করছে! আর তেমনই দুর্গন্ধ। ঐ খাটা-পায়খানার নারকীয় পরিবেশ বহুকাল সহ্য করতে হয়েছে নীরদবরণকে। তারপর তিনি কয়েক বছর হল বাড়ির দোতলায় একটা সেপটিক-ট্যাংকের পায়খানা বসিয়ে নিয়েছেন। সারা হাওডা শহরে এমন মিস্তিরি পাওয়া যায়নি, যারা সেপটিক-ট্যাংকের মেকানিজম্ জানে। এই ব্যাপাবে নীরদবরণ পরামর্শ পেয়েছিলেন সেই এক এবং অদ্বিতীয় বন্ধু—ম্যাকেঞ্জি সাহেবের কাছ থেকে। নীরদবরণের মুখে সমস্যাটা শুনে ম্যাকেঞ্জি প্রথমে হা হা করে হেসেছিলেন। তারপর অভয় দিয়েছিলেন তাঁকে—ওয়েল বাবু—ডোন্ট ওরি।....আমি তোমাকে মিস্ত্রি দেব।...হ্যাঁ, সত্যিই তাই। নীরদবরণের বাড়িতে সেপটিক-ট্যাংকের পায়খানা বসাবার জন্যে মিস্ত্রি কিংবা মেকানিক যাই বলা যাক্—আমদানি হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের সাহেব-পাডা থেকে। মুসলমান মিস্ত্রি নীরদবরণের বাড়ির দোতলায় চানঘরে একটা সেপটিক ট্যাংকের পায়খানা বসিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে নীরদবরণ সেটিই ব্যবহার করেন। বলাই বাহুল্য, সেটি তিনি একাই ব্যবহার করেন। যূথিকা এবং বাড়ির অন্যান্যরা দোতলার চানঘর মাড়ায় না। তারা সবাই নিশ্চিন্তে খাটা-পায়খানাই ব্যবহার করে।

সাহেবদের সঙ্গে ওঠাবসা করে নিজের অভ্যাসগুলো কবে যে পালটে নিয়েছেন নীরদবরণ। সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি পাওয়াব ব্যাপারটাতে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। একমাত্র সাহেবরাই জানে দৈনন্দিন জীবনে কী-ভাবে থাকতে হয়। ম্যাকেঞ্জিসাহেব যেমন বলেন—'উইথ আ বিট অব টেস্ট...।' তোমার চারপাশটাকে তুমি যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখতে পার বাবু, তাহলে তুমি বড় কাজের জন্যে নিজের মনটাকে তৈরি করবে কীভাবে।....ম্যাকেঞ্জি বলেন। 'অ্যামবিয়েন্স'—এই শব্দটা ম্যাকেঞ্জি প্রায়ই ব্যবহার করেন। প্রপার অ্যামবিয়েন্স ইন ইওর হাউসহোল্ড অ্যান্ড দ্যাট অলসো ইন ইওরসেলফ্,—উইদিন ইওর মাইন্ড।....মাইন্ড দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং।...তুমি যদি কিছু ক্রিয়েট করতে চাও বাবু, তাহলে তোমার মাইন্ড শুড বি ইন ইটস্ প্রপার স্টেট...। এসব জ্ঞানের কথাবার্তা সব ম্যাকেঞ্জি সাহেবেরই। মদের টেবিলে ম্যাকেঞ্জির কথাবার্তা আরও জ্ঞানগর্ভ হয়ে যায়।...কী সৃষ্টি করেন ম্যাকেঞ্জি? তিনি আসলে ইংরেজ রোমান্টিক কবি পারসি বিশি শেলির ভক্ত। শেলির কবিতা নীরদবরণেরও কিছু পড়া আছে। ম্যাকেঞ্জির কবিতা তার অক্ষম অনুকরণ বলে মনে হয় নীরদবরণের। আর তার সব কবিতার সোর্স হল কোনও এক নারীর প্রতি প্রেম। কে সেই নারী? ম্যাকেঞ্জিকে যতই দেখেন নীরদবরণ ততই তাকে রহস্যময় মনে হয়।

দুপুর থেকে এতটা রাস্তা ট্রেন-জার্নি করে শরীরে ধকল এবং ঘাম তো কম হয়নি। নীরদবরণের ইচ্ছে করছিল একটু গা ধুয়ে ঝরঝরে হতে। পারলে পায়খানাও যেয়ে নেন। ট্রেনে টিফিন খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। টিস্‌টিস্ করছিল যেন পেটটা। তাছাড়া সন্ধের দিকে পায়খানায় ঘুরে

আসা তাঁর অভ্যাস। কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে মাঠে যাবেন পায়খানা করতে? গ্রামের মাঠঘাট মানে এখন সাপেদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। নাহ—পায়খানা যাওয়া যাবে না। তাহলে গা ধোওয়া? তার জন্যেও পুকুরে যেতে হবে নাকি? হাতমুখ ধোওয়ার পর এখন অপরেশ নিশ্চয়ই কিছু খেতে—টেতে বলবে। শুধু চা ছাড়া এখন আর কিছুই খাওয়া যাবে না। এমনকী পরনের ধড়াচুড়োও ছাড়েননি। স্যুট-টাই এখনও পরে আছেন। সুবুকে ধারে কাছে দেখতে পাচ্ছেন না। সে মেয়ে-মহলে নিশ্চয়ই জমে গেছে। অপরেশের স্ত্রী সুপর্ণা দেখতে ভাল নয়। কিন্তু ব্যবহারটি বড় সুন্দর। শুভ্রাকে দেখেই তিনি তার চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন—ওমা! এসো এসো! মেয়ে তো নয় যেন রাজকুমারী! কী রূপ!...তারপর শুভ্রার হাত ধরে ওপাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ঘর থেকে অনেক মহিলার কথাবার্তা, গলার স্বর কানে আসছিল নীরদবরণের। বিয়ে বাড়ি মানেই তো এইসব। হই-হল্লা, অকারণ ব্যস্ততা, শোরগোল, সাজগোজ করে, যা যা অলঙ্কার আছে সব নিজেদের শরীরে ধারণ করে কিংবা প্রদর্শন করে মহিলাদের ঘনঘন যাতায়াত, গাওয়া-ঘি এ লুচি ভাজার গন্ধ, মিষ্টির পাক করার জন্যে ভিয়েন-ঘরের কর্মকাণ্ড।...আহা সুবু তো এসব তেমন দেখেই নি। ও একটু দেখুক, জানুক, বুঝুক সব।

অপরেশ কি আজকাল থট-রিডিং-এও অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন নাকি? তিনি বন্ধুকে বললেন—হাতমুখ তো ধুলে ভাই। কিন্তু ধড়াচুড়ো খুলে একটু ফ্রেশ হও। তারপর না হয় জলটল খাবে?...তোমার তো আবার সব সাহেবি কায়দা। সন্ধের সময় গা ধোওয়া। নাকি ওয়াশ করা—তোমরা তো তাই বলো?

—ওয়াশ করতে হলে তো সেই পুকুরঘাটে যেতে হবে?

—কেন?...অপরেশ যেন অবাক হলেন।—পুকুরঘাটে যাবে কেন? আমার দোতলাতেই তো চান করার জায়গা আছে। পায়খানাও আছে। ইচ্ছে হলে যেতে পারো।

—বাথরুম-পায়খানা আছে?...মাঠে যাওয়া, পুকুরঘাটে যাওয়া কি তোমরা ছেড়ে দিয়েছ?

—আমরা ছাড়ব কেন?—হাসলেন অপরেশ।—যে অভ্যাস নিয়ে বড় হয়েছি তা কি ছাড়া যায়?...সোজা কথা বলি ভাই খোলা আকাশের নীচে, ফুরফুরে বাতাস খেতে খেতে আলের ধারে বসে হাগতে না পারলে শরীরটা যেন জুত মনে হয় না। আর পুকুরের জলে ডুব দিয়ে, সূর্য প্রণাম করে চান।..সাহেবরা আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। এগুলো কাড়তে পারবে না।

—তাহলে? নিজের বাড়িতে বাথরুম-পায়খানা বানিয়েছ কার জন্যে?

—তোমাদের মতন সাহেবি মেজাজের মানুষদের জন্যে? আর কার জন্যে?...আরে আমার ভাই ত্রিদিবেশ আর তার বউ ওরাও তো এখন কলকাতার মানুষ। কলকাতার বাঙালি মাঠে-ঘাটে যেতে সাহস করে না। তারা তো এ বাড়িতে আসে। অন্তত পুজোর সময় বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যায় এখানে। তাদের আর তাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে আমাকে দোতলাতে ওসব বানাতে হয়েছে। তোমার চিন্তা কী?

--পায়খানা.. খাটা না সেপটিক?

—সেপটিক। তুমি কী ভাবো আমাকে?

—স্প্লেনডিড! ওয়ান্ডারফুল!--নীরদবরণ সহর্ষে বললেন।—এবার খুব ইজি বোধ করছি। তাহলে আমি জামাকাপড় ছেড়ে একটু ফ্রেশ হই। কিন্তু....

—এতে আবার কিন্তু কী হল?—অপরেশ অবাক হলেন।

—সুবু কী করছে? তারও তো ফ্রেশ হওয়া দরকার। আমার পাল্লায় পড়ে সেও তো একই হ্যাবিট ডেভলপ করেছে। মাঠে যেতে পারে না। খাটা পায়খানাতেও না। বাথরুম ছাড়া চান করতে পারে না।

—বাহ বেশ বেশ। নিজেব মত নাতনিকেও তৈরি করেচ! তা করো। আপত্তি নেই। কিন্তু মেয়েটাকে শ্বশুরঘবে তো যেতে হবে একদিন না একদিন। বেশি উঁচুকপালে স্বভাবেব মেয়ে হলে সেখানে মানিয়ে নিতে পারবে তো?...

প্রশ্নের মোড়কে নাতনিব প্রতি অপরেশের এই কটাক্ষ নীরদবরণের ভাল লাগল না। কড়া একটা উত্তরই হয়ত তিনি দিযে ফেলতেন। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? নিজেকে সংযত করলেন নীরদববণ। অপরেশ তাঁর বহুদিনের বন্ধু। তাঁরা আজ অপরেশের বাড়িতে অতিথি। বরং নীরদবরণ অন্যরকম একটা উত্তর দিলেন। তিনি বললেন—সুবুব বিয়ে আমি গ্রামে দেব কেন? শহরেই দেব। যাতে ডেইলি লাইফের ওসব ঝামেলায সে না পড়ে।...একটু থামলেন নীরদবরণ। তারপর বললেন—নাতনিকে আমি নিজের কাছে রেখে বড় কবেছি এটা ঠিকই অপরেশ। আমার পাল্লায় পড়ে শি হ্যাজ ডেভলপড সাম সফিসটিকেটেড হ্যাবিটস এটাও ঠিক। আর সে কারণেই আমি ওর বিয়ে কলকাতার বনেদি বাড়িতেই দেব। সম্ভব হলে অন্য প্রভিন্সেও দিতে পাবি। যেমন দিল্লি। সেখানেও অনেক প্রবাসি বাঙালি থাকে। সুবুর রূপ আছে। গুণ আছে। দু-পাতা ইংরেজি পড়তেও জানে। তার জন্যে সুপাত্রের অভাব হবে না...।

নীরদবরণের কথায় কি অহংকাব প্রকাশ পেয়েছিল? আভিজাত্যের অহংকার? কিংবা তীক্ষ্ণ হুল ছিল কি কথাগুলোয? তা না হলে অপরেশেব মুখটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কেন? নিজেকে যেন সামলে নিলেন অপরেশ। কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না! বরং তিনি বললেন—যাও ঐ যে কলতলা পায়খানা। সব পরিষ্কার। ফ্রেশ হয়ে এসো।

নীরদবরণ বললেন—সুবুকে ডাকো। তাকেও তো ফ্রেশ হতে হবে।

শুভ্রা এসে যা জানাল তাতে নীরদবরণ আশ্বস্ত হলেন। ইতিমধ্যেই কখন যেন সে চানঘরে গিয়ে তাজা হয়ে এসেছে। তার পরনে একটা ঝলমলে সিল্ক শাড়ি। কুঁচিয়ে পরেছে শাড়িটা শুভ্রা। এভাবেই পরে সে। এখানে অবশ্য কোনও মহিলাই বাড়িতে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরেনি। আগামীকাল বিয়ে বাড়িতে পরবে। সেটাই রীতি। বয়স্ক মহিলাদের কথা আলাদা। তাঁরা 'খোঁট' গুঁজে সবসময়ই শাড়ি পরেন। শুধু শাড়ি-ব্লাউজ পরিবর্তন করা নয়। জলখাবার খাওয়াও হয়েছে শুভ্রার। জেনে, নিশ্চিন্ত মনে চানঘরে ঢুকলেন নীরদবরণ। বেরিয়ে এসে কিঞ্চিৎ জলখাবার নিলেন। দুটো রসগোল্লা। কাটোয়ার রসগোল্লা বিখ্যাত। শক্তিগড়ের ল্যাংচাও ছিল। কিন্তু তা এড়িয়ে গেলেন নীরদবরণ। ওতো ভাজা বস্তু। এখন ভাজাটাজা না খাওয়াই ভাল। রসগোল্লা আর জলপানের কিছু পরে চা এল। নীরদবরণের ফরমাশমতো লিকার-চা। তারপর পাইপে তামাক ভরে ধরালেন নীরদবরণ। অপরেশের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল টুকটাক। বিয়ে বাড়ির খোঁজখবর নিলেন নীরদবরণ। অপরেশকে বেশ নিশ্চিন্ত মনে হল। কারণ বিবাহ-অনুষ্ঠান এবং অতিথিদের আপ্যায়ন করার ব্যাপারটা সমরেশ আর ত্রিদিবেশ দেখছে।

নীরদবরণ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মেয়ে অপর্ণার মাথা ধরেছে বলছিলে? এখন সে কেমন বোধ করছে?

—ভালই বোধ করছে মনে হয়।...তুমি ওর সঙ্গে একবার কথা বলবে নাকি নীরদ?

—হ্যাঁ। বলতে পারি। তার বিয়ে। তার সঙ্গেই এখনও দেখা হল না।

—চলো। ওপাশের ঘরে সে শুয়ে আছে।

—সেই টেররিস্ট ছোকরার অ্যাফেয়ারটা আর বেশিদূর গড়ায়নি তো?

—গত একমাস মেয়ের বাইরে যাওয়া বন্ধ করেছি। তবুও...

—তবুও?

—মনে হয়, মেয়েটা সত্যিই সেই টেরারিস্ট ছোকরাকে ভুলতে পারছে না। অনেক অশান্তি

হয়েছে বাড়িতে। ধরে নাও প্রায় জোর করেই এ বিয়ে দিচ্ছি আমি।

—টিন-এজ লাভ...ওসবের স্থায়িত্ব কদিন? নতুন সংসারে গেলেই দেখবে সব ও ভুলে যাবে।—হেসে বললেন নীরদবরণ।

—আমারও তাই ধারণা।—বললেন অপরেশ।...চলো অপুর সঙ্গে তোমার একবার কথা বলা দরকার।

অপরেশের সঙ্গে নীরদবরণ অপর্ণা যে ঘরে শুয়ে ছিল সেই ঘরে এলেন। খাটের ওপর বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল অপর্ণা। একেবারে একা। ঘরে কেউ নেই। শুধু হেরিকেন জ্বলছে। দক্ষিণের জানলা খোলা। বাতাস আসছে। পাশের ঘরে মেয়েরা জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছে। ওদের মধ্যে শুভ্রাও আছে নিশ্চয়ই।

অপরেশ ডাকলেন—অপু-মা আমার। এখন কেমন বোধ করছিস মা? এই দ্যাখ নীরদকাকু এসেছে। কলকাতা থেকে। উঠে প্রণাম কর...।

ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পডল অপর্ণা। খাট থেকে নেমে এল। কিন্তু অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন নীরদবরণ...।

পনেরো

কোনও দিন নীরদবরণ অপর্ণাকে দেখেননি। কী করে দেখবেন? তিনি তো অপরেশের বিয়ের পর আসেননি এ বাড়িতে। বিয়ের সময়েও যে এসেছিলেন তা নয়। যদিও অপরেশ তার বিয়েতে বন্ধুকে নেমতন্ন করতে ভোলেননি। কিন্তু আসার ইচ্ছে থাকলেও আসা হয়ে ওঠেনি। তিনি তখন চাকরিতে ঢুকে গেছেন। নতুন চাকরি। সেই জুট মিলে। ইচ্ছে থাকলেও ছুটি নিয়ে বন্ধুর বিয়েতে আসা সম্ভব হয়নি। কাটোয়ায় এই বন্ধুটির বাড়িতে তিনি মাত্র একবারই এসেছিলেন।

অপর্ণাকে এই প্রথম দেখলেন নীরদবরণ তার প্রায় বাইশ বছর বয়সে। হ্যাঁ তাই। অপর্ণা যেমন তার বাবার বেশি বয়সের মেয়ে। তেমনই তার বিয়েও হতে চলেছে বেশ দেরিতে। সেই সময় পনেরো ষোল বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। নীরদবরণদের সময়ে আরও আগে মেয়েদের বিয়ে হত। তিনি নিজে যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন যূথিকার বয়স মাত্র বারো। আর নিজের দুই মেয়ে সুনীতি এবং সুজাতারও বিয়ে দিয়েছেন নীরদবরণ সামাজিক রীতি মেনে ওদের পনেরো কিংবা ষোল বছর বয়সেই। এত বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন,—এ কথা অবশ্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেননি নীরদবরণ। বন্ধু কিংবা ঘনিষ্ঠ হলেও কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো কোনওদিনই ইচ্ছে নয় তাঁর। আসলে মেয়েকে প্রায় বুড়ি-বয়সে বিয়ে দিতে চলেছেন এটা অপরেশই তাঁকে একবার যেন বলেছিলেন কথাপ্রসঙ্গে। যেদিন তাঁর বাড়িতে অপরেশ নেমতন্ন করতে গিয়েছিলেন সেদিন। তারপর আলোচনাটা বোধহয় অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। নীরদবরণেরও আর মনে হয়নি কারণটা জিজ্ঞেস করার। আর অপরেশেব মেয়ের নাম যে অপর্ণা এটা তাঁকে জানতে হয়েছিল বিয়ের নেমতন্ন পত্র পড়ে।

অপর্ণাকে প্রথম দেখে নীরদবরণের চমকে ওঠার কারণ ছিল। এমনিতে অপর্ণাকে দেখতে খারাপ নয়। সে তার বাবার মুখের আদল পেয়েছে। আর পেয়েছে মায়ের গায়ের রং। অপরেশের মুখের ধাঁচ বেশ কাটা কাটা। টিকালো নাক। বড় বড ভাসা ভাসা চোখ। অপর্ণারও তাই। তবে অপরেশ পেয়েছে বড় কপাল। সে বরাবরই চুল উলটে আঁচড়ায়। তাতে কপাল আরও বড় দেখায়। ভাগ্যক্রমে অপরেশের মেয়ে অবশ্য বাবার মতো বড়-কপালে নয়। মেয়েদের যাতে ভাল লাগে

তারও তেমনই। ছোট কপাল। আব মাথায় অনেক চুল। তার চুল পুরোটা খুলে দিলে কোমর ছাড়িয়ে চলে যাবে। যদিও এখন ঘরে হেরিকেনের অনুজ্জ্বল আলো। কাটোয়া শহরে এখনও বিদ্যুৎ আসেনি! এবকম অনেক মফস্বলেই আসেনি। কবে আসবে কে জানে। কিন্তু হেরিকেনের মলিন আলোতেই নীরদবরণের জহুরি চোখ যা দেখার দেখে নিল। অপরেশের স্ত্রীর গায়ের রং চাপা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলা যেতে পারে। মেয়েও মায়ের রং পেয়েছে। অপর্ণাকে দেখে নীরদবরণের মনে হল সে দেখতে খারাপ নয়। খুব রূপসী হয়তো নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে আলগা একটা শ্রী আছেই।

আসলে নীরদবরণকে চমকে উঠতে হয়েছিল মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে। আগামিকাল যার বিয়ে হতে চলেছে তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল তার থেকে নিরানন্দে বোধহয় এই পৃথিবীতে কেউ নেই। অপর্ণার মুখ থেকে সমস্ত বিভা কে যেন শুষে নিয়েছে। ভীষণ ফ্যাকাসে লাগছিল তাকে। সে এতক্ষণ বিছানায় শুয়েছিল বটে। কিন্তু ঘুমিয়ে যে ছিল না তা তো তার চোখ- মুখ দেখেই টের পেলেন নীরদবরণ। তাহলে মেয়েটাকে কেন এত রক্তহীন, ফ্যাকাশে আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে? ওর কি সত্যিই শরীর খারাপ? কোনও অসুখে ভুগছে কি মেয়েটা? যদি ভুগছে তাহলে ডাক্তার দেখানো হয়নি কেন? অপরেশকে জিজ্ঞেস করতে হবে এখনই।

—প্রণাম করো মা। তোমার নীরদকাকু। কলকাতা থেকে এসেছেন। ওর গল্প অনেক শুনেছ তুমি।—সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েকে অপরেশ বললেন। অপর্ণা সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে প্রণাম করল নীরদবরণকে।

—থাক থাক মা।—ব্যস্ত হয়ে বললেন নীরদবরণ।—আশীর্বাদ করছি সুখী হও। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বেশ অসুস্থ।...কী হয়েছে তোমার?

—মাথাটা ভীষণ ধরেছে কাকু।—মিনমিনে স্বরে অপর্ণা জানাল।

—মাথা ধরেছে?—নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।—আজই প্রথম মাথা ধরল? নাকি আগেও এরকম মাথা ধরেছে?

—আগে ধরেনি। আজ দুপুর থেকেই—

—মনে হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়ার দোষে গ্যাস হয়ে গেছে না কি?...গুরুপাক কিছু খেয়েছিলি ভাতের সঙ্গে?—অপরেশ মেয়েকে জিগ্যেস করলেন। অপর্ণা না-সূচক মাথা নাড়ল।

—মাথা ধরা যাতে কমে তার জন্যে ওষুধও কিছু খাওনি?—এ প্রশ্ন নীরদবরণের।

—ওষুধ খাইনি। মা কিছুক্ষণ আগে কর্পূর-তেল মালিশ করে গেছে কপালে।—অপর্ণা সেই মিনমিনে স্বরেই জানাল।

—কর্পূর-তেল?—নীরদবরণ বন্ধুর দিকে তাকালেন।

—ওসব পাড়াগাঁর টোটকা। তোমরা সাহেব-সুবো মানুষ ভাই-ওসব বুঝবে না।—অপরেশ ঈষৎ হালকাভাবে বললেন।

—আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি অপরেশ...।

—কী ভাবছ ভায়া?

—তোমার মেয়ের চোখ খারাপ হয়নি তো? মাথা ধরা কিন্তু চোখ খারাপের একটা ইনডিকেশন। সে জন্যেই আমি জিজ্ঞেস করলাম কতদিন ধরে মাথা ধরছে?

—চোখ খারাপ?—অপরেশ কথাটা যেন কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর মেয়েকে প্রশ্ন করলেন—হ্যারে মা—চোখে কম-টম দেখিস নাকি আজকাল?...আগে কোনওদিন বলিসনি তো?

—না। আমি চোখে কম দেখি না।—মেয়ে বাবাকে জানাল।

—ও তো চোকে কম দেখে না। বলছে...অপরেশ কৈফিয়তের সুরে বন্ধুকে বললেন।

—শোনো মা।—নীরদবরণ অপর্ণার দিকে তাকালেন।—আগামিকাল তোমার বিয়ে। সকাল থেকে রাত অব্দি তোমাকে অনেক ধকল সইতে হবে। উপোসেও থাকতে হবে বোধহয়।...বিয়ের লগ্ন তো বেশ রাত করে...।

—সেই রাত নটায় লগ্ন পড়বে।—অপরেশ বললেন।

—সুতরাং মাথা ধরার ব্যাপারটা অত লাইটলি নেওয়া ঠিক নয়। তেল-ফেল মালিশ চলছে। ঠিকই আছে হয়তো। কিন্তু আমার মনে হয় অপর্ণার ওষুধও কিছু খাওয়া ভাল।—নীরদবরণ বললেন।

—ওষুধ?—অপরেশকে এবার চিন্তিত দেখাচ্ছিল।—ব্যাপারটা যে এতদূর গডিয়েছে আমাকে তো কেউ বলেনি? ওব মা শুধু একবার বলেছিল মেয়েব মাথা ধরেছে। তাই শুয়ে আছে।... তো নীরদ যখন ওষুধের কথা বলছে তাহলে তো চাকর-বাকর কাউকে অবনী ডাক্তারের কাছে একবার পাঠাতে হয়। তোর মা আবার গেল কোথায়...

—বাবা তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমার মাথা ধরা কিন্তু মা মালিশ করে দেবার পর এখন অনেক কমে গেছে। ওষুধ-টষুধ কিছু খাবার দরকার নেই। মা আর একবার মালিশ করে দিলেই...

—তা তোব মা গেল কোথায়?—অপরেশ স্পষ্টই অধৈর্য হয়ে পড়লেন।—আজ বাদে কাল যার বিয়ে তাকে ফেলে তোর মা কি রাজকার্যটা করছে শুনি?—বিড়বিড় করতে করতে অপরেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোধহয় স্ত্রীকে খুঁজতে। অপর্ণা যেন কীরকম অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। নীরদবরণ প্রখরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর মন কু গাইছিল। বন্ধু অপরেশের জন্যে দুশ্চিন্তা বোধ করছিলেন নীরদববণ। তিনি ভাবছিলেন আগামিকালটা ভালয় ভালয় কেটে গেলে হয়।.. আচ্ছা অপরেশের হবু জামাই কী করে? তার নিবাস কোথায়? পরিবারেব অবস্থা কেমন? এসব কিছুই তো জানা হয়নি। জানতে হবে। অপবেশ যখন হাওড়ার বাড়িতে নেমতন্ন করতে গিয়েছিলেন, তখন এসব কথা হয়নি। অপরেশের তাড়া ছিল। কলকাতায় তার আবও কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের বাড়িতে গিয়ে নেমতন্ন সারার কথা ছিল অপরেশের। তাই অন্য কথাবার্তা হওয়ার ফুরসুত ছিল না। কিন্তু এখন সব জানতে হবে। নীরদববণের কৌতূহল হচ্ছিল। অপরেশটা গেল কোথায়? স্বভাবে ও বরাবরই একটু ব্যস্তবাগীশ।

—তুমি শুয়ে পড় মা—বিশ্রাম নাও।—এই কথা বলে নীরদববণ ঘরের দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রায় ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল শুভ্রা।

—দাদু দেখ আমি মাথায় কী পরেছি!—শুভ্রা বলল।

—কী পরেছিস আবাব?—নীরদবরণ শুভ্রার দিকে তাকালেন। দেখে অবাক হলেন। শুভ্রার মাথায় একটা মুকুট। সম্ভবত রুপোর। চকচক করছে...।

—ওটা তুই মাথায় কী পরেছিস রে সুবু? পেলি কোথায়?...

—এটা ঐ অপর্ণাদির মুকুট। কাল বিয়েতে কনে সাজার সময় পরতে হবে অপর্ণাদিকে। আমাকে হঠাৎ এক কাকিমা পরিয়ে দিলেন।—শুভ্রা জানাল। রুপোর মুকুট মাথায় দিযে সে স্পষ্টতই বেশ উত্তেজিত।

—কাকিমা পরিয়ে দিল? কোন কাকিমা রে?—নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন।

—এই যে আমি।—এক মহিলার স্বর। বেশ অভিজাত কণ্ঠস্বর। নীরদবরণ তাকালেন। একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না এমনই রূপ মহিলার। বয়স খুব বেশি নয়। অভিজ্ঞ নীরদবরণের চোখ বুঝল এই মহিলার বয়স বড়—জোর একত্রিশ কি বত্রিশ। বেশ লম্বা। ফর্সা। মুখশ্রী পানপাতার

ছাঁদে। কুচি দিয়ে শাড়ি পরেছে। তার মানে এই মহিলাও নিশ্চয়ই কলকাতার। কিন্তু এঁকে তিনি চেনেন না।

—নমস্কার দাদা। মহিলা নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে সৌজন্য জানাল।

—নমস্কার।....আপনাকে তো ঠিক...অপরেশ কোথায় গেল? সেই তো আমাকে চিনিয়ে দেবে সবাইকে...।

—ইনি আমাদের ত্রিদিবেশ কাকিমা।...জানো তো দাদু উনিও কলকাতা থেকে এসেছেন। ভবানীপুরে থাকেন। আমাকে জোর করে এই মুকুট পরিয়ে দিয়ে বললেন, চলো তোমার দাদুকে দেখিয়ে আনি। তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!—অপরেশের পরিবর্তে শুভ্রাই জানাল।...ত্রিদিবেশ কাকিমা? নীরদবরণ বুঝেছেন। অপরেশের ছোট-ভাই ত্রিদিবেশের পরিবার। ডঃ ত্রিদিবেশ চক্রবর্তী। তারপর ভাবলেন নীরদবরণ।...সুবু তো বেশ আলাপে মেয়ে! এই তো কিছুক্ষণ আগে এ বাড়িতে ঢুকল। এর মধ্যেই সকলের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। এটা ভাল লক্ষণ।

—আপনার নাতনিকে সত্যিই দেখতে খুব সুন্দর। মুকুটটা পরে দেখুন ওকে কেমন প্রতিমার মতন লাগছে।—মহিলা বলল নীরদবরণকে। ঠিকই বলছে। নীরদবরণ চোখ মেলে তাকালেন নাতনির দিকে। সুবুকে যে এত ভাল দেখতে অনেকদিন যেন মনে হয়নি! মুকুটটা দেখেই বোঝা যায় রুপোব। মুকুটের গায়ে যে ছোট ছোট সবুজ পাথব ওগুলো কি পান্না?

—এসব নিশ্চযই অপর্ণার বিয়ের গয়না?—জিজ্ঞেস করলেন নীরদবরণ।

—হ্যাঁ। অপুর।—মহিলা বলল।—এই মুকুট বরপক্ষ থেকে দিয়েছে। আরও অনেক গয়না দিয়েছে। খুব বডলোকের বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে অপুর।....ওরা—যাকে বলে গয়না দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাচ্ছে পুত্রবধূকে।

—কনের গয়না হঠাৎ আমার নাতনি মাথায় পরে ঘুরছে। এটা কি ঠিক?...সুবু—যাও মুকুট মাথা থেকে খুলে রেখে দাও। পরের গয়না ওভাবে পরতে নেই।

—তাতে কী হয়েছে কাকাবাবু? ও তো আমার বোনের মতন। একবার মুকুটটা পরেছে তাতে কী হয়েছে?...সত্যিই আমার বোনকে এত সুন্দর দেখতে...।

নীরদবরণ ঘুরে তাকালেন। হেরিকেনের আলোতে অনভ্যস্ত তার চোখ। তবুও সব কিছু বেশ দেখতে পাচ্ছেন তো। নাকি এখানে চারপাশে অন্ধকার বলেই হেরিকেনের আলোই যথেষ্ট জোরাল মনে হচ্ছে? নীরদবরণ দেখলেন শোবার ঘর থেকে এই টানা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে অপর্ণা। কথাগুলো সে বলল।

—তুমি আবার উঠে এলে কেন মা? বেশ তো শুয়ে ছিলে। তোমার তো মাথা ধরেছে...।—উদ্বেগের স্বরে নীরদবরণ বললেন।

—এখন একটু ভাল বোধ করছি।—হেসে অপর্ণা বলল।

নীরদবরণের মৃদু ধমক খেয়ে শুভ্রা একটু থমকে গেছে মনে হল। তার মুখ যেন কাঁচুমাচু। যদিও পান্না(?) বসানো রুপোর মুকুট এখনও তার মাথায়। হেরিকেনের আলো সেই মুকুটে প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগছে। কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তিকর পরিবেশকে আবার সহজ করতে যেন অপর্ণাই এগিয়ে এল।

শুভ্রার হাত ধরে মৃদু টেনে সে বলল—এসো বোন-ওরা আমার জন্যে যত গয়না পাঠিয়েছে সব একটা একটা করে তোমাকে পরিয়ে দিই।...আসলে তোমাকেই ঐ গয়নাগুলোতে ঠিক মানাবে।

নীরদবরণ কিছু মন্তব্য করার আগেই অপর্ণা, শুভ্রা আর ত্রিদিবেশের স্ত্রী পাশের ঘরে আবার ঢুকে যাচ্ছে। অপর্ণার স্বভাব-চরিত্র তো বেশ ভাল! নীরদবরণের মনে হল। কিছুক্ষণের আলাপ সুবুর সঙ্গে। কিন্তু কত আপন করে নিতে পারে। অবশ্য তা হবারই কথা। অপরেশের মেয়েটি

তো মোটামুটি শিক্ষিত বলা চলে। স্কুল-ফাইন্যাল পাস। হয়তো সারা কাটোয়াতে ঐ এতটা শিক্ষিত মেয়ে। শিক্ষার আলো পেলে মানুষেব মন অনেক পরিণত হয়। এটা নীরদবরণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। ইংরেজরাও এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। তারা শাসকের জাত হতে পারে। অত্যাচারী হতে পারে। বেনিয়া-মানসিকতার হতে পারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই শিক্ষায় প্রকৃত বিভায় আলোকপ্রাপ্ত। একদিকে ইংরেজরা শাসন করছে ভারতীয়দের, বাঙালিদের। আবার অন্যদিকে তারাই তো এদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্যে—প্রাণপাত করেছে। বেথুন সাহেব প্রথম মেয়েদের জন্যে স্কুল খুলেছিলেন। এটা কি কম কথা? বেথুন স্কুলের পর বেথুন কলেজেরও পত্তন করেছে তো তারাই। বাঙালি মেয়েরা অন্দর মহলের ধূসর আঁধাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে শিক্ষার আলো পেতে সেই স্কুল-কলেজে যাচ্ছে তো কেউ কেউ। শিক্ষা মানুষকে উদার করে। এইমাত্র তা যেন আর একবার বুঝলেন নীরদবরণ। অপরেশের মেয়ে তো এই মাত্র সুবুর প্রতি তার ব্যবহারে কত উদারতার পরিচয় দিল।...কিন্তু অপরেশটা গেল কোথায়? নিজের স্ত্রীকে খুঁজতে গেল! মেয়ের কপালে কর্পূর তেল মালিশ করাবে স্ত্রীকে দিয়ে! কিন্তু...নীরদবরণ ভাবলেন। অপর্ণা মুখে যাই বলুক তাকে দেখে মনে হল সে বেশ নিরানন্দে আছে। কেন? কত বড়লোকের বাড়িতে তার বিয়ে হতে যাচ্ছে। তার তো আনন্দে ডগমগ করার কথা। কিন্তু অপর্ণাকে দেখে তা তো মনে হচ্ছে না? সে কি এই বিয়েতে ইচ্ছুক নয়? অপরেশ যেদিন নেমতন্ন করতে গিয়েছিলেন নীরদবরণের হাওড়ার বাড়িতে; সেদিন বলেছিলেন...যে তার মেয়ে 'লভে' পড়েছে? এক টেররিস্ট ছোকরার সঙ্গে? তার মানে কি অপর্ণাকে এই বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছে? সে নিজের মনের ইচ্ছেতে এই বিয়ে করছে না? ব্যাপারটা ঠিক কী তা জানার কৌতূহল হচ্ছিল নীরদবরণের।

বারান্দায় পায়ের শব্দ। বারান্দাতেও একটা হেরিকেন বসানো আছে। বাড়ির মধ্যে চারপাশে অনেক হেরিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো প্রতিদিন কোনও গেরস্থ-বাড়িতে এরকম থাকার কথা নয়। প্রয়োজনমতো আলো জ্বালিয়ে নেওয়া হয়। সিঁড়িতে—দালানে-অন্দরে-বাইরে এরকম হেরিকেন জ্বেলে বসিয়ে রাখা হয় না। বাড়িতে বিয়ের উৎসব। তাই আলোরও এই বিশেষ আয়োজন। আজ দেখা যাচ্ছে না। আগামিকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে গ্যাসের আলোতে হয়তো ছয়লাপ হয়ে যাবে সারা বাড়ি। নীরদবরণ সেরকমই দেখেছেন।

অদূরে হেরিকেনের আলোতে নীরদবরণ দেখলেন অপরেশ আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। পেছনে ওর স্ত্রী। কিঞ্চিৎ হাঁফাচ্ছিলেন অপরেশ। পরিশ্রমের জন্যে ততটা নয় বোধহয়। যতটা উত্তেজনায়।

নীরদবরণকে সামনে পেয়ে অপরেশ বললেন—এই যে, গিন্নিকে নিজে বগলদাবা করে নিয়ে আসতে হল। কি কান্ড বলো দিকিনি? আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে। তেনার এমন মাথা ধরেছে যে...। তো উনি মেয়ের কপালে কোথায় বারবার কর্পূর তেল মালিশ করবে তা নয়তো ভিয়েনের তদারকি করতে গেছেন! ওসব কি গিন্নি-বান্নির কাজ? বল দেকি নীরদ? ঠাকুরদের রান্নাবান্না, ভিয়েনের তদারকির ভার তো আমি দিয়েছি সমরেশের হাতে। সেই তো সেখেনে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। অপরেশের স্ত্রী মৃদু স্বরে বললেন—আচ্ছা বাবা দেকছি আমি মেয়েকে। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?...আর মেয়েকেও বলিহারি যাই। কত বড় ঘরে যাচ্ছিস। কোথায় হাসিমুখে থাকবি। তা নয়তো মুখ গোমড়া করে সারাদিন বিছানায় শুয়ে আছে। কীসের মাথা ধরেছে বুঝি না বাপু!...

নীরদবরণের মনে হল অপরেশের স্ত্রী বেশ মুখরা। তাঁর নিজের স্ত্রী যূথিকার ঠিক বিপরীত। যূথিকা সবসময় স্বামীর সামনে নুয়ে থাকেন। যা নীরদবরণের ভালই লাগে। ঘরের বউ-ঝি আবার মুখ তুলে কথা বলবে কী? তারা মুখ বুজে থাকবে। কথা বলবে বাড়ির পুরুষ।

অপরেশ স্ত্রীকে ফিরতি কিছু বলবার আগেই নীরদবরণ জানালেন—তোমাদের মেয়ের মাথা

ধরা বোধহয় একটু কমেছে। এখন সে মেয়েদের মজলিশে গিয়ে বসেছে। আর আমার নাতনিটাও হয়েছে তেমনি! বিয়েবাড়িতে এসে বিয়ের কনের মাথার মুকুট পরে ঘুরছে।

—আহা তা পরুক না।—অপরেশ বললেন।—শুভ্রা কিন্তু বেশ মেয়ে।

—আপনার নাতনিকে ঠিক প্রতিমের মতো দেখতে।—অপরেশের স্ত্রী বললেন।....ওর বিয়ে দিচ্ছেন কবে? পাত্তর দেখেছেন? আমাদের বর্ধমানে কিন্তু অনেক ভাল ভাল পাত্তর জোটে। দরকার হলে বলবেন। আমরা আপনার নাতনির উপযুক্ত পাত্তর দেখে দেব...।

—আচ্ছা সে হবেখন।—অপরেশ বললেন।—শুভ্রার বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তুমি এখন আমাদের মেয়েটাকে দেখ দিকিন। আজ এত মাথা ধরেচে কাল যে ধরবে না কে বলতে পারে?

—হ্যাঁ। দেখি। আবার মেয়ের কপালে এট্টু কর্পূর-তেল মালিশ করি। আমার হয়েচে জ্বালা!-

অপরেশের স্ত্রী চলে যেতে নীরদবরণ বললেন—এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে? না কোথাও বসব?

—হ্যাঁ চলো। আমাদের বাগানের দিকে যাই। ওখেনে গোলঘরে বসব।

—গোলঘর? মানে গোলাঘর? সেখানে তো ধান রাখো?

—না রে ভাই। গোলাঘর নয়।...গোলঘর। বাড়ির পেছনে আমের বাগান আছে। সেখেনে একটা ঘর বানিয়েছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেব বলে। তা তেমন বন্ধু আর এখেনে কে আছে? তারা সব গেঁয়ো ভূত। সর্বদা টাকার চিন্তা আর বিষয়-আশয়ের চিন্তা মাথায় ঘুরছে। বসা তেমন হয় না। তবে ঘরটা তুমি আসবে বলে পরিষ্কার করিয়েছি। মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আমার তেমন দুশ্চিন্তা নেই ভায়া। মনে হচ্ছে ভালয় ভালয় সব উতরে যাবে। দোকান-বাজার অন্য ব্যবস্থার ভার ছোটভাই ত্রিদিবেশকে দিয়েছি। রসুই আর ভিয়েন-ঘর দেখাশোনা করছে মেজভাই সমরেশ। আমি এখন ঝাড়া হাত পা।... তোমার সঙ্গে বসব। ভাল জিনিস আনিয়েছি। গেলাস—টেলাস সব রেডি। শুরু করবে তো?—অপরেশ চোখ মটকালেন।

—কী জিনিস শুনি? আমি তো স্কচ ছাড়া খাই না....।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। স্কচই আছে। তুমি আমাকে চিরকাল আন্ডার এস্টিমেট করে গেলে।

—বাহ বাহ। গ্রান্ড। কাটোয়ায় বসে হেরিকেনের আলোতে স্কচ? আনথিংকেবল!—নীরদবরণের স্বরে উল্লাস ফুলে উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে দুই বন্ধু বাগানের দিকে হাঁটছেন। বাড়ির পেছনদিকে বাগান। বন্ধুকে অনুসরণ করছিলেন নীরদবরণ।

হঠাৎ বললেন—অপরেশ তোমার মেয়ে কোন্ এক টেররিস্ট ছোকরার সঙ্গে লভ-এ জড়িয়ে পড়েছিল না? সে ব্যাপারটা কীভাবে ট্যাকল করলে?

অপরেশ নীরদবরণের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—শুনতে চাও? এখনই বলব।...আগে পেটে দু-এক পাত্তর পড়ুক...।

ষোলো

পানভোজনের যা আয়োজন করেছেন অপরেশ তা দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে হল নীরদবরণকে। এ বাড়ির বাগানটিও বেশ। কত রকম গাছ। ফুলের গাছ যেমন আছে। ফলের গাছের সংখ্যাও কম নয়। তবে আবছায়া—অন্ধকারে গাছগুলো আলাদা আলাদাভাবে চেনা

মুশকিল। আকাশের দিকে একবার তাকালেন নীরদবরণ। আজ দুপুরে ট্রেনে আসতে বেশ গুমোট লাগছিল। আকাশের চেহারা ছিল ঘোলা। রোদের তীব্রতাও ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেই গুমোট ভাবটা কখন যেন কেটে গেছে। মাথার ওপর ঝক্‌ঝকে, নীল আকাশ দেখছেন নীরদবরণ। চুমকির মতো নক্ষত্রের পাঁতি এখানে সেখানে। বেশ আরামপ্রদ বাতাস বইছে মাঝে মাঝে। তাতে গুমোট ভাবটা কেটেছে। কী বড়, ছড়ানো আর খোলামেলা আকাশ। এই বিশাল আকাশের নীচে দাঁড়ালে নিজেকে কত ক্ষুদ্র মনে হয়। সবথেকে বড় কথা, এই মুহূর্তে যেটা নীরদবরণের মনে হচ্ছিল, কলকাতা শহরে থেকে আকাশকে কতদিন এভাবে চোখ মেলে দেখাই হয়নি। মাথার ওপরে এত বিশাল একটা আকাশ আছে ভুলেই গিয়েছিলেন বোধহয়। বেশ ভাল লাগছিল নীরদবরণের। তাঁর একবার মনে হল, তাঁর সংসারজীবন থেকে ভ্রমণ ব্যাপারটা তিনি যেন একেবারে বাদই রেখেছেন। মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে গেলে তো হয়। তিনি একা নন। যূথিকাকে নিয়ে। এটা যেন আজ একেবারে আবিষ্কারের মতো মনে হল নিজের কাছে, যে, স্ত্রীকে নিয়ে বিয়ের পর থেকে একদিনেব জন্যেও কোথাও বেড়াতে যাননি। কোথাও বেড়াতে যাওয়া যে উচিত, সেটা মনেই হয়নি কোনওদিন। নীরদবরণের মনে হল, তিনি এতকাল যূথিকার প্রতি অবিচারই করেছেন। তিনি যেন নিজে বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সাধ-আহ্লাদকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন সব থেকে বেশি। যূথিকারও যে সাধ কিছু থাকতে পারে যে ব্যাপারে কোনওদিন ভাবেননি। বিয়ে হবার পর সেই যে যূথিকা ঢুকেছেন শ্বশুরবাড়িতে তারপর আর বের হওয়া হয়নি তাঁর। বোধহয় বছর দশ আগে যূথিকাকে একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়েছিল। সে অনেক দূর। সেই বাঁকুড়া জেলার সোনামুখি বলে একটা জায়গায়। সোনামুখি তো একটা টিমটিমে মফস্বল শহর। নীরদবরণের শ্বশুরবাড়িটা সেখানে হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু সোনামুখি শহরে তো নয়। শহর ছাড়িয়ে আরও অনেক মাইল যেতে হয়। এক অজ গাঁয়ে। সেখানে এখনও পিচের রাস্তা হয়নি। হয় হেঁটে নয়তো গরুর গাড়িতে যেতে হয়। তিরিশ বছরেরও বেশি বিবাহিত জীবনে নীরদবরণের শ্বশুব-বাড়ি যাওয়া হয়েছে মাত্র দু'বার। একবার তো সেই যা বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও মনে আছে।...ভয়ঙ্কর? হ্যাঁ ভয়ঙ্করই তো। বিয়ের দিন সকাল থেকেই আকাশ ভেঙে নেমেছিল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি থামতেই চাইছিল না। হাওড়া থেকে কয়লার ট্রেনে বর্ধমান এসে, সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বর আর বরযাত্রীদের প্রথমে সোনামুখি পৌঁছতে হয়েছিল। কিন্তু তারপর যূথিকাদের গ্রামে যেতেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল নীরদববণের। গ্রামে পৌঁছনোর পুরো রাস্তাটাই ছিল মাটির। সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টির ফলে সেই মাটির রাস্তা নদীর আকার নিয়েছিল। রাস্তার সেই রূপ দেখে নীরদবরণ সেখানেই বেঁকে বসেছিলেন। জলে নেমে, কাদায় হাঁটু ডুবিয়ে তিনি কিছুতেই বিয়ে করতে যেতে পারবেন না। যূথিকার মামা ছিলেন সঙ্গে। বর এবং বরযাত্রীদের তিনি নিতে এসেছিলেন। তাঁর তো নীরদবরণকে হাতে-পায়ে ধরার অবস্থা। প্রকাশ্য রাস্তাতেই, অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই রীতিমতো ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল বাবা আর ছেলের মধ্যে। নীরদবরণের বাবা ছেলেকে বলেছিলেন—যদি সাঁতরে কনেপক্ষের বাড়ি যেতে হয় তাও যেতে হবে। যাবে না মানে? ছেলেখেলা নাকি? একটা মেয়েব ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার ওপর! যূথিকার মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন সোনামুখি শহরে যদি অন্তত একটা পালকি পাওয়া যায়। পালকিতে বসেই না হয় বর যাবে। কিন্তু কাছাকাছি. এখনও বেশ স্পষ্ট সব মনে আছে নীরদবরণের পালকি যদিও বা মিলেছিল, বেয়ারাদের পাওয়া যায়নি। ওরকম বৃষ্টির মধ্যে কোমরসমান জল ঠেলে কে যাবে পালকি নিয়ে? তখন বর এবং বরযাত্রীদের জল-কাদা ভেঙে, পিছল খেতে খেতে, (কেউ কেউ আছাড়ও খেয়েছিল, নীরদবরণ নয়) ভিজে টইটম্বুর হয়ে পৌঁছতে হয়েছিল কনেপক্ষেব বাড়ি। নীরদবরণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করেছিলেন, এরকম শ্বশুরবাড়িতে তিনি আর কোনওদিন আসবেন না। যূথিকা অবশ্য সেই প্রতিজ্ঞার কথা জানেন না। শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নীরদবরণ শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। যূথিকাকে নিয়ে সঙ্গে ছিল বড়ছেলে ক্ষীরোদবরণ। আর হাওড়ার ঘুপচি বাড়িটা থেকে কোথাও যাওয়া যূথিকারও সেই শেষ। সেও তো প্রায় দশ-বারো বছর হয়ে গেল। এবার কলকাতায় ফিরে যূথিকাকে নিয়ে সত্যিই একবার ভ্রমণে বের হতে হবে। কোথায় যাওয়া যায়? পুরী? না দেওঘর? যাবেন কোথাও একটা। আচ্ছা-মেয়ে—জামাইয়ের ওখানে গেলেই বা কেমন হয়? সেই ঝালদা। অনেকদূর। মানভূম জেলা। বিশ্বদেব অবশ্য শ্বশুরকে যেতে টেতে তেমন বলে না। সে কেমন যেন রুক্ষ স্বভাবের। নীরদবরণকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করার একটা ঝোঁক তার মনে যেন সর্বদাই ক্রিয়াশীল। অবশ্য শাশুড়ির সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক বেশ ভালই। বিশ্বদেব শ্বশুরবাড়ি এলে শ্বশুরের সঙ্গে যত না কথা বলে, শাশুড়ির সঙ্গে বকবক করে ঢের বেশি। নীরদবরণ সবই লক্ষ্য করেন। কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না। কিন্তু বিশ্বদেব না বলুক। মেয়ে তো বলে। সুনীতি শুধু সামনাসামনি বলে না। চিঠিতেও লেখে। নীরদবরণের মেয়ে যখন সুনীতি একেবারে মূর্খ নন। কিঞ্চিৎ লিখতে পড়তে জানেন। সুনীতির হাতের লেখাটিও বেশ ভাল। গোটা গোটা ছাঁদের অক্ষর। মাঝে মাঝে তার পোস্টকার্ড সুদূর ঝালদা থেকে এসে হাজির হয়। তাতে বাবা এবং মা দুজনের কাছেই আবেদন থাকে।...তোমরা দুজনে একটিবারের জন্যে অন্তত এখানে ঘুরিয়া যাও। দেখিয়া যাও ঝালদা কত সুন্দর জায়গা।...এবার তাহলে যূথিকাকে নিয়ে নীরদবরণ ঝালদাতে ঘুরে আসবেন। তাঁদের সঙ্গে শুভ্রাও যাবে। সেও ঘুরে আসবে কদিন তার বাবা-মায়ের কাছে।

—কি ভায়া তুমি বাগানের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কার ধ্যানে ব্যস্ত হয়ে পড়লে?—নীরদবরণের অন্যমনস্কতা কাটল। তিনি তাকালেন। অপরেশ বন্ধুকে বাগানের মাঝখানে গোলঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে একবার বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলেন। এখন ফিরে এসেছেন। ঝকঝকে নীল আকাশে তারার চুমকিরা যেমন আছে। তেমনই চাঁদও হাসছে। পরিপূর্ণ চাঁদ অবশ্য নয়। মাথার দিকে কিঞ্চিৎ কাটা পড়ে যাওয়া চাঁদ। যেন চাঁদের মাথার দিকটা কেউ সামান্য একটু ছেঁচে দিয়েছে। কিন্তু সেই মাথাভাঙা চাঁদই ঝলমল করছে আকাশে। চাঁদের কিরণ আর চারপাশের ঝড়ো হওয়া আঁধার মিলেমিশে কেমন এক ভাল লাগার আবেশ তৈরি হয়েছে। চাঁদের আলোতে নীরদবরণ দেখলেন—অপরেশের দু-হাতে ধরা আছে একটা ছোট চ্যাঙারি। সেই চ্যাঙারিতে কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে মনে হচ্ছে।

—ওগুলো কি নিয়ে এলে আবার? —জিজ্ঞেস করলেন নীরদবরণ।

—কিছু বেগুনি ভাজিয়ে নিয়ে এলুম। রসুইঘরের ঠাকুররা ভেজে দিল। খুব মুচমুচে। একেবারে ফ্রেশ তেলে ভাজা...।

—বেগুনি সহযোগে হুইস্কি?...কোনওদিন ভাবিনি।—হাসলেন নীরদবরণ।

—শুধু বেগুনি কেন হবে? তুমি কী ভাবো আমাকে? গেঁয়ো ভূত? এটা ঠিক যে আমি গাঁয়ে থাকি। তাতে কী হয়েছে? আমার সাহেব বন্ধুর অনারে আমিও আজ একটু সাহেব হতে চাই।

—হুইস্কির সঙ্গে আর কী আছে ভাই?

—গোলাঘরের মধ্যে ঢোক। তুমি তো এখনও ভেতরে গেলেই না। বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে ছিলে। দেখে মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকেও কোনও তারা খসে পড়বে আর তুমি টুপ করে সেটা গিলে নেবে।...তো কীসের ধ্যান করছিলে শুনি?— গোলঘরের দরমা-দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে অপরেশ জিজ্ঞেস করলেন।

—একটা ইংরেজি কবিতার কথা মনে পড়ল।—মনের আসল ভাবনগুলোকে না প্রকাশ করে নীরদবরণ মিথ্যে বললেন।

—ইংরেজি কবিতা? কার? আমিও তো ক্লাশ নাইন-ট্রেনে ইংরেজি পড়াই। বলো দেখি কবির নামটা?

—কবির নাম বলছি না। কবিতার নাম বলছি—To One Who has long been in city pent—।

—হ্যাঁ জানি। এতো জন কিটস-এর কবিতা।

—কবিতার বিষয়বস্তু তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?

—কেন মনে থাকবে না?...একজন শহুরে মানুষ গ্রামে বেড়াতে এসেছে। তার কী মনে হচ্ছে সেটা নিয়েই কবিতা।

—তোমার এখানে এসে, আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমারও কবিতার সেই লোকটার মতো মনে হচ্ছে আকাশ এত বড় প্রকৃতি এত সুন্দর, জীবন এত মায়াময় এই দারুণ সত্যটা আমি যেন ভুলেই গেছিলুম।

—বাববা! এতো দেখছি তোমার মনে ভাবেব উদয় হয়েছে। এর মধ্যেই এই। তারপর পেটে মাল পড়লে না জানি কি হবে। খাতা-কলম চেয়ে বসবে। কবিতাই লিখে ফেলবে হয়তো। কিন্তু ভায়া আগামিকাল যে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান সেটা যেন মনে থাকে। বেশি রাত করা যাবে না। ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠতে হবে।

—সে দেখা যাবে। আগে শুরু তো করি।

—চলো। শুরু করা যাক। আরেঞ্জমেন্ট কেমন সেটা আগে নিজের চোখে দেখে নাও।—অপরেশ হেসে বললেন। গোলাঘরে একটা ছোট টেবিল। গোলাকৃতি। দামি কাঠ। দেখেই বোঝা যায়। হয়তো রিয়েল টিক। অপরেশদের পরিবারে আভিজাত্য আছে।

সেই ছোট সাইজের গোলাকৃতি টেবিলের একপাশে একটা হেরিকেন। ঘরটা আকৃতিতে ছোট হওয়ায় হেরিকেনের আলো খুবই উজ্বল লাগছে। সেই আলোতে দেখছিলেন নীরদবরণ। হেরিকেনের পাশে একটা বড় পেটমোটা বোতল। নীরদবরণ দেখেই চিনেছেন। সাদা ঘোড়া। হোয়াইট হর্স। স্কচ হুইস্কি। বোতলের ঠিক পাশে একটা বড় কাচের প্লেটে কাজুবাদাম। আর একটা প্লেটে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখা আপেল। তার ঠিক পাশে অপরেশ বেগুনি-ভর্তি চ্যাঙারিটাও রাখলেন। তারপর একগাল হেসে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—কি ভায়া আরেঞ্জমেন্ট দেখে পছন্দ হচ্ছে?

নীরদবরণের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। তিনি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি উচ্ছ্বাসে বললেন—একি করেছ ভাই? পার্ক স্ট্রিটের ছোটখাটো একটা বার বানিয়ে ফেলেছ! ওহ—ম্যাকেঞ্জি-পাগলাকে যদি একবার এখানে আনা যেত! সে যে কি আনন্দ পেত!

—ম্যাকেঞ্জি মানে তোমার অফিসের সেই সাহেবটা।

—হ্যাঁ।

— লেট আস ড্রিঙ্ক টু ইওর ম্যাকেঞ্জি'স হেলথ?—খাঁটি ইংরেজিতে গ্রাম্য অপরেশ বললেন।

—ইয়েস, আর দেরি করা ঠিক নয়। এসো শুরু করি। নীরদবরণ অভ্যস্ত হাতে বোতলের ছিপি খুলে টেবিলের একপাশে রাখা দুটো কাচের গেলাসে মদ ঢালতে লাগলেন। কড়া হুইস্কির গন্ধে এক নিমেষে ভরে গেল খড়ে ছাওয়া-গোলাঘর।

নীরদবরণ বললেন—চিয়ার্স!

অপরেশ বললেন—চিয়ার্স! বেস্ট অব হেলথ টু ম্যাকেঞ্জি। নীরদবরণ বারবার তাকিয়ে

দেখছিলেন সামনে টেবিলের ওপর থরে থরে সাজানো জিনিসের দিকে। মদের বোতল, কাজুর পাহাড়, কাটা আপেলের স্তূপ, চ্যাঙাবিতে বেগুনির সমাহার। ঠিক যেন একটা পেইন্টিং। স্টিল লাইফ। সেজানের আঁকা। পল সেজান। ফরাসি শিল্পী। এই সেজানের কথাও নীরদবরণ শুনেছেন ম্যাকেঞ্জির কাছেই। ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহে অনেক বিদেশি পেইন্টিং-এর অ্যালবাম আছে। সেজান। পল গঁগা। ভ্যান গগ। এসব নাম তো ম্যাকেঞ্জির কাছেই শুনেছেন নীরদবরণ। ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে বসা মানেই শিক্ষিত হওয়া। ম্যাকেঞ্জির কাছে অনেক ঋণ নীরদবরণের।

সতেরো

বেগুনিগুলো বড় চমৎকার বানিয়ে এনেছে বটে অপরেশ। ভাবলেন নীরদবরণ। তিনি তেলেভাজা খান না বললেই চলে অন্তত দোকান থেকে কিনে আনা তেলেভাজা তাঁর রোচে না। ওসব অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বাড়িতে ঢুকতে দেন না তিনি। যদিও জানেন, ক্ষীরোদ প্রায়ই হাবুর মা-কে দিয়ে দোকানের তেলেভাজা আনিয়ে খায়। মুড়ি, তেলেভাজা তার নাকি খুব প্রিয় খাবার। যূথিকার মুখে যা শুনেছেন। হবেই তো। অশিক্ষিত, আনকালচারড্ লোকজনের সঙ্গে যাত্রাপালা করে বেড়ালে তার টেস্ট তো ওরকমই হবে। সে চায়ের দোকানের আড্ডায় বসে মুড়ি-তেলেভাজা ওড়াবে, বিড়ি খাবে, চা চলবে ভাঁড়ের পর ভাঁড়। আর নিম্নশ্রেণির রসাল আলোচনা হবে। ক্ষীরোদের টেস্ট ওরকমই। নীরদবরণের ধারণা। বাড়ির বড় ছেলেকে আর মানুষ করা গেল না। লেখাপড়াও তেমন শিখল না। যাত্রাপালা নিয়ে পড়ে থেকে নিজের কেরিয়ারটাকেই নষ্ট করল। এদিকে বয়স বাড়ল। বিয়েও দিতে হল ক্ষীরোদের। চাকরি-বাকরি তো কিছু করে না। চাকরি খোঁজার দিকে আগ্রহও নেই, ক্ষীরোদের। তখন নীরদবরণ বড় ছেলেকে একটা সাইকেলের দোকান করে দিলেন। বলা যেতে পারে, উইলিয়ামস অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির একটা সাব এজেন্সি দিলেন ক্ষীরোদকে। সাইকেল এবং সেই সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি সব এজেন্ট হিসেবে ক্ষীরোদ পাবে খোদ কোম্পানি থেকে। তার দোকানে সেসব বিক্রি করবে। শেয়ার ফিফটি ফিফটি। অর্থাৎ যদি একটা সাইকেল ক্ষীরোদের দোকান থেকে বিক্রি হয় তিনশ টাকায় তাহলে কোম্পানি পাবে দেড়শ টাকা। ক্ষীরোদ পাবে দেড়শ টাকা। এর থেকে সহজ বিজনেস হয়? পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ারে কোম্পানি কোনও এজেন্ট-এর সঙ্গে বিজনেসে যায় না। ক্ষীরোদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটা যে এরকম তার কারণ হল, নীরদবরণের প্রতি উইলিয়াম এবং ম্যাকেঞ্জি এই দুই সাহেবেরই দুর্বলতা।...ইট ইজ ইওর সান'স অ্যাফেয়ার। উই উইল গ্র্যান্ট, দ্য বেস্ট পসিবল কমিশন। বিকস ইউ আর আওয়ার বেস্ট ওয়ার্কার। উই শুড দাজ পে রিগার্ডস টু ইওর কমপিটেন্স।—এরকমই হল সাহেবদের বক্তব্য। নীরদবরণ কোম্পানির জন্যে জান-প্রাণ দিয়ে করেন। কোম্পানিও তাঁকে দেখবে বইকি। বড় ছেলেকে দোকানটা নীরদবরণ করে দিয়েছেন বউবাজারে। বেশ বড়সড় একটা দোকানঘর। নামমাত্র মাসিক ভাড়ায় এই দোকানঘরটা নীরদবরণ পেয়েছেন তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে। সেই ব্যক্তিটিও কোম্পানির এজেন্ট। যেহেতু নীরদবরণ কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস্ ম্যানেজার তাই তাঁর সঙ্গে সেই ব্যক্তির সরাসরি পেশাদার সম্পর্ক। নিজের ছেলের মঙ্গলের জন্যে সেই সম্পর্ক ইউটিলাইজ করতে পিছপা হননি নীরদবরণ। কিন্তু ক্ষীরোদ মন দিয়ে দোকান চালায় না। বেচাকেনা সে নিজে যে খুব দেখে তা নয়। নিমাই লাহা নামে কে একজন তার ইয়ার-বন্ধু আছে তার, হাতে প্রায় দোকানটা সঁপে দিয়ে বসে আছে। সেই নাকি দোকানের ম্যানেজার-কাম-ক্যাশিয়ার। নীরদবরণ নানা সূত্রে দোকানের খবর রাখেন। দোকান

যে একেবারেই ভাল চলছে না, সেটা তাঁর জানতে বাকি নেই। এসব নিয়ে ক্ষীরোদবরণের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝে অশান্তি লেগে যায়। কিন্তু ক্ষীরোদ নিজের ভাল বুঝছে না। ভাল পরামর্শ কিংবা যুক্তি সে মানতে চায় না। আর তার বউ বন্দনাও হয়েছে সেরকম। সে প্রায়ই বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকে। বিয়ে হল তিন বছর। একটা পুত্রসন্তানও হল। তাও নিজের সংসারের প্রতি যেন তেমন টান আসছে না বন্দনার। সেও তো স্বামীকে একটু বোঝাতে পারে। কিন্তু কোথায়? সেরকম কোনও লক্ষণ নজরে আসেনি নীরদবরণের। ছেলে আর বউমার মধ্যে খিটিমিটি দিনরাত যেন লেগেই আছে। কীসের এত ঝগড়া তাদের তা বোঝেন না নীরদবরণ। আর বউমারও এত ঘনঘন বাপের বাড়ি দৌড়নোর কী আছে? মাঝে মাঝে নীরদবরণের ভীষণ রাগ হয়। সংসারের কোনওকিছুই যেন তাঁর মনের মতো চলছে না।....অ্যা ডিসকরড্যান্ট নোট....নীরদবরণ মাঝে মাঝে বিড়বিড় করেন। সবকিছু বেসুরো বাজছে। বড় বেসুরো বাজছে। কেন এমন হয়? কেন নিজের অভিলাষ মতো সংসার চলে না? কেন যা ভাবেন, পরিকল্পনা করেন, সবকিছু যেন তার উলটো হয়ে যায়। এসবও কী অদৃষ্টের খেলা? Man proposes but God disposes...।

—কী ভায়া? কেমন এনজয় করচ?—দুজনেরই দু-পেগ হয়ে গেছে। অপরেশ জিজ্ঞেস করলেন। নীরদবরণের কাছে এই দু-পেগ স্কচ কিছুই নয়। তাঁর তো এই সবে শুরু....beginning of the end.। অন্তত পাঁচ থেকে ছয় পেগ না টানলে নীরদবরণের নেশা হয় না। কিন্তু অপরেশের মুখ তো এর মধ্যেই টস্‌টস্ করছে। তার বাক্যেও যেন সামান্য জড়ানো টান। আজ বেশিক্ষণ ড্রিংক না করাই ভাল। তাতে অপরেশের পক্ষে ভাল হবে না। তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। সে মেয়ের বাপ বলে কথা।

—এনজয় করছি তো বটেই। কলকাতা থেকে এত দূরে তুমি যে এমন ব্যবস্থা করবে তা তো আগে বুঝিনি। সত্যিই খুব ভাল লাগছে। আই অ্যাম রিয়েলি এনজয়িং।

—তাহলে গেলাস শেষ কর? তুমি তো খুব ধীরে চলচ?

—তুমিও তাই করো অপরেশ। ডোন্ট গো সো ফাস্ট। স্কচ কিন্তু খুব ডিসেপটিভ—জানো তো?

—মানে? ডিসেপটিভ মানে তো প্রতারক?

—স্কচ একজন অনভিজ্ঞ লোকের সঙ্গে সবসময় প্রতারণা করে। প্রথমে তুমি পরপর গলায় ঢেলে যাবে কিছুই বুঝবে না। মনে হবে নেশা হচ্ছে না। তারপর যখন নেশা ধরে যাবে তুমি আর সামলাতে পারবে না। তাই বললুম, আস্তে পান করো। আচ্ছা, তুমি কি প্রায়ই ড্রিংক কর অপরেশ?

—খেপেচ ভায়া? প্রায়ই ড্রিংক করব সে সুযোগ কোথায়? আর রেস্তই বা কোথায়? সামান্য ভিলেজ স্কুল মাস্টার। আর ড্রিংক করার জন্যে কমপ্যানিওন চাই। পরিবেশ চাই। তোমাদের যেটা আছে। সাহেব-বন্ধু আছে। পার্ক স্ট্রিটের হোটেল আছে। আমার সেসব সুযোগ কোথায়? আমি তো চিরকাল গেঁয়ো ভূতই হয়ে রইলুম।

—তবুও লাস্ট কবে ড্রিংক করেচ?—নীরদবরণ গেলাসে ছোট চুমুক দিলেন।

—বলছি।...কিন্তু তুমি তো ভাই শুধু বেগুনি খেয়ে যাচ্চো? কাজু নিচ্ছ না। আপেল নিচ্ছ না?

—বেগুনিটা খুব ভাল লাগছে। অয়েল-কেক আমি নর্মালি খাই না। কিন্তু এগুলো ভাল লাগছে। কারণ বেগুন আর তেল দুটোই খুব খাঁটি। আর বেসনের মিশ্রণটাও খুব প্রপোরসানেট।

—ঠিকই ধরেছ। মিল থেকে আমাব খেতেব সরষে ভাঙিয়ে তেল বানিয়ে নিয়েছি। এরকম

তেল ছাড়া আমরা বাড়িতে টিনের তেল খাই না। আর যে ঠাকুর কিংবা হালুইকর এই বেগুনি বানিয়েচে তার মতো রান্নার কারিগর সারা কাটোয়া শহরে বোধহয় আর দ্বিতীয়টি মিলবে না। ওর নাম হল যদু ঠাকুর। ওর হাতের রান্না হল অমৃত। বিয়েবাড়ির রান্নাও যদু ঠাকুরই রাঁধবে। জিভে দিলেই বুঝবে তার স্বাদ।

—সে তো বুঝব। কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনের আনসার পেলুম না। লাস্ট কবে ড্রিংক করেচ?

—সেই বিজয়া দশমীর দিন আর দোলপূর্ণিমার রাতে। আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড আছে। কেউ মাস্টার। কেউ চাকুরে। তাদের পাল্লায় পড়ে।...আবার দেখো বেগুনি নেয়? কাজু নাও?

—তোমাকে একটা কথা বলি অপরেশ। আমাদের বয়স হয়েছে। কাজু নাটস বেশি গিলো না। ওতে কোলেস্টেরল বাড়ে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তার থেকে ফ্রুটস বেটার।—নীরদবরণ একটুকবো আপেল নিলেন। অপরেশও তাঁর মুঠোর কাজু বাদাম প্লেটে রেখে দিয়ে এক টুকরো আপেল নিয়ে কচ্‌কচ্‌ কামড়াতে লাগলেন। সন্ধে যত রাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, চারপাশ তত নিশুতি হয়ে উঠছে। একটানা ঝিঁঝির ডাক কানে আসছিল। চারপাশ নিস্তব্ধ বলেই বোধহয় অপরেশদের ভেতর-বাড়ি থেকে কথাবার্তার টুকরো এবং মেয়েদের হাসির শব্দ বাইরের বাগানে এই গোলঘরেও ভেসে আসছিল। ওদের মধ্যেও সুবুও আছে নিশ্চয়ই। নীরদবরণ ভাবলেন। মেয়েটা বেশ মিশে গেছে এ-বাড়িতে এসে।

—তোমার নাতনি কিন্তু বেশ গ্রেসফুল হয়ে উঠেছে নীরদ।

—হ্যাঁ। ওর মা সুনীতিকে তো দেখতে ভালই। আর বিশ্বদেব কালো। কিন্তু খুব ম্যানলি চেহারা। সুবু ওর মায়ের রং পেয়েছে আর বাবার মতো হাইট পেয়েছে। মুখশ্রীটা অবশ্য বিধাতার দান। কথাটা বলে নীরদবরণ হাসলেন এবং গেলাসে চুমুক দিলেন। খুব ছোট ছোট চুমুক। এটা দু-পেগ চলছে। তিন পেগের বেশি তিনি কিছুতেই নেবেন না। আর অপরেশকেও তিন পেগের বেশি নিতে দেবেন না।

—নাতনির বিয়ের কথা ভাবছ?—অপরেশ জিজ্ঞেস করলেন।

—গবমেন্ট ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস করাচ্ছে। কাগজে পড়োনি? এখন এইটিন ইয়ার্সের কমে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। পার্লামেন্টে সেই আইন পাস হয়ে যাবে হয়তো। তাহলে কীভাবে এত তাড়াতাড়ি সুবুর বিয়ে দেব? সে তো সবে ষোলোতে পড়েছে।

—ওসব আইন-ফাইন রাখো ভায়া। আমাদের দেশ-গাঁয়ে সেই একই থাকবে রীতিনীতি। মেয়ে চোদ্দোয় পা দিতে না দিতে শ্বশুরঘর পাঠিয়ে দিতে হবে। বাড়িতে বেশিদিন আইবুড়ো মেয়ে বসিয়ে রাখলে বাড়িতে অশান্তি। পাড়া-প্রতিবেশী কিংবা সমাজও সেটা ভাল চোখে দেখবে না। তুমি কোনদিকে যাবে? নাও দু-পেগ আমার শেষ। আর এক পেগ ঢালো।

—তুমি আর নিয়ো না অপরেশ। দিস ইজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট।

—ওমা কেন?

—তুমি কনেপক্ষের কর্তা। মেয়ের বাপ। তোমার কাঁধে অনেক দায়িত্ব। কাল সকাল থেকে বোধহয় তোমাকেও উপোস করে থাকতে হবে। যতক্ষণ না তুমি জামাইয়ের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করছ। তাই না?

—হ্যাঁ তাই। সাহেব হলেও তুমি দেখচি সব জানো।

—কেন জানব না? কোট-টাই চাপিয়ে ফরফর করে ইংলিশ বুকনি ঝাড়তে পারলেই কি সাহেব হওয়া যায় নাকি? আমি তো হিন্দুর ছেলে। খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান। আমি কেন বিয়ের

আচার-বিচার জানব না?

—তাহলে বলছ আর পেগ নেব না?

—নো। নট অ্যা সিঙ্গল ড্রপ। আমিও তিন পেগের বেশি নেব না।

—বেশ। তুমি যখন বলছ। আসলে তোমার কথা ভেবেই—। বেশি ড্রিংক-ফ্রিংক তো আমিও ঠিক পারি না। মাথা ধরে যায়। সহজে ছাড়ে না।

—ঠিক আছে। আর নিও না। দু-পেগ স্কচ পেটে গেছে। এবার তার আমেজ ফিল করো। আচ্ছা অপরেশ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব?

—তুমি যে বলেছিলে তোমার মেয়ে—অপর্ণা—কোন এক টেররিস্টের সঙ্গে লভে পড়েছে। তো সে ব্যাপারটা মিটে গেছে? কোনও অশান্তি হয়নি তো?

—অশান্তি হয়নি কে বললে? অনেক অশান্তি হয়েছে। অপর্ণা তো বেঁকেই বসেছিল। দীপককে ছাড়া কারোকে বিয়ে করবে না।

—দীপক? সে আবার কে?

—সেই বিপ্লবীর নাম। ভারি আমার বিপ্লবী হয়েছেন উনি! ঐ যে মাস্টারদা...সূর্য সেন...লোকনাথ বল এই সব আমাদের ছেলেগুলোর মাথা খেয়েচে। সেই অনুশীলন সমিতি। টেররিস্টদের দল। তারা আমাদের এই কাটোযাতেও বেশ অ্যাকটিভ। কিন্তু আমাব ধারণা ওরা পাগল। ব্রিটিশ হচ্ছে সব থেকে পাওয়ার ফুল ইমপিরিয়ালিস্ট পাওয়ার। দুটো বোমা বানিয়ে আর দেশী পিস্তল চালিয়ে আর ইংরেজদের হঠাতে হচ্ছে না এ দেশ থেকে!

—দীপক তাহলে অনুশীলন সমিতিব সদস্য?...আই সি! তো তার সঙ্গে তোমার মেয়ের লদকালদকি হল কী করে? অপর্ণা কি খুব বাইরে-টাইরে ঘোরাঘুরি করে নাকি?

—একটা কথা বলছি ভায়া। কাউকে বলে ফেলবে না তো? অপরেশ নীরদবরণের দিকে ঝুঁকে বললেন। নিচু স্বরে। যদিও কেউ কোথাও নেই। কে আর তাদের কথাবার্তা শুনতে যাচ্ছে!

—কী কথা? কাকে আবার বলব? হ্যাভ কনফিডেন্স অন মি?

—আমার মেয়ে অপর্ণাও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মেলামেশা করত।

—অ্যাঁ? বল কি?...তাহলে তো পুলিশ কেসের ঝামেলায় পড়বে?

—পড়তে পারত। তার আগেই আমি সেই বিপথ থেকে মেয়েকে সরিয়ে এনেছি...

—কী হয়েছিল? গো ইন ডিটেলস্!—নীরদবরণ উৎকর্ণ।

আঠারো

—ঠিক কী হযেছিল আমাকে খুলে বল তো অপরেশ।—নীরদবরণ বললেন। নিজের গেলাসে একটা ছোট সিপ দিলেন নীরদবরণ। দুটো বা তিনটে কাজু ছুঁড়ে দিলেন নিজের হাঁ-এর মধ্যে। অপরেশ জুলজুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বারবার বোতলটার দিকে। কিন্তু সেটা নীরদবরণ নিজের দিকে সরিয়ে রেখেছেন। দু-একবার হাত বাড়িয়েছেন অপরেশ। নীরদবরণ আর এক ফোঁটাও তাঁকে নিতে দেননি। মদের আসরে বসলে অনেক সময় নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হয়। অপরেশও সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আরও একটু পান করতেন। কিন্তু নীরদবরণ বন্ধুকে দমিয়ে রেখেছেন। এখন বুঝছেন না অপরেশ। এটা কাজের বাড়ি। যে সে কাজ নয়। তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ে। মাত্রাতিরিক্ত ড্রিংক করে তারপরে যদি সামলাতে না পারেন? তখন তো সবাই সেই নীরদবরণকেই দুষবে। খড়ের ছাওয়া এই গোলঘরের ভেতরটা সত্যিই খুব ঠাণ্ডা। দরজা

খোলা। দমকা বাতাস ছুটে এল হঠাৎ। খানিকটা আরাম দিয়ে গেল। নেশাটা অল্প ধরেছে। বেশ ভাল লাগছে নীরদবরণের। অপরেশ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন। দু-পেগ স্কচেই কি ও বেহেড হয়ে যাবে নাকি? নীরদবরণ আবার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—অপর্ণার সঙ্গে সেই টেররিস্ট ছোকরার কেসটা কতদূর গড়িয়ে ছিল বল অপরেশ?

—বলছি ভাই।—অপরেশ এতক্ষণ বাদে কথা বললেন।—বেশ আমেজ এসেছে বুঝলে?...কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ড্রিংক করছি। তবে...

—তবে আবার কী?

—আর একটু খেলে ভাল হত। আর এক পেগ।

—নো।—নীরদবরণ কড়া গলায় বললেন।—আই ওনট অ্যালাও। নেভার। এখন বলো তো এই হুইস্কির বোতল কোথা থেকে জোগাড় করলে? কাটোয়ায় তো এসব মিলবে না।

—ত্রিদিবেশ এনেছে। আমার ছোট ভাই। ওকে আমি বলেছিলুম ভাল দেখে একটা স্কচ-হুইস্কি আনবি তোদের কলকাতা থেকে।

—হি হ্যাজ আ গ্রেট চয়েস!—নীরদবরণ বললেন।—হোয়াইট হর্স খুব ভাল স্কচ।....যাই হোক। রাত বাড়ছে।—ঘড়ি দেখলেন নীরদবরণ।—ও বাবা! প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। তোমাদের এই দেশ-গাঁয়ে তো শুনিছি সন্ধে সাতটে সাড়ে সাতটায় সবাই বিছানায় চলে যায়।...ইন দ্যাট কেস, রাত তো অনেক।

—ঠিকই শুনেছ। আমরা তাড়াতাড়ি বিছানায় যাই। আবার সেই কাকভোরে বিছানা ছাড়ি। আমি ঘুম থেকে উঠি ভোর চারটেতে। কী শীত কী গ্রীষ্ম, আমার ঘুম থেকে ওঠার সময় একই থাকে। তবে বিয়েবাড়ি লেগেছে তো। কেউ এত তাড়াতাড়ি শোবে না।

—ঠিক আছে। তাহল বলো শুনি। আর ভ্যানতাড়া কোরো না।—নীরদববরণ আবার একটা সিপ্ দিলেন।

—অপর্ণার ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আর ওর মায়ের কথা ছেড়ে দাও। নিজের সংসার আর বাতের ব্যথা নিয়ে সে বছরভর কাবু হয়ে আছে। অন্য কোনও ব্যাপারে নজর দেওয়ার ফুরসুত তার নেই। আমাকে একদিন বলল কাটোয়া থানার দারোগা মহিম সান্যাল।

—দারোগা?

—হ্যাঁ। দারোগা হলেও লোকটার ব্যবহার ভাল। স্বভাবচরিত্রিরও শুনেছি খারাপ নয়। আমি শিক্ষকতা করি বলে আমাকে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

—কী শুনলে তাহলে দারোগার মুখে?

—একদিন সাইকেলে ফিরছি বাজার থেকে। দারোগা যাচ্ছিল পুলিশের জিপে। আমাকে দেখে থেমে গেল জিপ। মহিম সান্যাল ডাকল মাস্টারমশায় একবার শুনুন। কথা আছে।....আমার সঙ্গে আবাব কী কথা? আমি তার জিপের দিকে এগিয়ে গেলুম। মহিম অবশ্য ভদ্রতা করল। জিপ থেকে নেমে একটু তফাতে গাছতলায় এল। জিপে সেপাই দু-চারজন ছিল। তারা যাতে শুনতে না পায় এভাবে আমাকে বলল—মাস্টারমশায় একটা কথা বলছি কিছু মনে করবেন না। আপনার মেয়ে আজকাল কাদের সঙ্গে মিশছে খবর-টবর রাখেন? এরকম প্রশ্ন শুনে আমার একটু রাগই হল। বললুম—আমার মেয়ে আবার কাদের সঙ্গে মিশবে? তখন মহিম যা জানাল তা শুনে তো বেশ ভয় লেগে গেল আমার। অপু নাকি আজকাল অনুশীলন সমিতির মিটিং এ যাচ্ছে। ওদের নেতা গোছের একজন—দীপক সামন্ত—তার সঙ্গে নাকি অপুর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এই দীপক ছোকরা নাকি ডেঞ্জারাস। কিছুদিন আগে বর্ধমান শহরে কয়েকটা বড় ডাকাতি হয়ে গেছে। সব টেররিস্টদের কাণ্ড। ওদের নাকি অনেক টাকাপয়সা চাই। ব্রিটিশদের হঠাতে অস্ত্রশস্ত্র

কিনতে হবে।.. তো সেই সব ডাকাতিতে নাকি দীপক ছিল। পুলিশ ওকে সন্দেহ করে। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারেনি।

—আজ দুপুরেও নাকি কাটোয়ার বাজারে ডাকাতি হয়েছে? —জিজ্ঞেস করলেন নীরদবরণ।

—হ্যাঁ হয়েছে। তুমি কীভাবে জানলে?

—তোমার ভাই সমরেশ স্টেশনে আমাদের রিসিভ করতে গেছিল। সেই বলল।... ওটাও কি টেররিস্টদের কাজ।

—ঠিক জানি না ভাই। হতে পারে।

—হুঁ।....তারপর বাড়ি ফিরে মেয়েকে বকাবকি করলে?

—প্রথমে কিছুই বলিনি অপুকে। এমন কি স্ত্রীকেও বলিনি। প্রথমে নিজেই একটু আই. বি.-র কাজ করলুম।

—আই. বি?

—ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। টিকটিকি হয়ে নিজেই লাগলুম মেয়ের পেছনে।

—তাই নাকি? এতো রীতিমতো কোনান ডয়েলের স্টোরি?—হেসে বললেন নীরদবরণ। নিজের গেলাসে তলানি মদটুকু শেষ করে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিলেন। দামী পারফিউমের গন্ধ ভেসে এল অপরেশের নাকে।— তারপর? —জিজ্ঞেস করলেন নীরদবরণ।

—সে অনেক কথা। বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আমি তোমাকে ছোট করে বলছি। দারোগার ইনফরমেশন ঠিক ছিল। অনুশীলন সমিতির সভায় অপু যেমন যেত। আবার দীপকের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথাটথা বলত। বাবা হয়ে আমাকে খারাপ কাজটা করতে হয়েছিল ঠিকই। তাকে আমি কদিন আড়াল থেকে ফলো করেছিলুম। তারপর...অপরেশ থামলেন। বললেন—গলাটা খুব শুকোচ্ছে ভাই। একটু জল খাই।—পেতলের জাগ থেকে গেলাসে জল ঢেলে নিলেন অপরেশ। ঢক্ ঢক্ করে খেলেন।

নীরদবরণ বললেন—তারপর?

—তারপর আর কী? মেয়েকে নিয়ে বাড়িতে অশান্তি। তার বাইরে বেরনো বন্ধ করে দিলুম। মেয়ে তখন আমাকে শাসাল যে সে বিপ্লবীদের দলে নাম লিখিয়েছে। তাকে আটকে রাখা যাবে না। আর বিয়ে যদি কাউকে করতে হয় দীপক সামন্তকেই করবে।

—দীপক সামন্ত? সে তো ব্রাহ্মণের ছেলে নয়?

—আরে ছো ছো! সে হল আগুড়ি! লেঠেলদের জাত। এই সম্প্রদায়ের লোকজন আগে রাজাদের, জমিদারদের লেঠেলের কাজ করত।

—ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে অব্রাহ্মণকে বিয়ে? তাও আবার টেররিস্ট?

—আর বোলো না ভাই। দিনের পর দিন বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে অশান্তি। কেঁদে কেঁদে স্ত্রীর শরীর তো খারাপই হয়ে গিয়েছিল। এখন কিছুটা সামলে নিয়েছে। আমার অপুর আবার ছোটবেলা থেকেই খুব জেদি আর একগুঁয়ে। একবার গোঁ ধরলে ওকে থামানো মুশকিল। বিপদ বুঝে আমি পড়িমরি করে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করতে লেগে গেলুম। তো আমাদের ঘটক একদিন এই পাত্রটির খোঁজ নিয়ে এল।

—কীরকম পাত্র সে? সেসব তো জানাই হয়নি আমার। অপর্ণা যাদের বাড়ির বউ হয়ে যাচ্ছে তাদের স্ট্যাটাসই বা কীরকম?

—সব ঠাকুরের কৃপা ভাই। আমার অপুর জন্যে যে এত ভাল পাত্তর পাওয়া যাবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

—কীরকম? একটু ডিটেলসে শুনি?

—ছেলের নাম মনীশ। মেমারির বাড়ুজ্জ্যে পরিবার। খুব বর্ধিষ্ণু পরিবার। ওদের ধানকল আছে দুটো। তেলকলও আছে। জমিজমা অনেক। ছোটখাটো জমিদার বলতে পার।

—ছেলে তাহলে বাপের কারবারই দেখাশোনা করে?

—আজ্ঞে না। মনীশ ইঞ্জিনিয়ার।

—ইঞ্জিনিয়ার? কী ইঞ্জিনিয়ার? সিভিল? না ইলেকট্রিকাল?

—এখনও ইঞ্জিনিয়ার হয়নি। বেঙ্গল ইনজিনিয়রিং কলেজে পড়ছে। থার্ড ইয়ার। ঐ তো তোমাদের হাওড়ায়।...শিবপুরে।

—আই সি।...শিবপুর বি. ই. কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র! পাত্তরটি তো ভালই বাগিয়েছ হে। তোমার মেয়ের কপাল ভাল। তো কী পড়ছে বললে না তো? সিভিল না ইলেকট্রিকাল?

—সিভিল। সব থেকে বড় কথা কী জানো?

—কী?

—মেয়েকে পার করতে আমাকে তেমন কিছু দিতে হচ্ছে না। সতীশবাবুর কোনও দাবি-দাওয়া নেই। ঐ আমি বাবা হয়ে মেয়েকে যা সাজিয়ে দেব। আমার অপুর রূপ তো আছে! তাকে দেখে ওদের পছন্দ হয়েছে। এটাই যথেষ্ট।

—বাহ! সত্যিই গ্রেট! শুনে খুব খুশি হলুম অপরেশ। সতীশাবাবু কে? পাত্রের বাবা?

—ঠিক তাই।...কিন্তু ভাই নীরদ আমার মন কেন কু গাইছে?

—কু গাইছে? কেন?

—আমার খুব ভয় করছে। টেররিস্টদের তো বিশ্বাস নেই? ঐ বজ্জাত ছোকরা দীপক সামন্ত অপুকে বিয়ে করতে পারবে না। তার জন্যে কাল বিয়ের আসরে দলবল নিয়ে ঝামেলা পাকাবে না তো?

—ঝামেলা পাকাবে? কী ঝামেলা পাকাবে?....নাহ! এত সাহস হবে না।—নীরদবরণ বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন।

—টেররিস্টদের তুমি জানো না ভাই। দে ক্যান ডু অ্যান্ড আনডু এনিথিং....!

—ইফ ইউ অ্যাপ্রিহেন্ড সো, দেন ইনফর্ম দা পোলিশ!

—ধর কাল টেররিস্টরা বিয়েবাড়িতে একটা ডাকাতিই বাধিয়ে দিল। বিয়েবাড়িতে ডাকাতি করলে ওদের অনেক লাভ। অনেক সোনাদানা পাবে। টাকাকড়ি পাবে। দানসামগ্রী পাবে। সেসব বিক্রি করে টাকা পাবে ওরা। সেই টাকায় আর্মস কিনে ওরা ইংরেজ তাড়াবে....

—দুর! দুর!—হেসে উঠলেন নীরদবরণ।—সবকটা পাগল! আ প্যাক অব ম্যাডক্যাপস! ব্রিটিশের মতন ইমপিরিয়ালিস্ট পাওয়ারকে এদেশ থেকে তাড়াবে টেররিস্টরা? কটা গাদা বন্দুক আর বোমা-পিস্তল দিয়ে? ছো....। যাই হোক তোমার মন যখন কু গাইছে তুমি ঐ দারোগাটাকে বলো না? সে বিয়ের আসরে সিপাই সান্ত্রী নিয়ে হাজির থাকুক?

—সেসব ব্যবস্থা করা আছে ভাই। মহিম সান্যাল কাল বিয়েতে নিমন্ত্রিত। সে তো থাকবেই বিয়ের আসরে। তাছাড়া সাদা পোশাকের পুলিশও থাকবে। তারা আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবে।

—তা বেশ বেশ। ভালই তো।—নীরদবরণ নিজেও যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

—আচ্ছা নীরদ? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কী?

—গান্ধী না সুভাষ বোস? কাকে রাইট মনে হয়?

—এরকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। পোলিটিকাল লিডার আর ফ্রিডম-ফাইটার এদের কারোর ওপরেও আমার আস্থা নেই।

—আস্থা নেই মানে?

--আমি মনে করি তারা কেউই এদেশ থেকে ইংরেজকে হটাতে পারবে না। ইংরেজকে হটানো অত সোজা নয়।

—সেটা অন্য প্রশ্ন। তুমি যে ইংরেজভক্ত তা আমি জানি।

—ভক্ত কি না জানি না। ভক্তির মধ্যে যুক্তি বেশি থাকে না। তা আবেগের দ্বারাই বেশি চালিত হয়। ইংরেজদের মতো সিভিলাইজড জাতকে আমি অ্যাডমায়ার করি।...ইয়েস আই রিয়েলি অ্যাডমায়ার দেম। তারা যে আজকে পৃথিবীর মধ্যে গ্রেট তার অনেক কারণ আছে। তাদের মতো ডিসিপ্লিনড আর কে? ইনডাসট্রিয়াস আর কারা? আর তাদের সাহিত্য!...আই অলওযেজ কিপ দেম, আই মিন, — দি ইংলিশ,—ইন হায়েস্ট এসটিম থিংস অব দেয়ার লিটরেচার!...শেক্সপিয়র...ওয়ার্ডসওয়ার্থ..শেলি...কিটস্...জেন অস্টেন... একেবারে হাল আমলের ডি. এইচ. লরেন্স কিংবা টমাস হার্ডি . চালর্স ডিকেন্স...সব এক একটা গ্রেট রাইটার! আমাদের দেশে ইংরেজরা যতদিন থাকবে ততদিনই মঙ্গল। আমরা আরও সভ্য হয়ে উঠব।— নীরদবরণকে বেশ উত্তেজিত দেখাল। ফর্সা, গোলপানা মুখে রক্তাভা। চোখদুটোও এখন বেশ লালচে। এতক্ষণ পাইপ ধরাবার কথা মনেই ছিল না যেন নীরদবরণের। এখন তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে পাইপ বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরালেন।

অপরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—গান্ধী আর সুভাষ বোসের কাজিয়া নিয়ে তাহলে তুমি কিছু বলবে না?

—কী বলব? আমি তো ওসব নিয়ে ভাবি না। তবে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলব—সুভাষ বোস যা বলছে বা করছে হয়তো ঠিকই আছে। কিন্তু দ্য রোল অব গান্ধী ইজ ভেরি (dubious) ডিউবিয়াস...!

—ডিউবিয়াস? কেন?

—স্বাধীনতার জন্য ভিক্ষে করলে কি স্বাধীনতা পাওয়া যায়? গান্ধী তো তাই করছে।

—নীরদ তুমি কি গোলটেবিল বৈঠকে বসতে চাইছ?

—ঠিক তাই। আমি গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে বলতে চাইছি। ব্রিটিশের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসে কি করল গান্ধী?...sheer farce! একটা জঘন্য নাটক! আনন্দবাজার পত্রিকা ডিটেলসে লিখেছিল। তুমি পড়োনি?

—হ্যাঁ পড়েছি। পড়ব না কেন? ব্রিটেনে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বাপুজি ইংরেজদের বলেছিলেন—ঈশ্বরের নামে তোমাদের কাছে আমি আবেদন করছি, এই দুর্বল বাষট্টি বছরের বৃদ্ধকে শেষবারের মতো তোমরা একটু সুযোগ দাও। তার স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নাও...।

—ঠিক তাই। ওরকমই বলেছিল লোকটা। কিন্তু অপরেশ তুমি কি মনে করো ওভাবে ভিক্ষে করলে স্বাধীনতা আসবে? পার্লামেন্টে সেদিন সব ইংরেজ মেম্বাররা শুধু হেসেছে আর স্বয়ং চার্চিল গান্ধীকে দেখে কী বলেছে জানো?

—এটা জানি না। কী বলেছে?

—চার্চিল বলেছে—Gandhi is a half-naked fakir....

—চার্চিল যাই বলুক আমি কিন্তু ভাই মনে করি বাপুজির স্বরাজ আর সত্যাগ্রহ আন্দোলনেই স্বাধীনতা আসবে। টেররিস্টরা যে রাস্তা নিয়েছে ওটা কোনও সুস্থ রাস্তা নয়। শুধু কিছু রক্তপাত হবে। শুধু কিছু প্রাণ যাবে। আর ইংরেজ আরও খেপে গিয়ে যাকে

পারবে তাকে জেলে পুরবে।

—আমি এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। তুমি হয়তো স্বরাজ-টরাজ করছ আজকাল। আমি ওসব করি না। করা সম্ভবও নয়। I am neither for Gandhi nor for Subhash.। আমি একটা সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করি। আমি চাই সাহেবরা এদেশে আরও কিছুদিন থাকুক।

—নীরদ এসব চেঁচিয়ে বোলো না। টেররিস্টদের কানে গেলে তোমার বিপদ হতে পারে।—অপরেশ বললেন। নীরদবরণ যেন তাঁর কথা শুনতে পেলেন না। তিনি নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছিলেন। যেন তাঁর মনে অনেক কথা জমে আছে। তিনি এখন তা বলে মনের ভার হালকা করতে চান।

—আমি সুভাষেরও নয়, তোমার বাপুজিরও নয়।—আবার বলছিলেন নীরদবরণ।—কিন্তু আমি একজন সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ। চারপাশে কী ঘটছে তার খবর রাখি। নিউজপেপার পড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সেদিন নিউজপেপারে একটা লেখা পড়লুম। খুব ইনটারেস্টিং।

—কী লেখা? কোন কাগজে বেরিয়েছে?

—নাহ নিউজপেপারে পড়িনি। মডার্ন রিভিউ-এ পড়লুম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে পত্রিকার এডিটর।

—হ্যাঁ হ্যাঁ মডার্ন রিভিউ। কী পড়লে সেখেনে?

—গান্ধী আর শরৎচন্দ্রের ইনটারভিউ। তোমাদের ঐ রাইটার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়...।

—তোমাদের শরৎচন্দ্র বলছ কেন নীরদ? তুমি কি শ্রীকান্ত কিংবা গৃহদাহ পড়নি?

—পড়েছি। তবে ওগুলো কিসস্যু হয়নি। সহজ করে লিখতে পারলে আর সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিলেই লেখক হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণির লেখক। তো যাক সেটা আমার বক্তব্য নয়। চুরুট মুখে ছিলই। নীরদবরণ চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিলেন। ধোঁয়া ছাড়লেন। কড়া তামাকের গন্ধে গোলঘর ভরে আছে।

অপরেশ ধরিয়ে দিলেন—বাপুজি আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে কি কথা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। কথাগুলো মনে আছে আমার। ইংরেজিতেই বলছি। গান্ধী নাকি শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—why don't you believe that the attainment of Swaraj will be helped by spinning? তাতে তোমাদের শরৎচন্দ্র কী উত্তর দিয়েছেন জানো? লোকটা লেখে খুব খারাপ। কিন্তু গান্ধীর প্রশ্নের উত্তর খুব বুদ্ধি করে দিয়েছিলেন।

—কী বলেছিলেন শরৎচন্দ্র?

—শরৎচন্দ্রের উত্তর ছিল—I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spiders.....হাঃ হাঃ হাঃ..... that reply is really intelligent।—নীরদবরণকে কথার নেশায় পেয়েছে। চার থেকে পাঁচ পেগ স্কচ নিলে তাঁর বেশ নেশা হয়। তিনি গুম হয়ে যান। বেশি কথা বলেন না। আজ কম পান করেছেন বলেই বোধহয় কথা বলছেন বেশি।

আবার বললেন নীরদবরণ—সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আগুন আছে। সে ডিসিশান নিতে পারে। কংগ্রেস পার্টিটাকে সে নতুন করে অর্গানাইজ করতে চাইছে। কিন্তু বাদ সাধছে গান্ধী। সুভাষের কোনও মুভমেন্টকেই গান্ধী সাপোর্ট করেনি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সুভাষবাবু যতবার আইন অমান্যের ডাক দিয়েছেন, গান্ধী ততবার তা বন্ধ করে দিয়েছে মাঝরাস্তাতে। সে কারণেই সুভাষবাবু তাঁর 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল বইতে গান্ধীর বিষয়ে কী বলেছে জানো?

—ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল? সুভাষচন্দ্রের লেখা ঐ বইটা তুমি কী করে পড়লে ভাই? ওটা তো

বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে? ঐ বই তো পড়তে চাইলেও পাওয়া যায় না? আর পড়তে দেখলেও তো পুলিশ হাজতে পুরবে।

—হ্যাঁ ঠিকই বলেছ অপরেশ।...Indian Struggle was published on 16th January in 1935 and it was banned by the British just after Seven days--23rd January...। কিন্তু তোমাকে চুপি চুপি বলি। বইটা আমার বন্ধু এবং Boss ম্যাকেঞ্জির কাছে এককপি আছে। ম্যাকেঞ্জি তো নিজেই একজন ইংরেজ। ওকে আর কে অ্যারেস্ট করবে। ম্যাকেঞ্জি 'Indian Struggle' এক কপি কেন রেখেছ জানো?

—কেন?--অপরেশ হাই তুলে জিজ্ঞেস করলেন। তার ক্লান্তি লাগছিল।

—বইটার ভাষার জন্যে। ম্যাকেঞ্জি প্রায়ই বলে—তোমাদের সুভাষ চন্দ্র বোস—he writes English just like an Englishman!

—সেই বইয়ে বাপুজি সম্বন্ধে কী লিখেছে সুভাষচন্দ্র?

—জায়গাটা আমি বার বার পড়েছি। আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। সুভাষবাবু লিখেছে—আমি ঐ বইয়ের ২৪৫ পৃষ্ঠা থেকে হুবহু কোট করছি—Wherever any opposition raised outside his cabinet, he could always coerce the public by threatenring to retire from the congress or to fast unto death'...এই হল তোমাদের বাপুজি অপরেশ। নীবদবরণ থামলেন। তাঁর পাইপ নিভে গেছে। তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে দেশলাই বের করতে যাবেন, এখন সময়কে যেন এল। হ্যারিকেনের আলোতে তার মুখ দেখলেন নীরদবরণ। লোকটা ত্রিদিবেশ। অপরেশের ছোট ভাই।

ত্রিদিবেশ বলল—এবার চলো দাদা। নীরদদা আপনিও চলুন। খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে হবে। বউদি বসে আছেন। অপরেশ আর নীরদবরণ দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনজন ভেতর-বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। বাড়িতে অনেক চাকর-বাকর আছে। গোলঘরের টেবিল তারা পরিষ্কার করে ফেলবে। যেতে যেতে নীরদবরণ জানালেন যে তিনি বিশেষ কিছু খাবেন না। শুধু কয়েকটা লুচি আর দু পিস মাছ। জিজ্ঞেস করলেন, নাতনী শুভ্রার খাওয়া হয়ে গেছে কি না। ত্রিদিবেশ জানাল, শুভ্রার খাওয়া শেষ। সে অপর্ণা আর গীতার (ত্রিদিবেশের স্ত্রী) সঙ্গে গল্প করছে। শুভ্রার খুব প্রশংসা করল ত্রিদিবেশ। মেয়েটা সত্যিই খুব মিশুকে। একদিনের মধ্যেই সারা বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কীরকম মিশে গেছে। ত্রিদিবেশের কথায় নীরদবরণ হাসলেন। মনে মনে অবশ্য বললেন—সেরকমই তো হওয়ার কথা। আমি তো সুবুকে সবসময় ভাল শিক্ষাই দিয়েছি।

বাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে নীরদবরণ আর বেশি কথাবার্তা বললেন না। সোজা ঢুকে গেলেন দোতলার একেবারে কোণের ঘরটিতে। এ বাড়িতে অতিথি এলে এই ঘরেই থাকে। অপরেশ তাঁর সাহেব বন্ধুর জন্যে ঐ ঘরেই থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। শুভ্রা একবার এল দাদুর সঙ্গে দেখা করতে। নীরদবরণ তখন লুচি আর মাছ খাচ্ছেন।

—দাদু আমি খুব ভাল আছি। আমার জন্যে একেবারে ভাববে না। এ বাড়ির লোকজন সবাই খুব ভাল।

—তুমি শোবে কোথায়?

—আমি গীতাকাকিমার সঙ্গে শোব। এ বাড়িতে অনেক ঘর। শোবার অসুবিধে নেই।

—হ্যাঁরে অপর্ণার সঙ্গে দেখা হল না? তার মাথা ধরা ছেড়েছে?

--অপু-দির মাথা ধরেছিল? আমরা তো অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলুম।

—তাহলে বোধহয় মাথা ছেড়ে গেছে।—নীরদবরণ বললেন।

সারা বাড়ি এখন নিঃশব্দ। অন্ধকারে ছেয়ে আছে চারপাশ। যদিও নীরদবরণের এই ঘরের কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। অপরেশে বুদ্ধি সেটা। একেবারে নতুন জায়গা। বন্ধুকে পুরোপুরি অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। এছাড়া নীরদবরণের মাথার বালিশের পাশে নিজের একটা তিন সেল ব্যাটারির টর্চ তো আছেই। বাইরে কোথাও গেলে এই টর্চটা তাঁর সঙ্গে থাকে।

মাথা ভার লাগছে সামান্য। হবেই তো। তিন পেগ স্কচের রেশ একটু থাকবে না? ঘুমের অপেক্ষায় চুপচাপ শুয়ে ছিলেন নীরদবরণ। তিনি ভাবছিলেন নাতনি শুভ্রার কথা। এবার শুভ্রার বিয়েটাও দিতে হবে। অপরেশ নিজের মেয়ের জন্যে যেমন একটা পাত্র জোটাতে পেরেছে, তেমন একটা পাত্র জোটাতে পারলে বেশ হয়। ছেলেটা শুনলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। চমৎকার! এরকম শিক্ষিত একটা ছেলে সুবুর জন্যে কি পেতে পারেন না নীরদবরণ? কেন পাবেন না? খুঁজতে হবে। ঘটক লাগাতে হবে। এবারে সুবুর বাপ বিশ্বদেব কলকাতায় এলে তার সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা বলে রাখতে হবে। বিশ্বদেবও মেয়ের জন্যে পাত্র খুঁজুক। কিন্তু সে আর কোথা থেকে পাত্র জোগাড় করবে? ঝালদা থেকে? আরে ছোঃ! সেখানে তো শুধু গুটিকয় সাহেব আর জংলি দেহাতি মানুষদের বাস। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুম এসে গেল নীরদবরণের চোখে। গভীর এক ঘুমে তলিয়ে গেলেন তিনি।

এখন কতটা ভোর? হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নীরদবরণের। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে! কান পেতে শুনলেন নীরদবরণ। স্বপ্ন নয় তো? নাহ্ স্বপ্ন নয়। সত্যিই দরজাতে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ! দরজায় ওরকম অসভ্যের মতো ধাক্কা দিচ্ছে কেন? কী হয়েছে বাড়িতে? ডাকাত পড়ল নাকি? বিহ্বলতার মধ্যেও নীরদবরণ বালিশের তলা থেকে বের করলেন হাতঘড়ি। বেশ বেলা হয়েছে। সকাল সাতটা।

--দরজাটা খুলুন নীরদদা?—এ তো ত্রিদিবেশের গলা! কী হয়েছে বাড়িতে? বিছানা থেকে নেমে নীরদবরণ দরজার খিল নামিয়ে দিলেন। দরজাও খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশ। তাকে বেশ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

—কী হয়েছে ত্রিদিবেশ?...সামথিং রং?

—অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—সেকি? পাওয়া যাচ্ছে না মানে?

—অপর্ণা বোধহয় পালিয়েছে।...আপনি বাইরে আসুন নীরদদা...।

উনিশ

কথাটা নীরদবরণ শুনলেন, কিন্তু বুঝতে তাঁর যেন কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। কী বলছে ত্রিদিবেশ? অপর্ণা পালিয়েছে? যার বিয়ে আজ সে পালিয়ে গেছে? এটা কী করে হয়? কোথায় পালাতে পারে? কেনই বা পালাবে? একজন সোমত্থ মেয়ের পক্ষে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া কি আদৌ মঙ্গলজনক? মেয়েটাকে দেখে তাঁর বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয়েছিল। সে এরকম বোকার মতন কাজ করবে?

—পালিয়ে গেছে?...তুমি ঠিক বলছ তো ত্রিদিব?...এত বড় বাড়ি হয়তো কোথাও চুপচাপ বসে আছে? সারা বাড়ি খুঁজে দেখা হয়েছে?

—যেখানে যেখানে অপর্ণার থাকা সম্ভব সব জায়গাই খুঁজে দেখা হয়েছে। ত্রিদিবেশ

জানাল।—সে যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে তা তো সে নিজেই জানিয়ে গেছে।

—জানিয়ে গেছে?...কীভাবে?

—চিঠি লিখে রেখে গেছে। দাদার চোখেই সে চিঠি সবচেয়ে আগে পড়েছে। দাদা দিশেহারা হয়ে গেছে। বউদি পাগলের মতো ব্যবহার করছে। শুভদিনে বাড়িতে এ কী অশান্তি বলুন তো? কী করব বুঝতে পারছি না। আপনি তো এখনও নাইট-ড্রেস ছাড়েননি। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ফ্রেশ হয়ে দাদার ঘরে আসবেন একটু? কিছু তো একটা করতে হবে?

—আমি এখনই আসছি।...উইদিন টেন মিনিটস—।

এই বয়সেও নীরদবরণের শরীরের সিস্টেম ঠিকঠাক কাজ করে। দশ মিনিট অবশ্য নয়। প্রাতঃকৃত্য সেরে, দাঁত মেজে নিয়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে তাঁর মিনিট কুড়ি লাগল। অপরেশের ঘরে ঢুকেই নীরদবরণের মনে হল, এ বাড়ির সবাই সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শক্ত হাতে হাল তাঁকেই ধরতে হবে।

এই ঘরে অবশ্য কোনও মহিলা নেই। খাটের পাশে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন অপরেশ। তাঁর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন নীরদবরণ। রাতারাতি যেন অপরেশের বয়স এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেছে। মাথার কাঁচাপাকা চুল অবিন্যস্ত। যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত কাকের বাসা। চোখের দৃষ্টি শূন্য। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন বটে। কিন্তু যেন কিছুই দেখছেন না। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া। ঘরের আর এক পাশে একটা নিচু টুলে বসে আছে সমরেশ। গালে হাত দিয়ে সে বসেছিল। নীরদবরণকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। আর অপরেশের চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিদিবেশ। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা এরকমই যেন অপরেশ কোনও কারণে চেয়ার থেকে পিছলে পড়ে গেলে সে ঠিক দাদাকে ধরে ফেলবে। ওপাশে আর একটা ঘর আছে নীরদবরণ জানেন। ওখানে বোধহয় মেয়েরা আছে। বাড়িতে বিয়ে কিংবা কোনও উৎসব লাগলে অনেক অতিথির সমাগম হয়। তখন বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দাদের শোবার জায়গাগুলো পালটে যায়। তবে ওপাশের ঘরে যে অপরেশের স্ত্রী কান্নাকাটি করছেন সেটা নীরদবরণ এঘর থেকেই বুঝতে পারলেন। অপরেশের স্ত্রীর কান্নাকে বিলাপ বলাই উচিত। হাহাকারময় বিলাপ। অনেক মহিলার চাপা গুঞ্জন। ওরা নিশ্চয়ই শান্ত করতে চাইছে অপরেশের স্ত্রীকে। ওদের মধ্যে কী সুবু আছে? নিশ্চয়ই আছে। যাবে আর কোথায়। রাতারাতি কী যে সব ঘটে গেল! আহা সুবু এসেছিল বেড়াতে। বিয়েবাড়িতে হইহই করতে আর ভোজ খেতে। এখন বিয়েবাড়ি শোকের বাড়িতে পালটে গেছে। সুবু-র সঙ্গে একবার কথা বলার ইচ্ছে হল নীরদবরণের। পরমুহূর্তেই অবশ্য মনে হল, আগে অপরেশকে সামলানো দরকার। ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটেছে সেটাও জানা দরকার। সুবু নিশ্চয়ই ঠিকই আছে মেয়ে মহলে। ত্রিদিবেশের শশুরে বউ তাকে নিশ্চয়ই আগলে রেখেছে।

—কী ঘটেছে বলো দেখি আমাকে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছ?—নীরদবরণ বললেন অপরেশকে। ত্রিদিবেশ ঘরের ওপাশ থেকে একটা বেতের চেয়ার টেনে এনেছে। নীরদবরণ বসলেন। অপরেশ কিছু বলছেন না। একইভাবে দেয়ালের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নীরদবরণ নিজের চেয়ারে বসা অবস্থা থেকে ঈষৎ ঝুঁকে দুহাত বাড়িয়ে অপরেশের দু-কাঁধ আলতো স্পর্শ করলেন। একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধুকে বললেন—কাম অন মাই ফ্রেন্ড! পুল ইওরসেল্ফ টুগেদার!...ঠিক কী ঘটেছে আমাকে একটু বলো তো? এত ভয় খাচ্ছ কেন? আমি তো আছি!

অপরেশ এবারও কিছু বললেন না। শুধু নিজের ডান মুঠোর ভেতর ধরে রাখা একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন নীরদবরণের দিকে। রুল-টানা এক টুকরো কাগজ। কোনও খাতার পৃষ্ঠা

থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। দোয়াতের কালিতে খাগের কলম ডুবিয়ে টুকরো কাগজে কিছু লেখা হয়েছে। এটাই কী অপর্ণার চিঠি? কাগজের নীচের অংশে চোখ নিয়ে গেলেন নীরদবরণ। হ্যাঁ অপর্ণারই। কাগজের নীচে সে নিজের নাম লিখেছে। ...ইতি তোমাদের অপর্ণা...। চিঠিতে কী লিখেছে অপর্ণা? নীরদবরণ দ্রুত পড়তে লাগলেন। অপর্ণার হস্তাক্ষরটি ভাল। গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছে অপর্ণা...

পূজনীয় বাবা ও মা,

আমি চললুম। দীপকের সঙ্গে। আমি দীপককে ভালবাসি। এই বিয়ে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।...শুধু দীপককে ভালবাসি বললে ভুল হবে। আমি তার আদর্শেও বিশ্বাস করি।...সশস্ত্র বিপ্লবের রাস্তা ধরেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসবে। তোমরা আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না। লাভ হবে না। আমাকে ভুলে যেও। হয়তো এভাবে চলে গিয়ে অপরাধ করলুম। সম্ভব হলে ক্ষমা কোরো।

ইতি...

—আমি এখন কী করব নীরদ? বলে দাও কী করব?...লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী ভাবে? মেমারি থেকে ওরা তো চলে আসবে। বরপক্ষ। তাদের কাছেই বা মুখ দেখাব কীভাবে?...এ কী হল আমার? এতক্ষণ বাদে ডুকরে কেঁদে উঠলেন অপরেশ।

—এখন মনে সাহস দবকার অপরেশ। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কাটোয়া থেকে পালিয়ে কতদূর আর যেতে পারে ওরা? এখন কটা বেজেছে?—নীরদবরণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রশ্নটা তিনি করলেন ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে।

—এখন সাতটা বেজে পঞ্চাশ। ভোরবেলা কী কী ট্রেন ছেড়েছে আমি ঠিক...।

ত্রিদিবেশ দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর সমরেশের দিকে ঘাড় ঘোরাল--মেজদা তুই বোধহয় বলতে পারবি ভোর থেকে কটা ট্রেন কলকাতার দিকে গেছে?

—ভোর সাড়ে চারটেতে বর্ধমান প্যাসেঞ্জার। এত ভোরে নিশ্চয়ই ওরা যেতে পারেনি। তারপর নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস পাঁচটা কুড়িতে কাটোয়া পাস করে। কাটোয়াতে দু-মিনিট দাঁড়ায়। যারা কলকাতা যেতে চায় তারা ঐ ট্রেন অ্যাভেল করতে পারে। তার পর আবার সাতটা নাগাদ বর্ধমান প্যাসেঞ্জার। কিন্তু...সমরেশ যেন কী ভাবছিল।

—কিন্তু? কী ভাবছ? বলে ফেলো?—নীরদবরণ বললেন।

—ওরা যে ট্রেনে চম্পট দিয়েছে এটা আমরা ভাবছি কেন? বাই রোডও তো যেতে পারে। মোটরে। টেররিস্টরা সব পারে। আর কলকাতার দিকে নাও যেতে পারে। উলটো দিকে মালদার দিকেও যেতে পারে। মুর্শিদাবাদেও আত্মগোপন করতে পারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অপর্ণা যে এভাবে আমাদের মুখ ডোবাবে? সমাজের কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না আমাদের। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

সমরেশের কথাগুলো কানে যেতে অপরেশ আবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এবার নীরদবরণ রেগে গেলেন। তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেল! পুরুষমানুষকে কাঁদতে দেখলে তাঁর ভয়ানক রাগ হয়। বিপদের সময় তো মানুষের উচিত বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কোনও উপায় আছে সেটা ভেবে বার করা। ঘরের মধ্যে বসে কপাল চাপড়ালে আর হা-হুতাশ করলে হবে না।

কঠিন স্বরে বললেন নীরদবরণ—তোমরা সবাই মিলে কান্নাকাটি করলেই মেয়ে ফিরে আসবে?...ডিসগাসটিং! কিছু একটা করার কথা ভাবতে হবে তো?

—কী করতে বলছেন আপনি?—ত্রিদিবেশ প্রশ্ন করল।

—উই আর টু ইনফর্ম দ্যা পোলিশ উইদাউট এনি ফারদার ডিলে! নীরদবরণ জানালেন।—কিন্তু

তার আগে আমাকে একটা কথা জানতে হবে।

—কী কথা, নীরদদা?—ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করল।

—অপর্ণা যে পালিয়েছে সেটা কে প্রথম বুঝতে পারল। আই মিন হু কেম টু নো ইট ফার্স্ট?

—আমাদের বাড়ির চাকর নিতাই। ও অনেকদিন আছে আমাদের বাড়িতে। ত্রিদিবেশ বলছিল।—অপর্ণাকে সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। এ বাড়ির ফটকের চাবি নিতাইয়ের কাছেই থাকে। রাতে সবশেষে সে চাবি লাগায়। ভোরবেলা সে চাবি খোলে। ঠিক ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে ও মেন দরজা মানে বাড়ির ফটকের চাবি খুলে দেয়। কি মেজদা ঠিক বলছি তো? আমি তো আবার এ বাড়িতে সবসময় থাকি না।

—হ্যাঁ ঠিকই বলছিস। বলে যা—সমরেশ সায় দিল।

—ভোরবেলা প্রথমে বাড়ির মেয়েরা বাইরে যায়। তারপর আর একটু বেলা হলে ছেলেরা।—ত্রিদিবেশ আবার শুরু করল।

—আজ সবথেকে আগে বাড়িব বাইরে গেছে অপর্ণা। নিতাই তাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। ঘুম থেকে উঠে বাইরে যাবার দরকার হতেই পারে।

—তখন কটা বেজেছে বলছিলে?

—রোজকার মতোই, নীরদদা। সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে। তাহলে তো একটা ব্যাপার ক্লিয়ার?—নীরদবরণ বললেন।—অপর্ণা সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে এ বাড়ি ছেড়েছে।

—হ্যাঁ। তাইত।—ত্রিদিবেশ বলল। এরপর কী বলা যায় সে ভাবছিল।

—অপরেশ তুমি বাড়িতে থাকো। ত্রিদিবেশ তোমার সঙ্গে থাকুক। আমি এখনই থানায় যাব। আমার সঙ্গে যাবে সমরেশ।—ঘোষণা করলেন নীরদবরণ।

—থানা-পুলিশ করবে? এর পর সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারব?

ঘড়ঘড়ে স্বরে অপরেশ বললেন।—আমাকে একটু বিষ দাও নীরদ। আমি তাই খাব।

—আবার বলছি পাগলামি কোরো না।—নীরদবরণ দৃঢ় স্বরে বললেন।—জানি তুমি যে ক্রাইসিসে পড়েছ তা সত্যিই খুব ক্রিটিকাল।...কিন্তু ঘরে বসে মাথা খুঁড়লে তো আর মেয়ে খুঁজে পাবে না। যা ঘটেছে তাকে তো ফেস করতে হবেই। আই সাজেস্ট উই শুড ইনফর্ম দ্যা পোলিশ! এখন সময় নষ্ট করা যাবে না একেবারে। অপর্ণাকে ফিরে পাওয়া তো যেতে পারে! আমরা আশা ছাড়ব কেন? চেষ্টা করে দেখব না? হয়ত বেশিদূর যাবার আগেই পুলিশ ওদের ট্রেস করে ফেলবে। বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে যা করার করে ফেলতে হবে। আমার ধারণা তার আগে বরযাত্রী এ বাড়িতে এসে পৌছবে না।—নীরদবরণ থামলেন।

—একটা কথা বলব নীরদদা?—ত্রিদিবেশের প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। বলো?

—মেমারিতে বাবু সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি আমাদের কিছু খবর পাঠানো উচিত?

—ঐ ভদ্রলোক বোধহয় অপর্ণার ভাবী শ্বশুর?

—হ্যাঁ নীরদদা?—ত্রিদিবেশ জানাল।

—তোমরা কি পাগল হয়েছ?—নীরদবরণের স্বরে উত্তেজনা।—এখনই তাদের খবর পাঠাবে কেন? তারপর যদি অপর্ণাকে পাওয়া যায়? সব শুনে ওরা অপর্ণার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হবে?...Don't be carried away by emotions Tridibesh ! Let your brain work...। এখন প্রতিটি কাজ করতে হবে ভেবেচিন্তে। আমি দেখছি কী করা যায়।....I am always afraid of rumour-mongering। গ্রামে যেটা বেশি হয়। তোমাকে এসব দায়িত্ব

দিয়ে গেলুম ত্রিদিবেশ। I am sure you could tackle the situation...। অপরেশ চুপচাপ থাকো। আমরা থানায় যাচ্ছি। চল সমরেশ।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন নীরদবরণ। একবার ভাবলেন এই পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই কি থানায় যাবেন? নাকি স্যুট-টাই চাপিয়ে নেবেন? সাহেবি পোশাক দেখলে হয়ত থানার দারোগা বেশি পাত্তা দেবে। তারপরই মনে হল দরকার নেই। তিনি নিজে তো জানেন, মাথায় খাটো হোন, বেঢপ মোটা হোন, তাঁর চলনে-বলনে এমন একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে যা কেউই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। নাহ, এই পোশাকেই থানায় যাবেন। বারান্দা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন নীরদবরণ। বেশ দ্রুত। পেছনে সমরেশ। সামনে সিঁড়ির মাথায় দেখলেন ত্রিদিবেশের বউ আর শুভ্রা দাঁড়িয়ে আছে। সুবু কি তাঁকে কিছু বলতে চায়?

—কীরে সুবু? কিছু বলবি?

—কোথায় যাচ্ছ দাদু?

—থানায়। তুমি ত্রিদিবেশ কাকিমার কাছে থাক।

—এসব কী শুনছি দাদু? এখন কী হবে?

—দেখা যাক কী হয়। জীবন এরকমই রে সুবু। এটাতে তোর একটা অভিজ্ঞতা হবে।...নীরদবরণ যেন ম্লান হাসলেন। তারপর ত্রিদিবেশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—ওকে একটু চোখে চোখে রেখো। নতুন জায়গা...বাড়িতে এতবড় বিপদ...।

—আপনি কিছু চিন্তা করবেন না দাদা। শুভ্রা খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

—এসো সমরেশ। আমাদের তাড়াতাড়ি থানায় রিপোর্ট করা দরকার।

—চলুন নীরদদা।--দুজনে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।...

কুড়ি

সারাদিনই তো প্রায় কেটে গেল। সকাল গড়িয়ে দুপুর। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল। অশান্ত প্রতীক্ষায় কাটছিল এ বাড়ির সকলের। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে তেমন কোনও খবর তো এল না। থানার দারোগা মহিম সান্যাল, বলাই বাহুল্য, ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে অপর্ণার সন্ধান পাবার জন্যে। নীরদবরণ নিজে থানায় যেতে বেশ কাজও হল। মহিম সান্যাল শশব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। নীরদবরণের পরিচয় সে সমরেশের কাছ থেকে পেয়েছিল। কিন্তু তাঁকে দেখেই তো বোঝা যায় যে তিনি একজন কেউকেটা। যদিও পরনে সেই সময় সাহেবি পোশাক নেই। মুখে চুরুট নেই। মুখে চুরুট নিয়ে কথা বলার স্টাইল নীরদবরণ চুপিচুপি আয়ত্ত করেছিলেন উইনস্টন চার্চিলের ছবি থেকে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। ওফ্ কী ব্যক্তিত্ব মানুষটার! তেমন সুন্দর ইংরেজি লিখতে পারেন। কেউ জানে না। মানুষের মনের সব কথা কী অন্য মানুষ জানতে পারে, না বুঝতে পারে? চার্চিল হলেন এই বুড়ো বয়সেও নীরদবরণের আইডল।

তো যাই হোক, নীরদবরণের রাশভারি ব্যক্তিত্বের মূল কারণ হল তাঁর গলার স্বর এবং বাচনভঙ্গি। কথায় কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার দিকেও ঝোঁক আছে নীরদবরণের। যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

থানায় গিয়ে নীরদবরণই দারোগার সঙ্গে কথা শুরু করলেন। অপর্ণার অন্তর্ধানের খবরটা মহিম সান্যালের কাছেও একেবারে অপ্রত্যাশিত। কাটোয়া শহরে টেররিস্টদের ঘাঁটি ধীরে ধীরে

বেশ শক্তপোক্ত হচ্ছে এই খবর মহিমের কাছে ছিল। দীপক সামন্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ থানায় ছিল বটে। কিন্তু সে সব খবর সবই প্রায় উড়ো। তেমন তথ্যগত ভিত্তি নেই। সুতরাং পুলিশ কী করবে? বিনা কারণে তো আর দীপককে কিংবা তার অন্যান্য শাগরেদদের গ্রেপ্তার করা যায় না। তাতে সন্ত্রাসবাদীদেরই খেপিয়ে তোলা হবে। দীপকের সঙ্গে যে অপর্ণার আড়ালে-আবডালে টুকটাক মেলামেশা চলছে সে খবরও তো মহিমই অপরেশের কানে তুলেছিল। কিন্তু এতটা বোধহয় কেউই আশা করতে পারেনি। অপর্ণার বিয়ের দিন সে দীপকের সঙ্গে পালাল? এত বুকের পাটা আছে দুজনের? খবরটা জানার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহিম (নীরদবরণদের থানায় পাঁচ থেকে সাত মিনিট বসিয়ে রেখে) ধড়াচূড়ো পরে তৈরি হয়ে নিল। সে নিজে বেরোবে জিপে। সঙ্গে থাকবে চারজন সেপাই। প্রথমে স্টেশনমাস্টারের কাছে খোঁজ নিতে হবে। মহিমের ধারণা পাখি ট্রেনেই পালিয়েছে। কিন্তু কোন ট্রেনে? সকাল ৬টা থেকে ৭ টার মধ্যে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন আছে। আবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনও আছে। বর্ধমানের দিকে যাবার ট্রেন আছে। আবার মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদার দিকে যাবার ট্রেনও আছে। কোনদিকে গেছে ওরা? কলকাতার দিকে? না—মালদার দিকে? মহিমের ইনটুইশান বলছে কলকাতার দিকে। সমরেশ ফস্ করে জিজ্ঞেস করেছিল—গতকাল দুপুরে কাটোয়া বাজারে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে কি এই ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে?...প্রশ্নটা হয়তো অবান্তরই ছিল। কী বলতে চেয়েছিল সমরেশ? ডাকাতদের দলে দীপকও ছিল? তাতে কী প্রমাণ হয়? ব্রিটিশকে ব্যতিব্যস্ত করতে তো সন্ত্রাসবাদীরা মরিয়া হয়ে গেছে। যে কোনও প্রকারে প্রশাসনকে আঘাত করো। ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার দেখলেই মারো। তাতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তারা হয়তো নড়েচড়ে বসছে। ডিসটার্বড হচ্ছে। কিন্তু সেভাবে কী স্বাধীনতা আসবে? সন্ত্রাসবাদীরা যত আঘাত করছে, ব্রিটিশ তত সতর্ক হচ্ছে। বেছে বেছে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিগুলোতে তল্লাসি চালাচ্ছে তারা। প্রচুর ধড়পাকড় হচ্ছে। চট্টগ্রামের সূর্য সেন-এর কী হল? শেষমেশ তাকে ধরল তো পুলিশ। তাকে ফাঁসিতে তো লটকাল। সেই কতদিন আগেকার কথা। দশ-এগারো বছর হয়ে গেল। এখনকার সন্ত্রাসবাদীরা সূর্য সেনের মত ও পথই অনুসরণ করছে। দেশের মুক্তি আসবে সন্ত্রাসও বিপ্লবের পথেই। দীপক সামন্ত তাই বিশ্বাস করে। অপর্ণাও হয়তো তাই বিশ্বাস করে। কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বোসও তাই বিশ্বাস করে। আবার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তা বিশ্বাস করে না। নীরদবরণের স্থির বিশ্বাস, সন্ত্রাসবাদীরা বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে ব্রিটিশদের এ দেশ থেকে তাড়াতে পারবে না। ব্রিটিশের দুর্গে কয়েকবার আঘাত করতে পারবে ওরা। ছোটখাটো ফাটলও হয়ত ধরাতে পারবে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সেই দুর্গে এমন আঘাত হানতে পারবে কী তারা যে ব্রিটিশ এ-দেশ ছেড়ে পালাবে? অসম্ভব। একমাত্র উন্মাদ ছাড়া কেউ বোধহয় তা বিশ্বাস করবে না। আবার নীরদবরণের ধারণা গান্ধীর মতন উলঙ্গ ফকির—তোমরা আমাদের দয়া করো। আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দাও।—এভাবে ভিক্ষে করলেও ব্রিটিশ দয়া করবে না। তাহলে? তাহলে কীভাবে স্বাধীনতা আসবে? সুভাষ বোস কী বলছে? সেসব খবরও নীরদবরণ ভালই রাখেন। প্রতিদিন 'দ্য স্টেটসম্যান' আর যুগান্তর পত্রিকা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়েছে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কাউকে যদি ব্রিটিশ একটু রেয়াত করে সে হল সুভাষ বোস। লোকটার শিক্ষা-দীক্ষা আছে। সুদর্শন চেহারা। বক্তৃতা দিতে পারে ভাল। কিন্তু গান্ধী তো সুভাষকে উঠতেই দিচ্ছে না। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে দুজনেই যেন প্রকাশ্যে যুদ্ধং দেহী ভাব নিয়েছে। সুভাষের প্রস্তাব গান্ধী সভাগুলোতে তেমনভাবে আলোচনা না করেই খারিজ করে দিচ্ছে! একদিকে গান্ধীর সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ! অন্যদিকে ব্রিটিশের নানা ছুতো-নাতায় সুভাষকে জেলে পাঠানো। ও তো কাজ করতে পারছে না। যেমন এখন সুভাষকে

তার এলগিন রোডের বাড়িতেই গৃহবন্দি করে রেখেছে ব্রিটিশ। তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ এভাবেই আটকে দিতে চাইছে ব্রিটিশ। তাহলে? তাহলে স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে? এরকম প্রশ্ন যখনই নীরদবরণ নিজেকেই করেন, তখন আবার নিজেকে তিনি উত্তরও বাতলে দেন। কাউকে তেমন জোর দিয়ে কোনওদিন বলেননি তিনি। বলতে চাননি। কারণ নিজের মনের গোপন প্রদেশে লুকিয়ে রাখা এই কথাগুলোকে প্রকাশ করলে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতজনেরা তাঁকে প্রবলভাবে ভুল বুঝতে পারে। নীরদবরণ আসলে মনে মনে চান, স্বাধীনতা-টতার দরকার নেই। ব্রিটিশ যেমন আছে থাকুক না। ব্রিটিশ কিংবা ইংরেজদের মতো সভ্য জাত পৃথিবীতে কটা আছে? ভারতবর্ষের মতো অসভ্য, বর্বর, অনুন্নত দেশে আরও পঞ্চাশ কী একশ বছর ইংরেজদের থাকার প্রয়োজন আছে। তাতে আমাদেরই লাভ। এইসব কথা কাউকে কোনওদিন প্রকাশ করতে পারেন না নীরদবরণ। কিন্তু কথাগুলোকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। প্রায়ই এসব প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে নিজের মনে লোফালুফি খেলেন।

সমরেশের সেই অবান্তর প্রশ্নে দারোগা মহিম সান্যাল প্রথমে থমকেছিল। তারপর চোখ সরু করে উত্তর দিয়েছিল—ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে ইলোপমেন্টের সম্পর্ক আর কী থাকবে? বড়জোর বলা যায় গতকালের ব্যাঙ্ক-ডাকাতিটা হয়ত দীপক সামন্তের লিডারশিপেই হয়েছে। তার সঙ্গে এটাও বলা যায় যে, মেয়েটা মানে আপনার ভাইঝিও হয়ত ডাকাতির খবর জানত। কিন্তু তাতে আর কী আসে যায়? এখন তো মনে হচ্ছে, আপনাদের মেয়েও সন্ত্রাসবাদীদের দলে আছে। ছি ছি ছি কী বুকের পাটা বলুন তো? ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে একটা আঘুড়ি ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেলি? টিচার হিসেবে অপরেশবাবুর একটা সম্মান আছে। সেই সম্মান এভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিলি? ছি ছি ছি....।

—মি. সান্যাল—জলদগম্ভীর স্বরে নীরদবরণ ডাকলেন।

—হ্যাঁ বলুন স্যার?—মহিম তাকাল।

—যা ঘটেছে সে ব্যাপারে মেয়ের দোষ কিন্তু আমরা দেখছি না। আই স্টিল বিলিভ....ঐ সন্ত্রাসবাদী ছোকরা আমাদের অপর্ণাকে জোরকরে ইলোপ করেছে। কেসটা আপনাকে সেভাবেই সাজাতে হবে। মনে রাখবেন অপর্ণার আজ বিয়ে। বিকেল চারটে পাঁচটার মধ্যে তাকে যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে! ব্যাপারটা নিয়ে যেন বেশি হইচই না হয়।

—আপনি বলছেন মেয়ে ইচ্ছে করে যায়নি? তাকে অ্যাবডাক্ট করা হয়েছে?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।—নীরদবরণ বললেন।

—তা কী করে হয়? আমি তো জানি মেয়েটার সঙ্গে ঐ ছোঁড়াটার লভ অ্যাফেয়ার্স চলছিল—

—আপনি কিছুই জানেন না। যা জানেন প্লিজ ফরগেট। তা না হলে মেয়েটার বিয়ে আটকে যাবে। সারা জীবন নষ্ট হবে ওর। সেটা আমি কিছুতেই হতে দেব না।—দৃঢ় স্বরে বললেন নীরদবরণ। মহিম সান্যাল কুতকুতে চোখে তাকিয়েছিল। চিবিয়ে চিবিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি স্যার পুলিশকে এভাবে ডিকটেট করবেন?

—আপনার ফোনটা ব্যবহার করা যাবে?—নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন।

—কোথায় ফোন করবেন?

—ডি. আই. জি (ক্রাইম) স্যামুয়েল রিচার্ডসন আমার পরিচিত। আমি তার সঙ্গে এই কেসটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। নীরদবরণের কথা শুনে মহিম সান্যালের মুখ থেকে যেন কথা সরছিল না। বিস্ময়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে জিজ্ঞেস করল—ডি. আই. জি (ক্রাইম) আপনার পরিচিত? ওরে বাবা! আপনি তো ভি. আই. পি স্যার?

—আপনার সামনেই আমি রিচার্ডসনের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। ফোন-নাম্বার আমার সঙ্গেই আছে। আমি যেখানে যাই একটা ছোট নোটবুক আমার সঙ্গে থাকে। তাতে ইমপর্টান্ট লোকদের টেলিফোন নাম্বার লেখা আছে। থানায় আসছি যখন কাজে লাগতে পারে। সেই ভেবে নোটবইটা আমি সঙ্গে এনেছি।—পাঞ্জাবির পকেট থেকে নীরদবরণ ছোট্ট নোটবইটা সত্যিই বের করলেন। ধীরে ধীরে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আই.জি (ক্রাইম) রিচার্ডসন সাহেবের সঙ্গে তিনি সত্যিই কথা বলতে চান। রিচার্ডসন খুব দুঁদে অফিসার। সে হুকুম দিলে পুলিশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপর্ণাকে খুঁজে আনতে পারবে ঠিক। এই তো নম্বরটা পেয়েছেন! তিনি রীতিমতো হুকুমের সুরে বললেন—নিন। ধরুন—রিচার্ডসন সাহেবকে।

মহিম সান্যাল বেশ ভয়ে ভয়ে বলল—স্যার ওভাবে কলকাতার লাইন তো পাওয়া যাবে না। ট্রাংককল করতে হবে। আর এখন তো সকাল সাড়ে দশটা সবে বেজেছে। এখন সাহেবকে কোথায় পাওয়া যাবে? অফিসে? না বাংলোতে?

—অফিসে, আবার কোথায়। আমি রিচার্ডসনকে জানি। সে খুব পাংচুয়াল। ঠিক দশটায় লালবাজারে ঢুকে যায়। তাহলে ট্রাংককলই করুন। বলুন জরুরি কল। তাহলে এখুনি পাওয়া যাবে।

এত দূর থেকে কলকাতায় টেলিফোনের কানেকশান পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। নীরদবরণের সন্দেহ ছিল লাইন আদৌ পাওয়া যাবে কি না। কিন্তু পুলিশকে বোধহয় সবাই সমঝে চলে। থানার দারোগা নিজে যেখানে লাইন চাইছে , কথা বলতে চাইছে ডি.আই.জি (ক্রাইম)-এর সঙ্গে তখন ট্রাঙ্ককল অফিস বা টেলিফোন অফিসের কর্মচারীদেরও নড়ে চড়ে বসতে হয়। মিনিট দশ অপেক্ষার পর যোগাযোগ হল। ফোন বেজে উঠল একটু অন্যভাবে। অর্ডিনারি রিং টোন যেভাবে বাজে ট্রাঙ্ক কলের রিং টোন তার থেকে একটু অন্যরকম। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং একটানা বাজতে থাকে। সেইরকম শব্দে যখন বেজে উঠল ফোন, তখনই নীরদবরণ বুঝলেন যে ট্রাংকল আসছে। মহিম সান্যাল রিসিভার তুলে কানে লাগানোমাত্র বলল—স্যার আপনি কথা বলুন। ডি. আই. জি সাহেবকে ওরা লাইনটা দিচ্ছে। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞেস করছে সাহেবের সঙ্গে কে কথা বলবে?

—বলুন—উইলিয়ম অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বাবু নীরদবরণ মুখার্জি।

—ঠিক আছে স্যার।

নীরদবরণ যে সত্যিই ডি. আই. জি সাহেবের পরিচিত তা তো টেলিফোনের কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল। মহিম সান্যাল শুনল। সমরেশও শুনল। খুব সংক্ষেপে, দু মিনিটেরও কম সময়ে, রীতিমতো চোস্ত এবং কেতাদুরস্ত ইংরেজিতে যা বললেন তার সারমর্ম হল, তিনি কলকাতা থেকে কাটোয়াতে এক 'ইনটিমেট' বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। সেই মেয়েকে এক 'টেররিস্ট' 'ইলোপ' করে নিয়ে চলে গেছে। মেয়েকে এখন উদ্ধার করা দরকার। তা না হলে বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে যাবে। মেয়েটি পথে বসবে। তার সঙ্গে মেয়ের বাবা-মাও। ও প্রান্তে, কলকাতায় বসে রিচার্ডসন সব শুনে বললেন—These terrorists have been making trouble everywhere. We are to tackle their hooliganism at any cost....আর নীরদবরণকে তিনি আশ্বাস দিলেন যে, Don't worry. I am sending instruction to the SP Burdwan. The terrorists will be tracked down and the bride would be saved before long....। তারপর ফোন কেটে গেল। নীরদবরণ একবার মহিমের দিকে এবং আর একবার সমরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন,—রিচার্ডসন যখন আশ্বাস দিয়েছে, তখন চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না। দারোগা মহিম সান্যালের বিস্ময় তখনও যাচ্ছিল

না। তার থানায় বসে কেউ লালবাজারে ডি. আই. জি পদমর্যাদার কোনও অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এটা যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। সে হঠাৎ এক নাটকীয় কান্ড করে বসল। নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে ভুঁড়িসমেত শরীরটাকে বাঁকিয়ে নিচু হল এবং টিপ্ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল নীরদবরণকে।

—আরে করেন কী? করেন কী?—নীরদবরণ বললেন। অন্য সময় হলে ব্যাপারটাতে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ বোধ করতেন তিনি। মেজাজে সাহেব হলেও কেউ তাঁকে প্রণাম করলে তিনি মনে মনে খুবই পুলকিত হন। তাঁর অহমিকায় বাতাস লাগে। কিন্তু এখন তাঁর মনের অবস্থা অন্যরকম। তাই মহিম সান্যালের ব্যবহারে একটু যেন বিরক্তই হলেন তিনি। বললেন—এরকম ড্রামা করছেন কেন মশাই?

—স্যার আপনি মহাপুরুষ! আপনার সঙ্গে ডি. আই. জি সাহেবের আলাপ ভাবা যায়? আমাদের এস. পি. সাহেবও তো ব্রিটিশ। ভীষণ রগচটা সাহেব। উঠতে-বসতে আমাদের মতো কর্মচারীদের গালি খেতে হয় সাহেবের কাছে। পান থেকে চুন খসলে বরখাস্ত করে দেবার ভয় দেখান। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ এস. পি. সাহেবও বোধহয় সরাসরি লালবাজারে ডি. আই. জি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে সাহস করবেন না। আর আপনি স্যার....।—মহিম সান্যাল এতই উচ্ছ্বসিত যে কথা শেষ করতে পারল না।

নীরদবরণ বললেন—আমার সঙ্গে ওরকম অনেক কেউকেটা লোকজনেরই পরিচয় আছে। আমার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা এটা জানে।....Anyway that is beside the point...আমি ভাবছি এস. পি-র কাছ থেকে ইনসট্রাকশন তো এখনও এল না? অথচ রিচার্ডসন আমাকে বলল...

নীরদবরণের কথা শেষ হবার আগেই মহিম সান্যালের টেলিফোন আবার বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়েই মহিম সটান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ইয়েস স্যার—মনিং স্যার—সান্যাল স্পিকিং স্যার...! নীরদবরণ বুঝলেন, এস. পি-র ফোন এসেছে এতক্ষণে। তার আভাস পেয়েই দারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, যেন এস.পি. সাহেব সামনেই উপস্থিত। নীরদবরণ মনে মনে হাসলেন। সাহেবদের দেখলে তাঁর অফিসের বাঙালিবাবুরাও ওরকমই ব্যস্ত হয়ে যায়। হবেই তো। সাহেবরা তো শাসক।...তারা জানে কীভাবে শাসন করতে হয়।....Yes, they are born rulers...নীরদবরণ বিড়বিড় করলেন। যেটা তিনি এইমাত্র মনে মনে আওড়ালেন সেটা তিনি বিশ্বাস করেন। এবং সেইসঙ্গে এটাও বিশ্বাস করেন যে—The Indians are born to be ruled ! অতএব কীসের স্বাধীনতার কথা বলে ঐ গুজরাটি লোকটা—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী? কোন্ স্বাধীনতার মরীচিকার পেছনে ছুটছে এঁচড়ে পাকা সুভাষ বোস? আরে! তোরা আগে ব্যাপারটা ভালভাবে রিয়ালাইজ কর! আমরা কী সত্যিই স্বাধীনতা পাবার অধিকারী হয়েছি! সভ্যতার অনেক কিছু এখনও শিখতে হবে ব্রিটিশদের কাছে! ইংরেজি সাহিত্য না পড়লে রবীন্দ্রনাথ হত? সে যে নোবেল পেল সেখানেও তো সেই ইংরেজের রেকমেনডেশন? আইরিশ কবি ইয়েটস না তদ্বির করলে নোবেল কমিটি পড়েও দেখত না টেগোরের কবিতা। এই ক্যালকাটা সিটি কাদের তৈরি?—ব্রিটিশের না? ....So, do we really deserve freedom as of now ? এসব ভাবনা একান্তই নীরদবরণের। এরকমই ভাবেন তিনি। হয়তো প্রকাশ করেন না কারো কাছে। কিন্তু এই কথাগুলো নিয়েই তিনি মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেন। যখনই কোনও কারণে কথাগুলো মনের মধ্যে উথলে ওঠে।

দারোগা মহিম সান্যালের পরনে ইউনিফর্ম ছিল। এবার সে দেয়ালে আটকানো হ্যাঙার থেকে

টুপিটা তুলে মাথায় চাপাল।

—আপনি কি বেরোবেন?—সমরেশ প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ এখনই বের হতে হবে। অপরেশবাবুর মেয়ের খোঁজে।

....এস. পি. সাহেবের অর্ডার। যে কোনও উপায়ে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে।....and that terrorist is to be put bchind the bars। যদি প্রয়োজন হয় তাকে গুলি করে মারতে হবে। Shoot him at sight ! এস. পি. বলেছেন।

—তাহলে রিচার্ডসনকে ফোনটা করে লাভই হল বলুন?

—হ্যাঁ ঠিকই। ডি. আই. জি আচ্ছাসে প্রেশার দিয়েছেন আমাদের এস. পি. সাহেবকে। আর আমিও এখন চাপে...। কী যে হবে বুঝতে পারছি না।—মহিম সান্যালকে এবার চিন্তিত দেখাল।—সামনে একটা প্রোমোশান আছে সেটা বোধহয় আটকে গেল।

...এই হল বাঙালি চরিত্র! মুহূর্তে মনে হল নীরদবরণের। হারার আগেই হেরে বসে আছে! নীরদবরণের খুব রাগ হল। তিনি মহিম সান্যালের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—কীরকম পুলিশ অফিসার আপনি? আপনার নিজের ওপর কোনও কনফিডেন্স নেই? আগে থেকেই ধরে নিচ্ছেন অপরাধীকে ধরতে পারবেন না। ওয়ার্থলেস!

মহিম সান্যাল নীরদবরণের ধমক বেশ চুপচাপই হজম করল। কারণ সে বুঝে গেছে সামনে বসে থাকা এই হৃষ্টপুষ্ট, মাথায় খাটো মানুষটার অনেক ক্ষমতা। শুধু মহিম সান্যাল বলল—স্যার, স্যার। আপনি বোধহয় আমাকে মিসআনডারস্ট্যান্ড করছেন।...অপরেশবাবুর মেয়েকে খুঁজতে আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখব না। সে জন্যেই তো নিজে বেরোচ্ছি। কিন্তু এই টেররিস্টরাও বড় সোজা নয় স্যার। দীপক সামন্ত যে কোন রাস্তায় গেছে সেটা না বুঝতে পারলে? কলকাতায় যেতে পারে। আবার মালদা হয়ে ঢাকার দিকেও যেতে পারে। তা ছাড়া দিনাজপুর পেরিয়ে পূর্ণিয়ার দিকেও তো চলে যেতে পারে!...যাই হোক, আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা খবর আমি নিশ্চয়ই আনব। নমস্কার স্যার।—মহিম সান্যাল নীরদবরণকে নমস্কার জানাল।

থানা থেকে বেরিয়ে ভাঙাচোরা সড়ক ধরে হাঁটছিলেন নীরদবরণ। পাশে সমরেশ। অপরেশের বাড়ি থেকে থানা বেশ কিছুটা দূর। একমাইলের বেশি রাস্তা। দেড়মাইল হবে। গতকাল যে গাড়িটা স্টেশন থেকে অপরেশের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে এসেছিল সেই গাড়িটার কোনও চিহ্ন আজ সকাল থেকে নীরদবরণ দেখেননি। গাড়িটা থাকলে বেশ হত। হাঁটাহাঁটির অভ্যাস তো তেমন নেই। বাড়ি থেকে এক পা বাড়ালেই গাড়ি চড়তে অভ্যস্ত নীরদবরণ। তার ওপর এই পাকা সড়ক কিছুক্ষণ বাদেই শেষ হয়ে শুরু হবে মাটির রাস্তা। সেখানে রাজ্যের ধুলো। নীরদবরণের ব্রাউন নিউকাট ধুলোয় ধূসরিত। মাথার ওপর সূর্য যেন ক্রমশ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে। চারপাশে এত গাছ। কিন্তু সবাই যেন বিদ্রোহ করেছে। একটাও পাতা নাড়ছে না। পাঞ্জাবির পিঠ ক্রমশ ঘামে ভিজে উঠছে। একটা উপায় অবশ্য ছিল। হেঁটে না এসে বাইসাইকেলে আসা যেত। অপরেশের বাড়িতে অনেকগুলো সাইকেল নজরে পড়েছে নীরদবরণের। এবং তাঁর চোখ দেখে নিয়েছে। প্রতিটি সাইকেলই তাঁদের কোম্পানির।...হবেই তো। সহকারী সেলস্ ম্যানেজার হিসেবে নীরদবরণের বুদ্ধিটা ভালই খেটে গেছে। সাইকেলের বিজ্ঞাপনসহ প্রচারপত্র শাঁখা আর আলতাবিক্রেতাদের মারফত বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। সাইকেলের বিক্রি বেড়েছে। কোম্পানিও ফুলে-ফেঁপে উঠছে। নীরদবরণ তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার গুণে ক্রমশ আরও আস্থাভাজন হয়ে উঠছেন উইলিয়ামস আর ম্যাকেঞ্জি সাহেব দুজনেরই।

অপরেশের বাড়ি থেকে দুটো সাইকেলেও তো থানায় আসা যেত। তাহলে আর এত হাঁটাহাঁটি করতে হত না। কিন্তু গলদটা আছে তো গোড়াতেই। বিদেশি সাইকেল কোম্পানির সহকারী সেলস ম্যানেজার নীরদবরণ মুখুজ্জ্যে নিজে সাইকেল চড়তে জানেন না। সুতরাং হাঁটা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আর একটা বাহন ছিল অবশ্য। দেশ গাঁয়ে খুব চালু। সেটা হল পালকি। চারজন বেহারার কাঁধে বসে বসে বেশ দুলুনি খেতে খেতে যাওয়া। কিন্তু দেড়মাইল রাস্তা যেতে পালকি লাগবে? নীরদবরণের লজ্জা করেছিল। তিনি হেঁটে যাবেন আর আসবেন এমনই ঠিক করেছিলেন।

পাকা সড়ক ছেড়ে এবার পড়তে হল কাঁচা রাস্তায়। ভাগ্যিস বৃষ্টি হয়নি। সময়টা বর্ষাকাল নয়। তা না হলে বর্ষায় মাটির রাস্তায় আছাড় খেয়ে একসা হতে হত শহুরে নীরদবরণকে। নিউকাটের মধ্যে ধূলোবালি কচ্‌কচ্‌ করছিল। বিরক্ত লাগছিল নীরদবরণের। হঠাৎ সমরেশ কথা বলল। সচকিত হলেন নীরদবরণ। কী বলছে সমরেশ? সমরেশ বলছিল—আপনার কি মনে হয় নীরদদা? অপুকে পাওয়া যাবে তো?

—হ্যাঁ। পাওয়া যাবে না কেন? কতদূর আর ওরা যেতে পারবে? এতক্ষণ স্টেশনে স্টেশনে খবর চলে গেছে। ট্রেনে ট্রেনে তল্লাসি চালাবে পুলিশ। ওরা ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

—যদি সন্ধের মধ্যে অপুকে না পাওয়া যায় কি হবে নীরদদা? মেমারির সতীশবাবুদের কাছে আমরা অপমানিত হব। সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

—আরে অত উতলা হচ্ছ কেন? এখন মনে বিশ্বাস রাখো। লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট...।—নীরদবরণ সাহস জোগাতে চাইলেন।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে ভাবতে কখন যেন অপরেশের বাড়ি এসে গেল। নীরদবরণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অপরেশের বাড়ির দিক থেকে কে একজন ছুটে আসছে না? এ লোকটাকে দেখেছেন নীরদবরণ। একজন ভৃত্য। এই লোকটাই গত সন্ধেয় গোলঘরে মদের আসরে খাবার-দাবার আনছিল। সমরেশ জিজ্ঞেস করল—কী হল নিতাইদা? কোথায় চললে?

—গিন্নিমা বারবার মুচ্ছো যেতেছেন। ডাক্তার ডাকতে হবে।—খবরটা জানিয়ে নিতাই দ্রুত হাঁটছিল....।

একুশ

অপরেশ যেন অপেক্ষা করছিলেন নীরদবরণরা কখন থানা থেকে ফেরেন। বাড়ির ফটকের কাছেই তাকে দেখতে পেলেন নীরদবরণ। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন অপরেশ। পরনে ধুতি মালকোঁচা করে। খালি গা। আজ গরম পড়েছে খুব। আকাশের রং মরা মাছের চোখের মতো ঘোলা। বোঝা যাচ্ছে; যত বাড়বে বেলা, রোদের তেজ এবং গরমও তত বাড়বে। অপরেশের বুক জুড়ে কাঁচাপাকা রোমরাজি ঘামে ভিজে আছে দেখলেই বোঝা যায়। কাঁধে অবশ্য একটা গামছা রেখেছেন অপরেশ জড়ো করে। ঐ গামছাটা নিশ্চয়ই জলে ভেজানো। মাঝে মাঝে গামছার পুঁটলিতে অপরেশ নিজের ঘাড়, গলা, হাত বাড়িয়ে যতদূর পারা যায় পিঠও মুছে নিচ্ছিলেন।

নীরদবরণ আর সমরেশকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন অপরেশ। জিজ্ঞেস করলেন—কী হল? কোনও হদিশ পাওয়া গেল? থানার বড়বাবু কী বলছে নীরদ? বড়বাবু মহিম সান্যালের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে, এমন কী জেলার এস. পি.-কে ডি. আই. জি. (ক্রাইম)-এর নির্দেশ ইত্যাদি যতটা সংক্ষেপে বলা যায় বলতে হল নীরদবরণকে।

আবেগে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন অপরেশ। বন্ধুর দুই হাত জড়িয়ে ধরে বললেন—জীবনে এতবড় আঘাত পাব কোনওদিন ভাবিনি নীরদ! এ কী ভয়ঙ্কর আঘাত ঈশ্বর আমাকে দিলেন?...মেয়েটা যে এতবড় ভুল করে বসবে তা কোনওদিন দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। সে এখন কোথায় আছে, কী করছে, যার পাল্লায় পড়েছে সে তাকে কেমন রেখেছে কী ভাবে জানা যাবে? ঐ মেয়েকে যদি পুলিশ উদ্ধার করেও আনে তাহলে তাকে ঘরে তুলব কেমন করে? সমাজ আছে না? লোকলজ্জার ভয় আছে না? আমি কী করব নীরদ? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।—অপরেশ দৃশ্যত কাঁদছিলেন। তাঁর দু-চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে নিঙড়ানো অশ্রু। নীরদবরণ নিজেও বেশ বিহ্বল বোধ করেছিলেন। কীভাবে তিনি বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবেন? সেই সঙ্গে তাঁর গরমও হচ্ছিল বেশ। ঘামে তাঁর পাঞ্জাবি ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। এরকম রোদে গ্রামের মেঠো রাস্তায় এতটা জীবনে বোধ হয় কোনওদিন হাঁটতে হয়নি তাঁকে। মনে মনে আরও ভীত বোধ করছিলেন নীরদবরণ এটাও ভেবে যে অপরেশের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। ফলে মাথার ওপর পাখা ঘোরারও কোনও প্রশ্ন নেই। তাহলে? গ্রীষ্মের এই প্রচন্ড দাবদাহ তিনি, সাহেবী মেজাজের নীরদবরণ, এখানে আজ সারাদিন সহ্য করবেন কী করে? অবশ্য এটাও মনে পড়ল যে, গত রাতে যে তিনি ঘুমিয়েছেন সেটা তো ফ্যানের ব্যবস্থা ছাড়াই। প্রথমে মনে হয়েছিল বৈদ্যুতিক পাখা ছাড়া ঘুমই হয়তো আসবে না। কিন্তু বিছানায় শোয়ার পর অনুভব করেছিলেন ঘরের মধ্যে, এমন কী মশারির মধ্যে কোনও গুমোট ভাব নেই। দোতলাতে যে ঘরে শুয়েছিলেন নীরদবরণ সেখানে চারটে বড় বড় জানলা। সেই জানলা দিয়ে বাইরে থেকে ফুরফুরে বাতাস আসছিল। নীরদবরণ এ বাড়ির বিশেষ অতিথি। তাই তাঁর জন্যে নেটের নতুন মশারি লাগানো হয়েছিল খাটে। ফুরফুরে বাতাস মশারির ছিদ্র ভেদ করে নীরদবরণকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল হালকা পালকের স্পর্শের মতো। রীতিমতো আরাম বোধ করছিলেন তিনি শুয়ে শুয়ে। সেই আরামের স্বাদই অন্যরকম। বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে সেই আরাম পাওয়া যায় না। ঘুমে কখন যেন চোখদুটো জড়িয়ে এসেছিল নীরদবরণের। তারপর ঘুম ভেঙেছিল পরদিন সকালে ত্রিদিবেশের ডাকে। বিচিত্র মানুষের মনের গতি! নীরদবরণের দুই হাত ধরে শোকস্তব্ধ এক পিতা হাপুস নয়নে কাঁদছিল। তাকে কোথায় সান্ত্বনা দেবেন। তা নয়ত নিজের শরীরের সাধ আহ্লাদ নিয়ে ভেবে ফেললেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরই তাঁর অবশ্য সম্বিৎ ফিরল।

অপরেশের হাতে চাপ দিয়ে নীরদবরণ বললেন—বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এরকম কান্না-কাটি করতে নেই অপরেশ। চাকর-বাকরেরা তোমায় তাকিয়ে দেখছে। সেটা ভাল কথা নয়। এই সময় তোমাকে মন শক্ত করতে হবে। আশা রাখতে হবে। আমি তো যা করবার করেছি। অ্যাডমিনিসট্রেশনের ওপর মহলে আমার জানাশোনা আছে সে তো তুমি জানোই। সেই সোর্স কাজে লাগিয়েছি আমি। খোদ ডি. আই. জি. (ক্রাইম) কে সব জানিয়েছি। তিনি ডাইরেকশন দিয়েছেন এস. পি. কে। এতে কাজ হবে না? আমার মনে হয় কাজ হবে। অপর্ণাকে পুলিশ ঠিক ফেরত নিয়ে আসবে।...উত্তরে অপরেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনই সমরেশ দাদাকে প্রশ্ন করল—বউদির কী হয়েছে? নিতাই যে কবরেজ আনতে গেল।—তোর বউদি এ আঘাত সহ্য করতে পারচে না সমু। বারবার ফিট হয়ে যাচ্ছে। এ কি দুর্দশায় আমি পড়লুম—হা ভগবান! এবার নীরদবরণ কঠোর স্বরে বললেন—অপরেশ! প্রকাশ্যে আর কোনও সিন ক্রিয়েট করা নয়। লেটস গো ইনসাইড অব দ্য হাউস।

আর কিছু না বলে নীরদবরণ গম্ভীর মুখে সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে লাগলেন। তাঁর পেছনে মুহ্যমান অপরেশ এবং সমরেশ। দোতলার বারান্দায় এসে নীরদবরণ অনিশ্চিতভাবে

এদিক-ওদিক তাকালেন। কোন্ ঘরে যাবেন এখন? বিশ্রাম তো নিতে হবে। কিন্তু কোন্ ঘরে? সমরেশ তাঁকে অতিক্রম করে বারান্দা দিয়ে হেঁটে উত্তরদিকে চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তার বউদির খোঁজখবর নিতে। কিন্তু মেয়েমহলে এখন যেতে চান না তিনি। এ বাড়ির মেয়েরা এখন সবাই মিলে কী করছে তা ভালই আন্দাজ করতে পারেন নীরদবরণ। বিপর্যয় ঘটে গেলে গড়পড়তা বাঙালি বাড়িতে যা করে মেয়েরা তাই করছে। শুধুই কান্নাকাটি করছে। কিন্তু ওভাবে কোরাসে কান্নাকাটি করে কী অপর্ণাকে এ বাড়িতে ফিরিয়ে আনা যাবে? এখন সকলেরই উচিত মন শক্ত করা। সবাই মিলে অপরেশ আর তার গিন্নি সুপর্ণাকে সাহস জোগানো। অবশ্য ফাঁকা সাহস জুগিয়েই বা কী হবে? ধরা যাক আজ বিকেলের মধ্যে অপর্ণাকে পুলিশ সত্যিই ফিরিয়ে আনতে পারল না। সেক্ষেত্রে কী হবে? চরম অপমানের হাত থেকে অপরেশকে কীভাবে বাঁচাবেন নীরদবণ?

উত্তর দিকের বারান্দা দিয়েই কে একজন মহিলা হেঁটে আসছে। অপরেশ আর তাঁর বন্ধুকে দেখে হাফ-টানা ঘোমটা এক হাত টেনে দিল। দেখে মনে হল, সমরেশের বউ। গতকাল নীরদবরণকে বেশ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিল এই মহিলা। মুখশ্রী ভাল নয়। কিন্তু গায়ের রং বেশ ফরসা। ঘোমটা টেনে সর্ন্তপণে বউটি আসছিল। অপরেশ ব্যগ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—ও এখন কেমন আছে বউমা? বউটি ঘোমটার আড়াল থেকে উত্তর দিল—দিদির জ্ঞান ফিরেচে। চা চাইচে। যাই চা নিয়ে আসিগে....। ঐ মহিলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। নীরদবরণ লক্ষ্য করলেন তার গায়ে শেমিজ নেই। শুধু একটা রং-জলা শাড়ি পরনে। নিজের ঢলঢলে দুই বুক সেই শাড়ি দিয়েই আবৃত রাখতে হয়েছে রমাকে। মহিলাদের সেমিজ পরার চল এখনও দেশ-গাঁয়ে তেমন চালু হয়নি। গতকাল বিকেলে এই বাড়িতে পদার্পণ করার পর থেকেই নীরদবরণ দেখেছেন মহিলাদের পরনে শুধু শাড়ি। সেই শাড়িটাই বিচিত্র কায়দায় পরে স্তনদ্বয় এবং তার চারপাশ বেশ ঢেকে রেখেছে তারা। এরকম মহিলাদের দেখলেই রাগে গা জ্বালা করে নীরদবরণের। শাড়ির নীচে শেমিজ না চাপিয়ে এরা হাঁটাচলা কীভাবে করে? লজ্জা হয় না? এ কী অসভ্যতা! কলকাতা এবং শহরতলিতে অবশ্য, আজকাল ব্লাউজেরও চল হয়েছে। নিজের স্ত্রী যূথিকার অনেক বয়স। তবুও তিনি শাড়ির নীচে সেমিজ পরেন। শুভ্রা তো ব্লাউজ পরে। তার জন্যে বিশেষ ডিজাইনের ব্লাউজ নীরদবরণ নিজে কিনে আনেন পার্ক স্ট্রিটের দোকান থেকে। এমনকী সুদূর মানভূমে,—দেহাতি আর অসভ্যদের জায়গা ঝালদাতেও সুনীতি শাড়ির নীচে সেমিজ ব্যবহার করে। এমনিতে নীরদবরণের সঙ্গে নানা মতের অমিল থাকলেও বিশ্বদেব সে ব্যাপারে বেশ আধুনিক। কিন্তু কাটোয়াতে এসে অপরেশের বাড়িতে নীরদবরণ গণ্ডায় গণ্ডায় মাগীদের দেখছেন যারা শুধু পরনে শাড়ি জড়িয়ে কীরকম অসভ্যের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি। ত্রিদিবেশের স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সে খাস কলকাতার মেয়ে। তাকে ঘটিহাতা ব্লাউজ পরে থাকতে দেখেছেন নীরদবরণ। কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নয়। এখন বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছেন তিনি। অপরেশকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি এখন কোন্ ঘরে বিশ্রাম নেব অপরেশ?

—কেন? ঐ যে ঐ ঘরটা।

বারান্দার দক্ষিণ দিকের ঘরটা দেখিয়ে দিলেন অপরেশ। নীরদবরণ সেদিকে হাঁটতে লাগলেন। যেতে যেতে অপরেশ বললেন—নিতাই কবরেজের বাড়ি থেকে ফিরে এলেই ওকে পাঠাচ্ছি।

—তাকে আবার কী জন্যে লাগবে?—নীরদবরণ ঘুরে তাকালেন।

—আমাদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিক নেই। মে মাসের এই গ্রীষ্মে জানি তোমার খুব কষ্ট হবে। নিতাই পাখার বাতাস করবে।

—নাহ, আমাকে ওসব করতে হবে না। আমি যখন রেস্ট নিই আশেপাশে কেউ থাকলে অস্বস্তি হয়। তাছাড়া নিতাইকে কেন পাখার বাতাস করতে হবে? আমাকে একটা পাখা দিয়ে যাও। আমি নিজেই বাতাস করে নিচ্ছি।

—পাখা তো তুমি টানতে পারবে না। পাখা তো ঘরের সিলিং-এ টাঙানো আছে! নিতাই দড়ি ধরে টানলেই বাতাস হবে।

—ওহ তুমি পাংখাপুলিং-এর কথা বলছ? তোমার ঘরে সে ব্যবস্থা আছে?

—সব ঘরে নেই। ঐ ঘরটাতে আছে। ওটা-এ বাড়ির গেস্ট-রুম তোমাকে কাল বলেছি বোধহয়?

—ঐ ঘরের সিলিং-এ পাখা টাঙিয়ে রেখেছে?...তাহলে দেখতে হচ্ছে। রাতে তেমন নজর হয়নি।

ঘরে ঢুকে দেখলেন নীরদবরণ। এ জিনিস তিনি খুব একটা যে দেখেছেন তা নয়। ঘরের সিলিং-এ ঝোলানো মাদুরের পাখা তিনি বেশ কিছুদিন আগে দেখেছিলেন বারাকপুরে। যখন সেখানকার চটকলে অ্যাকাউনট্যান্ট ছিলেন। চটকল-ম্যানেজারের ঘরে ওরকম একটা পাখা ছিল। সেই পাখা টানত পনেরো-ষোল বছরের একটা কালো ছোঁড়া। তার সামনের দাঁতটা উঁচু বলে তাকে কীরকম কদাকার লাগত। যখনই কাজকর্মের বিষয়ে ম্যানেজারের ঘরে যেতে হত নীরদবরণকে, তিনি দেখতেন ম্যানেজার চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করছে আর একটা কানি জড়ানো কোমরে সেই দাঁত-উঁচু ছোকরা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পাখার দড়ি টেনে যাচ্ছে অবিরাম।

এ-ঘরে ঢুকে কিছুটা অবাক চোখে পাখাটা দেখছিলেন নীরদবরণ। মাথার ওপরে ঘরের সিলিং বরাবর লম্বা মাদুরের পাখা ঝোলানো। দেখে মনে হল, প্রায় ছ ফুট লম্বা আর তিন কিংবা সাড়ে তিন ফুট চওড়া মাদুর। তার তলার দিক লাল শালুর পাড় দিয়ে জোড়া। পাখার মাঝামাঝি মোটা কাছি-দড়ি লাগানো। সেই দড়িটা গুটিয়ে ঘরের একপাশে পেরেকে আটকানো। নীরদবরণের খুব সাধ হল তিনি নিজেই দড়ি ধরে টান দিয়ে দেখবেন কাজটা করতে কীরকম লাগে। অপরেশ কাঁচুমাচু মুখে অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়েই ছিলেন। বাস্তববাদী নীরদবরণ ভাবলেন, অপরেশেরও এবার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কিংবা তাঁর স্ত্রীর খোঁজ নেওয়া উচিত। উতলা হয়ে ঘর বার করলেই তো আর মেয়ে ফিরে আসবে না। তিনি এবার অপরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি যাও অপরেশ একটু বিশ্রাম নাও। কিংবা চান-টান সেরে নাও। এখন তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। ব্যস্ত হয়ে শুধু দৌড়াদৌড়ি করলে কোনও লাভ হবে না।

—বুঝছি। কিন্তু বাবার মন তো? আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গেল মেয়েটা। আমি লোকজনের কাছে মুখ দেখাব কী ভাবে?

—আহ অপরেশ! Again you are harping on the same tune! please don't behave like a child. Be strong my friend!

—জানি তুমি বিরক্ত হবে । তবু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না...।

—কী প্রশ্ন?

—মেয়েকে যদি বিকেলের মধ্যেও না পাওয়া যায় তাহলে আমি ওদের কাছে মুখ দেখাব কী ভাবে?

—কাদের কাছে?

—মেমারির সতীশবাবুদের কাছে?...ছেলেকে বর সাজিয়ে নিয়ে এসে ওরা কি শুধু হাতে ফিরে যাবে? আমার গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে না? এখন কী উপায় বলো?

নীরদবরণের কপাল কুঁচকে গেছে। তিনি ভাবছিলেন। অপরেশের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। কী উপায়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়? কী উপায়ে?...

কিছু শুনবার আশায় অপরেশ বন্ধুর মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিলেন।

বাইশ

বন্ধুকে নীরদবরণ কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ত্রিদিবেশ জানাল—দাদা, থানা থেকে বড়বাবু এসেছে। জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বড়বাবু এসেছে?—অপরেশ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।—তাহলে কি কোনও খবর পেল? বড়বাবু একা এয়েছে?

—হ্যাঁ একা।...আমি নীচের ঘরে বসিয়েছি।

—কী খবর নিয়ে এল আবার? নীরদ তুমি একটু এসো ভাই আমার সঙ্গে। বড়বাবু কি বলবে বুঝতে পারছি না। আমার কীরকম ভয় করছে। আমার গা-হাত কীরকম কাঁপছে নীরদ। ভয় করছে....

—আহ অপরেশ! তুমি এবার একটু বাড়াবাড়ি করছ।—ধমকে উঠলেন নীরদবরণ।—বার বার বলছি না তোমাকে একটু শক্ত হতে?...একটা কথা তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছ না অপরেশ—সেটা হল—ইউ আর টু ফেস দ্য হার্ড রিয়েলিটি। বাস্তবের মুখোমুখি হও তুমি। নিজের মনকে শক্ত করো। ওরকম অস্থির হয়ে তুমি নিজের শরীর খারাপ করবে শুধু। কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না।

—নীরদ-দা আপনিও চলুন কাইন্ডলি।—ত্রিদিবেশ বলল।—থানার বড়বাবু কী খবর এনেছে শুনি। দাদা চল।

—একটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে অপরেশ—।

—কী কথা ভাই?

—তোমার মেয়ে যে তোমাকে চিঠি লিখে এ বাড়ি ছেড়েছে এটা কিন্তু তুমি পুলিশকে বলবে না। আমরা সকালে থানায় গিয়ে ওটা বলিনি।—নীরদবরণ বন্ধুকে জানালেন।

—তাহলে কী বলেছ?

—আমরা বলেছি ঐ ছোকরা—ঐ যে টেররিস্ট—দীপক না কি নাম—সে তোমার মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গেছে। ইটস আ কেস অব কিডন্যাপিং...নো, নট কিডন্যাপিং। ইটস আ কেস অব অ্যাবডাকশন। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে অ্যাবডাকশনের জন্যে স্পেসিফিক পানিশমেন্টের ব্যবস্থা আছে।...তুমি যদি মেয়ের ঐ চিঠির কথা সিক্রেট না রাখ তাহলে অ্যাবডাকশনের কেস দাঁড়াবেই না। এবার মাথায় ঢুকেছে?

—ঢুকেচে। আমার মাথা এখন কাজ করছে না নীরদ। আমি কিছুই ভাবতে পারছি না। তোমরা যা বলবে আমি তাই...

—তোমাকে বড়বাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে না দাদা। যা বলবার আমি আর নীরদদাই বলব।—ত্রিদিবেশ অপরেশকে সতর্ক করল।

তিনজনে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে—একতলায়।

একতলায় অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট বসার ঘরে গতকাল ঢোকা হয়নি নীরদবরণের। এখন ঢুকে দেখলেন বেশ সাজানো ঘর। দামী কয়েকটা কৌচ। বনেদী বাড়িতে যেমন থাকে। একপাশে

একটা চারপায়া। তাতে ফরাস পাতা। নিচু টেবিল একটা। চা-জলখাবার অতিথিদের দেওয়া হয় নিশ্চয়ই ঐ টেবিলেই। এ ঘরেও সিলিং-জুড়ে মাদুরের পাখা। তার পাড় লাল শালু দিয়ে মোড়া। বাড়ির একজন কাজের লোক সেই পাখার দড়ি ধরে টানছে। সেই লোকটা অবশ্য নিতাই নয়। নিতাইয়ের মুখ চিনে গেছেন নীরদবরণ। অপরেশের বাড়িতে ভৃত্যের সংখ্যা কত? জনা তিন-চার হবে নিশ্চয়ই। এছাড়া মহিলাও আছে কয়েকজন। তারা মেয়েমহলে কাজ করে। অপরেশদের বনেদী পরিবার। আগে কাটোয়ার নামকরা ধনীদের মধ্যে একজন ছিলেন অপরেশের ঠাকুর্দা। তাঁর বাবার আমলেও এ বাড়িতে প্রাচুর্য ছিল ভালই। অপরেশদের পূর্বসূরিরা আসলে সম্পন্ন জমিদার ছিলেন কাটোয়া অঞ্চলে। বিঘের পর বিঘে জমি ছিল তাঁদেরই দখলে। সেই জমিতে প্রজা বসিয়েছিলেন তাঁরা। সেই প্রজারা জমি চাষ আবাদ করত। ফসলের ভাগ দিত জমিদারকে। যাকে খাজনা বা রেভিনিউ বলা হয়। ব্রিটিশরা এদেশে এসে শাসন শুরু করবার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি করল। তাতে জমিদারদের একচ্ছত্র আধিপত্য আর রইল না। আইন মোতাবেক সিলিং-বহির্ভূত জমি ছেড়ে দিতে হল জমিদারদের। অপরেশের পূর্বপুরুষরাও আইনের সেই কোপ থেকে বাদ গেলেন না। ক্রমে তাঁদের অবস্থা পড়তে লাগল। অপরেশের বাবা বুঝেছিলেন শুধু জমির খাজনার ওপর নির্ভর করে যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি নিয়ে বাঁচা যাবে না। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তিনি। এখন অপরেশদের যৌথ পরিবারকে (ত্রিদিবেশরা ছাড়া। তারা তো কলকাতা বসবাস করে) যতটা না জমিদার-পরিবার বলা হয়, তার থেকেও বলা হয় মাস্টার পরিবার। অপরেশ আর মেজভাই সমরেশ দুজনেই স্কুলের শিক্ষক। এখন এ-বাড়িতে পয়সাকড়ির খুব রমরমা না থাকলেও অতীতের বনেদিয়ানার চিহ্ন কিছু কিছু আছে। যেমন এই ঘরটা। কিংবা দোতলার দক্ষিণপ্রান্তের ঘরটা। যেখানে নীরদবরণের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে।

মহিম সান্যাল একটা কৌচের গদিতে হেলান দিয়ে বসে আছে। সেভাবে বসে আছে বলেই তার ভুঁড়ির বহরটা বেশ দৃশ্যমান। ইউনিফর্মের মোটা এবং চকচকে চামড়া-কোমরবন্ধনী অগ্রাহ্য করে মহিম সান্যালের ভুঁড়ি সামনের দিকে এগিয়ে আসতে চাইছে। মহিমের হাতে শরবতের গ্লাস। আপ্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ত্রিদিবেশই করেছে।

অপরেশদের দেখলে হয়ত মহিম কৌচ ছেড়ে উঠত না। কেনই বা উঠবে? থানার দারোগা হিসেবে সারা কাটোয়াতে মানুষের কাছে না চাইতেই মহিম যে ভয়মিশ্রিত সমীহ আদায় করে তাতে তাকে দেখতে পেলেই অপরেশের গদগদ হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা তিনজন ঘরে ঢুকতেই হাতের শরবতের গেলাস সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে মহিম যে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল সেটা আসলে নীরদবরণকে সম্মান জানানোর জন্যে। এই হৃষ্টপুষ্ট চেহারার ছোটখাটো মানুষটা যে একজন কেউকেটা সেটা অভিজ্ঞ মহিম সান্যাল ভালই বুঝেছে। মফস্বলের একটা থানায় বসে যে মানুষ লালবাজারে একেবারে খোদ ডি. আই. জি পদমর্যাদার সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারে তার ক্ষমতা যে কত সুদূরপ্রসারী তা মহিম ছাড়া আর কে ভাল বুঝবে? ইতিমধ্যে সে এরকম হিসেবও করে ফেলেছে যে এই লোকটি তার কাজে গাফিলতি দেখলে রাতারাতি তাকে এই থানা থেকে বদলি করে দিতে পারে। অতএব নীরদবরণকে সে যে উঠে দাঁড়িয়ে—'নমস্কার স্যার' বলে সম্মান জানাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? মহিমের ব্যস্তভাবে সম্মান প্রদর্শনে নীরদবরণেরও অহং যেন তৃপ্তি পেল। তিনি গলায় যথেষ্ট কর্তৃত্ব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর বড়বাবু? এনি নিউজ?

বিপরীত দিকের একটা কৌচে নীরদবরণ বসলেন। ত্রিদিবেশ আর অপরেশ চারপায়াতে। মহিম নিজের কৌচে আবার উপবেশন করে বলল—খবর কিছু পেয়েছি স্যার। সেটাই দিতে

এলুম।—তার মাথার পুলিশি টুপি সামনের টেবিলে রাখা আছে। অপরেশ বললেন—কী খবর পেয়েছেন বড়বাবু? বলুন? আমার যে আর তর সইছে না! মহিম শান্তভাবে তাকাল—এসব ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধরতে হবে মাস্টারমশাই। ব্যস্ত হলে তো সমস্যার সমাধান হবে না।

—কিন্তু আপনি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করুন?...একমাত্র মেয়ে আমার। আর কয়েক ঘণ্টা পরে তার বিয়ে...আমি যে কীভাবে সমাজে মুখ দেখাব..।—অপরেশের স্বর আবেগে যেন রুদ্ধ হয়ে এল। ত্রিদিবেশ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাইল—দাদা-প্লিজ—বড়বাবু কী বলেন শোনা যাক। এবার নীরদবরণ বললেন—মি. সান্যাল ওঁর মেয়ে সম্বন্ধে আপনি কী খবর এনেছেন?

—তদন্ত আমি নিজে করছি স্যার। প্রথমে স্টেশনে গেলুম। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা বললুম। যা জানা গেল ভোর চারটে থেকে আপ লাইনে ট্রেন আছে। ডাউন লাইনেও ট্রেন আছে। কাটোয়া ইজ অলমোস্ট দ্য মিডল পয়েন্ট—এ জংশন। আপ লাইনে গেলে আপনি মালদা পৌঁছে যাবেন—হুইচ ইজ দ্য গেটওয়ে টু নর্থ বেঙ্গল।...আর এদিকে ডাউন লাইনে বর্ধমান, ব্যান্ডেল হয়ে হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশন....

—দেখুন মশাই—নীরদবরণ এবার ধমকে উঠলেন—ভ্যানতাড়া বাদ দিয়ে প্লিজ কাম টু দ্য পয়েন্ট! আপনি আমাদের মেয়ের কোনও খোঁজ পেয়েছেন কি পাননি?

—ঠিকমতো বলতে গেলে কী স্যার ওরা দুজন যে কোনদিকে—আই মিন—আপ-এ গেল না ডাউনে গেল সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

—ননসেন্স! তাহলে আপনি এখানে এলেন কী কবতে?—নীরদবরণের কপালে বিরক্তির ভাঁজ। মহিম সান্যাল তাঁর ধমকটা হজম করে নিয়ে বলল—আসলে ভোরবেলা স্টেশনে লোকজন তেমন থাকে না। একটা লোক আর এক জন মেয়ে যে কোনও ট্রেনে উঠতেই পারে। কে আর তাদের বিশেষভাবে লক্ষ করেছে?

—কেন? নীরদবরণ বললেন—গতকাল বিকেল থেকে তো আপনি রেল-স্টেশনে পুলিশ পোস্টিং করেছেন। আমি ট্রেন থেকে নেমে এখানে আসার সময় নিজে দেখেছিলুম। গতকাল দুপুরে ব্যাঙ্কে টেররিস্টদের হামলাব পর নাকি পুলিশ পোস্টিং করা হয়। অ্যাম আই কারেক্ট?

—হ্যাঁ স্যার, কারেক্ট।

—তারাও আজ সকালে ওদের দুজনকে স্টেশনে দেখেনি? তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডিটেইন করেনি?

—পুলিশ পোস্টেড ছিল ঠিকই। কিন্তু ম্যান টু ম্যান কিংবা ওম্যান টু ওম্যান তারা তল্লাসি করেনি।

—কেন করেনি? তাহলে স্টেশনে পুলিশ ছিল কেন? শুধু মুখ দেখাতে?...স্ট্রেঞ্জ! আপনার পুলিশ এত ওয়ার্থলেস?

নীরদবরণের অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে মহিম সান্যাল চুপসে গেছে যেন। সে হয়তো ভাবছে তার চাকরিটাই বোধ হয় আর থাকল না। এই সাহেবি মেজাজের লোকটা ওপরমহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হয়তো তার চাকরিটাই খেয়ে নেবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে থানার বড়বাবু বলল—স্যার একেবারে খবর যে নেই তা নয়। আমি স্টেশনের লোকজন, ঝাড়ুদার, আমাদের সেন্ট্রি সবাইকে ইনটারোগেট করে যা বুঝেছি তা হল ওরা দুজন বোধহয় ডাউন বর্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই চম্পট দিয়েছে।

—তার মানে কলকাতা গেছে?—ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করল।

—সেটা ডেফিনিটলি বলা মুশকিল। ঐ ট্রেনে বর্ধমান পর্যন্ত গিয়ে আবার হাওড়ার ট্রেন ধরা যায় বটে, শিয়ালদার ট্রেনও ধরা যায়; কিন্তু সেটা না করে ওরা তো বর্ধমানেও গা-ঢাকা

দিতে পারে।

—আপনি সমস্ত পোলিশ-স্টেশনে খবর পাঠিয়েছেন?—প্রশ্ন করলেন নীরদবরণ।

—খবর তো পাঠিয়েছি। কিন্তু মাস্টারমশাই আপনার মেয়ের একটা ফোটো লাগবে।

—ফোটো?....কেন?...নীরদবরণ এই প্রশ্নটা করেই কিছু যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—বুঝেছি ঐ ফোটো কপি করে সব থানায় থানায় পাঠাতে হবে। যাতে পুলিশ কিংবা সাধারণ মানুষ অপর্ণাকে দেখলে চিনতে পারে এবং খবর দেয়। কিন্তু সেটা তো সময় লাগবে। তাহলে কী?...নীরদবরণ কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেলেন।

মহিম বলল—আপাতত নিউজ পেপারে নিরুদ্দেশ কলামে মাস্টারমশাইয়ের মেয়ের ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। তাতে আশা করছি অনেকটা কাজ হবে। সুতরাং যাহোক একটা ফোটোগ্রাফ এখনই চাই। আর একটা এফ. আই. আর করতে হবে।

—এফ. আই. আর?—ত্রিদিবেশ প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ। ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট। মাস্টারমশাইকে দিতে হবে। তা না হলে কেস রেজিস্টার করাব কীভাবে?

—আপনাকে দেখে আমার আশা হয়েছিল হয়তো মেয়ের কোনও খোঁজ পেয়েছেন।—অপরেশ বললেন—কিন্তু এখন দেখছি...! আমি কি করব নীরদ? তুমি বলে দাও। আমার মাথা কাজ করছে না।

—সময় নষ্ট না করে অপর্ণার যদি কোনও ছবি-টবি থাকে তার এক কপি নিয়ে এসো আর একটা এফ. আই, আরও তো করতে হবে।—নীরদবরণ বললেন।—ত্রিদিবেশ তুমি দেখ। এখনই এ দুটো লাগবে।

—আমি দেখছি। দাদা তুমি ভেতরে চলো।

অপরেশ ভাইয়ের সঙ্গে ভেতর-বাড়িতে যাবার আগে মহিমের সামনে এসে তার দুই হাত ধরে বললেন—বড়বাবু আপনি দেখুন যদি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মেয়েকে পাওয়া যায়।...জানি না সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে কী করছে....আর কয়েক ঘন্টা মাত্র তারপরই তো বিয়ের লগ্ন পেরিয়ে যাবে। সারাজীবন ঐ মেয়েকে নিয়ে কী করব আমি?

—আহ অপরেশ!—নীরদবরণ বললেন।—এখন এত সেন্টিমেন্টাল হলে চলবে না। তুমি এফ. আই. আরটা তাড়াতাড়ি সই করে দাও। আর দেখ মেয়ের যদি একটা ছবি টবি....।

বিয়ে হয়ে মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে, তাই অপরেশ শখ করে তাঁর এক বন্ধুকে দিয়ে মেয়ের ফোটো তুলিয়েছিলেন। অপেশাদার হাতে ছবি ভাল ওঠেনি। রোদ ছিল আকাশে। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয়েছিল অপর্ণার। কিন্তু ফোটোগ্রাফার বোধহয় ঠিক জানত না, প্রকাশ্য রোদে যার ফোটো তোলা হবে, তাকে ঠিক কোন্ পজিশনে দাঁড় করালে ছবি ভাল হবে। ছবি জ্বলে যাবে না। তার ফলে অপর্ণার ফোটোতে তাকে কীরকম ঝাপসা লাগছে। কী আর করা যাবে? সেই ফোটোই এক কপি দারোগাকে দেওয়া হল। এফ. আই. আর লিখে দিল ত্রিদিবেশ। অপরেশ সই করলেন।

চলে যাবার সময় মহিম সান্যাল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা মাস্টারমশাই আপনার মেয়ে কি চিঠি-ফিটি লিখে গেছে?

নীরদবরণ চোখ টিপলেন। অপরেশেব পরিবর্তে ত্রিদিবেশ জানাল—নাহ।...কী লিখে যাবে? সে তো আর নিজের ইচ্ছেয় যায়নি...।

তেইশ

দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। নীরদবরণ সেই ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর দুই চোখ বোজা। পরনে সেই পাজামা-পাঞ্জাবিই আছে। যদিও পাঞ্জাবিটা এই গরমে যেন সবসময় শরীরের সঙ্গে কীরকম লেপটে আছে। পাঞ্জাবি খুলে শুধু গায়ে থাকলেই তো হত। কিন্তু তার উপায় নেই কারণ এই ঘরে নীরদবরণ তো একা নন। আর একজন আছে। সে হল এ বাড়ির কাজের লোক নিতাই। পাখার দড়ি টানছে একটানা, একঘেয়ে এক ছন্দে যেন। বাতাস অনুভব করছেন নীরদবরণ। মাদুরের পাখায় যা মাথার ওপর ঝুলন্ত, তাতে বাতাস ভালই হয়। নীরদবরণ ইজিচেয়ারে শুয়ে আরাম অনুভব করছিলেন। এখন তিনি কিছুই ভাবছেন না। এ বাড়ির বিপর্যয়ের কথা ভাবছেন না। নিজের কথা ভাবছেন না। হাওড়ার বাড়িতে যূথিকারা এখন কী করছে সেসবও ভাবছেন না। বরং তাঁর মনে পড়ছিল বেশ কিছুদিন আগে পাঠ করা এক ইংরেজি ফিকশনের কথা। সেটির নাম—এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া। লেখক—ই. এম. ফর্স্টার। যতদিন ব্রিটিশ শাসন করবে ইন্ডিয়া। এই দুই জাতির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন কোনওদিনই বোধ হয় টিকবে না। ফর্স্টার সাহেব তো তাই লিখেছেন। উপন্যাসটিতে আর আছে মালাবার কেভস্-গুহার মধ্যে সেই অদ্ভুত ঘটনা। ট্যুরিস্ট সেই ইংরেজ মহিলাকে গুহার অন্ধকারে কে হঠাৎ স্পর্শ করেছিল? বোধহয় অশ্লীলভাবে স্পর্শ করেছিল। কে? এই জটিল প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি লেখক। অনেকরকম রহস্যময় ইঙ্গিত আছে। এই ঘটনার পরই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে বাঁক নিয়েছিল। সেসবও অবশ্য এখন তেমনভাবে ভাবছিলেন না নীরদবরণ। তিনি ভাবছিলেন অন্য একটা কথা। ঐ উপন্যাসেই ফর্স্টার সাহেব বর্ণনা দিয়েছেন ইন্ডিয়ান পাংখাপুলারের।....আদালতকক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বসে আছেন। আদালত চলছে। কক্ষের এককোণে বসে বৃদ্ধ পাংখাপুলার যান্ত্রিক ভঙ্গিতে পাখা টেনে চলেছে। তার মুখ শীর্ণ ঘোড়ার মতো। তার দু-চোখের দৃষ্টিতে যেন কোনও প্রাণ নেই। যেন লোকটা একটা আকাট যন্ত্র। একটানা পাখার সেই লম্বা, কাছিদড়ি টেনেই চলেছে ... টেনেই চলেছে......।

নভেলে পড়া পাখার দড়ি টেনে যাওয়া সেই লোকটার সঙ্গে কি নিতাইয়ের কোনও মিল আছে? নীরদবরণ তাকালেন, লোকটার দিকে। উপন্যাসে পড়া সেই লোকটার মতো নিতাইও মিশমিশে কালো। একটা মলিন খাটো ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে আছে। আদুল গা। তবে নিতাইয়ের চেহারাটা হাড়-জিরজিরে নয়। বেশ নাদুস-নুদুস। বুক রোমরাজিতে ভরা। ঘন কাঁচাপাকা রোমরাজি। নিতাইয়ের বেশ বয়স হয়েছে। নিতাই দু চোখ বুজেই আছে। কিন্তু ঘুমোচ্ছে না নিশ্চয়ই। কারণ তার দুই হাত যন্ত্রচালিতের মতো উঠছে আর নামছে। নীরদবরণ ইচ্ছে করে একবার কাশলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের তন্দ্রাভাব চলে গেল যেন। সে তটস্থ হল। বসল সোজা হয়ে। মাথার ওপর মাদুরের পাখা দুলতে লাগল আরও দ্রুত। নীরদবরণ দেখলেন চৌকাঠ ডিঙিয়ে একজন ঢুকছে ঘরে। তাকে চেনা গেল। ত্রিদিবেশের স্ত্রী। তার এক হাতে মিস্টির প্লেট। আর এক হাতে শরবতের গ্লাস। মাথায় ঘোমটা টানা। নীরদবরণ ইজিচেয়ারে বসলেন, সোজা হয়ে। জিজ্ঞেস করলেন—এসব আবার কী বউমা?...

—একটু মিষ্টিমুখ করে নিন দাদা। আর একটু শরবত। ঘুম থেকে উঠেই তো থানায় ছুটতে হয়েছে শুনলাম।....হঠাৎ কী যে হয়ে গেল বাড়িটাতে...?

—সুপর্ণা এখন কেমন? অপরেশকে বলেছি ধৈর্য ধরতে।

—অপর্ণাকে কি পাওয়া যাবে দাদা?

ইতিমধ্যে নীরদবরণ গ্রহণ করেছেন শরবতের গ্লাস। ত্রিদিবেশের স্ত্রীর বাড়িয়ে ধরা প্লেট থেকে একটা কাঁচাগোল্লাও তুলে নিয়েছেন। কাটোয়ার মিষ্টির স্বাদ উত্তম। কলকাতায় বসেই নীরদবরণ অনেকের মুখেই কাটোয়ার মিষ্টির সুখ্যাতি শুনেছেন। সেই মিষ্টির স্বাদও পেয়েছেন মাঝে মাঝে যখন অপরেশ চাঙারি-ভর্তি মিষ্টি নিয়ে গেছেন হাওড়ায়। এখন অবশ্য মিষ্টি খাবার উপযুক্ত সময় নয়। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠে নীরদবরণ যেটা প্রথমে গলাধঃকরণ করেন সেটা হল বেড-টি। তারপর পায়খানা যান। ফিরে এসে সংবাদপত্রে চোখ বুলোন এবং আবার চা-বিস্কুট নেন। এভাবে দিন শুরু হয়। কিন্তু আজ তো তিনি বাড়ির বাইরে। দিনটা শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে।

একটা মিষ্টির সঙ্গে শরবত পান করে খুব একটা খারাপ লাগল না। অনুভব করলেন একটু খিদেও পেয়েছিল। ত্রিদিবেশের স্ত্রী প্রশ্নটা করে দাঁড়িয়েই আছে। নীরদবরণের কাছ থেকে এখনও উত্তর পায়নি। নীরদবরণের মনে হয়েছিল, তিনি কী অন্তর্যামী নাকি যে সেই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়। তার মধ্যে অপর্ণাকে পাওয়া যাবে কি না কীভাবে বলা সম্ভব? তিনি তো বন্ধুর জন্যে যা চেষ্টা কবার করেছেন। পুলিশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে খুঁজছে অপর্ণাকে।

—আমাদের আশা তো রাখতে হবে।—নীরদবরণ বললেন। শরবতের গ্লাস শেষ। ইজিচেয়ারের পাশে একটা টি-পাইয়ে তিনি গ্লাস রাখলেন। ত্রিদিবেশের স্ত্রী সেটা তুলে নিল।....ঠিক তখনই নীরদবরণের মনে পড়ল—কী আশ্চর্য! সকাল থেকে ব্যস্ততার মধ্যে তাঁর একবারও মনে পড়েনি—নাতনির কথা! সে কেমন আছে? নতুন জায়গায় রাতে ঘুমোতে পেরেছিল তো?...এখন কী করছে? খাওয়াদাওয়া কিছু করেছে?

—আচ্ছা—শুভ্রা-সুবু—কোথায়? ওর তো খোঁজই নিতে পারিনি।

—শুভ্রা?...সে আছে আমাদের মধ্যেই। আপনার এই নাতনিটি খুব মিশুকে আর ভদ্র। আমার সঙ্গে ওর খুব আলাপ জমে গেছে।

—কিন্তু সে এখন করছেটা কী?...খাওয়াদাওয়া কিছু করেছে?

—ওকে নিয়ে আপনি একেবারে ভাববেন না। ওকে আমি ঠিক চোখে-চোখে রেখেছি। রাতে শুভ্রা তো আমার পাশেই শুয়েছিল। কত গল্প করলুম আমরা। তারপর সকাল থেকে সে তো দিদির বিছানার পাশেই বসে আছে। হাতপাখা নিয়ে দিদিকে বাতাসও করছিল।.....খুব ভাল মেয়েটি। খুব বুঝদার। কত কী জানে! ওর সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়।

—নাতনিকে আমি নিজের কাছে রেখে ছোটবেলা থেকে মানুষ করছি। সবসময় চেয়েছি ভাল শিক্ষা দিতে।—নীবদবরণ বললেন এক অহং-বোধে। নাতনির প্রশংসা শুনলেই গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি—এসব কি সকলে বোঝে? ত্রিদিবেশের স্ত্রী বুঝেছে, কারণ সে নিজে শিক্ষিতা, খাস-কলকাতার মেয়ে। গাঁয়ের অশিক্ষিতা মহিলারা কি শুভ্রাকে বুঝতে পারবে? তাদের স্থূল রুচির সঙ্গে শুভ্রার কি মিলমিশ হবে? এটা ভাল না খারাপ লক্ষণ? নাতনিকে নিজের মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে, তাকে দু-পাতা ইংরেজি পড়বার মতো সক্ষম করে নীরদবরণ তার ভাল করলেন, না ক্ষতি করলেন?...কে জানে। এখন কিছু বোঝা যাবে না। সময়ই তা বলবে।

—দাদা আমি শুভ্রাকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দেব?

—হ্যাঁ। তাই দাও বউমা।...সকাল থেকে ওর সঙ্গে তো দেখাই হল না।

ত্রিদিবেশের স্ত্রী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নীরদবরণ ইজি-চেয়ারে একটু এলিয়ে দিলেন

নিজেকে। শরবতটা পান করে বেশ ঠাণ্ডা লাগছে উদর। নিতাই একভাবে পাখার দড়ি টেনে যাচ্ছে। যন্ত্রচালিতের মতো। খুব মৃদু খস্ খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। মাথার ওপর মাদুরের পাখারই শব্দ ওটা। নিতাইয়ের দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন নীরদবরণ। দেখে মনে হল বোধহয় ঝিমোচ্ছে মানুষটা। ওর দু-চোখ বুজে আছে। শুধু হাত দুটো কাজ করছে। ইচ্ছে করে একবার গলা ঝাড়লেন নীরদবরণ। তাতে তটস্থ হয়ে গেল নিতাই। একটিবার সোজা হয়ে বসল যেন। খোলা চোখে তাকাল নীরদবরণের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে শুভ্রা ঢুকল ঘরে।

—দাদু আমাকে ডেকেছ?—শুভ্রার দিকে চোখ মেলে তাকালেন নীরদবরণ। একটা হলুদ শাড়ি পরনে তার। ক্রিম-রং পেটি কোট। মাথার কেশদাম অল্প অবিন্যস্ত মনে হল। এখনও স্নান সারেনি শুভ্রা, মাথার চুলে চিরুনিও পড়েনি। তাই ওরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু তার নিখুঁত চোখ-মুখের সজীবতা নজর এড়াল না নীরদবরণের।

—কীরকম লাগছে দিদি?...আয় কাছে আয়।—নীরদবরণ ডাকলেন। ইজিচেয়ারের পাশে খাটের বিছানায় বসল শুভ্রা।

—তুমি থানায় গিয়েছিলে আমি জানি দাদু।...অপর্ণাদিকে পাওয়া যাবে তো?

—চেষ্টা তো পুলিশ করছে। লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট...।

—একটা পিকিউলিয়ার ক্রাইসিস। তাই না দাদু?

—ইয়েস—পিকিউলিয়ার ক্রাইসিস।...কোয়াইট আনফোরসিন।

—এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সবকিছু রাতারাতি কীরকম বদলে গেল।...কাকিমা খুব ভেঙে পড়েছে দাদু। অপরেশকাকুও।

—সেরকমই তো হওয়ার কথা। ওরা তো বাবা-মা....।....কেন যে অপর্ণা এরকম করল? বিয়ের সম্বন্ধ যখন হচ্ছিল তখনও তো বলতে পারত যে সে ঐ টেররিস্ট ছেলেটাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। এরকম লোক হাসিয়ে, বাবা-মাকে পথে বসিয়ে বিয়ের আগের দিন পালিয়ে না গেলে কি চলত না?

—এ বিয়ে অপর্ণাদি কিন্তু করতে চায়নি দাদু। প্রথম থেকেই করতে চায়নি। সেসব নিয়ে বাড়িতে অনেক গোলমাল হয়েছে। অপরেশকাকু অপর্ণাদিকে বাড়ির বাইরের যেতেই দিত না। সবসময় পাহারা থাকত। সেসব নিয়ে কত চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। অপর্ণাদি কারোর কথা শোনেনি। ও নিজেও নাকি টেররিস্ট দলের মেম্বারশিপ নিয়েছিল।

—তুই এতসব কথা জানলি কী করে?

—রত্নাকাকিমা সব বলেছে।

—রত্নাকাকিমা?

—ত্রিদিবেশ কাকুর স্ত্রী....।

—আই সি।—নীরদবরণ বুঝলেন।—ওর সঙ্গে তোর বেশ জমে গেছে বল?

—হ্যাঁ। রত্নাকাকিমা খুব ভাল। কলকাতায় ফিরে আমি ভবানীপুরে ওদের বাড়ি একবার যেতে চাই। নিয়ে যাবে দাদু?

—আমরা কেন ওদের বাড়ি আগে যাব? ওরাই তো আমাদের বাড়িতে আগে আসবে। তুই কাকা আর কাকিমাকে ইনভাইট করো।

—সে তো করব। আচ্ছা দাদু—

—তুই কিছু খেয়েছিস সুবু?

—হ্যাঁ খেয়েছি। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না দাদু। আমি এখন—

—...at thc disposal of Ratna-Kakima?—নীরদবরণ হাসলেন।

তারপর সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল নীরদবরণকে, যে প্রশ্নের উত্তর তাঁর আদৌ জানা নেই।

—অপর্ণাদিকে পুলিশ যদি খুঁজে না পায় কী হবে দাদু?

—কীসের কী হবে?

—কাকা-কাকিমার খুব কষ্ট হবে এটা ঠিক। আমাদেরও কষ্ট হবে। কিন্তু মেমারি থেকে বরপক্ষ এলে তাদের কী হবে?

—তাদের একটা মেয়ে জুটিয়ে দিলেই তো হবে।—নীরদবরণ হালকা গলায় বললেন।

—কোথা থেকে মেয়ে জুটিয়ে দেবে? আর অপর্ণাদিকে বিয়ে করতে এসে বর অন্য মেয়েকে বিয়ে করবেই বা কেন?

—কেন? তুই তো আছিস? অপর্ণাকে না পেলে তোকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। তোকে দেখে বরের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়ে যাবে।

—ধ্যাৎ! তুমি যে কি ইয়ার্কি করো না দাদু!—শুভ্রার ফর্সা মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল।—এত তাড়াতাড়ি আমি কি বিয়ে করব? তাদের চিনি না। জানি না। তারাও আমাদের চেনে না, জানে না।....আর তাছাড়া....শুভ্রা যেন একটু থমকাল।

—তাছাড়া আবার কী?—নীরদবরণ তাকালেন নাতনির দিকে।

—তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও থাকতে পারব না দাদু—।

—সে বললে কি হয়?...তুই মেয়েমানুষ। একদিন না একদিন শ্বশুরবাড়ি তো তোকে যেতেই হবে।

—আচ্ছা সে যখন যেতে হবে যাব।....দাদু তুমি আর একবার থানায় যাও না?

—কেন রে?

—পুলিশকে তুমি ভালভাবে বলো অপর্ণাদিকে খুঁজে আনতে। তুমি বললে ওরা ঠিক উঠেপড়ে লাগবে। তোমার কত জানাশোনা?

—থানা থেকে লালবাজারে ফোন করেছিলুম। একজন বড় পুলিশ-অফিসারকে বলেছি অপর্ণার পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা। দেখা যাক কী হয়....।

শুভ্রা দাদুকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। সেই সময় রত্না ঢুকল ঘরে। শুভ্রার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—তুমি চানটা সেরে নাও শুভ্রা।

—হ্যাঁ সুবু যা। চান সেরে নে। বেলা বাড়ছে। ফ্রেশ হ।...ওকে কি চান করতে পুকুরে যেতে হবে নাকি?

—নাহ দাদা। ওকে কখনও আমি পুকুরে যেতে দিই? ও শহরের মেয়ে। ও কীভাবে দুদিনের জন্যে গ্রামে এসে পুকুরে চান করবে? আমি নিজেও পুকুরে যাই না। পুকুরে চান করা আমার অভ্যাস নেই। ভয় করে।...আমি দোতলার বাথরুমে জল তুলিয়েছি। ও সেখানেই চান করবে। এসো শুভ্রা...

—খুব ভাল করেছ। তুমি না থাকলে আমার এই আরবান মেনটালিটির নাতনিটির খুব অসুবিধে হত এখানে।...আমাকেও তো চানটা সারতে হবে। আমি তাহলে এই বাথরুমেই—।

নীরদবরণ ঘরের লাগোয়া বাথরুমের দিকে আঙুল দেখালেন। অতিথির জন্যে বুদ্ধি করে অপরেশ এই ঘরটা সত্যিই ভালভাবে বানিয়েছে। যাকে বলে অ্যাটাচড্ বাথরুম তাও আছে। কাটোয়ার মতো মফস্বলে এ বস্তু আশাই করা যায় না। শুভ্রা তার রত্নাকাকিমার সঙ্গে চলে

গেলে নীরদবরণ নিতাইকেও বললেন চলে যেতে। এখন তাঁর পাখা লাগবে না। তিনি স্নানে যাবেন। পরে দরকার হলে আবার তাকে ডেকে নেবেন। নিতাই চলে গেল। নীরদবরণ ঘরের দরজা বন্ধ করে জামাকাপড় ছাড়লেন। চানঘরে ঢুকে দেখলেন—চৌবাচ্চায় ভর্তি জল। বালতি আছে। মগ আছে। সাবানদানিতে সাবান।...আহ্ কী ঠাণ্ডা জল! অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারলেন নীরদবরণ। তারপর চানঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ব্যাগ থেকে একটা ফতুয়া বের করলেন। পাঞ্জাবির সঙ্গে এটাও নিয়েছিলেন তিনি। দুদিনের জার্নি হলেও কাজে লেগে যাবে জানতেন। কাজে লেগে গেল তো! শুভ্রা ব্যাগ থেকে তার জামাকাপড় গতরাতেই বের করে নিয়েছিল। এখন ব্যাগটা বেশ হালকা লাগছে। শুধু শুভ্রার জন্যে আনা গয়নার বটুয়াটা আছে। আর একটা বই। বাড়িতে যা বিপর্যয় ঘটে গেছে তাতে তাঁর আদরের নাতনির এখন বই-টই পড়া মাথায় উঠেছে। আহা ওর কত শখ ছিল বিয়েবাড়িতে খুব আমোদ করবে। লোকজনের সঙ্গে গল্প করবে, টুকটাক বই পড়বে। শাড়ি-গয়না পরে, সেজেগুজে ঘুরবে। কিন্তু রাতারাতি বাড়ির আবহাওয়াটা পাল্টে গেল। সত্যি শেষপর্যন্ত কী যে হবে বুঝে উঠতে পারছেন না নীরদবরণ। পুলিশ কী পারবে অপর্ণাকে খুঁজে বের করতে? আর যদি তা পারেও তাতে কী লাভ হবে? একজন টেররিস্ট-এর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে যে মেয়ে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেও কী সব জলবৎ তরলং হয়ে যাবে? অপর্ণাকে বরপক্ষ কী আর গ্রহণ করবে? প্রবল এক গোলমালের সম্ভাবনা এ বাড়িতে,—আজ বিকেলে কিংবা সন্ধেবেলা। অপরেশের মনের যা অবস্থা সে কী সব সামাল দিতে পারবে? পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসতে হবে নীরদবরণকেই। বন্ধুকে চরম অপমানের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। যে কোনও উপায়ে...।

পাজামা আর ফতুয়া চড়িয়ে বেশ ঝরঝরে লাগছিল। ব্যাগ হাতড়ে ওডিকোলনের শিশি বের করলেন নীরদবরণ। স্প্রে করলেন ফতুয়ায়। ...সুগন্ধ। এবার এক কাপ চা দরকার। তারপর পাইপ ধরাবেন নীরদরবণ। তবে তাঁর মেজাজ আসবে। চায়ের প্রয়োজনের কথা জানাতে দরজা খুলে ঘরের বাইরে যেতে হবে। বন্ধ দরজা খুলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন নীরদবরণ। তার আগেই কে যেন করাঘাত করছে দরজায়। কে?...কী হল আবার? তাড়াতাড়ি দরজার খিল নামিয়ে দিলেন। দেখলেন সামনে আর কেউ নয়, স্বয়ং অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে-মুখে উত্তেজনার চাপ। কী রকম দিশাহারা লাগছিল অপরেশকে।

—কী ব্যাপার অপরেশ? অপর্ণার খোঁজ পাওয়া গেল?

—অপর্ণার খোঁজ?—শুকনোমুখে বললেন অপরেশ।—সে মুখপুড়ি তো আমার সর্বনাশ করে দিয়ে চলে গেছে? এখন নীচে ওরা এসেছে। ওদের সামলাই কী ভাবে?

—কারা এসেছে?

—গাঁয়ের পণ্ডিত সমাজ।

—পণ্ডিত সমাজ? কী বলতে চায়?

—ওরা আমাকে একঘরে করে দেবে নীরদ। তুমি ওদের বোঝাও। এ আমার কী সর্বনাশ হল...!

—ওরকম করছ কেন? ডোন্ট লুজ ইওর নার্ভ। এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে অপরেশ। পণ্ডিত সমাজ—টমাজ কীসব বলছ? সেসব তো শরৎচন্দ্রের নভেলে পাওয়া যায়।...চল আমি দেখছি।

নীরদবরণ তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। পেছনে শুকনো, প্রায় রক্তশূন্য মুখে-অপরেশ।

চব্বিশ

একতলার সেই বড় ঘরটাতে এসে নীরদবরণ দেখলেন তিনজন বয়স্ক মানুষ মেঝেতে পাতা ফরাসের ওপর বসে আছে। ত্রিদিবেশ বেশ কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। নীরদবরণের পেছনেই ছিলেন অপরেশ। তিনজনকে দেখেই তিনি যেন শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন—যতীন কাকা আপনি নিজে আমার বাড়িতে এসেছেন!....বসুন বসুন—চা জল খান-তামাক সাজতে বলি? তিনজনের মধ্যে মাঝখানের ব্যক্তিটির নাম তাহলে যতীন? নীরদবরণ ভালভাবে তাকালেন। প্রবীণ মানুষটি বেশ ফর্সা। গোলগাল, নাদুসনুদুস চেহারা। গড়পড়তা বাঙালির যেমন হয়। মাথা জুড়ে চকচকে টাক। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। যতীনবাবুর মুখ দেখে মনে হল যেন রাগ থমকে আছে। তাঁর আরও দুজন সঙ্গীর দিকেও তাকালেন নীরদবরণ। দুজনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন। ধুতির খুঁট জড়ানো ঊর্ধ্বাঙ্গ। যা একেবারেই পছন্দ নয় নীরদবরণের। সামান্য একটা শার্ট, খদ্দরের পাঞ্জাবি কিংবা ফতুয়া গায়ে থাকলে তো বেশ ভদ্রস্থ লাগে। খালি গায়ে লোকসমাজে বেরনোর কথা নীরদবরণ ভাবতেই পারেন না। সেই দুজন লোকের একজন চিমড়ে রোগা। ধুতির খুঁটের ফাঁকফোকর দিয়ে একজনের হাড্ডিসার চেহারা দেখা যাচ্ছে। আর একজন খর্বকায়। নাড়ুগোপালের মতো চেহারা। তার থলথলে বুক জুড়ে কাঁচাপাকা রোমরাজি নজর এড়াল না নীরদবরণের। তবে তিনজনেরই ঊর্ধ্বাঙ্গে যেটি প্রবলভাবে দৃশ্যমান সেটি হল তাদের উপবীত। বেশ মোটা এবং শ্বেত উপবীত। দেখলেই বোঝা যায়, পরনের ধুতি হয়তো প্রতিদিন কাচা হয় না। কিন্তু উপবীত যাতে ধবধবে সাদা থাকে সে ব্যাপারে নিয়ম করে প্রতিদিন যত্ন নেওয়া হয়। এদের দেখে নীরদবরণ বুঝেছেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। নিজেদের এরা মনে করে সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। এরাই সম্ভবত সমাজকে নানা বিধিনিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার হক নিজেরাই নিজেদের কাঁধে নিয়েছে। কেউ এদের এসব করতে বলেনি। শাস্ত্রে কোথাও লেখা নেই কিংবা বলা নেই যে, ব্রাহ্মণরাই সব ব্যাপারে শেষ কথা বলবে। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়; কোনটা সুনীতি, কোনটা দুর্নীতি; কোনটা করা উচিত আর কোনটা অনুচিত সেসব ঠিক করার জন্যে এরা, গ্রামের এই স্ব-ঘোষিত মোড়লেরা যেন ওত পেতে বসে থাকে। চারদিকে যেন তাদের শ্যেন দৃষ্টি। কোথাও অনৈতিক কিছু চোখে পড়লেই তারা রে রে করে ওঠে। ঐ বুঝি সব রসাতলে গেল! কিন্তু অপরেশ এমন কী অনৈতিক কাজ করেছেন যে এরা সব ছুটে এসেছে তার বাড়িতে? অবশ্য এরকম নাও হতে পারে। হয়তো অপরেশের বিপর্যয়ের কথা কানে যেতেই ওরা ছুটে এসেছে ঠিক কী ঘটেছে জানতে। সহানুভূতি জানাতে প্রতিবেশীব প্রতি।

মধ্যিখানে বসে থাকা যতীনবাবুই বেশ ভারী ব্যক্তিত্ব বোঝা গেল। তিনিই প্রধান মান্যগণ্য ব্যক্তি। বাকি দুজন তাঁর ল্যাঙ-বোট তা বোঝা গেল। যতীনবাবু থমথমে মুখে অপরেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—জল-টল কিংবা তামাক-টামাক সেবন করতে আমরা এরকম অসময়ে তোমার বাড়িতে আসিনি অপরেশ।....আমরা এয়েচি কতকগুলো জরুরি কথা বলতে....। যতীনবাবুর ডান পাশে প্যাংলা মানুষটি এবং বাঁ পাশের নাড়ুগোপাল তাঁর কথায় সায় দিয়ে একসঙ্গে বলল—হ্যাঁ ঠিক তাই। আমরা আপনার বাসায় মজলিশি করতে আসিনি। একটা খবর শুনে আমরা জানতে এলুম—

—কী জানতে এলেন?—ফস্ করে নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন। যতীনবাবু তির্যকভাবে তাকালেন নীরদববণের দিকে। হয়তো নীরদবরণের চেহারা কিংবা মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁব

মনে হল, লোকটির ব্যক্তিত্ব আছে। নেহাত হেলাফেলা করা উচিত হবে না। সে কারণেই বোধহয় তাঁর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। নীরদবরণের প্রতি দুই হাত জড়ো করে তিনি বললেন—নমস্কার মশায়।....আপনাকে তো ঠিক চিনলুম না?—নীরদবরণ উত্তর দেবার আগেই অপরেশ বললেন—উনি হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু। নীরদবরণ মুখুজ্যে। কলকাতায় থাকেন। সাহেব-কোম্পানিতে চাকরি করেন।

—সাহেব-কোম্পানিতে?—যতীনবাবু ভুরু কোঁচকাল।—তাহলে তো আপনি বেশ হোমরা-চোমরা মানুষ মশায়? তো বেশ বেশ। আপনিও থাকুন। আমাদের কথাগুলো আপনাদেরও শোনা উচিত।—যতীনবাবু থামলেন। যেন এরপর কী বলা যায় সেসব গুছিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের মনে।

ঘরে ঢুকেই নীরদবরণ এ-ঘরে পাতা গদিমোড়া দুটি চেয়ারের একটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন। ত্রিদিবেশও অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ-ঘরে তো চেয়ারের অভাব নেই। গদি মোড়া চেয়ার আরও একটি আছে। এছাড়া কাঠের পালিশ চকচকে টুলও আছে গোটাকতক। তাহলে অপরেশ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ত্রিদিবেশই বা দাঁড়িয়ে আছে কেন? বসলে কি আগন্তুকেরা অসন্তুষ্ট হবেন? নীরদবরণ অপরেশ ও তাঁর ভাইকে বসতে বললেন। কিন্তু তবুও অপরেশ বসছিলেন না। তখন নীরদবরণ বন্ধুকে নিজে হাতে টেনে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর ঠিক পাশের গদি-মোড়া, হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে। আর ত্রিদিবেশও তাঁর ইশারা অনুযায়ী বসল একটু তফাতে,—একটা টুলের ওপর।

তিনজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ হন্তদন্ত হয়ে কেন এখানে অপরেশের বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়েছে তা নীরদবরণ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন। কোনও কারণে এঁদের ধারণা হয়েছে গ্রামের মান-সম্মান ইজ্জত সবকিছু রসাতলে যেতে বসেছে। সেই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতেই যেন যতীনবাবুরা তড়িঘড়ি ছুটে এসেছেন এখানে। নীরদবরণ এটাও বুঝলেন যে, অপরেশের মনের এখন যা অবস্থা তাতে তাঁকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে কোনও লাভ নেই। গ্রামের এই শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ মোড়লদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে তাঁকেই। নীরদবরণ এবার সরাসরি যতীনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা যা বলতে এসেছেন বলতে পারেন.....।

আগন্তুক তিনজন নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। যেন নিজেদের মধ্যে নিঃশব্দে কিছু একটা ভাবের আদান-প্রদান করে নিলেন। কেশে দু-বার গলা ঝাড়লেন যতীনবাবু। তারপর বললেন—অপরেশ তোমার মেয়ে নাকি আজ সকাল থেকে নিরুদ্দেশ?...সে কী হে? ছ্যা ছ্যা ছ্যা! আজ তো তার বিয়ে? এ তো এক্কেবারে কেলেঙ্কারি?

—হ্যাঁ যতীনকাকা।—ঠিকই শুনেছেন।—মুখ নিচু করে অস্ফুটে অপরেশ বললেন।

—এখন উপায়? পাত্রপক্ষ তো এসে যাবে?—যতীনবাবুর ডানপাশে প্যাংলার প্রশ্ন।

—ব্যাপারটা গুরুতর। গ্রামের সুনামের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে...।—নাড়ুগোপালের মন্তব্য।

—তোমার মেয়ে আমাদের গ্রামের নাম ডোবাতে বসেছে! এরকম জঘন্য ঘটনা কাটোয়ার মতো এরকম শহরে ঘটবে এ তো কোনওদিন ভাবিনি আমরা। তাও আবার তোমার বাড়িতে....!—যতীনবাবু বললেন।

—জঘন্য! জঘন্য! ছি ছি ছি ছি...।—আবার মন্তব্য নাড়ুগোপালের।

—গ্রামের সকলের কাছে মুখ দেখাবে কী করে?—প্যাংলার পুনরায় প্রশ্ন।

অপরেশ মুখ নিচু করে বসে আছেন। তাঁর ঠোঁট কি মৃদু কাঁপছে? কিছু কি বলতে চাইছেন তিনি? কিন্তু বোধহয় বলতে পারছেন না। নীরদবরণ ত্রিদিবেশের দিকে তাকালেন। ডাকলেন—ত্রিদিবেশ এদিকে শোনো?

টুলের আসন ছেড়ে উঠে এল ত্রিদিবেশ। নীরদবরণের সামনে দাঁড়াল।

—কিছু বলছেন নীরদদা?

—তোমার দাদাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাও। ও একটু বিশ্রাম নিক। ওর এখন মনের যা অবস্থা কথা বলতে অসুবিধে হতে পারে। আমি কথা বলছি এঁদের সঙ্গে।

—আপনি কতা বলবেন মানে?—যতীনবাবু বললেন।—আমরা তো এয়েছি অপরেশের বাড়িতে। ওর সঙ্গে কতা বলতে। আপনি কী কতা বলবেন?

—হ্যাঁ। আমিই কথা বলব।...আপনারা কী বলতে এসেছেন আমি বুঝতে পেরেছি। আমার বন্ধুর হয়ে আমিই কথা বলব। বলুন কী জানতে চান?

এবার অপরেশের মুখে কথা ফুটল। তিনি বললেন—না নীরদ। আমি কতা বলছি ওঁদের সঙ্গে। তুমিই বরং ভেতরে যাও। কারণ—

—কারণ আমি বাইরের লোক। তোমার পরিবারের কেউ নয়।...এই তো? কিন্তু সেসব বললে আমি শুনছি না। আমিই আজ কথা বলব। তুমি নয়। তুমি ভেতরে যাও। হ্যাভ রেস্ট। ইউ নিড রেস্ট। ইউ নিড এ্যাসিসট্যান্স। তুমি এত আনইজি ফিল করছ কেন অপরেশ? যা ঘটেছে তার জন্যে তোমার মেয়েকে হয়তো কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যেতে পারে। কিন্তু তুমি কোনও অর্থে দোষী নও। ডোন্ট লুজ ইওর নার্ভ। এখন ওরকম ব্যস্ত কিংবা দিশাহারা হলে চলবে না। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছুর মোকাবিলা করতে হবে। ত্রিদিবেশ তুমি তোমার দাদাকে ভেতরে নিয়ে যাও!

নিজের ব্যক্তিত্বের যে একটা আকর্ষণ আছে সেটা নীরদবরণ ভাল বোঝেন। তিনি অভিজ্ঞতা থেকে এটাও দেখেছেন যে, কথার মধ্যে ফটর ফটর ইংরিজি শব্দ মিশিয়ে দিলে বাঙালিরা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকায়। তিনি চেয়েছিলেন, যতীনবাবুরা বুঝে যাক যে তিনি সত্যিই একজন কেউকেটা। আসলে নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে যদি ওদের, সংস্কারপন্থী এই বুড়োগুলোকে, একটু ঘাবড়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা যা বলতে এখানে এসেছে, সেসব গন্ডগোল হয়ে যাবে।

আদেশের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা নীরদবরণের কথাগুলো অমান্য করতে পারেনি ত্রিদিবেশ। অপরেশকে নিয়ে সে বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল। এই ঘরে নীরদবরণ এখন একা। বিপরীত দিকের ফরাসে তিনজন বয়স্ক মানুষ। যেন ছোটখাটো একটা বিচারসভা বসেছে এই ঘরে। অবশ্য নীরদবরণ মনে মনে বেশ তৃপ্তি বোধ করছিলেন। কড়া গলায় কথা বলে এবং দু-চারটি ইংরিজি শব্দ বলে এই বৃদ্ধদের বেশ তাক লাগিয়ে দেওয়া গেছে। মনে হয় বেশ ঘাবড়েও গেছে ওরা। কিন্তু ওরা কী বলতে চায় তা শোনা উচিত। সামাজিক ঘোঁট পাকাতে এরা ওস্তাদ। অবস্থাটা এমন করে দিল যে, অপরেশ গ্রামে আর থাকতেই পারল না। সে কারণেই এরা কী বলতে চায় শোনা উচিত।

যতীনবাবুর দিকে তাকালেন নীরদবরণ। বললেন—কী বলতে এসেছেন বলুন? অপরেশের হয়ে আমি উত্তর দেব।

যতীনবাবুদের সেই রুক্ষ ভাব যেন বেশ কিছুটা উবে গেছে। তিনি জুলজুল করে তাকাচ্ছিলেন নীরদবরণের দিকে।

বললেন (সুর বেশ নরম)—দেখুন মশায় আমরা সেকেলে মানুষ। একটু আধটু শাস্তর-টাস্তর মানি। কোনও অনাছিস্টি আমরা গেরামে হতে দেব না...।

—অনাসৃষ্টি?—নীরদবরণের ভুরু কুঁচকে গেল।—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—বিবাহযোগ্যা মেয়ে বিয়ের দিন সকালে পরপুরুষের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল এর পরও আপনি বলছেন অনাছিস্টি নয়?

—পালিয়ে তো যায়নি? তাকে ফুসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে...।—বললেন নীরদবরণ। জেনেশুনেই তিনি মিথ্যে বলছেন। বন্ধুকে বাঁচাতে তিনি মিথ্যে বলছেন। এতে কি কোনও পাপ আছে? পাপ-পুণ্যের হিসেব কে রাখে? নীরদবরণ মনে করেন যে কাজ করলে তাঁর বিবেক কামড়ায় না, মনটা ভরে যায় প্রসন্নতায়, মনে হয় কাজটা করে ঠিকই করেছি সেটাই হল আসলে পুণ্য কাজ। যেমন এখন মনে হচ্ছিল। অপর্ণা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে চিঠি লিখে রেখে গেছে তার বাবার উদ্দেশে। তাতে সে পরিষ্কার স্বীকার করেছে যে, সে স্বেচ্ছায় তার প্রেমিকের সঙ্গে নিরুদ্দেশে চলল। সে চিঠি নীবদবরণ দেখেছেন। কিন্তু সে চিঠির কথা গোপন করা হয়েছে থানার বড়বাবুর কাছে। এখন, গাঁয়ের এই গাঁয়ে-মানে-না আপনি মোড়লদের কাছেও তিনি গোপন করবেন অপর্ণার সেই চিঠির কথা। সেটা না করলে তো মেয়েটার ফেরার কোনও রাস্তাই থাকে না।

—আপনি বলছেন অপরেশেব মেয়ে পালিয়ে যায়নি? তাকে ফুসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?—যতীনবাবুর রোগা সঙ্গীর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। তাই বলছি।

পরস্পরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল বৃদ্ধরা। স্পষ্টতই নীরদবরণের কথা তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। নাড়ুগোপালের মতো চেহারার সেই বৃদ্ধের মন্তব্য—আমরা কিন্তু কানাঘুষায় অন্য কথা শুনেছি।....কী বলো যতীনদা?

—আমরা শুনেছি যে ছোকরার সঙ্গে অপরেশের মেয়ে পালিয়েছে, সে একজন টেররিস্ট। তার সঙ্গে নাকি মেয়েটার অনেকদিন পিরিত চলছিল। মাঝেমাঝে ওদের দুজনকে একসঙ্গে ঘুরতে গাঁয়েরও কেউ কেউ দেখেছে...।—যতীনবাবু এতটা বলার পর থামলেন। সঙ্গীদের দিকে ঘাড় দুপাশে ঘুরিয়ে তাকালেন। যেন নিজের কথারই সমর্থন খুঁজলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুজন সঙ্গী ঘাড় নেড়ে তাঁকে সমর্থন জানাল। যতীনবাবু এরপর কী বললেন যেন ভেবে নিচ্ছিলেন। আবার বলতে শুরু করলেন—শুনুন মশায় আপনাকে দেখে ভদ্র-সভ্য মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি এখানকার বাসিন্দা নন। দুদিনের জন্যে এসেছেন। বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নেমতন্ন খেতে। আপনি সব কথা জানেন না। আপনার সঙ্গে আর কী কথা বলব? বরং আপনি একবার অপরেশকে ডাকুন। সে সুড়সুড় করে পালিয়ে গেল কেন? যে কতাগুলো আমরা বলতে এয়েচি তাকেই বলে যাব।

—অপরেশকে এখন পাওয়া যাবে না। সে মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়েছে।....আপনাদের যা বলার আমাকে বলুন দৃঢ়। স্বরে নীরদবরণ বললেন।

—আপনি তো দেখছি আচ্ছা জাঁহাবাজ লোক মশায়? চিনি না শুনি না আপনাকে। এখানে এসে অপরেশের হয়ে কতা বলতে লেগে গেলেন? আমরা কি এখেনে তামাশা করতে এয়েছি? গাঁয়ের সম্মান যেতে বসেছে! অপরেশ ওভাবে পালিয়ে বাঁচবে? তাকে তো এ গাঁয়ে আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে? বেশ রেগে কথাগুলো বললেন যতীনবাবু। আর মুহূর্তে নীরদবরণের মাথায় মধ্যে দপ্ করে জ্বলে উঠল আগুন। কয়েকজন অশিক্ষিত এবং গেঁয়ো মানুষ তাঁকে ধমকাবে? আর সেটা তিনি মেনে নেবেন?

—ভদ্রভাবে কথা বলুন তো মশাই!—নীরদবরণ গর্জে ওঠলেন।—একটু আগে জাঁহাবাজ শব্দটা যে উচ্চারণ করলেন তা থেকেই বোঝা যায় আপনারা কতটা আনকালচারড, কতটা বারবারিয়ান..। বললেন নীরদবরণ। কথাটা বলেই, অবশ্য তাঁর মনে হল, যে দুটো ইংরিজি শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে এল, তাদের অর্থ কী এই বুড়োগুলো জানে? আনকালচারড শব্দটা হয়ত আগেও শুনে থাকবে। অর্থটাও হয়ত আঁচ করে নেবে কিন্তু পরের শব্দটা—বারবারিয়ান?

কভি নেহি। এত ভারী ইংরিজি শব্দ ওরা বোধহয় এই প্রথম শুনছে।

—আপনাদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই? বিবেক নেই? যা ঘটে গেছে তার জন্যে অপরেশ কীভাবে দায়ী হতে পারে? তাকে আপনারা শূলে চড়াতে এসেছেন কেন? তার মনের অবস্থা একবারও ফিল করলেন না? (feel শব্দটা এদের নিশ্চয়ই অজানা। অশিক্ষিত, গেঁয়ো ভূত-সব! তবুও ইংরিজি শব্দ আমাকে ব্যবহার করতে হবে। ওরা বুঝুক আর না বুঝুক। ইংরেজদের বাঙালিরা খুব ভয় পায়। আর ইংরিজি ভাষাকেও।)....যে মেয়েটার আজ বিয়ে হবার কথা, তাকে ফুসলে নিয়ে গেল একজন (আবার সত্যের অপলাপ করলাম। কিন্তু এটা তো অপরেশের সম্মানের কথা ভেবেই। নাহ্ এই মিথ্যে বলাতে কোনও পাপ নেই।)...কোথায় সবাই মিলে এসে অপরেশের পাশে দাঁড়াবেন, সান্ত্বনা দেবেন তাকে, সাহস যোগাবেন, মেয়েটাকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করবেন! তা নয়তো বাড়ি বয়ে এসেছেন তাকে শাসাতে, ভয় দেখাতে। সমাজ! সমাজ! সমাজ! সমাজের এত দায়িত্ব নিতে কে আপনাদের মাথার দিব্যি দিয়েছে? সমাজসেবার নাম করে লোকের অনিষ্ট করতে আসবেন না।...ইউ শুড বি অ্যাশেমড অব ইওর অ্যাকশানস!....আই ডেসপাইস ইউ! আই ডাউট হোয়েদার ইউ আর রিয়েলি হিউম্যান beings...। (ইচ্ছে করেই আমি ইংরিজি বলে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত যে ডেসপাইজ মানে এরা জানে না। ডাউট এবং হোয়েদারের মানে জানে কি না সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।)

নীরদবরণের রাগ যে এভাবে বিস্ফোরণ ঘটাবে সেটা বোধহয় যতীনবাবুদের ধারণা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পায়ের সামনে মাটি আচমকা ফাঁক হয়ে গেলে মানুষ যেমন চমক খায়, হাতের চেটো ঘামতে শুরু করে, ওদের তিনজনেরও সেরকমই অবস্থা। আর কামানের গোলার মতো ইংরিজি বলছে লোকটা। এখন তারা পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তার আগে যে কথাগুলো বলার জন্যে আসা হয়েছিল, সেগুলো তো হবে। হ্যাঁ, বলতেই হবে। অসামাজিক কাজকর্ম বরদাস্ত করা যাবে না। তাহলে তো সমাজ রসাতলে যাবে। আর সমাজ যাতে রসাতলে না যায় তার জন্যে যত ভাবনা আর মাথাব্যথা তো যতীনবাবুদেরই।

রীতিমতো উত্তেজিতভাবে যতীনবাবু বোধহয় জুতসই একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় দোতলা থেকে নেমে এসে এই ঘরে ঢুকল সমরেশ। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় তার মুখ থমথম করছিল। ব্যগ্রভাবে নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন—কী সমরেশ? তোমার দাদা....

—দাদা ঠিক আছে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলল এখন এ-ঘরে আসবে কি না....?

—ওকে এঘরে আসতে হবে না। ওঁরা যা বলার আমাকেই বলবেন। নীরদবরণের কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল।

—আচ্ছা লোক মশাই তো আপনি? আপনি কে?....যতীনবাবু চিৎকার করে উঠলেন।—সমরেশ তুমি ডাকো তোমার দাদাকে। আমাদেব বিধানটা আমরা বলে যাই তাকে!

—বিধান?—এত উত্তেজনার মাঝেও নীরদবরণ ঠোঁট টিপে হাসলেন।—ডু ইউ থিংক ইওরসেল্ফ অ্যাজ এ গড? আপনি বিধান দেবেন আর অপরেশকে তাই মেনে নিতে হবে?

শীর্ণ ব্রাহ্মণ রীতিমতো তর্জনী উঁচিয়ে বলল—সমরেশ! কতায় কতায় ইংরিজি বুলি ঝাড়চে এই লোকটা! একে চলে যেতে বলো। মনে রাখতে হবে তোমাদের এ গাঁয়ে থাকতে হবে। নাড়ুগোপাল সায় দিল—ঠিক। সমাজ-সংসারের নিয়ম না মেনে তোমরা এ গাঁয়ে থাকতে পারবে না! আমাদের কতা তোমাদের শুনতেই হবে!

—শুনতেই হবে। আলবাত শুনতে হবে।—যতীনবাবু বললেন!

প্রবীণদের সেই একযোগে ধমকানির সামনে সমরেশ যেন কীরকম দিশাহারা হয়ে পড়েছে। সে তাকাল নীরদবরণের দিকে। বলল—নীরদদা আপনি দোতলায় গিয়ে দাদাকে এখেনে পাঠিয়ে

দিন।....বুঝতেই পারছেন এসব আমাদের গাঁয়ের ব্যাপার। যতীনকাকা টোলের পণ্ডিত। ছোটবেলায় আমরা ওঁর কাছেই সংস্কৃত শিখিচি। ওঁর...ওঁদের কথাতো আমাকে শুনতেই হবে।

—অত ঘাবড়াচ্ছো কেন সমরেশ? উনি টোলের পণ্ডিত হতে পারেন, স্যানসক্রিট জানতে পারেন, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা ওঁর কিছুই তেমন নেই। উনি আমার মতো জেন্টেলম্যানকে বলেন কি না জাহাবাঁজ! ক্যান ইউ ইমাজিন?...দে আর সো আনকুদ....সো আনকালচারড! তোমরা এদের কথায় চিরকাল ভয় পেয়ে এসেছ। এখন আর ভয় পেয়ো না। এদের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। শরৎচন্দ্র লিখেছে। গাঁয়ের এই শাস্ত্র-পড়া ব্রাহ্মণের দল! এরা আসলে সমাজে সবসময় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। তাই নিজেরাই নানা রকম নিয়ম তৈরি করে তোমাদের ওপর তা চাপিয়ে দেয়। ডোন্ট লিসেন টু দেম! কে বলল এরা শাস্ত্র পড়েছে? এরা কিছুই পড়েনি। স্যানসক্রিট ল্যাংগুয়েজের গ্রামার এরা কী বোঝে? এরা বিষ্ণুপুরাণ পড়েছে? না মহাভারত পড়েছে? নাকি কালিদাসের মেঘদূত পড়েছে? সেসব গোল্ডেন লিটরেচার। সেসব পড়লে মন উদার হয়। মানুষ ভালবাসতে শেখে। ক্ষমা করতে শেখে। কুচুটেপনা করতে শেখে না। এদের একেবারে পাত্তা দিয়ো না সমরেশ। আমার সঙ্গে বড়লাটের অফিসের যোগাযোগ আছে। বড়লাটকে আমি লিখে জানাব যে, এরা—এইসব গাঁয়ের মোড়লরা কীভাবে মানুষের ওপর মেনট্যাল টরচার চালায়....।

বড়লাটের প্রসঙ্গ আনতে যতীনবাবুদের মুখ সাদা হয়ে গেল। নীরদবরণের কথা তারা বিশ্বাস করেছে। এই লোকটার যা হম্বিতম্বি...গলার আওয়াজ...কথায় কথায় ইংরিজির তুবড়ি তাতে এ বোধহয় সবই পারে। সমাজধর্ম করতে এসে শেষকালে হাজতবাস হবে! যতীনবাবু সঙ্গীদের বললেন—চলো আমরা যাই।

—যাব তো বটেই। আমাদের কতাটা বলবেন না?—একজন বলল।

—আমাদের বিধানটা জানিয়ে দিন। আর একজন।

—বলুন কী আপনাদের বিধান?—শান্ত স্বরে নীরদবরণ প্রশ্ন করলেন।

—শুনিচি সেই মেয়েকে খুঁজতে পুলিশ লাগানো হয়েছে। —যতীনবাবু বললেন। এখন তিনি আর ফরাসচৌকিতে বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দুই চোখ রক্তবর্ণ। শীর্ণ চেহারাটা যেন রাগের ঝোঁকে মৃদু কাঁপছে। ডান হাত বাড়িয়ে, তর্জনী তুলে হুবহু অভিসম্পাত দেবার ভঙ্গিতে তিনি নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন—একটা কতা বলে দিলুম মশায়। আপনি অপরেশকে জানিয়ে দেবেন। পুলিশ যখন লাগানো হয়েছে তখন হয়তো মেয়েকে পাওয়া যাবে। কাটোয়া থানার দারোগা মহিম সান্যালের অসাধ্য কিছু নেই মশায়। বাঘের দুধ খুঁজে আনতে বললে সে তাই আনতে পারে। কিন্তু ও মেয়েকে ঘটা করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে পারবে না অপরেশ।

—পারবে না মানে? মেয়েকে যদি ফিরেই পাওয়া যায় তাহলে তার বিয়ে দিতে আপত্তি কোথায়?

—একটা চরিত্রহীন মেয়ের সঙ্গে নিরপরাধ একজন ছেলের বিয়ে হবে আর আমরা জেনেশুনে তা মেনে নেব? সমাজ বলে একটা বস্তু আছে তো না কি? চোখের সামনে এতবড় অবিচার আমরা হতে দেব না। ঐ কুলটা মেয়ের বিয়ে দিতে অপরেশ কিছুতেই পারবে না। কিছুতেই না! পাত্রপক্ষকে আমরা ভাঙচি দেব। আমরা থাকতে এসব কেলেঙ্কারি এখানে হতে দেব না। আমাদের গাঁয়ের একটা সুনাম আছে...

—সেই সুনাম রক্ষা করবার ইজারা আপনাদের কে দিল?

—আপনার তো মশায় বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কতা!—নাড়ুগোপাল বলল।

—আপনি তো স্লেচ্ছদের মতন কথাবার্তা বলছেন!—রোগা বৃদ্ধের বলল।

—শুনুন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনাদের মতন মানুষদের জন্যেই আমাদের সমাজটা এগোচ্ছে না। আমরা চিরকাল অন্ধকার পাঁকে পড়ে আছি। আমার ধারণা ইংরেজ এখনও আমাদের আরও দুশ বছর শাসন করবে। আর তার কারণ হলেন আপনারা! অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার আর জাতপাতের দোহাই দিয়ে আপনারাই আমাদের সমাজটাকে এগোতে দিচ্ছেন না। আর তার সুযোগ বিদেশিরা নিচ্ছে।

—মশায় তো ভাল বক্তৃতাবাজি করতে পারেন?—শীর্ণের মন্তব্য।

—কমুনিস্ট নাকি? কথাগুলো সেরকম লাগতেছে?—এবার বলল নাড়ুগোপাল।

সমরেশ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। শুধু মুখে একরাশ অসহায়তা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল নীরদবরণের পাশে। এবার সে মৃদুভাবে বলতে চেষ্টা করল—যতীনকাকা আপনারা বড় রাগ করছেন। এ সময়ে দাদার মনের অবস্থাটা একবার বুঝতে চেষ্টা করুন। অপর্ণাকে ফিরে পাওয়ার পরও যদি তার আজকের লগ্নে বিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে মেয়েটা যে লগ্নভ্রষ্টা হবে। সারাজীবন আর বিয়েই হবে না ওর?

—রাধা সেজে কৃষ্ণের সঙ্গে ভেগে যাওয়ার সময় এসব কথা মনে ছিল না তোমাদের অপর্ণার? কেমন শিক্ষা দিয়েছ তাকে? সে নাকি ম্যাট্রিক পাস। তা লেখাপড়া শিখলে বুঝি চরিত্তকে বিসর্জন দিতে হয়? দু-পাতা ইংরিজি পড়া থাকলেই বুঝি সমাজের রীতি-নীতিকে দুরছাই করতে হয়?—যতীনবাবু বলে যাচ্ছিলেন আর তাঁর দু-চোখ দিয়ে যেন আগুন বর্ষণ হচ্ছিল।—শোনো অপরেশ তোমাদের এ গাঁয়ে থাকতে হবে। বাইরের লোকের জোর, জ্ঞানের কথাবার্তা তো চিরকাল পাবে না।—এই কথাগুলো আসলে নীরদবরণকে কটাক্ষ।—বাইরের লোক মোড়লি করতে আসবে দু-চারদিন। চিরকাল নয়। অপরেশের মেয়েকে পুলিশ খুঁজে এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও সব জেনেশুনে আমরা এ বিয়ে হতে দেব না। কিছুতেই না। যে ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে সে তো টেররিস্ট, আবার অব্রাহ্মণ।

—পালিয়েছে বলছেন কেন? তাকে তুলে নিয়ে গেছে। সমরেশ বলল।

—ওসব আষাঢ়ে গল্প আর আমাদের শুনিয়ো না সমরেশ। মেয়ের ইচ্ছে না থাকলে কাউকে জোর করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া যায়? আমরা তো শুনিনি যে তোমাদের বাড়ি ডাকাত পড়েছিল?

নীরদবরণের আর সহ্য হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তাঁর বাঁজখাই গলাটা একবার পরখ করেন এদের ওপর। চেঁচিয়ে বলেন—গেট আউট ইউ স্কাউন্ড্রেলস! ডোনট্ ডিসটার্ব আস ফারদার! কিন্তু তাতে গোলমালটা আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই নীরদবরণ নিজের রাগকে সংযত করলেন। গম্ভীব স্বরে বললেন—আপনাদের বিধান আমরা শুনেছি। এবার দয়া করে আপনারা আসুন।

যতীনবাবু চোখ লাল করে বললেন—আসল বিধানটা এখনও শোনেননি। শুনে নিন! অপরেশের মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করলেও তাকে বাড়িতে তোলা যাবে না। অপরেশ তাকে ত্যাজ্যকন্নে ঘোষণা করবে! আর মেমারিতে জোতদার সতীশ বাড়ুজ্জ্যের বাড়ি আমরা লোক পাঠাচ্ছি। তাকে সব জানানো হবে।—যতীনবাবু তাকালেন নিজের দুই সঙ্গীর দিকে। যেন নিজের কথার সমর্থন খুঁজছেন। তাঁর সঙ্গীরা সায় দিল ঘাড় নেড়ে। যতীনবাবু তাঁদের বললেন—চলো এবার। আমাদের যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তিনজন।

সমরেশ আর্তনাদের স্বরে বলল—দাদা তো মহাসঙ্কটে পড়ল নীরদদা? উপায়? গম্ভীরভাবে নীরদবরণ বললেন—তাই তো...কী করা যায় সেটাই ভাবছি....।

পঁচিশ

এ বাড়িতে আজ সকাল থেকে বিয়ের সানাই বাজার কথা। তাকে তো বলে নহবত। সেই নহবতের ধ্বনি কানে গেলে তবেই তো আশেপাশের মানুষেরা ভাববে বিয়েবাড়ি। অবশ্য এই গ্রামের প্রায় সকলেই এ বাড়িতে অপর্ণার বিয়ে উপলক্ষে আজ নিমন্ত্রিত ছিল। সকলকে বলা ঠিক হবে না। প্রতি পরিবারের অন্তত কর্তাব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত। বাড়ির মহিলারা নিমন্ত্রিত। আর ছোট ছেলেমেয়েরা তো মহিলাদের সঙ্গেই বিয়েবাড়ির ভোজ খেতে আসবে। সব মিলিয়ে হিসেব করে দেখা হয়েছে, প্রায় হাজার মানুষ এ বাড়িতে আজ ভোজ খাবে। প্রায় দুশো পরিবার এই গ্রামে। নানা পাড়ায় ভাগ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তারা থাকে। বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, বদ্যিপাড়া, মণ্ডলপাড়া এরকম সব বিভিন্ন পাড়ায় মানুষ এখানে পৃথক হয়ে আছে। পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাস করছে দীর্ঘকাল। এই ছবি বাংলার সব গ্রামে। অপরেশদের গ্রামও সেই ঐতিহ্যের বাইরে নয়। সব পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। অপরেশ নিজে গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে অধিকাংশ বাড়িতে। কিছু বাড়িতে অপরেশের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিল সমরেশ। ত্রিদিবেশ তো আর এই গ্রামে তেমনভাবে থাকে না। সুতরাং তার এ ব্যাপারে ভূমিকা কম ছিল। অবশ্য ভাইঝির বিয়ে উপলক্ষে ত্রিদিবেশ একটা ব্যাপারে দাদাকে বেশ কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছে। সেটা হল কলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা। অপরেশদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের পরিধি বেশ বড়। কলকাতার নানা অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে আছে। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার, আহিরিটোলা এবং বেলঘরিয়া অঞ্চলে। এদিকে দক্ষিণে কালীঘাট, হাজরা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা—সর্বত্র সেইসব আত্মীয়স্বজনদের বাস। অতজনের বাড়ি বাড়ি অপরেশের পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ত্রিদিবেশ ভবানীপুর এলাকার বাসিন্দা। সে দাদার হয়ে কলকাতার অনেক বাড়িতে নিজে গিয়ে নানা আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে এসেছে।

একটা কথা এখানে জানিয়ে রাখা ভাল। কাটোয়া স্টেশন থেকে অন্তত পনেরো কুড়ি মাইল ভেতরে অপরেশদের এই গ্রামে নানা পাড়ায় ভাগ হয়ে থাকা সব পরিবারেরই আজ এই বিয়েবাড়িতে নেমতন্ন আছে তা নয়। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে ডোমপাড়া আর বাউরিপাড়া। ঐ দুই পাড়ায় গিয়ে ব্রাহ্মণ অপরেশ চক্কোত্তির নিমন্ত্রণ করে আসার কোনও প্রশ্নই ছিল না। ওরা তো ছোটলোক। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি। ব্রাহ্মণ-বাড়িতে নেমতন্ন খেতে আসার অধিকার ওরা অর্জন করেনি। এই গ্রামের প্রধান জীবনস্রোত থেকে যেন ওরা বিচ্ছিন্ন। কোনও ভদ্রবাড়িতে ওদের আহ্বান জানানো হয় না। ওরা বিচ্ছিন্ন হয়েই গ্রামের এক প্রান্তে কিংবা একেবারে শেষ প্রান্তে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বাস করছে। জীবনের খেলা যখন সাঙ্গ হয়, শ্মশানযাত্রা করতে হয় মানুষের মৃতদেহকে, তখনই তো ডোম কিংবা বাউরিদের দরকার পড়ে। তার আগে ঐসব ছোটলোকগুলোর ছায়া মাড়ানোও পাপ। এরকম ডোম এবং বাউরি পরিবার এই গ্রামে আছে অন্তত পঁচিশ ঘর। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে এক একটা পরিবারে সাত-আটজন, এমনকী দশজনও হতে পারে। তার মানে প্রায় দুশ থেকে আড়াইশো মানুষ। ওরা নিমন্ত্রণের তালিকা থেকে অবধারিতভাবে বাদ। তবুও গ্রামের মানুষজন, আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজন বরযাত্রী সব মিলিয়ে মোট নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হাজারখানেক তো বটেই। এত মানুষের আপ্যায়নের জন্যে কত আয়োজনই না করা হয়েছে। ত্রিদিবেশের ওপর ছিল দোকান-বাজার করার ভার। বাড়ির একতলার বড়সড় উঠোনে বাঁশের ম্যারাপ বাঁধা হয়েছিল। সেই বাঁশের খাঁচার ওপর চাপানো হয়েছিল তেরপল। আর দুধারে সতরঞ্জি-ডিজাইনের কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। গ্যাসের বাতির

ব্যবস্থা করা হয়েছিল পরপর অনেকগুলো। যাতে উৎসবের দিন রাতে অপরেশের বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করে। আলোর রোশনাই, নহবতের সুর—এসব না হলে আর বিয়েবাড়ি কী? কিন্তু সেই আলো আজ আর কার জন্যে জ্বলবে? কী কারণেই বা জ্বলবে? আজ সকাল থেকেই তো এ বাড়িতে শ্মশানের স্তব্ধতা। দীর্ঘশ্বাস আর চাপা কান্নায় ভারী হয়ে আছে এ বাড়ির বাতাস।

তেরপল-চাপানো আর রঙিন শতরঞ্চি-মার্কা কাপড় দিয়ে ঘেরা বিরাট প্যান্ডেলের একদিকে প্রায় দেড়শো নিমন্ত্রিতের পাত পড়ার কথা ছিল। আর একদিকে করা হয়েছিল রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। হালুইকররা ইট আর কাদামাটি দিয়ে তিনটে বড় বড উনুন সেখানে গড়ে রেখে গেছে গতকালই। যজ্ঞিবাড়ির উনুন যেমন হয় আর কী। একটি উনুন নির্দিষ্ট করা আছে ভাতের জন্যে। আর একটি উনুনে রাঁধা হবে তরকারি। আর একটিতে মাছ। মাছের কালিয়া রাঁধবার জন্যে উনুনটি একটু তফাতে। ভাত এবং তরকারির সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে রাঁধা হবে মাছের পদ। যাতে নিরামিষ-ভোজী যাঁরা তাদের খাদ্যদ্রব্যে আমিষের ছোঁয়া না লেগে যায়। পাশাপাশি দুটো উনুন। বেশ তফাতে একটি উনুন। এই তিনটে উনুন নিয়ে সমস্ত জায়গাটা চটের বেড় দিয়ে ঘেরা। রান্না চলাকালীন কিংবা নিমন্ত্রিতদের পরিবেশনের সময় সেখানে সকলের প্রবেশ নিষেধ। রাঁধুনি-বামুনরা ছাড়া সেখানে একমাত্র ঢুকতে পারবে ভোজের দেখভাল করার দায়িত্বে থাকবে যারা। যেমন এক্ষেত্রে ত্রিদিবেশ, সমরেশ এবং অপরেশ নিজে। পরিবেশনকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করা গ্রামের কিছু ছেলে-ছোকরা। যারা সবাইয়ের কাছে চিহ্নিত পরিবেশনকারী হিসেবে। এই গ্রামের বামুন কিংবা কায়েতদের বাড়ির বিয়ে, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন কিংবা ঐ ধরনের অনুষ্ঠান লাগলে সেই পরিবেশনকারী দলেরই ডাক পড়ে।

রান্নার এরকম ব্যবস্থা ছাড়াও একতলার উঠোনের দক্ষিণ দিকের ঘরে ছিল ভিয়েনের ব্যবস্থা। আজ সকালেই সেখানে অর্ডারি ছানা এবং অন্যান্য উপকরণ চলে এসেছে। সারাদিন ধরে সেখানে মিষ্ঠান্ন-প্রস্তুতকারীদের তত্ত্বাবধানে তৈরি হওয়ার কথা নানারকম মিষ্টি খাবার। অপরেশ গতকাল সন্ধের সময় গোলঘরে বসে নীরদবনের সঙ্গে মদ্যপান করছিলেন যখন তখনই বন্ধুকে বলে রেখেছিলেন যে, ভিয়েনের ঘরে অর্থাৎ মিষ্টির ভাঁড়ারের দায়িত্ব নিতে হবে তাঁকেই। কারণ, উৎসবের বাড়িতে সবথেকে বেশি চুরির কিংবা বাটপাড়ির ভয় থাকে সেখানেই। নীরদবরণের মতো কড়া ধাতের মানুষ ভিয়েন-ঘরের দায়িত্বে থাকলে অপরেশ চিন্তাশূন্য থাকতে পারবেন। নীরদবরণের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে ময়রারা নিজেদের লুঙ্গি বা ধাতুর গোপন জায়গায় ছানার অংশ কিংবা খোদ মিষ্টিই লুকিয়ে রাখতে পারবে না এবং পরে সুবিধেমতো বাইরে পাচার করার ক্ষেত্রেও অসুবিধেয় পড়বে। বন্ধুর এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়েছিলেন নীরদবরণ। ভিয়েন-ঘরের দায়িত্বে থাকতে বেশ পছন্দ তাঁর। ময়রারা কীভাবে চুরি-চামারি করে সেসব তিনি জানেন ভাল। আর তত্ত্বাবধানের সময় দেখতেও ভাল লাগে। এক একটা বড় বারকোষে ধীরে ধীরে ভুঁড়িওলা ময়রারা গড়ে তুলবে মিষ্টির ছোটখাটো পাহাড়। কোনওটাতে কাঁচাগোল্লা। কোনওটাতে চন্দ্রপুলি। কোনওটাতে লেডিকেনির এক একটা নিখুঁত বল। পরে সেগুলোই ভাজা হবে। এবং ফেলা হবে রসে। তবেই না তৈরি হবে এক একটা রস-টইটম্বুর লেডিকেনি। এ মিষ্টিটাকে এখনকার লোকজন পানতুয়াও বলে থাকে। কিন্তু কলকাতার লোকেরা বলে লেডিকেনি। এরকম নাম কেন হল এই মিঠাইয়ের তা কলকাতার মানুষেরা কি সবাই জানে? সবাই নাও জানতে পারে। কিন্তু নীরদবরণ তো জানেন। লেডি ক্যানিং—মানে, ক্যানিং সাহেবের স্ত্রীর খুব প্রিয় ছিল নাকি এই মিষ্টি। মেমসাহেবের খুব প্রিয় এই মিঠাইয়ের নাম মানুষের মুখে মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে লেডিকেনি। এই তথ্য নীরদবরণ জেনেছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ পড়ে। ঐ পত্রিকাটি তিনি নিয়মিত পড়েন।

বাঙালিরাও যে কত উৎকৃষ্ট ইংরিজি লিখতে পারে সেটা ঐ পত্রিকা (মাসিক) নিয়মিত পড়লে বোঝা যায়।

হাজার লোকের পাত পড়বে এ বাড়িতে আজ রাতে; এই ভেবে সরু বাঁশকাঠি চাল আনা হয়েছিল কয়েক মণ। গতকাল বিকেলের দিকে ত্রিদিবেশ কাটোয়া রেলস্টেশনের লাগোয়া বড় বাজার ঘুরে ঘুরে ফর্দ ধরে ধরে তরিতরকারির পাহাড় কিনেছিল।

বেলা অনেক হল। উনুন সাজিয়ে, তরিতরকারির পাহাড় নিয়ে হালুইকরেরা অনিশ্চিতভাবে সকাল থেকে বসে আছে। তারা কী পরিমাণ চালের ভাত চাপাবে, ডাল-তরকারিই বা কতটা রাঁধবে সে ব্যাপারে কোনও নির্দেশই এখনও পায়নি। দুঃসংবাদ তারা শুনেছে। যার বিয়ে সেই মাগী-ই অন্য কোন ছোঁড়ার সঙ্গে ভেগে গেছে—এই মুখরোচক খবরটা তারাও শুনেছে। বিড়ি টানতে টানতে খবরটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা কতই না লোফালুফি করেছে সকাল থেকে। শুধু তারা কেন। সারা গ্রামেই খবরটা আগুনের দ্রুততায় ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের মানুষদের কাছে বৈচিত্র্যপূর্ণ খবর আর আসে কোথায় তেমন। সেই থোড়বড়িখাড়া একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন। হঠাৎ হঠাৎ চাঞ্চল্যকর খবর সেই নিস্তরঙ্গ জীবনে একটু কাঁপুনি তোলে, ঢেউ তোলে, আলস্য কাটিয়ে নড়েচড়ে বসে সবাই। এই খবরটাও ইতিমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেশ ঢেউয়ের সৃষ্টি করল। নীরদবরণ কিংবা অপরেশ যদি ইচ্ছেমতো উড়তে পারতেন, রূপকথার রাজ্যে যেমন হয়; যদি পিঠের দুপাশে পরিদের মতো দুটো ডানা থাকত, এবং সেই ডানার ব্যবহার তাঁরা জানতেন; তাহলে দুজনে বেরিয়ে পড়তেন পারতেন বাড়ি থেকে। কিংবা বলা উচিত এ-বাড়ির তেতলার ছাদ থেকে উড়ে যেতে পারতেন তাঁরা সাবলীলভাবে। উড়তে উড়তে যেখানে গিয়ে হাজির হতেন;—হয় কোনও চন্ডীমন্ডপে, কিংবা বাজারে, অথবা কোনও বাড়ির বৈঠখানায় বা উঠোনে, পুকুরঘাটের ধারে যেখানে সবাই স্নানের জন্যে জড়ো হয়েছে;—এরকম যে কোনও জায়গায় হাজির হলেই তাঁরা দেখতে পেতেন সবাই নিজেদের মধ্যে গুজগুজ, ফুসফুস করছে। কান পাতলেই তাঁরা, উড্ডীয়মান নীরদবরণ এবং অপরেশ, শুনতে পেতেন সর্বত্র চলছে একই আলোচনা— চক্কোত্তি বাড়ির মেয়ে ভেগেছে! বিয়ের দিন সকালে ভেগেছে এক ছোকরার সঙ্গে। আরে ও তো চেনা ছোকরা! টেররিস্ট। অনুশীলন সমিতির সদস্য। দীপক। সামন্তবাড়ির ছেলে....বামুন বাড়ির মেয়ে সামন্তবাড়ির ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে! কি লজ্জা! কি লজ্জা!... জাত—ধম্মো বলে আর কিছু রইল না। কেলেঙ্কারি! কেলেঙ্কারি! ছি ছি ছি ছি বদনাম হবে গ্রামের।

অবশ্য সময়টা তো যুদ্ধের। দুনিয়া জুড়ে নাকি যুদ্ধ লেগেছে। হিটলার চাইছে পৃথিবীর অধীশ্বর হতে। নাৎসিবাহিনী আক্রমণ করেছে পোলান্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া। ইহুদি জাতটাকে পুরো নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় হিটলার পৃথিবীর বুক থেকে। হাজার হাজার ইহুদি নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী, সদ্যোজাত শিশু সবাইকে নাৎসি-বাহিনীর যমদূতেরা ধরে ধরে পাঠিয়ে দিচ্ছে আউসভিৎস ক্যাম্পে—গ্যাসচেম্বারে। ১৯৩৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৪১ এর এই জুন মাস পর্যন্ত হিটলার নাকি কয়েক লক্ষ ইহুদিকে স্বর্গ কিংবা নরকে পাঠিয়ে দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, হিটলার নাকি এবার তোড়জোড় চালাচ্ছে আরও বড় এক অভিযানের, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের। দশ লক্ষ সৈন্য, পাঁচ হাজার বিমান, কয়েক হাজার ট্যাংক নিয়ে হিটলার-বাহিনী শুরু করেছে তাদের যাত্রা। তাদের লক্ষ্য—মস্কো এবং স্তালিনগ্রাদ। এসব খবর কি এসে পৌঁছয় অপরেশদের এই নিস্তরঙ্গ গ্রামে? সব খবর হয়তো আসে না। কিন্তু কিছু কিছু তো আসে। আসলে সময়টাই তো গোলমেলে। কীরকম যেন তালগোল পাকানো। গ্রামে-গঞ্জের বোকা-সোকা, নিরক্ষর মানুষেরা ঠিক বোঝে না অনেক অনেক অনেক দূরে—সাগর পেরিয়ে যেসব দেশ আছে;

—সেখানে সাহেবদের নিজেদের মধ্যে কেন যুদ্ধ লেগেছে। চালের দাম বেড়েছে। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েছে। সব নাকি যুদ্ধের ফল। শোনা যাচ্ছে যুদ্ধ যত এগোবে, তত খাদ্যদ্রব্যের আকাল হবে। দুর্ভিক্ষ লাগবে। ওইসব দূরের দেশে সাহেবরা কেন মারামারি করে মরছে? কে হিটলার? কে চার্চিল? কে স্ট্যালিন? তোজো নামে একজন জাপানির নামও শোনা যায় মাঝে মাঝে। সে নাকি সংঘাতিক মিলিটারি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাতে চায়। সে যুদ্ধের রেশ কি এই ভারতবর্ষ কিংবা বাংলাদেশেও বোঝা যাবে? যেতে পারে কারণ, ব্রিটিশরা তো ভারতবর্ষেও আছে। শোনা যাচ্ছে, জাপানিরা নাকি বোমা ফেলবে—কলকাতায়। বোমা ফেলে ধ্বংস করে দেবে বড়লাটের বাড়ি। তাহলে মানুষগুলো যাবে কোথায়? কলকাতার মানুষগুলো? তারা কি সব কাটোয়ায় পালিয়ে আসবে? নাকি যশোর কিংবা চাটগেঁয়ে যাবে?...কে জানে কী হবে? এদিকে সুভাষ চন্দ্র বসু ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেলেন! শোনা যায় তিনি নাকি কাবুল-কান্দাহার পেরিয়ে রাশিয়ার দিকে গেছেন। সেখান থেকে সৈন্য জোগাড় করে তিনি ভারতবর্ষে আসবেন। ব্রিটিশদের তাড়াবেন এদেশ থেকে। তারপর আবার শোনা গেল, তিনি রাস্তা বদলেছেন। গেছেন ভিয়েনার দিকে। বার্লিনের দিকেও যেতে পারেন। দেখা করবেন হিটলারের সঙ্গে। তাঁর মাথায় ব্রিটিশদের ভারতছাড়া করবার জন্যে কত রকম পরিকল্পনা! কিছু গুজব হয়ে কানে আসে। অনেকটাই আসে না। আবার নিজেদের দেশেও গান্ধীজি ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের তোড়জোড় করছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন। অহিংস আন্দোলন। এভাবেই তিনি ব্রিটিশকে বাধ্য করবেন ভারত ছাড়তে। কতরকম গুজব কার্পাস তুলোর বীজের মতো আকাশে-বাতাসে ছড়ায়। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কোন্‌টা সত্যি। কতটা সত্যি? সোভিয়েত রাশিয়া কি আক্রমণ করবে হিটলার-বাহিনী? সুভাষ বসু কি আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে এগিয়ে আসছে দিল্লির দিকে? জাপানিরা কি সত্যিই বোমা ফেলে উড়িয়ে দেবে কলকাতা শহরটাকে? ভারত ছাড়ো আন্দোলন কি শুরু হবে? নেহেরু, গান্ধী, রাজাগোপালচারীরা কি সেই আন্দোলন করে তাড়াতে পারবে ব্রিটিশকে এ দেশ থেকে? তাহলে দীপক সামন্তের মতো টেররিস্টরা কী চাইছে? তারাও তো চাইছে ব্রিটিশরা হটে যাক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। লক্ষ্য সকলের এক। শুধু রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন। কলকাতার মানুষ কতরকম খবরের কাগজ পড়ে। তারা হয়তো অনেক খবর রাখে। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জের মানুষেরা ঠিক অনুধাবন করতে পারে না দুনিয়াজুড়ে কী হচ্ছে। নিজেদের দেশ জুড়েই বা কী হচ্ছে। যুদ্ধের খবরের থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তাদের কাছে কোনও বামুন মেয়ের বিয়ের দিন পালিয়ে যাওয়ার খবর। সেই খবর নিয়ে তারা সুখে থাকে কিছুক্ষণ। উত্তেজিত হয়। দেশটা যে সত্যিই রসাতলে যেতে বসেছে এটা যেন আরও বুঝতে পারে।

দোতলার ঘরে নীরদবরণ চুপচাপ বসেছিলেন। পাখা টানার সেই লোকটা—নিতাই আবার নিঃশব্দে এসে হাজির হয়েছে। যন্ত্রচালিতের মতো টেনে যাচ্ছে পাখা। ঘসর ঘসর ঘসর ঘসর। আরাম হচ্ছিল নীরদবরণের। তিনি ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়ে, দু-চোখ মুদে ছিলেন। অপরেশের বাড়ির অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিটা যেন একবার ভেবে দেখতে চাইছিলেন নিজে। সুবুর কথাও মনে হয়েছে। পরক্ষণেই অবশ্য ভেবেছেন, মেয়েটা এ বাড়ির চরম বিশৃঙ্খলার মাঝেও ত্রিদিবেশের বউয়ের তত্ত্বাবধানে নিশ্চয়ই ভালই আছে। ভাবতে ভাবতে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা মতো এসে গিয়েছিল কি?

সেই আচ্ছন্নতা কেটে গেল যখন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ত্রিদিবেশ।

—নীরদ-দা একটা কথা বলতে এলাম।

—কী?-চোখ খুললেন নীরদবরণ।

—রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারছি না।

—মানে?

—হালুইকর ইনস্ট্রাকশান চাইছে। সে কি ওবেলার হাজার লোকের রান্না চাপাবে? যা করার তো করতে হবে। না হলে অত লোকের রান্না সামলাবে কী করে ওরা?

নীরদবরণ তাকিয়ে থাকলেন।

—আর ভিয়েনঘরের কী অবস্থা?—প্রশ্ন নীরদবরণের।

—বাড়িতে বিপর্যয় দেখে আমি হীরু ময়রাকে আসতে বারণ করে দিয়ে এসেছি সকালেই। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে।

—থানা থেকে অপর্ণার কোনও খবর আছে?

—নাহ।...তবে এ বাড়িতে আত্মীয়স্বজন মিলে জনা তিরিশ আছে। তাদেরও এ বেলা তো মুখে কিছু দিতে হবে।

—অপরেশ কোথায়? প্রশ্ন করলেন নীরদবরণ

—চুপচাপ বসে আছে নিজের ঘরে। পাথরের মতন। আর বউদি শুয়ে শুয়ে চোখের জল ফেলছে।...কী যে হয়ে গেল! নীরদবরণ তাকিয়ে ছিলেন দৃশ্যত বিভ্রান্ত ত্রিদিবেশের দিকে। ইজিচেয়ার থেকে নিজেকে টেনে তুললেন। ত্রিদিবেশের কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন—ডোন্ট বি সো পার্টাবাড। সবাই দিশাহারা হলে কি চলে? তোমার সঙ্গে আমি যাব হালুইকরের কাছে। যা ইনস্ট্রাকশান আমিই দেব।...লেটস গো ত্রিদিবেশ...।

ছাব্বিশ

ত্রিদিবেশের সঙ্গে একতলাতে নেমে এসে নীরদবরণ দেখলেন, সত্যিই চারদিকে সবকিছু ছত্রাখান হয়ে আছে। হালুইকর তার দু-জন সঙ্গীকে নিয়ে তেরপলের আড়ালে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। প্রত্যেকের দু-আঙুলের ফাঁকে বিড়ি জ্বলছে। গতরাতে বানিয়ে ফেলা পরপর তিনটে মাটির উনুন শুকিয়ে খটখট করছে। একটু দূরে—উঠোনের একপাশে ডাঁই হয়ে আছে জ্বালানি কাঠ। উনুন জ্বলেনি। এই তেরপল—ঘেরা জায়গায়, এক পাশে নানা তরিতরকারির একটা ছোটখাটো পাহাড়! আলু, পিঁয়াজ, আদা, রসুন, পটল, কুমড়ো, বেগুন, লংকা এরকম অনেকরকম তরকারি। আজকের বিয়ের আসরে খাবারের পদ কী ছিল? সেটাই তো জানা হয়নি নীরদবরণের মনে হল। এখন আর জানার প্রশ্ন নেই। জেনে বোধহয় লাভও নেই। কারণ বিয়ের আসর কি আদৌ বসবে আজ এ বাড়িতে? পুলিশ সত্যিই কি অপর্ণাকে খুঁজে আনতে পারবে? আর যদি শেষমেশ খুঁজে আনতে পারে তাহলেও মেমারির সেই পাত্রের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে দেওয়া কি সম্ভব হবে? নীরদবরণের মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যতীনবাবুর শাসানি। ওরা সব নিজেদের সমাজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ভাবে। একটু বেমক্কা কিছু দেখলেই—সবকিছু রসাতলে গেল—বলে চিৎকার শুরু করে। যে মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তাকে আবার নির্বিবাদে আজ রাতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসানো—এ কি আদৌ সম্ভব? নীরদবরণ একা কি প্রতিবাদ করে কিছু করতে পারবেন? গ্রামের সব ব্রাহ্মণ যদি দলবেঁধে বিয়ের আসরে উপস্থিত হয় এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় তাহলে কি তা অগ্রাহ্য করা যাবে? জোর করে কিছু করতে যাওয়াটা বোধহয় হঠকারিতা হয়ে যাবে। কারণ

অপরেশকে এই গ্রামে নিজের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে। পারিপার্শ্বিক সমাজকে অস্বীকার করে কি বিচ্ছিন্নভাবে, একা, একা এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব? কলকাতায় বসে, কোট-প্যান্টুলুন-টাই হাঁকিয়ে নীরদবরণের মতো উচ্চশিক্ষিত এবং অভিজাত মানুষের পক্ষে হয়ত এই গ্রামের কুসংস্কার এবং ভিত্তিহীন সামাজিক বিধিনিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্যাখানো সম্ভব; ফুঃ.....'ফুঃ.. বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই অজ গাঁয়ে পড়ে থেকে অপরেশের পক্ষে তা কীভাবে সম্ভব?

হালুইকর এবং অন্য দুজন হঠাৎ ত্রিদিবেশ ও নীরদবরণকে দেখে যেন কিছুটা ঘাবড়ে গেল। বিড়ি দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে। ছাই জমেছে। ছাই ঝেড়ে ফেলে বিড়িতে পুনরায় টান দেবার ব্যাপারে তারা বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। রান্নার জিনিসপত্র,—যেমন বড় ডেকচি, কড়াই, হাণ্ডা, হাতা, খুন্তি এসবও এলোমেলো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

নীরদবরণ তিনজনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন—একি এখনও উনুন জ্বালা হয়নি কেন?.....এক ডেকচি ভাতও চাপানো হয়নি? ব্যাপারটা কী হে?

হাঁটু অব্দি খাটো ধুতি, আদুড় গা, গলায় কণ্ঠির মালা, মাথায় টাক, মুখটা ঘোড়ার মতো লম্বাটে যে লোকটা উত্তর দিল সেই বোধহয় প্রধান রাঁধুনি। সে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে বলল—কী করব বাবু? কেউ তো কিছু বলেনি?

—বলেনি মানে?—সব বুঝেও প্রশ্ন করতে হল নীরদবরণকে।

—কতবার খবর পাঠিয়েছি গিন্নি-মার কাছে কতটা চালের ভাত হবে, সকালে কত লোক খাবে। কোনও জবাব পাইনি। বাড়িতে তো একটা বিপজ্জয়... হালুইকর শেষ করল না কথাটা।

—সত্যি এটা তোমাদের দ্যাখা উচিত ছিল। ত্রিদিব...।—গম্ভীরভাবে বললেন নীরদবরণ।—বেলা অনেক হল। এগারোটা পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে এখন যারা হাজির আছে তারা তো দুপুরবলো কিছু মুখে দেবে? একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে গেছে বলে সবাই একযোগে উপোস করবে তা তো আর হবে না?

—ঠিকই বলেছেন নীরদদা।—ত্রিদিবেশ সায় দিল।

—এখন এ-বাড়িতে লান্চ করার মতো কত হেডস হবে বলে তোমার মনে হয়?

—এখন?...কপাল কুঁচকে ত্রিদিবেশ মিনিটখানেক ভাবল।—অ্যাবাউট থার্টি?

—তাহলে....সব মিলিয়ে ফিগারটা ফর্টি হবে?—নীরদবরণ বললেন। ত্রিদিবেশ হিসেবটা বুঝল। বাড়ির লোকজন, অতিথি, এদের সঙ্গে হালুইকরেরা, চাকরবাকর এদেরও হিসেবের মধ্যে ধরেছেন নীরদবরণ।

—হ্যাঁ। সেরকমই।—উত্তর দিল ত্রিদিবেশ।

—এই যে ভাই! আপনার নাম?—হালুইকরের দিকে তাকিয়ে নীরদবরণ।

—পরান....দাস ছ্যার।

—বেশ। পরান আপনি এখুনি দুটো উনুন জ্বালুন। একটাতে চল্লিশজনের মতো ভাত চাপিয়ে দিন। আর একটাতে ডাল। আর....মাছ তো এসে যাবার কথা। গতকাল অপরেশ বলছিল।

—নাহ নীরদদা মাছ আসেনি।—ত্রিদিবেশ জানাল।

—মানে?

—সকালের কাণ্ড দেখে আমি আর সমরেশ আড়তদারের ডেরায় গিয়ে মাছের অর্ডার বাতিল করে দিয়েছি। এটা আমারই ডিসিসান। দাদাকে জানাইনি। সব কিছু যেখানে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে সেখানে এক কুইন্টাল মাছ এনে বাড়ি বোঝাই করে লাভ? কে খাবে?

—আড়তদার তোমার কথা মেনে নিল?

—ঝামেলা একটু হয়েছে। অর্ডারি মাল। সেও তো অসুবিধেয় পড়বে। বেশ কিছু টাকা

দিতে হল আড়তদারের হাতে গুঁজে।

—আর যদি সত্যিই বিয়ে হয় এ বাড়িতে?...আজকেই? সব নিমন্ত্রিতদের নিরামিষ খাওয়াবে?

—কাটোয়ার বাজার রিসোর্সফুল। দু-ঘন্টার নোটিসে যা প্রয়োজন সেই মাছ বাড়িতে পৌঁছে যাবে।—ত্রিদিবেশ হাসল। যদিও হাসিটা ম্লান।

—তাহলে শুনুন ভাই পরান।—নীরদবরণ বললেন।

—ছ্যার শুনচি।

—ভাত, ডাল আর তরিতরকারি দিয়ে যাহোক একটা ঘ্যাঁট। আশা করি ঘন্টা দুই-এর মধ্যে ম্যানেজ হয়ে যাবে। বেলা একটার মধ্যে প্রথম পাত পড়ুক এটা আমি চাই।

—চেষ্টা কইরব ছ্যার। সকাল থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আচি। কেউ কিছু বললেন না। এখন শিরে সংক্রান্তি। দু-ঘন্টার মধ্যে চল্লিশ জনের রান্না? তিনটে পদ?

—আরে এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ঠিক হয়ে যাবে। কাজের বাড়িতে তো আর এই প্রথম কাজ করছেন না?

—আজ তিরিশ বৎসর একই কাম করতাছি ছ্যার!

—তাহলে? চলো ত্রিদিব। এবার দোতলাতে গিয়ে সবাইকে চানে পাঠাই। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে কান্নাকাটি করলে তো আর সমস্যার সুরাহা হবে না। সেটাই তো কেউ বুঝতে চাইছে না।

দোতলার সিঁড়িতে পা দেবার মুখে থমকে গেলেন নীরদবরণ। ত্রিদিবেশও থেমে যেতে বাধ্য হল।

—কিছু বলবেন নীরদদা?

—তোমার মিষ্টির ভিয়েনের কী অবস্থা? ছানা-টানা, মিষ্টি বানাবার কারিগর সব কি এসে গেছে?

—সে ব্যাপারেও আমি একটা ডিসিসান নিয়েছি। সকালে এ বাড়ির কনডিশন দেখে। সেটাও দাদাকে বলিনি।

—ডিসিসানটা কি?

—বাজারে হারু ময়রার ডেরায় গিয়ে মিষ্টির অর্ডারও ক্যানসেল করে দিয়েছি।

—অর্ডার ক্যানসেল করা চুপচাপ মেনে নিল?

—তা কি মানতে চায় নীরদদা? সেখানেও টাকা দিতে হয়েছে।

—দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ অলরেডি টেকেন ইট ফর গ্র্যান্টেড দ্যাট অপর্ণা উইল নট রিটার্ন?

এ কথার কী উত্তর দেবে ত্রিদিবেশ? সত্যিই তো কী উত্তর দেবে? সুতরাং সে চুপ করে রইল। নীরদবরণ মুখ নিচু করে কি যেন ভাবছিলেন। তিনিও আর কিছু বললেন না। থমথমে মুখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠতে লাগলেন।

প্রথমে নীরদবরণ বিনা নোটিসেই ঢুকে পড়লেন অপরেশের ঘরে। দেখলেন পালঙ্ক, বিছানা সব ফাঁকা। কেউ নেই। তিনি শুনেছিলেন অপরেশের স্ত্রী সুপর্ণার শরীর খারাপ। আশা করেছিলেন তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখবেন। এখন দৃশ্যটা সেরকম নয়। এই বড় ঘরের একধারে মাদুর পাতা। সেখানে অপরেশ বসে আছেন। দুই হাতের চেটোর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে। আর তাঁর পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে স্ত্রী। বিনবিনিয়ে কাঁদছেন। নীরদবরণ হাঁক পাড়লেন—অপরেশ! সেই ডাকে অপরেশ তেমন কোনও চঞ্চলতা কিংবা শশব্যস্ত ভাব দেখালেন না। শুধু ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। বন্ধুকে দেখেই নীরদবরণ বুঝলেন অপরেশও কাঁদছিলেন। যদিও পুরুষমানুষকে কাঁদতে দেখলেই নীরদবরণের প্রতিক্রিয়া হয় তবুও এখন তিনি সে ব্যাপারে কোনও

মন্তব্য করা শোভন মনে করলেন না। তাঁর স্বর শুনে সুপর্ণাও উঠে বসেছেন। বেশ ব্যস্তভাবেই। উঠে বসে মাথায় এক হাত ঘোমটা টেনে দিয়েছেন। স্বামীর বন্ধুকে দেখেও তাঁর লজ্জা। এত শোকের মাঝেও সেই লজ্জাবোধ থাকে?

গলায় একটু কড়া ভাব এনে নীরদবরণ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন—অপরেশ! জানি তুমি খুবই মেন্টাল ডিসট্রেসের মধ্যে আছো। তোমাকে কিছু বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। তবুও বলছি এভাবে বসে বসে একটানা কান্নাকাটি না করে তুমি একবার সারা বাড়িতে ঘুরে এসো। মেয়েরা আছে। বাচ্চারা আছে। আমরা আছি। প্রত্যেকের উচিত চান-টান সেরে নিয়ে ভাত-ডাল যাহোক কিছু মুখে দেওয়া। এভাবে সবাই মিলে উপোস দিয়ে বসে থাকলেই কি প্রবলেম সলভড হয়ে যাবে?

—কী করতে বল আমাকে?—ফ্যাঁসফেঁসে স্বর অপরেশের।

—তুমি উঠে এসো। সবাইকে চান-টান সেরে নিতে বল।

তারপর কিছু মুখে দেওয়া। আফটার এল বাড়িটা তো তোমার?

—ভাই নীরদ—তুমি তো নিশ্চয়ই বোঝো আমি কি অবস্থায় আছি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেটা তো ফিল করছি।

—এ বাড়ির সবাই তোমার কথাও মানবে। আমার হয়ে তুমি যদি সবাইকে বলো যে...।

অপরেশ কথা শেষ করলেন না। নাকি কান্নার দমকে বুজে গেল গলা? সুপর্ণা কেঁদেই চলেছেন। বিনবিন...বিনবিন...।

দৃশ্যটা দেখতে আর ভাল লাগল না নীরদবরণের। তার ঠিক পেছনেই ত্রিদিবেশ। তার দিকে তাকিয়ে নীরদবরণ অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন—দে ওনট লিসেন টু রিজন।....পাশের ঘরে তো মেয়েরা আছে?...চলো আমিই ওদের বোঝাচ্ছি।...

পাশের ঘরে গিয়ে দেখা গেল যেন আর একটা বড় শোকসভা। এ-ঘরে অনেক মহিলা। দু-একজনকে মুখ দেখে চিনতে পারলেন নীরদবরণ। খাটের একধারে জড়োসড়ো হয়ে বসে যে মেয়েটা ও তো সমরেশের স্ত্রী। তার পাশে রত্না—ত্রিদিবেশের স্ত্রী। ওপাশে ঐ মহিলা-নাকে নথ, নানা ধরনের অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়েছে ও বোধহয় অপরেশের কোনও এক শ্যালিকা। গত কাল অপরেশের স্ত্রী চিনিয়ে দিয়েছিল। নীরদবরণ আর ত্রিদিবেশকে হঠাৎ এ ঘরে ঢুকতে দেখে মহিলারা সবাই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাদের মুহ্যমান বসে থাকা থেকে প্রায় একযোগে উঠে দাঁড়ানো, মাথার আলতো ঘোমটা বেশি করে টেনে দেওয়া,—এসব নজর করে নীরদবরণের হঠাৎই কোন ক্লাসরুমের কথা মনে পড়ল। মেয়েদের স্কুলে, ক্লাসে শিক্ষক ঢুকলে ঠিক এরকমই হয়। সবাই একযোগে উঠে দাঁড়ায়। সকলের শরীরের ভাষায় একটা সন্ত্রস্তভাব ফুটে ওঠে। নীরদবরণ কি মাস্টারমশাই? নাহ তিনি মাস্টার হতে চাননি কোনওদিন।

কিন্তু মেয়েদের এই দঙ্গলের মাঝে শুভ্রা কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না? সে কোথায় গেল? একা একা কী করছে? রত্না এই আড়ষ্ট মহিলাদের মাঝে একমাত্র যার মাথায় ঘোমটা তেমন প্রকটভাবে দৃশ্যমান নয়। মুসলমান মহিলাদের বোরখা আর হিন্দু মহিলাদের ঘোমটা এ দুটোই নীরদবরণের দু-চক্ষের বিষ। রত্না খাস কলকাতার মেয়ে। সামনে পুরুষ দেখে বিশ্রিভাবে পাঁচ হাত ঘোমটা টেনে দেয় নি সে। তার মাথার পেছনদিকে পুরুষ্ট খোঁপার ওপর আলতোভাবে লেগে আছে ঘোমটা অংশত। রত্না অভ্যাসবশত দুই হাত দিয়ে যেন সেই আংশিক ঘোমটাই একটু গুছিয়ে নিল। এগিয়ে এসে মৃদুভাবে জিজ্ঞেস করল—কিছু বলবেন দাদা?

—সুবু—আমার নাতনিটাকে দেখছিনে? সে আবার কোথায় গেল? নীরদবরণের প্রশ্ন শুনে এই দমচাপা পরিবেশের মধ্যেও রত্না মৃদু হাসল। ত্রিদিবেশের দিকে একবার তাকাল। তারপর

বলল—আপনার নাতনিকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। ওকে নিয়ে একেবারে ভাববেন না। খুব লক্ষ্মী আর বুঝদার মেয়ে শুভ্রা। ও নিজেকে নিয়েই থাকে। কারোকে ওর দরকার হয় না।

—সে তো বুঝলাম বউমা। কিন্তু সে গেল কোথায়?

—পাশের ঘরে।...বোধহয় কী একটা বই পড়ছে.....।

—পাশের ঘরে? ওপাশে আবার ঘর আছে নাকি?

—হ্যাঁ। একটা ছোট ঘর আছে। সেখানে বইপত্তর আছে। গানবাজনার সরঞ্জামও আছে।

—তাই নাকি? এটা তো জানতাম না।

—সারা বাড়ি আর আপনি ঘুরে দেখলেন কোথায়? সবে তো কাল সন্ধেবেলা এলেন। আর আজ সকাল থেকেই বাড়িতে এই বিপত্তি...। রত্না দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। নাতনি পাশের ঘরে একা একা কী করছে সেটা দেখার খুব কৌতূহল হচ্ছিল নীরদবরণের। কিন্তু তার আগে প্রয়োজনীয় কথাটা এদের বলে যেতে হবে তো? তিনি স্পষ্ট অনুভব করছিলেন, এই ঘরে জড়ো হওয়া অন্য মহিলারা ঘোমটার আড়ালে তাঁকে লক্ষ করে যাচ্ছে। সে করুক। নীরদবরণ তাতে আগ্রহী নয়। যে কথাটা বলতে এসেছিলেন সেটা বলতে হবে।

—শোনো বউমা একটা কথা তোমাকে বলি।...শুধু তোমাকে কেন সকলকেই বলি। বাড়িতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে এটা ঠিক। চরম বিপর্যয়। কেউ ভাবেনি এরকম হবে। অপর্ণা যে কী করে বসল?.... কিন্তু তাই বলে সবাই মিলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেই বা কী হবে? অপর্ণাকে তো খুঁজে আনার চেষ্টা চলছে।...পুলিশ যথাসাধ্য করছে।...দেখা যাক কী হয়। কিন্তু তোমরা সবাই এভাবে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না।

নীরদবরণ থামলেন। সবাই তার কথা শুনছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণে এরকমই হওয়ার কথা।

—তাই বলতে এসেছি—আবার শুরু করলেন নীরদবরণ।— এভাবে সবাই চুপচাপ বসে না থেকে চান-টান সেরে নাও। সকাল থেকে হালুইকর উনুনে আঁচ দেয়নি। রান্না চাপায়নি। কেউ কোনও ইনসট্রাকশন দেয়নি তাকে। আমি নীচে গিয়ে তাকে বলে এলাম। ভাত ডাল আর যাহোক একটা তরকারি চাপিয়ে দিতে। ছোট ছেলেমেয়েরা আছে। তাদের তো খিদে পেতে পারে। আমাদেরও পেতে পারে। পেয়েছেও হয়তো। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে রান্না নেবে যাবে। তোমরা, আমরা, ছেলেমেয়েরা যাহোক কিছু মুখে দেব। মনের কষ্ট আছে জানি। তা বলে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? শরীরকে কষ্ট দিলে শরীরেই ক্ষতি। পরে হ্যাপা সামলাতে হতে পারে। ঠিক আছে তাহলে?—কথাগুলো বলে নীরদবরণ চলেই যাচ্ছিলেন। ঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে কি যেন মনে পড়ায় তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন—বউমা অপরেশ আর ওর স্ত্রীকে একটু দেখো। ওদেরও বোধহয় কিছু মুখে দেওয়া দরকার।

—আচ্ছা দাদা আমি দেখছি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আর বাড়ির যে যেখানে আছে তারাও যাতে চানটা সেরে নিয়ে ভাত খাবার জন্যে একতলাতে চলে যায় সেটাও দেখছি—রত্না আশ্বাস দিল।

এবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকালেন নীরদবরণ। বললেন—তুমি একতলায় হালুইকরদের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। তাহলে রান্নাটা তাড়াতাড়ি হবে। তা না হলে ওরাও বিড়ি খাবে, মস্করা করবে আর রান্না শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, নীরদদা। ঠিকই বলেছেন। আমি যাই। রান্নার ব্যাপারটা একটু তদারকি করা দরকার।

পাশের ঘরে এলেন নীরদবরণ। দোতলার অন্য ঘরগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘর। তবে বেশ ছিমছামভাবে সাজানো। কাচ-ঢাকা বইয়ের আলমারি। বেশ কিছু বই। অপরেশের

যে এরকম বইয়ের কালেকশান আছে তা তো জানাই ছিল না। সেই কালেকশানের 'কোয়ালিটি' কেমন? রাজ্যের বটতলার উপন্যাসে বইয়ের আলমারি বোঝাই? নাকি 'ওয়ার্থ-রিডিং' কিছু আছে? এ বাড়িতে গানের চর্চা কে করে? দেওয়ালে ঠেস দেওয়া, জামা- পরা তানপুরা, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলার সমাহার দেখে নীরদবরণের মনে হল। হয়তো অপর্ণা নিজেই গান শিখত। গাইত হয়তো ভালই। ঘটনাগুলো এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তালগোল পাকিয়ে গেল যে, অপর্ণার বিষয়ে তেমন কিছুই জানা হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতসব কথা ভেবে ফেললেন নীরদবরণ। ভাবলেন যে, বিয়ের দিন সকালে এক ছোকরার সঙ্গে এভাবে পালিয়ে গিয়ে কি অপর্ণা ঠিক কাজ করল? এরপর তার জীবনে কী হবে? সে ঐ দীপক সামন্ত নামের ছোকরার সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকতে শুরু করবে। হয়তো তাদের বিয়েও হবে। কীভাবে বিয়ে হবে? আচার-বিচার মেনে? পুরোহিতের উপস্থিতিতে? বিয়েটা তো হবে অসবর্ণ। নাকি কলকাতার কালীঘাটে গিয়ে মায়ের সামনে ওদের বিয়ে হবে। অনেক বিয়ে তো ওভাবেও হয়। শুনেছেন নীরদবরণ। নিজের চোখে দেখেননি। কালীঘাটে—মাকে সাক্ষী রেখে ছেলে আর মেয়ে দুজনের মধ্যে মালা বিনিময় হয়। স্বামী সিঁদুর লেপে দেয় স্ত্রীর সিঁথিতে। দীপক সামন্ত ছেলেটা তো টেররিস্ট। পুলিশের নজর আছে তার গতিবিধির ওপর। অপর্ণাও কী টেররিস্ট দলে নাম লিখিয়েছে? হতেও পারে। কোনও কিছুই অসম্ভব না। জীবনের অনেকটাই তো দেখা হল। জীবনে অভাবনীয় কত কী যে ঘটে। আগে থেকে কি কেউ কিছু বলতে পারে?

এ ঘরেও একটা খাট। পায়াতে বাঘের মুখ। পালিশ বিবর্ণ। ফুলকাটা চাদর পাতা আছে বিছানায়। খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে শুভ্রা একমনে একটা বই পড়ছে। পড়াতে এতটাই মশগুল যে দাদু কখন এসে ঘরে ঢুকেছে খেয়ালই নেই।

—কী বই পড়া হচ্ছে?....সুবু?—নীরদবরণ ডাকলেন। শুভ্রার সম্বিত ফিরল। মুখের সামনে থেকে বই সরাল। দু-পা ছড়িয়ে ছিল। পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। বই মুড়ে রেখে অল্প হেসে জিজ্ঞেস করল—কী গো দাদু?

—কী বই পড়া হচ্ছে?—আবার প্রশ্ন করলেন নীরদবরণ।

—ঐ সেই চোখের বালি।—হালকা আড়মোড়া ভেঙে শুভ্রা বলল। দাদুর সামনে হাত ভেঙে, একটু বুক উঁচিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিতে তার কোনও অস্বস্তি নেই।

—রি-রিড করছিস?

—রি-রিড করছি।...কী করব বলো? অপর্ণাদি সবাইকে ভাবিয়ে আর কাঁদিয়ে কোথায় যে চলে গেল! সবাই গুম হয়ে আছে। নয়তো কাঁদছে। আমারও খুব খারাপ লাগছিল।....তো আমি আর কী করি? পড়া বইটাই আবার পড়ছিলুম;—একটা হাই আসছিল। সেটা চেপে নিয়ে শুভ্রা বলল।

নীরদবরণ তাকিয়ে ছিলেন, নাতনির দিকে। বিছানার ওপাশে দুটো জানলা। খোলা সেই জানলা দুটো দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার, নীল আকাশ। বাইরে মে মাসের কড়া রোদ। উজ্জ্বল চারপাশ। সেই উজ্জ্বলতায় নাতনিকে যেন নতুনভাবে দেখছিলেন নীরদবরণ। কী যে সোনার মতো রং মেয়েটার। একমাথা কোঁকড়া চুল। কেশবতী কন্যা। ছোট কপাল। সুন্দর মুখশ্রী। যৌবন-ভরন্ত শরীর। এই সোনার প্রতিমারও তো এবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় হয়ে এল।...একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে হয়তো নীরদবরণকে। পারবেন তো নিতে?

—ওরকম হাঁ করে তাকিয়ে কী দেখছ বলো তো দাদু?

—তোকে দেখছি। কেন? দেখতে নেই?

—আহা ঢং!—শুভ্রা হাসল।

—চান হয়ে গেছে দিদি?

—অনেকক্ষণ। বেলা করে চান করলে আমার তো মাথা ধরে। তাই...

—ভাল করেছিস। একটু বাদে খেয়ে নিবি। খুব খিদে পেয়েছে তো?

—সকাল থেকে দুবার খেয়েছি।—স্বর নামিয়ে, যেন গোপন কথা বলছে, এভাবে শুভ্রা জানাল।

—দুবার? কী খেলি?

—ফল আর মিষ্টি। রত্না বউদি এসে বলল—বাড়িতে গন্ডগোল। লুচি-পরোটা এখন খাওয়াতে পারব না। হাতের কাছে যা পেলুম নিয়ে এলুম ভাই। আম, লিচু, জামরুল আর মিষ্টি। চন্দ্রপুলিগুলোর যা টেস্ট না?

—বেশ করেছিস। যা হয়েছে তার জন্যে সবাই মিলে বসে রোদন করলে তো আর সব ঠিক হয়ে যাবে না। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যে খেয়ে নিবি দুটি ডাল-ভাত। তারপর একটু গড়িয়ে নিবি সুবু। রাত জাগতে হতে পারে।

—কেন রাত জাগতে হবে কেন?—শুভ্রার প্রশ্নটা যেন শুনেও শুনলেন না নীরদবরণ। অন্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সমরেশ ঘরে ঢুকল। ব্যস্ততার ভাব তার চোখমুখে।

—কী ব্যাপার সমরেশ? আবার কী হল?

—থানা থেকে বড়বাবু এসেছে। একবার নীচে চলুন।

আর প্রশ্নটা না করে নীরদবরণ সমরেশের সঙ্গে একতলাতে এলেন। বাইরের সেই ঘরে সোফার একধারে নিজের বিশাল বপু নিয়ে বসে আছে মহিম সান্যাল। মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলেছে। টাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নীরদবরণকে দেখে উঠে দাঁড়াল বড়বাবু।

—বসুন বসুন।...এনি ইনফর্মেশন?

—তেমন কিছু নয় স্যার।—বেশ হতাশভাবে জানাল মহিম।

—মানে? তাহলে এলেন কী করতে?—নীরদবরণের স্বর রুক্ষ।

—একটা খবর আছে স্যার—মহিম হাতের চেটোতে কপালের ঘাম মুছে নিল। বলল—শ্রীরামপুর স্টেশনে ওদের দুজনকে দেখা গেছে। ওখানকার থানা থেকে খবর পাওয়া গেছে। তারপর যে কোথায় গেল বোঝা যাচ্ছে না।...মহিম থামলে নীরদবরণ ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন যে—তাহলে পুলিশ আছে কী করতে?—কিন্তু তার আগেই মহিম আরও জানাল—তবে অপরেশবাবুর মেয়েও যে একেবারে ধোয়া তুলসিপাতা তা নয় স্যার। মেয়েটা টেররিস্ট দলে অনেক দিনই মিশছে। বোধহয় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার হতে চায়। মাস্টার সূর্য সেনের সঙ্গে সেই যে একজন মহিলা ছিল। এখন তো হিরোইন হয়ে গেছে! গ্রেট প্যাট্রিয়ট....।—নীরদবরণ চুপচাপ শুনলেন। সমরেশ চুপচাপ শুনল। খানিক বাদে নমস্কার জানিয়ে মহিম সান্যাল চলে গেল। অপর্ণার বিষয়ে খবরটা দিতেই সে এসেছিল। সেও যে টেররিস্ট সেটা জানাতে।

সাতাশ

সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে নীরদবরণ যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাতে কাজ হল। মেয়েদের এবং বাচ্চাদের খাওয়া শেষ। এবার বয়স্করা যে কজন আছে তাদের খেয়ে নিতে হবে। তাদের মধ্যে নীরদবরণও পড়েন। কিন্তু তিনি নিজে খাওয়ার আগে আর একটা বড় কাজ তো বাকি আছে এখনও। সে ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হল তাঁকেই। অপরেশ এবং সুপর্ণা এখনও এত

বেলা পর্যন্ত জলস্পর্শ করেননি। মেয়ের শোকে তারা সত্যিই কীরকম যেন অস্বাভাবিক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। দোতলার ঘরে সেই যেমন তাদের দেখে গিয়েছিলেন নীরদবরণ, তারা দুজনে এখনও সেভাবেই স্থাণুবৎ বসে আছেন। মেঝেতে মাদুর বিছোনো। তাতে গুটিসুটি মেরে, কুঁকড়ে শুয়ে আছেন সুপর্ণা। মুখে কথা নেই। চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। আর সেই মাদুরেই, একপাশে বসে আছেন অপরেশ। তাঁরও মুখে কোনও কথা নেই। শূন্য দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে। ভূমিকম্পে ভেঙে-পড়া কোনও বাড়ির মতো দেখতে লাগছে তাঁকে। মাঝে মাঝে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন অপরেশ এবং অস্ফুটে বলছেন—হায় ভগবান একী হল?....আমি কী পাপ করেছিলাম যে তুমি আমাকে এতবড় আঘাত দিলে?...

যে ঘরটাতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরেই একা এবং চুপচাপ বসে ছিলেন নীরদবরণ। ঠিক বসে ছিলেন বললে ভুল হবে। শরীরটা ঈষৎ এলিয়ে দিয়েছিলেন ইজিচেয়ারে। পাখা টানছিল যে লোকটি সে একবার এসেছিল বটে। পাখার দড়ি টেনে নীরদবরণকে বাতাস করবে। কিন্তু নীরদবরণ মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। এই লোকটার উপস্থিতি তাঁর ডিসটার্বিং মনে হয়েছে। তার মানে লোকটা যে খারাপ তা নয়। সে অতি বিনীত ভঙ্গিতে এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল। সাহেব আদেশ করলেই সে পাখা টানতে শুরু করবে। কিন্তু নীরদবরণ তাঁকে ভাগিয়ে দিয়েছেন এই কারণে যে তিনি কিছুক্ষণ একা থাকতে চান। একেবারে একা। মুখের সামনে ঐ লোকটা দাঁড়িয়ে থাকলে চিন্তা করার ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ ব্যহত হবে। কী চিন্তা করবেন নীরদবরণ? ঠিক চিন্তা করবেন না। আসলে তাঁকে প্রাণপণে মনকে স্থির করতে হবে। কারণ তাঁকে আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কঠিন এক সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া এখন আর তাঁর সামনে কোনও রাস্তা খোলা নেই।

এতবড় বাড়িটা অস্বস্তিকরভাবে চুপচাপ। বিয়েবাড়ি বলে কথা। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকত, তাহলে এতক্ষণ কতরকম কলরোল, আর হট্টগোলেই না ভরে থাকত এই বাড়ি। যে কোনও বিয়েবাড়িতে যেরকম হয়ে থাকে। সর্বত্র আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মেয়েদের হাসাহাসি, বাচ্চাদের কলকাকলি, বয়স্ক মানুষদের চিৎকার-চেঁচামেচি। আজ কোথায় সে সব? শ্মশানের স্তব্ধতা সারা বাড়ি জুড়ে। কেউ কোনও কথা বলছে না। বললেও ফিসফাস করে বলছে। কেউ জানে না, যে সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন অপরেশ, সেই বিপদ থেকে তিনি কীভাবে রক্ষা পাবেন? চরম অপমানের হাত থেকে কীভাবে নিজেকে বাঁচাবেন তিনি? পাত্রপক্ষ এখনও কি কিছু জানে? তাদের কি জানিয়ে দেওয়া উচিত? যদি জানাতেই হয় তাহলে কীভাবেই বা জানানো হবে? তাদের বাড়িতে কি টেলিফোন আছে? আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। অপরেশের যে এখন বোধবুদ্ধি কাজ করবে না সে ত বোঝাই যাচ্ছে। এ ব্যাপারেও নীরদবরণকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

নির্জন ঘর। বেলা দ্বিপ্রহর। ঘরের বড় বড় তিনটে জানলাই খোলা। সেই জানলা দিয়ে দ্যাখা যাচ্ছে নির্মেঘ, নীল আকাশ। বেশ বাতাস বইছে। প্রশস্ত জানলাগুলো দিয়ে সেই বাতাস ঘরের মধ্যে খেলছেও ভালো। সেই কারণেই তেমন গরম বোধ হচ্ছে না নীরদবরণের। তিনি পাইপ ধরিয়েছেন। পাইপের নীল ধোঁয়া বাতাসের দমকে ভেসে যাচ্ছে জানলার দিকে। তারপর বাইরে বেরিয়ে অবাধ শূন্যতায় হারিয়ে যাচ্ছে।

—নীরদ-দা আসছি।—ত্রিদিবেশ ঢুকল ঘরে।

নীরদবরণ তাকালেন। এই ছেলেটাও বেশ প্র্যাকটিক্যাল। সকাল থেকেই নীরদবরণের সঙ্গে আছে। তিনি যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছেন, তা পালন করার চেষ্টা করছে। বরং অপরেশের

মেজ-ভাই সমরেশকেই তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে সেও নিশ্চয়ই কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত। এ বাড়ির বিপর্যয় সেও নিশ্চয়ই সম্যক উপলব্ধি করেছে।

—কিছু বলবে ত্রিদিবেশ?

—প্রায় সকলকেই খাইয়ে দেওয়া গেছে। এবার নীচে চলুন? আমরাও ডাল-ভাত যাহোক দুটি খেয়ে নিই। হালুইকররাও তো খাওয়া-দাওয়া করবে....।

—তোমার দাদা-বউদির কথা ভেবেছ? তারাও তো সকাল থেকে অভুক্ত।

—তাদের কথা যে ভাবিনি এটা বলা যাবে না নীরদদা। রত্না—মানে আমার স্ত্রী গরম দুধ আর সন্দেশ নিয়ে কত সাধাসাধি করল দাদা আর বউদিকে। কিন্তু ওঁরা কেউ কিছু মুখে দিলেন না।....এক্ষেত্রে কী করা যাবে বলুন?

—ওদের কোনও ভাবেই দোষারোপ করা যায় না। এব্যাপারে তুমি নিশ্চয়ই একমত হবে?

—তা তো বটেই। এতবড় আঘাত যে কীভাবে দাদা আর বউদি সামাল দেবে সেটাই বুঝতে পারছি না। সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে। গ্রামের লোকের কাছে ওরা মুখ দেখাতেও পারবে না।

—কেন পারবে না?—নীরদবরণ যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন।—অপর্ণা সাবালক এবং শিক্ষিতা মেয়ে। তার নিজের বোধ-বুদ্ধির অভাব নেই। সে নিজেও টেররিস্টদের দলে ভিড়েছে। ঐ টেররিস্ট ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সে ঠিক করেছে না ভুল করেছে এসব প্রশ্ন পরে। কিন্তু সে যা করেছে সেই জন্যে তার বাবা আর মা গ্রামের লোকের কাছে মুখ দ্যাখাতে পারবে না কেন?

—নীরদ-দা এটা তো আপনি মানবেন যে, সবাই আপনার আমার মতো শিক্ষিত নয়। বিশেষত এইসব গ্রামের মানুষ। এরা যে কত ন্যারো-মাইন্ডেড আর কুচুটে হয় তা আপনি গ্রামে দীর্ঘদিন না থাকলে বুঝতে পারবেন না। মানুষের মন এখানে অন্ধকার আর অশিক্ষার পাঁকে ডুবে আছে। তারা সব কিছুকে বাঁকা চোখে দেখতে পছন্দ করে। প্রতিবেশীর বিপদে তারা মনে মনে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাদের একঘেয়ে জীবনে অপরের কেচ্ছাই হল বেঁচে থাকার একমাত্র খোরাক।

—বুঝেছি। বুঝেছি।....এখন চলো দেখি অপরেশরা যাতে কিছু মুখে দ্যায় তার ব্যবস্থা করা যাক। শুধু বসে বসে কাঁদলে আর কপালে চাপড় মারলে তো মেয়ে ফিরে আসবে না? আর ফিরে এলেই বা কী হবে? যে মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ির বাইরে চলে গেছে; তাকে যদি পুলিশ ধরেও আনে তাহলে কি এই কুসংস্কারের দেশে তার আবার বিয়ে দেওয়া যাবে? নাকি পাত্রপক্ষ সেই মেয়েকে গ্রহণ করবে?

—এটাই তো এখন প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নীরদ-দা। পাত্রপক্ষ কীভাবে এই কেলেঙ্কারিটা নেবে? তাদের কি সব জানিয়ে দেওয়া উচিত নয়?

—আমিও তো তাই ভাবছি। কিন্তু জানাবে কীভাবে? মেমারি তো বহুদূর। কাউকে পাঠিয়ে খবর দেবার আগেই হয়তো পাত্রপক্ষ এখানে আসার জন্যে রওনা হয়ে পড়বে। টেলিফোনে কি কোন মেসেজ দেওয়া সম্ভব?

—টেলিফোনে?...ত্রিদিবেশ মাথা চুলকোল।—দাদার কাছে টেলিফোন-নাম্বার থাকতে পারে।

—তাহলে চলো তোমার দাদার কাছেই যাই। ওদের কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করা যাক। সেইসঙ্গে পাত্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারটা অপরেশের সঙ্গে একটু আলোচনা করা যাক।

ইজিচেয়ারের আরাম ছেড়ে নীরদবরণ ঝাঁ করে উঠে পড়লেন। হাঁটতে লাগলেন দোতলার কোণের ঘরটার দিকে। তাঁর পেছনে ত্রিদিবেশও গেল। সেই একই ভঙ্গিতে মাদুরের ওপর অপরেশ

বসে আছেন। আর শুয়ে আছেন সুপর্ণা। নীরদবরণ গলায় শব্দ করলেন। অপরেশ একবার ফিরে দেখলেন বন্ধুকে। কিন্তু তাঁর কোনও ভাবান্তর দ্যাখা গেল না।

—শোনো অপরেশ,—শুরু করলেন নীরদবরণ,—তোমাদের দুঃখ-কষ্ট-ক্ষোভ-জ্বালা সবই আমরা অনুভব করছি।....আমার নিজের মেয়ে যদি এরকম করত তাহলে আমার অবস্থাও এরকমই হয়তো হত। কিন্তু ভাই, তোমাদের নিজেদের শরীরটার কথাও তো একটু ভাবতে হবে....।

একটানা বলে থামলেন নীরদবরণ। ওদের দেখে বোঝা যাচ্ছে দুজনেই শুনছেন কথাগুলো। কিন্তু তবুও কোনও সাড়াশব্দ তো করছেন না।

—অপরেশ-সুপর্ণা তোমাদের দুজনকেই আমি কথাগুলো বলতে চাইছি।—কড়া গলায় এবারে বললেন নীরদবরণ। এবার সুপর্ণা শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। গায়ের কাপড় ঠিক করলেন। আর অপরেশ জলভরা, ঝাপসা চোখে তাকালেন বন্ধুর দিকে।

ম্রিয়মান, ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কী করতে বলছ নীরদ?

—সকাল থেকে অভুক্ত আছো। এখন বেলা দুটো বাজে। এরকম করলে শরীর থাকবে? শুধু শুধু নিজেদের এভাবে অসুস্থ করে লাভ কী? একটু কিছু মুখে দাও?

—কী মুখে দিতে বলছ?....আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারো? অপরেশের এই কথায় আবার সুপর্ণার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। অর্থাৎ তিনি কাঁদছেন।

—প্লিজ অপরেশ তুমি একজন শিক্ষিত মানুষ—ডোন্ট ক্রিয়েট সাচ এ সিন...। এভাবে শুয়ে থাকলে, উপোস দিলে আর কান্নাকাটি করলে অপর্ণা কি ফিরে আসবে?...ট্রাই টু বি প্র্যাকটিক্যাল। একটু কিছু মুখে দাও। অন্তত দুধ আর সন্দেশ।

—সে মুখপুড়ির নাম আর উচ্চারণ কোরো না নীরদ। সে বংশের এক কুলাঙ্গার।

—সবই বুঝলাম। কিন্তু আপাতত আমার অনুরোধটা তো রাখবে তোমরা? সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। মনেও ভার। এই অবেলায় ডাল-ভাত খেলে সিওর অম্বল হয়ে যাবে। তার থেকে গরম দুধ আর সন্দেশ খেয়ে নাও তোমরা। ত্রিদিবেশ—।—নীরদবরণ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালেন। ত্রিদিবেশ ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল। খানিক বাদেই সে ফিরে এল। একা নয়। রত্নাও এসেছে। দুহাতে রত্না ধরে আছে একটা ট্রে। তাতে দু-গ্লাস দুধ। আর একটা প্লেটে কিছু সন্দেশ। রত্নার দিকে তাকালেন নীরদবরণ। কত আর বয়স হবে? ত্রিশ-একত্রিশ? ফর্সা, সুশ্রী মুখটা পরিশ্রমে রক্তাভ। কপালে ঘাম। অল্প ঘোমটা টানা। ভাসুরের সামনে যেটুকু না দিলে নয়। ত্রিদিবেশের এই বুঝদার বউটি না থাকলে সকাল থেকে বাড়িতে যে ঝামেলা চলছে সেসব কে সামলাত? রত্না গ্রামের মেয়ে নয়। খাস কলকাতার। শিক্ষিতা রীতিমতো। তাই এত ঝড়-ঝাপটা কীরকম সাবলীলভাবে সামলে নিচ্ছে।

—এই খাবারটুকু খেয়ে নাও অপরেশ। সুপর্ণা তুমিও খেয়ে নাও।—বেশ কড়া গলায়, আদেশের ভঙ্গিতে বললেন নীরদবরণ। তারপর আবার যোগ করলেন—এটুকু তোমরা না খেলে আমিও এ বাড়িতে যতক্ষণ আছি, জলস্পর্শ আর করব না এটুকু বলে রাখলাম।

অপরেশ এবার তাকালেন। সুপর্ণাও। দুজনের সামনে ছোট. নিচু টুলে রত্না দুধ আর সন্দেশ রেখেছে।

অপরেশ ধরা গলায় বললেন—ঠিক আছে। তুমি বলছ—আমরা দুজনেই ওগুলো খেয়ে নেব। তুমি নীচে চলে যাও নীরদ। তুমিও কিছু খাও। অপরেশের এই কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলেন নীরদবরণ। এই মুহূর্তে তাঁর চকিতে একবার মনে হল, খিদেটা পেটে বেশ জানান দিচ্ছে। খিদে পেলে তড়িঘড়ি যা-হোক কিছু মুখে দিতে হয়ই। তা না হলে মাথা ধরে নীরদবরণের।

রত্না এবার বলল—আপনি চলে যান দাদা। ঠাকুর ভাত-তরকারি নিয়ে বসে আছে। কিছু খেয়ে নিন।....এই তুমিও খেয়ে নাও।—রত্না ত্রিদিবেশকেও বলল।—বড়দা আর বউদিকে আমি দুধ আর সন্দেশ খাইয়ে তবে এখান থেকে নড়ব।

একতলার উঠোনে ম্যারাপের নীচে বসে খেতে নীরদবরণের আভিজাত্যে বাধল। তাছাড়া ওখানে মাটিতে চাটাই পেতে বসে খেতে হবে। জায়গাটা বেশ অপরিষ্কার। পছন্দ হয়নি নীরদবরণের। তিনি দোতলার ঘরে টেবিল-চেয়ারে খাওয়াটাই মনস্থ করলেন। ঐ ঘরে শ্বেতপাথরের একটা গোল টেবিল আছে। সেটা বেশ বড়। তিন-চারজন বসে খাওয়া যায়। খাবার আনিয়ে নিয়ে ত্রিদিবেশের সঙ্গে সেখানেই বসে পড়লেন নীরদবরণ। এত বেলায় পেট ভর্তি করে খাওয়া ঠিক হবে না। মাত্র দু-হাতা ভাত নিয়েছেন নীরদবরণ। ডাল এড়িয়ে গেলেন। একটা বেগুনভাজা আর ছ্যাঁচড়া নিলেন। বেশ স্বাদ হয়েছে ছ্যাঁচড়ার। অনেকদিন বাদে এরকম ছ্যাঁচড়া খাচ্ছেন। অনেক আগে যূথিকা যখন নিজের হাতে রাঁধতেন, তখন মাঝে মাঝে এরকম ছ্যাঁচড়া বানাতেন। আজকাল তো যূথিকা বছরের অধিকাংশ সময়েই হাঁফানি আর বাতের ব্যথায় ভোগেন। নিজে হাতে রান্না করেন না। তাঁর নির্দেশ মতো কাজের লোক রাঁধে। তার হাতের রান্না খারাপ নয়। তবে ছ্যাঁচড়া সে খুব একটা রাঁধে না।

—নীরদ-দা একটা কথা বলব?—খেতে খেতে বলল ত্রিদিবেশ।

—মেমারিতে তো খবর পাঠানোর আর উপায় নেই। পাত্রপক্ষ মনে হয় এসেই যাবে।....কীভাবে ফেস করা হবে ওদের?

—যা সত্যি সেটাই বলতে হবে।

—ইস্ কী কেলেঙ্কারি বলুন তো? কথাগুলো ওদের গুছিয়ে কে বলবে? দাদাকে তো দেখে এলেন। কথা বলার ক্ষমতা নেই।

—আমি আছি কী করতে?....যা বলার আমি বলব।

—হ্যাঁ আপনাকেই সিচুয়েশন ফেস করতে হবে।...আচ্ছা ওরা কীভাবে নেবে ব্যাপারটাকে মনে হয়?

—সেটা ওদের সঙ্গে কথা না বললে তো বোঝা যাবে না।

—ওদের দিক থেকেও ব্যাপারটা স্যাড। খুবই দুঃখের তাই না?

—অ্যাঁ?—হাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেলেন নীরদবরণ। ঠিক কী বলতে চাইছে ত্রিদিবেশ?

—মানে-দ্য নিউজ অব অপর্ণা উইল সিম্পলি ব্রেক দেয়ার হার্টস—তাই না? ত্রিদিবেশ বুঝিয়ে বলতে চাইল।—পাত্রের মনের অবস্থাটা কী হতে চলেছে সেটাও একবার ভাবুন নীরদ-দা? বরের বেশে, চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসবে বিয়ে করতে। আর এসেই শুনবে যে, মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছে সে নিরুদ্দেশ।....টেররিস্ট ছেলের সঙ্গে ভেগে পড়েছে। ছি ছি ছি....। অপর্ণা সত্যিই আমাদের বংশের নাম ডোবাল। আমি গ্রাম ছেড়েছি অনেকদিন আগে নীরদ-দা। আমার স্ত্রী তো কলকাতারই মেয়ে। শোভাবাজারের বনেদী বংশ। আমরা সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এসব ব্যাপার দেখি না। অপর্ণা বলতে পারত যে সে একটা ছেলেকে ভালোবাসে। তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

—তাতে কী হত?—পাতিলেবুতে নুন মাখিয়ে নীরদবরণ খাচ্ছেন। এরপর জল খাবেন। হজম ভালো হবে।—অপরেশ তো জানত যে, তার মেয়ে একটা ছোকরার সঙ্গে মেলামেশা করছে। সে আবার যে সে ছেলে নয়। টেররিস্ট।

—জানত? দাদা জানত?

—জানত। আমাকে জানিয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে।

—তাহলে বিয়ের সম্বন্ধ করল কেন? এখন তো অপমানিত হতে হবে?

—বিয়ের সম্বন্ধ না করলেই বা কী হত? টেররিস্ট ছোকরার সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হত? ভেবেচিন্তে কথা বলো...?

ত্রিদিবেশ মুখ নিচু করল। ভাবতে লাগল। তার খাওয়া শেষ। সে ডাক্তার মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে স্বভাবতই সতর্ক। নীরদবরণের মতোই স্বল্প আহার করেছে ত্রিদিবেশ।

—অপরেশ ঠিকই করেছিল।—নীরদবরণ বললেন—বিয়ে দিয়ে সে অপর্ণাকে জীবনের মেইন স্ট্রিমে ফেরাতে চেয়েছিল। মেইন স্ট্রিম নিশ্চয়ই বোঝা?

—কেন বুঝব না? আপনার আমার জীবনই তো মেন স্ট্রিম।

—আজ সকালে দারোগা মহিম সান্যাল কী বলে গেল শুনলে না?—অপর্ণা নিজেও একজন কমিটেড টেররিস্ট। এ খবর পুলিশের কাছে আছে।

—আচ্ছা নীরদ-দা টেররিস্টদের আপনি কী চোখে দ্যাখেন?

—আমি মনে করি না যে কয়েকটা গাদা বন্দুক আর দেশি পিস্তল দিয়ে ঐ টেররিস্টরা ব্রিটিশদের মতো সুপ্রিম পাওয়ারকে এদেশ থেকে তাড়াতে পারবে। তাই যদি হত, তাহলে তোমাদের সূর্য সেন, ঐ যাকে মাস্টারদা বলা হয়,—অনেক আগেই তা পারত। আমার ধারণা, দিজ টেররিস্টস লিভ ইন অ্যা ফুলস্ প্যারাডাইস। দীপক সামন্ত কিংবা অপর্ণা,—দে আর সিম্পলি মিসগাইডেড। নিজেদের জীবনকেই এরা নষ্ট করবে। আমাদের স্বাধীনতা আসবে না এভাবে।

—তাহলে কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা আসবে নীরদ-দা? হাউ উই উইল উইন ফ্রিডম? এদিকে শুনছি সুভাষ বোস সেই যে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পুলিশকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেলেন তিনিও নাকি কাবুল আর কান্দাহার হয়ে রাশিয়া যাবার চেষ্টা করছেন। সেখান থেকে মিলিটারি অ্যাসিসট্যান্স নিয়ে ইন্ডিয়ায় ঢুকতে চেষ্টা করবেন। ইংরেজদের এ-দেশ থেকে তাড়াবেন।

—বোগাস বোগাস। আর বোলো না প্লিজ।.....এই সুভাষ বোস লোকটার প্রতি আমার প্রথমে কিছুটা রিগার্ডস ছিল আমি স্বীকার করছি। খুব এডুকেটেড। আই সি এস পাস করেছে যখন তখন তার ব্রিলিয়ান্স নিয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। খুবই বোল্ড আর স্ট্রেট-ফরওয়ার্ড। গান্ধীর মতো মিনমিনে নয়। কিন্তু সেই লোকটাই যেসব কান্ড কারখানা করছে সেসব অ্যাডভেঞ্চারইজম ছাড়া কী তুমি বল? নিজের দেশের মাটি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে সেখান থেকে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করবে? এতো স্রেফ পাগলামো! কিংবা ডে-ড্রিমিং! লোকটা দিবাস্বপ্ন দেখছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এসব কাজকর্মের তুমি কোনও রেফারেন্স পাবে না। কেউ এভাবে নিজের দেশে স্বাধীনতা আনতে পারেনি। সুভাষ বোস সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটা কথাই বলতে পারি....।

—কী নীরদ-দা?—এঁটো হাত শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে এসেচে। তবুও ত্রিদিবেশ কৌতূহলী হয়।

—সুভাষ বোস উইল আলটিমেটলি ক্রিয়েট মিথ; হি উইল বি রিমেমবারড অ্যাজ এ্যা মীথ। বাট আই হ্যাভ এভরি ডাউট ইফ হি উইল বি সাকসেসফুল ইন হিজ মিশন...।

—তাহলে কি গান্ধীর নন-ভায়োলেন্ট মেথডই ঠিক রাস্তা?

—বলতে পারব না। আমার ধারণা এই লোকটার জন্যেই সুভাষ বোস দেশ ছাড়তে বাধ্য হল।

—মানে? ঠিক বুঝলাম না...।

—কংগ্রেস পার্টিতে সুভাষ বোসের এগেনস্‌টে দল পাকিয়েছে তো এই লোকটাই। কিছুতেই সুভাষকে লিডারশিপে আসতে দেবে না। অথচ ইউথদের সাপোর্টটা তো সুভাষই পাচ্ছিল। আজ যদি কংগ্রেসের মধ্যে লিডারশিপ নিয়ে এত দলাদলি না থাকত, গান্ধী সুভাষ বোসের পেছনে এত না লাগত তাহলে ঐ দলটাকে, তাদের স্বরাজ আন্দোলনকে ব্রিটিশ ভয় পেত। সমঝে চলত। সুভাষ, গান্ধী, সি আর দাশ, জহওরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সবাই একসঙ্গে কংগ্রেসের ব্যানারে লড়লে ব্রিটিশ তো ভয় পেতে বাধ্য। কিন্তু সেটা হবার নয়। আমাদের লিডারদের মধ্যে এত দলাদলি যে ব্রিটিশ তার সুযোগ নিচ্ছে। দ্য ব্রিটিশ আর ফেমাস ফর ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। গান্ধীর দলবাজিতে বীতশ্রদ্ধ হয়েই সুভাষ বোস দেশ ছাড়তে বাধ্য হল বলে আমার ধারণা। তা না হলে তার মতো বুদ্ধিমান লোক এত ঘোরালো রাস্তায় দেশের স্বাধীনতা আনবার কথা ভাবে?

—আবার শুনছি কংগ্রেস নাকি ইংরেজ ভারত ছাড়ো ডাক দেবে। গান্ধীরই মাথায় এসেছে এটা।

নীরদবরণ চুপ করে গেলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। কী উত্তর দেবেন? ঐ গান্ধী লোকটাকে তিনি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। লোকটা ব্যক্তিগত জীবনে ঋষি-টিসি হতে পারে। ইংরেজিটাও খুব ভালো লেখে। কিন্তু নীরদবরণের ধারণা লোকটা, ইংরেজরা যাকে—'ধোতি-ক্ল্যাড ফকির বলেছে, রাজনীতিটা একেবারেই বোঝে না। নিজের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা অন্যদের ওপর চাপাতে চাইছে। কীসব অহিংসার কথাবার্তা বলে। নীরদবরণ সেসব খুব একটা বোঝেন না। বোঝার চেষ্টাও করেন না। ঠিকমতো বলতে গেলে, নীরদবরণ মনে মনে চান না যে, ব্রিটিশরা এদেশ থেকে চলে যাক। এটা চেঁচিয়ে বললে হয়তো সবাই তাঁকে রেনিগেড বলবে। কপালে মারও জুটতে পারে। তাই তিনি কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও এসব কথা কাউকে বলেন না, কিন্তু তিনি মনে মনে বিশ্বাস করেন যে, ইংরেজদের মতো 'কালচারড' এবং 'সিভিলাইজড' জাতি এদেশে যতদিন থাকবে ততদিনই মঙ্গল। পরাধীন থাকার জ্বালা-যন্ত্রণা হয়তো অনেক আছে। কিন্তু আজকে বাঙালি যেটুকু সভ্য-ভদ্র হয়েছে তা তো ইংরেজদের জন্যেই। এতকাল দেশের মানুষ অশিক্ষা, কু-শিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে পচে মরছিল। ইংরেজরাই প্রথম তাদের শিক্ষার আলো দেখিয়েছে। চিন্তা করতে শিখিয়েছে। পড়তে শিখিয়েছে। বাঁচতে শিখিয়েছে সভ্যভাবে। এটা কি কম কথা নাকি? তাই মনে মনে নীরদবরণ চান, ইংরেজরা এদেশে থাকুক আরও কিছুদিন। আমরা আরও একটু সভ্য আর শিক্ষিত হই। কিন্তু এসব কথা কি চেঁচিয়ে কাউকে বলা যায়? তাহলে মানুষ তাঁকে নিশ্চিতভাবেই ভুল বুঝবে। এখনও ত্রিদিবেশের কাছে তিনি নিজের মনের প্রকৃতভাব জানালেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঘরের লাগোয়া চানঘরে গিয়ে এঁটো হাত ধুয়ে নিলেন। ত্রিদিবেশও বেরিয়ে গেছে ঘরের বাইরে। হাত ধুয়ে নিতেই।

খেয়েছেন কম। তবুও তো অসময়ে, অবেলায় পেটে ভাত পড়েছে। চোখ জড়িয়ে আসছিল নীরদবরণের। এক হাত দূরেই পরিপাটি পালঙ্ক সাজানো। একটু গড়িয়ে নিলেই হয়। কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রা দেওয়া বা আয়েস করা কি ঠিক কাজ হবে? এখন এ বাড়িতে প্রকৃতই দুঃসময়। বিছানায় শুয়ে যদি নীরদবরণ নাক ডাকেন, তাহলে তা সত্যিই খুব বিসদৃশ হবে। তাহলে চোখের পাতায় যে ঘুম ভর করেছে, তাকে তাড়াতে একটু পাইপই না হয় টানা যাক। এই ভেবে পাইপে তামাক ভরছিলেন নীরদবরণ। ঠিক তখনই ত্রিদিবেশ হন্তদন্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল। তার ডান হাতের চেটোয় জল লেগে আছে। বোধহয় মোছার সময়ও পায়নি।

—নীরদদা!—ত্রিদিবেশ ডাকল।

—আবার কী হল?

—পাত্রপক্ষ এসে গেছে!

—তাই নাকি? কোথায় তারা? একতলার ঘরে বসিয়েছ?

—বাড়িতে তারা আসেনি। স্টেশনে অপেক্ষা করছে। লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। এখন কী হবে?

—কী আর হবে। যেতে হবে আমাদের। ফেস করতে হবে তাদের।

—আপনি যাবেন?

—নিশ্চয়ই। আমি, তুমি আর সমরেশ—তিনজনে যাব। অপরেশকে যেতে হবে না। কথাবার্তা যা বলার আমিই বলব।....সমরেশ কোথায়?

—বাড়িতেই আছে। ডেকে নিচ্ছি। গাড়িও বের করতে বলি?

—নিশ্চয়ই। তোমাদের এই বাড়ি থেকে স্টেশন তো বেশ দূর। এতটা রাস্তা হেঁটে যাব নাকি?

—তাহলে আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে কোট-প্যান্ট আর টাইয়ে সাহেব হয়ে গেলেন নীরদবরণ। যে পোশাকে তাঁর ব্যক্তিত্ব সবথেকে বেশি ফুটে ওঠে, সেটাই পরলেন! এখন তাঁর মাথায় অনেক দায়িত্ব। পাত্রপক্ষ নিশ্চয়ই এতক্ষণে সব শুনেছে। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে এটা অবধারিত। প্রথমে তারা অপরেশকেই দুষবে। যে মেয়ে বিয়ের দিন সকালে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তার স্বভাব-চরিত্র কেমন বাবা-মা কি জানে না? সব জেনে-শুনেও তারা বিয়ের সম্বন্ধ করল কেন? যা সত্যি তা গোপন করল কেন? মেয়ে যে গোল্লায় গেছে এটা তো তাদের জানাই ছিল। একজন সৎপাত্রের ভবিষ্যৎ তারা নষ্ট করল কেন? এসব কথার জবাব অপরেশের পক্ষে এখন দেওয়া সম্ভব হবে না। বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে অপরেশ। সব সামলাতে হবে আজ নীরদবরণকেই। দ্যাখা যাক কদ্দূর কী হয়। কিন্তু পাত্রপক্ষ স্টেশনে অপেক্ষা করছে কেন? তারা তো সোজা বাড়িতেই আসতে পারত। এরকম ভাবছিলেন নীরদবরণ। তারপরই তাঁর মনে হল, বিয়ের আসরে পৌঁছনোর ব্যাপারে পাত্রপক্ষর জন্যে হয়তো এরকম ব্যবস্থাই করা ছিল। তারা ট্রেনে কাটোয়া স্টেশন পর্যন্ত আসবে। তারপর এ বাড়িতে আসার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু গাড়ি পাঠাবার কথা বিকেলে। কারণ লগ্ন সন্ধের মুখেই। সুতরাং পাত্রপক্ষের বিকেলের মধ্যে এসে পড়ার কথা ছিল। কনের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার খবর তাদের কানে দ্রুত পৌঁছে গেছে। যাবেই তো। দুঃসংবাদ কিংবা খারাপ খবর কি চাপা থাকে? দাবানলের মতোই তো শনৈঃ শনৈঃ ছড়িয়ে পড়ে। হয়ত অপরেশদের গ্রামেরই সেইসব কুচুটে বামুনরাই সাত-তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছে দিয়েছে পাত্রপক্ষের কাছে। এরা সব পারে। প্রকৃত অশিক্ষিত আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন তো এরাই। বাংলার গ্রামে গ্রামে, ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে এরকম কত বামুন-কায়েতের দল ছড়িয়ে আছে। ধর্মের ভেকধারী সব। এদের দেখেই তো শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ' নভেল লিখেছেন। নীরদবরণের মনে হল। শরৎ-এর ভাষা খুব বলিষ্ঠ নয়। প্রোজ অতি বাজে, ফুল অব সেন্টিমেন্টস। নো স্পার্ক অব ইনটেলেক্ট। কিন্তু তবুও এটা মনে মনে স্বীকার করেন নীরদবরণ যে, শরৎচন্দ্রের নভেলগুলোতে সাবজেক্ট-ম্যাটার ভাল থাকে। লোকটার অভিজ্ঞতা আছে। যদিও লেখক হিসেবে হয়ত, নীরদবরণের মতে, খুব একটা উঁচু শ্রেণির নয়।

—চলুন নীরদ-দা আমরা রেডি। গাড়িও লেগে গেছে।—এখন ঘরে ঢুকল ত্রিদিবেশ। সে একা নয়। তার সঙ্গে সমরেশও।

—হ্যাঁ চলো। তার আগে দাঁড়াও—আমার নাতনিটা কী করছে দেখেনি।

—আপনার নাতনি? ঘুমুচ্ছে মনে হয়।—সমরেশ বলল।

এই দোতলার একেবারে ও-প্রান্তে যে ঘরে শুভ্রাকে একমনে বই পড়তে দেখেছিলেন নীরদবরণ, সেদিকে হেঁটে গেলেন তিনি। ঐ ঘরে কি এখন একা সুবু আছে? হয়তো অন্য মহিলারাও বিশ্রাম নিচ্ছে। সরাসরি ঢুকে গেলে তারা লজ্জায় পড়ে যেতে পারে। তাই নীরদবরণ ত্রিদিবেশের দিকে তাকালেন। ত্রিদিবেশ যথেষ্ট বুদ্ধিমান। নীরদবরণের ইশারা সে বুঝল। ঢুকে গেল ঘরে। ডেকে নিয়ে এল রত্নাকে। রত্নার চোখে-মুখেও আলস্যের হালকা আঁশ।

—কিছু বলছেন দাদা?—রত্না জিজ্ঞেস করল।

—সুবু কী করছে? এখনও বই মুখে দিয়ে বসে আছে?

—নাহ ঘুমিয়ে পড়েছে।....কিছু বলবেন ওকে?

—নাহ। ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।—নীরদবরণ বললেন।—ওর এখন ঘুমিয়ে নেওয়াই ভালো।—এই কথাটা ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়ে বললেন। কেন যে বললেন কে জানে...।

খানিক বাদে অপরেশের ভাড়া-করা অস্টিন গাড়ি তিনজনকে নিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল।

আঠাশ

স্টেশনের বাইরে গাড়ি রেখে তিনজন হাঁটছে কাটোয়া স্টেশনের প্লাটফর্মে। এখন দুপুর। মে মাসের দুপুরবেলা যেমন হয়, আজকেরটাও সেসবের থেকে তেমন আলাদা কিছু নয়। আকাশে রোদ গনগনে। চারপাশ নিঝুম। ওপাশের লাইনে একটা লম্বা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কতদিন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, কতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে কে বলতে পারে। হাওড়া বা বর্ধমান যাবার কোনও ট্রেন বোধহয় এই সময়ে নেই। প্লাটফর্ম একেবারে শুনশান। শুধু একটা বাদামি-রং হাড়-জিরজিরে কুকুর এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীর্ণ গাছের নীচে এক ভিখিরি হাত পেতে বসে আছে। হাঁটতে হাঁটতে নীরদবরণের বেশ কষ্টই হচ্ছিল। ঝাঁ-ঝাঁ গ্রীষ্মকালের খর দুপুরে এরকম হাঁটার অভ্যাস তাঁর একেবারেই নেই। ঠিকমতো বলতে গেলে হাঁটা তেমন হয় কোথায়। কলকাতায় এক পা বাড়ালেই গাড়ি। আরও অসুবিধে হচ্ছে, পরনের কোট-প্যান্ট-টাইয়ের জন্যে। ভেতরে ভেতরে, শার্টের নীচে কুলকুল ঘামছেন নীরদবরণ। তাঁর ফর্সা, গোলপানা, ভারী মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। ঘামে চকচক করছে মুখখানা। খুব ভালো হ'ত যদি ধুতি-পাঞ্জাবি চাপিয়ে আসতে পারতেন। ত্রিদিবেশ কিংবা সমরেশ যেমন পরে আছে। সেভাবেও যে স্টেশনে এখন আসতে পারতেন না নীরদবরণ তা নয়। এলে আর কী অসুবিধে ছিল। কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি সাহেবি পোশাকে নিজেকে সাজালেন নীরদবরণ অন্য এক কৌশলগত কারণে। পাত্রপক্ষের মেজাজ যে সপ্তমে চড়ে আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। যা ঘটেছে তাতে অপরেশ তো পথে বসেছে। শুধু অপরেশ কেন? পাত্রপক্ষও কি পথে বসেনি? নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে তারাই বা মুখ দ্যাখাবে কেমন করে? এমন এক পরিবারের সঙ্গে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হল যে, এভাবে পর্যদুস্ত হতে হল? মেয়ে পালাল পরপুরুষের হাত ধরে? পাত্র বেচারার মনের অবস্থাটাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছিলেন নীরদবরণ। বিয়ে প্রত্যেকের জীবনেই এক বিশেষ ঘটনা। কতরকম স্মৃতি এই ঘটনাকে ঘিরে থাকে। আর এই হতভাগ্য পাত্রটির প্রথম স্মৃতি কী হবে? যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে ভেগে পড়েছে! সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ

দুঃখজনক। নীরদবরণ পোড় খাওয়া মানুষ। তিনি জানেন যে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রীতিমতো তোপের মুখে পড়তে হবে! কিন্তু মেমারির মতো অজ মফস্বলে যারা থাকে তারা তো গেঁয়ো মানুষ। অন্তত নীরদবরণের মতো ঝকঝকে শহুরেপনার কাছে তারা কিছুই হতে পাবে না। নিজের অভিজাত ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক সপ্রতিভতা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। ব্যক্তিত্বের কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতেই নিজের সাহেবি পোশাকটা পরে নিয়েছেন নীরদবরণ।

প্লাটফর্মের মাঝামাঝি হলুদ-রং, আয়তাকার ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন ওরা। স্টেশন মাস্টারের অফিস এটাই। অফিস-কাম-ওয়েটিং রুমও বলা যায়। পাত্রপক্ষের লোকজন কি এখানেই বসে আছে? তাই হবে। এই দাবদাহে আর কোথায় যাবে? কোনও একটা ছায়া তো দরকার। মফস্বলি স্টেশনের অপরিচ্ছন্ন বিশ্রামাগারই একমাত্র সেই ছায়া দিতে পারে। কতজন এসেছে ওরা? কীভাবে কথাবার্তা শুরু হবে?

অফিস থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরের ভাষা দেখে নীরদবরণের মনে হল, লোকটা যেন তাদের গতিবিধি নজর করছিল। ওরা কাছাকাছি আসতেই সে বোধহয় বেরিয়ে এল। মধ্যবয়স লোকটার। মাঝারি উচ্চতা, শ্যামবর্ণ। ধুতির ওপর শার্ট। তার ওপর রেল কোম্পানির কোট। মোটাসোটা বপুতে থলথলে মুখে খাড়া নাকের নীচে কাঁচাপাকা বুরুশ গোঁফ। সমরেশ বলল—ঐ তো স্টেশনমাস্টার আসছেন। সুবিমলবাবু। আগুয়ান লোকটির দিকে তাকিয়ে সমরেশ জিজ্ঞেস করল—সুবিমলদা ওঁরা এসেছেন তো? কোথায়?

—কী আর করব ভাই। আমার অফিসঘরেই বসিয়েছি ওদের। এসেছে তিনজন। একজনের খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কতা....।—সুবিমল বললেন নীরদবরণকে লক্ষ্য করতে করতে।

—কীভাবে যে এদের ফেস করব তাই বুঝতে পারছি না। —অস্ফুটে বলল ত্রিদিবেশ।

—যা ঘটেচে তাতে ওদের এরকমই ব্যবহার করার কতা। ছি ছি ছি! কী ঘটে গেল বলুন তো? অপরেশবাবুকে আমি ভালোই চিনি। ইংরিজির মাস্টার হিসেবে তাঁর এই এলাকাতে বেশ সুনাম আচে। তাঁর মেয়েই কিনা...? কী আর বলব? সবই হল গিয়ে কপাল। সমরেশ তোমাদের বাড়ির কেলেঙ্কারি আর চাপা নেই। সবাই জেনে গেচে। আমার কানেও এসেচে। তাই তো ঐ লোকগুলো এসে যখন বলল যে, তারা অপরেশ চক্কোত্তির বাড়ি যাবে, আসচে মেমারি থেকে, তখনই আমি বুঝলুম কেসটা।....আই ফেল্ট পিটি ফর অপরেশবাবু। অনেকদিনের চেনা আমার। খুব সজ্জন মানুষ। তাই মনে হল, সরাসরি তোমাদের বাড়ি ওদের না পাঠিয়ে আমার এখানে বসাই। তোমাদের বাড়িতে খবর দেই। তাতে অবস্থার সামাল দেবার ব্যাপারে তোমাদের কিছুটা মেন্টাল প্রিপারেশান থাকবে।

—আপনি ঠিকই করেছেন।...ইউ হ্যাভ ডান আ রাইট জব।... আ গ্রেট জব ইনডিড!—বললেন নীরদবরণ। তাঁর দিকে তাকালেন স্টেশনমাস্টার।

—এনাকে তো ঠিক...

—উনি নীরদবরণ মুখার্জি।—ত্রিদিবেশ জানাল।—দাদার অনেকদিনের বন্ধু। অপর্ণার বিয়েতে কলকাতা থেকে এসেছেন।

—ও...নমস্কার।...সুবিমলের চোখ জরিপ করছিল নীরদবরণের পোশাক।

—নমস্কার।—নীরদবরণ বললেন।—এখন চলুন। ওদের সঙ্গে কথা বলা যাক।

মফস্বলের স্টেশন মাস্টারের ঘর দেখতে কীরকম হয়, সে বিষয়ে নীরদবরণের তেমন ধারণা নেই। ট্রেনে তিনি বরাবর প্রথম শ্রেণিতে যাতায়াত করেন। প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং রুমে ওঠেন। আর সেসব হ'ল বড় বড় স্টেশন। হাওড়া, নাগপুর, কানপুর, দিল্লি, বোম্বাই। গত ২৫ কি ৩০

বছর মফস্বল স্টেশনে তো তাঁর তেমন যাতায়াতই নেই।

এখন দেখছিলেন ঘরটা। মোটামুটি প্রশস্ত। তারের জাল দিয়ে ঘেরা দুটো বড় বড় জানলা। এরকম দুপুর বেলাতেও গ্যাসের বাতি জ্বলছে ঘরে। আয়তাকার একটা টেবিল। বিবর্ণ রেক্সিন। ফাইল, কাগজপত্র টেবিলে ছড়ানো। চওড়া কাঠের চেয়ার। স্টেশনমাস্টারের চেয়ার। এছাড়াও ঘরে বেশ কিছু টিনের চেয়ার ছড়ানো। অন্তত ৮ কি ১০টা তো বটেই। এত চেয়ার কী কাজে লাগে? সারাদিনে স্টেশনমাস্টারের ঘরে আর কজন সাক্ষাৎপ্রার্থী আসে? অবশ্য মিটিং-টিটিং হতে পারে মাঝে মাঝে। বড়সাহেবরা আসতে পারে ইনসপেকশনে। নীরদবরণ তাকিয়ে দেখলেন। ওপাশে দেয়াল ঘেঁষে পরপর তিনটে চেয়ারে পাত্রপক্ষের লোকেরা বসে আছেন। দুজনের পরিচয় নীরদবরণের গোয়েন্দা চোখের কাছে ধরা পড়ে গেছে। একজন তো স্বয়ং পাত্র। কী নাম যেন.....? গত রাতে গোলঘরে বসে স্কচ-হুইস্কি পান করার সময় অপরেশ বলেছিল বটে।.....ওহ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে! ....মনীশ—পাত্রের নাম। বাঁড়ুয্যে। মেমারির বাঁড়ুয্যে ঘর এরা। ধান-চালের কারবারি। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। এমনকি জমিদারও বলা যেতে পারে। অপরেশ বলেছিলেন। আর পাত্রের গা-ঘেঁষে যে বয়স্ক লোকটি বসে আছে তার মুখের গড়ন দেখে বলে দেওয়া যায় পাত্রের বাবা। এর নামটি সহজেই মনে পড়ল সতীশ বাঁড়ুজ্জে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডই নীরদবরণের চোখ পাত্রকে দেখে নিয়েছে। এত কালো পাত্র! ছোকরার গায়ের রং সত্যিই বেশ কালো। চোখে যেন বড় লাগে। কিন্তু মুখশ্রী অতি সুন্দর! একমাথা ঘন এবং কোঁকড়া চুল। নাক টিকলো। বড় বড় চোখ। শান্ত চোখের দৃষ্টি। বেশ লম্বা। তা অন্তত পাঁচ ফুট আট বা নয় ইঞ্চি তো হবেই। চওড়া কাঁধ। বলিষ্ঠ গড়ন। খুবই পুরুষালি চেহারা। কিন্তু গায়ের রং এত কালো যে ওর চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো যেন তেমন নজরে পড়ে না। যেন ঘন, কালো একরাশ মেঘের আড়ালে ডুবে যাওয়া সূর্য। ছেলেটি বেশ ভদ্র তা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কারণ, নীরদবরণরা ঢুকতেই ছেলেটি উঠে দাঁড়াল এবং নমস্কার জানাল তিনজনকেই। খুব ভালো লাগল নীরদবরণের। এ তো অভিজাত ভদ্রতা! মেমারির গ্রামের অধিবাসীর কাছ থেকে এরকম নিখুঁত ভদ্রতা আশা করা যায় না। এরকম ভাবনা আসতেই নীরদবরণের মনে পড়ল, ছেলেটি তো বেঙ্গল ইনজিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। ছেলেটির পাশের চেয়ারেই গোমড়া মুখে যে বয়স্ক লোকটি আসীন; তিনি যে সতীশ বাঁড়ুজ্জে এটা কারোর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কেউ দুজনের মুখের মিল দেখলেই বুঝতে পারবে। এমনকী ঘন কোঁকড়া চুলেও দুজনের আশ্চর্য মিল! তবে কিনা সতীশবাবুর চুল অধিকাংশই পাকা। আর তাঁর পাশে সতীশবাবুর থেকেও বয়স্ক এবং বেশ হুমদো চেহারার যে লোকটি বসে আছেন, তাঁর কী পরিচয়, নীরদবরণ ঠিক বুঝলেন না। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে নীরদবরণকেই লক্ষ্য করছেন। সতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে নীরদবরণ নমস্কার জানালেন। সমরেশ ও ত্রিদিবেশও তাই করল। প্রত্যুত্তরে সতীশবাবু কীরকম দায়সারাভাবে ঘাড় নাড়লেন। তাঁর মুখ যেন আরও গম্ভীর হ'ল। এতে নীরদবরণের মেজাজ কিন্তু গরম হল। কারণ ভদ্রতার বিনিময়ে ভদ্রতা না জানালে তিনি রীতিমতো চটে যান। কিন্তু এখন মেজাজ গরম করার সময় নয়। এখন তাঁরা, ইংরেজিতে যাকে বলে,—'রং সাইড'-এ আছেন। এখন মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

স্টেশনমাস্টার সুবিমলবাবু নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বললেন—বসুন না স্যার। এত চেয়ার ঘরে। দাঁড়িয়ে কেন? ঠিকই! এপাশের তিনটে চেয়ারে তিনজনের বসার পর সুবিমলবাবু হঠাৎ—'আমি একটু সকলের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করি'—এই বলে হাওয়া হয়ে গেলেন। যেহেতু সর্ব অর্থেই পরিস্থিতির দিকে সতর্ক নজর রাখতে হচ্ছে নীরদবরণকে, তাই তাঁর মনে হ'ল দু-পক্ষের

কথাবার্তার সময় সুবিমলবাবু ঠিক সাক্ষী থাকতে চান না। কারণ ব্যাপারটাই তো গোলমেলে। বিয়ের পাত্রী পালিয়েছে টেররিস্ট যুবকের সঙ্গে। এসব ব্যাপারে কেউ থাকে? বিশেষত সুবিমলবাবু যখন খোদ রেল কোম্পানির কর্মচারী। সরকারের নোকর। ব্রিটিশ সরকারের। তাঁকে তো সাবধানে থাকতেই হবে। আবার এটাও হয়তো ঘটনা যে, তিনি তাঁর অফিসে এই অযাচিত অতিথিদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেছেন। এই খট্‌খটে দুপুরে রেল-কোম্পানির ভেন্ডাররাও বোধহয় লম্বা ঘুম দিচ্ছে। সুতরাং চা হয়তো সুবিমলবাবুকে এই অফিসের লাগায়ো নিজের সরকারি আস্তানা থেকেই করে নিয়ে আসতে হবে। আহা রে, ভদ্রলোক হয়ত গৃহিণীর (অসময়ে চা বানানোর বায়নার জন্যে) মুখ ঝামটাও খেতে পারেন।

—আপনাদের তো চিনি। আশীর্বাদের দিন আলাপ হয়েছিল।—সতীশবাবু বললেন ত্রিদিবেশ এবং সমরেশের দিকে তাকিয়ে।—কিন্তু এঁকে তো ঠিক চিনলুম না? —নীরদবরণের দিকে তাকালেন।

—উনি হলেন আমার বড়দার বিশেষ বন্ধু। বাবু নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়। কলকাতায় থাকেন। বিয়ে উপলক্ষে এসেছেন। জানাল ত্রিদিবেশ।

—তো হ্যাঁ মশায় এসব কী শুনচি?—সতীশবাবু নীরদবরণকেই করলেন প্রশ্নটা।

—কী শুনেছেন একটু বলবেন?—জিজ্ঞেস করলেন নীরদবরণ।

—কী শুনেচি?....ও নারান বলো না হে?...আচ্ছা আলাপ করিয়ে দি মশায়। এটি হল আমার ছেলে মনীশ। আর এ হল নারান মুখুজ্জ্যে। পাত্রের মামা। ইস্কুলের হেডমাস্টার।

...ওহো স্কুলমাস্টার। তাই ওরকম গম্ভীর মুখ করে বসে আছে। নীরদবরণ ভাবলেন। ভিলেজ স্কুলমাস্টারদের সম্বন্ধে নীরদবরণের ধারণা হল যে তারা অল্প বিদ্যে নিয়ে নিজেদের খুব জ্ঞানী-গুণী মনে করে। ভিলেজ স্কুলমাস্টারদের নিয়ে ব্রিটিশ কবি অলিভার গোল্ডস্মিথের একটা বেশ হাসির কবিতা আছে। এবার অবশ্য নারান মুখুজ্জে হাত তুলে নমস্কার করলেন। নীরদবরণ তা ফিরিয়ে দিলেন নমস্কার জানিয়ে।

—দেখুন যা শুনিচি তা আমরা বিশ্বাস করচি না।—নারানবাবু বললেন।

—কোথা থেকে শুনলেন?

—আরে মশায় সে এক কান্ড! চোখ বড় বড় করে জানালেন সতীশবাবু।

—কী কান্ড শুনি?

—টেরেন যেই না এসে থেমেচে অম্নি এক দঙ্গল লোক আমরা পেলাটফর্মে নামতেই আমাদের ঘিরে ধরল। আর বলল যে....ধুর মশায় আমি ওসব কতা কানে নিই নি।... ও নারান তুমিই বল...।

কথায় কথায় 'মশায়' যোগ করা সতীশবাবুর মুদ্রাদোষ। নারাণবাবু কী বলবেন তা অবশ্য নীরদবরণ আঁচ করেছেন। ট্রেন থেকে নামতেই পাত্রপক্ষকে যারা ঘিরে ধরেছিল তারা নিশ্চয়ই সেই ভেকধারী ব্রাহ্মণের দল। যারা আজ সকালে অপরেশের বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেছে যে, অপর্ণা ফিরে এলেও বিয়ে তারা হতে দেবে না। যে মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে তার চরিত্রের আর আছেটা কী? তার সঙ্গে বিয়ে মানে অনাচার।

—লোকগুলো যা বলেছে তা আমরা সত্যিই বিশ্বাস করিনি। আমরাও গ্রামের মানুষ। কারো বিয়ে থাওয়া হলে যে গ্রামের পরশ্রীকাতর, কুচুটে লোকজন ভাঙচি দেবার চেষ্টা করে তা আমরা জানি। তাই আমরা ওদের কথাকে তেমন আমল দিতে চাই না।

নারানবাবুর কথার মধ্যে বেশ বাঁধুনি আছে। হয়ত ভদ্রলোক সত্যিই শিক্ষিত। এবং সজ্জন।

—আমি হাওড়ার যে অঞ্চলে থাকি সেটা হাওড়া স্টেশন থেকে বেশি দূর নয়। গাড়িতে মিনিট দশ। আর হাওড়া স্টেশন পেরোলেই তো ক্যালকাটা। আমি চাকরি করি পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে। সাহেবপাড়ায়। শুধু সাহেবপাড়াতে নয়। সাহেব কোম্পানিতে।—যাই হোক আমি যেটা বলতে চাইছি আপনাদের। আমার নাতনিকে আমি নিজের হাতে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি। বাংলা পড়তে তো জানেই। এমনকি দু-পাতা ইংরেজি পড়তেও জানে। আপনারা দেখতে চান তাকে?—নীরদবরণ তাকালেন সতীশের দিকে। তারপর মনীশের দিকে ফিরে বললেন—বাবা মনীশ তুমি একবার দেখবে মেয়েকে? তোমার ভালর জন্যেই বলছি। বিয়ে করতেই তো তুমি এসেছিলে? নিজের বাড়ি থেকে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়েছিলে, তখন তো জানতে যে তুমি ফিরবে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে করে? সেক্ষেত্রে শুধু হাতে ফেরা কি ঠিক হবে? পাড়া—প্রতিবেশী কী বলবে? আর তুমিও যথেষ্ট শিক্ষিত। আমাদের সমাজটাকে তো তুমি জানো? তুমি যাকে বিয়ে করতে এসেছিলে তাকে যে তুমি বিয়ে করতে পারলে না সেটা তোমার দোষ আদৌ নয়। তোমার দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে। কিন্তু অন্য লোকে তো তা বুঝবে না। তারা নানারকম রটাবে। কটূ কথা বলবে। সেসব ভেবেই আমি—

—তা ও মশায়।—মনীশ কিছু বলার আগেই সতীশ এবার উঠে এলেন নিজের জায়গা ছেড়ে নীরদবরণের কাছে।—আপনার প্রস্তাব তো মনে হচ্ছে যথার্থ। বেশি লেকাপড়া জানা মেয়ে আমাদের দরকার নেই বাপু। ইংরিজি পড়তে জানুক কি না জানুক তাতে কী আসে যায়?...তুমি কী বলো নারান?

—শুধু হাতে মেমারি ফিরলে অনেক অশান্তি সতীশ;—নারান বললেন;—লোকের কাছে জবাবদিহি করতে করতে তোমার ভূষ্যি নাশ হয়ে যাবে। মনীশকেও টিটকিরি শুনতে হবে কম না। পরান ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে ওর। সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে...আপনার নাতনিকে একবার দেখাতে পারেন নীরদবাবু...।

অপরেশ ঘাড় হেঁট করে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর কিছু বলার নেই। কী থাকতে পারে বলার? বন্ধু আকস্মিকভাব এরকম একটা প্রস্তাব দিতে পারে সেটাই তো তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। অপরেশ কি নীরদবরণের প্রতি ঈর্ষা বোধ করছেন? তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে মনীশের মতো সুপাত্রের হাতে তিনি নিজের নাতনিকে তুলে দেবেন? এ তো মেঘ না চাইতেই জল? কিংবা বলা যায় সোনায় সোহাগা! অপরেশ ঠিক কী যে ভাবছেন তা এই মুহূর্তে বোঝা সম্ভব নয়। নীরদবরণ কিংবা সতীশবাবুদের সেদিকে কোনও নজর আছে বলেও মনে হল না। বরং ত্রিদিবেশকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল নীরদবরণের দিকে।

—নীরদ-দা আমি বলব এটা আপনার গুড ডিসিশান। শুভ্রাকে আমিও তো গতকাল থেকে দেখছি! ওর মতো মেয়ে হয় না। ধীর, স্থির, শান্ত। আর সবসময় বই মুখে নিয়ে বসে আছে।

—আরে মশায় তখন থেকে তো শুধু গুণগানই শুনে যাচ্ছি সে মেয়ের। চোকে তো এখনও দ্যাকলাম না—।—সতীশ বললেন।—সে মেয়েকে নিয়ে আসুন আপনারা।

—নীরদ -দা আমি দোতলায় যাচ্ছি—ত্রিদিবেশ বলল।—রত্নাকে বলছি—শুভ্রাকে সাজিয়ে এখানে পাঠাতে।

—তুমি একা গেলে হবে না।—নীরদবরণ বললেন,—আমাকেও যেতে হবে। সুবুও তো এখনও কিছুই জানে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে 'চোখের বালি' পড়ে যাচ্ছে হয়তো। তাকে সেজেগুজে একতলাতে আসতে হবে শুনলে তো রীতিমতো অবাক হয়ে যাবে।...ইট উইল বি রিয়েলি আ বোল্ট ফ্রম দ্যা ব্লু টু হার....। চলো আমাকেও দোতলাতে যেতে হবে।

নীরদবরণ আর ত্রিদিবেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর এই প্রথম সমরেশ কথা বলল।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা নয়। নেহাতই সৌজন্যমূলক কথা। সতীশবাবুদের দিকে তাকিয়ে সমরেশ বলল—আপনারা আর একবার চা কিংবা শরবত কিছু নেবেন?

—চা?...শরবত?—সতীশ তাকালেন নারানের দিকে।

—শরবত নয়। চা একবার হতে পারে।—নারান জানালেন। ঘরের মেঘলা আবহাওয়া যেন হঠাৎই উধাও। মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ যেন উঁকি দিচ্ছে। সমরেশ নিজেব দাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—দাদা তুমিও এক কাপ চা নাও? নেবে?

—চা?—আচ্ছন্নতার মধ্যে থেকে যেন অপরেশ উঠে এলেন। ভাইয়ের দিকে তাকালেন—খাব চা?

—খাবেন না কেন?—সতীশ বললেন;—আমরা চা নিচ্ছি আপনিও নিন। অনেক ধকল সহ্য করেছেন বুঝতেই পারছি। অনেক কষ্ট। এই কষ্ট যাবার নয়। তাও বুঝছি। বুঝছি নাকি? মেয়ের বাপ হয়ে আপনার মতো দুর্ভাগ্য হলে আমিও বুঝতাম হাড়ে হাড়ে কী হারিয়েছে আপনার। ভাববেন না আমরা অমানুষ! প্রথম ঝোঁকে বাড়িতে এসে হয়তো কিছু কটূ কতা বলেচি আপনাকে; কিছু মনে কববেন না ভাই। যদি মনে আঘাত পেয়ে থাকেন নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।—এই কথা বলতে বলতে সতীশ অপরেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অপরেশ মুখ নিচু করে বসেছিলেন। তাব দুই হাত ধরে সতীশ তাকে নিজেব দিকে টেনে নিলেন। বললেন—যা ঘটেছে তার জন্যে আমি কিংবা আপনি কেউ দায়ী নই। এ সবই অদেষ্ট। অপর্ণা মাকে দেখে সত্যিই আমাদের পছন্দ হয়েছিল। রূপে-গুণে লক্ষ্মী মা আমার। ভেবেছিলুম তাকে ঘরের বউ করে নিয়ে যাব। মনীশ সুখী হবে। আমরাও আনন্দে থাকব। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! সব কীরকম ওলট-পালট হয়ে গেল অপরেশবাবু। বিশ্বাস করুন যা ঘটেছে তার জন্যে আমি আপনাকে দোষী করচি না, কোনওদিন দোষী করব না...কোনওদিন না...। আবেগে সতীশের গলা বুজে এল। তিনি মুহ্যমান অপরেশকে নিজের বুকে টেনে নিলেন। অপরেশের চোখ দিয়ে গড়িয়ে নামছে জল। তিনি শুধু বলছিলেন—সে মুখপুড়ি আমার কপাল ভেঙে দিয়ে চলে গেল।....শেষজীবনটা আমি কাটাব কীভাবে? শুধু মেয়ের জন্যে চোখের জল ফেলে ফেলে? আমার স্ত্রীর কতা ভাবুন একবার। তিনি বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচবেন না....।

—এসব আপনি কী বলছেন? —মনীশ কথা বলছে;—শোক দুঃখ এসব তো মানুষের জীবনে আছে! শুধু তাতে আটকে থাকলে চলবে? বেঁচে তো থাকতেই হবে। তাই না? মৃত্যু যতদিন না আসে ততদিন তো মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে শোক দুঃখ ভুলে এই জীবনের আলোর দিকগুলো খুঁজে নিতে। অপরেশবাবু আপনাদের জীবনে যা ঘটেছে তা খুবই মর্মান্তিক তা আমরা বুঝি। কিন্তু এত ভেঙে পড়লে চলবে কীভাবে? নতুন আশা নিয়ে বাঁচতে হবে তো আবার।....এই কথাগুলো বলতে বলতে মনীশ গিয়ে অপরেশের দিকে বাড়িয়ে দিল তার বলিষ্ঠ হাত। অকৃত্রিম আবেগে অপরেশও তাকে ছুঁলেন। অস্ফুটে বললেন—নীরদের নাতনি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে। ওকে তো বহুদিন থেকে দেখছি। নীরদ ওকে খুব ভালবাসে। নাতনি অন্ত প্রাণ। শুভ্রাকে বিয়ে করে তুমি খুবই সুখী হবে বাবা মনীশ...।

অদৃষ্টের ওপর মানুষের সত্যিই কি কোনও নিয়ন্ত্রণ আছে? গ্রিক্ নাট্যকাররা যা দেখেছেন এবং বলেছেন তা কি সত্যিই জীবনের ক্ষেত্রে সত্যি? কারণ মনীশের ভাগ্যেও বোধহয় জমে আছে অনেক অন্ধকার; দুর্দশা অনেক; মানসিক যন্ত্রণা ভীষণ। তারও কি ভবিষ্যৎ জীবন খুব সুখের? সেটা সময়ই বলবে। যদি জীবনে সত্যিই তেমন আঘাত পায় মনীশ; তাহলে তখনও কি সে নিজেকে বলতে পারবে যে, ...এত ভেঙে পডলে চলবে কীভাবে? নতুন আশা নিয়ে তো বাঁচতে হবে আবার...।

সমরেশ অনেকক্ষণ হল বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। এখন শুধু এখানে তিনজন। সতীশ, নারান আর অপরেশ। বাইরে দুপুর শেষ হয়ে বিকেল নেমেছে। কীরকম নিঃঝুম হয়ে আছে চারপাশ। সতীশের যেন আর তর সইছিল না। এত দেরি হচ্ছে কেন? খুব বেশি সাজগোজের দরকার কি বাপু? মেয়ে বাড়িতে যেমন আছে, তেমনই নিয়ে আসুক না এরা। একেবারে ডানাকাটা পরিও তিনি চান না। আবার ফরফর ইংরিজি বলতে পারা মেমসাহেবও দরকার নেই। গৃহস্থ ঘরের বউ হতে হলে আধিক্য যত কম হয় ততই ভাল। একজন ভৃত্য রেকাবির থালায় চার কাপ চা নিয়ে এল। তিনজন চা নিলেন। মনীশ নিল না। তার বরং সিগারেট ফুঁকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এখানে সে সুযোগ নেই। ঘরে ঢুকল ত্রিদিবেশ। খবর দিল যে মেয়েকে নিয়ে আসছেন নীরদবরণ। সতীশ মনীশ আর নারাণ অধীর আগ্রহে দরজার দিকে তাকিয়ে।

চৌত্রিশ

নীরদবরণের অনুমানই ঠিক। বাড়িতে এত হইহই, রইরই, বিষণ্ণতা, বিশৃঙ্খলা চলছে সকাল থেকে। কিন্তু শুভ্রার কোনও হেলদোল নেই। বিয়ে বাড়ির আনন্দটা মাঠে মারা গেল বলে মনে মনে সে মুষড়ে পড়েছে ঠিকই। তবুও বাড়ির এখানে-সেখানে মহিলাদের বিমর্ষ জটলার মাঝে সে নিজেকে একেবারেই আটকে রাখেনি। দোতলার বারান্দার দক্ষিণদিকে একেবারে শেষ ঘরটাতে শুভ্রা খাটের ওপর আধশোয়া হয়ে বই পড়াতে ব্যস্ত রেখেছিল নিজেকে। মুশকিলটা হল, বিয়ে-বাড়িতে এত হাঙ্গাম হবে জানলে সে সুটকেশের মধ্যে আরও বই ভরে নিত। 'শেষের কবিতা' বইখানা দাদু কিনে এনেছে বটে। কিন্তু এখনও তেমন ভাবে পড়া হয়নি। বইটা যে তার খুব ভাল লাগছে তাও নয়। গল্প নেই তেমন। চরিত্রের ওঠা পড়াও যে খুব আছে তা বলা যাবে না। বেশি কাব্য-ঘেঁষা যেন বইটা। কথায় কথায় কবিতা। আর অমিত রে বড় বেশি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে। তার বদলে সে 'চোখের বালি'-র সঙ্গে দাদুর সদ্য কিনে দেওয়া চার্লস ল্যামের 'টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার' বইটাও আনতে পাবত। কী অপূর্ব ইংরেজিতে শেক্সপিয়ারের নাটকের গল্পগুলো লেখা আছে বইটাতে। পড়তে দারুণ লাগে। সেই বইটা যদি সঙ্গে থাকত, তাহলে বিয়েবাড়িতে এই ডামাডোলের আবহাওয়ায় বারবার 'চোখের বালি' না পড়ে সেই বইটাও তো মনের সুখে তারিয়ে তারিয়ে পড়তে পারত।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছিল বিকেলের দিকে। ইতিমধ্যে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমও এসে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। বাইরে আমগাছের ডালে বসে একটা কাক বিবক্তিকরভাবে একটানা ডেকে যাচ্ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই শুভ্রা বুঝতে পারছিল একতলাতে কারা যেন এল। কারা এল? একবার দাদুর গলাও সে শুনেছে। দাদু তো দুজন কাকুর সঙ্গে কাটোয়া স্টেশনে গিয়েছিল। বরপক্ষের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। তারা নাকি স্টেশনে পৌঁছে অপেক্ষা করছে ওয়েটিং রুমে। সমরেশকাকু, ত্রিদিবেশকাকু ও দাদু স্টেশনে ছুটেছে তাদের সঙ্গে কথা বলতে। কথা আর কী বলার আছে? দুঃসংবাদ দেওয়া ছাড়া। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে বরপক্ষ কেমন আচরণ করে কে জানে? কী যে করল অপর্ণাদি! একেবারে এ বাড়ির সকলের মুখে চুন কালি মাখিয়ে দিল। তবে অপর্ণাদির ঘটনাতে বেশ একটা রোমান্সের গন্ধ পেয়েছে শুভ্রা। একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান্স। শুভ্রা যদি লিখতে পারত তাহলে সে কপালকুণ্ডলা বা দুর্গেশনন্দিনীর মতো একটা উপন্যাসই লিখে ফেলত হয়তো।

এরকম সব হিজিবিজি ভাবনা যখন শুভ্রার মনে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তখনই রত্না-কাকিমা

এসে ঢুকেছিল ঘরে।

—ওরা এসে গেছে।—জানিয়েছিল রত্না।

—কারা? বরপক্ষের লোকজন?

—হ্যাঁ। মোট তিনজন। তোমার সমরেশকাকু একফাঁকে এসে আমাকে বলে গেল।

—কে কে?

—পাত্র নিজে, পাত্রের বাবা, আর একজন কে এক দূর-সম্পর্কের কাকা। খুব হম্বিতম্বি করছে। তোমার দাদু অবশ্য ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

—দাদু যা মানুষ ঠিক ওদের ম্যানেজ করে দেবেন।—হেসে বলল শুভ্রা।—কিন্তু.....

—কী কিন্তু?

—ব্যাপারটা ভাবলে খুব খারাপ লাগে তাই না? পাত্র বেচারার মনের অবস্থাটা ভাবো একবার কাকিমা? বেচারা বরবেশে সেজেগুজে মনে কত আশা নিয়ে বিয়ে করতে এসে শুনল কিনা কনে পালিয়েছে।...আচ্ছা কাকিমা অপর্ণাদি কেন এরকম করল? তাকে পরে কি সমাজ মেনে নেবে? কোথায় যাবে অপর্ণাদি? কার কাছে থাকবে?

—তার কথা যতো কম বলা যায় ততোই ভাল। সত্যিই সে মুখপুড়ি এ বংশের মুখ পুড়িয়েছে। তবে অপুর ব্যাপারটা অত সহজ নয়।—চাপা স্বরে বলল রত্না।—সে যার সঙ্গে পালিয়েছে সে তো টেররিস্ট!

—টেররিস্ট? তাই নাকি? —উত্তেজনায় শুভ্রা বিছানায় সোজা হয়ে বসে।—অপর্ণাদি টেররিস্টের সঙ্গে পালিয়েছে? তার মানে অপর্ণাদি টেররিস্টদের দলে নাম লিখিয়েছে?

—চুপ চুপ। এসব কথা অত গলা তুলে বলতে নেই। কে কোথায় শুনে ফেলবে। অবশ্য সবাই সব জানে। অপর্ণা তো চিঠিও লিখে রেখে গেছে ওর বাবা মায়ের কাছে। অবশ্য....রত্না থেমে যায়।

—অবশ্য কী? বলো?

—অপর্ণার চিঠির কথা পুলিশকে গোপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের মেয়েকে কে একজন গুণ্ডা ছেলে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।...যাই হোক, তুমি এ কথা জানলে বটে। কাউকে বোলো না যেন।

—কথা চালাচালি করা আমার স্বভাব নয় কাকিমা....। শুভ্রার স্বরে যেন একটু অভিমান ফুটে উঠল।

—জানি গো জানি।—রত্না এগিয়ে, ঝুঁকে পড়ে চিবুক নেড়ে দিল শুভ্রার।—কী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি দেখছি তো? আর কত লেখাপড়া জানো। যে পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার সে খুব সুখী হবে।

—ধ্যাৎ...শুভ্রা লজ্জা পেল। আর লজ্জা পেলে যা হয়ে থাকে তার ক্ষেত্রে। তার টেবো-টেবো দুই ফর্সা গাল রাঙা হয়ে উঠল।

—পাত্রকে একঝলক দেখলাম জানো তো?

—তাই বুঝি? কেমন দেখতে গো?

—বেশ লম্বা। ছিপছিপে। একমাথা কোঁকড়া চুল। যেন ঠিক কার্তিক ঠাকুরটি। তবে....

—তবে?

—গায়ের রংটা বড় কালো মনে হল।

—এ মা কালো?

—হ্যাঁ ভাই কালো। বেশ কালো। বলা যায় কেলে কার্তিক....এই কথা বলে রত্না হেসে গড়িয়ে

পড়ল।

—খুব কালো মানুষকে দেখলে কীরকম গা শিরশিব করে।

—তা বললে হয় ভাই? কালো ফর্সা সবই তো আছে। সবাই কি তোমার মতো রং পায়?

—আহা আমার মতো বলছ কেন শুধু? তুমিও তো কম ফর্সা নও কাকিমা?....

অসমবয়সী দুজন মেয়ের অন্তরঙ্গ এই আলোচনা হয়তো গড়িয়ে যেত আরও কিছুক্ষণ, যদি না ত্রিদিবেশ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকত।

—আরে রত্না? তুমি এখানে?...নীচে চলো? ওঁরা এসে গেছেন। জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে তো?

—ওমা! হ্যাঁ হ্যাঁ চলো...। রত্না ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়েছিল। ত্রিদিবেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে একবার তাকিয়েছিল শুভ্রার দিকে। জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো শুভ্রা?

—নাহ কাকু। আমি বেশ আছি।

—ব্যাড লাক তোমার। এলে মজা করতে বিয়েবাড়িতে। সেটা হয়ে গেল শোকের বাড়ি।...রিয়েলি ইটস ব্যাড লাক ফর ইউ।

—মানুষের জীবনে সব সময় কি গুড লাক আসে কাকু?

—বাহঃ ভাল বলেছ তো?...ঠিকই বলেছ।....মানুষের জীবনটাকে কী বেশ বলে? তোমাদের লিটরেচারের ভাষায়?

—মেঘ আর রোদের খেলা।

—মারভেলাস! তুমি খুব বুদ্ধিমতী শুভ্রা। রিয়েলি ইউ আর ইনটেলিজেন্ট।

প্রশংসা শুনতে শুভ্রা বেশ অভ্যস্ত। আর প্রশংসা শুনলেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। এখনও তাই হল। ত্রিদিবেশ বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

শুভ্রা খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে আবার 'চোখের বালি'-তে মনোনিবেশ করেছিল। তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বাইরে আমগাছের ডালে একটা কাক একটানা ডেকেই যাচ্ছিল। ক্লান্তিকর ডাক ক্লান্তিহীনভাবে দিয়ে চলেছে কাকটা। শুভ্রার কানে আসছিল বটে। কিন্তু তার মন আঠার মতো লেগে আছে বইয়ের পৃষ্ঠায়। কতক্ষণ কেটেছে শুভ্রার খেয়াল নেই। একতলার বৈঠকখানায় পাত্রপক্ষের সঙ্গে এ বাড়ির কী কথাবার্তা চলছে তার খেয়াল নেই। তার মনঃসংযোগের ঘোর কেটে গেল যখন স্বয়ং নীরদবরণ এসে হাজির হলেন ঘরে।

—সুবু!—নীরদবরণ ডেকেছিলেন মৃদুভাবে।

শুভ্রা তাকিয়েছিল। দাদুকে সে আদৌ আশা করেনি এইসময় এ-ঘরে। দরজার চৌকাঠের ওধারে যেন কিছুটা অনিশ্চিতভাবে নীরদবরণ দাঁড়িয়েছিলেন। পরনে প্যান্ট-শার্ট-টাই। শুধু কোটটাই যা তিনি রেখে এসেছেন। শুভ্রার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন নীরদবরণ। কিছু একটা বলতে চাইছেন অথচ ঠিক কথা সরছে না যেন মুখ দিয়ে। পুরু ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কীরকম অদ্ভুতভাবে নাতনির দিকে তাকিয়ে ছিলেন নীরদবরণ। শুভ্রা এরকম অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাদুকে কবে দেখেছে মনে করতে পারল না। হঠাৎ এক অজানা ভয়ে তার বুকটা ধক্ করে উঠল। খাট থেকে নেমে সে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল নীরদবরণকে—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে দাদু?

—শরীর খারাপ?...নাহ, শরীর খারাপ লাগবে কেন?

—তবে? তোমাকে এত ফ্যাকাসে লাগছে কেন?

—ফ্যাকাসে লাগছে?...ইউ মীন pale? তাই নাকি? Am I looking pale?

—সার্টেনলি।—শুভ্রার সপ্রতিভ উত্তর।

—সুবু মা তোমাকে এখনই একটু তৈরি হয়ে নিতে হবে।

—তৈরি?..তার মানে আমরা কি কলকাতায় ফিরে যাব?

—নো নো নো—নট দ্যাট।...তোকে একটু পবিষ্কার হয়ে নিতে হবে।...আ লিটল মেক-আপ।

—কেন দাদু?

—তোকে ওঁরা একটু দেখবেন।

—কারা?

—সতীশবাবুবা। মেমারি থেকে যাঁরা এসেছেন।

—ওঁরা আমাকে দেখতে চান কেন?

—পাত্রটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে রে। মনীশ! হিরের টুকরো ছেলে! ভেরি ইনটেলিজেন্ট! অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার। এরকম পাত্র আর পাবো না।...হি ইজ দ্য মোস্ট বিফিটিং ব্রাইডগ্রুম ফর ইউ।

—এসব কী বলছ দাদু?

—সুবু আর কিছু জিজ্ঞেস করিসনি মা। গেট ড্রেসড প্রপারলি। রত্না কোথায় গেল? রত্না? সে তোকে ঠিক সাজিয়ে দেবে।

—কিন্তু দাদু তুমি এসব কী পাগলের মতো বলছ? আমার বিয়ে দিয়ে দেবে? এব মধ্যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে?....বলতে বলতে শুভ্রাব চোখে জল এসে যায়।

—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকব কীভাবে? দিদুকে ছেড়ে থাকব কীভাবে? আমি এখন বিয়ে করতে চাই না দাদু, আমি বিয়ে করতে চাই না! তোমাকে ছেড়ে আমি পরের বাড়িতে থাকতে পারব না। তাছাড়া....শুভ্রা থেমে যায়,—ঐ ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

—কেন রে মা?

—রত্নাকাকিমা বলছিল ছেলে নাকি ভীষণ কালো। তুমি তো জানো আমি কালোদের পছন্দ করি না?

শুভ্রার কথা শুনে নিজের সাময়িক অপ্রতিভতা কাটিয়ে নীরদবরণ হেসে উঠেন হা হা হা।

—মনীশ ইজ আ ট্যালেনটেড গাই;—নীরদবরণ বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন—অনেক ভাগ্য করলে মেয়েরা ওর মতো হাজব্যান্ড পায়। যাই হোক, আর দেরি করা ঠিক নয়। রত্না—ও রত্না—নীরদবরণ ডাক দেন। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে রত্না। তাব দিকে তাকিয়ে নীরদবরণ বলেন—তোমাকে নিশ্চয়ই সব বলেছে ত্রিদিবেশ। আমি বাইরে ওয়েট করছি। তুমি সুবুকে সাজিয়ে দাও। ও সুটকেশে শাড়ি এনেছে। বেনাবসীও বোধহয় আছে। তার থেকে তুমি ওকে একটা শাড়ি পরিয়ে নিয়ে এসো....।

পঁয়ত্রিশ

একতলা বৈঠকখানায় বেশ কিছু চেয়ার ছিল। আরও কিছু চেয়ার আনা হয়েছে। এখন দৃশ্যটা এরকম। ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে শুভ্রা। আর তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছেন সতীশ আর নারান। পাশাপাশি আবও কয়েকটা চেয়ারে বসে আছেন নীরদবরণ, মনীশ আর অপরেশ। সমরেশ কী কাজে যেন বাইরে গেছে। ত্রিদিবেশ স্পষ্টতই ব্যবস্থাপনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে। সে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। আবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে

যাচ্ছে। ঘরের বাইরে চওড়া এবং টানা বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে রত্না। ত্রিদিবেশ ঘরের বাইরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে এবং ফিসফিস স্বরে রত্নার সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলছে। হয়তো ঘরের মধ্যে মেয়ে দেখার যে অগ্নিপরীক্ষা চলছে। তার ধারাবাহিক বিবৃতি সে পৌঁছে দিচ্ছে রত্নার কাছে।

নীরদবরণ প্রথমে ভেবেছিলেন, সতীশবাবুদের কাছে আরও কিছু গুণকীর্তন করবেন শুভ্রার। ইতিমধ্যেই কিছুটা করেছেন। কিন্তু যেচে বেশি কথা বলতে তাঁর অহমিকাতে লাগছে। তিনি নিশ্চিত যে, শুভ্রাকে পাত্রপক্ষের পছন্দ হবেই। কাটোয়া কিংবা মেমারির মতো ধ্যাদ্দেড়ে গোবিন্দপুরে শুভ্রার মতো মেয়ে কটা আছে? যেমন তার রূপ, তেমনি তার শিক্ষা-দীক্ষা আর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। শুভ্রার মতো মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেলে, মনীশও বর্তে যাবে। তার জীবনটাই অন্য খাতে বইবে। মনীশ ইঞ্জিনীয়াবিং পড়ছে। পাস দিয়ে সে যখন পুরোপুরি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবে, তখন তার জীবনের স্টেটাস অনেক পালটে যাবে। অনেক বড়ো কোম্পানিতে চাকরি করবে হয়তো মনীশ। তাকে পার্টিতে যেতে হবে। মদ্যপান করতে হবে। একটু আধটু নাচগানেও অংশগ্রহণ করতে হবে হয়তো। তখন শুভ্রার মতো 'অ্যাকমপ্লিশড' (নীরদববণের ভাষায়) স্ত্রী পাশে থাকলে আর দেখতে হবে না। মনীশের গ্ল্যামার তো বাড়বেই। এমনকী পার্টির গ্ল্যামারও অনেক বেড়ে যাবে। নীরদবরণ ভাবছিলেন। তাই কোনও কথা বলছিলেন না। ঘবের কেউই কোনও কথা বলছিলেন না। ঠিকমতো বলতে গেলে ঘরে বিবাজ কবছিল পিনপতনের নিস্তব্ধতা। নীরদবরণের শুধু বারবার মনে হচ্ছিল শুভ্রা ওরকম ব্যাজাব মুখে বসে আছে কেন? আরও একটু সহজভাবে বসলেও তো পারত। আর মুখটা রাখতে পারত খানিক হাসিহাসি করে। এত বিরক্তির কী আছে রে মা? মনীশ একটু কালো ঠিকই। একটু কেন বেশ কালো। কিন্তু মানুষের গায়ের রংটাই কি সব? মনীশের গুণপনাটা দেখ! অনেক খুঁজেও হয়তো তোব জন্যে ইঞ্জিনিয়ার পাত্র খুঁজে পাওয়া যেত না। আর কী বিচক্ষণ মনীশ! কী ভদ্র! নীরদবরণের জহুরী চোখ মানুষ চিনতে ভুল করেনি। অনেক মানুষ ঘেঁটেছেন তিনি এই দীর্ঘ, বৈচিত্র্যময় জীবনে। মনীশের মতো ছেলেকে তিনি ঠিকই চিনেছেন। মনীশ 'সুবু'-কে সুখে রাখবে, শান্তিতে বাখবে। স্ত্রীর স্বামীর কাছে যা যা দাবি সেসবই মনীশ পূরণ করতে পারবে। কিন্তু নীরদবরণ তো একজন শিক্ষিত মানুষ। আলোকপ্রাপ্ত। তিনি তো ইংরেজি সাহিত্যের পোকা। কতো প্রগতিবাদী মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত। তবুও তাঁর একবারও মনে হল না যে, বিয়ের ব্যাপারে শুভ্রারও কিছু মতামত থাকতে পারে। এবং সেই মতামতকে হয়তো গুরুত্ব দেওয়াও উচিত। কিন্তু বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মের ব্যাপারে পাত্রীর কোনও মতামত যে থাকতে পারে এটা ভাবাও সম্ভব ছিল না নীরদবরণের মতো শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও।

শুভ্রাকে দেখে সবথেকে বেশি চমক খেয়েছিল মনীশ। চোখের সামনে এ কাকে দেখছে সে? এ তো সাক্ষাৎ রাজরানী! যেন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা কোনও অসামান্যা নায়িকা! শুভ্রার রূপের ছটায় চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছিল মনীশের! আর সে নিজেও যেহেতু মেধাবী, তাই বুঝতে পেরেছিল যে, সামনে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে যে মেয়েটি বসে আছে তাকে দেখতে এত আকর্ষণীয়া কারণ তার রূপের সঙ্গে মেধার সংমিশ্রণ ঘটেছে। মনীশের হঠাৎ মনে হল, সে এখনই চেঁচিয়ে সতীশকে জানিয়ে দেয় যে সে এই মেয়েটিকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। একে দেখামাত্রই সে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল মনীশ। এখন বেফাঁস কিছু বলে ফেললে তাকে সবাই অপ্রকৃতিস্থ ভাবতে পারে। যে মেয়েটিকে সে বিয়ে করার কথা ভাবছে সেও তো তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার পর সতীশ বললেন—ঘরের কাজকর্ম সব জানো তো মা?

শুভ্রা বিপাকে পড়ল। ঘরের কাজ বলতে লোকটা কী বলতে চাইছে? রান্না করা, বিছানা পরিষ্কার রাখা? এসব কাজ তো শুভ্রা কোনওদিনই করেনি। ঠিকমতো বলতে কী সে ভাতও রাঁধতে জানে না। কোনওদিন সেভাবে রান্নাঘরে ঢোকেনি। এখন সে কী উত্তর দেবে? ঘাড় নেড়ে না বলে দেবে? সেটা কি ভাল দেখাবে?

ঠিক এই মুহূর্তে রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিলেন নীরদবরণ।

—দেখুন সতীশবাবু সত্যি কথা বলতে কী নাতনিকে আমি একটু বেশি আদর দিয়েই ফেলেছি। রান্নাবান্না এখনও তেমন কিছু জানে না। তবে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। কেউ শেখালে শিখে নিতে দেরি করবে না।

—কিন্তু বাবা?—মনীশ হঠাৎ এপাশ থেকে ফস্ করে বলল—আমাদের বাড়িতে তো রান্নার জন্যে ঠাকুর আছে। ঘর গুছোবার জন্য চাকর আছে। তাহলে তুমি ওঁকে এ প্রশ্ন করছ কেন?

সতীশের চোখ কপালে। বাব্বা! মেয়েকে দেখে ছেলে এর মধ্যেই গদগদ! অবশ্য তা হবার কারণ আছে। মেয়েকে সত্যিই দেখতে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীর মতো। আর পড়াশোনা জানা মেয়ে সে তো ওর চোখ-মুখের ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। যে মেয়ের সঙ্গে মনীশের বিয়ের ঠিক হয়েছিল, সেই অপর্ণা, তাকে এত ভাল দেখতে ছিল না। তবে কিনা না চাইতে সত্যিই পরশপাথর পেল মনীশ! বিয়ে করতে এসে একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হল বটে। কিন্তু আখেরে যা লাভ হল তাতো আগে ভাবা যায়নি। কিন্তু ছেলের প্রশ্নে মজা পেলেও এত লোকজনের সামনে তাকে একটু ধমকই দিলেন সতীশ।

—দেখা খোকা। আমি যা জিগ্যেস করছি সেসব নিয়ে প্রশ্ন তুলো না। তুমি চুপ করে বসে থাকো। তোমার হয়ে কথা বলতে আছি আমরা—আমি আর নারান।...তো যাকগে, রান্নাবান্না যদি না জানে সে হয়তো শিখিয়ে দেওয়া যাবে।....আমাদের আরও কিছু জানার আছে। ও নারান তুমি কিছু বলবে?

নারাণ লোকটি বেশ এককাঠি বাড়া। গ্রামের লোকজন অনেকক্ষেত্রে যেমন হয় আর কী! একটু কুচুটে-মার্কা। কপাল কুঁচকে নারান শুভ্রাকে বললেন—মা তুমি হাঁটো তো কয়েকপা?

নীরদবরণ চমকে তাকালেন। এ কী! হাঁটতে বলছে কেন? সারা জীবনেও তিনি মেয়ে দেখার আসরে যাননি। যূথিকাকে বিয়ে করেছিলেন না দেখেই। তাঁর বাবা, কাকা এবং অন্যরা বাঁকুড়ার অজ গাঁয়ে যূথিকাকে দেখতে গিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এসে কেন তাকে হাঁটতে বলে থাকে এ ব্যাপারে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। মনে মনে চটলেও মুখে কিছু বললেন না নীরদবরণ। তবে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি কারণটা ধরে ফেলেছে। হাঁটতে বলাতে শুভ্রা বেশ ঘাবড়ে গেছে। পিটপিটি করে তাকাচ্ছে দাদুর দিকে। গলায় মজা এনে নীরদবরণ নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন—একটু হেঁটে দেখিয়ে দে সুবু। এরা আসলে দেখতে চাইছেন তুই খোঁড়া কিনা...।

ঝাঁ করে চেয়ার থেকে উঠে শুভ্রা ঘরের মধ্যে হেঁটে এল একপাক। মনীশের বুকে শুভ্রার নধর নিতম্বের ছন্দ চকিতে ঢেউ তুলল। সতীশ তাড়াতাড়ি বললেন—হয়েচে মা হয়েছে। বসো তুমি।...তারপর নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওহে মশায়, মেয়ে খোঁড়া কিনা শুধু এটুকু দেখার জন্যেই যে আমরা হাঁটতে বালি তা নয়। অন্য কারণও আছে।

—কী কারণ?—নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।

—আমরা দেখি মেয়ের চরণ লক্ষ্মীর চবণ কি না....।

—ও। তা কী দেখলেন?

—এ মেয়ের লক্ষ্মীর চরণ।—নারানবাবু বললেন।

—এ মেয়ে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। আমাদের একে পছন্দ হয়েচে নীরদবাবু। আজ সন্ধ্যের

লগ্নেই এই মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হবে। এ বাড়িতে যদি সম্ভব না হয় অন্য কোথাও। এ মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে পেলে আমার সংসারও আলো হয়ে উঠবে।

—তাহলে অন্যান্য কথা শুরু হোক?—নীরদবরণ বললেন।

—অন্যান্য কথা বলতে তো দেনাপাওনার কথা। আমাদের কোনও দাবি নেই। আপনারা মেয়েকে গয়নাগাঁটি যা দেবেন। সতীশ বাড়ুয্যে টাকা নিয়ে ছেলে বিক্রি করে না। অপরেশবাবুর সঙ্গেও আমার একই চুক্তি হয়েছিল। আমি তো কোনও নগদ চাই না।

ছত্রিশ

সকাল থেকে অপরেশের বাড়িটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। বিকেলের দিকে আবার জেগে উঠল। ব্যস্ততা, হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচি। সবাই যেন এরকম একটা উপলক্ষর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। যে গেছে, স্বেচ্ছায় চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে, উৎসবের অঙ্গন ছেড়ে, এমন কাজ করেছে যার জন্যে হয়তো অপরেশের বংশই কলঙ্কিত হয়ে থাকবে; তাকে, নিয়ে আর ভেবে কী হবে? সে ফিরে আসবে না। আর ফিরে এলেও আজকের লগনে তার বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। সারা বাড়ির লোকজন, নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিষণ্ণ, বিস্ময়াহত এবং মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। যেন তারা সত্যিই অপেক্ষা করছিল এরকম এক সুযোগের জন্যে ; যে সুযোগ নীরদবরণ করে দিলেন মনীশের সঙ্গে তাঁর নাতনির বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। আর সতীশবাবুকেও অতি বিচক্ষণ এবং সজ্জন ব্যক্তি বলতে হবে। প্রায় এককথায় তিনি রাজি হয়ে গেলেন শুভ্রার সঙ্গে ছেলের বিবাহে। সতীশবাবুর মনে হয়েছিল, জহুরি যেমন হিরে চিনে নিতে পারে সহজে; তেমনই তিনিও শুভ্রাকে ঠিক চিনেছেন। এ মেয়ের গড়ন-পেটন, চলন-বলন, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুই উঁচু মানের। অভিজাত 'বাবু' নীরদবরণের নাতনি যে তাঁর পরিবারে পুত্রবধূ হয়ে এলে পরিবার উপকৃত হবে; তাঁর স্ত্রী বীণাপানি খুশি হবে; মনীশও সুখী হবে; এ ব্যাপারে সতীশের মনে কোনও সংশয় হয়নি। পাত্রীর দাদুর সঙ্গে দেনাপাওনার কথাও পাকা হয়ে গেছে। নীরদবরণ বলেছিলেন, তিনি কলকাতা থেকে আদৌ প্রস্তুত হয়ে আসেননি। তিনি এসেছিলেন কাটোয়াতে মাত্র দুদিনের জন্যে, নেহাতই নাতনিকে নিয়ে বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে। এরকম সব নাটকীয় ঘটনার মধ্যে যে পড়তে হবে তাঁর ধারণাতেই ছিল না। তবে যাই হোক, নাতনির বিয়ে যখন দিচ্ছেন, তখন ভিখিরির মতো মেয়েকে তিনি ছেলের হাতে তুলে দেবেন না। নীরদবরণ তাঁর আভিজাত্যের অহঙ্কার থেকেই নিজের চেক-বই স্যুটকেশ থেকে বের করলেন। একতলার ঘরের দৃশ্যপটের কোনও পরিবর্তন হয়নি। নারান, সতীশ এবং মনীশ নিজের নিজের জায়গায় উপবিষ্ট। নিচু টুলে ঈষৎ জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিলেন অপরেশও। ত্রিদিবেশ অবশ্য দাঁড়িয়ে ছিল কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে। সমরেশ বোধ হয় লোকজনের সামনে একটু মুখচোরা। কথা সে প্রায় বলেই না। অবশ্য যখন যে কাজটা করার দায়িত্ব সমরেশকে দেওয়া হয় সে মুখ বুজে নিজ দায়িত্ব পালন করে। একতলার ঘরে সমরেশ ছিল না। সে আসলে দোতলার অন্দরমহলে গিয়ে পড়েছে। সেখানে তার স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলাদের কানে খবরটা দিয়েছে যে, অপর্ণার জন্যে নির্বাচিত পাত্রের বিয়ে হবে নীরদবরণের নাতির সঙ্গে। শুনে সকলে থ হয়ে গেছে প্রথমে। ওমা এ কীরকম কথা গো? এরকম হয়? এ বাড়িতে অপর্ণার বদলে অন্য মেয়ের বিয়ে হবে? দেখা গেল, নীরদবরণ আর শুভ্রার সপক্ষে প্রথম কথা বলল ত্রিদিবেশের স্ত্রী রত্না। সে আলোকপ্রাপ্ত মহিলা। শিক্ষাদীক্ষা আছে। কলকাতায় থাকে। তার বক্তব্য হ'ল, এটা ভালই হয়েছে। অপর্ণা নিজে থেকেই বাড়ি ছেড়ে, বাবা, মা এবং

সকলের মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে। তার জন্যে দুঃখবোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সমবেদনা থাকা উচিত নয়। আর সতীশবাবু কিছুই জানতেন না। তিনি সরল বিশ্বাসে এসেছেন ছেলের বিয়ে দিতে। বিয়ের লগন বৃথা বহে যাবে, পাত্রের হাত ধরে সতীশবাবু আবার মেমারিতে ফিরে যাবেন এ কি হয়? নীরদবরণ যদি তাঁর নাতনিকে ওঁদের দেখিয়েই থাকেন এবং সতীশবাবুদের যদি মেয়ে পছন্দ হয় তাহলে তা দোষের নয়। বরং এই বাড়ির সম্মান, অপরেশের সম্মান, এই গ্রামের সম্মান ধুলোয় লুটোতে গিয়েও যেন পরমেশ্বরের ইচ্ছেতে রদ হয়ে গেল। ...হ্যাঁ পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ছাড়া এ হতে পারে না। এরকমই বিধাতা লিখে রেখেছিলেন বোধহয় অপর্ণার কপালে। শুভ্রা ও মনীশের কপালেও।

রত্নার যুক্তিতে বোধহয় সত্যিই জোর ছিল। প্রস্তাবিত বিয়ে নিয়ে মেয়েমহলে যে চাপা গুঞ্জন উঠেছিল, তা ক্রমশ দিক বদলাল। হ্যাঁ ভালই হয়েছে। কপালের লেখা কে খণ্ডাবে? কপাল পুড়ল অপর্ণার। বলা উচিত, সে নিজেই যেন নিজের হাতে কপাল পোড়াল। আর কপাল খুলল ঐ গোরাপানা, সুন্দর মুখশ্রীর মেয়েটার। সবাই দেখছে মেয়েটাকে এ বাড়িতে গতকাল থেকে। সবাইয়ের ভাল লেগেছে। কী রূপ মেযেব! কী গুণ! কী অপূর্ব ব্যবহার! ও মেয়ের যদি ভাল হয় তো হোক না!

দোতলার ঘরে রাখা স্যুটকেশ থেকে চেক-বই বের করে এনে নীরদবরণ নাটকীয়ভাবে বললেন—সতীশবাবু, বুঝতেই পারছেন নাতনির বিয়ে দিতে আমি এ বাড়িতে আসিনি। তাই আমি আমার হবু জামাইকে কী দেব সে ব্যাপারে আদৌ প্রিপেয়ার্ড নই, ভাবিওনি কিছু। কিন্তু একেবারে শুধু হাতে আমাদেব মেয়েকে ছেলের হাতে তুলে দেব তা তো হয় না? আমি আপাতত মনীশের নামে তিরিশ হাজার টাকার চেক লিখে দিচ্ছি। মনীশ বাবা বলো তো? তুমি ইংরেজিতে সারনেমের বানান ব্যানার্জি লেখ না বন্দ্যোপাধ্যায়? সতীশ নিজের জায়গা থেকে দ্রুত উঠে ক্রমে নীরদবরণের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। বললেন—নীরদবাবু আমি একটু আগে আপনাকে কী বললাম?

—কী বললেন মশায়? খেয়াল করতে পারছি না তো?

—ওহে মশায় আবার বলছি—টাকা নিয়ে আমি ছেলে বিক্রি করতে আসিনি। সে ঘরানার লোক আমি নই। আর একটা কতা বলচি মশায় মনে কিচু করবেন না। আপনাদের আশীর্বাদে টাকার অভাব আমার নেই। বরং ও বস্তুটা একটু বেশিই আচে। আপনার কাছ থেকে টাকা আমরা নেব না। মেয়ের বাবার কাছ থেকেও নেব না। আবার তার জন্যে মেয়েকে খোঁটাও দেব না।

—কিন্তু আমার তো খারাপ লাগবে। আমি তো নাতনিকে শুধু হাতে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাব না। আবার এদিকে হয়েছে আর এক মুশকিল? নীরদবরণ হাত ঝাঁকিয়ে আক্ষেপের মুদ্রা করলেন।

—কী মুশকিল আবার?

—বিয়েবাড়িতে পরবে বলে দু-চারটে যা গয়না এনেছে মেয়েটা। আর কোনও গয়না তো আনেনি। কিন্তু এটা জানবেন ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়নায় মুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। আর তা আমরা দেবও। তবে তার জন্যে সময় লাগবে। অন্তত বউ-ভাতের দিন সকাল পর্যন্ত।

—বুঝিচি মশায় বুঝিচি। সতীশ বললেন,—ভদ্দরলোককে দেখলেই চেনা যায়। এ বিয়ে তো আর পাঁচটা বিয়ের মতো নয়। আজ সকালেও যখন ঘুম থেকে উঠেছিলুম তখনও কি জানতুম যে, আপনার পরিবারের সঙ্গে আমাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ লেগে যাবে? কিন্তু লাগল তো? ... ঠিক আচে গয়না আপনাদের যতো ইচ্ছে মেয়েকে দিন, আপত্তি করব না। আর ফুলশয্যের দিন সকলেই যদি সেই গয়না মেমারিতে আমার বাড়ি পৌঁছে যায় তাতেও অসুবিধে নেই। সেদিন তো আপনি আসচেন আমাদের বাড়ি, আপনার স্ত্রী আসচেন, আরও অনেকে আসচেন! আর

মেয়ের বাবাও নিশ্চয়ই আসবেন। তিনিই তো আমার আসল বেয়াই গো? নীরদবরণের কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন—সেই রিমোট ঝালদা থেকে বিশ্বদেব, মানে মেয়ের বাবা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে কি না বলতে পারছি না, তবে আমি যাব, আমরা যাব।

—তখনই না হয় যা গয়না দেবার মেয়েকে দেবেন? এইসময় একটা কাণ্ড ঘটল। অপরেশ হঠাৎ উঠে এসে নীরদবরণের হাত দুটো ধরলেন। ধরা গলায় অপরেশ বললেন—ভাই নীরদ একটা কতা বলব? কিছু মনে করবে?

—নাহ ভাই মনে করব কেন? বলো?

—শুভ্রা তো আমারও নাতনির মতনই।

অপরেশ কী যে বলতে চাইছেন তেমন বোধগম্য হচ্ছে না নীরদবরণের। সতীশবাবু, নারাণবাবু আর মনীশও তাকিয়ে আছেন অপরেশের দিকে। অপরেশ একটু থেমে ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে আবার বললেন—সে মুখপুড়ি তো আমার মুখও পোড়াল? সে যদি কোনওদিন বাড়িতে ফিরেও আসে তাহলে কী অবস্থায় ফিরে আসবে আমি জানি না। অন্তত আমাদের সমাজে তার বিয়ে আর হবে না আমি জানি। ... তাই আমি ভেবেচি অপর্ণার বিয়ের কথা ভেবে যে গয়না আমি গড়িয়ে রেখেছি সেসবই আমি শুভ্রাকে আর মনীশকে দিতে চাই। আশা করি তোমার আপত্তি হবে না ভাই?

এরকম একটা প্রস্তাব যে আসতে পারে, নীরদবরণ ভাবেননি। তাই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভাবছিলেন। সতীশবাবু কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—সাধু। সাধু। অতি সাধু প্রস্তাব? মশায় আপনাকে দেখে তো বুঝিনি যে আপনার মনটা এত বড়? নিজের মেয়ের শোকে মানুষের মাথার কি ঠিক থাকে? তার মধ্যেও তো আপনি এটা ভেবেচেন? ও মশায় নীরদবাবু আপনি মত দিয়েই দিন না...? নীরদবরণ বললেন—এটা কি ঠিক কাজ করতে চলেছ অপরেশ? ভাল করে ভেবে দেখো?

—আর কী ভাবব নীরদ? আমার তো ঐ একটিই মেয়ে।

—অপর্ণা কি আর কোনওদিনই ফিরবে না? তারও তো ভবিষ্যৎ বলে কিছু আছে?

—আমার ধারণা তার আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমাকে এই পোড়া কপাল নিয়েই বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা বলে আমি শুভ্রার বিয়েতে হাত গুটিয়ে বসে থাকব কেন? আমার যা গয়না আচে আমি তা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতে চাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি তাই করবেন। সতীশ বললেন।

—এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। সায় দিলেন নারানও।

নীরদবরণের আর কী বলার ছিল? এখন ঘটনাপ্রবাহ নিজেই নিজের গতি ঠিক করে নিয়েছে। নিজেকে তাঁর মনে হচ্ছিল নিমিত্ত মাত্র। পুরোদমে বিয়েবাড়ির ব্যস্ততা আবার লেগে গেল বাড়িতে। সমরেশ আর ত্রিদিবেশ ছুটল মাছ আর মিষ্টির ব্যবস্থা করতে। নিমন্ত্রিতরা সবাই হয়তো আসবে না। এরকম গোলমেলে বিয়েতে অতিথি হতে বাধবে তাদের। তবুও বাড়িতে তো কিছু অতিথি ইতিমধ্যেই এসে গেছে। তারা সব বৃত্তান্ত জানে। তাদের খাওয়াতে হবে। বরযাত্রীরাও আসবে। মনীশের মুখ থেকে নীরদবরণ জেনেছেন তাদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ জন। তারা সব ট্রেনে করে এসে নামবে কাটোয়া স্টেশনে। তারপর বিয়েবাড়ি পৌঁছতে হন্টন। একতলার উঠোনে উনুন জ্বলেছে। ঠাকুরেরা ময়দা মাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ত্রিদিবেশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারকি করছে। সমরেশ মুটেদের মাথায় মাছ আর মিষ্টির হাঁড়ি তুলে দিয়ে খানিকবাদে এসে পড়ল। রত্না এবং অন্য মহিলারা শুভ্রাকে সাজাতে বসে গেছে। সন্ধে সাতটাতে লগন। তার আগে মেয়ে

ও বরের আশীর্বাদের পালা চুকিয়ে দিতে হবে। সব ভেবে রেখেছেন নীরদবরণ। তাঁর হুকমতো কিংবা চিন্তা-ভাবনা মতোই সব মসৃণভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে অবশ্য দুটো ঘটনা ঘটল যা বেশ অস্বস্তিতে ফেলল নীরদবরণকে।

সাঁইত্রিশ

সন্ধ্যায় আসন্ন বিয়ের লগনের জন্যে সতীশবাবুরা একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। একতলার বসার ঘরের পাশে আর একটা ঘর আছে। অপরেশের পূর্ব-পুরুষেরা কাটোয়া শহরে জমিদার-বংশ বলেই খ্যাত ছিলেন। কুড়ি-তিরিশ বছর আগেও এ বাড়িকে লোকে জমিদার বাড়ি বলেই চিহ্নিত করত। একতলাতে পরপর অনেক ঘর। তাছাড়া মূল বাড়ির কিছু তফাতে, আরও একটা ছোট বাড়ি আছে। যা কাছারি বাড়ি বলে পরিচিত। সেই বাড়ি অবশ্য বর্তমানে পরিত্যক্ত। সাপ খোপের আড্ডা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার প্রায় সব জমিদাববংশের মতো অপরেশদের পূর্বপুরুষদেরও অবস্থা পড়তে শুরু করে। ক্রমে কয়েক পুরুষ বাদে এই বাড়ির বাসিন্দাদের এখন মধ্যবিত্ত বলাই ভাল। জমিদারির গৌরব এখন অতীত। শুধু লোকের মুখে মুখে স্মৃতি রয়ে গেছে কিছু। জমিদারবংশের উত্তরাধিকারী অপরেশ কিংবা সমরেশকে এখন স্কুলমাস্টারি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়।

কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাড়িটা তো রয়ে গেছে। দ্বিতল এই বিশাল বাড়িতে ঘরের অভাব নেই। অধিকাংশ ঘরই তো খালি এবং তালাবন্ধ পড়ে থাকে। একতলার কয়েকটা ঘর বিয়ে উপলক্ষে খুলে দেওয়া হয়েছে। ঝাড়পোঁছ করা হয়েছে। বাসর-ঘর হিসেবে একটা ঘর তো রীতিমতো সাজিয়ে ফেলা হয়েছিল গতকাল থেকেই। অপরেশ ব্যস্তবাগীশ মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন বিয়ের আগের দিনই সব গুছিয়ে রাখতে। আজ দুপুর পর্যন্ত সবাই জানত, বাসর-ঘর আবার এলোমেলো করে ফেলতে হবে। কোনও কাজেই আসবে না। এখন অবশ্য পরিস্থিতি হঠাৎই বদলে গেছে। নির্দিষ্ট ঘরেই বাসর বসবে। ত্রিদিবেশের হুকুমে লোকজন বাসর-ঘরও আবার নতুন উদ্যমে ঝাড়পোঁছ করতে লেগেছে। আর একটা ঘর খুলে মনীশ, সতীশবাবু এবং নারানবাবুর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই ঘরে একটা বড় পালঙ্ক ছিলই। বিছানাও ছিল। সেই পালঙ্কে সতীশবাবু এবং নারানবাবু বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর একটি অতিরিক্ত চৌ-পায়া আনা হয়েছে ঐ ঘরে। পুরু গদি, বিছানা-বালিশ সব কিছু পাতা হল দ্রুত। মনীশের ক্রমাগত আপত্তি টিকল না। তাকে অপরেশ, ত্রিদিবেশ ও নীরদবরণের পীড়াপীড়িতে সেই চৌ-পায়ার আরামপ্রদ বিছানাতে লম্বা হতে হল।

দোতলাতে নিজের ঘরে এসে নীরদবরণ ধরাচুড়ো খুললেন। চানঘরে বালতি-ভরা টলটলে ঠাণ্ডা জল ছিল। গা ধুলেন। সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি পরলেন। পারফিউম এনেছিলেন স্যুটকেশে। ফরাসি পারফিউম ছাড়া তিনি চলতেই পারেন না। সকাল থেকে এ বাড়িতে যা নাটক এবং ঝামেলা চলছিল, এসব দৈনন্দিন বিলাসিতার কথা নীরদবরণের মনেই ছিল না। এখন কি মন হালকা লাগছে? তা অবশ্য বলা যাবে না। একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে যেমন নীরদবরণের অহং প্রীত হয়েছে। আবার অন্যদিকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘেও তাঁর মনের আকাশ ক্রমশ যেন ছেয়ে ফেলছিল।

পরিবর্তিত পরিধানে নিজেকে বেশ তাজা মনে হচ্ছিল। স্যুটকেশ থেকে পারফিউমের শিশি বের করে ঢাললেন পাঞ্জাবিতে। এসময় বন্ধ দরজায় করাঘাত শোনা গেল। বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে

গেল নীরদবরণের। এখন আবার কে এল? একটু কি একা থাকা যাবে না? একা থাকতে চান কিছুক্ষণ নীরদবরণ। ভাবতে চান। তিনি বুঝতে পারছেন না সিদ্ধান্তটা ঠিক নেওয়া হ'ল না ভুল নেওয়া হ'ল। দরজা খুলে দেখলেন এ বাড়ির একজন ভৃত্য। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরনে, আদুল গা, কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক। প্রণাম ঠুকল।

—কী চাই? নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।

—বড়কর্তা পাঠালেন হুজুর...

—বড়কর্তা? ...অপরেশ?

—আজ্ঞে...

—কী জন্যে পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে আপনার গরম লাগতেচে ......পাখা টানতি হবে.....

নীরদবরণ বুঝলেন এবং প্রীত হলেন। মনে মনে তারিফ করলেন বন্ধুর। এত দ্রুত পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবে অপরেশ ; ক্রমশ বাস্তবতাকে মেনে নেবে ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে তা যেন ভাবতে পারেননি নীরদবরণ। হাজার হোক অপর্ণা তাঁকে, যে শোকের পাথারে ফেলে চলে গেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া অত সহজ নয়। এ দুঃখ সারা জীবনে যাবার নয়। কিন্তু অপরেশ সত্যিই প্রকৃত বন্ধু-বৎসল এবং উদার মনের মানুষ এটা মানতেই হবে। মনীশের সঙ্গে শুভ্রার বিয়ের প্রস্তাব কত সহজে মেনে নিল। অপর্ণার বিয়ের কথা ভেবে গড়িয়ে রাখা গয়না সব 'সুবু'-কে দিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করল। নীরদবরণ নিজে এরকম বোধহয় পারতেন না। তিনি নিজের ব্যাপারে অতি মাত্রায় সচেতন, বোধহয় স্বার্থপরও। নিজের এবং নিজের পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, গৌরব-অগৌরবের কথা তিনি আগে ভাবেন। কিন্তু অপরেশ দেখা যাচ্ছে সত্যিই অন্যরকম। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি খেয়াল রেখেছেন যে, তাঁর 'সাহেব-বন্ধু' নীরদবরণ পাড়া-গাঁর গরমে কষ্ট পাবেন। তাই ভৃত্যকে পাঠিয়েছেন সিলিং-এ টাঙানো পাখা টানার জন্যে।

—নাহ, আমার জন্যে এখন পাখা টানতে হবে না। বরং তুমি এক কাজ করো...

—হুকুম করুন হুজুর...

—ঘরের জানলাগুলো সব খুলে দিয়ে যাও। এখন তো সন্ধে হয়ে আসছে, রোদ কখন পড়ে গেছে। ঘরে হাওয়াবাতাস খেলুক।

—যে আজ্ঞা হুজুর। বাতিও কি জ্বালিয়ে দিয়ে যাব?

—নাহ, এখনও যথেষ্ট আলো আছে। বাতি জ্বালবার দরকার নেই। শুধু জানলাগুলো......

—ঘরের এক-মানুষ সমান বড় বড় জানলাগুলো হাট খুলে দিয়ে লোকটা চলে গেল। নীরদবরণ গদি-আঁটা চেয়ারে এলিয়ে বসে একা একা ভাবতে লাগলেন। ...আমি কি ঠিক সিদ্ধান্ত নিলাম? বিশ্বদেবকে না জানিয়ে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করা কি যুক্তিযুক্ত হল? পরে যদি বিশ্বদেব আমাকে দোষারোপ করে? সে বড় একরোখা, গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ। শুভ্রাকে যে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছেন নীরদবরণ, নিজের বিবেচনা মতো তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন; এটা একেবারেই পছন্দ হয়নি বিশ্বদেবের। সে নাকি প্রায়ই তার স্ত্রীকে এবং শাশুড়ি যূথিকার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে যে, আদর দিয়ে তার শ্বশুর মেয়েটার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছেন। নীরদবরণ ভাবছিলেন আর ভাবছিলেন। পাইপ ধরিয়ে নিয়েছিলেন। কড়া তামাকের ধূম্রজালে অবগাহন করে বিষণ্ণ গোধূলিবেলায় নীরদবরণের শুধুই মনে হচ্ছিল, তিনি কি ঠিক সিদ্ধান্ত নিলেন? মনীশ আর শুভ্রা সুখী হবে তো? যদি সুখী না হয়? যদি ওদের মধ্যে বনিবনা না হয়? 'সুবু' খুব জেদি ও একরোখা মেয়ে। অনেকটা তার বাবার মতোই। আর ভীষণ অভিমানী। তার মানভঞ্জন করতে অনেক সময় লাগে। মনীশের ধৈর্য আছে তো 'সুবু'র খামখেয়ালিপনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ব্যাপারে? সেও

তো শিক্ষিত ছেলে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার-হবে দুদিন বাদে। তারও তো অহমিকা থাকা স্বাভাবিক। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই যদি অহমিকাসম্পন্ন হয় তাহলে কি তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়? নীরদবরণকে তাঁর দাম্পত্য-জীবনে এ সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ যূথিকা প্রথম দিন থেকেই নীরদবরণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। বিয়েটা তো আজ হয়ে যাবে নির্বিঘ্নেই। তারপর কী হবে? 'সুবু' যদি সুখী না হয় তাহলে সারাজীবন বিশ্বদেব তাঁকে দুষবে। হঠাৎ নীরদবরণের মনে হ'ল, ঝালদাতে বিশ্বদেবের ফোন-নাম্বার তো তাঁর সঙ্গে নোটবুকেই আছে। তার অফিসে এবং বাড়িতে দু-জায়গাতেই ফোন আছে। সাহেবদের অফিসে অ্যাকাউন্টবাবু বলে কথা। বিশ্বদেবের চাকরিটা বেশ সম্মানের। ... আচ্ছা ওকে একবার ফোন করে খবরটা দিলে হয় না? যদি পারে বিশ্বদেব আগামিকালই চলে আসুক হাওড়ায়। আগামী পরশু মেয়ের বউভাত হওয়ার কথা। সেখানে উপস্থিত থাকুক বিশ্বদেব। পাইপ নিভিয়ে নীরদবরণ ঝাঁ করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। এখানে ফোন করা যায় কোথা থেকে? দরজার দিকে এগোতে যাবেন, আবার দরজাতেই করাঘাত। আবার কে এলো? কী ঘটল আবার? নীরবরণ দরজা খুললেন এবং দেখলেন রত্না দাঁড়িয়ে আছে উদ্বিগ্ন মুখে।...

—কী ব্যাপার রত্না? নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।

—একবার যেতে হবে দাদা...

—কোথায়?

—শুভ্রা কাঁদছে ....কথা বলতে চাইছে আপনার সঙ্গে...

—কেন? ...কী হয়েছে? ...কাঁদছে কেন? ...শরীর খারাপ লাগছে?

—শরীর খারাপ? ...নাহ শরীর খারাপ নয় বোধহয়। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ও। ...কথা বললেই মনে হয় ঠিক হয়ে যাবে। নীরদবরণ তাকালেন রত্নার দিকে। তাঁর মনে হল, 'সুবু'র কান্নার কারণটা রত্না জানে। কিন্তু সে মুখ ফুটে বলতে চাইছে না। কেন? কান্নাকাটি শুরু করল কেন মেয়েটা? নীরদবরণ নাতনিকে ভালই চেনেন। চট করে তার কান্না আসে না। আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো সেন্টিমেন্টাল তো সে নয়। কথায় কথায় ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কান্না তার আসে না। শুধু তো আর শরৎচন্দ্রের নভেল পড়ে সে মানুষ হয়নি। ডিকেন্স ও টমাস হার্ডির নভেলও তো পড়েছে 'সুবু'। এমনকী শেক্সপিয়রের নাটকও তো সে পড়েছে কিছু কিছু। তার মানসিক গড়ন তো গড়পড়তা বাঙালি ছিঁচকাঁদুনে মেয়েদের মতো নয়। তাহলে কাঁদছে কেন?

—তুমি যাও। আমি আসছি। রত্নাকে বললেন নীরদবরণ। রত্না চলে গেল। নীরদবরণ ভাবছিলেন। এটাও হতে পারে যে হঠাৎ বিয়ের কথা শুনে ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা। এসেছিল বিয়েবাড়িতে নেমতন্ন খেতে। এখন নিজেকেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হচ্ছে। সত্যিই এটা অপ্রত্যাশিত ছিল। শুধু শুভ্রার কাছে কেন। নীরদবরণের কাছেও। কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল। রাতারাতি যে ঘটনা এরকম নাটকীয়ভাবে ঘুরে যাবে তা কি ভেবেছিলেন নীরদবরণ? জীবন বোধহয় এরকমই। আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা, নিস্তরঙ্গ জীবনেরও পরতে পরতে কতো যে নাটক আর বিস্ময় লুকিয়ে থাকে!

দোতলার করিডর দিয়ে হেঁটে একেবারে শেষ মাথার ঘরটিতে চলে এলেন নীরদবরণ। অন্যান্য ঘরে মেয়েদের উঁকিঝুঁকি তাঁর নজর এড়াল না। কিন্তু নীরদবরণ গম্ভীরভাবে হেঁটে গেলেন। সেই ঘরে গিয়ে দেখলেন শুভ্রা বসে আছে খাটে। পা ছড়িয়ে নয়। কীরকম জড়োসড়ো ভঙ্গিতে। রত্না তার সামনেই। ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলছিল রত্না শুভ্রাকে। নীরদবরণকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে চুপ করে গেল। অস্ফুটে বলল—ঐ তোমার দাদু এসে গেছেন। যা বলার ওঁকেই বলো।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রত্না দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে সহবৎ জানে। দাদু

আর নাতনির অন্তরঙ্গ কথাবার্তার মধ্যে তার যে থাকা ঠিক নয় এ জ্ঞান রত্নার আছে।

নীরদবরণ নাতনির দিকে তাকালেন। তার মুখ ফোলা লাগছে। চোখে জল টলটল করছে। কাঁদলে মেয়েদের এরকমই লাগে। শুভ্রা সরাসরি তাকাচ্ছিল না দাদুর দিকে। কীরকম মুখ গোঁজ করে বসে ছিল। এরকম ব্যবহার সে সচরাচর তো করে না?

—কী হয়েছে সুবু—মা? ...টিয়ার্স ইন ইওর আইজ! হোয়াই? যখন দুজনে একা কথাবার্তা বলেন, তখন মাঝেমাঝেই ইংরেজি ব্যবহার করেন নীরদববণ। নাতনিও শুদ্ধ ইংরেজিতে উত্তর দিয়ে থাকে। এসব দাদু এবং নাতনির অনেকদিনের অভ্যাস। কারণ আর কিছুই নয়। নাতনিকে যতটা পারা যায় ইংরেজিতে কথা বলা অভ্যাস করাতে চান নীরদবরণ। কিন্তু শুভ্রা আজ অন্যরকম ব্যবহার করছে। সে প্রথমে কিছুই বলল না। শুধু কাঁদতে লাগল আবার। নীরদবরণের খারাপ লাগছিল। তিনি কান্নাকাটি, বিশেষত মেয়েদের, একেবারেই পছন্দ করেন না। কিঞ্চিৎ অধৈর্যের গলায় নীরদবরণ জানতে চাইলেন—কাঁদছিস কেন? বলবি তো? শরীর খারাপ লাগছে?

শুভ্রা বড় হয়ে যাবার পর কোনওদিন যা করেনি হঠাৎ আজ তা করল। নিতান্ত বাচ্চা মেয়ের মতো নীরদবরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল। কীরকম অস্বস্তি হচ্ছিল নীরদবরণের। শুভ্রা যে কত বড় হয়েছে, কতটা যৌবনবতী হয়েছে, তা যেন সেই মুহূর্তে অনুভব করতে পারছিলেন। বেশ বিহ্বলও হয়ে পড়লেন তিনি।

উদ্বেগের গলায় জানতে চাইলেন—কী হয়েছে? হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার? ইজ এনিথিং রং?

—ইয়েস এভরিথিং ইজ রং দাদু। ... আই ডোনট লাইক ইওর ডিসিসান.....কান্না সামলে থমথমে স্বরে বলল শুভ্রা। নিজেকে সরিয়ে নিল দাদুর কাছ থেকে। তারপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল—ঐ ছেলেটাকে আমি বিয়ে করব না দাদু। ডোন্ট ইনসিস্ট মি.... ডোন্ট...

—বিয়ে করবি না? কেন? ...কী দোষ করল মনীশ? ডু ইউ নো হি ইজ গোয়িং টু বি অ্যান ইঞ্জিনিয়ার উইদিন টু আর থ্রি ইয়ারস? ও যে তোকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে এটা তোর গোল্ডেন ফরচুন। তাই নয় কি? তোর তো কোনও ফর্মাল ডিগ্রি নেই। ম্যাট্রিক পাসও নয়। সে তুলনায় ছেলে তো হিরের টুকরো? তোর আপত্তি কোথায়?

—সবই মানলাম দাদু। ও হাইলি এডুকেটেড। কিন্তু ও যে ভীষণ কালো দাদু? ভীষণ কালো? অতো কালো ছেলেকে আমি বিয়ে করব না...

—ওরে চুপ চুপ। নীরদবরণ গলার স্বর নামিয়ে বললেন। এসব কথা শুনলে লোকে তোকে পাগলি ভাববে। বাঙালি মেয়ে হয়ে তুই যেভাবে কথা বলছিস সেভাবে কেউ কথা বলে না...

—কী ভাবে কথা বলছি? ... নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা বলতে পারব না?

—নো.....ইউ আর নট অ্যালাউড টু...ইন আওয়ার সোসাইটি। তুই তো আর বিয়ে করবি না। তোকে বিয়ে করা হবে। তোকে ওরা পছন্দ করছে এটা তোর ভাগ্য সুবু...?

—এসব কী বলছ দাদু? শুভ্রার ভুরু কুঁচকে গেল। তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছ যে মেয়ে হয়েছি বলে যে পুরুষদের সব অন্যায় মেনে নিতে হবে তা নয়। তুমি প্রোটেস্ট করবে। আমি প্রোটেস্ট করতে পারব না?

নাতনির এহেন কথায় নীরদবরণেরও মেজাজ চড়ে গেল।

তিনি বললেন—অন্যায়? ...হোয়াট ডু ইউ মীন? ...তুমি কি ভাবছ তোমার ওপর অন্যায় করা হয়েছে? প্রতিবাদের কথা তো তখনই ওঠে যখন সত্যি সত্যিই অন্যায় করা হয়। এখানে মনীশের মতো সু-পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়ে আমি কী অন্যায় করেছি বলো? ...এক্সপ্লেন?

—দাদু, প্লিজ তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর আমাকে। কালো ছেলেকে আমার একেবারেই

পছন্দ নয়। যার সঙ্গে সারাজীবন ঘর করতে হবে সে যদি এরকম কুচকুচে কালো হয়... ম্যাগো ...হাউ আগলি...?

—সুবু ওরকম বলিসনি মা? ওরকম বলতে নেই। মনীশ একটু বেশি কালো হতে পারে। কিন্তু কী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা? হি লুক্স রিয়েলি ইনটেলিজেন্ট। মুখশ্রী ভাল। একমাথা কোঁকড়া চুল.....

—হতে পারে দাদু। কিন্তু বড্ড কালো? লাইক আ মুর!

সেই যে শেক্সপিয়ারের ওথেলো? পড়েছিলাম না?

নাতনির কথা শুনে নীরদবরণ হাসবেন না বিরক্ত হবেন ঠিক যেন বুঝতে পারছিসেন না। কী বলছে মেয়েটা? নাহ্, শুধু চেহারাটাই ওর বড় হয়েছে। বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারেই পাকেনি। গায়ের রং নিয়ে কেউ এত উতলা হয়?...হাজবান্ড ফর্সা হলেই সব মিটে গেল? কোনও পুরুষ যদি কন্দর্পকান্তি হয়; কিন্তু তার যদি কোনও গুণ না থাকে, যদি তার চরিত্র ঠিক না থাকে; তাহলে স্বামী হিসেবে সেকি কাউকে সুখী করতে পারবে? এসব জানে না শুভ্রা। এসব নিয়ে ভাবেওনি। কী করেই বা ভাববে? জীবনের অভিজ্ঞতা তো তার হয়নি। নিতান্ত অনভিজ্ঞ মেয়েটা। একেবারে ছেলেমানুষ।

—ছিঃ ওরকমভাবে ভাবতে নেই সুবু। তোমার বাবা তো কালো। তাই বলে কি তোমার মা বিয়ের সময় কোনও আপত্তি জানিয়েছিল?

—ঐ লোকটির মতো অত কালো বাবা নয়। সে তুমি যাই বল দাদু? আর মা যা মেনে নিতে পেরেছে আমিও যে তা মেনে নিতে পারব এটা তুমি ভাবছ কেন দাদু? আই হ্যাভ মাই ওন চয়েস। আমি যাকে পছন্দ করি না তার সঙ্গে সারাজীবন থাকব কীভাবে? হতেই পারে না....।

এবার নীরদবরণ মেজাজ হারালেন। মনে হ'ল তাঁর তিনি এতদিন ভুল করেছেন। ... হ্যাঁ ভুল করেছেন। মেয়েদের দু-পাতা ইংরেজি পড়তে শেখালে তারা কি একরকমই উদ্ধত আর দুর্বিনীত হয়ে পড়ে? শুভ্রা এসব কী বলছে? ইজ শি টকিং সেন্স? গায়ের রং মনীশের কালো ;—এই সামান্য কারণে শুভ্রা তাকে বিয়ে করতে চায় না? এসব কী হাবিজাবি বলছে ও? ইংরেজি নভেল আর ফেয়ারি-টেলস পড়ে ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নীরদবরণ অনুভব করছিলেন তিনি রেগে যাচ্ছেন ক্রমশ। শুভ্রা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ও কী ভাবছে? এই কথা কি ও ভাবছে যে কথা দিয়ে দাদুকে ও কাত করে ফেলেছে? বিয়ের পিঁড়িতে ওকে বসতে হবে না?

—শোন্ সুবু—কঠিন স্বরে বললেন নীরদবরণ ; অনেক বড় বড় কথা বলেছিস্। এবার চুপ হয়ে যা। আদর দিয়ে দিয়ে তোকে দেখছি মাথায় তুলেছি আমি। এসব কী কথা বলছিস তুই? মানুষের গায়ের রং কি বড়? গায়ের রং আর রূপ দিয়ে কি মানুষের বিচার হয়? সব দেখছি ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা তোমার হয়নি। মনীশের সম্বন্ধে আর একটাও বাজে কথা বলবি না। ছেলেটি অত্যন্ত ভাল। ভদ্র, মার্জিত, শিক্ষিত। সতীশবাবুরা বেশ বড় ঘর। মেমারির ধনী পরিবার। এমনি খুঁজলে এরকম পাত্র বোধহয় তোমার জুটত না। ওকেই বিয়ে করতে হবে তোমাকে। দিস ইজ মাই ডিসিসান.....ইয়েস মাই ডিসিসান ....। এই কথা বলে নীরদবরণ হাঁক দিলেন—রত্না রত্না! পাশের ঘর থেকে রত্না ছুটে এল।

—ওকে সাজিয়ে দাও। এখন বিকেল পাঁচটা। সন্ধে সাতটায় লগন। খেয়াল আছে তো?

ঘাড় নাড়ল রত্না। নীরদবরণ ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে করিডর দিয়ে হাঁটছিলেন। যেভাবে হোক এই কাটোয়া থেকে ; এরকম অসময়েই বিশ্বদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। শুভ্রার বিয়ের খবরটা তাকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। আগামী পরশু সকালেই বিশ্বদেবের হাওড়ায় চলে আসা দরকার।

আটত্রিশ

মোটরগাড়িতে একটানা যেতে যেতে শুভ্রার ঘুম পাচ্ছিল। কাটোয়া থেকে সকালের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। পরপর দুটো গাড়ি ছুটছে রাস্তা দিয়ে। সামনের গাড়িতে আছে শুভ্রা, মনীশ এবং একটা দশ এগারো বছরের ছেলে। সে নাকি নিতবর। বিয়ের সময় বরের সঙ্গে নাকি একজন নিতবরও থাকে। তাকেও বরবেশ পরিয়ে বিয়ের আসরে হাজির করানো হয়। সে বরের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই ছেলেটার নাম পিন্টু। কালো, গোলগাল চেহারা। মাথার চুল কদমছাঁট। ছেলেটাকে দেখে আদৌ পছন্দ হয়নি শুভ্রার। ভীষণ পেটুক প্রকৃতির। আর নোংরা। ওর মা একটুও নজর দেয় না? ধুতি-পাঞ্জাবি, মাথায় টোপর আর মুখে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে পাঠিয়ে তো দিয়েছে, কিন্তু ওর হাতে বড় বড় নখ। সেই নখে ময়লা জমে আছে। গতকালই বিয়ে হয়ে যাবার পর বাসরঘরের হুল্লোড়ের মধ্যে বসে শুভ্রা পিন্টুর দশ আঙুলের নখের ভেতর জমে থাকা ময়লা আবিষ্কার করেছে। আর তা দেখেই গা কীরকম ঘিনঘিন করেছিল তার। তার ওপর ছোঁড়াটা মহা পেটুক। কথায় কথায় এটা খাব সেটা খাব বলে বায়না করে। নিতবর হয়ে যেন মাথা কিনে নিয়েছে! গতকাল বিয়ের জমজমাট আসরে কতবার যে বায়না ধরেছে এটা খাব, সেটা খাব বলে। এই বলছে লেডিকেনি খাব, এই বলছে লুচি আর সন্দেশ খাব। আবার খানিক বাদেই বলেছে মাছ খাব মাছ! আর যতবার পিন্টু এরকম করেছে বরযাত্রীর দল শশব্যস্ত হয়ে ত্রিদিবেশ কিংবা সমরেশকে বলছিল যে, নিতবর অমুক জিনিস খেতে চেয়েছে! এখনই আনতে হবে। নিতবরের আবদার সামলাতে ত্রিদিবেশ এবং সমরেশের পরিশ্রম কিছু কম হয়নি।

গাড়িতে ছেলেটা মনীশ এবং শুভ্রার ঠিক মাঝখানটিতে হেলান দিয়ে বসেছে। তার গলায় বাসি বেলফুলের মালা। গাড়িতে উঠে থেকে ছেলেটা ঘুম দিচ্ছে। তার মাথাটা বারবার হেলে পড়ছে শুভ্রার গায়ে। মাথা থেকে একটা বোঁটকা গন্ধ শুভ্রার নাকে এসে লাগছে। কীরকম ঘেন্না করছিল শুভ্রার। সে কয়েকবার পিন্টুর মাথাটা আলতোভাবে সরিয়ে দিয়েছে তার কাঁধের কাছ থেকে। তাতে অবশ্য তেমন কাজ হয়নি। কিছুক্ষণের জন্যে স্বস্তি। তারপর আবার কিছুটা যেতে না যেতেই ঘুমন্ত পিন্টুর মাথা হেলে পড়েছে শুভ্রার কাঁধে। একসময় শুভ্রা আর চুপ করে থাকতে পারল না। পিন্টুকে রীতিমতো জোরে ঠেলা দিয়ে বলল—এই পিন্টু তুমি সোজা হয়ে বোসো তো! বারবার আমার গায়ে পোড়ো না। মাঝখানে বসে থাকা পিন্টুর বাঁ-দিকে চুপচাপ বসে ছিল মনীশ। তারও চোখদুটো রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে বারবার বুজে আসছিল। কিন্তু সে ঘুমোয়নি। চোখ দুটো মুদে চুপচাপ বসেছিল। এখন শুভ্রার কথাগুলো শুনে সে নিজে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। চোখ খুলে তাকাল একবার শুভ্রার দিকে। একবার পিন্টুর দিকে।

তারপর শুভ্রাকে জিজ্ঞেস করল—অসুবিধে হচ্ছে? শুভ্রা চকিতে একবার মনীশের দিকে তাকিয়ে আরও বিরক্তির গলায় বলল—বারবার গায়ে পড়লে অসুবিধে হবারই তো কথা....। শুভ্রার স্বরে বিরক্তির যে ঝাঁঝ ছিল তা অনুভব করল মনীশ। কিন্তু তেমন গায়ে মাখল না।

পিন্টুকে ঝাঁকুনি দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে বলল—অ্যাই এত ঘুম কিসের রে? বাইরে দিকে একটু তাকিয়ে দেখ না। কত নতুন নতুন জায়গা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। মনীশের কথায় পিন্টুর কোনও ভাবান্তর হল না। সে চোখ খুলেছে বটে কিন্তু সে চোখে ঘুম জমাট ধে আছে। উপরন্তু তার মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য করে বেশ ক্ষুণ্ণভাবে মনীশ ন—ওকে কি আমি এপাশে নিয়ে নেব? সেটা হলেই ভালই হত। অন্তত শুভ্রাকে পিন্টুর মুন্ডুর গুঁতুনি খেতে খেতে যেতে হত না। কিন্তু পরমুহূর্তেই শুভ্রার মনে হল, পিন্টুকে

ওপাশে দিয়ে মনীশ আরও এপাশে চলে আসা মানে তার শরীরের কাছাকাছি হওয়া। সেক্ষেত্রে মনীশের কনুইয়ের গুঁতোও তো সে খেতে পারে। ভাবতেই শুভ্রার প্রথমে লজ্জা করল। তারপর তীব্র অনীহা জাগল। তার শরীরের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে এটা লোকটার একটা ছল হতে পারে। শুভ্রা তাড়াতাড়ি বলল—নাহ যেমন ও আছে থাক। একটু সোজা হয়ে বসলেই হবে। শুভ্রার এই কথায় মনীশ যেন ক্ষুণ্ণ হল। সে পিন্টুকে নিজের দিকে টেনে নিল। পুনরায় ঘুমে ঢুলে পড়া পিন্টুর মাথাটা নিজের কাঁধে স্থাপন করল। শুধু তাই নয়। নিজের ডান হাত দিয়ে মনীশ পিন্টুর মাথাটা মৃদুভাবে ধরে রইল। যাতে কোনও ভাবেই তা শুভ্রার দিকে ঢলে না পড়ে।

কী থেকে কী হয়ে গেল। শুভ্রার বারবার মনে হচ্ছিল। সে এসেছিল দাদুর সঙ্গে মফস্বলে বেড়াতে। বিয়ের নেমতন্ন খেতে। আর এখন নিজেই বউ হয়ে চলেছে সম্পূর্ণ অচেনা এক বাড়িতে, অচেনা এক জায়গায়। এত তাড়াতাড়ি যে তার বিয়ে হবে এটা কল্পনাতেই ছিল না শুভ্রার। এখনও তার সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। দাদু একী করল? দাদুর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল শুভ্রার। ওরকম মিশকালো একটা লোকের সঙ্গে দাদু কেন তার বিয়ে দিল? মনীশ নামের এই লোকটাকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। ও নাকি খুব শিক্ষিত। দাদু বলছিল। হাওড়ার শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। তা পড়ে তো পড়ে শুভ্রার কী যায় আসে? যেসব মানুষ খুব কালো তাদের একেবারেই পছন্দ নয় শুভ্রার। এই লোকটারও যত গুণই থাকুক একে স্বামী হিসেবে কোনওদিন মেনে নিতে পারবে না শুভ্রা। কোনওদিন না। তাহলে কী হবে? কী আর হবে, দাদুকে সামনে পেলেই সে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে। কেন এতো কালো একটা লোকের সঙ্গে তুমি আমার বিয়ে দিলে? কেন? আমার জীবনটা বরবাদ করে দিলে দাদু! আমার বাবা জানল না। মা জানল না। দিদিমা জানল না। মামারা জানল না। আমার বিয়ে হয়ে গেল? এমন বিয়ে কখনও চায়নি শুভ্রা। কখনও চায়নি। সে সবসময় স্বপ্ন দেখেছে তার বিয়ে হবে এমন একজনের সঙ্গে, যার গায়ের রং ধবধবে ফর্সা; তাকে দেখতে হওয়া চাই রাজপুত্তুরের মতো। যেসব রাজপুত্রের কথা সে পড়েছে রূপকথায়। ঠাকুরমার ঝুলিতে। কিংবা হ্যান্স অ্যান্ডারসনের গল্পে। তার সেই গোপনে নিজের বুকের মাঝে লালিত স্বপ্ন আজ ভেঙে চৌচির। এই লোকটার সঙ্গে সারাজীবন থাকতে হবে তাকে? কীভাবে সেটা মেনে নেবে সে? কীভাবে? গলার কাছে কান্না দলা পাকিয়ে আসছিল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কাঁদা তো শোভনীয় নয়। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করল শুভ্রা। কান্নাকাটি সে আদৌ করতে চায় না। তা করলে এই কালো লোকটা আরও পেয়ে বসবে। ওর কাছে কঠোর কঠিন হয়ে থাকতে চায় শুভ্রা। ওর হ্যাংলাপনাকে একেবারেই সুযোগ দিতে চায় না। লোকটা যে ভীষণ গায়ে-পড়া, একটু সুযোগ পেলেই তার ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে এটা বুঝতে তো আর তার বাকি নেই। গতরাতেই তো সেটা বুঝেছে। হ্যাঁ গতরাতেই....।

চলতে চলতে গাড়ি হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। কী ব্যাপার বুঝতে পারল না শুভ্রা। সামনে রেল লাইন আর বেশ কিছু মানুষের ভিড় সে শুধু দেখতে পাচ্ছে। এটা কি বাজার এলাকা নাকি? বাজার হলে গাড়ি থেমে যাবে কেন? শুভ্রা কৌতূহলী হয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখতে চাইছিল। তাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই যেন মনীশ বলল—এটা একটা লেভেল ক্রশিং। গেট পড়ে গেছে। ট্রেন আসছে। ট্রেন পাস করলে তারপর আবার গেট উঠবে। আমরা যেতে পারব।

শুভ্রা একবার মনীশের দিকে তাকাল মাত্র। এই সামান্য কথা বলতে গিয়েই দাঁত বের করে হাসছে মনীশ। কুচকুচে কালো লোকটার দাঁতগুলো বেশ ঝক্ঝকে, পরিষ্কার। কী দিয়ে প্রতিদিন দাঁত মাজে কে জানে! সেই উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকিয়ে শুভ্রার গা-পিত্তি জ্বলে গেল! শুধু সুযোগ

খুঁজছে লোকটা। কীভাবে ভাব জমানো যায়। কীভাবে ছলচাতুরি করে গায়ে মাথায় হাত বুলোনো যায়। ওর মতলব যে খারাপ তা তো শুভ্রা গতরাতেই বুঝেছে।

বিকট আওয়াজ তুলে, তীব্র বাঁশি বাজাতে বাজাতে, প্রচুর ধুলো উড়িয়ে, চারদিক সচকিত করে একটা ট্রেন ঝড়ের গতিতে ছুটে গেল। শুভ্রা চোখ বুজল। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে কোনওদিন হয়নি। ঝড়ের গতিতে সট্‌সট্‌ আওয়াজ তুলে যতক্ষণ ট্রেনের কামরাগুলো একে একে চলে যেতে লাগল ততক্ষণ নিজের চোখ বুজিয়েই রাখল শুভ্রা। তারপর একসময় চোখ খুলে দেখল ওপাশের খোলা জানলায় সতীশ এসে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেকে সতীশ জিজ্ঞেস করলেন—কী রে? কোনও অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

মনীশ ঘাড় নেড়ে বলল—নাহ্ বাবা অসুবিধে আর কী? প্রায় পৌঁছে গেলুম।

—তা বটে।—সতীশ ঘাড় নেড়ে বললেন।—আর মিনিট চল্লিশ লাগবে মেমারি পৌঁছতে। আমার বউ-মণির কেমন লাগচে? বউ-মণির খুব খিদে আর ঘুম পেয়েছে বোধহয়? আর একটু কষ্ট করো। বাড়ি ফিরে বিশ্রাম—কেমন? এসময় মুখ গোমড়া করে রাখলে খুবই অভদ্রতা হয়। তাই শুভ্রা মুখটা কিঞ্চিৎ হাসি-হাসি করে তাকাল। তাদের গাড়ির চালক একবার হর্ন দিল। মনীশ বলল—তুমি যাও বাবা। এবার গাড়ি ছাড়বে। আমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

—হ্যাঁ যাই।—সতীশ বললেন.—আহা আমার বউ-মণির ওরকম সোঁদর মুখটা শুকিয়ে এই এতটুকুন হয়ে গেছে গো? বাড়ি চলো। খেয়ে দেয়ে ঘুমোবে খন।—সতীশ চলে গেলেন। পেছনের গাড়িতে উঠলেন। দুটো গাড়িই ছেড়ে দিল। এই বুড়ো লোকটা, মানে তার শ্বশুর মানুষটা খারাপ নয়। শুভ্রাকে খুব পছন্দ হয়েছে লোকটার। কথায় কথায় তাকে বউ-মণি বলে ডাকছে। ওর ব্যবহার ভালই লাগছিল শুভ্রার। কিন্তু সে একেবারেই মেনে নিতে পারছে না পাশে টোপর মাথায় দিয়ে বসে থাকা এই লোকটাকে। গতরাতের ঘটনাটা আবার মনে পড়ল শুভ্রার।...

উনচল্লিশ

হয়েছিল কী বাসরঘরের হুল্লোড়ের মাঝে বসে থাকতে থাকতে একসময় কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল শুভ্রা। বিয়ের অনুষ্ঠানটাই বোধহয় অন্যরকম। বাড়িতে যতই শোকের আবহাওয়া থাক, সন্ধের দিকে যখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, বিয়েটা হচ্ছেই তখন ধীরে ধীরে সকলের মনের বিষণ্ণভাবটা যেন পালটে গেল। মেয়েরা সাজল যেমন যেমন তারা ভেবে রেখেছিল। উজ্জ্বল জামা-কাপড় পরে ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করতে লাগল একতলার উঠোনে সামিয়ানার নীচে। তারা ভিয়েনঘরের দিকেও বারবার উঁকি দিচ্ছিল। সেখানে তখন হালুইকরেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কাজে। বিশাল হাঁড়িতে ভাত বসানো হয়েছে। তরি-তরকারি কাটা হচ্ছে। একপাশে পাঁচ কেজি ওজনের তিনটে কাতলা নিষ্প্রাণ পড়ে আছে। সেই মাছ কাটাকোটার তোড়জোড় চলছে। পুরোপুরি উৎসবের আমেজ কখন যেন সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে ফিরে এসেছে সারা বাড়ির আবহাওয়ায়, পুরুষ-মহিলা-বালক-বালিকাদের শরীরের ভাষায়।

নীরদবরণ ত্রিদিবেশের সঙ্গে আলোচনাতে বসেছিলেন। তাঁর মত ছিল, বেশি খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে লাভ নেই। কারণ নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশই আসবে না। শুধু অপরেশদের গ্রাম কেন; সারা কাটোয়া মহকুমাতে হয়তো এই বাড়ির বিপর্যয়ের খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সবাই জানে ভণ্ডুল হয়ে গেছে বিয়ে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসার কোনও প্রশ্নই নেই। তারা কীভাবে আর জানবে একই লগ্নে মেমারি থেকে আগত পাত্রের সঙ্গে আর একটা বিয়ের বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে। জানলেও

তারা সেই বিয়ের আসরে অংশগ্রহণ করতে রাজি নাও হতে পারে। সুতরাং খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশি রাখলে তা অপচয় হবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু ত্রিদিবেশ এবং সমরেশ দেখা গেল অন্তত এই একটি ব্যাপারে নীরদবরণের সঙ্গে একমত হল না। তাদের দুজনেরই মত হল, কমপক্ষে তিনশো লোকের খাবার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। কারণ অনেকে, আসবে দূর-দূরান্ত থেকে। কলকাতা, হাওড়া এবং বর্ধমান শহর থেকে। তাদের কাছে বিপর্যয়ের খবর না পৌঁছানোরই কথা। এছাড়া গ্রামের নিমন্ত্রিতরাও সবাই যে বাড়িতে বসে থাকবে তা নয়। অনেকে মজা দেখতেও আসব। কারণ অপরেশ তো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করেননি যে, নিমন্ত্রিতদের আসতে তিনি বারণ করছেন। আসলে এই অজ গ্রামে ঘটনা ঘটেই খুব কম। মজা পুকুরের বৈচিত্র্যহীন, ধরাবাঁধা জীবন এখানে। সেই মজা পুকুরে হঠাৎ ঢিল ছুড়লে যেমন দূর সঞ্চারী আলোড়ন ওঠে; তেমনই আলোড়ন উঠেছে গ্রাম জীবনে, অপরেশের বাড়ির ঘটনায়। আলাপ-আলোচনা, পরস্পরের গা-টেপাটেপি, রসালো মজলিশ এসবের মাধ্যমে ব্যাপারটাকে যতক্ষণ কিংবা যতদিন টিকিয়ে রাখা যায় ততই জীবনে যেন খানিক রগড় পাওয়ার আয়োজন। সুতরাং যারা মজা দেখতে সন্ধের দিকে অপরেশের বাড়িতে গুটিগুটি এসে হাজির হবে এবং এক বিয়ের বদলে অন্য বিয়ের আয়োজন দেখবে; তখন আর তারা শুধু শুধু ফিরে যাবে কেন? কনুই ডুবিয়ে বিয়েবাড়ির খাওয়াটা খেয়েই ফিরবে।

—সেসব কারণেই বলছি নীরদদা, অনেক ভাবনাচিন্তা করেই বলছি সব নিয়ে শ তিনেক লোকের খাওয়াদাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতেই হবে। ত্রিদিবেশ বলেছিল।

—আমারও তাই মত নীরদদা।—সমরেশ সায় দিয়েছিল।

—তাহলে আমি চেক লিখে দিচ্ছি।—নীরদবরণ বলেছিলেন।

—চেক লিখে দেবেন?

—হ্যাঁ। ক্যাশ তো আমার সঙ্গে খুব একটা আনিনি। তবে চেকবই আছে। আমার নাতনির বিয়েতে খরচ তো আমাকেই করতে হবে।

—কিন্তু অপর্ণার বিয়ের কথা ভেবেই তো অনেক জায়গাতেই অ্যাডভান্স করা হয়েছে নীরদদা? সেসব টাকা তো দাদাই দিয়েছেন। সেই অ্যাডভান্সের টাকাতে যা মালপত্র আসবে কিংবা এসেছে সেসব শুভ্রার বিয়েতে লেগে যাবে। ইটস অল দ্য সেম নীরদদা। ত্রিদিবেশ বলেছিল।

—সব বুঝলাম। আমি আপাতত অপরেশের নামে হাজার দশেক টাকার চেক লিখে দিচ্ছি। নীরদবরণ বলেছিলেন।

—হাজার দশেক সে তো অনেক টাকা?—সমরেশ একবার যেন বলতে চেয়েছিল;—তিনশো লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে অতো টাকা কি লাগবে? একবার দাদাকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়?

—অপরেশকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। টাকাপয়সা নিয়ে হিসেব করার মতো মনের অবস্থা তার এখন নয়। আর অত হিসেবেরই বা কী আছে? এ বাড়ি থেকে সুবুর বিয়ে হচ্ছে বলে অনেক খরচই আমার বেঁচে যাচ্ছে। সেদিক থেকে দশ হাজার টাকা কিছু নয়। মোট যা খরচ হবে তার কমই। পরে হিসেব নিকেশ করে সেই টাকা আমার মিটিয়ে দেওয়া উচিত। তা আমি দেবও। তোমরা আর আপত্তি কোরো না। টাইম ইজ রানিং ভেরি ফাস্ট। সন্ধে সাতটাতে বিয়ের লগন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সব করে ফেলতে হবে। আচ্ছা পুরোহিতের এ বিয়েতে কোনও আপত্তি নেই তো?

—নাহ কোনও আপত্তি নেই।—ত্রিদিবেশ জানিয়েছিল।...পুরোহিত বলেছেন আমার মন্ত্র পড়ে বিয়ে দেওয়ার কথা। আমি তাই করব। যে মেয়েটির সঙ্গে অপর্ণার জন্যে ঠিক হওয়া পাত্রের বিয়ে হবে সেও তো ব্রাহ্মণ? পুরোহিত মশাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। শুভ্রাকে ব্রাহ্মণ

জেনে তিনি কোনও আপত্তি করেননি।

—তা বেশ বেশ।—নীরদবরণ দশ হাজার টাকার চেক কেটে সমরেশের হাতে দিয়েছিলেন।

অপরেশ যে সত্যিই প্রকৃত বন্ধুবৎসল এবং উদার মনের মানুষ তা আবার নীরদবরণ বুঝেছিলেন, যখন তিনি দেখলেন নিজের মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে গড়িয়ে রাখা যায়না অপরেশ নির্দ্বিধায় শুভ্রাকে উপহার দিলেন। আর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সুপর্ণা সেই গয়না একে একে নিজে হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন শুভ্রাকে। সেই গয়নার ভার এবং বৈচিত্র্যও নেহাত কম নয়। শুভ্রার মাথায় উঠেছিল সেই সোনার মুকুট যা তাকে গতকাল খেলাচ্ছলে রত্না পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—বাহ কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে! শুভ্রার ওপর-হাতে শোভা পাচ্ছিল তাগা, অনন্ত, কৃষ্ণচূড়া আর্মলেট, মানতাসা। আর নীচের হাতে সোনার চুড়ি, বাউটি, ব্রেসলেট, রতনচূড়, কঙ্কন। সুপর্ণা শুভ্রার গলায় একটা একটা করে পরিয়েছিলেন, চিক্ নেকলেস, সীতাহার, মফচেন, পাটিহার, সাতনরী হার। কোমরে রুপোর বন্ধনী। আর পায়ে রুপোর চরণ পদ্ম। সেইসব মহামূল্য অলঙ্কারে শোভিত হয়ে শুভ্রা যখন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল তখন নীরদবরণের মতো আবেগসংযত মানুষও চমকে উঠেছিলেন। দশভুজা দুর্গা কিংবা কোনও রানির মতো দেখাচ্ছিল শুভ্রাকে। ক্ষীর্ণভাবে একবার যেন ক্লিওপেট্রার কথাও মনে এসেছিল নীরদবরণের। শেক্সপিয়রের ক্লিওপেট্রা। তারপরই মনে হয়েছিল ক্লিওপেট্রা ছিল শ্যামবর্ণা। শুভ্রা তো তা নয়। নিজের দুধবরণ রূপের বিভা অলঙ্কাররাশির চোখ-ধাঁধানো আলোর সঙ্গে মিলে-মিশে যেন শুভ্রাকে সত্যিই ভুবনমনোমোহিনী করে তুলেছিল। এই শুভ্রাকে চেনেন না নীরদবরণ। এ তাঁর 'সুবু' নয়। রূপকথার কল্পনাস্নিগ্ধ জগত থেকে মর্ত্যপৃথিবীতে নেমে আসা কোনও জাদুকরী যার রূপোর আগুনে যুগে যুগে পুরুষেরা অসহায় পতঙ্গের মতো জ্বলেপুড়ে মরেছে। মনীশের ভাগ্যকে মনে মনে তারিফ করেছিলেন নীরদবরণ।

বিয়ের আসরে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, মেয়েদের উলুধ্বনি, শুভদৃষ্টির মুহূর্তে নাপিত আর নাপতানির মজার মজার ছড়া কাটা, নিমন্ত্রিতদের হাপুস-হুপুস খাওয়ার আশ্চর্য শব্দে বিয়েবাড়ি সত্যিই বেশ জমে উঠেছিল। খাদ্যবস্তুর তালিকাও কম দীর্ঘ ছিল না। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে ভোজবাড়িতে লুচি খাওয়ার চল তখনও তেমন হয়নি। কলকাতার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতেরা লুচি-মণ্ডার স্বাদ পেলেও গাঁয়ে গঞ্জে ভাতের ব্যবস্থাই করা হত। অল্প সময়ের মধ্যে সেদিন কাটোয়ার দক্ষ হালুইকরের নিমন্ত্রিতদের জন্যে রান্না করতে পেরেছিল—ভাত, সোনা (ভাজা) মুগের ডাল, ছ্যাঁচড়া, পটলের দোলমা, ছানার ডানলা, মাছের কালিয়া। আর মিষ্টি ছিল বোঁদে, লেডিকেনি আর কাটোয়ার বিখ্যাত দই। মাটিতে চাটাইয়ের আসন পেতে সামিয়ানার নীচে একসঙ্গে একশো দশ জন নিমন্ত্রিতের বসার ব্যবস্থা ছিল। ভাত ও তরি-তরকারি দেওয়া হয়েছিল কলাপাতায়। আর মাটির সরাতে মিষ্টান্ন। মাটির খুরিতে দই। খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিল নিমন্ত্রিতেরা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল নীরদবরণের। তিনি ভাবতেই পারছিলেন না, এরকম নির্বিঘ্নে, আকস্মিকভাবে, সুবু-র বিয়েটা দেওয়া সম্ভব হবে। শুধু একটাই কাঁটা মনের মধ্যে বার বার খচখচ্ করছিল। এরকম আনন্দের আসরে যূথিকা নেই, সুবু-র মা, বাবা, মামারা, মাসি মেশোমশাই কেউ নেই। বিয়ের পিঁড়িতে সুবুকে যে কী অপরূপ দেখতে লাগছে তা ওদের কেউ দেখতেই পেল না।...তাতে কী হয়েছে? মেমারিতে বউ-ভাতে সবাইকে নিয়ে যাবেন নীরদবরণ। সবাইকে নিয়ে যাবেন? আজ শুক্রবার। কাল বাদে পরশু সুবুর বৌভাত। এত দ্রুত কি সকলকে নিয়ে সুদূর ঝালদা থেকে বিশ্বদেবের হওড়ায় পৌঁছনো সম্ভব? আজ সতীশবাবুদের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর নীরদবরণ আবার থানায় দৌড়েছিলেন। আবার খাতির পেয়েছিলেন দারোগা মহিম হালদারের। যদিও সে অপর্ণার কোনও খোঁজ আনতে পারেনি বলে একটু কুণ্ঠিত হয়ে ছিল। ওসব প্রসঙ্গ

তোলার কথা মনে হয়নি নীরদবরণের। তখন আর তাঁর কাছে ব্যাপারটা প্রাসঙ্গিকও ছিল না তেমন। তিনি থানা থেকে ফোন করতে চেয়েছিলেন যূথিকাকে। হাওড়াতে বাড়ির ফোনে যোগাযোগ হল না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। আর সুদূর ঝালদায় বিশ্বদেবের সঙ্গে এই মফস্বল থেকে ফোনে যোগাযোগ করা যে সম্ভবই নয় তা প্রথমে মনে হয়নি নীরদবরণের। মহিম হালদারের কথা শুনে মনে হয়েছিল।

—বেস্ট হল গিয়ে স্যার ঝালদাতে একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া; অ্যাড্রেস আচে তো?—মহিম হালদারের প্রশ্নে নীরদবরণ ঘাড় নেড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সর্বদা একটা নোটবই থাকে। তাতে রাজ্যের ঠিকানা ও ফোন-নম্বর।

অগত্যা কাটোয়া সাব-পোস্ট অফিস থেকে বিশ্বদেবকে একটা টেলিগ্রামই করেছিলেন নীরদবরণ। তার ভাষা হল এরকম—সুবু ইওর ডটার গোয়িং টু বি ম্যারেড, মাই অ্যারেজমেন্ট, নো ওরিজ, অল ওকে. কাম শার্প।

বাসরঘরে মেয়েরা আমোদের আসর বসিয়ে দিয়েছিল। সবথেকে উৎসাহ ত্রিদিবেশের স্ত্রী রত্নার। নানারকম ছল-চাতুরি করে সে ঠকাতে চাইছিল মনীশকে। সকলের সামনে, বিশেষত সুবেশা মেয়েদের উপস্থিতিতে অপদস্থ করতে চাইছিল তাকে। বিয়েবাড়িতে এরকম মজা আগে হত, এখনও হয়। নিজে হাতে মিষ্টি আর জল নিয়ে এল রত্না জামাইয়ের জন্যে। প্লেটে চারটে রসগোল্লা আর ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে জল। মিষ্টির প্লেট সে বাড়িয়ে দিল মনীশের দিকে।

—জামাই খেয়ে নাও ভাই।...মনীশ ভালভাবে তাকাল প্লেটের দিকে। তারপর মুচকি হেসে বলেছিল—খিদে নেই। খাব না।

—ওমা সেকি? সেই কখন বিকেলে কী খেয়েছে না খেয়েছ। এতক্ষণ ধরে বরের বেশে বিয়ের আসরে বসে থাকতে হল। খিদে পায়নি?

—তা খিদে তো একটু পেয়েছে।—মুচকি হাসল আবার মনীশ। তারপর বলল—খিদে পেলেও মাটির রসগোল্লা তো আর খাওয়া যায় না? জামাইয়ের বুদ্ধি দেখে রত্না তো বটেই, উপস্থিত মহিলাবাও চমৎকৃত। রত্না বলল—কী করে বুঝলে মাটির রসগোল্লা?

মনীশ বলল—না বোঝার কী আছে দিদি? মাটির মিষ্টিগুলো দেখতে সত্যিকারের রসগোল্লার মতো এটা ঠিকই। কিন্তু তাই বলে রসগোল্লায় রসের ছিটে ফোঁটা থাকবে না এটা কেমন? যে প্লেটে ওগুলো আনলেন সেটা তো শুকনো খটখট করছে। এরকম হতে পারে? রসগোল্লার প্লেটে একটু রস থাকবেই।

—বাব্বা! এতো দেকচি দারুণ বুদ্ধি!—কে একজন বলেছিল। রত্না বলেছিল—হবে না? বুদ্ধি না থাকলে কি আর ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়?

এরকম আরও কত কথা, রগড়, হাসি-ঠাট্টা যে চলছিল। শুভ্রার তেমন ভাল লাগছিল না। বরং ওরকম কালো একটা লোকের পাশে অলঙ্কারে আর বেনারসীতে নিজেকে আগাগোড়া মুড়ে ঠায় বসে থাকতে কীরকম বোকা-বোকা লাগছিল। খুব রাগ হচ্ছিল তার দাদুর ওপর। কত রঙিন স্বপ্ন ছিল শুভ্রার নিজের পুরুষ সম্বন্ধে। এসব নিয়ে সে তেমন ভাবত না এটা ঠিক। কিন্তু মনে মনে এই বাসনা তো ছিল যে, তার সঙ্গে যার বিয়ে হবে তাকে দেখতে হবে অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরার মতো কিংবা 'দ্য টেমপেস্ট' নাটকের রাজপুত্তুর ফার্দিনান্দের মতো। মনীশ নামের কুৎসিত লোকটার মেয়েদের পটানোর বেশ ভাল গুণই আছে। এরকম মনে হয়েছিল শুভ্রার। বেশ চালাক-চালাক কথা বলতে পারে। এমন কথা যাতে মেয়েরা না হেসে পারে না। একেবারে কলির কেষ্টঠাকুর। নাহ্, মনীশকে পছন্দ হয়নি। বাসরঘরের ভিড়ের মাঝে বসে গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল তার। এ তার কী সর্বনাশ করল দাদু? কী ভয়ানক সর্বনাশ! এই লোকটার সঙ্গে

সারাজীবন তাকে ঘর করতে হবে? যাকে সে মনে মনে পছন্দ করে না; যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না; যে তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তাকে সারাজীবনের সঙ্গী করে থাকতে হবে? এ কি সম্ভব নাকি? শুভ্রার মনে হচ্ছিল, সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কিংবা সকলের চোখকে অগ্রাহ্য করে দাদুর কাছে গিয়ে কেঁদে বলে ওঠে—আমার এত বড সর্বনাশ কোরো না দাদু! ঐ আফ্রিকার অসভ্য লোকেদের মতো দেখতে লোকটার সঙ্গে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। তুমি সিদ্ধান্ত বদলাও দাদু। আমাকে মুক্তি দাও। আমি কোনওদিন তোমার কথার অবাধ্য হইনি। আমি কোনওদিন তোমাকে অশ্রদ্ধা করিনি দাদু। তাহলে কেন তুমি আমাকে এভাবে দূরে ঠেলে দিচ্ছ? কোথায় কোন্ গাঁয়ের বাড়িতে এই লোকটার সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে। আমার বাবা জানল না, মা জানল না, দিদিমা জানল না, কেউ জানল না, কোনও আত্মীয়স্বজন দাঁড়াল না, আমার বিয়েতে। এরকম বিয়ে দেবার কী দরকার ছিল দাদু? এ বিয়েতে আমি সুখী হতে পারব না। এই লোকটার সঙ্গে থাকতে আমার একটু ও ভাল লাগবে না।...

সকলের মাঝে চুপচাপ বসে কথাগুলো শুধু ভেবেই গেছে শুভ্রা। বলতে পারেনি। কীভাবে বলবে? বিয়েবাড়ির ভিড়ে দাদুকে সে তো একা পায়নি আর। সেই যে নীরদবরণ বিকেলের দিকে কড়া গলায় নাতনিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, বিয়ের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবার তিনিই নেবেন। তারপর থেকে আর একটিবারের জন্যেও দাদুকে একা পায়নি। কাছাকাছিও পায়নি। দূর থেকে সে দেখেছে নীরদবরণ সন্ধের পর কোট-প্যান্ট চাপিয়ে, রীতিমতো সাহেব সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বাড়িতে। একবার একতলায় যাচ্ছেন। আবার দোতলাতে উঠে আসছেন। কোনও সময়েই তিনি একা নন। তাঁর পাশে পাশে হাঁটছে ত্রিদিবেশ না হয় সমরেশ। মুখ গম্ভীর নীরদবরণের। কপালে চিন্তার ভাঁজ। দূর থেকে দাদুকে লক্ষ্য করে, তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় বর্ষার আকাশে কালো মেঘের মতো গাঢ় অভিমানে ছেয়ে এল শুভ্রার মনের আকাশ। সকলের অলক্ষ্যে একটু কেঁদেও নিয়েছিল সে। তারপর তো সেজেগুজে বিয়ের কনে হয়ে ছাদনাতলায় যেতে হয়েছিল তাকে।

ক্রমে রাত গভীর হলে বাসরঘরের ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল। সারা বাড়িও ক্রমশ নিঝুম হয়ে এল। একতলার বাসরঘরে শুধু শুভ্রা আর মনীশ নিতান্ত বেকুবের মতো বসে ছিল। ঘন ঘন হাই তুলছিল শুভ্রা। বাসঘরঘর বলে কথা। রেড়ির তেলের প্রদীপের বদলে গ্যাসের বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শুভ্রার ঘুম পাচ্ছিল। ঘর অন্ধকার হলেই বোধহয় তার স্বস্তি হত। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। অন্ধকার ঘরে মুশকো এবং কালো এই 'কলির-কেষ্টর' সঙ্গে থাকার কথা ভাবলেই ভয়ে তার গা শিউরে উঠল। ঘুমের কথা ভুলে অনেকক্ষণ গ্যাঁট হয়ে বসে রইল শুভ্রা! তারপর আর পারল না। একসময় লজ্জার মাথা খেয়ে একটা ভেলভেটের ওয়াড় পরানো তাকিয়া টেনে নিয়ে তাতে মাথা দিয়ে লম্বা হল। মনীশ হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠেছিল। সে শুভ্রাকে বলেছিল—ঘুম পেয়েছে? তা ঘুমের আর দোষ কী? সারাদিন যা ধকল যাচ্ছে শরীর আর মনের ওপর দিয়ে। এহে একটা বালিশ হলে ভাল হত। তাকিয়া বেঁকে আছে। ঠিক করে নাও। এই কথা বলে মনীশ হাত বাড়িয়ে সোজা করে দিতে গেল তাকিয়াটা। তাতে তার হাত, এক মুহূর্তের জন্যে স্পর্শ করল শুভ্রার চন্দন চর্চিত গাল। এটা মনীশের ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু শুভ্রার প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম। সে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখ পাকিয়ে মনীশকে বলেছিল—এভাবে কোনও না কোনও ছুতোয় আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।....মনীশ ফর্সা হলে বোঝা যেত, সে যথেষ্ট অপমানিত হয়েছে। কিন্তু গাঢ় কালো বলেই তার মুখে তেমন ভাবান্তর ফুটে উঠল না। অপ্রস্তুত হয়ে মনীশ বলল—এই যাহ এসব কী বলচ? তুমি তো আমার নিজের।

তোমার কাছে ছল-চাতুরি করব কেন? শুভ্রার মনে হল, মনীশ তার প্রতি স্বামীর অধিকার ফলাতে চাইছে।

সে বলেছিল—আমাকে একদম বিরক্ত করবেন না আপনি! একেবারেই না!

মনীশ আর কিছু বলেনি। নিজেও একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েছিল।

হাইওয়ে ধরে, দুপাশে মাইল মাইল বিস্তৃত ধানজমিকে পেছনে ফেলে দুটো গাড়িই বেশ জোরে ছুটছিল। শুভ্রা ক্লান্ত চোখে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। তার আর মনীশের মাঝখানে চলন্ত গাড়িতে পিন্টু। গভীর ঘুমে মগ্ন ছোঁড়াটা। তাকে নিজের দিকে টেনে রেখেছে মনীশ। যাতে তার মাথা ঘুমের অজান্তে শুভ্রার কাঁধে বা বুকে গিয়ে না পড়ে। গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। উঃ রাস্তা কি শেষ হবে না? একসময় মনীশও সিটে এলিয়ে বসে, ঘুমোতে, লাগল। তার নাক ডাকছে মৃদুভাবে ফরফর। গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে মনীশের নাসিকাগর্জন শুভ্রার কানে আসছিল। শুভ্রা তাকাল। দেখল লালার একটা সুতো নিঃশব্দে মনীশের ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে আসছে। ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠল শুভ্রার।

চল্লিশ

কাটোয়া থেকে গাড়িতে কলকাতায় ফিরছেন নীরদববণ। একা। মনে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। সতীশবাবুরা তাদের নতুন বউকে নিয়ে অপরেশের বাড়ি থেকে রওনা দিতে চেয়েছিলেন সকাল সকাল। কারণ কাটোয়া থেকে মেমারি হল পাকা সড়কে গাড়িতে চড়ে প্রায় দু-ঘন্টার রাস্তা। জুন মাস। তীব্র গরম যেমন। তেমনই বর্ষাও আসব আসব করে মাঝে মাঝে জানান দিচ্ছে। হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাবে। সূর্য সেই কালো মেঘের দুর্গেব কোন দুরূহ প্রকোষ্ঠ লুকিয়ে পড়বে কে জানে। তারপর আকাশ ডাকবে এবং বৃষ্টিপাত শুরু হবে। গতরাতে অপ্রত্যাশিতভাবে কাটোয়াতে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখন অবশ্য গভীর রাত। বিয়েবাড়ির আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ। নিমন্ত্রিতেরা চলে গেছে। হালুইকরেরা পাওনাগন্ডা বুঝে নিয়ে বাড়ির রাস্তা ধরেছে। বাসরঘরের গতানুগতিক হইচই থেমে গেছে। অপরেশের বাড়িটা আবার নিঝুম হয়ে পড়েছিল। সেই সময় আকাশ কাঁপিয়ে, মেঘের গুড়গুড় গর্জনসহ ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল। বেশ অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। তখন সতীশ আর নীরদবরণ দোতলার বারান্দার দক্ষিণ দিকের যে ঘরে নীরদবরণের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে মুখোমুখি বসেছিলেন। ঘরে যে চওড়া টেবিলটা আছে সেখানে বসানো ছিল টিমটিম করে জ্বলতে থাকা একটা হেরিকেন। আর টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসেছিলেন নীরদবরণ আর সতীশ। সতীশবাবুর সঙ্গী নারান তখন একতলার ঘরে বিছানায় লম্বা দিয়েছেন। সারাদিন পরিশ্রম তো কম হয়নি। মনীশের বিয়ের অনুষ্ঠানও শেষ। সুতরাং তিনি বিছানায় শুয়ে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন। সতীশ আর নীরদবরণ প্রায়ান্ধকারে মুখোমুখি বসে কী কথা বলছিলেন? তেমন গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা কিছু নয়। ঐ যা মনে আসছিল মাঝে মাঝে। যাকে বলে বিশ্রম্ভালাপ। সতীশ—জীবনে সত্যিই বিচিত্র অনেক কিছু ঘটে তা আমি শুনিচি অনেকবার। বিশ্বাস করারব দরকা মনে করিনি মশায়। আজ বিশ্বেস হল...

নীরদবরণ—কী বিশ্বাস হল আপনার?

—যে, জীবনে অনেককিছু ঘটে যার ওপর মানুষের হাত থাকে না।

—আপনি ঠিকই বলেছেন,—নীরদবরণ একমত হলেন;—দি এসেন্স অব লাইফ লাইজ ইন আনসার টেনটিটিস....। পাইপ জ্বালিয়ে নিয়েছিলেন নীরদবরণ। কড়া তামাকের গন্ধ ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

—ইংরিজিতে যা বললেন তার মানে কী মশায়? মুখ্যসুখ্যু লোক। ব্যবসা করে খাই। লেখাপড়া তেমন হয়নি।...বলতে লজ্জা হয়। তবে আপনার কাছে আর লজ্জা কী? আত্মীয়তা তো হয়েই গেল।....এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করতে পারিনি। তাও চালিয়ে তো গেলুম।

—আরে লেখাপড়া বেশি শিখলে বড় বড় ডিগ্রি থাকলেই কি মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়? আপনি নিজে খুব এডুকেটেড না হতে পারেন কিন্তু ছেলেকে তো খুবই এডুকেশন দিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার তো আর আজকাল ঘরে ঘরে জন্মায় না।...ইংরেজিতে আমি যা বললাম ওটা আমার কথা নয়। একজন সাহেবের কথা। সেই সাহেবের নাম হল রয় এমার্সন। কথাটার মানে হল, অনিশ্চয়তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জীবনের নির্যাস অর্থাৎ মজা। আপনি যেমন বললেন আমিও তার সঙ্গে একমত। গতকাল যখন বাড়ি থেকে নাতনিকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তখনও কি জানি যে হঠাৎ এরকম সব ওলোট পালোট হয়ে যাবে?

—নিজের মেয়ের মতন নাতনিকে ভালবাসেন—তাই না?

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কী হয় জানেন তো? ও যে নাতনি, মানে আমার মেয়ের মেয়ে এ কথাটা মনেই থাকে না। মনে হয় ও মেয়েই। সেভাবেই একেবারে নিজের মতো করে সুবু-কে মানুষ করেছি আমি।

—একটা কতা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবেন?

—কী কথা?—নীরদবরণ সতর্ক হলেন।

—আমার নতুন বউ-মণি, শুভ্রা-মা আপনার কাছে মানুষ হল কেন? ...মানে ওর বাবা-মায়ের কাছেই তো মেয়ের থাকার কতা...।

—শুনুন সতীশবাবু—নীরদবরণ গলা ঝেড়ে নিলেন। পাইপে টান দিলেন। ধোঁয়া বের হতে লাগল্ গলগল করে।—আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। সুবু-র বাবা বিশ্বদেব সাহেবদের গালা-ফ্যাক্টারিতে চাকরিটা খারাপ করে না। অ্যাকাউন্টস-বাবুর চাকরি। বুঝতেই পারছেন? স্যালারি যে খুব খারাপ কিছু তা নয়। নিজের সংসার সে ভালই মেনটেন করতে পারে। বিশ্বদেব নিজেও খুব হিসেবি। তার ওপর কলকাতার বাইরে সেই মানভূমে পড়ে থাকে। ওখানে কস্ট অব লিভিং অনেক কম। সাহেবদের কুঠি যে এরিয়ায় সেখানেই থাকে। সাহেবদের সঙ্গে থাকার সুযোগ-সুবিধা কিছু আছে। ওরা একদিকে যেমন বেনিয়ার জাত, অন্যদিকে তেমন আবার উদার—জেনেরাস। সুতরা ব্যাপারটা এরকম নয় যে, বিশ্বদেবের সংসারে অভাব আছে বলে তার বড়মেয়েকে সে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।...নাহ দ্য ম্যাটার ইজ নট অ্যাট অল লাইক দ্যাট। বরং বলতে পারেন ঠিক তার উলটো....জাস্ট দি অপোজিট। থামলেন নীরদবরণ। পাইপটা নিভে গিয়েছিল। ঠোঁট থেকে খুলে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। আর স্মোক করবেন না। সতীশ ধূমপান করেন না। কিন্তু পান চিবোন ঘনঘন। পানের রসে সর্বদা তার ঠোঁটদুটো লাল হয়ে থাকে। এখনও আছে। আজ আবার বিয়েবাড়িতে ত্রিদিবেশ সতীশবাবুর জন্যে মিঠা জরদা-পাতি দিয়ে স্পেশ্যাল পান বানিয়ে এনেছে বেশ গোটাকতক। কচ্‌কচ্ পান চিবোচ্ছিলেন সতীশ।

—যা বলছিলাম—নীরদবরণ আবার শুরু করলেন;—ব্যাপারটা ঠিক অপোজিট। আমার বড় নাতনিকে আমি নিজেই জোর করে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। নিজের হাতে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। দু-পাতা ইংরিজি পড়তে পারে ও। ইংরিজিতে কথাও বলতে পারে একটু-আধটু।

এখন আপনার সংসারে সেটা ওর ডিসকোয়ালাফিকেশান হবে কি না বলতে পারব না।

—আমার মেমারির বাড়িতে পড়াশোনার যে খুব একটা চল আছে তা বলব না। আবার দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আর এক ছেলে। ও যে পড়াশোনাতে অত ভাল হবে, কলকাতার কলেজে পড়তে পারবে তা তো আর আগে বুঝিনি। অত আশাও করিনি। আমার পরিবার সাঁরাদিন সংসার নিয়েই থাকে। আমাদের গরু আছে চারটে। জমিজমা আছে। হেঁসেলের কাজ। এসব দেখাশোনা করতেই সেই মহিলার সময় চলে যায়। বই পত্তর যে খুব একটা আছে আমার বাড়িতে তা আমি বলব না। অনেকদিন আগে আমি প্রবাসী পত্রিকা রাখতুম বাড়িতে। এখন আর রাখি না। বড় শক্ত শক্ত সব লেকা থাকে মশায় ঐ পত্রিকাতে। দাঁত ফোটাতে পারি না। কে পড়বে এত শক্ত কাগজ? তাই আর রাখি না। আবার বাড়িতে বউ-মণির বোধহয় ঐ একটাই অসুবিধে হবে। বাড়িতে বইপত্তরের বড় অভাব।

—সেটা এমন কিছু অসুবিধা নয়। বইপত্তর ওর যা লাগে আমি সাপ্লাই দেব। কিন্তু একটাই অনুরোধ সতীশবাবু....

—হ্যাঁ বলুন?

—আমার নাতনির কোনও অনাদর হলে আমি কিন্তু খুব কষ্ট পাব। ছোটবেলা থেকে ও বড আদরে মানুষ।

—আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আমার বউ-মণিকে আমি রাজরানি করে রাখব।

—শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

এরকম কথাবার্তা যখন হচ্ছিল, তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে আকাশ ডেকেছিল কয়েকবার। গুড়গুড় গুড় গুড়। ঠাণ্ডা বাতাসও ধেয়ে এল খোলা জানলা দিয়ে। কখন যে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে এসেছিল তা খেয়াল হয়নি দুজনের কারোরই।

নীরদবরণ অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন—বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে? হোক। বড় গুমোট গরম পড়েছিল।

—হ্যাঁ বর্ষা তো আসল বলে...। কিন্তু বৃষ্টি হলে রাস্তাঘাট আবার কাদা হয়ে যাবে....।

—সে তো হবেই। আপনার তাতে কি খুব অসুবিধে?

—কাল সকালে ছেলে আর বউ-মণিকে নিয়ে ফিরতে হবে মোটরগাড়িতে। রাস্তা পেছল থাকলে গাড়িতে যেতে বড় ভয় মশায় আমার।

—কেন?

—আর বলেন কেন? একবার বর্ষাকালে মোটরগাড়িতে যাচ্ছিলুম একটা জায়গায়। সঙ্গে দুজন বন্ধু ছিল। রাস্তা পেছল থাকায় গাড়ি উল্টে গিয়েছিল রাস্তার ধারের ধানজমিতে।

—তাই নাকি? তারপর?

—আমার দুই বন্ধুর চোট ছিল বেশি; একজনের কপালে সাতটা সেলাই দিতে হয়েছিল। আর একজনের বাঁহাত ভেঙে ছিল।

—আর আপনার?

—আমার হাঁটুতে চোট লেগেছিল মশায়। সেই চোট এখনও পুরু সারেনি। দশ বছর হয়ে গেল,—সারেনি। আর সারবেও না মনে হয়। পুন্নিমে অমাবস্যা এলে বাতে খুব কষ্ট পাই। দেখবেন আমি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটি।

—তা আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? কাল সকালেও খুব বর্ষা হবে। গাড়িতে মেমারি ফিরতে অসুবিধে হবে?

—হ্যাঁ তাই ভাবছি মশায়...।

—আরে দুর! আপনি তো বড় নেগেটিভ চিন্তা করেন মশাই। অলওয়েজ থিংক পজিটিভ্।

বর্ষা সত্যিই বোধহয় এসে গেছে। আজ সকাল থেকেই আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। আর টিপটিপে বৃষ্টি। সতীশবাবুদের জন্যে দুটো মোটরের ব্যবস্থা করা হল। ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন নীরদবরণ। সতীশবাবু নিলেন না। শুভ্রা, মনীশ আর নিতবর পিন্টু একটা গাড়িতে চলল। আর তার ঠিক পেছনে আর একটা গাড়িতে চললেন সতীশবাবু আর নারানবাবু। বরযাত্রীরা কাটোয়া স্টেশন থেকে ভোরের ট্রেনেই মেমারি পাড়ি দিল। তারপর নীরদবরণও ঠিক করলেন তিনি ট্রেনে না গিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে হাওয়া ফিরবেন। এখন তিনি তাতেই যাচ্ছিলেন।

গাড়িতে যেতে যেতে ভাবছিলেন নীরদবরণ। বার বার একটা কথাই ভাবছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক হল? মনীশকে স্বামী হিসেবে পেয়ে, সতীশবাবুদের সংসারে কি সুবু নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে? সুখী হবে কি সুবু? সুখী হবে কি মনীশ?....সুবুর কথা ভেবে হঠাৎ খুব হাসি পেল নীরদবরণের। চলন্ত গাড়িতে বসে তিনি আপনমনে হাসলেন। মেয়ে বলে কীনা মনীশ কালো, তাই তাকে সে বিয়ে করবে না। কালো রং যাদের তাদের নাকি সে পছন্দ করে না। হা হা হা হা হা....! আপনমনে নীরদবরণ হাসছিলেন। ওরে বোকা মেয়ে! মানুষের গায়ের রংটাই কি সব? স্বামীর কাছে স্ত্রীর সুখ পাওয়ার নানা কারণ আছে। যে স্বামী তার নারীকে অর্থনৈতিক নির্ভরতা আর শারীরিক সুখ দিতে পারে, তার প্রতিই স্ত্রী সবথেকে বেশি অনুগত থাকে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এটা নীরদবরণ বুঝেছেন। মনীশদের পরিবার অত্যন্ত সচ্ছল। ধনী পরিবার বলা যায়। সেদিক থেকে সুবু বোধহয় তাব দাদুর কাছে যেমন ছিল, তার থেকেও বেশি সচ্ছলতার মধ্যে থাকবে। আর মনীশ কালো হতে পারে। কিন্তু তার শরীরের বাঁধুনি খুবই ভাল। রীতিমতো সক্ষম এবং বলিষ্ঠ পুরুষ মনীশ।... হা হা হা হা হা হা! বিয়ের পর কদিন কাটুক না। স্বামীকে ছেড়ে আর থাকতে চাইবে না সুবু। ঐ কালো মনীশই তখন মেয়েটার জীবনে কেষ্টঠাকুর হয়ে যাবে।

এরকম কত কথা ভাবতে ভাবতে নীরদবরণ বিকেল বেলা হাওড়াতে নিজের বাড়ির সামনে এসে পৌছলেন। গাড়ি থেকে নেমে চালকের ভাড়া মেটালেন। চালক যা চাইল তার থেকে দশ টাকা বেশি দিলেন। ছোকরার হাত ভাল। বেশ নির্বিঘ্নে এতটা রাস্তা নিয়ে এল। এতটা রাস্তা! কত আর ভাবতে ভাবতে আসবেন? মাঝে মাঝে ঘুম দিতেও হয়েছে নীরদবরণকে। রাস্তা যে খুব ভাল তা নয়। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা মাঝে মাঝেই পড়েছে। খানা-খন্দ ভর্তি। তা সত্ত্বেও কোথায়? এমন কিছু ঝাঁকুনি লাগেনি তো! ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

নীরদবরণ গট্‌গট্ করে দোতলাতে উঠে এলেন। যূথিকা তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁগো সুবু কোথায়?

—তার বিয়ে দিয়ে দিলাম। মেমারিতে। ভাল ঘর। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। সুবুর যে এত ভাল বিয়ে দিতে পারব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। যূথিকা!....ব্যস্ত হয়ো না। সব বলছি! আগে ধড়াচূড়ো ছাড়তে দাও। বিশ্রাম নিতে দাও। শরীরের ওপর খুব ধকল গেছে।

সুবুর বিয়ে হয়ে গেছে? নিজের কানকে যূথিকার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না! কার সঙ্গে বিয়ে হল? কবে ঠিক হল পাত্র? তার বাবা মা কিছু জানল না। ওমা কী কথা!....

প্রায় ঘন্টা তিন পরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে, মুখে পাইপ, নীরদবরণ সব বলছিলেন ওদের। ওরা মানে—স্ত্রী যূথিকা, আর তিন ছেলে—ক্ষীরোদবরণ, অসিতবরণ, এবং বারিদবরণ। সবাই উৎকর্ণ। সবাই বিস্মিত। সবাইয়ের মনে সংশয়—নীরদবরণের সিদ্ধান্ত সঠিক তো?...

একচল্লিশ

এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা? কোন্ অজ গাঁয়ে? এখানে তাকে থাকতে হবে সারাজীবন? দাদু তুমি কি করলে আমার! কেন এমন সর্বনাশ করলে? তোমাদেব সবাইকে ছেড়ে এরকম গ্রাম্য পরিবেশে অচেনা মানুষদের সঙ্গে আমি কীভাবে থাকব? কীভাবে? কান্নার একটা দমক ধাক্কা দিচ্ছিল চলন্ত মোটরগাড়িতে কনের বেশে বসে থাকা শুভ্রার গলার কাছে। তার মনে হচ্ছিল সে পারিপার্শ্বিক ভুলে, পাশে বরের বেশে এই লোকটাকে, মুখের লালায় টইটম্বুর হয়ে থাকা এই নিতবর ছোঁড়াকে আর লক্কা পায়রা চেহারার ঐ চালককে অগ্রাহ্য করে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বার বার শুভ্রার মনে হচ্ছিল, তাকে এরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এরা প্রত্যেকে খারাপ লোক, অপরাধী এক একজন। শুধু...শুধু পেছনের গাড়িতে ঐ বুড়ো লোকটা, যার নাম সতীশবাবু, সে ছাড়া। ঐ লোকটাকে দেখলে ইংরেজদের ভাষায় পুরোপুরি 'ডার্টি নিগার' বলে মনে হয় বটে। কিন্তু লোকটার প্রাণে দয়ামায়া আছে। অন্তত শুভ্রার সঙ্গে সে দেখা হওয়া ইস্তক ভাল ব্যবহার করে চলেছে। বেশ নরমভাবে তার সঙ্গে কথা বলেছে লোকটা সবরকম। তার রূপের প্রশংসা করেছে। স্বভাব-চরিত্রের প্রশংসা করেছে। তাকে 'বউ-মণি' বলে সম্বোধন করেছে। লোকটাকে দেখতে যাচ্ছেতাই। কালো কুচকুচে গায়ের রং। মাথায় সিঁথি কাটা কাঁচা পাকা চুল। নাকের নীচে বুরুশ গোঁফ। মাথায় খুব একটা লম্বা নয়। দাদুর থেকে সামান্য লম্বা। হাতদুটো রোগা-রোগা। কিন্তু ভুঁড়ি আছে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছে লোকটা। পেটের দিকে তাকালে মনে হয় পাঞ্জাবির নীচে একটা ঝুড়ি বসানো আছে। কিন্তু লোকটাকে দেখতে 'রাস্টিক' (ইংরেজি নভেল পড়া শুভ্রা 'rustic' শব্দটাই সতীশবাবু সম্বন্ধে ভেবেছিল) হলেও, ওকে খুব একটা খারাপ লাগেনি শুভ্রার। সতীশবাবুর কথা ভাবতে ভাবতেই শুভ্রার একবার চকিতে মনে হল, আচ্ছা ওঁর কাছে একবার অনুরোধ করলে কেমন হয়? কী অনুরোধ করবে শুভ্রা?....কী আবার,—লোকটাকে হাতজোড় করে বলবে—সতীশবাবু আমাকে দয়া করে মুক্তি দিন। হ্যাভ মারসি অন মি সতীশবাবু? আমাকে হাওড়ার কদমতলাতে আমার মামার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসুন। আমি আপনাদের বাড়িতে থাকতে পারব না। আপনার ছেলের সঙ্গে আমি থাকতে পারব না। ওকে আমি স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না। ওর দিকে তাকাতেই আমার ভাল লাগছে না। এত কালো একজন মানুষের সঙ্গে আমি শোয়া-বসা করতে পারব না। আপনি আমাকে দয়া করুন। আমাকে ছেড়ে দিন। মুক্তি দিন আমাকে। বিনিময়ে যা চাইবেন, আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আমার গায়ের এই গয়নাগুলো দিয়ে দেব।....এটুকু ভেবেই শুভ্রার মনে হল, এই গয়নাগুলো তার নিজের নয়। দাদুর নয়। দিদিমারও নয়। তার বাবাও তাকে এখনও কিছু দেয়নি। বাবা তো এখনও জানেও না যে, দাদু হঠাৎ একজন কালো, মুশকো চেহারার লোকের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছে। নাহ্, এই যে এত গয়না সে পরে আছে, হাত পা নাড়লেই আওয়াজ উঠছে ঝম্ ঝম্ ছম্ ছম্ ; এসব তার নয়। শুধু একটা হার, দুটো বালা কানের দুল, আর একটা আংটি ছাড়া। এই গয়নাগুলোর কিছু সে পরে এসেছিল। কিছু নিয়ে এসেছিল ট্রাংকে। বিয়েবাড়িতে পরবে বলে। বাকি সব গয়না তো অপরেশকাকুর মেয়ের। নিজের মেয়ের বিয়ের জন্যে যেসব গযনা বানিয়ে নিয়েছিলেন অপরেশ, সেগুলো তিনি তুলে দিয়েছেন শুভ্রার হাতে। দাদুর আপত্তি ধোপে টেকেনি। অপরেশ আর তাঁর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে জানিয়েছেন যে, যার কথা ভেবে ঐ গয়না সংগ্রহ করা সে যখন বাড়ি ছেড়ে চলেই গেল, তখন আর ঐ গয়না রেখে লাভ কী? শুভ্রাকে তিনি আশীর্বাদ করেছেন .সব মহামূল্য গযনা দিয়ে।

আবার পিন্টু বলে সেই বিচ্ছিরি ছোঁড়াটা ঢুলতে ঢুলতে শুভ্রার গায়ের ওপর ঢলে পড়েছে।

সেই হেড়ে মুন্ডটা প্রায় শুভ্রার নাকের কাছে। সেই বোঁটকা গন্ধটাও পাচ্ছে শুভ্রা। ভীষণ বিরক্তি হল তার। সে বাঁ হাতের কনুই দিয়ে জোরে এক গুঁতো মারল পিন্টুর কোমরের কাছে। 'কঁক্ক' করে অস্ফুট একটা আওয়াজ করল পিন্টু। তারপর সোজা হয়ে বসে চিল চিৎকার শুরু করে দিল—আঁ আঁ আঁ আঁ ! মনীশও রীতিমতো তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু পিন্টুর কর্কশ গলার আওয়াজ কানে যেতে তারও তন্দ্রাভাব কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে, সোজা হয়ে বসে সে একবার তাকাল শুভ্রার মুখের দিকে। কিন্তু শুভ্রার মুখ ভাবলেশহীন। সে কিছুই বুঝতে পারল না। তখন সে ক্রন্দনরত পিন্টুকেই জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হল—কী হল রে? এই পিন্টু! ওরকম চেল্লাচিস কেন?

—উঁ উঁ উঁ—পিন্টু কাঁদতে কাঁদতে বলল,—এই বউটা মহা পাজি! আমার পেটে কী জোর গুঁতো মারল!

—অ্যাই ওরকম বলতে নেই! গুরুজন হয় না? ও আবার কী কথা?

—বেশ করেছি। আমার পেটে গুঁতো মারবে কেন?

—এবার এক থাপ্পড় কষিয়ে দেব হারামজাদা ছেলে? মুখে মুখে চোপা করতে শিখেছিস?

পিন্টু মনীশের এক ধমকে কান্নার ভঙ্গি এবং দমক থামাল বটে, কিন্তু পুরোপুবি কান্না থামাল না। কেঁদেই যেতে লাগল উঁ উঁ উঁ করে। মনীশ এবার শুভ্রার দিকে তাকাল। যা গোমড়া মুখ করে বসে আছে বউ। কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। সাহসও হচ্ছে না বলা যায়। তবুও কথা তো বলতেই হবে। এভাবে বোবা হয়ে বসে থাকতেও তো ভাল লাগছে না। গতকাল থেকে শরীর আর মনের ওপর ধকল যাচ্ছে। ক্লান্তিকর মোটর জার্নি। তার ওপর শুভ্রার থমথমে মুখ। এবং পিন্টুর বিশ্রি কান্না। মনীশ সব মিলিয়ে রেগেও যেতে পারত। আর একবার রেগে গেলে মনীশের ঠাণ্ডা হতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু মনীশ চট করে রাগে না। তার মাথা সবসময় ঠাণ্ডা। প্রতিকূল পরিস্থিতিও বিবেচনা করে দেখা তার চরিত্রের একটা গুণ। তাই এখনও সে রাগল না। বরং কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে শুভ্রাকে জিজ্ঞেস করল—ছেলেটা কাঁদছে কেন বলো তো?

—আমি ওকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়েছি। তাই কাঁদছে।

—তুমি .....কনুইয়ের গুঁতো দিয়েছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি! ঘুমিয়ে আমার গায়ের ওপর যদি বারবার পড়ে তাহলে কী করবে মানুষ?—শুভ্রার উত্তর শুনে মনীশ হাসবে না রাগ করবে বুঝতে পারছিল না। যাকে সে ঘটনাচক্রে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, সে মেয়েটা সত্যিই ছেলেমানুষ। তা না হলে সরাসরি ওরকম নিজের দোষ স্বীকার করে! কিন্তু এই সামান্য অপরাধের জন্যে তো নিজের সদ্য বিয়ে করা বউকে ধমকানো যায় না। তাই মনীশ পিন্টুকেই ধমক দিল। বলল যে, সে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও 'লোকের গায়ে' পড়ছে কেন? নিজের দিকে পিন্টুকে আরও টেনে নিয়ে মনীশ চালককে জিজ্ঞেস করল—অনাদি আমরা কি এসে গেছি?

—হ্যাঁ ছোটকত্তা আর দু মাইল। আরও আগে আসতে পারতুম। কিন্তু গত রাতে কয়েক পশলা বিষ্টি হয়েছে তো! রাস্তায় জল কাদা। তাই বেশি স্পিড তো তুলতে পারছি না....।

—থাক থাক আর স্পিড তুলতে হবে না।—এই বলে মনীশ আড়মোড়া ভাঙল। তার ইচ্ছে হল সিগারেট ধরাতে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়েও নিজেকে থামিয়ে দিল মনীশ। পাশে গোমড়া মুখে যে নববধূটি বসে আছেন, তিনি আবার বাসরঘরে গতরাতেই জানিয়ে দিয়েছেন—"আমার সামনে সিগারেট খাবেন না। ধোঁয়া নাকে গেলে আমার অসুবিধে হয়।"...দুশ শালা! মনীশ মনে মনে বলল। বিয়েটা আলটপকা করে ফেলে এক ঝকমারি হল না তো? এত উদ্ধত মেয়ের সঙ্গে সে থাকবে কীভাবে? উঠতে বসতে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই

থাকবে। কে জানে বাবা কপালে কী আছে। আর শুভ্রা ভাবছিল, সতীশবাবুর পা ধরে অনুনয় করতে যাওয়া বৃথা। কারণ তার সঙ্গে এই লোকটার মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়ে গেছে। কী যেন বলে?....সাত পাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে দুজনকে। আর কি ছাড়াছাড়ি হওয়া সম্ভব? কান্না পাচ্ছিল ভীষণ। তবুও কাঁদল না শুভ্রা। শুধু শুধু চোখের জল ফেলে লাভ কী? তাতে নিজের অসহায়তাই জানিয়ে দেওয়া হয়। তার থেকে সে সুযোগের অপেক্ষাতে থাকবে। একবার যদি হাওড়াতে ফিরে যেতে পারে তারপর আর কেউ তাকে এতদূরে আর পাঠাতে পারবে না। কেউ না। পিন্টু কান্না থামিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে। চালক হঠাৎ নীরবতা ভেঙে বলে উঠল এই যে মেমারিতে ঢুকচি ছোটকত্তা...।

বিয়াল্লিশ

মেমারিতে পৌঁছে গেলেও গাড়ি যে থেমে গেল তা নয়। শুভ্রা তাই কিন্তু ভেবেছিল। যে, এবার বোধহয় নামতে হবে। তা আর হল কোথায়? গাড়ি ছুটছে তো ছুটছেই। গঞ্জ এলাকা পেরিয়ে গাড়ি হঠাৎ একটা ঝাঁকড়া বটগাছের গায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুভ্রা সামনের গাড়িতে বসেই বুঝতে পারছে পেছনের গাড়িও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাতে সতীশবাবুরা আছেন। এখানেই নামতে হবে নাকি? এখানে নেমে কোথায় যাবে? যেদিকে চোখ যায় ছড়িয়ে আছে ধানখেত। এখন বর্ষার সময় আসন্ন। তাই ধানক্ষেতে দল বেঁধে কাজ করছে চাষীরা। মাথার ওপর বিশাল এক আকাশ। ধূসর রং আকাশের। ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘের ছোট ছোট দল ভেসে বেড়াচ্ছে। মনীশ খুব নরম স্বরে বলল—এখানে নামতে হবে।

—এখানে? কোনও বাড়ি দেখতে পাচ্ছি না?—শুভ্রা গতকালের পর সম্ভবত এই প্রথম মনীশের মুখের দিকে একঝলক তাকিয়ে সরাসরি তাকে প্রশ্নটা করল।

—একটুখানি হাঁটতে হবে..., ভীষণ কুণ্ঠিতভাবে যেন বলল মনীশ,—ডানদিকের ঐ সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা হাঁটলেই আমাদের বাড়ি। সামনের ঐ আমবাগানটা পেরোলেই...। যে রাস্তাটার দিকে আঙুল দেখাল মনীশ, সেদিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল শুভ্রা। সরু মাটির রাস্তা। কিন্তু সেটাকে এখন ছিরছিরে বৃষ্টি হওয়ায় ফলে আর রাস্তা বলা যাবে কি? কাদায় ছত্রাখান হয়ে আছে সেই পায়ে চলার পথ। হাঁড়ির দই একেবারে তলানিতে এসে ঠেকলে যেমন ঘাঁটা-ঘাঁটা দেখতে হয়; বর্ষার জল পেয়ে এই পথের অবস্থাও তেমনই। সম্ভবত কাটোয়া থেকে মেমারিতে গত রাত থেকে বৃষ্টি বোধহয় বেশি হয়েছে। তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। এরকম সুন্দর এবং দামি একটা বেনারসী পরে ঐ কাদা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে কীভাবে? যদি আছাড় খেয়ে পড়ে? ও মাগো, একী গেঁয়োদের পাল্লায় পড়া গেল গো! ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল শুভ্রার। আর এরকম যখন তার মনের অবস্থা, ঠিক তখনই মনীশ গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কালো মুখে ঝকঝকে সাদা দাঁতের ঝিলিক ছড়িয়ে কাষ্ঠ হেসে আবার বলল—এসো...নামবে না?—আর মনীশের সেই বোকা-বোকা হাসি দেখেই পিত্তি যেন জ্বলে গেল শুভ্রার। সে মাথা ঝাঁকিয়ে রেগেমেগে বলল—আমি নামব না!

—নামবে না? সেকি?....

—এ রকম সেজেগুজে আমি কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে পারব না। আর তাছাড়া...

—কী তাছাড়া?—অবাক হয়ে মনীশ জিজ্ঞেস করল।

—ওরকম কাদার রাস্তা দিয়ে হাঁটা আমার হ্যাবিট নয়। আমি শহরের মেয়ে...কলকাতার।

শুভ্রার এই কথা উচ্চারিত হবার মুহূর্তে সতীশ এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে নারানবাবুও সারা রাস্তা গাড়িতে আসতে বোধহয় ঘুম দিয়েছেন ভদ্রলোক। চোখমুখ ফুলে আছে। ঘুমের স্বচ্ছ আঁশ যেন এখনও ঘুরছে ফিরছে নারাণের মুখের চারপাশে ইতস্তত। সতীশবাবু গাড়ির জানলায় মুখ রেখে ভেতরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা শুভ্রাকে বললেন—এবার যে নামতে হবে বউমণি। শুভ্রা মুখ গোঁজ করে বসেই রইল। ইতিমধ্যে মনীশ তার বাবাকে গাড়ি থেকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে কথা বলল। নারানও শুনলেন। শুভ্রা বুঝতেই পারল তার বিষয়েই আলোচনা হচ্ছে। এবং সে শুনতেও পেল। সতীশবাবু বেশ আক্ষেপের স্বরে বলছেন—বটেই তো বটেই তো! ঠিক কথা বলেছে আমাদের বউমণি। নতুন বউ শহরের মেয়ে বটে। খাস কলকাতার মেয়ে। সে যে এই কাদায় ভর্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না এটা আমাদের আগে ভাবা উচিত ছিল।....আসলে অপরেশবাবুর মেয়ে তো গাঁয়েই মানুষ। মনীশ তো বিয়ে করতে গিয়েছিল তাকেই। সুতরাং এসব নিয়ে আর ভাবা হয়নি। কিন্তু তারপর তো, সব রাতারাতি পালটে গেল কিনা! এখন আমাদের বৌমণি কলকাতার মেয়ে। সে কাদার ওপর দিয়ে কীভাবে হাঁটবে? কী করা যায় বাতলাও না—ও নারান?...নারাণবাবু গ্রাম্য স্কুল-শিক্ষক। বিচক্ষণ মানুষ। তিনি বললেন—নতুন বউ-কে এভাবে গাড়িতে বসিয়ে রেখে রাস্তায় তর্ক-বির্তক করতে থাকা কি ঠিক হচ্ছে? একটু বাদেই সারা গাঁয়ের মানুষের কানে খবরটা পৌছবে। আর অমনি এখানে ভিড়ে ভিড়ে হয়ে যাবে। সে ভাই আর এক হ্যাপা হবে। তার থেকে......

—কী বলতেছ?—সতীশ প্রশ্ন করলেন।

—একটা পাল্কি-টাল্কির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? এখান থেকে তোমাদের বাড়ি তো আধ মাইলও নয়। নতুন বউ নাহয় পাল্কি করেই শ্বশুরবাড়ি গেল...?

—মন্দ বলনি নারাণ। ও মনীশ দেক দিকি একটা পাল্কির ব্যবস্থা করা যাবে?

—তাই যাই বাবা!—বলল মনীশ। চকিতে একবার গাড়িতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা বউয়ের দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল,—দ্যাখো তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে রাজি। শুধু তুমি ওরকম গোমড়া মুখে আর বসে থেকো না; একটু হাসো, একটু কথা কও....ও বউ কথা কও....। আর শুভ্রার বিগড়ে যাওয়া মন তাতে একটুও ভিজল না। সে মনে মনে বলল—যতই তুমি চেষ্টা করে যাও আমার মন পেতে, আমি গলব না। আমি তোমাকে স্বামী বলে মানতে পারব না। ভালবাসতে পারব না। আমার সব দিতে পারব না তোমাকে।....কালো কেলে মিনসে! তোমার ধান্দা আসলে একটাই। কতক্ষণে আমার মন ভিজিয়ে তুমি আমার সঙ্গে বিছানায় যাবে! আমার সব দেখবে...সেটা আমি বুঝিনি ভেবেছ?

মনীশ যখন যাবার জন্যে উদ্যত, পিন্টু বলল—আমি তোমার সঙ্গে পালকি ডাকতে যাই মামা?

—আয় না!

মনীশ আর পিন্টু কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে গাঁয়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে তা মোটরে বসেই দেখতে পেল শুভ্রা। তার হাসি পাচ্ছিল। কীরকম এক নিষ্ঠুর আনন্দে উব্‌চে উঠছিল মন। মনীশের পায়ে নতুন পাম্প শু। কিন্তু ঐ চকচকে জুতো পরে যে কাদা-রাস্তায় হাঁটা যাবে না এটা সে জানে। তাই জুতো জোড়া হাতে নিয়েছে। আর খাটো ধুতি আর টুইলের শার্ট পরনে পিন্টুর পায়ে তো জুতোই নেই। সে বেমালুম লাফাতে লাফাতে কাদার ওপর দিয়ে চলেছে।

হাইওয়ের ধারে মোটরগাড়ি থামিয়ে চালক কোথায় কেটে পড়েছে। বিড়ি-ফিড়ি ফুঁকতে গেছে বোধহয়। শুভ্রা যে চুপচাপ একা একা বসে নিজের ক্লান্তি আর অবসাদ অনুভব করবে আর নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেকেই ধিক্কার দেবে তার কি জো আছে? সতীশ এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। বিড়ি ধরিয়েছেন। সেই বিড়ির ধোঁয়া গাড়ির মধ্যে ধেয়ে এসে শুভ্রার নাকেও বিলি

কাটছিল। বিড়ির ধোঁয়া অসহ্য মনে হয় শুভ্রার। এইসব পাড়াগেঁয়ে মানুষগুলো কীভাবে যে এত নিশ্চিন্তে বিড়ি টানে! কী তীব্র উটকো গন্ধ বিড়ির! দাদুকে বরাবর চুরুট খেতে দেখেছে শুভ্রা। সিগারেটও নয়। চুরুট। একদিন একটা মোটা ইংরেজি বইয়ের পাতা খুলে একজন সাহেবের ছবি নাতনিকে দেখিয়েছিলেন নীরদবরণ। জিজ্ঞেস করেছিলেন কার ছবি। বলতে পারেনি শুভ্রা। নীরদবরণ জানিয়েছিলেন—সাহেবের নাম হল উইনস্টন চার্চিল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। চার্চিলের ঠোঁটেও ছিল চুরুট। দাদু বলেছিলেন—এক একজন বড় মানুষের এক একটা ট্রেড মার্ক থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথ টেগোরের আলখাল্লা আর দাড়ি। তেমনই চার্চিলের চুরুট।...আই অলসো স্মোক ওনলি চুরুট। যেন বেশ গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিলেন নীরদবরণ। কিন্তু দাদু এখন কত দূরে! এই মুহূর্তে গাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে সতীশ আবার খোশামোদের মিহি সুরে বলছিলেন—আহ আমার বউ-মণির মুখটা খিদে তেষ্টায় এতটুকু হয়ে গেছে গো! একটু ধৈর্য ধরো মা। খোকা এখনই পালকি নিয়ে আসছে। শুভ্রা কিছু বলল না। কী বলার আছে? যদিও তার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। সে তো কিছুটা শিক্ষিতা। দাদুর কাছ থেকে বরাবর ভাল শিক্ষাই পেয়ে এসেছে। কত উৎকৃষ্ট বাংলা এবং ইংরেজি বই পড়েছে। তার মনে হচ্ছিল একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সাবধানে কাদা রাস্তা দিয়ে সে হাঁটতে পারবে না? মনীশকে ছুটতে হবে পালকি আনতে? দাদু থাকলে রাম বকুনি দিত শুভ্রাকে। হাঁটতে বাধ্য করাত হয়তো। আসলে...আসলে ঐ কালো মুশকো মনীশকে সে সবথেকে বেশি অপছন্দ করে। ওকেই ভোগাতে চায়। তাই এরকম গোঁ ধরে বসে আছে। কেন বলতে পারবে না শুভ্রা, ঐ লোকটাকে দেখলেই তার গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে। লোকটা নাকি আবার শিক্ষিত। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। সে যাই পড়ুক যত শিক্ষিতই হোক শুভ্রা ওকে সহ্য করতে পারবে না। মেনে নিতে পারবে না স্বামী হিসেবে। নাহ... কিছুতেই না। যাকে দেখে চোখের তৃপ্তি হয় না, তার সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় শুতে পারবে না। এরকম একই কথা ভেবে যাচ্ছিল শুভ্রা। আর সতীশ একভাবে বকে যাচ্ছিল।

একসময় দূরে ঐ পায়ে চলা রাস্তার মাথায় মনীশকে দ্যাখা গেল। সে একা নয়। তার পেছনে অনেকে। বেশির ভাগই মহিলা। কিছু বাচ্চা ছেলে মেয়েও আছে। তাদের সকলের শরীরের ভাষাতে বেশ চঞ্চলতার ভাব। কিন্তু পালকি কোথায়? পালকির চিহ্ন নেই। খানিক বাদেই মনীশ গাড়ির কাছে এসে পৌঁছল। তার ধুতির পাড় কাদায় মাখামাখি। হাতের জুতোটা বোধহয় বাড়িতে রেখে এসেছে সে। দুটো পা কাদায় ভরা। তাকানো যায় না সেদিকে। তার পেছনে পিলপিল করে মহিলা আর বাচ্চাদের দল। সতীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কীরে পালকি?

—তুমি তো জানো বাবা আমাদের গাঁয়ে একটাই পালকি। তো সেই পালকি বেরিয়ে গেছে।

—কোথায় বেরল?

—পাশের গ্রামে। সেখেনেও বিয়েবাড়ির বায়না।

—সব্বোনাশ, এখন উপায়?

—উপায় আর কী? এখন তাহলে....। শুভ্রার দিকে একবার তাকিয়ে থেমে গেল মনীশ। যেন সে বলতে চেয়েছিল যে, এবার তার বউ না হয় তার কাঁধেই চড়ে শ্বশুরবাড়ির দরজাতে গিয়ে হাজির হোক। নেহাত বাবার কানে সে ধরনের কথা অশালীন শোনাবে তাই বোধহয় মনীশ নিজেকে সংযত করে নিল।

ইতিমধ্যে আর এক কান্ড হল। মহিলাদের দল হামলে পড়ল গাড়ির জানলাতে বউ-এর মুখ দেখবে বলে। নানারকম মন্তব্য কানে আসছিল শুভ্রার। সবগুলোই আসলে যেন প্রশংসাসূচক।...ওমা এতো সাক্ষাৎ পতিমে!...হাই মেয়ের গায়ের রং দ্যাখো গো!... এরকম পরের পর মন্তব্য। গেঁয়ো মেয়েদের মুখে বিচিত্র সব রগড়ের কথা শুনতে শুনতে শুভ্রার একসময় বিরক্তি ধরে গেল।

গাড়ির দরজা খুলে বাইরে নেমে এসে সতীশবাবুর দিকে তাকিয়ে শুভ্রা বলল—পালকি নেই তো কী হয়েছে? আমি ঐ কাদার মধ্যেই হাঁটব...।

তেতাল্লিশ

সকলকে রীতিমতো অবাক করে শুভ্রা কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। তার পাশে হাঁটছে মনীশ, বেশ সতর্কভাবে। শুভ্রার যে তা পছন্দের নয়, সেটা তার ভ্রুকুটি দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু মনীশ বোধহয় এখন আর স্ত্রীর অপছন্দ কিংবা বিরক্তি গায়ে মাখছে না। কাদার মধ্যে নিজের দুই পা ফেলে ফেলে শুভ্রার চলার ধরণ দেখেই তার ভয় হচ্ছিল, যে কোনও সময় স্ত্রী সকলের চোখের সামনে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। বকলশ দেওয়া যে জুতোজোড়া শুভ্রার পায়ে ছিল, সে তা খুলে নিয়ে হাতে ঝুলিয়েছে। সতীশ একবার জুতোজোড়া ভদ্রতাবশত যথেষ্ট ইতস্তত করে 'বউ-মণি'-র হাত থেকে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুভ্রা তা অবশ্যই হতে দেয়নি। শ্বশুরকে দিয়ে জুতো বওয়াবে এরকম ধৃষ্টতা অন্তত শুভ্রার নেই। বরং মনীশ যদি তার জুতো বইতে চাইত, সে হয়তো দিয়েই দিত। আফ্রিকার কালো মানুষদের মতো দেখতে ঐ লোকটাকে দিয়ে জুতো বয়ানোই উচিত। কিন্তু মনীশ সেদিকে কোনও আগ্রহই দেখাল না। শুভ্রা ঠিকই বুঝেছে মনীশকে। ছুতোয় নাতায় শুধু মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার ধান্দা। এদিকে তালে ঠিক। বরং সতীশের প্রতি সত্যিই শুভ্রা কৃতজ্ঞতা বোধ করল। এই বৃদ্ধের প্রাণে প্রকৃতই মায়াদয়া আছে। তিনি মানুষকে কাছে টেনে নিতে জানেন।

কাদাময় রাস্তা ধরে এক মিছিল বা শোভাযাত্রা যাচ্ছিল যেন। সকলের আগে শুভ্রা। তার পাশে মনীশ। খানিক তফাতে সতীশ আর নারান। আর তাদের পেছনে মনীশের জ্ঞাতিগুষ্টিদের দেখা যাচ্ছে। ওদের গেঁয়ো চোখ শুভ্রা-দর্শনে সত্যিই বিহ্বল। নতুন বউ তো সাক্ষাৎ প্রতিমে! আহা কী গড়ন! কী অপরূপ মুখশ্রী! তবে বউ বড় দেমাকি। অহঙ্কারে যেন মাটিতে পা পড়ছে না। মুখে হাসি নেই। লজ্জার ভাবও নেই। যেন ভেতরে ভেতরে রেগে আছে। কেন এত রাগ গো তোমার নতুন বউ? কাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে বলে?

রাস্তাটা সত্যিই বেশি নয়। আসলে সামনে একটা আমবাগান আছে বলে মনীশদের ছড়ানো এবং দোতলা বাড়িটা নজরে পড়ছিল না। আমবাগান পেরোলেই দেখা গেল বাড়িটা। সতীশবাবুরাও কি এখানকার জমিদার? বাড়িটা দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। শুভ্রা ভাবছিল।...নাহ এরা তো জমিদার নয়। দাদু গতকাল বলেছিল বটে। এরা কোনও জমিদার নয়। বড় ব্যবসাদার। ধান চালের কারবারি। বেশ কয়েকটা চালকলের মালিক। তার মানে এরা বেশ ধনী পরিবার।....কিন্তু এসব ভাবছে কেন শুভ্রা? এরা বড়লোক হোক আর ছোটলোক হোক তাতে তার কী যায় আসে? এ বাড়ির প্রতি শুভ্রার মনে কোনও মোহ থাকতে পারে না।

প্রথমে পাঁচিল এবং ফটক। সেসব পেরিয়ে চকমিলানো বাড়ির মধ্যে বড়সড় উঠোন। লোকে লোকারণ্য। তবে পুরুষ প্রায় চোখে পড়ল না। শুধু মহিলা, মহিলা। সব এয়ো মহিলার দল। নতুন বউকে বরণ করবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

উঠোনে পা রাখতেই যে বয়স্কা এবং স্থূলকায়া মহিলা—'এসো মা এসো' বলে শুভ্রার দু-হাত ধরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি সতীশের স্ত্রী—মনোরমা। ইনিও শ্যামবর্ণা। তবে মুখশ্রী ভাল। মনীশ তার মুখের আদল মায়ের কাছ থেকেই যে পেয়েছে তা মনোরমাকে দেখলে বোঝা যায়। মনোরমার দুপাশে আরও অনেক মহিলা। সকলেই সুসজ্জিতা। তাদের শরীরে শোভা পাচ্ছে

চকমকে শাড়ি ও বিচিত্র সব অলঙ্কার। আর প্রত্যেকেরই সিঁথিতে দগদগে সিঁদুর। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল মনীশের তা হয়নি এবং তার জন্যে দায়ী যে এ বাড়ির ছেলে নয়, ও-বাড়ির মেয়েই; এ খবর বরযাত্রীদের মধ্যে যারা তাড়াতাড়ি ফিরেছিল তারাই বয়ে এনেছে এবাড়িতে। নির্দিষ্ট মেয়ের পরিবর্তে কলকাতার এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে মনীশের এ খবরও তারাই এনেছে। খবরটা প্রথমে দুঃসংবাদই মনে হয়েছিল মনোরমার কাছে। তিনি এ বাড়ির প্রশস্ত ভেতরদালানে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছিলেন। কান্না মহিলাদের কাছে সর্বদাই সংক্রামক। তাই অন্যান্য আত্মীয়-মহিলারাও শুরু করে দিয়েছিল রোদন। পরে অবশ্য তাঁরা সকলেই কান্না থামিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন নতুন বউকে দেখবেন বলে। প্রথম দর্শনেই তাঁদের সকলেরই মনে হয়েছিল, বউ রীতিমতো রূপসী। অনেকেরই মুখ দিয়ে তাদের অজান্তেই উচ্চারিত হয়েছিল—বাহ! বেশ দেখতে নতুন বউকে। ওমা, এতো দেখছি স্বয়ং মা দুগ্‌গা! উপর্যুপরি শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে উঠোনে। মনোরমাকে উচ্চস্বরে এক মহিলাকে 'পিদিম' আর 'ধান-দুববো' আনার জন্যে নির্দেশ দিতে দ্যাখা গেল। শুভ্রাকে তিনি হাত ধরে নিয়ে এলেন উঠোনের মাঝখানে। সেখানে একটি বাটনা বাটার জন্যে ব্যবহৃত শিল রাখা আছে। সেই শিলের ওপরে ও তার চারপাশ জুড়ে সুদৃশ্য আলপনা। শিলাটির ওপরে দুই পা রেখে দাঁড়াতে হল শুভ্রাকে। তার মনে হচ্ছিল সে এই বুঝি পড়ে গেল। সে কারণেই বোধহয় শুভ্রাকে একপাশ থেকে ধরে ছিলেন আর একজন মহিলা। ইনিও বয়স্কা। তবে মনোরমার মতো নয়। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। মুখশ্রী খারাপ নয়। রং-ও বেশ উজ্জ্বল। তবে এই মহিলার সারা মুখে যেন ম্লান বিষণ্ণতা মাখা। তিনি আসলে সম্পর্কে শুভ্রার জা। মনীশের দাদা প্রীতীশের স্ত্রী। ১৫ বছর বিয়ের পরও মহিলার কিংবা বিন্দুবাসিনীর কোলে কোনও সন্তান আসেনি। তাই তো বিন্দুর মুখে সর্বদা খেলা করে বিষণ্ণতার ধূসর ছায়া।

প্রথমে মনোরমা বরণ করলেন শুভ্রাকে। মাথায় দিলেন ধান-দূর্বা। পিদিম ঠেকালেন বউ-এর কপালে, চিবুকে, বুকে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। তারপর শুভ্রার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলেন একজোড়া সোনার বালা। এরপর আরও অনেক মহিলা নতুন বউ বরণ ও আশীর্বাদ করলেন। কেউ দিলেন আংটি, কেউ দিলেন না। শুধু-দূর্বাই তাঁদের সম্বল। যেসব উপহার পাচ্ছিল শুভ্রা, তা তার হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখছিলেন বিন্দু। তাঁকে এই দায়িত্বই দিয়ে রেখেছেন এ বাড়ির ডাকসাইটে কর্ত্রী মনোরমা। নতুন-বউকে চোখে চোখে রাখার দায়িত্ব তাঁর। তার সুবিধে অসুবিধের ভার ন্যস্ত বিন্দুর ওপরই। ইতিমধ্যে আর এক কান্ড। কালোবরণ কিন্তু বেশ মিষ্টি মুখশ্রীর এক মেয়ে, শুভ্রারই বয়সী, তার দিকে এগিয়ে এল। তার হাতে একটা ছোট মাটির হাঁড়ি। সে হেসে শুভ্রাকে বলল—বউদিকে এবার ল্যাটা মাছ ধরতে হবে! তার কথা শুনে উপস্থিত মহিলারা সবাই হেসে উঠল। মাটির হাঁড়ি শুভ্রার দিকে এগিয়ে ধরে মেয়েটি ফিক্ করে হেসে বলল—হাঁড়ির জলের মধ্যে একটা ল্যাটা মাছ সাঁতাব কাটছে! ওটাকে ধরতি হবে! শুভ্রা মেজাজ হারিয়ে বলল—এসব আবার কী! খামোকা হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢোকাতে যাবে কেন? সকলের মাঝখানে নতুন বউ যে এভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে সেটা বোধহয় কারোরই প্রত্যাশিত ছিল না। নিমেষে হাসি থামিয়ে সবাই চুপ হয়ে গেল। আচমকা উৎসবের বাড়িতে ঝপ্ করে নেমে এল পিনপতনের স্তব্ধতা। সবাই সবাইয়ের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। বাবা! মেয়ের একী মেজাজ! মিষ্টি মুখের সেই মেয়েটিও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। এই সময় এগিয়ে এলেন আর এক মহিলা। তাঁর পরনে লালপাড় শাড়ি। গলায় সোনার মটর হার। মনোরমার থেকেও বয়স্কা। তিনি বললেন—ওগো বউ এই মেয়ের নাম হল বুড়ি। এ তোমার ননদাই। আমাদের ছোট খোকার

(মনীশ) বোন। নতুন বউকে ল্যাটা মাছ ধরতে দেওয়া আমাদের রীতি। আচারও বলতে পারো। ল্যাটা মাছ নিজের হাতের মুঠোয় বেশিক্ষণ ধরে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। যদি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারো তাহলে বোঝা যাবে তুমি নিজের স্বামীকেও ঘরে বেঁধে রাখতে পারবে। এসব কথা শুনতে শুভ্রার খারাপ লাগছিল। লজ্জা করছিল। রাগও হচ্ছিল।

সে নিচু স্বরে বলল—এসব আচার বিচারের কোনও মানে হয় না। এসব গেঁয়ো নিয়ম।....এই কথা শুনে মহিলার মুখ যেন রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি চড়া স্বরে বললেন, ওরকম বলতে নেই নতুন বৌ! তুমি শহরের মেয়ে হতে পারো। কিন্তু এ গাঁয়ে কিংবা শ্বশুর বাড়িতে শহুরেপনা দ্যাখালে চলবে না বাপু। আমাদের আচার-বিচারই মেনে চলতে হবে...। ধরো ল্যাটা মাছ, ধরো তো দেকি!

মহিলার কথার মধ্যে ঝাঁঝ ছিল। শুভ্রার জ্বালা করছিল। তার সমবয়সী,মনীশের বোনের বাড়িয়ে ধরা হাঁড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সে সক্রোধে বের করে আনল ল্যাটা মাছের চারা। তারপর নিজের মুঠোর ভেতরে একরত্তি মাছটাকে এত জোরে জেপে ধরল যে বেচারা মাছের প্রাণ যায় আর কী! সকলের মুখ দিয়ে বিস্ময়সূচক ধ্বনি প্রকাশ পেল। বয়স্কা মহিলা বললেন—আর ভয় নেই। এ মেয়ে স্বামীকে বেঁধে রাখতে পারবে।

চুয়াল্লিশ

উঠোনের মাঝখানে এয়ো স্ত্রীরা সমবেতভাবে নতুন বউকে বরণ করে নেবার পর তাকে আনা হল দোতলার একটা বড়সড় ঘরে। শুভ্রার ক্লান্তি লাগছিল ভীষণ। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল একা একা কোনও নরম বিছানায়। কিন্তু তা কি হবার যো আছে! এ বাড়িতে মহিলা, যুবতী আর ছেলেপিলেদের যেন অভাব নেই। সবাই নতুন বউকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতে চাইছে। তাকে দেখতে চাইছে বার বার। তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে। একটু আধটু খুনসুটিও করতে চাইছে হয়তো। মনীশের বউদি বিন্দু তার সঙ্গে যেন লেপটে আছে। আর মনোরমাও তাই। শুভ্রার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যেন প্রথম দিন থেকেই অধিকার করে নিতে চাইছেন বউমাকে।

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল শুভ্রার। বিরক্তিও লাগছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে। এই অচেনা বাড়িতে সে সম্পূর্ণ একা। এখানে আপনজন তার কেউ নেই। সে যে একটু রাগে ফুঁসে উঠবে, অভিমান করবে কিংবা বিরক্তিতে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠবে তার কোনও সুযোগ নেই। মেয়েদের স্বাভাবিক ক্ষমতাই হল তাদের সূক্ষ্ম ইনটুইশানকে কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতিকে বুঝে নেওয়া। শুভ্রার ক্ষেত্রেও, কী আশ্চর্য, তার ব্যতিক্রম হল না। ইতিমধ্যেই সে বুঝে নিয়েছে যে, এখানে, এই শ্বশুরবাড়িতে, (এই বাড়িটাকে যদিও শ্বশুরবাড়ি বলে ভাবতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না শুভ্রার। এরকম শ্বশুরবাড়ি সে চায়নি কোনওদিন। গ্রাম তার মোটেও পছন্দের নয়। তার বরাবরের ধারণা, গ্রামে দু-চারদিনের জন্যে থাকা যায় বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকা যায় না।) সে যদি একমুহূর্তের জন্যে মেজাজ হারায়, অসমীচীন কিংবা বেফাঁস কিছু বলে ফেলে; নিজের মনের বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলে এতটুকু; তাহলে আর রক্ষে নেই। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠবে। অসন্তুষ্ট হবে তার প্রতি। সমালোচনা করবে নতুন বউয়ের, হয়তো সারা গাঁয়েই রটে যাবে যে, এ বাড়ির নতুন বউ খুব মুখরা, খুব ঝগড়াটে। শুভ্রার পক্ষে কথা বলার এ বাড়িতে কেউ নেই। মনীশকে সে আর দেখতেই পাচ্ছে না। সতীশ এবং নারানও কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে! মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কোনও পুরুষ নেই। শুধু মেয়ে আর মেয়ে। অধিকাংশই কলা বউ-এর মতো একহাত

ঘোমটা টানা বউ। প্রত্যেকেই যেন নানারকম অলঙ্কারে উপুড়-ঝুপুড় হয়ে আছে। সবাই যেন চোখ দিয়ে গিলছে তাকে! উঃ মাগো! আর যেন সহ্য হচ্ছিল না শুভ্রার। তার মেজাজ ভেতরে ভেতরে তুঙ্গে উঠছিল।

আবার তার রাগ হচ্ছিল, ভীষণ রাগ হচ্ছিল দাদুর ওপর। জেনেশুনে এ কোথায় তাকে পাঠাল দাদু? এখানে, এই পরিবেশে, এই বাড়িতে, এইসব গেঁয়ো ভূত-পেত্নীদের সঙ্গে কাটাতে হবে তাকে সারাজীবন? অসম্ভব! অসম্ভব! এখানে থাকতে পারবে না শুভ্রা। মন টিকবে না তার। এখানে বেশিদিন থাকলে সে হয়তো পাগলই হয়ে যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে পা রাখতেই কী যেন থপ্ করে পড়ল শুভ্রার বাঁ কাঁধে। চমকে উঠল সে। তাকিয়ে দেখল একটা কালো কুচকুচে টিকটিকি। এ ম্যাগো—থুঃ! এক চাপড় মেরে শুভ্রা টিকটিকিটাকে ফেলে দিল কাঁধ থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল মহিলাদের মধ্যে। বিন্দু হাসতে হাসতে বলল—ওমা! ওটাকে কি সত্যিকারের টিকটিকি ভাবতেচ বউ? ওটা তো ন্যাকড়ার....।

এবারেও কালপ্রিট হল মনীশের ঢলোঢলো মুখের বোন, সম্পর্কে শুভ্রার ননদাই, বুড়ি। সে ফিকফিকিয়ে হেসে বলল—কী মজা! কী মজা! নতুন বউ-দিদিকে বোকা বানিয়েছি! অন্যেরাও হাসছে। শুভ্রা ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। আর ছেড়ে দেবেই বা কেন? সে তো আর সত্যি ভয় পায়নি। টিকটিকিকে সে সত্যিই কোনওকালে ভয় পায় না। তবে ওদের দেখলে তার ঘেন্না করে। বিশেষত কালোপানা টিকটিকি। দেখলে গাটা যেন গুলিয়ে ওঠে। সমবেত হাস্যরোলের মাঝেই শুভ্রা তাড়াতাড়ি বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—আমি তো ভয় পাইনি ভাই। আমাকে ভয় দ্যাখানো অতো সহজ নয়। আমি কলকাতার মেয়ে।

শুভ্রা যেই বলল সে কথাটা, অমনি সবাইয়ের হাসি যেন এক নিমেষেই থেমে গেল। 'আমি কলকাতার মেয়ে'—এই সগর্ব ঘোষণার মধ্যে যে অহমিকা প্রকাশ পেয়েছিল তার তীব্রতা উপস্থিত সকলকেই যেন স্পর্শ করল। এক মুহূর্তে সব মহিলাদের হাসি যেন থেমে গেল। এমনকী বুড়িকে যে হাসলে বেশ সুন্দর দ্যাখায় তার গোলপানা, দীঘল আঁখির মুখটাও নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। সবাইয়ের যেন মনে পড়ে গেল, নতুন বউ যে সে নয়। খাস কলকাতার লেখাপড়া জানা মেয়ে। তার সঙ্গে গেঁয়ো বউ-ঝিরা কথায় পেরে উঠবে না। এমনকী নিতান্ত গ্রাম্য রসিকতাও তার সঙ্গে যেন ঠিক জমবে না। ম্রিয়মাণ পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে এলেন মনোরমা নিজে। মহিলাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—ওগো আমাদের নতুন বউ এখন ঘরে ঢুকবে, শাড়ি বেলাউজ ছাড়বে, চ্যান করবে। তোমরা এখন যাও। শুধু বড়বউমা থাকবে। এই কথায় কাজ হল। সবাই দুদ্দাড় করে নেমে গেল একতলায়। কেউ বা সেঁদিয়ে গেল দোতলারই কোনও ঘরে। এ বাড়িতে মনোরমার কথাই বোধহয় শেষ কথা। একটা বড় ঘরে শুভ্রা ঢুকে পড়ল মনোরমা আর বিন্দুর সঙ্গে। এই ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতা। একটা বড় পালঙ্ক বিছানো। ধবধবে সাদা চাদর পাতা। সেই পরিচ্ছন্ন বিছানার দিকে তাকিয়েই শুভ্রার হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। কিন্তু এদের দুজনের চোখের সামনে সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। সে শুনতে পেল মনোরমা কর্তৃত্বের গলায় বলছেন—ও গো নতুন বউ, দেরি করলে হবেনি। তাড়াতাড়ি চ্যান সেরে নতুন শাড়ি পরতে হবে। সিঁদুর দিতে হবে সিঁথিতে। খালিপেটে থাকতে হবে এখনও কিছুক্ষণ...।

—কেন?—শুভ্রার মুখ দিয়ে প্রশ্নটা ছিটকে এল। কেননা তার পেট খিদেতে চুঁইচুঁই করছিল।

—এখনই কুসুমডিঙেতে বসতে হবে তোমাকে। তুমি চ্যানে গেলেই আমি একতলাতে যাব। পুরোহিত এসে গেচে। কুসুমডিঙের যোগাড়যন্তর করতেচে।

—কুসুমডিঙে? সেটা আবার কী?

—সেসব আচে অনেকরকম ব্যাপার! যখন করবে তখন বুঝবে। তোমার মা দেখচি মেয়েকে কিছুই শেখায়নি!....

শুভ্রা বলতে যাচ্ছিল আমি আপনাদের মতো মায়ের কাছে মানুষ হইনি। আমি যা কিছু শিখেছি দাদুর কাছ থেকে। কিন্তু কী ভেবে নিজেকে সে সংযত করে নিল।

—বিন্দু তুই থাক মা নতুন বউ-এর সঙ্গে। ওর চ্যানের ব্যাপারটা দ্যাখগে।....এই নির্দেশ দিয়ে মনোরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনোরমা বউমাকে অর্থাৎ বিন্দুকে 'তুমি' সম্বোধন করেন না। তুই তোকারি করেন। শুভ্রার কানে সেটা কীরকম বিশ্রি শোনাল।

এই ঘরে এখন আর কেউ নেই। শুধু তারা দুজন। শুভ্রা আর বিন্দু। বিন্দু বলল—শাড়ি বেলাউজ ছাড়বে তো নতুন বউ? আমি একটু তফাতে যাই?

শুভ্রা জিজ্ঞেস করল—চান করব কোথায়? তোমাদের বাথরুম আছে?

বিন্দু বলল—কী বললে?...কলতলার কতা বলচ?

শুভ্রা তীক্ষ্ণবুদ্ধির মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নিল যে, বাথরুমের মতো ইংরিজি শব্দ এরকম অজ গাঁয়ের ঘরের বউ-এর কাছে অচেনা। এরকম হওয়াই তো স্বাভাবিক। তার দিদিমা, যূথিকা, তিনি তো শহরে থাকেন। তবুও সম্ভবত তিনি দৈনন্দিন জীবনে কথায় কথায় ব্যবহার করা অনেক ইংরিজি শব্দের মানে জানেন না। তিনিও তো বাথরুম বলেন না। বলেন—কলতলা। চানঘরকে বোঝাতে ঐ ইংরেজি শব্দটা বাড়িতে ব্যবহার করেন দাদু আর শুভ্রা।

—হ্যাঁ। আমি কলতলার কথাই বলছি।

—পাইখানা যাবে?...না শুধু চ্যানই করবে?—এ বাড়িতে পা দেওয়া থেকে শুভ্রার কানে 'চ্যান' শব্দটা খট্‌খট্ করে লাগছে। এরা 'স্নান' কিংবা 'চান' কে বলে 'চ্যান'। আরও কত চেনা শব্দের বিকৃত উচ্চারণ যে করে তা কে বলতে পারে? ক্রমশ এসবের সঙ্গে কি শুভ্রাকে মানিয়ে নিতে হবে? এরকম কথা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শুভ্রাকে ঝাঁকুনি দিল। তীব্র ঝাঁকুনি! মানিয়ে নেওয়ার কথা আসছে কেন? সে এ বাড়িতে কি চিরকালের জন্যে থাকতে এসেছে নাকি? হোক তার বিয়ে। হোক এটা তার শ্বশুরবাড়ি। এসব সে মানে না। এসবের পরোয়া করে না সে। এ বাড়িতে সে থাকতে পারবে না। কখনই না। তাকে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। যেভাবে হোক পালিয়ে যেতে হবে। তারপর কী হবে সে জানে না। সে তো বিয়ে করা বউ একজনের। এভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে কি কোনও অপরাধ হবে? দাদুর মুখ পুড়বে? মনীশ আর এ বাড়ির অন্য সবাই কি খুব রেগে যাবে? সেসব নিয়ে চিন্তা কেন করবে শুভ্রা? এ বিয়ে তার মনের মতো হয়নি। স্বামী মনের মতো হয়নি। শ্বশুরবাড়ি মনের মতো হয়নি। এটাই সত্যি। আর কোনওকিছু সত্যি হতে পারে না। জীবনটা তার নিজের। দাদুর নয়। সতীশের নয়। ঐ কালো লোকটারও নয়। নিজের জীবন অন্যের মনের মতো চলতে দেবে কেন সে? সে নিজের মনের মতো চলবে। নিজে যা ভাল বোঝে করবে। তার জীবনের কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেটা সে ছাড়া আর কে বুঝবে? সে এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যা-বেই। কীভাবে যাবে? সেসব নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে। এখন শরীর থেকে এই ভারী বেনারসিটা ছাড়তে হবে। চান করতে হবে। ফ্রেশ হতে হবে। আর হ্যাঁ.....একটু হালকাও হতে হবে।

বিন্দুর মুখে 'পায়খানা' শুনে শুভ্রার মনের হল, সেখানেও একটু যাওয়া দরকার। খুব যে বেগ আছে তা নয়। কী করে থাকবে? গতকাল বিকেল থেকে সে তো এমন কিছু খায়নি। মনও নানারকম দুশ্চিন্তা আর বিরক্তিতে ছেয়ে ছিল। বিয়ের পিঁড়িতে ঠায় বসে থাকতে হয়েছে। রাতে

ভাল ঘুম হয়নি। এরকম অনিয়ম হলে শরীরের যন্ত্রগুলোও ঠিকঠাক কাজ করে না। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোও অনিয়মিত হয়ে যায়। তাই যদিও শুভ্রার প্রতিদিন ভোরেই নিজের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থগুলো ত্যাগ করা অভ্যাস, সে তেমন বেগ এখনও পর্যন্ত অনুভব করেনি। এখন বিন্দুর কথা শুনে তার মনে হল ঐ কর্মটিও তার সেরে নেওয়া প্রয়োজন। বিন্দুর দিকে তাকিঁয়ে শুভ্রা জিগ্যেস করল—সত্যিই আমি একটু পায়খানায় যেতে চাই। প্রতিদিন চান করার আগে আমার যাওয়া হ্যাবিট। এখানে পায়খানা কোথায়? এই দোতলাতেই? না কি একতলাতে যেতে হবে?

শুভ্রার প্রশ্নের যা উত্তর দিল বিন্দু তা শুনে শুভ্রার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা!

—পাইখানা বাড়িতে থাকে নাকি? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে বিন্দু জানাল;—ওমা এ কী কথা বলচ গো তুমি? সাতজন্মেও আমরা শুনিনি বাড়িতে পাইখানার কথা! যে জিনিস নোংরা, দুগ্গন্ধ বের হয় তা বাড়িতে রাখবে মানুষ?

—বাড়িতে হবে না তো কোথায় হবে? এ তো অদ্ভুত কথা বলছ তুমি?

—জানি না বাপু! আমরা তো চোখ ফোটার পব থেকে ঐ জিনিসটা করতে মাটেই যাই গো। তোমরা অবশ্য শহরের লোক। তোমাদের ব্যাপার আলাদা।

—এ বাড়িতে একটা পাইখানা নেই? শুভ্রা সত্যিই আঁতকে উঠল।

—নাহ...নেই তো!

—কী বলছ তুমি? মাগো! শুভ্রার মাথায় যেন সত্যিই আকাশ ভেঙে পড়ে।

—এতে ঘাবড়াবার কী আছে? মাটে পাইখানা যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। তুমি কয়েকদিন যাও। দেখবে তোমারও ভাল লাগবে। তবে.....

—তবে মানে?

—তোমার বোধহয় সকালে যাওয়া অব্যেস। অব্যেসটা একটু পাল্টাতে হবে। আমরা সব সন্ধেবেলাতে মাটে যাই। দল বেঁধে। তখন আঁধার থাকে। কেউ মাটে বসে কী করতেচি দেকতে পায় না। সকালা একটু অসুবিদে। বুঝচ নিচ্চয়ই। যখন কাপড় তুলে বসেচি যদি কেউ দেকে ফেলে....?

এভাবে কথা বলতে বিন্দুর আটকায় না। কেন আটকাবে? তারা গাঁয়ের আধিবাসী। শহরের মানুষদের মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। শেখেওনি। তার ওপর কোনও মেয়ের সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলে বিন্দুর মতন গাঁয়ের বৌ-ঝিরা, তখন তাদের মুখের আগল থাকে না। 'কাপড় তুলে বসা'র কথা বিন্দু মুখে শুনে শুভ্রার খারাপ লাগতে পারে। কী আর করা যাবে? যেখানকার কথাবার্তার ধরন যেরকম। এত বড় একটা ঘর। অথচ মাথার ওপরে ফ্যান নেই। বৈদ্যুতিক পাখার নীচে থাকতে শুভ্রা অভ্যস্ত। কিন্তু এই গাঁয়ে, তার এত বিশাল শ্বশুরবাড়িতে কি সেই সুবিধে পাওয়া যাবে?

—তোমাদের বাড়িতে তো ইলেকট্রিক নেই? বিন্দু প্রথমে শব্দটা বুঝতে পারেনি। এই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলাই যেন ঝকমারি। উঠতে বসতে ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে। তবে শুভ্রা কী বলতে চাইছে সেটা অবশ্য বিন্দু বুঝেছে। সে উত্তরও দিল।

—বিজলির কথা বলচ? নাহ ভাই, নেই।

শুভ্রা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। আর কী কথা বলবে সে? তার যা জানার জানা হয়ে গেছে। দাদু তাকে সমুদ্রের মাঝখানে ছুড়ে দিয়েছে। তার জীবনের সবথেকে বড় ক্ষতিটা দাদুই করেছে। এরকম যে হবে সে কল্পনাও করেনি। দাদু তার এই চরম ক্ষতিটা কেন করল? এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে হাওড়ার বাড়িতে পৌঁছে শুভ্রার প্রথম কাজই হবে দাদুর মুখোমুখি হওয়া। জানতে

চাওয়া যে কেন, তার এমন ক্ষতি করলেন তিনি? কিন্তু সে হিসেব তোলা থাকুক এখন। তার নিষ্পত্তি পরে হবে। আপাতত শুভ্রার পেট গুড়গুড় করছিল। সে বেগও অনুভব করছিল বেশ।

বিন্দুর দিকে তাকিয়ে সে বলল—দিদি আমাকে বোধহয় যেতেই হবে...।

—কোথায়? মাটে?

শুভ্রা ঘাড় নাড়ল।

—তা চলো না। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্চি। খিড়কি দরজা দিয়ে নে যাবখন। কেউ জানতেও পারবে না। দেকতেও পাবে না। তারপর একেবারে চ্যানটাও সেরে নিতে হবে। দিঘিতে।...সাঁতার জানো তো?

—সাঁতার? জানি না তো...।

—এই খেয়েচে! আমার শ্বশুর কী বউ আনলে গো বাড়িতে? যে মাটে পাইখানা করে না। সাঁতার কাটতে জানে না। সব শেকাতে হবে তোমায়। সব শিকে যাবে তুমি। আমিই শেকাব। এই কথা বলতে বলতে বিন্দু একটা কাণ্ড করল। হঠাৎ শুভ্রার দিকে এগিয়ে এসে তার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে আদুরে গলায় বলল—ছুঁড়ির শুদু রূপই আচে। একেবারে ছেলেমানুষ। কিচ্ছুটি জানে না।

শুভ্রার বিরক্তি লাগছিল। সে এক ঝটকায় নিজের মুখ সরিয়ে নিল। তার হাতের চুড়িতে শব্দ হল। ছমছম ছমছম। বিন্দু তাতে দমল না।

হেসে বলল—ওমা রাগচ কেন গা? আমি কি খারাপ কিছু বলেচি? সত্যিই তোমার মতন সুন্দরী আমি কোনওদিন দেকি নাই গো। আমার দ্যাওরটির কপাল ভাল। অনেক পুণ্যফলে মানুষ এরকম বউ পায়। বিছানায় যে কী করবে ও তোমাকে নিয়ে!...ছলাকলা সব তোমাকে আমি শিকিয়ে দেব। কোনও চিন্তা নাই। এখন চলো মাটে যাবে—চ্যান করবে। বেনারসি ছেড়ে একটা অন্য শাড়ি পরে নাও। আমি তফাতে যাচ্চি...।

পঁয়তাল্লিশ

বিশ্বদেবের কর্মক্ষেত্র ঝালদা। ১৯৪০-৪২ সালে মানভূম জেলার মধ্যে ছিল। তখন পুরুলিয়া জেলার অস্তিত্বই ছিল না। ইংরেজ সরকার ১৮৩৩ সালে ধানবাদ, পুরুলিয়া, ধলভূম ও বাঁকুড়া জেলার বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে নতুন মানভূম জেলা গঠন করেন। মান শব্দ দিয়ে বেশ কিছু জায়গার নাম এখনও আছে। এখনকার পুরুলিয়া জেলাতেও বিভিন্ন অঞ্চলে মানা বাউড়ি জনগোষ্ঠীর বসবাস আছে। মানা বাউড়ি—এই জনগোষ্ঠীর নাম থেকেই সম্ভবত জেলার নাম হয় মানভূম। এই মানভূম জেলাই পরে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলা হিসেবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

আমাদের কাহিনীর সময়কাল যেহেতু বিশ শতকের চারের দশক, অতএব ঝালদার কথা বলতে হলে মানভূম জেলায় অবস্থিত এই এলাকার কথাই বলতে হবে। ঝালদাতে তখন ছিল এরাটুন সাহেবের বিশাল গালা ফ্যাক্টরি। সেই ফ্যাক্টরিতে অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম দেখত বিশ্বদেব।

এরাটুন সাহেবের গালা কারখানা কীভাবে ঝালদা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল তার এক বৈচিত্রময় ইতিহাস আছে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এবং পরিশ্রমে এরাটুন সাহেব গড়ে তুলেছিলেন এই গালা কারখানা। আসবাবপত্র রং এবং বার্নিশ করার কাজে গালা ব্যবহার করা হত সেই সময়। এরাটুন সাহেবের কারখানায় উৎপাদিত গালা-স্টিক কলকাতা বন্দরে আনা হত। তারপর তা পাঠিয়ে দেওয়া

হত জাহাজে করে ইউরোপের নানা দেশে। বিশেষত লন্ডনে এবং প্যারিসে এই গালা-স্টিকের খুবই চাহিদা ছিল। যে কোনও রং-এ গালার মিশ্রণ থাকলে তা হত খুব উজ্জ্বল। এবং সেই উজ্জ্বলতা বহুদিন দীর্ঘস্থায়ী হত। সুতরাং সাহেবদের কাছে গালার চাহিদা যে থাকবে এত স্বাভাবিক। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে এরাটুন সাহেব ভারতে এবং বিদেশে তাঁর গালার ব্যবসা ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে কলকাতা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে সুদূর বনাঞ্চল ঝালদাতেই বা এরাটুন সাহেব এসে পৌঁছলেন কীভাবে? আর এই ঝালদার খোঁজই বা তিনি পেলেন কোথায়? ঝালদার মতো জায়গার তেমন কোনও বিশেষত্বই ছিল না। কোল, ভিল, মুণ্ডা আর বাউড়িদের বাস ছিল সেখানে। আর মাইল মাইল জুড়ে লাক্ষার বন। এই লাক্ষার রস জমিয়েই যা পাওয়া যায় তাকেই বলে গালা।

বিশ্বদেবের মতো একজন নিরীহ বাঙালি ছোকরাই বা ঝালদার গালা-কারখানাতে চাকরি জোটাল কীভাবে? বাঙালিরা তো ঘরকুনো। তারা চট করে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ভিন রাজ্যে, অচেনা জায়গায় চাকরি করতে যেতে চায় না। গড়পড়তা বাঙালিদের থেকে বিশ্বদেবও তেমন কোনও ব্যতিক্রম নয়। সে আসলে হাওড়া জেলার আমতার ছেলে। তার বাবা চাকরি-টাকরি করতেন না। চাষ-আবাদ নিয়েই থাকতেন। বিশ্বদেবরা তিন ভাই, তিন বোন। ভাইদের মধ্যে বিশ্বদেব ছোট। সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির ছেলে বিশ্বদেব। তাদের অনেক জমিজমা। বোনেদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বদেবের আর দুই দাদার পড়াশোনায় তেমন মাথা ছিল না। একজন কোনওরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছিল। আর একজন তাও করেনি। দুজনেই বাবাকে সাহায্য করত চাষ-আবাদের কাজে। একমাত্র বিশ্বদেবই যা ব্যতিক্রম। সে বরাবরই বাড়ির আত্মসন্তুষ্ট আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। একটু বড় হবার পর থেকেই তার মনে হত সে চিরকাল আমতার মতো অজ গাঁয়ে পড়ে থাকবে না। সে লেখাপড়া করবে। চাকরি জুটিয়ে নেবে কলকাতায়। এবং করলও তাই। ম্যাট্রিক পাশ করেছিল বিশ্বদেব বেশ ভালভাবে। অঙ্কে, ভূগোলে আর সংস্কৃত-তে লেটার ছিল। সে আরও পড়তে চেয়েছিল। প্রি-ইউনিভার্সিটি পড়তে চলে এল কলকাতায়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে থেকে পড়াশোনা করত। ছোট ছেলের পড়াশোনাতে আগ্রহ দেখে বাবাও তার ইচ্ছেতে বাদ সাধেননি। সংসারে পয়সার অভাব ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব ছিল। বিশ্বদেব যতদূর শিক্ষিত হতে চায় হোক না। বাবার তরফ থেকে আপত্তি জানাবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। পি ইউ পাশ করার পর বিশ্বদেব সিটি কলেজে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে এবং ডিসটিংকশান নিয়ে বি. কম পাশ করে।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর ছেলেকে হরিচরণ জিজ্ঞেস করেছিলেন-এবার কী করবে? বিশ্বদেব জানিয়েছিল যে, কলকাতার কোনও ফার্মে চাকরি করবে। ছোটছেলের এই প্রস্তাব অবশ্য হরিচরণ অনুমোদন করেননি। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে এবার গ্রামের বাড়িতে থিতু হোক। গ্রামের স্কুলে ইচ্ছে করলে মাস্টারিও করতে পারে। যদিও হরিচরণের মতে বিশ্বদেবের চাকরি করার তেমন প্রয়োজন ছিল না। জমি জমা যা আছে তা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিলেও বিশ্বদেবের ভাগে যা পড়বে তাতে অন্তত তাকে সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্যে চাকরির ওপর নির্ভর করতে হবে না কোনওদিন। কিন্তু বিশ্বদেব বাবার এবং বাড়ির অন্যদের কথায় কান দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। একবার যখন সে গ্রামের সঙ্কীর্ণ জীবন ছেড়েছে এবং আস্বাদ পেয়েছে কলকাতার জীবনের; তখন তার পক্ষে আবার আমতায় ফিরে এসে বরাবরের জন্যে বাস করা অসম্ভব। বিশ্বদেব একটা সাহেবি মার্চেন্ট অফিসে অ্যাকাউন্টট্যান্টের চাকরি জুটিয়ে নেয় এবং আমহার্স্ট

স্ট্রিটের যে মেসে ছাত্রাবস্থায় থাকত সেখানেই থেকে যায়। আমতায় সে মাঝে মধ্যে যেত। উপার্জনের কিছু টাকা দিয়ে আসত হরিচরণের হাতে। যদিও হরিচরণ সেই টাকা নিতে চাইতেন না। কলকাতায় থেকে ছেলের চাকরি করার ব্যাপারটা তিনি মনে মনে অনুমোদন করতে পারেননি। বিশ্বদেব যখন প্রতি মাসে অন্তত একবার দেশের বাড়িতে গিয়ে বাবার হাতে টাকার বান্ডিলটা তুলে দিত, তখন হরিচরণ তা স্পর্শ করতেন না। বলতেন, তোমার টাকাতে দরকাব নেই আমার। আমার অনেক আচে। পারলে তুমি বরং কিছু নিয়ে যাও। তখন বিশ্বদেব বলত—আমার দায়িত্ববোধ থেকে আমি সংসারে এই টাকা দিচ্ছি। না নিতে চাইলেও আমি দেব। ঠিক আছে না নিতে চান আমি মায়ের হাতে দিয়ে যাচ্ছি টাকা। হরিচরণের স্ত্রী সরমা আর কী করেন। ছোট ছেলেকে তিনি ভালবাসতেন খুব। কিন্তু ছেলে ঘরছাড়া বলে তাঁরও অভিমান ছিল বিশ্বদেবের প্রতি। তবুও ছোট ছেলের দেওয়া টাকা কি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন? টাকাটা তিনি রেখে দিতেন। তারপর কী করতেন সেটা বিশ্বদেব বলতে পারবে না। হয়তো বড়ছেলে সোমদেব এবং মেজছেলে রণদেবের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। সোমদেব এবং রণদেব দুজনেই ততদিনে বিবাহিত এবং ঘোর সংসারী।

কলকাতায় চাকরি পাওয়ার বছরখানেকের মধ্যেই অবশ্য হরিচরণের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ ছিল সাপের কামড়। বর্ষাকালে রাতের দিকে কী কারণে যেন উঠোনে নেমেছিলেন হরিচরণ। পায়ের সামনেই যে গোখরো সাপ শুয়ে ছিল তা খেয়াল করেননি। হরিচরণের মৃত্যুর পর আর বছর দুই বেঁচে ছিলেন সরমা। তারপর তাঁরও মৃত্যু হয়। বাবা ও মা দুজনেরই মৃত্যুর পর বিশ্বদেব গ্রামের বাড়ি আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। মৃত্যুর আগে হরিচরণ উইল করে যেতে পারেননি। ফলে বিষয়-সম্পত্তি ছেলেমেয়েরা কে কতটা পাবে তা নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেধে যায়। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে বিশ্বদেব নিজেকে জড়াতে চায়নি। বিষয়সম্পত্তির প্রতি তার কোনওদিনই তেমন মন ছিল না। কলকাতা ছেড়ে কোনওদিন যে আমতায় গিয়ে থাকতে হবে এটাও সে কোনওদিন ভাবেনি। তার স্বপ্ন ছিল, সে নিজে চাকরি করে কলকাতাতে বা কলকাতার কাছাকাছি কোনও অঞ্চলে একটা বাড়ি বানাবে। তাই বাবা ও মায়ের মৃত্যুর পর বিশ্বদেব গ্রামে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তার প্রাপ্য বিষয়সম্পত্তি তার দাদারাই ভোগ করার সুযোগ পেল। তাতে অবশ্য বিশ্বদেবের কোনও আপসোস ছিল না।

সুনীতির সঙ্গে বিশ্বদেবের বিয়েটাও বেশ আকস্মিক। এবং তাতে কিছুটা নাটকও লুকিয়ে আছে।

তখন বিশ্বদেব যে অফিসে চাকরি করত, হাডসন অ্যান্ড হাডসন কোম্পানি, তার আসল কর্ণধার, অফিসের ভাষায় ম্যানেজিং ডিরেকটর একজন সাহেব-উইলিয়ম হাডসন; আর জেনারেল ম্যানেজার একজন বাঙালি, সত্যপ্রিয় সেন। 'হাডসন অ্যান্ড হাডসন' নামের অর্থ হল বাবা আর ছেলে দুজনের যৌথ মালিকানাতেই কোম্পানি। বাবা অ্যালেক্স হাডসনের বয়স হয়েছিল। তাই তিনি নিজের ছেলেকে এম.ডি. বানিয়ে তার হাতেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। অফিসটা আসলে ছিল চা-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। দার্জিলিং-এর চা তখন থেকেই, কিংবা তার আগে থেকেই সাহেবদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। চা-বাগান থেকে প্রসেসড্ চা-এর লন্ডনে এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানির ব্যাপারে হাডসন কোম্পানির একটা বড় ভূমিকা ছিল। সে যাই হোক, বিশ্বদেব সেই অফিসে অ্যাকাউন্টট্যান্টের কাজ করত। সাইকেল কোম্পানি ম্যাকেঞ্জি এ্যান্ড ম্যাকেঞ্জির বড় অফিসার নীরদবরণের সঙ্গে তার আলাপ হবার কোনও কারণই ছিল না। কিন্তু তবুও, আকস্মিকভাবেই একদিন নীরদবরণ পরিচিত হয়েছিলেন বিশ্বদেবের সঙ্গে।

আসলে সত্যপ্রিয় আর নীরদবরণ দুজনে ছিলেন গলায় গলায় বন্ধু। দুজনেই প্রায় প্রতিদিন

অফিস ছুটির পর পার্ক স্ট্রিটের বার-এ বসে মদ খান। যেখানে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সঙ্গও তাঁরা পেয়ে থাকেন। একদিন বিকেলের দিকে কী কারণে যেন নীরদবরণ বন্ধু সত্যপ্রিয় সেনের অফিসে এসেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা ইংরেজি নভেল। উইলিয়ম ম্যাকপিস থ্যাকারের লেখা—'ভ্যানিটি ফেয়ার'। নভেলটি সদ্য লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল। আর যে কোনও নতুন বই পাগল-পাগল স্বভাবের গ্রন্থকীট ম্যাকেঞ্জির হাতে ঠিক এসে যাবে। আর ম্যাকেঞ্জির পড়া হলে তিনি অবধারিতভাবে সেই বই নীরদবরণের হাতে দেবেন। বলবেন—রিড-নীরোদবরণ রীড দ্য বুক। অ্যান্ড ফাইন্ড হোয়াট আ গ্রেট ক্রিয়েশান ইট ইজ। প্রকৃত বই-পাগলদের বোধহয় এটা একটা স্বভাব। তারা কোনও ভাল বই যদি পড়ে থাকে এবং আনন্দ পায়, তাহলে তাতেই তৃপ্ত থাকে না। অন্য কোনও বই-পাগলকেও সেই আনন্দের ভাগ দিতে চায়। নীরদবরণও তো একজন দুর্বার বই পাগল। গ্রন্থকীটও বলা যায় তাঁকে। ম্যাকেঞ্জির দৌলতে নতুন বিলিতি বই কতই না পড়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ক্রমশ শিক্ষিত করে তুলেছেন নিজেকে। যদিও পণ্ডিত হননি। সাহিত্যরসিক থেকে গেছেন।

ঔপন্যাসিক হিসেবে উইলিয়ম ম্যাকপিস থ্যাকারের একটা বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁর জন্মস্থান শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়; একেবারে খাস কলকাতা। তাঁর শৈশবের অনেকটাই কেটেছিল কলকাতায়, সাহেবপাড়ায়। এবং তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' উপন্যাসেও কলকাতার কথা আছে। সে যাই হোক, নীরদবরণের সঙ্গে বিশ্বদেবের প্রথম আলাপেও 'ভ্যানিটি ফেয়ার' উপন্যাসের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

সত্যপ্রিয়র অফিস-চেম্বারে বসে নীরদবরণ কথা বলছিলেন। দুজনের সামনেই ছিল ধোঁয়াওঠা কফির কাপ। নীরদবরণের ঠোঁটে ছিল তাঁর প্রিয় চুরুট। সত্যপ্রিয় অ-ধূমপায়ী।

হঠাৎ বিশ্বদেব দরজাতে টোকা দিয়েছিল। এটাই সাহেবি রীতি। কারোর ঘরে কিংবা চেম্বারে ঢুকতে হলে বন্ধ অথবা ভেজানো দরজাতে মৃদু টোকা দিতে হবে। ঘরের ভেতরে যে কর্তাব্যক্তি আছেন তিনি 'কাম ইন' বলার পর তবেই ঘরে প্রবেশ করা যাবে।

দুপুরের দিকে সত্যপ্রিয় কী একটা জটিল হিসেবের দায়িত্ব বিশ্বদেবকে ডেকে দিয়েছিলেন। টাকা-পয়সার হিসেব আর কী। সারা বছর হাডসন কোম্পানি দার্জিলিং-চা-এর রপ্তানির কাজে যুক্ত থেকে লাখ লাখ টাকা কামায়। সত্যপ্রিয়র নির্দেশ ছিল, টাকায়পয়সার জটিল হিসেবটা যেন বিশ্বদেব কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর টেবিলে দিয়ে যায়। বিশ্বদেব বরাবরই তার নিজের কাজটা ভাল বোঝে। চটপট হিসেব-নিকেশ করতে পারে। এক কথায় সে একজন যোগ্য অ্যাকাউনট্যান্ট। দরজায় টোকা শুনে সত্যপ্রিয় বলেছিলেন—কাম ইন। বিশ্বদেব ঘরে ঢুকেছিল। তার হাতে একতাড়া কাগজ। টাইপ করা। জটিল হিসেবের অঙ্ক। সত্যপ্রিয় ভুরু তুলে জানতে চেয়েছিলেন— ইয়েস? দি ক্যালকুলেশান ইজ রেডি?

—হ্যাঁ স্যার। বিশ্বদেব বলেছিল; কাইন্ডলি একটু দেখবেন স্যার?

—ইয়েস। লেট মি সি। নীরদবরণের মতো সত্যপ্রিয়ও সাহেবি আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। এবং কথায় কথায়, বিশেষত যখন অফিসে থাকেন, ইংরেজিতে কথা বলতে পছন্দ করেন।

বিশ্বদেব কাগজের তাড়াটা সবিনয়ে বাড়িয়ে ধরেছিল। সত্যপ্রিয়র কপালে ভাঁজ। তিনি হিসেবটা ঠিকমতো হয়েছে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। নীরদবরণ চুরুট ফুঁকছিলেন। আনমনে সত্যপ্রিয়র চেয়ারের পেছনের দেয়ালে কোনও এক সাহেবেরই আঁকা এক বিশাল অয়েল পেইন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার হাতের মোটা বইটা পড়েছিল টেবিলের ওপর। বেশ থান ইটের মতন মোটা বই। হার্ড-বাউন্ড। চকচকে মলাট। বইয়ের ও লেখকের নাম লেখা। বিশ্বদেব তাকিয়েছিল

বইটার দিকে। তার চোখে ফুটে উঠেছিল আগ্রহ। কম বয়সে বিশ্বদেবও খুব বই পড়ত। বিশেষত ইংরেজি নভেল। ওয়াল্টার স্কট এবং চার্লস ডিকেন্সের অনেক উপন্যাসই সে পড়ে ফেলেছিল। একা একা আমহার্স্ট স্ট্রিটের মেসে আর কীভাবে সময় কাটাবে। কলকাতা শহরটাকে, বিশেষত সাহেবপাড়াকে সেও খুব ভালবাসত। অফিস ছুটির পর মেসের আবদ্ধ পরিবেশে না ফিরে গিয়ে সে সাহেবপাড়ার গলি খুঁজিতে ঘুরে বেড়াত। কখনও কখনও মেট্রো কিংবা গ্লোবে সিনেমা দেখত। যদিও তার সবথেকে ভাল লাগত ইংরেজি বইয়ের দোকানগুলোতে ঘুরে বেড়ানো। কত বই সে না কিনেই শুধুমাত্র দোকানে দাঁড়িয়ে ব্লার্ব পড়ে সেই বইটির বিষয়ে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। ইংরেজি বইয়ের দাম বরাবরই বেশি। বিশ্বদেবের পক্ষে প্রিয় বইগুলো কেনা তো আর সম্ভব ছিল না। তবে নারী-ব্যবসার মতন বইয়ের ব্যবসাও পৃথিবীতে সম্ভবত অতি প্রাচীন। এবং সেই ব্যবসার শর্তগুলিও অনেকদিন ধরে একভাবেই চালু আছে। ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে রহমান বলে এক মুসলমান ভদ্রলোকের বইয়ের দোকান ছিল। বিশ্বদেব সেই দোকানে প্রায় যেত। বই দেখত উল্টে-পাল্টে। দু-একটা কিনেও নিত কখনও সখনও। রহমান হয়তো লক্ষ করে থাকবে বইয়ের প্রতি বিশ্বদেবের আগ্রহ। তার অভিজ্ঞ চোখ এটাও হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে, এই ছোকরার বই পড়ার খুব নেশা। কিন্তু বই কেনার রেস্ত পকেটে তেমন নেই। বৃদ্ধ রহমানই একদিন প্রস্তাব দিয়েছিল বিশ্বদেবকে। ইচ্ছে হলে সে দোকান থেকে বই নিয়ে যেতে পারে। কয়েকদিন রেখে পড়ে আবার ফেরত দিতে হবে। তার জন্যে দু আনা পয়সা ভাড়া চাই রহমানের। শুধু একটাই শর্ত। বই যেন নোংরা না হয় কিংবা ছিঁড়ে না যায়। সেই প্রস্তাবে বিশ্বদেব এক কথায় রাজি। এবং এভাবেই সে রহমানের দোকান থেকে পড়ে ফেলেছিল কতই না বই।

থ্যাকারের সেই বিশালবপু উপন্যাসটি অবশ্য বিশ্বদেব রহমানের দোকানে আগে দ্যাখেনি। তবে উপন্যাসটির বিষয়ে এবং থ্যাকারে সম্বন্ধে সে অনেককিছু জেনেছে 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্র থেকে। জানার পর বইটি সম্বন্ধে খুবই আগ্রহ জন্মেছিল তার মনে। সত্যপ্রিয় মনোযোগ দিয়ে হিসেব দেখছিলেন। নীরদবরণ চুরুট টানছিলেন আর দেয়ালের ছবির দিকে আনমনে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ বিশ্বদেব সপ্রতিভ গলায় জিগ্যেস করেছিল—ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যার....মে আই সি দিস বুক?

নীরদবরণ চমকে তাকিয়েছিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন বিশ্বদেবের দিকে। মার্চেন্ট ফার্মের এক সামান্য কেরানি। ভেতো বাঙালি। সে থ্যাকারের নভেল সম্বন্ধে আগ্রহ দ্যাখাচ্ছে!

নীরদবরণ বলেছিলেন—ডু ইউ রিড ইংলিশ ফিকশান? অ্যাম আই টু বিলিভ ইট?.....তাকে অবাক করে বিশ্বদেব স্পষ্ট স্বরে জানিয়েছিল বাংলাতেই, যে, সে অনেক ইংরেজি উপন্যাস পড়েছে। এমনকী থ্যাকারের বিষয়েও জানে।

নীরদবরণ সত্যিই অবাক হয়েছিলেন। তাঁর কপালে যে কুঞ্চন ছিল তা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। তিনি সাগ্রহে বইটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বদেবের দিকে।—ইয়েস ইউ মে সি ইট।....মাত্র দু-মিনিট নিয়েছিল বিশ্বদেব বইটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে। পেছনের মলাটের ব্লার্বটিও সে পড়েছিল। নীরদবরণ লক্ষ করেছিলেন বিশ্বদেবকে। তার দু-চোখে যে আগ্রহ ফুটে উঠেছিল সেটি বুঝতেও তাঁর ভুল হয়নি। কে এই ছোকরা? তিনি মনে মনে সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। মার্চেন্ট ফার্মের এক অতি সাধারণ কেরানি। পরনে ধুতি আর সাবান-কাচা শার্ট ছোকরার। নিতান্ত ভেতো বাঙালির মতন চেহারা। পায়ে পাম্প শু। বিবর্ণ। অনেকদিন পালিশ পড়েনি দেখলেই বোঝা যায়। তবে ছোকরার শরীরের গড়ন মন্দ না। বেশ লম্বা মাথায় ছ ফুট কি হবে?....নাহ অতটা নয়। তবে পাঁচ ফুট দশ কিংবা এগারো তো বটেই। গোলগাল চেহারা নয়। বেশ বলিষ্ঠই

বলা যায়। এক নজর দেখে সেদিন বিশ্বদেবকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তবে তার লম্বা-চওড়া চেহারার কারণে পছন্দ হয়নি। মার্চেন্ট ফার্মের একজন কম মাইনের কেরানি ইংরেজ লেখক থ্যাকারের বিষয়ে আগ্রহী এটা জেনেই আসলে মনে মনে চমৎকৃত হয়েছিলেন নীরদবরণ। বইটা উলটে-পালটে দেখে বিশ্বদেব টেবিলে রেখে দিয়েছিল। তখন নীরদবরণ তাকে বলেছিলেন—বইটা পড়ার কি খুব ইচ্ছে হচ্ছে? বিশ্বদেব লাজুক হেসে উত্তর দিয়েছিল—নাহ ঠিক আছে।....বইটা কোন্ পাবলিকেশনের সেটা দেখে নিলাম। একসময় কিনে নেব। টাইমস লিটারেরি সাপলিমেন্ট পত্রিকায় এই বইটার একটা রিভিউ চোখে পড়েছিল। আমাদের ইন্ডিয়ার কথা আছে। ক্যালকাটার কথাও আছে। থ্যাকারে তো অনেকদিন ক্যালকাটায় ছিলেন।

—টাইমস লিটারেরি সাপলিমেন্টও পড়া হয় নাকি?—নীরদবরণের চোখ এবার সত্যিই ছানাবড়া। বাব্বা! এ ছোকরা তো কয়লার বেশে সাক্ষাৎ হিরে!

—হ্যাঁ। পড়ব না কেন? ওয়াই এম সি এ-তে গেলেই তো পড়তে পারা যায়।

হিসেবের যে কাগজটা বিশ্বদেব সত্যপ্রিয়র হাতে দিয়েছিল সেটা তাঁর দেখা শেষ। হিসেবটা ঠিকই আছে। এদিকে যে আলোচনা অন্যদিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। অফিসের মধ্যে বই-ফই নিয়ে আলোচনা একেবারেই পছন্দ নয় সত্যপ্রিয়র। তার ওপর আবার সাহিত্য-ফাহিত্য। লিটারেচর! যা দু চক্ষের বিষ সত্যপ্রিয়র।....নীরদ-টার অনেকরকম ঢং-ঢাং আছে যে তা জানেন সত্যপ্রিয়। সব সময় সাহেব সেজে বেড়াতে হবে। শালা যাবি তো এখন পার্কস্ট্রিটের বারে মদ গিলতে আর অ্যালো-ইন্ডিয়ান ট্যাঁশ মেয়েদের হেঁড়ে আর বেসুরো গলার গান শুনতে। তখনও হাতে ইংরেজি নভেল না নিলে চলছিল না? সত্যপ্রিয় গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন—বিশ্ববাবু, এটা রাখুন।

—হ্যাঁ স্যার।—শশব্যস্ত হয়ে বিশ্বদেব সত্যপ্রিয়র হাত থেকে কাগজের তাড়াটা নিয়ে ছিল।

—মোটামুটি ঠিকই আছে; সত্যপ্রিয় বললেন,—বাট দেয়ার আর সাম টাইপোগ্রাফিক্যাল মিসটেকস....।

—আচ্ছা স্যার। আমি দেখে নিচ্ছি। আসলে তাড়াহুড়োতে...

—হ্যাঁ। আরও কনসেনট্রেট করুন। আচ্ছা আমি এখন একটু বেরোচ্ছি। সন্ধে ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ ফিরব। আপনি তো আবার সাড়ে পাঁচটাতে লিভ করবেন।

—যদি দরকার হয় আমি থাকতে পারি স্যার...।

—নাহ তার দরকার নেই। আপনি ফ্রেশ টাইপ করে ম্যাটারটা আমার টেবিলে রেখে যাবেন! আমি কখন ফিরি...নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হেসেছিলেন সত্যপ্রিয়! তিনি জানেন তাঁর এই বন্ধুটির সঙ্গে মদের টেবিলে বসলে তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়া যায় না।

—তবে যত রাতই হোক আমি অফিসে একবার ফিরবই। আমার ব্রিফকেস রয়ে গেল...।

—ঠিক আছে স্যার। আমি পেপারস আপনার টেবিলে রেখে দেব।

—ও. কে।...চল হে ব্রাদার... নীরদবরণকে বলেছিলেন সত্যপ্রিয়। ওরা দুজনে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অফিসের সামনে নীরদবরণের গাড়ি অপেক্ষমান ছিল। তাতে দুজনে উঠে বসেছিলেন। আসলে সেদিন সত্যপ্রিয় একটু ঝাড়া হাত-পা ছিলেন। তাঁর বস, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাডসন সাহেব লন্ডনের সাসেক্সে নিজের বাড়িতে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে অফিসের সর্বেসর্বা সত্যপ্রিয়ই। যেহেতু তাঁর ওপর বসের নজরদারি নেই, তাই তিনিই দুপুরের দিকে ফোন করেছিলেন নীরদবরণকে। বিকেলের দিকে পানভোজনের মজা লুটবার জন্যে। দুজনকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে গাড়ি ছুটছিল। নীরদবরণ হঠাৎ বন্ধুকে জিগ্যেস করেছিলেন—তোমার অফিসের ছোকরাটির নাম কী হে?

—কার কথা বলছ? অ্যাকাউট্যান্ট?

—হ্যাঁ।...এই যে ছোকরা? থ্যাকারে সম্বন্ধে ইনটারেস্ট দেখাল।

—বিশ্বদেব ব্যানার্জি।

—ব্যানার্জি?...বাহ...! নীরদবরণ অস্ফুটে বলেছিলেন।

—বাহ কী হে?—সত্যপ্রিয় সত্যিই অবাক হয়েছিলেন।

—ছেলেটি কাজ কর্ম কেমন করে?

—ভালই তো।...নট ব্যাড। বেশ সিনসিয়ার।

—খুব স্ট্রেঞ্জ লাগল...নীরদবরণ বিড়বিড় করছিলেন।

—কী স্ট্রেঞ্জ লাগল?

—আ লো-পেড বেঙ্গলি ক্লার্ক ইজ অ্যা রিডার অব ইংলিশ ফিকশানস! নর্মালি ইট ডাজ নট হ্যাপেন...।

সেই যে ভাল লেগে গিয়েছিল বিশ্বদেবকে, নীরদবরণ কয়েকদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সত্যপ্রিয়র সঙ্গে কথা বলে বিশ্বদেবকে একদিন ডেকে পাঠালেন নিজের অফিসে। প্রথমে থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' বইটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—আই হ্যাভ ফিনিশড দ্য বুক। নাও ইউ মে রিড ইট। বিশ্বদেব খুশি হয়েছিল। সে তখনও বইটি জোগাড় করতে পারেনি। বিশ্বদেবকে বেশ খাতির-যত্ন করেছিলেন নীরদবরণ। ভীমনাগের সন্দেশ খাইয়েছিলেন। তারপর কফি। আর অনেক কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বিশ্বদেবের বাড়ি কোথায়। বাড়িতে কে কে আছে ইত্যাদি। বিশ্বদেব যে তার বাবা-মা মারা যাবার পর দেশের বাড়িতে তেমন যায় না, দাদা-বউদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার মনে করে না, কলকাতায় মেসে নিজের স্বাধীন জীবন যাপন করে; এসব বৃত্তান্ত জেনে মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছিলেন নীরদবরণ। তারপর একদিন তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হাওড়ার বাড়িতে। নিজের অফিসের গাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বদেব লোভে লোভে গিয়েছিল। অনেক ইংরেজি নভেল দেখতে পাবার লোভে। তার তখন সত্যিই খুব বই পড়ার নেশা। নীরদবরণের মনে যে অন্য মতলব খেলছে তা সে কীভাবে জানবে?

এক হাত ঘোমটা টেনে যূথিকা চা-মিষ্টি দিতে এসেছিলেন। তার পেছনে জলের গ্লাস হাতে সুনীতিও এসেছিল। নীরদবরণ হঠাৎ বলেছিলেন বিশ্বদেবকে—এই আমার বড় মেয়ে সনু, সুনীতি। বিশ্বদেব উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করেছিল। এটা পুরোপুরি সাহেবি সহবত। নীরদবরণের ভাল লেগেছিল। প্রথমদিন ছোটখাটো চেহারার, গোলগোল, ফর্সা সুনীতিকে দেখে বেশ ভালই লেগেছিল বিশ্বদেবের। দেখেই মনে হয়েছিল সুনীতি খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে। একটু যেন লাজুকও। জড়োসড়ো। সেদিন নীরদবরণ যেচেই যেন আরও একখানা নভেল পড়তে দিয়েছিলেন বিশ্বদেবকে। সেই নভেলের নাম লে মিজারেবলস। লেখক ভিক্টর হুগো। বইটা বিশ্বদকে দিয়ে নীরদবরণ বলেছিলেন—রিড রিড অ্যান্ড রিড। যারা পড়ে, বিশেষত ইংরেজি ফিকশন পড়ে, আই লাইক দেম।

নীরদবরণ বিশ্বদেবকে বুঝেই এগোচ্ছিলেন। তিনি জানতেন, বইয়ের টানে বিশ্বদেব তাঁর বাড়িতে আসবে। বারবারই আসবে। বিশ্বদেব সত্যিই আসত। বই ফেরত দিয়ে আবার বই নিয়ে যেত। নীরদবরণ কতরকম গল্প করতেন তার সঙ্গে। মাঝে মাঝে সুনীতির সঙ্গে দ্যাখা হত। বিশ্বদেবের মুখোমুখি হলেই সুনীতি ফিক্ করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিত। কেন যে সে বিশ্বদেবকে দেখে হাসত কে জানে! বিশ্বদেবকে দেখলে কি হাসি পায়?

নীরদবরণ পাকা সংসারি মানুষ। বিশ্বদেবের আসাযাওয়া চলছে তাঁর বাড়িতে মাস তিন চার। তিনি আবার কোনও ব্যাপারে ঢাকঢাক-গুড়গুড় ভালবাসেন না। একদিন তিনি বিশ্বদেবকে প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটা হল আর কিছুই নয়। সুনীতির বিয়ে দিতে চান তিনি বিশ্বদেবের সঙ্গে।

—যদি তুমি চাও তোমার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারি। তাঁদের ওপিনিয়ন নেওয়াও তো বোধহয় দরকার। —বলেছিলেন নীরদবরণ। বিশ্বদেবকে চিন্তিত দেখিয়েছিল। সে বলেছিল—আপনাকে আমার বাড়ির ব্যাপারটা জানানো হয়নি। হয়তো দরকার পড়েনি তাই। আমার জীবনের ব্যাপারে যা কিছু ডিসিশান আমার নিজেরই। গাঁয়ের বাড়িতে আমার বড় দাদারা আছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁরা কেউ আমার অভিভাবক নন। আমার গার্জেন আমি নিজে...।

বিশ্বদেবের মুখে একথা শুনে নীরদবরণ মনে মনে আহ্লাদিতই হয়েছিলেন। মেয়ের বাবা হিসেবে তিনি তো চাইবেনই যে জামাইয়ের পায়ে তার নিজের পরিবারের ডালপালা যতো কম জড়িয়ে থাকে ততই ভাল। পৃথিবীর সব শ্বশুররা বোধহয় চান যে, জামাই শুধু তাদেরই হোক, শুধু তাদেরই। অতীতের সব সম্পর্ক, পারিবারিক টান তারা ক্রমশ বিস্মৃত হোক। তারা শুধু বর্তমান নিয়ে থাকুক। তাদের জীবনের একমাত্র মোক্ষ হোক নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে হইহই করে বেঁচে থাকা।

বিশ্বদেব বলেছিল—আমাকে কয়েকটি দিন সময় দিন ভাবতে। তারপর আমার সিদ্ধান্ত জানাব।

নীরদবরণ উত্তর করেছিলেন—ভেবো না মেয়েকে তোমার হাতে আমি যেন তেন প্রকারে গচাতে চাই। সুনীতি আমার খুব ভাল মেয়ে। ওর নাম যেরকম। ওর স্বভাবও সেরকম। আর আমি তোমার যা যা প্রাপ্য সবই দেব। টাকাপয়সার অভাব নেই আমার সেটা তো বুঝেছ নিশ্চয়ই।

চমৎকৃত হয়েছিলেন নীরদবরণ, যখন বিশ্বদেব মৃদু হেসে জানিয়েছিল—এ বিয়ে যদি আমি করি তাহলে জানবেন আমার কোনও চাহিদা থাকবে না। এটা আমার প্রথম শর্ত।

—তুমি না নাও কিছু, আমার মেয়েকে তো আমি যা দেবার দেব।

—সেটা আপনার ব্যাপার।....আপনার মেয়ের সঙ্গে আপনার ব্যাপার।

১৯২৭ সালে একজন যুবকের পক্ষে এই কথা বলা বড় সহজ ছিল না।

ঠিক তিনদিন বাদে বিশ্বদেব নীরদবরণকে জানিয়েছিল যে সে বিয়েতে রাজি। সুনীতির সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। বিশ্বদেবের গাঁয়ের বাড়ি থেকে বিয়েতে তেমন কেউ আসেনি। শুধু তার বড় দাদা এবং বউদি এসেছিলেন। বিবাহ-পর্বের পর নীরদবরণ যেমন ভেবেছিলেন তেমনই ঘটতে লাগল সব। বউ-কে নিয়ে কোথায় আর বাড়ি ভাড়া করে থাকবে বিশ্বদেব? তখন কলকাতায় কিংবা তার লাগোয়া অঞ্চলে ভাড়া বাড়ি তেমন পাওয়াই যেত না। বাড়িওলা-ভাড়াটের বিচিত্র কালচার তখনও বাঙালির জীবনে তেমনভাবে অনুপ্রবেশ করেনি। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার এবং নেওয়ার চল শুরু হয়. ঠিকমতো বলতে গেলে, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে। যখন কলকাতায় প্রথম জাপানিরা বোমাবর্ষণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তখন অন্তিম সময়। কীভাবে যেন ভারতবর্ষে এবং অযাচিতভাবে কলকাতাতেও সেই তালগোল-পাকানো যুদ্ধের আঁচ ধেয়ে এল। কলকাতায় বোমা পড়ার পর দলে দলে মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে লাগল। তারপর আরও কয়েক বছর পর দেশভাগ হল। ওপার বাংলা থেকে দলে দলে মানুষ কলকাতায় পালিয়ে এল। বাসস্থানের চাহিদা হল। অনেক ফাঁকা বাড়ি জবরদখল হল। আবার সুযোগ বুঝে অনেক সম্পন্ন গেরস্থ নিজেদের বাড়ির কোনও কোনও ফাঁকা অংশ ভাড়াও দিতে শুরু করল।

যে যাই হোক, তখনকার চালু রীতি অনুযায়ী বিশ্বদেব নীরদবরণের ঘর-জামাই বনে গেল। নীরদবরণের তাতে বেশ নিশ্চিন্ত। মেয়ের বিয়ে হল। মেয়ে ঘরে রইল। আবার বিশ্বদেবের মতো সৎ, শিক্ষিত এবং কর্মঠ জামাইও পাওয়া গেল।

কিন্তু মানুষকে বোঝা কি অতই সহজ? খুব কাছ থেকে না দেখলে কোনও মানুষকেই বোধহয় ঠিকমতো চেনা যায় না। বিশ্বদেবের সব ভাল। নির্বিরোধী, শান্ত, স্ত্রীর প্রতি পুরোমাত্রায় দায়িত্বশীল। কিন্তু সে আবার ভীষণ একরোখা চরিত্রের এবং স্বাধীনচেতা। নিজে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। নীরদবরণের ব্যক্তিত্বের সামনেও সে নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন যেতে দেয়নি। যতদিন যেতে লাগল নীরদবরণের সঙ্গে যেন বিশ্বদেবের এক অদৃশ্য সংঘাত শুরু হল। ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এই সংঘাতের আঁচ পরিবারের অন্য কেউ তেমন অনুভব করত না। শুধু নীরদবরণ অনুভব করতেন। বিশ্বদেবের স্বভাবই যেন হল নীরদবরণের ইচ্ছে অনিচ্ছাকে গুরুত্ব না দেওয়া। তার উপদেশ জাতীয় কথাগুলোকে অগ্রাহ্য করা।

শুভ্রা জন্মাল হাওড়ার বাড়িতে। তার পরের বোনেরও জন্ম মামাবাড়িতে। দ্বিতীয় মেয়ের জন্মের পর হঠাৎ একদিন হাডসন অ্যান্ড হাডসন কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিল বিশ্বদেব। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জেনারেল ম্যানেজার সত্যপ্রিয় মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় বহাল হয়েছিল একজন মাদ্রাজি, যার সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকত বিশ্বদেবের। চাকরি নেই। বেকার বিশ্বদেব। যদিও সে হন্যে হয়ে চাকরির চেষ্টা করছিল। নিজের সাইকেল কোম্পানিতে নীরদবরণও জামাইয়ের চাকরির জন্যে চেষ্টা করছিলেন। হয়েও যেত হয়তো। কিন্তু তাঁকে চমকে দিয়ে বিশ্বদেব একদিন শ্বশুরকে জানাল যে, সে ঝালদার গালা কারখানাতে চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়বে। পরিবারকেও নিয়ে যাবে সেই দুর্গম জায়গায়। নীরদবরণ রাজি হলেন না। এত জায়গা থাকতে ঝালদা? সেই সুদূর মানভূমে মানুষ থাকে? সেখানে তো অসভ্য জংলিরা থাকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বিশ্বদেব সেই চাকরি নিয়েই চলে গেল। সে বোধহয় চেয়েছিল শ্বশুরের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে। প্রথম নাতনি—ফর্সা, সুশ্রী শুভ্রাকে কিছুতেই ছাড়লেন না নীরদবরণ। তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। বছরখানেকের মেজ মেয়েকে কোলে নিয়ে সুনীতি চলে গেল স্বামীর সঙ্গে অনেক অনেক দূরে—ঝালদায়।

ছেচল্লিশ

মি. অ্যারাতুন ভারতে এসেছিলেন ১৮৯০ সালে, যখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। জাতে আর্মেনিয়ান এই সাহেবের জন্ম ১৮৭৫ সালে, পারস্য দেশে। মি. ক্রিট নামে আর এক আর্মেনিয়ানের সাহায্যে কিশোর অ্যারাতুন এ দেশের কানপুরে এসে পৌঁছয়। আর্মেনিয়ানরা বরাবরই পাকা ব্যবসায়ী। বিশেষত চামড়ার ব্যবসায় তারা বরাবরই খুব ঝানু এবং তাদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে তারা ভারতবর্ষকেই বেছে নিয়েছিল। কানপুরে ক্রিট সাহেবের ব্যবসার খুবই রমরমা ছিল। ব্যবসাটা শুধুমাত্র চামড়ারই ছিল না। কানপুরে তার কারখানাতে তৈরি হত প্রধানত ঘোড়ার জিন আর পিস্তল রাখবার চামড়ার খাপ। এই দেশকে নিজেদের শাসনে রাখবার জন্যে ঐ দুটি বস্তুরই ব্রিটিশদের প্রয়োজন ছিল। আর্মেনিয়ান সাহেব ক্রিট-এর ব্যবসায়িক বুদ্ধির কোনও অভাব ছিল না। ব্যবসার পণ্য ঠিক করার কাজে তার দূরদৃষ্টি খুবই সহায় হয়েছিল।

যাই হোক, ক্রীট সাহেবের কারখানায় বেশ কিছু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পারস্যের

জুলফা অঞ্চলে তার দেশ, যেখানে অ্যারাতুনও তখন চরম দারিদ্র আর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠছে। অ্যারাতুনরা অনেক ভাই-বোন। সকলকে মানুষ করে তোলাই তার বাবা-মায়ের মূল সমস্যা। জুলফা গ্রাম থেকে ক্রীট কয়েকজন কিশোরকে সুদূর ভারতে নিয়ে আসতে চেয়েছিল যাদের মধ্যে অ্যারাতুনও ছিল। বাবা-মা-ভাই-বোনকে ছেড়ে কিশোর অ্যারাতুন ক্রিট সাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল নিজের ভাগ্যের অন্বেষণে।

ভারতের কানপুরে পৌঁছে কিশোর অ্যারাতুন প্রথমে চামড়ার পণ্য তৈরির কারখানাতেই কাজে লেগে যায়। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর ক্রিট সাহেব কী কারণে যেন তার ওপর ভীষণ রুষ্ট হয়। ফলে তার চাকরিও চলে যায়। একা এবং অসহায় অ্যারাতুন মহাসঙ্কটে পড়ল। সে কি আবার পারস্য দেশে জুলফা অঞ্চলে ফিরে যাবে? কীভাবেই বা ফিরবে? সে তো হাজার মাইল দূরে। আর তার হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পয়সাই বা কোথায়? জাহাজ ভাড়াই তো লাগবে অনেক টাকা। কিন্তু ভবিষ্যতে যে নিজেই একজন ঝানু ব্যবসাদার হয়ে উঠবে তার প্রতি ভাগ্য বেশ কিছুটা সহায় ছিল বলতেই হবে। যখন বেকার হয়ে কানপুরের রাস্তায় রাস্তায় সামান্য চাকরির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিশোর অ্যারাতুন, তখন সে হঠাৎই নজরে পড়ে যায় আর এক ব্যবসাদার আর্মেনিয়ানের; তার নাম হল মি. ক্যারাপিয়েত। এলাহাবাদ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হ'ল মির্জাপুর, সেখানেও অনেক আর্মেনিয়ান সাহেব নিজেদের দেশ ছেড়ে চলে এসে নানারকম ব্যবসার পত্তন করেছিল। প্রকৃত বেনিয়ার জাত ছিল এই আর্মেনিয়ানরা। তারা ব্যবসা বুঝত, বাজার বুঝত; হিসেব-পত্তরও বুঝত। ক্যারাপিয়েত সাহেব ছোটখাটো এক গালার কারখানা তৈরি করেছিল মির্জাপুরে। তার ব্যবসার কোনও অংশীদার ছিল না। সে নিজেই তার কারখানার একমাত্র মালিক। ভারতে এসে সে কারখানাটির পত্তন করেছিল ১৮৮৩ সালে। মির্জাপুরে আরও অনেক আর্মেনিয়ান গালার কারখানা তৈরি করেছিল। তথ্য থেকে কয়েকজনের নামও পাওয়া যায়। যেমন, আনাদ্রিয়াস ম্যাকারিচ, হ্যাকব কালানথারিয়ান, গলস্তন নাহাপিয়েট।

কিশোর অ্যারাতুনকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ক্যারাপিয়েতের বেশ পছন্দ হয়ে গেল। সে নিজের গালা কারখানাতে ছেলেটিকে সঙ্গে সঙ্গেই বহাল করল। প্রথমে তার বেতন ছিল মাসে ৫০ টাকা, তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া আর থাকার খরচ কোম্পানির। কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যারাতুনের পদোন্নতি হল। সামান্য শ্রমিক থেকে সে ক্যারাপিয়েতের কারখানার ম্যানেজার হয়ে গেল। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় অ্যারাতুনকে। মাত্র ষোলো বছরের কিশোর খুবই দক্ষ হাতে কারখানা পরিচালনা করতে লাগল। মালিক ক্যারাপিয়েত তার কর্মতৎপরতায় সত্যিই মুগ্ধ। কয়েক মাস যেতে না যেতেই ক্যারাপিয়েত আরও বড় দায়িত্ব দিল তার তরুণ ম্যানেজারকে। এবার অ্যারাতুনের কাজটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারখানা বাড়াবার জন্যে আসলে ক্যারাপিয়েতের দরকার ছিল এমন একজন কর্মচারীর যে দেশের নানা প্রান্তে গিয়ে লাক্ষা-কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং কাঁচা লাক্ষা কিনে আনবে মির্জাপুরে। কাঁচা লাক্ষা নানা পদ্ধতির মাধ্যমে ঝাড়াই-বাছাই করে এবং শুকিয়ে যে বস্তুটি বের করে আনা হয় তাকেই বলে গালা। যে কোনও রং-এ যদি গালা মেশানো হয়, (বিশেষত আসবাবপত্রের রং) তাহলে সেই রং-এর উজ্জ্বলতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ে। সে কারণেই রং-ব্যবসায়দের কাছে গালার প্রচণ্ড চাহিদা। শুধু ভারতে নয়, গালার চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপেরও নানা দেশে। ভারতের মানভূম জেলার ঝালদা অঞ্চলে যে মাইল মাইল এলাকা জুড়ে লাক্ষার চাষ করা হত সে খবর ক্যারাপিয়েতের জানা ছিল। অ্যারাতুনের ওপর দায়িত্ব পড়ল ঝালদায় গিয়ে নিয়মিত লাক্ষা-কারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

এলাহাবাদের মির্জাপুর থেকে ঝালদার দূরত্ব হ'ল ৪৫০ মাইল। আর কলকাতা থেকে ২৩০ মাইল। অ্যারাতুন যে সময়ে ঝালদায় গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে, তখন সভ্যতার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল ঐ অঞ্চল। লোকবসতিও তেমন ছিল না। শুধু মাইল মাইল বিস্তৃত রুক্ষ ও টাঁড় জমি। বনবাদাড়ও ছিল বেশ। সেই বনের শোভা ছিল অপূর্ব। শাল, পিয়াল, মহুয়া এবং লাক্ষা গাছে ছেয়ে ছিল সেই বনাঞ্চল। একজন প্রকৃতিপ্রেমীর পক্ষে জায়গাটা আদর্শ মনে হলেও শহুরে মানুষের পক্ষে বিশেষত একজন সাদাচামড়ার বিদেশির পক্ষে ঝালদার মতো জায়গায় গিয়ে থাকা খুব একটা সহজ ছিল না। সেই সময়ের গেজিটিয়ার থেকে জানা যায়, আঠারো শতকের শেষে কিংবা উনিশ শতকের প্রথমে ঝালদায় মোট পরিবার ছিল ৭০ থেকে ১০০ জন। আর ওখানকার মোট লোকসংখ্যা ছিল আনুমানিক দু-হাজার। এই পরিবারগুলোর সবকটিই হল স্থানীয় আদিবাসী শ্রেণির। লাক্ষা-চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা সম্ভব ছিল না। গাছ থেকে উৎপন্ন লাক্ষা ফলের বিক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝখানে ছিল স্থানীয় দালালেরা। তাদের দু-একজন আদিবাসী, অধিকাংশই অবাঙালি হিন্দুস্থানী। ব্যবসার তাগিদে ভারতের নানা অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ছিল ঝালদায়। দালালদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কথাবার্তা বলার জন্যে অ্যারাতুন সাহেবকে তখন প্রায়ই ঝালদায় গিয়ে থাকতে হত। রাত কাটাবার জন্যে সেখানে না ছিল কোনও পাকা বাড়ি, না ছিল বাংলো। সাহেবকে থাকতে হত খড়ের চালের মাটির বাড়িতে। সাহেবদের প্রিয় মাখন-টোস্ট, মোর্গমোসল্লম কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব ছিল না। অ্যারাতুন সাহেবের কপালে জুটত হাতে গড়া বিঘত সাইজের চাপাটি, মুরগি আর দুধ। চিকেনকারি বা চিকেন দো-পিঁয়াজির কথা কল্পনা করাও ঝালদায় অসম্ভব ছিল। সাহেবের পক্ষে চিকেন খাবার উপায় ছিল একটাই। চিকেনকে পুড়িয়ে বা রোস্ট করে খাওয়াই সবথেকে আদর্শ ছিল। দুধ ছিল খুব সস্তা। মাত্র এক টাকায় ১৮ থেকে ২০ সের। এক একটা গোটা মুরগির দাম ছিল আধ আনা যা শুনলে হয়তো হাসিই পাবে। আর চালের দাম ছিল এক টাকাতে ৩০ থেকে ৩৫ সের।

মাত্র ২৩ বছরের অ্যারাতুন সাহেবের চরিত্রের সব থেকে বড় গুণ ছিল, যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া। পাকা বাড়ি নেই। বিদ্যুৎ নেই। পাখা নেই। মোটা মোটা মোমবাতি, রেড়ির তেলের প্রদীপ কিংবা পয়সা ফেললে পেট্রোম্যাক্স-এর আলো হয়তো সাহেবের জন্যে মিলত। আর দুবেলা আটার চাপাটি, বড় বড় ঘটির খাঁটি দুধ এবং মুরগার রোস্ট। এরকম থাকা এবং খাওয়ার সঙ্গেই ক্রমশ বেশ মানিয়ে নিলেন নিজেকে যুবক অ্যারাতুন। তাঁর মনে কোনও বিরক্তি নেই। বরং খোশ মেজাজেই থাকেন। স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথাবার্তা বলে মেলামেশার চেষ্টা করেন। আর দালালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান বন থেকে বনান্তরে লাক্ষা চাষের হাল-হকিকত জানতে। দালালদের সঙ্গে সমঝোতা করে কাঁচা লাক্ষা কিনে নিয়ে যান মির্জাপুরে। ক্যারাপিয়েত সাহেবের কারখানায় সেই কাঁচা লাক্ষা থেকে শ্রমিকেরা বের করে আনে গালা-কাঠি। খুবই মূল্যবান বস্তু। তোরঙ্গ-বোঝাই গালা-কাঠি কলকাতা বন্দর হয়ে রপ্তানি হয় লন্ডনে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে। ঝালদা থেকে দরদস্তুর করে কাঁচা লাক্ষা কিনে আনার বিনিময়ে ক্যারাপিয়েত কমিশন দিয়ে থাকেন অ্যারাতুনকে। সেই কমিশন সঞ্চয় করে যুবক অ্যারাতুনের হাতে বেশ মোটা টাকা হল। সেই টাকা তিনি কী কাজে ব্যয় করবেন? ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি অন্য এক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

বুড়ো ক্যারাপিয়েতকে একদিন প্রস্তাব দিলেন অ্যারাতুন। ঝালদায় একটা গালা কারখানা খোলার যথেষ্ট সুযোগ আছে। সেখানে অফুরন্ত লাক্ষার চাষ হয়। কাঁচামালের কোনও অভাবই নেই। শুধু সেই কাঁচা মাল থেকে গালা-কাঠি তৈরির জন্যে একটা কারখানা, কয়েকজন মজুর ও ন্যূনতম

কিছু যন্ত্রপাতি দরকার। ক্যারাপিয়েত সাহেব সেখানে আর একটা কারখানা খুলুন না? সেই কারখানার ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকবেন না-হয় অ্যারাতুন নিজেই। এই প্রস্তাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও ক্যারাপিয়েত সাহেবের তা মনঃপূত হল না। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মির্জাপুরের গালা-কারখানা রমরম করে চলছে। অনেক টাকার মালিক তিনি। বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে ঝালদার মতো 'অসভ্য' জায়গায় গিয়ে নতুন এক কারখানা খোলার ব্যাপারে তেমন কোনও উৎসাহ পেলেন না সেই আর্মেনিয়ান বৃদ্ধ। বরং যুবক অ্যারাতুনকেই তিনি ঝালদাতে একটা ছোটখাটো গালা কারখানা শুরু করার ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। প্রস্তাবটা মনে ধরল অ্যারাতুনের।

কয়েকমাস পর মির্জাপুরের কয়েকজন শ্রমিক এবং কিছু যন্ত্রপাতি জোগাড় করে তিনি ঝালদাতে এসে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করলেন। এবং ছোটখাটো একটা কারখানাও চালু করলেন ঝালদাতে। মাত্র বছরখানেকের মধ্যে অ্যারাতুনের গালা-কারখানা বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। স্থানীয় আদিবাসীরা অনেকেই কাজ পেল সেই কারখানায়। বিয়ে করলেন অ্যারাতুন। নিজেদের থাকার জন্যে গড়ে নিলেন বাংলো। কর্মচারীদের থাকার জন্যে তৈরি হল সারি সারি পাকা বাড়ি যার স্থানীয় নাম ছিল কুঠিবাড়ি। শুরু হয়ে গেল ঝালদায় আর্মেনিয়ান সাহেব এ. এম. অ্যারাতুনের রাজত্ব। তাঁর রাজত্বে অবশ্য কোনও সন্ত্রাস ছিল না। স্থানীয় মানুষদের জুতোর তলাতে রাখার কোনও চেষ্টাই তিনি কোনও দিন করেননি। বরং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন এই ভিনদেশি এবং বিচক্ষণ ব্যবসাদার। তাঁর কারখানাতে ঝালদার মানুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগও ছিল নিয়মিত। কারখানার শ্রমিকদের মজুরির হারও খারাপ ছিল না। স্থানীয় পুরুষ-শ্রমিক প্রতিদিন কাজের বিনিময়ে রোজগার করত দু-আনা। আর মহিলা-শ্রমিকদের দিনপিছু মজুরি ছিল দেড় আনা। সেই সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মজুরির হারের তুলনায় ঝালদাতে অ্যারাতুন সাহেবের গালা-কারখানায় এই মজুরির হার যথেষ্ট বেশি ছিল।

অ্যারাতুন সাহেবের কারখানায় হিসাব-পরীক্ষকের চাকরি নিয়ে বিশ্বদেব চলে এসেছিল ১৯২৭ সালে। যখন তার প্রথম কন্যাসন্তান শুভ্রার বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আর মেজ কন্যাসন্তানের বয়স মাত্র ছ মাস। শুভ্রা থেকে গেল হাওড়াতে দাদুর কাছে। বিশ্বদেব স্ত্রী সুনীতি আর মেজ মেয়েকে নিয়ে সংসার শুরু করল গালা-কারখানার কুঠিবাড়ির একটিতে। সে যে বাড়িটাতে থাকত তাতে বড় বড় চারটি ঘর, উঠোনে পাতকুয়ো এবং বাথরুম। থাকার পক্ষে বাড়িটা বেশ প্রশস্ত এবং খোলামেলা। শুধু যা একটু সাপের উপদ্রব। সব সময় যে বিষধর সাপ দেখা যেত তা নয়। যা প্রায়ই দেখা দিত তা হ'ল দাঁড়াশ সাপ। এই সাপ দৈর্ঘে প্রায় পাঁচ কিংবা ছ ফুট হয়ে থাকে। খুব দ্রুত ছুটতে পারে। তবে নাকি একেবারেই হিংস্র এবং বিষধর নয়। মানুষ দেখলেই ভয়ে পালায়। তবে তাদেরও হঠাৎ দেখতে পেলে যে কোনও মানুষের ভয় হবারই কথা। কত কত রাতে চাঁদের আলোতে বিশ্বদেব কিংবা তার স্ত্রী সুনীতি দেখেছে চকচকে এবং দীর্ঘ শরীর নিয়ে দাঁড়াশ সাপ শুয়ে আছে আড়াআড়ি কুঠিবাড়ির ছড়ানো উঠোনে। মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই তারা চকিতে আত্মগোপন করেছে। কোনওদিন কারোর ক্ষতি করেনি। সে কারণেই বিশ্বদেব কোনওদিন তাদেরও ক্ষতি করতে চায়নি। বিশ্বদেবের কাজে অ্যারাতুন সাহেব খুবই খুশি ছিলেন। এরকম সৎ এবং দক্ষ কর্মচারী তাঁর কারখানাতে বোধহয় আর কেউ ছিল না! অ্যারাতুন সাহেব কখনও তাঁকে ডাকতেন মি. অ্যাকাউনট্যান্ট কিংবা 'বেঙ্গলি-বাবু' বলে। আর স্থানীয় মানুষরা বিশ্বদেবকে ডাকত 'অ্যাকাউন-বাবু' বলে। ক্রমে এই ঝালদাতেই বিশ্বদেবের পরপর আরও দুই পুত্রসন্তান জন্মায়। তাদের একজনের নাম রাখা হ'ল দীনেশ। আর একজনের দিবাকর। দেখতে

দেখতে দীর্ঘ চোদ্দো বছর কেটে গেল ঝালদায় বিশ্বদেবের। তার মেজ বা ছোট মেয়ের বয়স এখন সাড়ে তেরো বছর। দুই ছেলের বয়স যথাক্রমে দশ এবং বারো।

এখন আমরা বলছি একটা সকালের কথা। ১৯৪১ সালের এক সকাল। অ্যারাতুন সাহেবের অফিস-ঘর। বিশাল টেবিলের ওপারে অ্যারাতুন বসে আছেন। তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। কিন্তু বার্ধক্য তাঁর শরীরে বা চেহারায় তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর ঠোঁটে পাইপ। মাথায় চকচকে টাক। পরনে স্পোর্টস গেঞ্জি এবং হাঁটু পর্যন্ত খাকি হাফপ্যান্ট। যে প্যান্টকে আমরা এই একুশ-শতকে বারমুডা বলে থাকি। অ্যারাতুন সাহেবের সামনে টেবিলে কিছু অফিসের কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। আর টেবিলের নীচে তাঁর পায়ের কাছে শান্তভাবে বসে আছে এক বাঘের মতো চেহারার অ্যালশেসিয়ান।

কথা হচ্ছিল, বিশ্বদেবের ছুটি নিয়ে। বিশ্বদেব বেশ কয়েকদিনের ছুটি চায়। তাকে কলকাতা যেতে হবে। একা নয়, সপরিবারে। সাধারণত ছুটিতে যে সে খুব একটা যায় তা নয়। মোটামুটি বছরে দুবার সে ছুটি নিয়ে থাকে। একবার পুজোর সময়। আর একবার খ্রিস্টমাসে। শরৎকাল এলে, পুজো এলেই গড়পড়তা বাঙালির মতো বিশ্বদেবের মনটাও ঢাকের বাদ্যি শোনার জন্যে আনচান করে ওঠে। সেসময় কি এই কোল, ভীল, মুন্ডা আর সাঁওতালদের সঙ্গে এই রুক্ষ বিদেশে পড়ে থাকা যায়? তার স্ত্রী সুনীতি এমনিতে বড় চুপচাপ। মুখ তুলে কথা প্রায় বলে না বললেই চলে। বিশ্বদেবের সব ব্যাপারেই যেন তার একমত হওয়া স্বাভাবিক। স্বামীর সঙ্গে সুনীতি কবে যে তর্কাতর্কি করেছে সেটা বিশ্বদেবও চেষ্টা করলে মনে করতে পারবে না। কিন্তু পুজোর সময় যত এগিয়ে আসে সুনীতিও যেন কীরকম অধৈর্য হযে ওঠে। সে প্রায়ই স্বামীকে জিজ্ঞেস করে—আমরা এবার কবে কলকাতা যাচ্চি গো? মহালয়ার আগেই পৌছব তো? ....হ্যাঁগো এবার আমাকে রামকানাই যামিনীরঞ্জন পালের দোকানে নিয়ে যাবে তো? একটা ভাল শাড়ি কিনে দেবে তো?....বিশ্বদেব রাগ করে না। হেসে বলে--হ্যাঁগো হ্যাঁ দেব দেব। শুধু তো তোমার জন্যে নয়। ছেলেমেয়েগুলোর জন্যেও তো কেনাকাটা আছে। আর আমার শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িমাতাই বাদ যাবেন কেন? তাঁদের জন্যেও তো কিছু কিনতে হবে...।

আর খ্রিস্টমাস কিংবা বড়দিন এলে ডিসেম্বরের শেষদিকে অ্যারাতুন সাহেব নিজেই ফ্যামিলি নিয়ে চলে যান কলকাতা। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আরমেনিয়ানদের কলেজ আছে। তার ঠিক পেছনে একটা বাড়িও আছে অ্যারাতুন সাহেবের। সেই বাড়ি তিনি নাকি কিনেছেন আর এক আরমেনিয়ান কারমাইকেল সাহেবেব কাছ থেকে। কারমাইকেল এদেশ ছেড়ে চলে গেছে কানাডা। আর ফিরবে না। নিজের বাড়ি বিক্রি করে গেছে অ্যারাতুনকে। বড়দিনের কদিন, অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় খুব আমোদ-আহ্লাদ করেন অ্যারাতুন সাহেব। শুধু তাই বা কেন। নিউ ইয়ার্স ডে তিনি উপভোগ করেন দারুণভাবে। অ্যারাতুন সাহেবের খানসামার মুখ থেকে শুনেছে বিশ্বদেব যে ইংরেজি বছরের প্রথম দিনটিতে সাহেব নাকি সকাল থেকে মদ্যপান শুরু করেন। সন্ধেবেলা পার্টিতে এই বুড়ো বয়সেও খুব খানিকটা নাচানাচি করেন। তারপর প্রায় বেহুঁশ হয়ে মাঝরাতে নিজের বাড়ি ফেরেন। তখন তাঁকে দেখে কে বলবে যে, তিনি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, দিনের পর দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এতবড় একটা গালা-কারখানা গড়ে তুলেছেন মানভূমের ঝালদার মতো ছোট ছোট টিলা, নদী আর অরণ্য দিয়ে ঘেরা পুরোপুরি এক অনুন্নত অঞ্চলে। বছরের শেষ দিনগুলোতে আর নতুন বছরের প্রথম কদিন অ্যারাতুন সাহেব থাকেন না ঝালদায়। তাঁর কারখানাও বন্ধ থাকে। তখন আর বিশ্বদেবই বা এখানে পড়ে থেকে কী করবে? সেও নিজের পরিবারের সব্বাইকে নিয়ে চলে আসে কলকাতায়। কাটিয়ে যায় শ্বশুরবাড়িতে। সুমতি

আর ছেলেমেয়েদেরও একটু মুখ বদলানো হয়।

অ্যারাতুন সাহেবের অফিস-ঘরে কিছুক্ষণ আগেই কথা বলতে এসেছে বিশ্বদেব। গতকালই সে শ্বশুর নীরদবরণের টেলিগ্রাম পেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল শ্বশুরের সঙ্গে। একী অদ্ভুত ব্যাপার? নীরদবরণ তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন অথচ তার মতামত নেবার দরকার মনে করলেন না! এরকম কেউ শুনেছে কখনও? মেয়ের বাবা জানতে পারবে না, মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে? টেলিগ্রাম পেয়ে বিশ্বদেবের মাথায় যেন হুড়মুড় করে আকাশ ভেঙে পড়েছিল।....শুভ্রার, সুবুর বিয়ে হয়ে গেছে! কার সঙ্গে বিয়ে হল? কোথায় বিয়ে হল? এত তাড়াহুড়োর কী দরকার ছিল? আর যে কথাটা ভেবে বিশ্বদেবের মনটা জ্বলছে, সেটা হল, সুবুর বিয়ের ব্যাপারে নীরদবরণ নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন? মেয়ের বাবা বহাল-তবিয়তে বর্তমান থাকতে এরকম সিদ্ধান্ত কে তাঁকে নিতে বলেছে? কোন্ অধিকারে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? এত দ্রুত সিদ্ধান্তই বা নিতে হল কেন? কোন্ পরিস্থিতিতে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন তিনি? মৌমাছির ঝাঁকের মতো প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেন হুল ফোটাচ্ছিল বিশ্বদেবের মনে। সে সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামটা বারবার পড়েছিল। নীরদবরণ যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছেন তাতে লেখা ছিল—আই হ্যাভ ম্যারেড শুভ্রা টু আ ভেরি ব্রাইট ব্রইডগ্রুম. দেয়ার হানিমুন ইজ অন ফিফটিন. ডোন্ট ওরি. প্লিজ কাম.—। কী বুঝবে এই ভাষা থেকে বিশ্বদেব? অনেক কিছু যে বোঝার আছে। বোঝার ছিল। মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি এতই সহজ? কতরকম ভাবতে হয়। পাত্র কোথায় থাকে। চাকরি করে কি করে না। বাড়ি-ঘর-দোর কেমন। বাড়িতে কে কে আছে। কোষ্ঠীবিচার করে দেখেও নেওয়া দরকার যে এই যোটকে মিল হবে কি না। সেসব কি দেখা হয়েছে? সব থেকে বড় কথা হল, কী এমন পরিস্থিতি হল যে সুবুর বিয়ে দিতে হল এত তাড়াতাড়ি? তবে কী.....। কথাটা ভেবে বিশ্বদেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। তবে কি সুবু কোনও ছেলের সঙ্গে অবৈধভাবে জড়িয়ে পড়েছিল? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তার মেয়ে এরকম কাজ করবে? আর যাই হোক, নীরদবরণের শিক্ষা-দীক্ষা অন্তত সেরকম নয়। তিনি নিজের কাছে রেখে যে নাতনিকে মানুষ করেছেন সে কি ওরকম কোনও ভুল কাজ করতে পারে? তাহলে কী কারণ এই বিয়ের? এরকম ভাবতে ভাবতেই নীরদবরণের প্রতি বিশ্বদেবের সেই পুরনো রাগটাই যেন আবার চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই লোকটাকে প্রথম যেমন মনে হয়েছিল বিশ্বদেবের, ক্রমশ দেখল তিনি আদৌ সেরকম নয়। সম্পূর্ণ উল্টো। প্রথমে মনে হয়েছিল, নীরদবরণ খুবই স্নেহপ্রবণ এবং অভিজাত মনের মানুষ। নিজেকে পুরোদস্তুর সাহেব ভাবতে পছন্দ করেন। চলনে-বলনে, পোশাকে, জীবনযাত্রায় তিনি সাহেবদের মতো নিখুঁত, কেতাদুরস্ত আর সপ্রতিভ। তাঁর সময়জ্ঞান প্রখর। পড়াশোনা করতে ভালবাসেন। কেউ পড়াশোনা করে জানতে পারলে তাকে পছন্দ করেন। কিন্তু সুনীতির সঙ্গে বিয়ে হবার পর বিশ্বদেব বুঝতে পারল লোকটাকে চিনতে তার কিছুটা ভুল হয়েছে। নীরদবরণের হয়তো গুণ অনেক আছে। সেইসঙ্গে একটা মহা বদগুণও আছে। তিনি একজন পাকা ইগোস্ট। প্রচন্ড অহং-সর্বস্ব মানুষ। নিজের মতামতকেই তিনি সব সময় ধ্রুবসত্য বলে ভাবতে শিখেছেন। অন্যের মতামতকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে চান না। অনেক সময় এরকমও মনে হয়েছে বিশ্বদেবের যে তিনি, নীরদবরণ, মানুষকে মানুষ বলেও ভাবেন না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে থাকতে শুরু করার পরই বিশ্বদেব ক্রমশ বুঝতে পার যে, নীরদবরণ ক্রমশ নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাকে গ্রাস করতে চাইছেন। তার মতামতকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। সব সময়েই সব ব্যাপারে, এমন কী বিশ্বদেবের নিজের সংসারের ব্যাপারেও নীরদবরণই বলবেন শেষ কথা। এটা বুঝতে পারার পরই বিশ্বদেব নিজের ভেতরে ছটফট করত। সে চাইত নীরদবরণের আওতা থেকে

মুক্তি পেতে। একসময় সুযোগও এসে গেল। ঝালদার গালা-কারখানার চাকরিটাই তাকে বাঁচিয়ে দিল। একটা বিষয়ে অবশ্য পরাজয় ঘটেই ছিল বিশ্বদেবের। অনেক চেষ্টা করে, ঝগড়া-ঝাঁটি করেও সে বড় মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। নীরদবরণ জোর করে শুভ্রাকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। কিন্তু মেয়ে তো বিশ্বদেবের। নীরদবরণের নয়। তাহলে কীভাবে তিনি শুভ্রার বিয়ের ব্যাপারে এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

অ্যারাতুন সাহেব বিশ্বদেবকে দেখেই বুঝেছেন। সে জরুরি কথা কিছু বলতে চায়। কী কথা? এইসময় খানসামা ঢুকল গরম কফি আর বিস্কুট নিয়ে। সাহেব আদেশ দিলেন—আউর কফি....ওয়ান মোর কফি অ্যান্ড বিস্কিট ফর মি. অ্যাকাউনট্যান্ট...।

সাতচল্লিশ

অ্যারাতুন সাহেবের গালা-ফ্যাক্টরিতে যত বছর কাজ কবছে বিশ্বদেব একটি বারের জন্যেও সে পুজো এবং খ্রিস্টমাস ছাড়া ছুটি নেয়নি। আর এখন জুন মাস। এখানকার কাজকর্ম এই সময়ে যাকে বলে একেবারে তুঙ্গে। বিশ্বদেবের মাথায় এখন অনেক দায়িত্ব। আগামিকালই পাটনাতে মামলার ডেট পড়েছে। এই কারখানার কাজকর্ম নিয়ে প্রায়ই মামলা হয়। সিভিল কোর্টের মামলা। কোর্ট-কাছারি যা কিছু সব পাটনায়। এখান থেকে বেশ দূর। প্রায় দুশো কিলোমিটার। অ্যারাতুন সাহেব নিজে সেসব মামলার শুনানিতে কোনওদিন হাজির হননি। তিনি তাঁর অ্যাকাউনট্যান্ট বিশ্বদেবকে পাঠান। মামলার ব্যাপার-স্যাপার বিশ্বদেব বোঝেও ভাল। সে পরিশ্রমী মানুষ। সব কিছুকে, বিশেষত তার চাকরির ব্যাপারকে বরাবরই সিরিয়াসলি নিয়ে থাকে। মামলার কাগজপত্র বুঝতে হ'লে সেগুলো মন দিয়ে পড়তে হবে। রিট পিটিশনের কপিতে নানারকম লিগাল টার্ম থাকে। সেসব বুঝতে হয়। ধৈর্য এবং শেখবার অদম্য ইচ্ছে বরাবরই বিশ্বদেবের বেশ প্রবল। যে প্রতিটি মামলার কাগজপত্র বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে (ইংরেজিতে যাকে বলে বিটউইন দ্য লাইনস) পড়ে। লিগাল টার্ম সম্বন্ধেও সে বেশ জানে। আইনের ছোটখাটো বইপত্তরও ঘাঁটাঘাঁটি করে। অ্যারাতুন সাহেব পোড়-খাওয়া মানুষ। তিনি বিশ্বদেবকে ঠিকই বুঝেছেন। বুঝেছেন যে এই 'বেঙ্গলি-বাবু'-র ওপর 'ডিপেন্ড' করা যায়। তাই পাটনা সিভিল কোর্টে গালা ফ্যাক্টরি নিয়ে যাবতীয় মামলার দেখাশোনার দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন বিশ্বদেবকেই। এত বড় অফিসের অ্যাকাউন্টস-এর কাজকর্ম সামলানো ছাড়া মামলার ঝামেলা সামলানো বিশ্বদেবের অতিরিক্ত দায়িত্ব। দু-রকম দায়িত্ব সামলাতে অবশ্য বিশ্বদেবের খারাপ লাগে না। সে কেজো মানুষ। বরাবর কাজ ভালোবাসে।

অ্যারাতুন সাহেব খুবই ভদ্র। জীবনের প্রতি মুহূর্তে বোধহয় এটিকেট মেনে চলেন। তাঁর কফি ও বিস্কুট আর্দালি কিছুক্ষণ আগেই টেবিলে দিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এখনও কফির কাপে চুমুক দেননি। অপেক্ষা করছেন। বিশ্বদেব এই ঘরে আসার পর তিনি আর্দালিকে আরও এক কাপ কফি ও বিস্কুট আনতে বলেছেন। সেসব না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন। এরকমই তাঁর ভদ্রতা।

ইতিমধ্যে অবশ্য প্লেট থেকে তিনি একটি বিস্কুট তুলে নিয়েছেন। সেটি ছুড়ে দিয়েছেন টেবিলের নীচে বসে থাকা বাঘের মতো কুকুরটার দিকে। এই কুকুরটার নাম টম। বিশ্বদেব অ্যারাতুন সাহেবের মুখেই টম-এর নানা গল্প শোনে। অ্যারাতুন তাঁর পোষ্যকে নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতে পছন্দ করেন। টম নাকি ভীষণ 'নটি'। নানারকম দুষ্টামি করে থাকে তার মনিবের সঙ্গে। এ কারণেই নাকি তিনি ওর নাম রেখেছেন টম সইয়ার। বিশ্বদেব অ্যারাতুনের এই রসিকতার মর্ম ভালোই

বোঝে। আসলে মার্ক টোয়েন নামে একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক আছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস—'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব টম সইয়ার।' টম সইয়ার হ'ল একজন ভীষণ দুষ্টু ছেলে। বিশ্বদেব সেই বই পড়েছে। পৃথিবীতে কিশোরদের জন্যে যত মজার উপন্যাস লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে, বিশ্বদেবের ধারণা এই বইটাই হ'ল শ্রেষ্ঠ। বিশ্বদেব যে মার্ক টোয়েনের সেই বইটা পড়েছে এবং কুকুরের নাম-মাহাত্ম্য ধরতে পেরেছে এটা জেনে সাহেব সত্যিই খুব খুশি হয়েছিলেন। এরকম ছোট-খাটো ঘটনাই বিশ্বদেবের ওপর সাহেবের আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছে বারবার।

টেবিলের নিচে বসে টম কচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে বিস্কুট চিবোচ্ছে। বিশ্বদেবকে সে ভালোই চেনে। সে কারণেই বিশ্বদেব যখন সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল তখন তার দিকে একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিয়েছিল টম। পরিচিতি বোঝাতে নিজের লেজটা দুবার নাড়িয়েও ছিল। বিশ্বদেবেরও টমকে নিয়ে কোনও অস্বস্তি নেই। সে দিব্যি টেবিলের নীচে পা-দুটো ঢুকিয়ে বসেছে। তার পায়ে অবশ্য পাম্প-শু আছে। মোজা নেই। সাহেবদেব সঙ্গে ওঠাবসা করলেও বিশ্বদেব শীতকাল ছাড়া মোজা ব্যবহার করে না।

আর্দালি এতক্ষণে বিশ্বদেবের জন্যেও এক কাপ কফি এবং বিস্কুটের প্লেট দিয়ে গেছে। অ্যারাতুন এতক্ষণ বাদে আবার কথা বললেন—ইয়েস বাবু—হ্যাভ ইওর কফি। —এই বলে নিজেও কফিতে একটা আরামের চুমুক দিলেন। কফির কাপে মৃদু এক চুমুক দিয়েই বিশ্বদেবের মুখটা বিস্বাদ হয়ে গেল। আর্দালিটা বোধহয় কোনও কারণে আজ সকালে মনে মনে চটে আছে। তা না হ'লে সে বিশ্বদেবের কফিতে চিনি দিতে ভুলে যাবে কেন? চিনি-ছাড়া কফি বিশ্বদেব একেবারেই মুখে তুলতে পারে না। চিনি-ছাডা চা তবুও চলে। কিন্তু অ-চিনি কফি এক চুমুক খাওয়াও বেশ শক্ত। সাহেবের আসল কুক কিংবা রাঁধুনি হলে এই ভুল করত না। এই গোমড়া-মুখো আর্দালিটাই বোধ হয় ইদানীং সাহেবের রান্নাবান্না করছে। কফিও মনে হয় সেই বানিয়েছে। সচরাচর এরকম হয় না। অ্যারাতুন সাহেবের বাংলোয় এলে খুব সুস্বাদু এবং সুগন্ধ চা কিংবা কফি পাওয়া যায়। আসলে সাহেবের আসল কুক রহমান না থাকায় এই বিপত্তি। রহমান কবে ফিরবে কে জানে। সে আসলে বিলেত গেছে। অ্যারাতুন সাহেব রীতিমতো সংসারী মানুষ। কর্মবীর মানুষদের সংসারী হতে বাধা কোথায়। নিজের চেষ্টায় দিনের পর দিন তিল তিল পরিশ্রম করে, বিজাতীয় পরিবেশে ভীষণ শারীরিক কষ্ট ও পরিকাঠামোগত অসুবিধে সহ্য করে অ্যারাতুন যেমন ঝালদার মতন ওরকম রুক্ষ এক জায়গায় বিশাল এক গালা-কারখানা গড়ে তুলেছেন; তেমনই তিনি যথাসময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন এবং দুই সন্তানের পিতাও হয়েছেন। হেলেন নামে যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছেন তিনিও একজন আর্মেনিয়ান। এই অঞ্চলে সবাই তাঁকে 'মেমসাহেব' বলে ডাকতেই অভ্যস্ত। হেলেনের রূপ আছে। গুণও কম নেই। তিনি সর্বদাই খুব হাসিখুশি এবং খোলামেলা। সব কথারই উত্তর দিয়ে থাকেন হেসে। আর খুব অতিথিবৎসল। বিশ্বদেব সাহেবের বাংলোতে কাজের খাতিরে যখনই আসুক, মেমসাহেব ড্রয়িং-রুমে এসে কিছুক্ষণ কথা বলে যাবেন। তারপর বাড়ির ভেতরে ফিরে গিয়ে আর্দালি-মারফত পাঠিয়ে দেবেন বিস্কুট অথবা কেক এবং চা। মাঝে মাঝে কফিও। সম্প্রতি মিসেস অ্যারাতুন তাঁব দুই মেয়েকে নিয়ে লন্ডনে গেছেন। অ্যারাতুন একটি কটেজ কিনেছেন সাসেক্সে। সেখানে তাঁরা সবাই খ্রিস্টমাসের ছুটিতে মাঝে মাঝে বেড়াতে যান। কলকাতায় যেমন যান, লন্ডনেও যান। এই জুন মাসে অবশ্য মিসেস অ্যারাতুন কেন সাসেক্স গেছেন সেটা বিশ্বদেব বলতে পারবে না। তবে সে জানে এই বাংলোর 'কুক' রহমানকেও তিনি নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে সঙ্গে নিয়ে গেছেন। রহমানের রান্না ছাড়া অ্যারাতুন কিছুকাল চালিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু মিসেসের রহমানকে ছাড়া একদন্ডও চলবে না।

চিনিহীন কফিতে কোনওরকমে দুবার ছোট ছোট চুমুক দিয়েই বিশ্বদেব রেখে দিয়েছে। সাহেবকে বললে এখনই চিনি চলে আসবে। তার সঙ্গে বেচারা আর্দালিটা বেশ বকুনিও খাবে। ওসব ঝামেলার দরকার নেই। কারণ বিশ্বদেব এখন সাহেবের সঙ্গে গালগল্প জুড়তে কিংবা কফি পান করতে আসেনি। সে এসেছে জরুরি কিছু কথা বলতে। আগামিকালই হয়তো তাকে সপরিবারে কলকাতা ছুটতে হবে। হয়তো ভাবছে এ কারণে যে, এখনও সে জানে না, আগামিকাল থেকেই সাহেব তার ছুটি মঞ্জুর করবে কিনা। অবশ্য কারণটা গুরুতর। আর সেটা বলতেই তো বিশ্বদেব এখানে এসেছে।

সাহেবের সঙ্গে বিশ্বদেবের কথোপকথন শুরু হল। বিশ্বদেব ইংরেজিটা ভালোই বলতে পারে। অ্যারাতুন সাহেবও তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে স্বস্তি পান। এখানে ইংরেজিতে দড় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে সাহেব কিংবা মেমসাহেব হিন্দিতে কথাবার্তা চালান। এখন দুজনের মধ্যে ইংরেজিতে কথা হলেও আমরা সেটা এখানে দেখব বাংলাতেই। মাঝে মধ্যে অবশ্য বাংলা সংলাপের মধ্যে ইংরেজি শব্দও থাকবে। অ্যারাতুন জিজ্ঞেস করলেন—ইয়েস বাবু—তুমি কি আমাকে কিছু বলতে এসেছ? এনিথিং আরজেন্ট?..

—স্যার আই নিড আ লিভ ফর সাম ডেজ...।

—লিভ? ...অ্যাট দিস অড টাইম অব দ্য ইয়ার?...এনিথিং সিরিয়াস হ্যাপেনড টু ইওর ইন-লজ ইন ক্যালকাটা?

—ইয়েস....স্যার...সামথিং সিরিয়াস হ্যাজ হ্যাপেনড...

—হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেনড?....অ্যারাতুন সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বিশ্বদেব উত্তরটা দিতে যাবে। তার আগেই তাকে চমকে ডান-পাটা সরিয়ে নিতে হ'ল। পায়ে কী লাগল রে বাবা? সরসর করে কী যেন একটা পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। সাপ-খোপ নয় তো? এই অঞ্চলে প্রচুর সাপ আছে। তারা দ্যাখাও দেয় মাঝে মাঝে। অধিকাংশই বিষধর সাপ। পাহাড়ি চিতি। ছুঁলেই নাকি মৃত্যু। এছাড়া বিশ্বদেবের বাড়ির পেছনে একটা বাগান আছে। সেখানে রাজ্যের ঝোপ-ঝাড় হয়ে আছে। যত্ন নেওয়া হয় না। বাগান-টাগান তৈরি করা এবং মেনটেন করার ব্যাপারে সাহেবরাই বোধহয় সব থেকে দড় এবং উৎসাহী। যেখানেই তারা থাকে গার্ডেন, গলফ খেলবার কোর্ট এসব তৈরি করে নেয়। তুলনায় ভারতীয়রা, বিশেষত বাঙালিরা এসব ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী নয়। কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারলেই হ'ল। চারপাশের পরিবেশ ছিমছাম এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাব ব্যাপারে তাদের তেমন আগ্রহ দ্যাখা যায় না। বিশ্বদেবের বাড়ির পেছনে যে বাগানের ধ্বংসস্তূপ কিংবা ঝোপঝাড় সেটা এখন সাপেদের অভয়াশ্রম বলা চলে। বিশেষত লম্বা লম্বা দাঁড়াশ সাপেদের সেখানে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দ্যাখা যায়। তাদের দেখে সুনীতি এবং ছেলেমেয়ে ভয় পায়। অবশ্য বিশ্বদেব জানে দাঁড়াশ সাপ দেখতেই বিশ্রী এবং ভীতিপ্রদ। তারা বিষহীন এবং লাজুক। লোকজন দেখলেই ভয়ে পালায়।

কিন্তু এখন এই ঝকঝকে সকালবেলা অ্যারাতুন সাহেবের টেবিলের নীচে সাপ আসবে কোথা থেকে? আসলে সাপ নয় সাপ নয়। ওটা আসলে অ্যারাতুন সাহেবের কুকুর টম-এর কেঁদো লেজের ঝাপট। হয়েছেটা কী বাংলোর উঠোনে কয়েকটা কাক মহা শোরগোল তুলেছে। এখানকার কাকেরা যে সে কাক নয়। একেবারে খোদ দাঁড়কাক। পাতি কাকেদের থেকে আকারে বড়। রং কুচকুচে কালো। আর কী বিশ্রী গলার আওয়াজ। হ্যাঁ ঠিকই। এই ঝালদাতে বিশ্বদেবের কাক বলতে যা চোখে পড়ে তা হ'ল দাঁড়কাক। এদের মেজাজ-মর্জি একটু অন্যরকম। যেন সাহেবদের মতন। গেরস্থের বাড়ির উঠোনে এঁটো-কাঁটা পড়ে থাকলে সেসবের দিকে ওদের খুব একটা

নজর নেই। এরা বিশেষ বিশেষ খাবারের দিকে নজর দিয়ে থাকে। এই তো সেদিন বিশ্বদেবের বড় ছেলে সুখদেব, তার বয়স এখন দশ কী এগারে, দুটো কুমড়োর মেঠাই খেতে ব্যস্ত ছিল। বাড়ির রোয়াকে সে বসে ছিল। তার হাতে ছিল একটা মেঠাই আর একটি কাচের প্লেটে সামনে রাখা ছিল। কোথা থেকে একটা দাঁড়কাক সাঁ করে উড়ে এসে প্লেটের মিঠাইটা নিয়ে হাওয়া! তারপর অতবড় ছেলের সে কী কান্না। এখানকার দাঁড়কাকগুলো আর একটা জিনিস বেশ পছন্দ করে। সেটা হল বিউলির ডাল বা কলাইয়ের ডালের তৈরি বড়ি। বিশ্বদেবের স্ত্রী সুনীতির বড়ি দেবার খুব সখ। কিন্তু কুলোর ওপর বড়ি দিয়ে রোদে শুকোতে দিলেই দাঁড়কাকের দল এসে উৎপাত করে। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বিশ্বদেব কঞ্চি দিয়ে একটা তির-ধনুক তৈরি করিয়ে নিয়েছে। আর সেটা ঝুলিয়ে রাখে উঠোনের দড়িতে। লক্ষ করে সে দেখেছে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা তির-ধনুককে দাঁড়কাকগুলো খুব ভয় পায়।

বাংলোর উঠোনে কয়েকটা দাঁড়কাক এসে কর্কশ স্বরে নিজেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে। সেই দেখে টমের মেজাজ খারাপ। সে সাঁ করে উঠে গিয়ে ওদের ধমকাতে লাগল। ওরকম বাঘের মতো কুকুর দেখে ঝগড়া-টগড়া ভুলে দাঁড়কাকেরা পগারপার। আর টম আচমকা উঠে যাবার সময় তার লেজের ঝাপট লেগেছিল বিশ্বদেবের পায়ে। সে হঠাৎ ভয় পেয়ে ভেবেছিল সাপ....। বিশ্বদেবকে চমকে উঠতে দেখে অ্যারাতুন জিজ্ঞেস করলেন—ইয়েস বাবু—ইজ দেয়ার এনিথিং রং?

—নো—ইটস অলরাইট।—বিশ্বদেব নিজেকে সামলে নিয়েছে। কাকগুলো পালিয়েছে, তবুও টমের স্বস্তি নেই। সে ডাকাডাকি করেই চলেছে। সাহেব এবার একটু চটে গেলেন। তিনি মৃদু ধমকানির সুরে এ-ঘর থেকে বললেন—ওই টম-শিট! সাইলেন্স প্লিজ! কুকুর কি মানুষের ভাষা বোঝে? বোঝে হয়তো। তা না হ'লে সাহেবের ধমকানিতেই মন্ত্রের মতন কাজ হল কেন? নিমেষে টম ডাকাডাকি থামিয়ে দিয়ে আবার গুটিগুটি টেবিলের নীচে সাহেবের পা-এর কাছে এসে বসল। মুখটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে আধশোয়া ভঙ্গিতে। তার মুখ এখন ঠিক একটা বড় সাইজের পেঁপের মতন লাগছে। টম এসে টেবিলের নীচে বসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেব এবার আন্দাজ করে পা সরিয়ে নিয়েছে। আর টমের লেজের খোঁচা খেতে হয়নি।

সাহেব রীতিমতো উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন—কী হয়েছে বাবু?

বিশ্বদেব একটু ইতস্তত করে বলল—সাহেব আপনি জানেন ক্যালকাটা থেকে একটু দূরে হাওড়াতে আমার শ্বশুরবাড়ি?

—ইয়েস ইয়েস আই নো।

—সেখানে আমার এলডেস্ট ডটারকে আমি রেখে এসেছি। তার গ্র্যান্ডফাদার এবং গ্র্যান্ডমাদার তার দেখভাল করে...

—ইয়েস দ্যাট অলসো আই নো...?

—আমার সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে...।

—হোয়াট? ...তার বয়স কতো?

—সবে ষোলোয় পা দিয়েছে...।

—ষোলো বছরে কোনও মেয়ে কিংবা কোনও ছেলের বিয়ে হওয়া তো ঠিক নয়। এদেশে সেটা হামেশাই দেখি ঘটে। আঠারোতে না পড়লে ওদের অ্যাডাল্ট বলা যায় না। আর অ্যাডাল্ট না হ'লে বিয়ে হয় কীভাবে? আমাদের দেশে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে আইন আছে। আনডার এজেডদের মধ্যে কোনওদিন বিয়ে হয় না। তোমাদের দেশে দেখছি সবই আলাদা।

এখানকার ট্রাইবালদের মধ্যে আবার আরও কম বয়সে বিয়ে হয়।...ভেরি আনফরচিউনেট। ইট ক্যান ওনলি বি স্টপড বাই এনঅ্যাক্টমেন্ট অব অ্যান অ্যাপ্রোপিয়েট ল...। —সাহেবের কপালে কোঁচ। তিনি বলেই যাচ্ছিলেন। বিশ্বদেব দেখল আলোচনাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। এসব গুরুতর সামাজিক সমস্যা নিয়ে ভাববার মতন মনের অবস্থা এখন তার নয়। সে বলল—আসলে কী জানেন তো স্যার আমার মেয়ের এই বিয়ের ব্যাপারে ডিসিসান নিয়েছেন আমার ফাদার-ইন-ল। আমাকে জিজ্ঞেস করার একবার দরকার মনে করেননি। ...দিস আই কানট অ্যাকসেপ্ট...।

সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন—ইয়েস আই আনডারস্ট্যান্ড। ইউ আর ইন আ রিয়েল প্রেডিকামেন্ট।.... তোমার এখনই ক্যালকাটা যাওয়া দরকার। কবে যেতে চাও?

একটু ভেবে নিয়ে বিশ্বদেব বলল—আগামিকাল পাটনা সিভিল কোর্টে কোম্পানির কেসের হিয়ারিং-এর দিন। সেটা তো স্যার আমাকে যেতেই হবে। আমি কাগজপত্তর না দেখালে আমাদের পাটনার প্লিডার কিছুই সওয়াল করতে পারবেন না। হয়তো জাজ-এর থেকে ডেট চাইবেন। জাজ ডেট না মঞ্জুর করে যদি আমাদের ছাড়া অর্থাৎ এক্স-পার্টি হিয়ারিং করে দেন তাহলে উই মে লুজ দ্য কেস। সেটা স্যার ঠিক হবে না।

সাহেব বিশ্বদেবের কথা শুনে মনে মনে খুশি হলেন। তার নিখুঁত দায়িত্বজ্ঞানের জন্যেই তো তিনি বিশ্বদেবকে এত পছন্দ করেন। এতবড় গালা-কারখানার অফিসের যাবতীয় দায়িত্ব তো এই লোকটার কাঁধেই। আর ও খাটতেও পারে তেমনি। দিনরাত অফিসে বসে মুখ বুজে কাজ করে। বিশ্বদেবের মতো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কাজ-পাগল মানুষকে না পেলে সাহেবকে এত বড়ো অফিস চালাতে সত্যিই রীতিমতো হিমশিম খেতে হত।

—ও কে। আমি বুঝেছি তোমার যুক্তি।....নাও হোয়াটস ইওর প্রোপোজাল?

—আমি আজ রাতে পাটনা রওনা হয়ে যাচ্ছি। আগামিকাল সকালে কেসটা অ্যাটেন্ড করে চলে আসছি। আগামিকাল রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমি ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে ক্যালকাটা যাব। আমাকে অন্তত সাতদিনের ছুটি দিতে হবে।

—সাতদিন কেন তুমি দশদিন ছুটি নাও। সবকিছু সেটল্ করে আসতে তোমার আরও বেশি সময় লাগতে পারে, ডোন্ট ওরি ফর দ্যাট। আমি ঠিক সামলে নেব। ক্যাশের চাবিটা আমাকেই দিয়ে যেও। আই ডোন্ট বিলিভ এনিবডি আদার দ্যান ইউ....। আর একটা কাজ করো...। টেক মাই ভিহিকল টু পাটনা। এই জার্নিতে তোমার টাইম সেভ করা দরকার। গাড়ি নিলে তোমার সুবিধা হবে....।

—না স্যার ট্রেনে পাটনা যাওয়া কিছু নয়। ঘন ঘন ট্রেন আছে— বিশ্বদেবের চক্ষুলজ্জাসম আপত্তি ধোপে টিকল না। অ্যারাতুন সাহেব নিজের পাইপ ধরিয়ে নিয়েছেন। কড়া তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে বেশ জোর দিয়ে বললেন—ডু হোয়াট আই সে! পাটনা থেকে কাজ সেরে গাড়িতে ফিরে আসার পর গাড়ি রিলিজ করবে না। ফ্যামিলি নিয়ে একেবারে পুরুলিয়া স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি রিলিজ করবে। ড্রাইভারকে আমি সেরকমই ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি। আর শোনো—ডু অ্যানাদার থিং—ইউ টেক ফাইভ থাউজান্ড ক্যাশ উইথ ইউ ফ্রম মাই ভল্ট। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। মানি উইল বি নিডেড।....

কৃতজ্ঞতায় বিশ্বদেব কুঁকড়ে গেল। সত্যি অ্যারাতুন সাহেবের মনটা অনেক বড়। এরকম বিবেচক এবং উদার এমপ্লয়ার পাওয়া ভাগ্যের কথা। বেশ কুণ্ঠিতভাবে সে বলল—ইয়েস স্যার আইল ওবে ইওর ওয়ার্ডস। আ লট অব থ্যাঙ্কস অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড স্যার!

—নো মেনশন প্লিজ।...আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু ডু অ্যানাদার থিং...

—হোয়াটস দ্যাট স্যার?

—আশা করি তোমার মেয়ের ভাল বিয়ে হয়েছে। শি... দে উইল বি হ্যাপি... দ্যাট আই অ্যাম প্রেয়িং টু গড। তুমি তো বলেছিলে তোমার ফাদার ইন-ল খুব প্রুডেন্ট এবং হাইলি এডুকেডেট। তিনি কি খারাপ বিয়ে দেবেন?

—জানি না। ...কী হয়েছে না গেলে বুঝতে পারব না।—বলল বিশ্বদেব। সে ঠিক বুঝতে পারছে না সাহেবের প্রস্তাবটা কী।

—আমার প্রস্তাব হ'ল যদি সম্ভব হয় তোমার ডটার এবং সান- ইন-ল এদের দুজনকে নিয়ে তুমি ফিরে এসো ঝালদায়। দে মে হ্যাভ দেয়ার গুডটাইম...দেয়ার হানিমুন হিয়ার। এখান থেকে ওদের আমি রাঁচি পাঠিয়ে দেব। সেখানে হুড্র ফলস আছে; আর অনেক সাইট-সিয়িং প্লেসেস আছে। তুমিও ফ্যামিলি নিয়ে যাবে। এনজয় লাইফ। শুধু কাজ নয় জীবনকেও উপভোগ করতে হবে।

বিশ্বদেব অস্ফুটে বলল—আপনার কথা মনে রাখব স্যার। যদি ওরা আসতে চায় ওদেরও নিয়ে আসব। আমার ধারণা আমার ফাদার ইন-ল যা ডিসিসান নিয়েছেন তা ভাল বলেই প্রমাণিত হবে...।

আটচল্লিশ

এখন বেলা ক্রমশ চড়ছে। রোদের তেজও বাড়ছে। বিন্দুর কথা শুনে শুভ্রা বুঝতে পেরেছে যে এখানে, এই পাড়াগাঁয়ে মহিলারা, এমনকী অল্প-বয়সী মেয়েরাও দিনের আলো থাকতে পায়খানা যায় না। তারা এই অনিবার্য শারীরিক কাজটি করে সন্ধের দিকে, অন্ধকারে। খোলা মাঠে, নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে ফেলা যায় একমাত্র অন্ধকারেই। তাই অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা এ ব্যাপারে নিজেদের শরীরকে অভ্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু শুভ্রার অভ্যাস তো সম্পূর্ণ উলটো। বরাবর দাদুর মুখে সে শুনেছে দিনের শুরুতেই প্রাকৃতিক কাজটি সেরে ফেলা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তাতে নাকি সারা দিন শরীরে কোনও অস্বস্তি থাকে না। খাওয়া-দাওয়া হৃষ্টচিত্তে করা যায়। আর খাবার-দাবার হজমও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। দাদু যেমন শিক্ষা দিয়েছে সেভাবে শুভ্রারও ছোটবেলা থেকে অভ্যাসটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু এখন এই গেঁয়ো ভূত-পেত্নির পাল্লায় পড়ে সে রাতারাতি কীভাবে অভ্যাসের পরিবর্তন করবে? তাহলে কী হবে? যতদিন সে এখানে থাকবে, তাকে পায়খানা চেপে থাকতে হবে? সেভাবে কি থাকা যায়? তাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে?

বাড়ির পেছনের দরজা অর্থাৎ খিড়কি-দরজা দিয়ে বিন্দুর সঙ্গে শুভ্রা বাইরে এসেছে। এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেটা একটা বাঁশবাগান। চারদিকে বড় বড় বাঁশঝাড়। বাড়ির খোলামেলা উঠোন পেরিয়ে আসছিল যখন রোদ বেশ ফুটছিল গায়ে। এখন এই ঘন বাঁশঝাড়ে রোদ তেমন ঢুকতে পারেনি। জায়গাটা কীরকম অন্ধকার হয়ে আছে। আর বেশ ঠান্ডা। নির্জনতা ছড়িয়ে আছে চারপাশে। মাঝে মাঝে কুব কুব কুব কুব...একটা ডাক শোনা যাচ্ছে। কোনও পাখির ডাক। কী পাখি? ঘুঘু? কে জানে? পাখির কথা মনে আসতেই শুভ্রার মনে পড়ল তাদের হাওড়ার বাড়িতে চন্দনা পাখিটার কথা। খাঁচার মধ্যে সে পোষে পাখিটাকে। ঐ পাখিটা শুধু তার প্রিয় নয়। দিদারও খুব প্রিয়। দিদা অনেক দিন ধৈর্য ধরে পাখিটাকে হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট বলতে শিখিয়েছে। ঐ একটা কথাই পাখিটা জানে। কাউকে চোখে পড়লেই শুধু বোকার মতন একটানা বলে যাবে—হরে

কেষ্ট হবে কেষ্ট...দাদুর অবশ্য পাখি পোষাতে একেবারে মত নেই। দাদুর মত হল, বনের পাখি বনেতেই থাকা ভাল। পাখির কথা মনে পড়তে শুভ্রার দিদার কথা মনে পড়ল। তারপর দাদুর কথাও। আর দাদুর কথা মনে পড়তেই তার রাগ হল। দাদু যে তার সঙ্গে এরকম বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। বিশ্বাসঘাতকতা? হ্যাঁ তাই তো। একটা বিয়েবাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে শুভ্রারই বিয়ে দেওয়া হল অপরিচিত এক ছেলের সঙ্গে। যার সম্বন্ধে কোনও খোঁজখবর নেওয়ার দরকার মনে করল না দাদু। তারা যে কীরকম অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করে সে ব্যাপারেও কিছু জানল না। রাতারাতি শুভ্রাকে চলে আসতে হল মেমারির এমন এক গাঁয়ে যেখানে বিদ্যুতের সুযোগ নেই, শহুরে জীবনের আরাম আর আনন্দ-উপকরণ নেই। এমনকী মেয়েদের জন্যে একটা শৌচাগারেরও ব্যবস্থা নেই। শুভ্রা কীভাবে এখানে থাকবে, মানিয়ে নেবে কীভাবে এদের সঙ্গে সে ব্যাপারে দাদু একটুও ভাবনা-চিন্তা করল না। এটা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কী? এ যেন তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস করতে পাঠিয়ে দেওয়া। কেন? কী এমন অপরাধ করেছে সে? শুভ্রা কি দাদুর খুবই গলগ্রহ হয়ে পড়েছিল? তাই যদি হয় তাহলে তাকে তার বাবার কাছে ঝালদাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল না কেন? সেখানেও নাকি থাকার অনেক অসুবিধে। আদিবাসীরা থাকে সেই জায়গায়। তার অন্য ভাই-বোনেরা হিন্দি ইস্কুলে পড়াশোনা করে। এমনকী একটা বাংলা পড়ার ইস্কুলও সেখানে নেই। সে যাই হোক। যত অসুবিধেই হোক। তবুও তো বাবা-মায়ের কাছে সে থাকতে পারত। আর এখন? ....এখন এমন একটা লোকের সঙ্গে তাকে থাকতে হবে যার চেহারাটা দেখলেই তার হাড়-পিত্তি একেবারে জ্বলে যায়! ওরকম কেলটে, হতকুচ্ছিৎ একটা লোক তার স্বামী হয়েছে এটা ভাবতেই শুভ্রার যেন গা গুলিয়ে উঠছে।....নাহ এই অবিচার সে মেনে নিতে পারবে না। তাকে এখান থেকে পালাতেই হবে। যে কোনও উপায়ে। সে প্রথমে যাবে হাওড়াতে। দাদুর সঙ্গে তার বোঝাপড়া বাকি আছে। তারপর ঝালদাতে বাবার কাছে চলে যাবে। আর কোনওদিনই থাকবে না দাদুর কাছে। —অ্যাই-সরে যাও সরে যাও গু-মুতে পা মাখামাখি হয়ে যাবে! —বিন্দু হঠাৎ শুভ্রার হাত চেপে ধরে। দুজনেই থেমে যায়। শুভ্রা তাকায় বিন্দুর দিকে। রঙিন শাড়িতে বিন্দুর মাথায় অনেকটা ঘোমটা টানা থাকে। এখন এই বাঁশবাগান দিয়ে হাঁটছে বলে সাহস করে বিন্দু মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিয়েছে। মেয়েরা বোধহয় সত্যিই নিজেদের মাথার চুল, মুখের বেশ কিছুটা ঘোমটায় ঢেকে রাখতে অপছন্দ করে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ভয়ে তাদের ঘোমটা চড়িয়ে থাকতে হয়। বিন্দুকে এই প্রথম যেন ভালভাবে তাকিয়ে দেখল শুভ্রা। বিন্দুর মুখশ্রী খারাপ নয়। তবে সে শ্যামবর্ণা। চোখদুটো বেশ টানা-টানা। কতকটা প্রতিমার চোখের মতন। অবশ্য তার নাক খ্যাঁদা। সেই নাকে আবার নাকছাবি। আর ঠোঁটদুটো বেশ মোটা। মেয়েদের ঠোঁট পাতলা না হলে আবার ভাল কীসের। তবুও বিন্দুকে খুব কাছ থেকে দেখে শুভ্রার মনে হল ও বেশ সরল।

—দেকে হাঁটতে হবে গো ছোটবউ! এখন আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখেনেই তো আঁধার রাতে বাড়ির বউ-ঝিরা হাগতে বসে....।

—অ্যাঁ? তাই নাকি?—শুভ্রা আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আঁধারে বাঁশঝাড়ে আর কে আসবে? তাই এখেনে বসেই আমরা মেয়েরা রোজদিন হাগি আর গপ্প করি। ....ঐ দ্যাখো না গু পড়ে আচে!...

শুভ্রাকে দেখতে হয়। দুপাশে ঘন বাঁশঝাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। বাঁশপাতা, গাছ থেকে খসে পড়া ভাঙা ডাল আর অন্যান্য জঞ্জালে সেই পথ ছেয়ে আছে। একটু ভালভাবে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায় যত্রতত্র কালচে হয়ে যাওয়া শুকনো মল পড়ে আছে। একতাল

তো শুভ্রার ঠিক পায়ের সামনেই।

—উঃ ম্যাগো!—শুভ্রার গলায় একদলা থুতু উঠে আসে।... হোয়াক থু—সে থুতু ফেলে। আর তার ঘেন্না আর মুখবিকৃতি দেখে বিন্দু হেসে লুটোপাটি হয়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আকুল হাসতে হাসতে সে বলে—পেথম-পেথম এরকম ঘেন্না করতেচে। তারপর যখন অব্যেস হয়ে যাবে তখন দেকবে এই বাঁশঝাড়ের আঁধার ছাড়া হাগতে আর মন চাইবেনে।

—চুপ করো তো! বাজে বোকো না!—রীতিমতো ধমকানির সুরে বলে শুভ্রা। বিন্দু তাতে রাগে না। বরং বলে—ঠিকই বলতেচি গো বোন। তোমাব কপাল ভাল। তুমি বরটি ভাল পেয়েচ। আর শ্বশুরবাড়িটিও ভাল পেয়েচ। শাশুড়িকে দেকে পেথম পেথম হয়তো তোমার দজ্জাল মাগি বলে মনে হবে। তারপর দেকবে উনিও ভাল। আর শ্বশুরের কতা তো ছেড়েই দিলুম গা। তিনি তো মাটির মানুষ।

—আর তোমার বরটি কেমন? তাকে তো দেখলুম না?—শুভ্রা জিজ্ঞেস করে।

—ওমা সে মিনসেকে দেকনি? সে তো ভিড়ের মধ্যে আসতে ভয় খায়। সকালা ভিড়ের মধ্যে ঠিক দাঁড়িয়ে ছিল। তুমি বুঝতে পারোনি। সে বড় নাজুক, মেনীমুখো....।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ।.... ওকে নিয়েই তো আমার যত দুঃখু...। বিন্দুর মুখটা করুণ হয়ে যায়।

—কেন? কীসের দুঃখ?

—আজ পাঁচ বচ্ছর বিয়েই করেচে মিনসে আমাকে। এখনও তো কোলে একটা খোকা দিতে পারল নি। শুভ্রা শোনে। চুপ করে থাকে। বিন্দুর দিকে তাকায়। এই আবর্জনাময় বাঁশবনে মলমূত্রের দুর্গন্ধের মাঝে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করে বিন্দুর বুকের গভীরে গোপন দুঃখ। সে দ্যাখে বিন্দুর চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের তলপেটে রীতিমতো অস্বস্তি অনুভব করে শুভ্রা। সে তাড়াতাড়ি বিন্দুকে জিজ্ঞেস করে—ভাই আমাকে এবার বসতে হবে। কোথায় বসব?.....

—বড় হাগা পেয়েচে না? সে তো তোমার মুখ দেকেই বুঝিচি।... ঐ যে ঐ ঝোপটার আড়ালে বসে পড়ো। কোনও ভয় নেই। আমি এখেনে দাঁড়িয়ে আচি। হাগো—মনের সুখে হেগে নাও ভাই....।

ইস্ কী বিশ্রী ভঙ্গিতে কথা বলছে বিন্দু। দৈনন্দিন জীবনে এই ভাষায় কথা বলতে বা এরকম কথা শুনতে সে কোনওদিনই অভ্যস্ত নয়। খুব খারাপ লাগছিল শুভ্রার। এ সে কোথায় এসে পড়ল? এদের সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে হবে? কোনও মতেই সম্ভব নয়। কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু তার আগে নিজের শারীরিক অস্বস্তিটা থেকেও তো অব্যাহতি পেতে হবে। যে জায়গাটা বিন্দু আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছে সেটা সত্যিই একটা ঝোপের মতন। ঐখানেই চলে যেতে হবে তাকে। উবু হয়ে বসতে হবে। তারপর....। কিন্তু ওখানে যদি সাপখোপ থাকে? ভাবতেই শিউরে উঠল শুভ্রা।

—কী গো ভাই যাও? ওরকম হাবার মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—ভাই ঐ ঝোপে সাপখোপ নেই তো?

—সাপখোপ? ... পোঁদে কামড়াবে?—বলেই নিজের কুৎসিত রসিকতায় নিজেই আবার খিলখিল হেসে উঠল বিন্দু।

—ধ্যাৎ ওরকম খারাপ খারাপ কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না তো! ওকী অসভ্যতা? যাও আমি পায়খানা করব না। নিজেকে কনট্রোল করতে জানি আমি।

শুভ্রার মুখ ঝামটা খেয়ে বিন্দুর মুখটা মুহূর্তে চুপসে গেল। সে মুখ নামিয়ে বলল—ও তুমি তো আমার লেখাপড়া জানা মেয়ে। আমরা তো লেখাপড়া জানিনে। খারাপ খারাপ কথা আমাদের মুকে লেগেই আচে ভাই। কিচু মনে কোরো না। রাগ কোরো না ভাই। তুমি যাও। আমি দাঁড়িয়ে আচি। ঝোপের আড়ালে চলে যাও। দিনের বেলা আকাশে রোদ থাকলে সাপ বের হয় না ভাই। যাও। এখনই তুমি এত ভয় পাচ্চ? তাহলে সন্ধের অন্ধকারে যখন আসতে হবে কী করবে? শুভ্রা ভয়ে ভয়ে গিয়ে ঝোপের আড়ালে বসে। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তার। কী লজ্জা! কী লজ্জা! এরকম পরিস্থিতিতে যে কোনওদিন পড়তে হবে সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু প্রাকৃতিক আহ্বানের কাছে মানুষ সত্যিই বড় অসহায়।

বিন্দুর আশ্বাসমতো অবশ্য নির্বিঘ্নেই হালকা হওয়া গেল। খুব ঘেন্না করছিল শুভ্রার। নিজের শরীরের প্রতিই ঘেন্না হচ্ছিল। এখনই জল চাই। ধুয়ে ফেলতে হবে নিজেকে। ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। এবং সেটা এখনই। কিন্তু সেটা কোথায় হবে? এদের তো বাথরুমও বোধহয় নেই। চানও কি প্রকাশ্যে করতে হবে? সেটা কি পুকুরে?

—ও দিদি আমার যে জল চাই। শাড়ি কাচব, চান করব।

—হ্যাঁ ভাই চলো না। পুকুরে যেতে হবে নাইতে।

—পুকুরে? কিন্তু আমি তো ভাই সাঁতার জানি না।

—পুকুরে চ্যান করতে হলে কী সাঁতার জানতে হয় নাকি? আর সাঁতার তুমি দুদিনে শিখে যাবে। আমি শিখিয়ে দেব।

—তাহলে পুকুরেই চলো। —দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শুভ্রা বলে। সে জানে যে কদিন এখানে আছে অনেক কিছুই তাকে মেনে নিতে হবে।

বাঁশঝাড় পার হয়েই পুকুর। এটা কি পুকুর বলা যায়? এটা তো দিঘি। অনেক বড়। ওপারে কলাগাছের ঝোপ। নিথর কালো জল। বাঁধানো ঘাট। শ্যাওলা-আচ্ছন্ন সিঁড়ির ধাপ। সেই দিঘির কাছে এসে থামে বিন্দু। শুভ্রা চারদিক তাকিয়ে দ্যাখে। তার এখনই জলে নামতে ইচ্ছে করছে। অশুচি নিজেকে ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই কি যাওয়া যায়? সত্যিই একটুও সাঁতার জানে না শুভ্রা।

—এই দিঘি কাদের জানো?—বিন্দু জিজ্ঞেস করে।

—কাদের?

—কাদের আবার....সব আমাদের মানে এ বাড়ির। এই বাঁশবাগান, দিঘি, ওপাশে অনেক জমি, জমিতে ধান সব আমাদের গো আমাদের। আমাদের শ্বশুরবাড়ির। এই পুকুরে কত বড় বড় রুই কাতলা আচে জানো? কাল সকালাই তো এখেনে জাল ফেলা হবে। দেকবে কত মাছ ধরা হবে...।

—কেন?

—ওমা কেন কী গো? কাল যে তোমাদের বউ-ভাত। কত লোক খাবে এ বাড়িতে। শুধু কী মাছ হবে? মাংসও তো হবে। হাট থেকে নাকি এক কুড়ি পাঁঠা আসবে কাল এ বাড়িতে। আজ রাত থেকে ভিয়েন বসবে বাড়িতে। সারা রাত ধরে মিষ্টি বানাবে ময়রারা। তোর জন্যে রে পোড়ারমুখী তোর জন্যে। তোর শ্বশুরের অনেক পয়সা। এরা টাকা চিবিয়ে খেতে পারে।....আয় আয় নেমে আয় জলে। ছুঁচিয়ে নে। এই আমি ভেসে আচি তোর কাছটিতে। তুই একটু জলে নাম লো। অত ভয় পেলে কি চলে ভাই? দেকে পা ফেলিস শ্যাওলা আচে। পা হড়কালে আমি ঠিক ধরে নেব।

জলের মধ্যেও সিঁড়ি। এক পা এক পা করে সাবধানে নামছিল শুভ্রা। বিন্দু অবশ্য তার কনুই শক্ত করে ধরে আছে। কোমর-জল পর্যন্ত নামার পর বিন্দু বলল—থাক থাক আর নামতে হবেনি ছোটবউ। এবার জলের মধ্যে উবু হয়ে বসে পড়। তারপর যা ধোবার ধুয়ে নে। চ্যানটাও করে নে ভাই। তোর হয়ে গেলে আমি এট্টু সাঁতরাব। তারপর চ্যানটা সেরে নেব। বাড়ি ফিরে দুজনে আরও গপ্প করব। তোকে আমার খুব মনে ধরেচে রে ছোটবউ। তোর মুখটা বড় মিস্টি....চাঁদপানা। আর গায়ের রং তো ফেটে বেরোচ্চে! তোর কেলে কেষ্ট তোকে পেয়ে যে কী খুশি হয়েচে.....।

এতক্ষণে শুভ্রার বুঝতে বাকি নেই আর যে বিন্দু কথা বলতে পছন্দ করে। কিংবা এরকমও হতে পারে যে সে ও-বাড়িতে কথা বলার লোক পায় না তেমন। এখন শুভ্রাকে পেয়েছে। শুভ্রা হয়তো বিন্দুর সমবয়সী নয়। কিন্তু আবার শুভ্রার থেকে খুব বেশি বড়ও নয়। এ বাড়িতে বিন্দুর কথা বলার মতো লোক হয়তো সত্যিই পায় না। ননদ বুড়ি আছে। সে মনীশের ছোট বোন। কিন্তু বুড়ির বয়স বড় কম। বিন্দু তার সঙ্গে কথা বলে সুখ পায় না। বিশেষত আদিরসাত্মক কথাবার্তা তো বুড়ির সঙ্গে ঠিক জমবেই না। কিন্তু এখন সে মনীশকে নিয়ে বিন্দুর রসিকতাকে তেমন পাত্তা দিতে চাইল না। মনীশের ব্যাপারে কোনও কথাতেই সে থাকতে চায় না। লোকটা কেলে তো বটেই। কিন্তু কৃষ্ণের সম্মান দিতে তাকে শুভ্রা রাজি নয়। বিন্দুর রসিকতাকে অগ্রাহ্য করে শুভ্রা জলের মধ্যে উবু হয়ে বসল। তার শাড়ি বিঘত সাইজের পদ্মপাতার মতন মেলে রইল জলের প্রচ্ছদে। নিজের শরীর থেকে নোংরা ধুয়ে ফেলল শুভ্রা। এতক্ষণে স্বস্তি পেল। কিন্তু বাঁ-হাত তো ধুতে হবে। সে বাড়িতে সাবান ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এখানে সাবান পাবে কোথায়? জলের ভেতরে উবু হয়ে বসেই শুভ্রা ডাকল—ও দিদি!

—কী রে?

—হাত ধোওয়ার সাবান আছে?

—সাবান?...ধুস সাবান কী করতে লাগবে। পুকুরের পাড়ে মাটি আচে। এক খাবলা মাটি হাতে ঘষে ধুয়ে নে।

—ম্যাগো! এরকম কোনওদিন করিনি। বড় ঘেন্না করচে!

—আমরা ওরকম নোংরা হাত মাটি দিয়েই ধুয়েনি। তুইও তাই কর। সাবান কি মাটির থেকে ভাল? বাড়ি গিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুবি। তোর বরকে বলবি। সে তোকে বিলিতি সাবান এনে দেবে। এখন মাটি দিয়ে ধুয়ে নে। আর ঝামেলা করিস না। শহরে মেয়েকে নিয়ে হয়েচে যত জ্বালা। তোর বর বুঝবে বিয়ে করে কত ধানে কত চাল....।

অগত্যা আর কী করা! মাটি দিয়েই হাত ধুতে হয় শুভ্রাকে। পুকুরে কীভাবে স্নান করতে হয় তার জানা থাকার কথা নয়। বিন্দু তাকে নাক-কান বুজে ডুব দিতে পরামর্শ দেয়। দুবার ডুব গিলতেই নাকানি-চোবানি খেতে হয় শুভ্রাকে। তার নাকে-কানে জল ঢুকে যায়। সে বিষম খায়। হাঁচতে থাকে। আর বিন্দু তার দুরবস্থা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে। তারপর বিন্দু শুভ্রার চোখের সামনে বহুক্ষণ জলে ভেসে থাকে। সাঁতরায়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে হাবিজাবি কথা বলে যায়। শুভ্রা শুনতে থাকে। দেখতে থাকে উল্লসিত বিন্দুকে। তারও খুব সাঁতার কাটতে বাসনা হয়। মনে হয় যদি তার সাঁতারটা জানা থাকত কী মজাই না হত। কিছুক্ষণের জন্যে নিজের ক্ষোভের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যায় শুভ্রা। তার মনে হয় এখানে এই পাড়াগাঁয়ে বিন্দুর সাহচর্যে জীবনটা কাটিয়ে দিলেই বা কেমন হয়। এখানকার জীবনও হয়তো ভালোই লাগবে তার। কে বলতে পারে? এরকম ভাবার পরই মনের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে—নাহ নাহ নাহ! ঐ কালো কুচ্ছিৎ লোকটাকে সে স্বামী হিসেবে কোনওদিনই মেনে নিতে পারবে না। কোনওদিন না। পালাতে

হবে তাকে। কীভাবে পালাবে? কখন পালাবে?

খানিক বাদে সিক্ত বসনে শুভ্রা বিন্দুর সঙ্গে বাড়ি ফেরে। বিন্দু তার বকবক থামায়নি। উফ! কত কথা যে মেয়েটার পেটে জমে আছে...!

উনপঞ্চাশ

আজ এ-বাড়িতে বউ-ভাত। সকাল থেকে মহা শোরগোল লেগে গেছে। কত লোকজন যে আসছে বাড়িতে। বুড়ো-বুড়ি, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা-কাচ্চা। পরের পর সব আসছে। আসার যেন বিরাম নেই। এ বাড়িতে ওপর আর নীচ মিলিয়ে অনেক ঘর। সুতরাং অতিথিদের দাঁড়াবার এবং বসবার অসুবিধে নেই। এক একটা দল আসছে, আর সেঁধিয়ে যাচ্ছে ঘরে। আনন্দ-উল্লাস, হইচই, প্রীতি-বিনিময়। কান যেন ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে চিৎকার-চেঁচামেচিতে। এক এক সময় শুভ্রার বিরক্তি লাগছে। কিন্তু বিরক্তি লাগলে তো চলবে না। এ বাড়িতে সে একা। শুধু একা নয়। নতুন বৌ। তার আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, আচরণ সব কিছুর প্রতি বোধহয় নজর রাখা হচ্ছে। মেয়েদের স্বাভাবিক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা থেকে শুভ্রা এসব বুঝেছে। তাই প্রত্যেকের সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছে। আর অতিথি যারা এ-বাড়িতে এসে পৌঁছচ্ছে তারা সবাই হুড়মুড় করে চলে আসছে দোতলায়, যেখানে শুভ্রা কিঞ্চিৎ সেজে-গুজে বসে আছে। তার পাশে সতর্ক প্রহরীর মতন রয়েছে বিন্দু। সত্যিই সে গতকাল থেকে শুভ্রার সঙ্গ ছাড়েনি। তার সঙ্গে লেগে আছে। এ-বাড়িতে শুভ্রার একা হবার কোনও সুযোগ নেই। একা একা চুপচাপ বসে বসে খানিক ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ নেই। তার পাশে সর্বক্ষণই ছায়ার মতন বিন্দু। এমনকী গতরাতেও বিন্দু তার স্বামীর সঙ্গে একঘরে শুতে যায়নি। দোতলার এই ঘরে শুভ্রার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমিয়েছে। এখন শুভ্রার মনে হচ্ছে মনীশের মা মনোরমার বোধহয় এ ব্যাপারে পরোক্ষ সায় আছে। হয়তো মনোরমারই নির্দেশ হল বিন্দুর প্রতি, নতুন বউ-কে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা। তাকে এ বাড়ির আচার-বিচার, রীতিনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো। মাঝে মাঝে শুভ্রা লক্ষ করেছে মনোরমা হঠাৎ এই ঘরে চলে এসেছেন। ডেকে নিয়েছেন বিন্দুকে একটু তফাতে। তারপর দুজনে বেশ কিছুক্ষণ গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর চলেছে। শুভ্রার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলেছে যে, ওরা তার সম্বন্ধেই আলোচনা চালাচ্ছে। কিন্তু কী আলোচনা করতে পারে ওরা? মনোরমা কি বুঝে ফেলেছেন যে, শুভ্রা মনে মনে এখান থেকে পালিয়ে যাবার মতলব ভাঁজছে। কী-ভাবে বুঝবেন? শুভ্রা তো মুখ ফুটে সে কথা কাউকে বলেনি? এমনকী কোনও অসতর্ক মুহূর্তে বিন্দুর কাছেও সে নিজের মনের কথা মুখ ফুটে বলেনি। কেন বলবে? তা কি কেউ বলে? তাহলে তো নিজের পায়ে কুড়ুল মারাই হবে। এতটা বোকা তো শুভ্রা নয়। তবে মনে মনে সে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এ-বাড়ি থেকে পালাবে। কিন্তু কীভাবে পালাবে? কোন সময়? এমন ভাবে পালাতে হবে যাতে ধরা না পড়ে। সেটা কীভাবে ঘটবে? কীভাবে ঘটাবে শুভ্রা। জানে না জানে না সে। কী তার ভাগ্যে আছে কিছুই জানে না সে।

গতরাতে ভালো ঘুমও হয়নি। বিন্দু পাশে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বকবক করে কানের পোকা বের করে দিয়েছে একেবারে। একে নতুন জায়গা। নতুন বিছানা। নতুন পরিবেশ। বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। তবে হেরিকেনের সঙ্গে গ্যাসের আলোও ছিল। হয়তো বাড়িতে উৎসব বলেই অনেকগুলো গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলো দেখতে হেরিকেনের থেকেও সাইজে বড়। গ্যাস ভরে সেই গ্যাসের সাহায্যে আলো জ্বালানো হয়। হেরিকেনের আলোর থেকে অনেক উজ্জ্বল

আলো। ফলে গতরাতে এ-বাড়িতে চলাফেরা করতে তেমন একটা অসুবিধে হয়নি শুভ্রার। বেশ রাত করে খাওয়াদাওয়া হয় এ-বাড়িতে। বরাবর শুভ্রা হাওড়ার বাড়িতে রাত নটার মধ্যে খাওয়া সেরে নিতে অভ্যস্ত। দাদুর সঙ্গে একসঙ্গে এক-টেবিলে বসে সে 'ডিনার' খায়। দাদু বিলিতি কায়দায় মধ্যাহ্নভোজনকে বলে লাঞ্চ। আর রাতের খাওয়াকে ডিনার। আর দাদুর বরাবরের মত হল প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে লাঞ্চ আর ডিনার সেরে নেওয়া। লাঞ্চ তো দাদু খায় অফিসে। আর বাড়ি ফিরে ঠিক রাত নটার মধ্যে ডিনার। যূথিকা অবশ্য স্বামীর সাহেবি কায়দা মেনে নেননি। তিনি আর একটু পরে রান্নাঘরের মেঝেতে আসন পেতে খাওয়া সারেন। কিন্তু শুভ্রা দাদুর সঙ্গে টেবিলে বসে রাত নটার মধ্যে ডিনার সারতে অভ্যস্ত। এ বাড়িতে অবশ্য নিয়মরীতি সব আলাদা। এখানে দু-বেলাই পুরুষদের খাওয়া আগে শেষ হয়। তারপর মেয়েরা খেতে বসে। শুভ্রা লক্ষ করেছে পুরুষদের খাবার সময় তাদের থালার চারপাশে তরি-তরকারির বাটি সাজিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েদের অতরকম বাটি সাজিয়ে দেওয়ার রীতি নেই। তাদের থালার ভাতের মধ্যেই তরি-তরকারি ঢেলে নিতে হয়। আর মাটিতে চাটাই পেতে বসে খেতেও শুভ্রার বেশ অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। সব বাড়ির পুরুষরা তো আর তার দাদুর মতন সাহেবি রীতিতে বিশ্বাসী নয়।

গতরাতে খাওয়াদাওয়ার পর শোবার পালা যখন এল তখন শুভ্রা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। তাকে কি একা-একা শুতে হবে নাকি? তার আর কিছুর ভয় না থাকুক একটু-আধটু ভূতের ভয় অবশ্য আছে। আর সে শুনেছে পাড়াগাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে নাকি ভূত থাকে। তাহলে উপায়? ভূতের ভয়ে তার ঘুমই আসবে না। সাতপাঁচ ভেবে শুভ্রা বিন্দুর কাছে জানতে চেয়েছিল।

—ভাই একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কী কতা লো?—বিন্দু বড় বেশি পান খায়। তার দুই ঠোঁট পানের রসে সর্বদাই যেন টইটম্বুর। একবার উঠে গিয়ে দোতলার বারান্দার কোণে পিচিৎ করে পানের পিক ফেলে এল। তারপর চোখ সরু করে শুধোল—কী আবার বলবি ভাই? আজ সকাল থেকেই বিন্দু শুভ্রাকে তুই-তোকারি শুরু করে দিয়েছে। এটাই হয়তো পাড়াগাঁয়ের রীতি। মনোরমাও তো বিন্দুকে অর্থাৎ তাঁর বড়-বউমাকে তুই-তোকারি করে কথা বলেন। যদিও শুভ্রাকে তিনি এখনও 'তুই' শুরু করেননি। 'তুমি' বলে সম্বোধন করছেন।

—কথাটা বললে তুমি আবার কাউকে বলবে না তো?

—ওমা তা বলব কেন? আমার ওরকম স্বভাব নয় ভাই। এর কথা ওকে বলা তার কথা তাকে।...কী কথা শুনি?

—আমার একটু ভূতের ভয় আছে ভাই। তাই...কথাটা শুনেই প্রবল হাসতে থাকে বিন্দু। হেসে প্রায় গড়াগড়ি দেবার যোগাড়।

তারপর সে বলে—রাতে বিছানায় একা শুতে পারিস না তাই তো? ...একা শুতে হবে তো একরাত্তির। তারপর কাল রাত্তির থেকে তো একজনকে পাশে নিয়ে শুবি। এখন তো সে তোর ভূত সেই হ'ল ভবিষ্যৎ।

শুভ্রা চুপ করে থাকে। যে কথাই সে বলুক বিন্দুর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে মনীশকে জড়িয়ে আদি রসাত্মক সব মন্তব্য করা।

—তো নিজের মরদকে ছাড়া এক রাতও শুতে মন চাইচে না ছুঁড়ির। আজ থেকেই রস উথলে উঠছে?

শুভ্রা সত্যিই লজ্জা পায়। তার ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

সে অস্ফুটে বলে—ধ্যাৎ! কী অসভ্যতা করো যে!

—অসভ্যতা হবে কেন ভাই? নিজের মরদের সঙ্গে শোবে, বিছানায় হুটোপাটি করবে তবেই না বিয়ে...তা সেটি আর আজ হচ্ছে না ভাই। একটু সবুর করো। আজকের রাতটা আলাদাই শুতে হবে। তবে একা শোবে কেন? ঐ সোনার অঙ্গভূত-পেরেত একা পেলে কি আর রক্ষে আচে? আমি তোমার সঙ্গে শোবখ'ন। তোমাকে পাহারা দেব ভাই সারারাত।

তবে বিন্দুকে পাশে নিয়ে শোওয়া যে কী ঝকমারি ব্যাপার তা শুভ্রা বিছানায় যাওয়ার পরই বুঝতে পারল। ফিস্‌ফিস্ করে কানের কাছে কথা বলেই যাচ্ছে বিন্দু। আর শুভ্রাকে তা শুনতে বাধ্য হতে হচ্ছে। আর সেসব কথা সবই হ'ল অশ্লীল। লজ্জায় শুভ্রার দু-কান চেপে থাকতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তা তো আর করা যায় না। দাঁতে দাঁত টিপে শুভ্রা নির্জীবের মতন নিরুপায় পড়ে রইল। আর বিন্দু ফিসফিস করে তাকে শুনিয়ে যাচ্ছিল তার স্বামীর সঙ্গে নিজের প্রথম রাতের অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম রাতেই নাকি মাত্র একবার সঙ্গম করে বিন্দুর তেমন তৃপ্তি হয়নি। সে দুবার সঙ্গম করেছিল। তার স্বামী নাকি একবারের পরই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বারবার এলিয়ে পড়ছিল। ঘুমিয়ে পড়তে চাইছিল। বিন্দুই নাকি তার চুলের মুঠি ধরে তাকে জাগিয়ে রেখেছিল। তার স্বামী তাকে সঙ্গম করেনি। প্রকৃত-প্রস্তাবে বিন্দুই নাকি যা যা করতে হয় করেছিল। কেন করবে না। তার শরীরের খিদে নাকি বরাবরই বেশি। তার স্বামী তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। আবার তার কোলে সন্তানও দিতে পারেনি। সেই কারণে বিন্দু কী কম দুঃখী? সেই দুঃখের কথা সে মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে না। শুভ্রাকে কাছে পেয়ে সে নিজের কথা প্রাণপণে উগরে দিচ্ছিল। ফিচফিচ করে কাঁদল অনেকক্ষণ। শুভ্রা কাঠ হয়ে শুয়ে শুনছিল। বিন্দুর গোপন দুঃখের কথা, তার নির্জন দীর্ঘশ্বাস। তার মনে হচ্ছিল রাতারাতি সে অনেক বড় হয়ে গেছে। সে আর দাদুর 'সুবু' নয়। সে শুভ্রা। বিবাহিতা শুভ্রা। তার নিজের শরীর, সেই শরীরের চাহিদা, নিজের শরীরের মহার্ঘ বস্তুকে সযত্নে আগলে রাখা এসব ব্যাপারেও শুভ্রা যেন রাতারাতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। আর এই সচেতনতা তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল বিন্দু, বিশেষত বিন্দুর নিজের জীবনের গোপন কথাগুলো। তারপর কখন শুভ্রা যে ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে নিজেই জানে না।

সকালে মনোরমার আদেশমতো স্নান সেরে, নতুন শাড়ি পরে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে শুভ্রা ঘর আলো করে দোতলার ঘরে বসে ছিল। পাশে ছিল যথারীতি বিন্দু। সিঁদুর দেবার কথা খেয়াল হয়নি তার। হলেও হয়তো দিত না। এ বিয়ে সে মানে না। এ বিয়ে সে অগ্রাহ্য করবে সারাজীবন। কিন্তু বিন্দুই তাকে সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ালো। নিজেও একবার পরিয়ে দিল। শুভ্রাকে বলল বিন্দুর সিঁথিতেও সে যেন সিঁদুর লাগায়। এয়ো বউরা নাকি পরস্পরের প্রতি এরকমই করে।

প্রায় পটের বিবির মতন বসে থাকতে হচ্ছে শুভ্রাকে। নিমন্ত্রিত অতিথি যারা এসে পৌঁছচ্ছে এ বাড়িতে প্রত্যেকেই প্রথমে সোজা দুপদাপ করে উঠে আসছে দোতলায়, নতুন বউ-এর মুখ দেখবে বলে। অবশ্য তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। কতরকম যে আত্মীয়-আত্মীয়া আছে এদের শুভ্রা যেন থই পাচ্ছিল না। বয়সে বড় যারা আসছিল তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন মনোরমা নিজে।

—অ বউমা—ইনি হল গিয়ে তোমার পিস-শাশুড়ি....মানে আমার ছোটখোকার পিসিমা। ছোটখোকা মানে মনীশ। পিসিমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। একেবারে বুড়ি থুত্থুড়ি বলা যায়। এ বাড়ির কী সবাই কালো? হা ভগবান ফর্সা মানুষ কি এ বাড়িতে একটাও পাওয়া যাবে না? পিসিমাও কালো। জবুথবু। বেঁটে। রোগা। কপালের কাছে আবার একটা বড় আঁচিল। মাথার

চুলগুলো সব সাদা। তবে বৃদ্ধার ব্যবহার বড় ভালো মনে হ'ল। অসুন্দর মুখটাতে যেন সর্বদাই স্নেহের প্রলেপ বিছানো। শুভ্রার চিবুক আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে পিসিমা বললেন—আহা গো! যেন সাক্ষাৎ সোনার প্রতিমে। এ কোন্ লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে আনলে গো এরা! মনোরমা চোখের ইশারায় প্রণাম করতে বললেন পিসিমাকে। শুভ্রা নিচু হয়ে প্রণাম করল। বিন্দুও প্রণাম করল। তবে দুজনের প্রণামের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক। শুভ্রা কোনওরকমে একবার মাথা মাটির দিকে নামিয়ে আঙুল দিয়ে পিসিমার পা ছুঁল। কিন্তু বিন্দুর প্রণামের ধরন আলাদা। সে পিসিমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর গলায় শাড়ির আঁচল জড়িয়ে প্রায় পিসিমার পায়ের ওপর পরপর তিনবার মাথা ঠুকল। পিসিমা অবশ্য দু বউকেই বললেন—থাক মা থাক। স্বামীকে নিয়ে সুখী হও মা। সকলের কল্যাণ হোক। সোনার বিছেহার দিয়ে পিসিমা মুখ দেখলেন নতুন বউ-এর। হারটা তিনি হয়তো পরিয়েই দিতে চেয়েছিলেন শুভ্রার গলাতে। কিন্তু তিনি মাথায় এই এতটুকু। আর শুভ্রা মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা। তার মা সুনীতি বেশ বেঁটে। কারণ নীরদবরণ আর যূথিকা দুজনেই বেঁটে। কিন্তু তার বাবার হাইটের প্রভাব পড়েছে শুভ্রার ওপর। সে মাথায় প্রায় পাঁচ ফুট ছয়-এর কাছাকাছি। হারের বাক্সটা নিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করছিলেন পিসিমা। মনোরমা হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিজের হাতে নিলেন। বললেন—এটা এখন আমার কাছে থাক। পরে বউমাকে দেওয়া হবে। মনোরমার এই আচরণ পছন্দ হল না শুভ্রার। এরকম হওয়ার কথা নয়। হারটা তো আসলে তাকে দিয়েছেন পিসিমা। তাহলে মনোরমা ছোঁ মেরে সেটা নেবেন কেন? নাকি শুভ্রার ব্যাপার সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে চান মনোরমা। এরকম ভাবনা আসতেই শুভ্রার মনে হল সে কেন এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। যত বেনারসি, যত গয়না সে এ-বাড়িতে উপহার পেয়েছে এবং পাবে সব ফেলে রেখে যাবে এ বাড়িতেই। কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে না। এ বাড়ির কেউ হবে না সে। এখানকার যাবতীয় স্মৃতি সে ভুলে যেতে চায়। ভুলে যাবেও। আগামিকালই পালাতে হবে তাকে। আচ্ছা এরকম করলে হয় না? এক ঘর মানুষজনের সামনেও শুভ্রার মনের গভীরে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। আজ যেহেতু বউ-ভাত। হাওড়া থেকে অনেকেই আসবে। দাদু আসবে। দিদা আসবে। বাবা মা ভাই বোন তারাও কি আসবে? সেই ঝালদা থেকে তারা কি এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে? যারাই আসুক, দাদু যে আসবে এ ব্যাপারে শুভ্রা নিশ্চিত। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? শুভ্রা যদি আজ দাদুর পায়ে কেঁদে পড়ে তাহলে কি দাদু তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে না?....মনে হয় দাদু তার অনুরোধে কোনও কর্ণপাতই করবে না। ফুলশয্যা হবে না তার? ঐ কালো লোকটার সঙ্গে এক বিছানায় ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতে হবে। ও মাগো! শুভ্রা ভাবতেই পারে না সেটা। ফুলশয্যার রাতে কী হবে? ...কী আর? ঐ কালো লোকটা তার গায়ে হাত দিতে চাইবে। আচ্ছা আসুক না একবার। ওর আঙুলগুলো মটকে ভেঙে দেবে শুভ্রা। হাত মুচড়ে দেবে। কিছুতেই ওকে ছুঁতে দেবে না তার শরীর।... তো সেই ফুলশয্যার রাতে বাড়ির বউ শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ফিরে যাবে। এ তো কস্মিনকালেই শোনেনি কোনওদিন। অতএব সে গুড়ে বালি। নিজেকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। একেবারে গোপনে। সরাসরি পালিয়ে যেতে হবে তাকে। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে? ভেবে ভেবে নিজের ভেতরে ঘামতে থাকে শুভ্রা। কোনও মতলব ঝিলিক মারে না তার মস্তিষ্কে।

কাজের বাড়িতে মনীশ যে শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত তা তো হতে পারে না। বউ-এর কাছে একবার আসবার জন্যে, তার মুখ দেখবার জন্যে সকাল থেকে ছোঁক ছোঁক করছিল সে। কিন্তু সুযোগ আর হচ্ছিল না। সতীশ তাকে কোনও না কোনও কাজে ঠিকই ব্যস্ত রাখছিলেন। সকালের অনেকটা সময় গেল বাঁশবাগানের পুকুরে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরছিল তার তদারকিতে।

সতীশ বড় বিচক্ষণ মানুষ। তিনি খোঁজ রাখেন জেলেদের দুষ্টুবুদ্ধির। জালে অনেক মাছ উঠবে। নজর না রাখলে জেলেরা সেই মাছের কিছু কিছু নিজেদের বিঘত সাইজের অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে নির্বিঘ্নে চালান করে দেবে। সুতরাং ছেলেদের ভার দিয়েছেন সতীশ জেলেদের ওপর নজর রাখবার জন্যে। মনীশ একা নয়। তার দাদা জ্যোতিষও সেই কাজে বহাল হয়েছে। ব্যাজার মুখে মনীশ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে জেলেদের ওপর নজর রাখছিল আর সিগারেট ফুঁকছিল। জ্যোতিষ তার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। তাতে কী? সে তেমন লেখাপড়া শেখেনি। ক্লাস এইট ফেল করে আর সে পড়াশোনা করেনি। সতীশ তাকে নিজের ব্যবসার কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আর বিয়েও দিয়েছেন। যদিও বিন্দুর এখনও কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। ছোটভাই বরাবর পড়াশোনায় ভালো। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তাই জ্যোতিষ ছোট ভাইয়ের কাছে কীরকম কুঁকড়ে থাকে। তাকে যেন একটু সমীহও করে। মনীশ সেটা বোঝে। তাই দাদার সামনে সিগারেট ফুঁকতে তার তেমন কোনও লজ্জা বা অস্বস্তি নেই। দাদাকেও সে অফার করে দেখেছে। দাদা সিগারেট-বিড়িতে আসক্ত নয়। তবে খুব পান খায় দাদা। তার ফতুয়ার পকেটে সর্বদাই একটা চ্যাপটা কৌটো থাকে। তাতে সাজা থাকে পান। বিন্দু খুব যত্ন করে দুবেলা স্বামীকে পান সেজে দ্যায়।

মাথার ওপর দুরন্ত রোদ্দুর। চাঁদি ফেটে যাচ্ছিল যেন। জ্যোতিষ রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে টোকা জাতীয় একটা বস্তু মাথায় দিয়েছে। কিন্তু মনীশ রোদ্দুরকে উপেক্ষা করেই দাঁড়িয়ে আছে। তদারকি করছে জেলেদের কাজের। আর সিগারেট টানছে। মনীশ প্রায়ই সিগারেট টানে। হোস্টেলে থেকে সে এই ধূমপানের অভ্যাসটা রপ্ত করেছে। আজ নিজের ফুলশয্যার রাতটাকে নিয়ে মনীশ মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করে রেখেছে। এক প্যাকেট কিং-সাইজ সিগারেটের প্যাকেট নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। ৫৫৫-সিগারেটের একটা ঝকঝকে বাক্স। বউ-এর সামনে সপ্রতিভ হবার জন্যে সে প্রথমে ঐ প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাবে ফস্ করে। তারপর.....

কিন্তু বউ-এর কথা ভাবতেই মনীশের মনটা কীরকম হয়ে গেল। যে মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল তা হ'ল না। মাত্র একদিনের মধ্যে কীরকম যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। যে মেয়েটার সঙ্গে আকস্মিকভাবে তার বিয়ে হয়ে গেল, সেই মেয়েটি কীরকম? তাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না মনীশ। শুনেছে কলকাতার ইংরেজি-পড়া মেয়ে। দাদুটাকে দেখে তো সাহেব-সাহেব মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই মেয়েকে বিয়ে করে কোথাও কোনও ভুল হ'ল না তো? ভীষণ দেমাকি। ভীষণ গুমোর। দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মনীশ অনেক চেষ্টা করেছে ওর সঙ্গে আলাপ জমানোর। কিন্তু মেয়েই যেন অপছন্দ করছে মনীশকে। কেন? মনীশ কি পাত্র হিসেবে খুব খারাপ? সে লম্বা, স্বাস্থ্যবান। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। ম্যাট্রিকে ওই জেলা থেকে সোনার মেডেল পেয়েছিল কারণ সে প্রথম হয়েছিল জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। মেমারি টুঁড়ে ফেললেও মনীশের মতন মেধাবী ছেলে পাওয়া যাবে না হয়তো। তার বাবার পয়সাকড়ির অভাব নেই। তাহলে মেয়েটা মনীশকে পছন্দ করছে না কেন? ওকি এই হঠাৎ বিয়ে চায়নি? নাকি ওর অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে ভালোবাসা ছিল। তাকেই কি ও বিয়ে করতে চেয়েছিল? তাহ'লে কি মনীশকে স্বামী হিসেবে ও কোনওদিনই মেনে নিতে পারবে না? ভাবতে ভাবতে মনীশ মুষড়ে পড়ে। তার খুব ইচ্ছে করে বউ-এর কাছে একবার যেতে। কিন্তু কীভাবে যাবে? একসময় সুযোগ এসে যায়। মুনীষ গোছের একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দ্যায় যে সতীশ ছোটছেলেকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। মনীশ হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জানতে চায়—কেন রে? কোনও দরকারের কতা বলেচে?

—তা তো বলতে পারবনি বাবু।...তবে দেখুন কারা যেন এয়েচে সব। বিয়েবাড়িতে তো

লোকজন আসবেই। তাতে আর ডেকে পাঠানোর কী আছে? তবুও যেতে হবে। বাবা কিংবা মায়ের কথা অমান্য করতে শেখেনি এরা। জ্যোতিষ যে খুব মন দিয়ে জেলেদের কাজকর্ম তদারকি করছিল তা ঠিক নয়। সে একটু আনমনা গোছের। সবসময় মনীশের ছায়াতেই ঘোরাফেরা করে। নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ তেমন হয়েছে বলা যায় না। তার থেকে তার বউ বিন্দু অনেক বেশি সপ্রতিভ এবং মুখরা। এমনকী বউ-এর সামনেও কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে জ্যোতিষ। মনীশ দেখল সে মাঠের দিকে আনমনে তাকিয়ে আছে। কয়েকটা কাদাখোঁচা ঘাসের মধ্যে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে আর পোকা ধরে খাচ্ছে। জ্যোতিষের গবেষণার বস্তু এখন তারাই। মনীশ চেঁচিয়ে বলল—দাদা, আমি একটু বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি। বাবা ডেকে পাঠিয়েচে। তুই একটু নজর রাখিস চারপাশে। চারপাশে নজর রাখার মানে হ'ল আসলে জেলেরা মাছ ধরবার ছলে যাতে অবাধে মাছ চুরি করতে না পারে সেটাই দ্যাখা। জ্যোতিষ নিশ্চয়ই সেটা বুঝেছে। সে হাত নেড়ে বলল—আচ্ছা...তুই ঘুরে আয়। তারপর আমি বাড়ির ভেতরে যাবো। বড় জলপিপাসা লেগেচে।

মনীশ বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে এমন সময় জেলেরা হইহই করে উঠল। তাদের গলা শুনেই বোঝা যায় এ চিৎকার উল্লাসের। মনীশ ছুটে গেল। দেখল বিশাল সাইজের দুটো কাতলা জেলেদের জালে ধরা পড়ে প্রবল আপসোসে লাফালাফি করছে। সত্যিই বিঘত সাইজের মাছ দুটো। অন্তত পনেরো কেজি করে তো হবেই।

একজন জেলে বলল—এরকম ডাগর কাতলা আরও কয়েকটা ধরতি হবে। বড়কর্তা বলেচে অনেক লোক খাবে।... সত্যিই অনেক লোক আমন্ত্রিত। তা অন্তত দেড়-দু-হাজার লোক তো হবেই। বিশাল আয়োজন। দুপুর থেকেই পাশাপাশি দুটো গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়বে এ বাড়িতে। এই পরিবারে অদ্ভুত নিয়ম। দুপুর থেকে পাত পড়তে শুরু করবে। চলবে সেই রাত পর্যন্ত। একই ধরনের পদ পরিবেশিত হবে। নিমন্ত্রিতেরা ইচ্ছে মতন আসবে এবং খাওয়াদাওয়া করবে। তবে গ্রামের মানুষ বেশিরভাগই দুপুরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। রাতের দিকে পরিবারের নিজেদের আত্মীয়স্বজনরাই কাজের বাড়ি সরগরম রাখে। মনীশ দেখল জেলেদের বিরাট নীল জালে সেই দুটো কাতলা মাছ ছাড়াও আরও অনেক চারামাছ উঠেছে। জলের মধ্যে লাফালাফি করছে তারাও। ওদের কোনও কাজে লাগবে না। তাই আবার জলে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এখনও অনেকটা বড় হতে বাকি আছে ওদের। তারপর ওদেরও ব্যবহার করা হবে এরকমই কোনও অনুষ্ঠানের ভোজে। কিন্তু এখন যদি নজর করা না হয় তাহলে এরকম ছোট মাছগুলোকেই জেলেরা নিজেদের হাঁড়িতে চালান করে দ্যায়।

—চারামাছগুলোকে জলে ছেড়ে দ্যাও গো!—মনীশ বলল।

—হ্যাঁ ছোটকত্তা। —একজন বয়স্ক জেলে বলল,—ওদের তো ছেড়েই দেব। জলের প্রাণী জলেই থাক। মনীশ মনে মনে হাসল! আমি সামনে না থাকলে ওরা কি ছেড়ে দিত ওদের? নিজেদের হাঁড়িতে হাত-সাফাই করে দিত। দাদার দিকে তাকাল মনীশ। কাদাখোঁচা পাখিগুলো কখন যেন উড়ে গেছে। তাই জ্যোতিষ এখন এদিকেই তাকিয়ে আছে। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বোকার মতন হাসল।

—আমি একটু আসচি। বাবা ডেকে পাঠিয়েচে...। যেন কৈফিয়তস্বরূপ মনীশ বলল। জ্যোতিষ সেই বোকার মতো তাকিয়েই আছে। হাসছে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে মনীশ দেখল আর কেউ নয়, বড়মামা এসেছে। তার সঙ্গে বড়মামি আর ছেলেমেয়েরা। বড়মামার বড় ছেলে, মানে মনীশের মামাতো ভাই বিদ্যুৎ একেবারে তার বয়সী। তবে সে পড়াশোনা করে না। বাবার সঙ্গে ব্যবসার কাজ দেখে। বড়মামারও ব্যবসা

বেশ রমরমিয়ে চলে। তাঁর বাস সোনামুখীতে। ব্যবসা গুঁড়ো পাথরের। সোনামুখী বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে। বাঁকুড়ার শালতোড়া, রানীবাঁধ হিরা-বাঁধ এসব অঞ্চলে মাইল মাইল বিস্তীর্ণ চুনাপাথরের টিলা এবং ঢিপি আছে। সেইসব পাথর নিয়ে এসে মেশিনে গুঁড়ো করে চালান দেওয়া হয় নানা জায়গায়। নির্মাণের কাজে, রাস্তা সারাইয়ের কাজে এবং আরও নানা কাজে গুঁড়ো পাথর প্রয়োজন হয়। খুবই সফল একজন ব্যবসায়ী বড়মামা।

ছেলেকে দেখে সতীশ বললেন—তোমার মামা-মামি এসে সেই থেকে বসে আছেন বাবা! বলছেন ভাগনে এলে তবে তাকে নিয়ে ভাগনে বউ-এর মুখ দেখবেন। মনীশ মামা ও মামিকে প্রণাম করল। মুখে বলল—চলুন মামা দোতলায়! এন্ডি-গেন্ডি এরকম তিন ছেলে তিন মেয়ে বড়মামার। তাদের মধ্যে বিদ্যুৎই বড়। বিদ্যুৎ অবশ্য এখনও অবিবাহিত। মনীশকে দেখে সে চোখ মটকে ফিচেল হাসল। অর্থাৎ কী ভালো দাঁও মারলে ভাই! যে মেয়ে বিয়ে করতে গেলে তাকে না পেয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে নিয়ে এলে। সে নাকি আবার কলকাতাইয়া....? মনীশের বিয়ের বিচিত্র ঘটনার কথা ইতিমধ্যে রটে গেছে সর্বত্র। বড়মামার কানেও তা গেছে। মনীশের অন্য মামারা এবং তাদের পরিবারেরা আগেই এ বাড়িতে এসেছে। কেউ কেউ গতকাল বরযাত্রী দলেও ছিল। শুধু বড়মামা ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আজ এলেন। বিয়ের ব্যাপারে সবাই সব জানে। কিন্তু সবাই এমন ভান করছে যে কিছুই হয়নি। যদিও অতিথিরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষো চালাচ্ছে। সকলেই ভাবছে, কলকাতার মুখুজ্যে পরিবারের সঙ্গে আকস্মিকভাবে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করার ব্যাপারে সতীশবাবুর কোনও ভুল-ভ্রান্তি হল না তো। কলকাতার মেয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে মানিয়ে নিতে পারবে তো? প্রত্যেকের মনেই হয়তো এসব নিয়ে চাপা টেনশান আছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলছে না। বড়মামার স্বভাব হল পেটে কথা জমিয়ে রাখতে না পারা। তাই যে কথাটা আজ সকালথেকেই তাঁর মনে গজগজ করছিল মনীশের সামনে সেটা তিনি প্রকাশ করেই ফেললেন—জামাইবাবু কাজটা ভালো করলেন তো? কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ অচেনা এক পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে বসলেন? মনীশ কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

সতীশ তাড়াতাড়ি বললেন—কাটোয়ার ঐ পরিবারের মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে যে হয়নি খুব বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা। সে তো মেয়ে নয়, ধিঙ্গি! স্বদেশি করে। আবার এক স্বদেশি ছোকরার সঙ্গে লভ-ও ছিল। উঃ ভাবা যায়! সেই মেয়েকে যদি ঘরের বউ করে আনতুম সংসারটাই রসাতলে যেত আমার।....তার বদলে যাকে বউ করে বাড়িতে নিয়ে এলুম সে তো সাক্ষাৎ মহামায়া।

—মহামায়া? বলেন কী?

—তাকে দেখেই তোমরা বুঝতে পারবে আমি কী বলছি। মেয়ে আমার রূপে মা লক্ষ্মী, আর গুণে সরস্বতী...

—বলছেন? তাহলে চলুন তাকে দেখে আসি।

—চলুন মামা।—মনীশ আগে আগে যাচ্ছিল। তার পেছনে সতীশ আর বড়মামার পরিবার সবাই দোতলাতে দুপদাপ করে উঠতে লাগল। ইতিমধ্যে মনোরমাও এসে হাজির হয়েছেন। তিনি তাঁর বড়দার সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনীশের চাপা টেনশান হচ্ছিল। ঢিপঢিপ করছিল বুক। তার বউকে দেখে বড়মামা কী বলবেন?

পঞ্চাশ

মনীশের বড়মামা লোকটি কিন্তু মন্দ নয়। ব্যবসার খাতিরে তাঁকে অনেকরকম মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। বেশ খোলামেলা। মনের ভাব গোপন করতে জানেন না কিংবা শেখেননি। যা মনে আসে তাই মুখে প্রকাশ করে ফেলেন। দোতলার ঘরে শুভ্রা সত্যি সত্যিই পটের বিবিটি সেজে বসে ছিল। সকালে দিঘির জলে স্নান করে নেওয়ার পর শুভ্রার নিজেকে বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। সে নিজেকে সাজায়নি। নিজেকে শুভ্রা সাজাতে শেখেনি ঠিক। হাওড়ার মামাবাড়িতে তাকে বরাবর দিদিমা সাজিয়ে দেন। এখানে শুভ্রাকে সাজানোর কাজটি স্বেচ্ছায় নিজের হাতে নিয়েছে বিন্দু। সুটকেশ থেকে ঢাকাই শাড়ি বের করে শুভ্রাকে পরে নিতে বলেছে। তারপর শেমিজ। মুখে অল্প পাউডার। কপালে সিঁদুরের টিপ। বড়, গোল টিপ। সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন। সব নিজের হাতে লাগিয়ে দিয়েছে বিন্দু। শুভ্রা বাধ্য মেয়ের মতো চুপচাপ বসেছিল শুধু। সে চুপচাপ বসেছিল বটে। কিন্তু মুখরা বিন্দুর মুখ থেমে ছিল না। শুভ্রার রূপের প্রশংসা করে যাচ্ছিল বিন্দু। একবার তার গ্রাম্য স্বভাবের বশে অশ্লীল ইয়ার্কি করতেও ছাড়ল না। সেটা হ'ল শুভ্রা যখন শেমিজ পরছিল। ঘরের দরজা ভেজিয়ে, ভিজে কাপড় গা থেকে সরিয়ে একেবারে এক কোণে দাঁড়িয়ে শুভ্রা শেমিজ আর সায়া পরে নিচ্ছিল। সব নতুন জিনিস। সতীশ নিজের ভাবী বউমা, অর্থাৎ অপর্ণার জন্যে তত্ত্ব সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অপর্ণার তা কাজে লাগেনি। কাজে লেগে গেল শুভ্রার। সেই সুটকেশ বোঝাই তত্ত্ব কাটোয়া থেকে মেমারিতে বর-কনের সঙ্গে গাড়িতে এসে পৌঁছেছে এ-বাড়িতে। এ-ঘরেও সেই সুটকেশ পৌঁছে গেছে। বিন্দু তার ডালা খুলে ভেতরের সামগ্রী চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়েছিল। অস্ফুটে একবার বলেছিল—কত জিনিস দিয়েচে গো এরা!...মরি লো মরি! তোর রূপ আচে। তাই বোধহয় সবই বেশি বেশি। সোনো, পাউডার, পমেটম, আয়না, চিরুনি, কাজললতা, সবই আচে। আহা থাকবেই তো। নতুন বউ কিনা। আমার বিয়ের দিনটা আর ফুলশয্যের দিনটা বারবার মনে পড়তেচে মাইরি!... বলে বিন্দু হি হি হাসছিল। শুভ্রা আর কী করবে। তাকিয়ে দেখছিল বিন্দুর হাসি। কীরকম যেন লোভ আর হিংসা প্রকাশ পাচ্ছিল সেই হাসিতে। তারপর বিন্দু আর একটা কাণ্ড করল। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে শুভ্রা দ্রুত হাতে শেমিজ পরে নিচ্ছিল। সেই সময়ে বিন্দু লাফিয়ে চলে এল শুভ্রার কাছে। নিজের হাতে শেমিজ সরিয়ে শুভ্রার বুকদুটোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—হেই মা—কতো বড় বড় মাই লো তোর! ফর্সা ধবধবে! ওহ! তোর বরের খুব হাতের সুখ হবে! এই কথা বলে বিন্দু নিজেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। শুভ্রার স্তনবৃন্তদুটিতে চকিতে একবার নিজের আঙুল ছুঁইয়ে হি হি হি হাসছিল। ভীষণ খারাপ লেগেছিল শুভ্রার। রক্ত যেন মাথায় উঠে এসেছিল। দ্রুত নিজের বুক শেমিজের আড়ালে ঢেকে নিয়ে শুভ্রা বলেছিল—আহ! কী অসভ্যতা করছ! এরকম গেঁইয়াপনা করবে না আমার সঙ্গে। তুমি ভীষণ গেঁয়ো... ম্যানার্স শেখোনি? 'ম্যানার্স'-এই ইংরেজি শব্দটি অভ্যাসবশত ঠোঁটে এসে গিয়েছিল শুভ্রার। বিন্দু সম্ভবত শব্দটার মানে বোঝেনি। কিন্তু শুভ্রার তিরস্কারটা ঠিকই বুঝেছে। শুভ্রার ধমক খেয়ে বিন্দুর মুখ হঠাৎ শুকিয়ে গেল যেন। নিভে গেল হাসি। মুখ কাঁচুমাচু করে সে একপাশে সরে গেল। তারপর খুবই ভয়-পাওয়া স্বরে বলল—ভুল হয়ে গেচে ভাই বউ। কিচু মনে করিস না। তুই ভাই নেকাপড়া জানা মেয়ে মানুষ। আমরা মুখ্যু... সত্যিই গেঁয়ো। কী বলতে কী বলে ফেলেচি। মনে রাখিস না। ক্ষমা-ঘেন্না করে দিস...।

বড়মামা আর বড়মামিমা নতুন বউয়ের মুখ দেখতে আসবার আগেই অবশ্য মনোরমা তড়িঘড়ি

দোতলাতে উঠে এসে সেই সংবাদ দিয়েছিলেন। শুভ্রা বিছানার একপাশে পটের বিবি সেজে বসেছিল। অল্প দূরে গণেশের কলাবউ-এর মতো ঘোমটা টেনে বিন্দুও দাঁড়িয়ে রইল। শুভ্রার মাথাতেও ঘোমটা। অনেকটাই ঘোমটা। বিন্দু নিজের হাতে তার ঘোমটা টেনে দিয়েছে। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল শুভ্রার। রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটানে ঘোমটা নামিয়ে দ্যায়। এই বিয়েই সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। তার আবার ঘোমটা কী? কিন্তু মনে হলেও সে চুপচাপ জবুথবু হয়ে বসেই রইল। এবং একসময় ওঁরা উঠে এলেন দোতলার এ-ঘরে।

বড়মামা এবং বড়মামিমার ঠিক পেছনে মনোরমা। মনীশকেও শুভ্রা দেখতে পেয়েছে। তার পাশে মনীশেরই বয়সী আর এক ছোকরাকে অবশ্য চিনল না শুভ্রা। গতকাল থেকে সে অনেককেই এ-বাড়িতে দেখছে। এই ছোকরাকে অবশ্য দেখেনি। এ কে? মনীশের বন্ধুবান্ধব কেউ হবে হয়তো। শুভ্রা দেখল মনোরমা তাকে প্রাণপণে কী যেন ইশারা করছেন। প্রথমে বোঝেনি। তারপর বুঝল। মনোরমাই আর ঝুঁকি নিলেন না। কথা দিয়ে বোঝাতে হল তাঁকে।

—ও ছোটবউ! এঁরা হলেন গিয়ে আমাদের ছোট খোকার বড়মামা আর মামি। তোমার মামাশ্বশুর আর মামিশাশুড়ি। প্রণাম কর এঁদের। মনোরমার সেই ডাকে সাড়া দিতে পারার আগেই অবশ্য বিন্দু সাষ্টাঙ্গে প্রায় শুয়ে পড়েছে মেঝেতে। গুরুজনদের বার বার পা জড়িয়ে ধরে কপাল ঠেকাল সেখানে বিন্দু। শুভ্রা তাকিয়ে দেখছিল। এ-রকম প্রণাম সে জন্মেও কাউকে করতে দেখেনি। যেন একটা হাসি বিজবিজিয়ে উঠছিল তার মনে। নিজেকে অতিকষ্টে সে সংযত করল। তারপর বিন্দুর প্রণামের আড়ম্বর শেষ হবার পর সে অল্প নিচু হয়ে দুজন মানুষের পায়ের ধুলো নিল। যেভাবে দাদু তাকে শিখিয়েছে। একই সঙ্গে মনোরমাকেও অল্প নিচু হয়ে প্রণাম করতে ভুলল না। কারণ তিনিও এখানে গুরুজন। এতদ্‌সত্ত্বেও অবশ্য মনোরমার মুখের আঁধার কাটল না। ছোটবউ-এর প্রণামের ধরন তাঁর পছন্দ হয়নি। কীরকম যেন দায়সারা ভাব। গতকাল থেকেই তিনি ছোট-বউকে নজর করে যাচ্ছেন। ওর চালচলন একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না তাঁর। রূপ থাকলে কী হবে, বড় গুমোর! এত গুমোর থাকলে কি চলে? কীসের গুমোর ওর? কীসের আবার! রূপ আছে, পেটে নাকি কিছু বিদ্যে আছে তাই। বড়মামা অবশ্য শুভ্রার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন—বাহ বাহ! ছোটবউমাকে দেকতে তো বেশ। শুনলুম তুমি ইংরেজি পড়তে পারো। বেশ বেশ! আমাদের মনীশও তো হিরের টুকরো ছেলে। ওর মতো এডুকেটেড আশেপাশের দশখানা গেরাম খুঁজলেও আর একটা পাওয়া যাবে না। একেবারে রাজযোটক দেকচি। সুখী হও মা...সকলকে সুখী করো...। একটা বড় বিছেহার দিয়ে তিনি শুভ্রাকে আশীর্বাদ করলেন। বড়মামিও আশীর্বাদ করলেন। তবে কীরকম যেন সন্দিহানভাবে তিনিও লক্ষ করে যাচ্ছেন বউমাকে। শুভ্রার প্রণাম করার দায়সারা ধরন তাঁরও যেন পছন্দ হয়নি। যদিও শুভ্রার মাথায় হাত রেখে ধান-দূর্বা দিয়ে তিনিও বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। মনীশের দিকে না তাকিয়েই শুভ্রা বুঝতে পারছিল যে তার চোখদুটো লেপ্টে আছে তার মুখে এবং শরীরে। আবার সেই ভয়ানক বিরক্তির ঢেউ যেন ধেয়ে এল শুভ্রার দিকে। সে চকিতে একবার ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল মনীশের দিকে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মনীশ যেন লজ্জা পেয়ে সরিয়ে নিল তার চোখ। বড়মামা শুভ্রার দিকে তাকিয়ে আরও কীসব যেন বলছিলেন। শুভ্রার কানে ঢুকছিল না। এইসময় দুদ্দাড় করে বুড়ি উঠে এল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—পুরোহিত ঠাকুর এয়েচেন। এখনই কুসুমডিঙে শুরু করবেন...।

একান্ন

রীতি হ'ল বউ-ভাতের দিন সকালে কিংবা বলা যায় ঠিক মধ্যাহ্নভোজনের সময়ে বাড়ির অতিথি-অভ্যাগতদের নতুন বউ নিজের হাতে পরমান্ন বিতরণ করবে। এ বাড়িতেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। মনোরমা আজ, বউভাতের দিন সকালে ছোট বউমাকে পই পই করে যা যা নির্দেশ দেবার দিয়েছেন। এখন দ্বি-প্রহর। বাড়ির লম্বা এবং ঢাকা দালানে পরপর চাটাই পেতে বিয়েবাড়িতে যেসব আত্মীয়স্বজন এসে জুটেছে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা। একসঙ্গে প্রায় ত্রিশ জন বসতে পারবে এই দালানে। এখন বাড়ির পুরুষেরা এবং ছেলেছোকরার দল খেতে বসেছে। এদের অধিকাংশকেই শুভ্রা ঠিকমতো চেনেনা। কিংবা বলা যায় এখনও ঠিকমতো চিনে উঠতে পারেনি। একবার করে আলাপ হয়তো সকলের সঙ্গেই হয়েছে। কিন্তু অনেককে একবার দেখলেই কি পরে ঠিকমতো চেনা যায়? শুভ্রার পক্ষে সেটা আরও সম্ভব নয়। কারণ সে মানসিকভাবে এই বাড়ির সঙ্গে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারেনি। দাদুকে সে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না। দাদু তার মঙ্গল করেনি। শুভ্রা এই দুদিন অনেক ভেবেছে এই আকস্মিক বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে। ভেবে ভেবে তার ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে যে, দাদু তার জীবনের ক্ষতি করেছে, এভাবে এদের বাড়ির ঐ কালো-কুৎসিত ছেলের সঙ্গে তার হঠাৎ বিয়ে দিয়ে দাদু তার জীবনকে ছারখার করে দিয়েছে। তার জীবন অভিশপ্ত। এখন তার বারবার একথা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, অভিশপ্তই তো। বয়স কম হলেও শুভ্রা তো লেখাপড়া জানে। তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। নিয়মিত ইস্কুলে না গেলেও সে বাড়িতে বসেই এমন অনেক বই পড়েছে, যা তার বয়সী ছেলেমেয়েদের পড়ার কথা নয়। বাংলা বই যেমন পড়েছে, ইংরেজি বইও পড়েছে। সে নিজেই কিছুটা ভাবতে জানে। নিজের মতামত দিতে পারে অনেক বিষয়েই। বলতেই হবে তার বুদ্ধি যথেষ্ট পরিণত। সেই পরিণত বুদ্ধি দিয়েই শুভ্রা বুঝেছে যে, অসময়ে এরকম আকস্মিক বিয়ের জন্যে তার জীবনটাই বোধহয় অভিশপ্ত হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। এই বিয়েকে সে অগ্রাহ্য করছে, অস্বীকার করছে প্রতিক্ষণ। স্বামীকে সে মেনে নিতে পারেনি, পারবেও না। শ্বশুরবাড়িকে সে মেনে নিতে পারেনি, পারবেও না। শুভ্রা মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, সে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। কোথায় পালিয়ে যাবে? ....প্রথমে যাবে হাওড়ায়, তার মামাবাড়িতে। সেখানে গিয়ে দাদুর মুখোমুখি হবে। দাদুর সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া তার বাকি আছে। তারপর বাবা আর মায়ের সঙ্গে কথা বলবে। দাদু কি এতটা ভুল করবে? তার বিয়ের খবরটা বাবাকে পাঠাবে না? সেই অনেক দূরে ঝালদাতে বাবাকে হয়তো গতকালই কলকাতা ফিরে ট্রাঙ্ককল করে দিয়েছে দাদু। আর শুভ্রার বিয়ের খবর পেয়ে বাবা-মা কি চুপচাপ বসে থাকতে পারবে? অন্য ভাই-বোনদের নিয়ে চলে আসবে হাওড়ায়। ...আচ্ছা, আজ ফুলশয্যার দিন দাদু-দিদা এবং অন্যদের এ-বাড়িতে আসার কথা। ওদের সঙ্গেও কি বাবা-মা আসবে? যদি তাই আসে তাহলে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে শুভ্রা কেঁদে ভাসাবে। আবদার করবে আজই সে বাবার সঙ্গে চলে যাবে এ-বাড়ি থেকে। নাহ, দাদুর কাছে আর সে থাকবে না। বাবার সঙ্গে সোজা ঝালদাতে চলে যাবে। হোক সেটা বিদেশ-বিভুঁই, কলকাতা থেকে অনেক দূর, বাবার মুখে যেমন শুনেছে কোল-ভীল-মুন্ডা আর সাঁওতালদের জায়গা। সেখানেই সে থেকে যাবে বাবা-মা আর অন্য ভাই-বোনদের সঙ্গে। কিন্তু সে তো এখন বিবাহিতা। কোথায় যেন পড়েছে শুভ্রা যে, হিন্দু মেয়েদের একবার বিয়ে হলে আর জীবনে দ্বিতীয়বার বিয়ে হয় না। শুভ্রার তো একবার বিয়ে হল। তাহলে? আর তো তার বিয়ে হবার কোনও সুযোগ নেই। তাহলে বাকি জীবন নিয়ে কী করবে শুভ্রা? তাকে কি এরকম আধা-খ্যাঁচড়া অবস্থাতেই থেকে

যেতে হবে? বিয়ে হ'ল তার অথচ সে স্বামীর সঙ্গে থাকে না, শ্বশুরবাড়িতেও থাকে না। সেক্ষেত্রে এই সমাজে তার পরিচয় কী হবে? গতকাল মেমারিতে এদের বাড়ি পা দেওয়া থেকেই শুভ্রা নিজের মনে ভীষণভাবে আলোড়িত। তার মনের মধ্যে নিরন্তর ঝড় বয়ে চলেছে। এরকম সিদ্ধান্তও সে নিয়ে ফেলেছে যে, এ-বাড়ি থেকে সে যেন-তেন প্রকারে পালিয়ে যাবে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা। আর প্রতিমুহূর্তে পালিয়ে যাবার ভাবনায় তার মন উচাটন বলেই না শুভ্রা কাকে দেখছে, কার সঙ্গে এ-বাড়িতে পরিচিত হচ্ছে, কার সঙ্গে তার কীরকম সম্পর্ক সেসব ব্যাপারে তার বাস্তবিক কোনও খেয়ালই থাকছে না। যেমন এখন যে এই ঢাকা এবং লম্বা দালানে পরপর সব পাত পেড়ে খেতে বসেছে, এরা কোনও না কোনওভাবে তার সঙ্গে (বিয়ে হবার সুবাদে) সম্পর্কযুক্ত; কিন্তু কার সঙ্গে যে তার সম্পর্কটা কীরকম এসব তার খেয়াল থাকছে না। আর খেয়াল রাখার তেমন কোনও চেষ্টাও তার নেই।

বুড়ো, মাঝবয়সী, ছেলে-ছোকরারা খেতে বসে গেছে পরপর। পরিবেশন করছে হালুইকরের লোকজন। দালানের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা ঘরে বসে থাকতে হয়েছে শুভ্রাকে। তাকে ঘিরে বসে আছে দুজন,—মনোরমা আর বিন্দু। বড় এবং ঝকঝকে জামবাটিতে পরমান্ন রাখা আছে সামনে। একটা হাতা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুভ্রাকে। ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল, চাটনির পরই শুভ্রাকে পরমান্ন বোঝাই পাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রত্যেকের পাতে এক কিংবা দু-হাতা করে পরমান্ন ঢেলে দিতে হবে। তাকে সাহায্য করার জন্যে পাশে পাশে থাকতে হবে বিন্দুকে। সেরকমই নির্দেশ মনোরমার। ঘরের ভেতরে আধ-হাত ঘোমটা টেনে (এটাও মনোরমার নির্দেশ) বসে আছে শুভ্রা। ঘোমটার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছে মনীশের বড়মামা আর নারানবাবুকে। ঐ দুজনকে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। নারানবাবুর পাশে বসে খাচ্ছেন স্বয়ং সতীশ, শুভ্রার শ্বশুর। তাঁর পাশে বিদ্যুৎ, মনীশের মামাতো ভাই। ঐ ছোকরাকে একেবারেই পছন্দ হয়নি শুভ্রার। ভীষণ চালিয়াত। একটা সবজান্তা ভাব। আর ওর চাহনিটাও একেবারেই সুবিধের মনে হয়নি শুভ্রার। কীরকম বিশ্রিভাবে তাকায়। পুরুষের চোখের খারাপ দৃষ্টি যে কোনও মেয়েই পড়ে ফেলতে পারে। গতকাল বিকেলের দিকে একসময় দোতলার ঘরে শুভ্রা যখন একা বসে ছিল, বিদ্যুৎ এসেছিল তার সঙ্গে আলাপ জমাতে। বিদ্যুৎ একা নয় অবশ্য। ছিল মনীশও। নানারকম ছল-ছুতোয় মনীশ প্রায়ই শুভ্রার সামনে আসতে চাইছে, ভাব জমাতে চাইছে তার সঙ্গে, দু-একটা কথা বলতে চাইছে। কিন্তু শুভ্রা একেবারেই পাত্তা দেয়নি মনীশকে। একটা কথাও বলেনি। মনীশের চোখের দিকে তাকায়নি। মনীশ তাকে লক্ষ করে কোনও কথা বললে সে যেন শুনতেই পায়নি এরকম ভাবভঙ্গি করেছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ছেলেটা মহা সেয়ানা। সে গতকাল বিকেলে মনীশের সঙ্গে দোতলার ঘরে উদয় হয়ে ভাব জমাতে চেয়েছিল বেশ।

বলেছিল—তুমি নাকি কলকেতার মেয়ে? ইংরিজি বই পড়েচ?

এরকম বোকা-বোকা প্রশ্নের কী আর উত্তর দেবে শুভ্রা? সে তাকিয়ে ছিল বিদ্যুতের মুখের দিকে, তার চালাক-চালাক হাসির দিকে। তারপর যে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিল বিদ্যুৎ তা শুনে শুভ্রার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করেছিল।

বিদ্যুৎ জানতে চেয়েছিল—তুমি গোপাল ভাঁড়ের গপ্পো পড়েচ?

প্রশ্নটা শুনে শুভ্রার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল। গম্ভীরভাবে বলেছিল—নাহ, পড়িনি তো! তার উত্তর শুনে বিদ্যুতের সে কী বিদ্রূপাত্মক মুখের ভঙ্গি। —সে কি গোপাল ভাঁড়ের গপ্প পড়নি? হ্যাঁরে মনীশ—কী ব্যাপার রে? এই যে অনেকের মুখে শুনলুম তোর বউ নাকি খুব পড়ুয়া? যে গোপাল ভাঁড় পড়েনি সে আবার কী এমন পড়ুয়া? মনীশ চুপ

করে ছিল। যেন এই কথার উত্তরে কী বলবে ভাবছিল। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল নিজের স্ত্রীর দিকে। যেন বলতে চাইছিল—কিছু একটা বলো? আমার প্রেস্টিজ যে যেতে বসেছে। একটা জবাব দিতে না পারলে বিদ্যুৎ কিন্তু এই কথাটা সকলের কাছে রটাবে। মহা বজ্জাত ছেলে বিদ্যুৎ। এক নম্বরের বিচ্ছু! সে সকলের কাছে প্রমাণ করে ছাড়বে যে, মনীশের বউ একেবারে গোমুখ্যু! যে গোপাল ভাঁড়ের গপ্পো পড়েনি সে আবার পড়ুয়া কীসের?

আসল রহস্যটা হল অন্যরকম। দাদুর সাহচর্যে শুভ্রার পাঠের পরিধি সত্যিই নেহাত অল্প নয়। সে ইতিমধ্যেই এমন সব ক্লাসিক বই পড়ে ফেলেছে, যা হয়তো তার বয়সী অনেক বাঙালি মেয়েই পড়েনি। এমনকী গোপাল ভাঁড়ের গল্পের ব্যাপারেও সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। মামাবাড়ির আলমারিতে অনেক বই আছে। সেই আলমারির বইয়ের জঙ্গলে প্রায়ই হাতড়ায় শুভ্রা। সেখানেই সে একদিন পেয়েছিল পাতলা একটি বই। সেই বইটাই বস্তুত ছিল গোপাল ভাঁড়ের গল্প। বটতলাতে ছাপা বই। সেই বইয়ের চকচকে মলাটে ভুঁড়িওলা, কামানো-মাথা গোপাল ভাঁড়ের হাসি-হাসি মুখের ছবি। বইটির কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শুভ্রার অবশ্য খারাপ লাগেনি। যদিও সে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লজ্জাও পেয়েছিল খুব। কারণ অনেক অসভ্য কথা লেখা ছিল বইয়ে। যা পড়তে রীতিমতো অস্বস্তি হয়েছিল শুভ্রার। একদিন সন্ধের সময় নিজের বিছানায় বসে শুভ্রা বইটি পড়ছিল আর হাসছিল আপন মনে। এমন সময় সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল দাদুর।

—কী বই রে সুবু? যা পড়ে অতো হাসছিস? জানতে চেয়েছিলেন দাদু। শুভ্রা নির্দ্বিধায় দাদুর হাতে তুলে দিয়েছিল বইটি। একবার মাত্র বইটি হাতে নিয়েই ভূত দ্যাখার মতন আঁতকে উঠেছিলেন নীরদবরণ।

—গোপাল ভাঁড়?... বোগাস....রাবিশ? ...কোথা থেকে পেলি রে এই বই? আমার বাড়িতে কে ঢোকাল এসব বই?—নীরদবরণের স্বরে রীতিমতো রাগের ঝাঁঝ। কান্ড দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল শুভ্রা। বইটি পড়ে কি সে কোনও অপরাধ করে ফেলেছে?

—হোয়াই আর ইউ সাইলেন্ট?—আবার গর্জে ওঠেছিলেন নীরদবরণ;—বলবি তো!...হু হ্যাজ গিভন ইউ দিস বুক?

—একতলার আলমারি থেকে বইটা পেয়েছি। ভয়ে ভয়ে বলেছিল শুভ্রা।

—একতলার আলমারি?...বোগাস! সেখানে তো যত রাজ্যের বাজে বই থাকে। যতো রাবিশ বই ওখানে গুঁজে রাখে ক্ষীরোদ। যত থার্ড ক্লাশ নভেল আর নাটক। ওখানে তোকে কে হাত দিতে বলেছে? এই গোপাল ভাঁড়ের বইটা ক্ষীরোদই নিশ্চয়ই বটতলার বাজার থেকে জোগাড় করে, আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখেছে। ও ছাড়া এই কীর্তি কেউ করতে পারে না। এ বাড়িতে ঐ তো সব থেকে আনকালচার্ড, কুলাঙ্গার!—রাগে যেন ফুঁসছিলেন নীরদবরণ। একটু দম নিয়ে আবার বলেছিলেন—তো তুমি আর বই খোঁজার জায়গা পেলে না? ঐ আলমারিতে হাত দিতে গেছ কেন? তোমার বই পড়ার দরকার হয় তুমি আমার দোতলার আলমারি থেকে বই বের করে নেবে! আমার বইয়ের আলমারি তো আমি লকড় রাখি না। তুমি যাতে বই পড়তে পারো সেজন্যেই তো আই অলওয়েজ কিপ ইট আনলকড! আমার ক্লাসিক কালেকশান ফেলে তুমি এইসব লো-ক্লাশ বই পড়ছ? বলিহারি যাই তোমার টেস্ট!

একটানা বলে যাচ্ছিলেন নীরদবরণ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগই পাচ্ছিল না শুভ্রা। একসময় দাদু চুরুট ধরাবার জন্যে থামলে ফস্ করে সে জিজ্ঞেস করেছিল—বইটা পড়তে তো খারাপ লাগছিল না দাদু। গল্পগুলো বেশ হাসির। খুব মজার...।

—ওরে বোকা! এসব বই ভদ্রলোকে পড়ে না। দিস ইজ ব্যাড লিটারেচর। ..আই শুড নট

কল ইট লিটরেচর। এসব বই যদি এখন থেকে পড়িস তাহলে ভাল বই কাকে বলে তা বুঝবি না। আমি তোকে কী লেসন দিয়েছি?

—লেসন? শুভ্রা দাদুর প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেনি।

—ইয়েস লেসন! আমি তোকে বলেছি যে ইফ ইউ এভার গো অন রিডিং বুকস...রিড ওনালি গুড বুকস... ক্লাসিকস...দোজ বুকস হুইচ হ্যাভ অলরেডি প্রুভড দেয়ার ওয়ার্থ....। বাংলা বই যদি পড়তে হয় শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নীচে নামবি না। ইভন শরৎচন্দ্র আই ডোন্ট প্রেফার। রিড রবীন্দ্রনাথ.... বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছুদিন বাদে। হিজ প্রোজ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট....ফুল অব রিদম বাট ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ...।

দাদুর সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে শুভ্রা। কোনওদিন গোপাল ভাঁড়ের বইটি আর উলটেও দেখেনি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস পড়েছে। শরৎচন্দ্রও পড়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বেশি পড়েনি। সত্যিই ভাষাটা খুব কঠিন মনে হয় শুভ্রার। পরে পড়বে। যখন ভাষাজ্ঞান আরও একটু বাড়বে। এরকমই ভেবেছিল শুভ্রা।

কিন্তু এসব কথা তো আর ব্যাখ্যা করা যায় না বিদ্যুতের কাছে। ঐ চালবাজ ছেলেটার মুখে 'গোপাল ভাঁড়' নামটা শুনেই তার মনের ভেতরে কে যেন না না করে উঠেছিল। আর তাই সে নিমেষে বলেছিল ঐ বইটা পড়েনি। কিন্তু সেই অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে যে এত জ্বালা লুকিয়েছিল তা তো শুভ্রা বুঝতে পারেনি। বিদ্যুতের কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে শুভ্রাও যেন মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। মনীশের চোখের দৃষ্টিও সে পড়তে পেরেছিল। ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল শুভ্রা। বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—এমন একটা খারাপ বইয়ের নাম করলে যা ভদ্রলোকে পড়ে না। এবার আমি কয়েকটা বইয়ের নাম করছি যেগুলো ভদ্রলোকে পড়ে এবং তাই আমিও পড়েছি। তুমি পড়েছ কি না আমি জানি না...।

—কী বই? বল তো শুনি? বিদ্যুতের দৃষ্টিতে ক্রোধ।

—চরিত্রহীন, চোখের বালি, চতুরঙ্গ... বল তো দেখি পড়েছ? প্রশ্নটা করে মিটিমিটি হাসছিল শুভ্রা। আর মনীশও যেন মজা পেয়েছিল। শুভ্রার সমর্থনে সেও বিদ্যুৎকে জিজ্ঞেস করল—কী রে এবার বল পড়েছিস বইগুলো?...

—নাহ পড়িনি। কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল বিদ্যুৎ।

—বলতে পারবে কার লেখা বইগুলো?

—আমি পাবব....ফস্ করে বলেছিল মনীশ—একটা শরৎচন্দ্রের লেখা আর দুটো রবীন্দ্রনাথের। ইন ফ্যাক্ট, চরিত্রহীন উপন্যাসটা আমি পড়েছি।

—ধ্যাৎ--তুই কিছু জানিস না....প্রকৃত চালবাজের ভঙ্গিতেই বিদ্যুৎ বলেছিল—তিনটে বই লিকেচে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র....। আর সেই উত্তর শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল শুভ্রা। আরও খুশি হয়েছিল যে বিদ্যুতের গুমোর ভেঙে দিতে পেরেছিল। শুভ্রা অনুভব করেছিল যে, মনীশ তার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। যেন বলতে চাইছে যে তুমি আমার...আমাদের প্রেস্টিজ আজ বাঁচিয়েছ। না হ'ল বিদ্যুৎ শুধুই হয়তো আমাকে খ্যাপাত....তোর বউ মুখ্যু এই কথা বলে। এই ঘটনার পর থেকে বিদ্যুৎ আর শুভ্রার মুখোমুখি হতে চায়নি। এখন সে এই ঢাকা-দালানে চাটাইয়ের আসনে বসে মধ্যাহ্নভোজন সারছে। তার ঠিক পাশে বসে মনীশ। ওদের সবাইয়ের পাতে এখন পরমান্ন দেবে শুভ্রা। যারা খাওয়াদাওয়া করছিল তারা সবাই বুঝেছে এখন এ-বাড়ির নতুন-বউ পাতে দেবে পরমান্ন। সবাইয়ের পাতই প্রায় ফাঁকা। যাদের ফাঁকা নয় তারা মাছের

কাঁটা, আলুর খোসা, না-খাওয়া উচ্ছিষ্ট পাতের একপাশে সরিয়ে পরমান্নর জন্যে জায়গা করে নিচ্ছে। শুভ্রা অতিথিদের পাতে পরমান্ন দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। আসলে পরমান্ন হেঁসেল থেকে ঢেলে নেওয়া হয়েছে একটা পেতলের বালতিতে। সেই বালতি বিন্দুর হাতে। সে শুভ্রার পাশে পাশে চলেছে। মনোরমার নির্দেশমতো শুভ্রা এক হাতা করে পরমান্ন প্রত্যেকের পাতে ঢেলে দিচ্ছে। বড়মামা, সতীশ এবং নারানবাবুর পাতে অবশ্য শুভ্রা দু-হাতা পরমান্ন দিল। বড়মামা আপত্তি করলেন না অবশ্য। শুধু মুখ তুলে, স্মিত হেসে শুভ্রার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদুভাবে বললেন—মিষ্টি আমি আজকাল খাই না রে মা....বয়স হচ্ছে...তবে মা-লক্ষ্মীর হাতের পায়েস—ফেলতেও তো পারিনে। সতীশ একগাল হেসে বললেন—সবাই আশীর্বাদ করো ভাই, ...এ বাড়িতে মা-লক্ষ্মীর আগমনে ঘর আলো হয়ে উটেছে একেবারে। দাও মা—পায়েস দাও। নারানবাবু মৃদুভাবে বললেন—আশীর্ব্বাদ রইল স্বামী এবং সকলকে নিয়ে— সুখী হও। এরকম এক একটা কথা শুনছে আর শুভ্রার বুক ধকধক করে উঠছে। সে তো আর এ বাড়িতে লক্ষ্মী হতে আসেনি! স্বামী? ...ঐ কেলটে লোকটাকে সে স্বামী হিসেবে মেনে নিতেই পারবেনা কোনওদিন। এরা কেউ জানে না, বুঝতেও পারছে না...সুযোগ পেলেই শুভ্রা এ-বাড়ি থেকে পালাবে। কবে পালাবে? কখন পালাবে? ...কিছুই ঠিক করতে পারেনি। আজ সারা বাড়ি গমগম করছে। এ বাড়িতে সিং-দরজা আছে। সেখানে নহবত বসেছে। অতিথি-অভ্যাগতরা এক এক করে জুটেছে। আজ সারা বাড়িতে বড় শোরগোল। সবাইয়ের নজর নতুন-বউ-এর দিকে। এরকম অবস্থায় সকলের নজর এড়িয়ে শুভ্রার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আগামিকাল যখন বাড়ি প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবে। সুযোগ বুঝে শুভ্রা ঠিক এ বাড়ি ছেড়ে পালাবে....পালাবেই....।

একে একে পরমান্ন দিতে দিতে শুভ্রা বিদ্যুতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুতের দিকে না তাকিয়েই শুভ্রা বুঝতে পারছিল যে, সেই বিশ্রি জুলজুল দৃষ্টি তাকে বিঁধছে। অস্বস্তিতে এবং লজ্জায় শুভ্রার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। সে কোনওরকমে হাতায় কিছুটা পরমান্ন তুলে বিদ্যুতের কলাপাতায় ঢেলে দিয়েই সরে এল। এবং তখনই তার মনে হল যে, এবার স্বয়ং মনীশের পাতে ঢেলে দিতে হবে পরমান্ন। এ যেন তীব্র নাটকীয় মুহূর্ত। কারও দিকে চোখ তুলে না তাকিয়েই শুভ্রা বুঝতে পারছে অনেক জোড়া চোখ তার দিকে যেন স্থির। রান্নাঘর থেকে মনোরমা লক্ষ করছেন শুভ্রার গতিবিধি। ওপাশ থেকে বড়মামা, সতীশ, নারানবাবু না-তাকাবার ভান করে ঠিকই লক্ষ রাখছেন এদিকে। বিন্দু মুখ টিপে হাসছে শুভ্রার দিকে তাকিয়ে। আর মনীশ প্রাণপণে মাথা মাটির দিকে নামিয়ে এনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। শুভ্রার হাত কাঁপছিল। ভীষণ এক অনীহা তার মনে কাজ করছে এখন। তাকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। বিন্দুর ধরে থাকা বালতিতে হাতা এবার নামমাত্র ডুবিয়ে সেই হাতার পরমান্ন মনীশের পাতে ঢেলে দেবার মুহূর্তে হাতটা সত্যিই কেঁপে গেল শুভ্রার। আর তার ফলে পরমান্ন ঠিক পাতে পড়ল না। পড়ল মনীশের গায়ে, ঠিক কোলের কাছে। সমবেত একটা চাপা হাসির রোল। ছেলে-ছোকরারা হাসছে। বিদ্যুতও হাসছে। মনীশ অস্ফুটে 'ঠিক আছে ঠিক আছে' বলে গরদের পাঞ্জাবি থেকে পরমান্ন খুঁটে তুলছিল। শুভ্রার চোখ-মুখ সত্যিই লজ্জায় থমথম করছে। সে কিছু করতে পারার আগেই অবশ্য বিন্দু নিজে শুভ্রার হাত থেকে হাতা ছিনিয়ে নিয়ে মনীশের পাতে বেশ কিছুটা পরমান্ন ঢেলে চাপা স্বরে বলল—ফুলশয্যের রাতটা ঝগড়া করেই কাটবে মনে হচ্চে! এসো গো নতুন-বউ যা হবার হয়েচে। এখন অন্যাদেরও পাতে পরমান্ন দিতে হবে...।

বিকেল হয়ে আসছে। দোতলার ঘরেই বড় খাটের একপাশে শুভ্রা গুটিসুটি মেরে শুয়ে ছিল।

একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল তার চোখে। মনীশের ফিচকে বোন বুড়ি ঝাঁ করে ঘরে ঢুকে জানাল-ও বউদি! তোমার বাড়ি থেকে লোকজন এয়েচেন! শুভ্রার তন্দ্রা ছুটে গেল। সে উঠে বসল ধড়মড করে। শাড়ি-টাড়ি গুছিয়ে বিছানা থেকে নামতেই দেখতে পেল নীরদবরণ দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের চৌকাঠের কাছে। তাঁর পরনে চকচকে স্যুট, টাই। হাসছেন। শুভ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন—কীরে সুবু?...কেমন আছিস মা?...দাদুর এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর দিল না শুভ্রা। টিপ্ করে দাদুকে প্রণাম করে বলল—হাওড়া থেকে আর কেউ আসেনি?

—হ্যাঁ এসেছে। আসবে না কেন? ক্ষীরোদ, বারিদ, অসিত, তোর তিন মামাই এসেছে। আর এসেছে তোর ছোট মাসি আর মেসো...।

—বাবা আসেনি?....মা?

—নাহ, এসে পৌঁছতে পারল না বিশ্বদেব...তা আমি কী করব? একটা ট্রাংক-কল পাঠিয়েছি অবশ্য।...

—কী লিখেছে বাবা? আসবে না?

—আরে আসবে না কেন? তুই এতো উতলা হয়ে যাচ্ছিস কেন?....বিশ্বদেব লিখেছে তাকে জরুরি কাজে মানে অফিসেরই কাজে একদিনের জন্যে পাটনা যেতে হবে। সেখান থেকে ফিরেই সকলকে নিয়ে চলে আসবে। ট্রাঙ্ক কলটা পেয়েছি গতকাল বিকেলে। আমার ধারণা ওরা আগামিকালই এসে যাবে।....তা আর কী করা যাবে? বউ-ভাতের দিন তো আর পেছিয়ে দেওয়া যাবে না। তাই আমরাই চলে এলাম সকলকে নিয়ে।-নীরদবরণ উজ্জ্বল হাসলেন।

—আর দিদা?

—তোর দিদা আসতে পারল না। তার হাঁফানিটা আবার একটু বেড়েছে.....তো যাই হোক তুই কেমন আছিস বল? শ্বশুরবাড়িতে অ্যাডজাস্ট করতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—দাদু আমাকে তোমরা যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে নিয়ে চলো।....এ বাড়িতে আমার একেবারে থাকতে ভাল লাগছে না। এরা বই-টই পড়ে না। শুধু খায়-দায় আর নিজেদের মধ্যে বক বক করে। এখানে রাতে লাইট নেই, ভীষণ মশা! আর ল্যাট্রিনও নেই। মাঠে পায়খানা করতে যেতে হয়। পুকুরে চান করতে হয়। এখানে আমি থাকতে পারব না দাদু। এখানে আমার মন টিকবে না। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।—শুভ্রা কাঁদছিল। নীরদবরণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাহান্ন

এই দোতলার ঘরটিই যে অবশেষে ফুলশয্যার ঘরে পরিণত হবে তা শুভ্রা জানতে পারল বিকেলের দিকে, যখন মহাসমারোহে ঘরটি সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কয়েকজন। অসংখ্য রজনীগন্ধার স্টিক, আরও অনেকরকম ফুল, তার মধ্যে কয়েক রকমের গোলাপ আনা হয়েছে এই ঘর সাজাবার জন্যে। শুভ্রা জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। সে কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি অন্য কোনও ঘরে চলে যাবে? ফুলের ঝাড় নিয়ে যে লোকগুলো ঘরে ঢুকেছে তাদের কাউকে সে চেনে না। তারা চোরাচোখে নতুন বউকে তাকিয়ে দেখছে। তাতে শুভ্রার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। কোথা থেকে বিন্দু এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই সে বলল—ও ছোটবউ! এখন তো এরা এ ঘর সাজাবে। খাট-বিছানা সব ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবে।... সব তোদের জন্যে লো....এই কথাটা অবশ্য বিন্দু গলা নামিয়ে চোখ টিপে বলল।...ফুলের বিছানায় শুয়ে দুজনে....

কথাটা শেষ করল না বিন্দু। হেসে উঠল হো হো করে। আর এই কথায় অবশ্য শুভ্রার দুই গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল না। যদিও সে বিন্দুর অশ্লীল ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে ঠিকই। বিয়ের পরদিন থেকেই বিন্দুর সাহচর্যে শুভ্রা যেন রাতারাতি অনেকটাই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠেছে। সে এই মুহূর্তে লজ্জা পেলে হয়তো বিন্দু আরও উৎসাহী হয়ে উঠত। আরও খারাপ কথা বলবার প্রেরণা পেত। কিন্তু শুভ্রার কঠিন হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কী রকম হতোদ্যম হয়ে গেল। সে আর কীভাবে বুঝাবে যে বিন্দুর গ্রাম্য রসিকতায় শুভ্রা আদৌ মজা পায়নি। বরং তার মনে ফুলশয্যা ব্যাপারটার প্রতি এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। কোনও লাভ নেই এত ফুল দিয়ে বিছানা সাজিয়ে। ঐ বিছানায় সে ঐ কেলে মিনসের সঙ্গে একটিবারের জন্যেও শোবে না। ঐ ফুলের বিছানা হয়তো মনীশের কাছে কাঁটার বিছানা মনে হবে।

বিন্দু বলল—চল্ রে ছোট বউ একতলার ঘরে তোর মামারা, মামী আর মেসোমশাই বসে আচেন। ওরা তোর সঙ্গে কতা বলতে চাইচেন।

শুভ্রা বলল—তাই চলো ভাই...।

আজ দুপুরে দাদুর কাছে কেঁদে নিজের অপছন্দের কথা বলা এবং এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করার পর অবশ্য দাদু তাকে যে খুব উৎসাহব্যঞ্জক কিছু বলেছেন তা নয়। শুভ্রার কথা শুনে প্রথমে রাগে থমথম করেছিল নীরদবরণের মুখ। তারপর তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিলেন। পাহাড়ের গাম্ভীর্য যেন তাঁর মুখে। শুভ্রার কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন জলদগম্ভীর স্বরে—শোন্ সুবু! এখন তুই বিবাহিতা। এখন যা কথা বলবি ভেবেচিন্তে বলবি। তোর এই আকস্মিক বিয়ে নিয়ে গত দুদিন ধরে আমি অনেক ভেবেছি।...আমার মন বলছে আমার ডিসিসান কারেক্ট। তোর বিয়েটা হয়তো প্রিমেডিটেডেড নয়। অল অন আ সাডেন, আনডার সাম আনইউজুয়াল সারকামটানসেস, ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু আই ফার্মলি বিলিভ যে, যা ঘটেছে তোর ভালোর জন্যেই ঘটেছে। কারণ মনীশের মতো পাত্র খুঁজলেও চট করে পাওয়া যেত না। শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ তো আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। সেখানকার রেজিস্টারও আমার খুব পরিচিত। আমি মনীশের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। মনীশ সত্যিই খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। ও তো ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে! থার্ড ইয়ার চলছে ওর। ক্লাসের মধ্যে টপার! এরকম পাত্র তোর জন্যে অনেক খুঁজলেও হয়তো পাওয়া যেত না। ....হিজ ফিউচার ইজ ভেরি ব্রাইট! লাখ টাকা দিলেও এরকম সুপাত্র পাওয়া যেত না রে সুবু। ব্যাপারটা তুই বোঝার চেষ্টা কর। আর সতীশবাবুদের জেনেরোসিটিও আছে! নেই কি? কোনও দাবি-দাওয়া ওদের ছিল না। একেবারে বিনা পয়সায় বিয়েটা হল। এমন সুপাত্র বিনা পয়সাতে..

—আমার জন্যে তোমাকে পয়সা খরচ করতে হত তুমি এরকম ভাবছ কেন দাদু? আমার বিয়ের জন্যে যদি টাকা পয়সা লাগত আমার বাবা ঠিক দিত....। শুভ্রার এই মন্তব্যে হঠাৎ কীরকম রেগে গেলেন নীরদবরণ। তিনি বললেন—তোর বাবার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশানের খোঁজ আমি রাখি। ছোট মুখে বড় কথা বলিস না সুবু! গালা কারখানার অ্যাকাউন্ট্যান্ট বাবু কত টাকা আর মাইনে পায়? ফ্যামিলিটাও তো বড়ো করে ফেলেছে। তোকে না হয় আমি নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছি। বিশ্বদেবকে নিজের স্ত্রী ছাড়াও আরও দুই ছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে হয়। এমন কিছু টাকা সে রোজগার করে না যে. এতবড় সংসার চালিয়ে সে অনেক টাকা সেভ করতে পারবে।...এনিওয়ে এসব ব্যাপার নিয়ে তোর সঙ্গে ডিটেলস আলোচনার দরকার নেই। ইউ শুড নট বদার ইওর হেড অ্যাবাউট অল দিজ ওয়ার্ল্ডলি অ্যাফেয়ারস। আমি শুধু

তোকে একটাই অ্যাডভাইস করব। সেটা হল মনীশ উইল মেক আ সুপার্ব হাজব্যান্ড। তুই ওর সঙ্গে একটু অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা কর। আর এ বাড়ির লোকগুলোও কমপ্যারাটিভলি সিম্পল। ওদের সঙ্গেও ভালো বিহেব করার চেষ্টা কর।

—মনীশ খুব কালো দাদু। কালো মানুষ আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আর এ বাড়ির লোকগুলো ভীষণ আনএডুকেটেড। কেউ বই পড়ে না। বাড়িতে ল্যাট্রিন নেই। মাঠে পায়খানা যেতে হয়। এভাবে আমি থাকতে পারব না দাদু।....ইটস ইমপসিবল ফর মি। তুমি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো....।

শুভ্রার কথা শুনে নীরদবরণের মুখের কালো মেঘ যেন নিমেষে উবে গেল। তিনি হো হো হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—তুই যেসব কারণ দেখাচ্ছিস বড় জীবনের ক্ষেত্রে সেসব ইরেলিভ্যান্ট। মানুষের এডুকেশন, হিউম্যানিটি এগুলোই বড়। গায়ের রংটা বড় নয়। তোকে আমি এতদিন ধরে কী শিক্ষা দিলাম সুবু? মানুষের গায়ের রং নিয়ে তুই এত বদার করিস? যে মানুষকে দেখতে সুন্দর সে যে কাজেও সুন্দর হবে এর কোনও গ্যারান্টি আছে? এসব নিয়ে ভাবিস না। ছেলেমানুষি করিস না। ট্রাই টু বি ম্যাচিওর। এ বাড়িতে যদি বই পড়ার চল না থাকে তাহলে তুই চালু কর পড়াশোনা।....দ্যাট উইল বি আ গ্রেট থিং। আর মাঠে পায়খানা করার কথা বলছিস? গ্রামের মানুষেরা অবশ্য ওপেন এয়ার পছন্দ করে।.... আচ্ছা আমি ব্যাপারটা নিয়ে সতীশবাবুর সঙ্গে কথা বলব। পুত্রবধূর জন্যে বাড়ির ভিতরে একটা ল্যাট্রিন করে দিতে নিশ্চয়ই ওঁদের কোনও অবজেকশান থাকবে না। তবে এই কথাটা আজকেই বলা ঠিক হবে না। আজকের অকেশানটা কেটে যাক। দুদিন বাদে বলব। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলার পর নীরদবরণ থেমেছিলেন। কোটের পাশ-পকেট থেকে বের করেছিলেন পাইপ। তামাক ভরে নেবার কথা ভাবছিলেন। নাতনিকে উপদেশাত্মক দীর্ঘ লেকচারটা দেবার পর বেশ প্রসন্ন লাগছিল। শুভ্রার কথাগুলোকে আদৌ গুরুত্ব দেবার দরকার আছে বলে তাঁর মনে হয়নি। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা তাঁর কাছে থেকে একটু বিলাসিতার মধ্যে মানুষ। ইংরেজি নভেল পড়তে শিখেছে। সে কারণেই বেশ 'স্নব' হয়ে উঠেছে শুভ্রা। এ কথাটা কোনও দিন মনে হয়নি নীরদবরণের। আজ মনে হল। কিন্তু রিয়েলিটির সঙ্গে ওকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তো? অবশ্য শুভ্রা যে খুব 'ইনটেলিজেন্ট' এটা নীরদবরণের থেকে ভালো আর কে জানে? এক পরিবেশ থেকে হঠাৎ অন্য এক পরিবেশে চলে এসে শুভ্রার মনে কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এটা সাময়িক। ফুলশয্যার রাত কেটে গেলে, ক্রমশ নতুন পরিবেশের সঙ্গে শুভ্রা ঠিকই মানিয়ে নিতে পারবে বলেই নীরদবরণের ধারণা। শুভ্রার সঙ্গে একা বেশিক্ষণ থাকতে চাইছিলেন না নীরদবরণ। আবার অভিযোগের পর অভিযোগ হয়তো শুনতে হবে তাঁকে। রক্ষাও পেয়ে গেলেন। সতীশ এসে বললেন—এই যে নীরদবাবু আপনাকেই খুঁজছি। কুটুমবাড়িতে এসে শুধু নাতনির সঙ্গে কথা বললে হবে। আমাদের আত্মীয়স্বজনরা সবাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে যে! এই কথা শুনে সতীশের সঙ্গে নীরদবরণ বেরিয়ে গেলেন।

আর এখন ঘরের শয্যা ফুলে ফুলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তাই শুভ্রাকে বিন্দুর সঙ্গে একতলাতে চলে যেতে হল। সেখানে একটা ঘরে ক্ষীরোদমামা, বারিদমামা আর অসিতমামা বেশ জমিয়ে বসেছে। প্রত্যেকের সামনে রেকাবিতে মিষ্টির পাহাড়। নিজের মনের দুঃখ ভুলে শুভ্রা মামাদের সঙ্গে আগডুম-বাগডুম গল্প করতে লেগে গেল।

তিপ্পান্ন

এখন অনেক রাত। বিয়েবাড়ির কোলাহল ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। নিমন্ত্রিতদের ভিড় আর নেই। কখন যেন সানাইয়ের তানও থেমে গেছে। হঠাৎই যেন সারা বাড়িতে ঝপ্ করে এক ভারী নৈঃশব্দ নেমে এসেছে। হাওড়া থেকে আসা শুভ্রার আত্মীয়েরা সন্ধের মুখেই নিজেদের মোটরগাড়িতে ফিরে গেছে। নীরদবরণ কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি। রাতের দিকে রাস্তাঘাট বিশেষত হাইওয়ে যাত্রীদের পক্ষে একেবারেই নাকি নিরাপদ নয়। চোর-ডাকাতের ভয় আছে। ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনীর উৎপাতও কম নয়। পায়ে-হাঁটা যাত্রীদের তো সুযোগ পেলে তারা সর্বস্বান্ত করে দেয়। মোটর গাড়ির আরোহীদেরও তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার কথা নয়। রাস্তাতে নাকি ঐ লুঠেরাদের দল বড় বড় লোহার গজাল ছড়িয়ে রাখে। আর নিজেরা অপেক্ষা করে রাস্তার ধারের ঝোপঝাড়ের আড়ালে। চলন্ত গাড়ির টায়ার তীক্ষ্ণ গজালের ওপর পড়লেই ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা। যাদের ভাগ্য ভালো, তারা গাড়ির চালকের তৎপরতায় হয়তো কোনও কোনও সময় বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গজালের পাল্লায় পড়ে গাড়ির চাকা ফেঁসে যায়। তখন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ডাকাতরা লাঠি সড়কি উঁচিয়ে রে রে করে ছুটে আসে। যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। কেউ বাধা দিতে গেলে লাঠি দিয়ে মেরে তার মাথা দুভাগ করে দেয়। তবে বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে এইসব হাইওয়ে লুঠেরাদের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা মহিলা-যাত্রীদের প্রতি কোনও শারীরিক নিগ্রহ করত না। শুধু তাদের নির্দেশ দিত গায়ের গয়নাগাঁটি খুলে দিতে। ঐ সময়ের পুলিশ-গেজেট ঘাঁটলে দ্যাখা যাবে হাইওয়ে ডাকাতির ক্ষেত্রে ধর্ষণের তেমন কোনও রেকর্ড নেই। পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে অবস্থাটা অনেক পালটে গেছে। একুশ শতকে আজ আমরা ডাকাত কিংবা লুটেরাদের এরকম নিরামিশাষী উদারতা কল্পনাও করতে পারি না।

নীরদবরণ বিচক্ষণ এবং সাবধানী মানুষ। তিনি 'হাইওয়ে রবারদের' বিষয়ে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখেন। সে কারণেই তিনি প্রিয় নাতনির ফুলশয্যার আসর থেকে সন্ধের মুখেই বিদায় নিয়েছেন। ঐ সময়ে কি আর পেট-ভরে খাওয়াদাওয়া করা যায়? নাকি খাওয়াদাওয়া করলেই সেই খাদ্যসামগ্রী পেটে বেশিক্ষণ থাকে? তাই 'কনেযাত্রী'-দের সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করে নিতে হয়েছে। আর প্রচুর খাবার দাবার সতীশের তত্ত্বাবধানে বাঁধা-ছাঁদা হয়ে উঠে গেছে নীরদবরণের গাড়িতে। সতীশের নির্দেশে তাঁর লোকজন যা খাবার দাবার গাড়িতে তুলে দিয়েছে তা কম করে কুড়িজনের। কুটুম্বিতায় কোনও ফাঁক রাখতে চান না সতীশ। নীরদবরণ গণ্যমান্য মানুষ। তাঁর অনেক যোগাযোগ। পুলিশের ওপরমহলে অনেক জানাচেনা। তিনি পুলিশের ডিজি-কে বলে, হাইওয়েতে তাঁর গাড়ির সামনে পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। বর্ধমান জেলার পুলিশ তাঁর গাড়িকে এসকর্ট করে বর্ডার পার করে দেবে। তারপর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে হাওড়া জেলা-পুলিশের প্যাট্রল-ভ্যান।

নাতনিকে উপহার দিয়েছেন হিরের নেকলেস। আরও অনেক গয়না হয়তো আনতেন। কারণ সুবু তো বিয়ের দিন কিছু পায়নি তাঁর হাত থেকে। শুধু ধান-দূর্বা দিয়ে নমো নমো করে নাতনিকে আশীর্বাদ সেরেছিলেন তিনি। আজ আসার সময় তিনি চেয়েছিলেন সুবুর জন্য আরও অনেক গয়না নিয়ে যেতে। কিন্তু যূথিকা বাদ সেধেছেন। তাঁর বাস্তববুদ্ধি এক্ষেত্রে স্বামীর থেকে বেশি কাজ করেছে। সুবু তো বিয়ের পর আটদিনের মাথায় 'ধুলো-পা' নিয়ে আসবে বাড়িতে—মানে হাওড়ায় মামাবাড়িতে। ফিরে যাবার সময় তাকে নিজের হাতে গয়না দিয়ে সাজিয়ে দেবেন যূথিকা।

অসিতবরণ আর বারিদবরণ দুজনেই ছাত্র। তাদের উপহার দেবার সামর্থ্য নেই। ক্ষীরোদবরণ দিয়েছে একটা আঙটি। তার স্ত্রীর আসা হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু সে তো চলে গেছে কলকাতায় শোভাবাজার স্ট্রিটে বাপের বাড়িতে। হিরের নেকলেস যূথিকা নিজেই পছন্দ করে তুলে দিয়েছেন স্বামীর হাতে। এটি আদরের এই নাতনির জন্যেই তিনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। এখন এই আকস্মিক বিয়েতে সেই গয়না কাজে লেগে গেল। বাকি গয়নাগুলো দিয়ে যূথিকা নিজের হাতে যথাসময়ে নাতনিকে সাজিয়ে দেবেন। শুভ্রার মাসি এবং মেসোমশাইও কনেযাত্রীদের দলে আছে। তারাও একটি সরু সোনার হার উপহার দিয়েছে শুভ্রাকে। আরও কত উপহার পেয়েছে শুভ্রা। প্রত্যেক নিমন্ত্রিতই হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে এসেছে। আজ ফুলশয্যার রাত। মেয়েদের জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। কিন্তু শুভ্রার মনে সুখ নেই। তার মনের আকাশ জুড়ে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। ক্ষীরোদমামা, অসিতমামা এবং বারিদমামার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বললেও নীরদবরণের সঙ্গে সে একটাও কথা বলেনি দুপুরের পর থেকে। এক সময় দাদুর বাক্য তার কাছে বেদবাক্য ছিল। আজ আর নেই। আজ শুভ্রার ধারণা দাদু তার জীবনের ভয়ানক ক্ষতি করেছে। দাদুকে সে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না। তাঁর জীবনে ভয়ংকর ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তার জন্যে শুভ্রার ধারণা তাকে সারাজীবন দুঃখ পেতে হবে। আর তার সেই ভবিষ্যতের দুঃখময় জীবনের জন্যে দাদু ছাড়া আর কে দায়ী হতে পারে।

অতিথি-অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নেওয়ার পর 'বর-কনে'-র আহারও শেষ। মনীশ আর শুভ্রা যখন পাশাপাশি বসে খাচ্ছিল তখন সেই চালিয়াত এবং বাচাল বিদ্যুৎ স্থূল রসিকতা করে তাদের হাসাবার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু শুভ্রা হাসেনি। ব্যাজার মুখে বসেছিল। শুভ্রাকে না হাসতে দেখে মনীশও চুপচাপ বসেছিল। হাসাহাসিতে তেমন উৎসাহ পাচ্ছিল না। বউ-এর মতিগতি সে আদৌ বুঝে উঠতে পারছে না। যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনীশ এটুকু অন্তত বুঝতে পারছে যে, বউ-এর তাকে একেবারেই পছন্দ হয়নি। কেন পছন্দ হয়নি? পাত্র হিসেবে সে খারাপ কোথায়? বরং তার মতন ইঞ্জিনিয়ার পাত্র খুঁজলে সারা তল্লাটে কটা মিলবে তা বলা শক্ত। তার চেহারা বলিষ্ঠ। হোস্টেলে ভোরবেলা সে নিয়ম করে যোগব্যায়াম করে। চাষার ছেলেদের মতন গোলমাল, জবুথবু চেহারা তার আদৌ নয়। মাথায় ঘন চুল ব্যাকব্রাশ করা। নাক টিকোলো। চোখ টানাটানা। অনেকে তাকে রসিকতা করে 'কেষ্টঠাকুর' ডাকে। তাহলে? কেন বউ তাকে পছন্দ করছে না? তার গায়ের রং অত্যন্ত কালো বলে? এটা ঠিক যে, তার বউ-এর নাম যে শুভ্রা তার কারণ আছে। এত ফর্সা মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। তার বড়-বউদিও যথেষ্ট ফর্সা। কিন্তু শুভ্রার মতন ফর্সা নয়। কাঁচা সোনা গলানো রং যেন মনীশের বউ-এর। সেই রং আর রূপের জন্যে কি ওর অতো দেমাক? নাকি অন্য কোনও কারণ? আর কী কারণ?...মনীশ অনেক ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছে আর একটা কারণ হলেও হতে পারে। সেটা হল, 'লভ-অ্যাফেয়ার'। ঐ মেয়ের কি কারোর সঙ্গে ভালোবাসা ছিল? তা তো থাকতেই পারে। মনীশের ভাগ্যটাই তো সেরকম। ভাগ্য আর কোথায়? বলা উচিত দুর্ভাগ্য। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল, সে তো কোন্ এক টেররিস্ট-এর সঙ্গে পালিয়েছে। এরকম যে তার জীবনে হবে তা তো মনীশ স্বপ্নেও ভাবেনি। তবে একজন মেয়ের ক্ষেত্রে যখন সেটা হয়েছে তখন অন্য মেয়ের ক্ষেত্রেও তো সেটাই হতে পারে। এ মেয়ে আবার বেশ কেউকেটা। ইংরিজি পড়া মেয়ে। নভেল-পড়া মেয়ে। রূপ আছে। দেমাক আছে। ফ্যামিলির আভিজাত্য আছে। নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবাসে ঐ মেয়ে। গোপনে গোপনে লভ-অ্যাফেয়ার চালায়। আর হঠাৎ বিয়ের

পিঁড়িতে বাধ্য হয়ে বসতে হয়েছে বলে ওর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ও কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মনীশকে। এখন উপায় কী? কীভাবে মনীশ তার বউকে বশে আনবে? কীভাবে আর? তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। মনীশের চরিত্রে এই একটা গুণ। তার অপরিসীম ধৈর্য। হ্যাঁ সে অধৈর্য হবে না। ধীরে ধীরে সে ভালোবাসা দিয়ে ঠিক বউকে বশে আনবে। আনতেই হবে তাকে। এ কাজ তাকে পারতেই হবে।

মনীশদের শোবার ঘরে এখন দুটো নতুন এবং উজ্জ্বল হেরিকেন। ফুলে ফুলে সাজানো বিছানা। চাদরের ওপর অজস্র গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। ঘাটের বাজুতে রজনীগন্ধার ঝাড়। ফুলের গন্ধে ম-ম করছে সারা ঘর। মনীশ তাকিয়ে দেখল। বিছানার এককোণে, মনীশের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে তার বউ। বেনারসী দিয়ে মোড়া তার শরীর। নানা রকম অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে তার গায়ে। এই ঘরে এত রাতে সে একা এক অচেনা মেয়ের সঙ্গে। এই প্রথম কথাটা মনে হল মনীশের। আর মনে হতেই তার কীরকম নার্ভাস লাগল। কী কথা দিয়ে শুরু করবে সে? কী বলবে? এমন কিছু একটা বলতে হবে যাতে বউ কৌতূহলী হয়, কিংবা সে বিরক্ত না হয়। কী বলবে? বউ তো তার দিকে তাকাচ্ছেই না। তার দিকে পেছন ফিরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। নাহ মাথায় ঘোমটা তো দেয়নি বউ! মনীশ তাকিয়ে দেখছিল শুভ্রার উঁচু করে বাঁধা চুড়ো খোঁপা। তার ফর্সা ঘাড়ের কিছুটা দৃশ্যমান। পাথরের মতন স্থির হয়ে বসে আছে শুভ্রা। মনীশ কীভাবে এগিয়ে যাবে? কী কথা বলবে? ফর্সা, মসৃণ ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনীশের হঠাৎ যেন এক রোমাঞ্চ হল। তার মনে হল, এই প্রথম মনে হল যে সে মনের সব জড়তা কাটিয়ে এগিয়ে যায় বউ-এর দিকে এবং তার ঐ সুন্দর ঘাড়ে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ায়। সত্যিই ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিল মনীশ। সে ঘামছিল। তার হাত দুটো কাঁপছিল। সে এগিয়ে গেল শুভ্রার দিকে। ভাবল ডান হাত দিয়ে তার কাঁধ স্পর্শ করবে। নিজের দিকে মৃদুভাবে আকর্ষণ করবে শুভ্রাকে। হয়তো তার এই ডাকের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে ঐ রূপসী! আর কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়। মনীশ নিজেকে বোঝাল। তারপর এগিয়ে গেল শুভ্রার দিকে। হেরিকেনের আলোয় দেয়ালে তার বিকট ছায়া পড়ল। হাত বাড়িয়ে শুভ্রাকে স্পর্শ করবার মহূর্তে কী মনে হল মনীশের। সে হাত গুটিয়ে নিল। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল—বাড়ির জন্যে কি তোমার খুব মন কেমন করছে? কোনও উত্তর পেল না। তখন যেন একটু সাহস সঞ্চয় করে ডান হাতে মৃদুভাবে স্পর্শ করল বউয়ের কাঁধ। এবং আবার জিজ্ঞেস করল—বাড়ির জন্যে দাদুর জন্যে তোমার খুব মন কেমন করছে তাই না?....কোনও উত্তর পেল না। বরং অনুভব করল শুভ্রা যেন পাখির ডানা সাপটানোর মতো কাঁধ নাড়াল। চকিতে মনীশ নিজের হাত সরিয়ে নিল। আর কিছু বলতে পারার আগেই ঘরের বাইরে সমবেত নারীকণ্ঠে হাসির রোল উঠল। বুঝতে কিছু বাকি থাকল না মনীশের। বাড়ির কম-বয়সী মেয়েরা ফুলশয্যার ঘরে আড়ি পেতেছে।....আহা সোহাগ দেকে আর বাঁচি না লো!—বলল একজন। এই স্বর চেনা মনীশের। বিন্দু, তার বড় বউদির কান্ড। মেয়েদের আড়ি পাতার ব্যাপারে বিন্দুই নেতৃত্ব দিচ্ছে।

মনীশ আবার নিজেকে ফিরে পেল যেন। সপ্রতিভভাবে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খিল খুলল নিজের হাতে। দরজা হাট করে খুলে দিল। সামনে অবশ্য কাউকে দেখতে পেল না। বাইরে নিশুত রাত। অনেক দূর থেকে অস্পষ্টভাবে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখতে পেল না মনীশ। তবে অজস্র তারা ফুটে আছে। বড় বউদি এবং অন্য মেয়েরা সবাই আসলে সিঁড়ির বাঁকের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। বুদ্ধিমান

মনীশের অবশ্য তা বুঝতে বাকি রইল না। সে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল যা ভেবেছে তাই। বিন্দু এবং আরও পাঁচজন মেয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির আড়ালে। মনীশকে সামনে দেখে তারা রীতিমতো অপ্রস্তুতে পড়ল। মনীশ বিন্দুকে উদ্দেশ করে বলল—কী গো বড়বউদি তোমরা বুঝি রাতে ঘুমোবে না?

—সে প্রশ্ন তো ভাই ঠাকুরপো আমিও তোমারে করতে পারি। বিন্দু হেসে বলল।

মনীশ উত্তর দিল—আমি তো ঘুমোতেই যাচ্ছিলাম। তা তোমরা আড়ি পাতলে আর উঁচু গলায় হাসাহাসি করলে ঘুমোই কীভাবে বলো?

—তা বটে!....বিন্দু বলল,—আমরা তোমাদের অসুবিদে করতেচি এটা ঠিক। এখন বউ-এর সঙ্গে তোমার কত সোহাগের কতাবার্তা হবে। আমরা তোমার পথের কাঁটা কেন হব গো ঠাকুরপো?....এই চল লো চল! রাত অনেক গড়িয়েচে। তোদের চোকে কি ঘুমও নেই লো?

ঠিক রাখালের গরু তাড়ানোর ভঙ্গিতে বিন্দু অন্য মেয়েদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে সবাই দুদ্দাড় করে নেমে গেল নীচে একতলায়। মনীশ ফিরে এল নিজের ঘরে। সে জানে বিন্দুরা একেবারে চলে যায়নি। আবার নতুন উদ্যমে ফিরে আসবে। আড়ি পাতবে তার ঘরের দরজাতে। এভাবে অশ্লীল আনন্দ পেতে চাইবে। তাছাড়া.....ভেবে শিউরে উঠল মনীশ। তাদের ঘরের দরজাতে কোনও ফুটো-টুটো নেই তো? সেই ফুটোতে চোখ রেখে ওরা ঘরের ভেতর মনীশ আর শুভ্রাকে.....। এই কথা মনে হতেই মনীশ ঘরের দুটো দরজা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। আর অচিরেই আবিস্কার করে ফেলল ফুটোটা। বিন্দুই হয়তো কোনওভাবে দরজাতে এই ফুটো করে নিয়েছে রাতে ঘরে নজর করবে বলে। বিন্দু সব পারে। ওর অসাধ্য কিছু নেই। এখন এই ফুটোটা যেভাবে হোক বন্ধ করতে হবে। কাগজ? কাগজ? এত রাতে ফুটো বন্ধ করার কাগজ কোথায় পাওয়া যায়? গরদের পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকাল মণীশ। সিগারেটের প্যাকেট বের করল। প্যাকেটের মধ্যে মাত্র একটা সিগারেট আছে। প্যাকেটের রাংতা-কাগজটা বের করে নিল মণীশ। তারপর সেটাকে সরু করে পাকিয়ে দরজার ফুটো বন্ধ করে দিল। এবার নিশ্চিন্ত। দরজার বাইরে আড়ি পাতলেও ওরা ঘরের ভেতর কিছু দেখতে পাবে না। যেন একটা মহা কর্ম সমাধান করতে পেরেছে এভাবে মনীশ উল্লসিত স্বরে শুভ্রাকে উদ্দেশ করে বলল—দরজার ফুটো বন্ধ করে দিয়েছি। এবার আর ওরা আড়ি পাতায় উৎসাহ পাবে না।

কোনও উত্তর পেল না শুভ্রার কাছ থেকে। ওকি বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? হতেই পারে। সারাদিন ধরে যা ধকল যাচ্ছে শরীরের ওপর দিয়ে! মনীশ আরও একটু সাহসী হতে চাইল। মেয়েরা তো লজ্জাই পাবে। তাকেই সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। আজকের রাতটা সম্ভবত জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত। এই রাতটাকে কি ঘুমিয়ে অপব্যয় করবে? তাহলে তো সারা জীবন আপসোস থেকে যাবে।....

মনীশ আবার এগিয়ে গেল নিজের বউ-এর দিকে। তার দু-কাঁধে আলতো হাত রেখে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চাইল। মুখে বলল—কী হল? ঘুমিয়ে পড়লে? আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না? কেন আমি কী অপরাধ করলাম?

হঠাৎ যেন সাপের মতন ফোঁস করে উঠল শুভ্রা। হিসহিসিয়ে বলল—আমাকে ছোঁবেন না আপনি! সরিয়ে নিন হাত... নিন সরিয়ে! আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। সেই কথাগুলো শুনতে হবে আপনাকে।

চুয়ান্ন

সর্বসমক্ষে সামাজিক অনুশাসন পুরোপুরি মেনে যে মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, ফুলশয্যার রাতে তার ঘনিষ্ঠ হতে গেলে এভাবে যে প্রত্যাখ্যাত এবং অপমানিত হতে হবে তা কল্পনাও করেনি মণীশ। শুভ্রার কথাগুলো শুনে প্রথমে সে চমক খেয়ে এবং বিস্ময়ে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষে রাগী এই অচেনা মেয়েটির দিকে। হ্যাঁ অচেনাই তো। যার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল সেই অপর্ণা নামের মেয়েটির সঙ্গেও তো আলাপ হয়নি। আলাপ হবার উপায়ই ছিল না। কিন্তু তবুও তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য কানে শুনে মনীশ মনে মনে ভেবে নিয়েছিল মেয়েটি কেমন হবে। কিন্তু শুভ্রার বিষয়ে সে কিছুই জানে না। জানার সুযোগও হয়নি। শুধু তাকে দেখে, তার রূপের বিভা দেখে বড় ভালো লেগে গিয়েছিল। সত্যিই অসাধারণ রূপসী মেয়েটি। গায়ের রং যেন গলানো সোনা। মুখশ্রী প্রতিমার মতো। ঘন কালো চুলের ঢল নেমে গেছে কোমর পর্যন্ত। আর শুধু রূপেরই অধিকারী নয় মেয়েটি। সেই রূপে মিশেছে মনীষার দীপ্তি। হ্যাঁ ঠিকই। ম্যাট্রিকে গোল্ডমেডেল পাওয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠরত মনীশ শুভ্রার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝেছিল মেয়েটি প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। শুভ্রাকে প্রথম দেখেই পছন্দ হয়েছিল বলে সতীশও এই আকস্মিক বিয়েতে মত দিয়েছিলেন। তবে তিনি নীরদবরণের পরিচয় পেয়েও তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক এটা তো ঠিকই যে, এই পাত্রীর বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার কোনও ফুরসুতই হয়নি সতীশদের। সম্বন্ধ করে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র এবং পাত্রী উভয়ের সম্বন্ধেই ব্যাপক খোঁজখবর নেওয়া হয়। এভাবে খোঁজখবর নিয়ে সব কিছু সন্তোষজনক মনে হলেই তবে বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। আধো-অন্ধকার ঘরে গভীর রাতে সম্পূর্ণ অচেনা এক মেয়ের সামনে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনীশের এই প্রথম মনে হ'ল, খোঁজখবর না নিয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করে সে বোধহয় মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। সম্ভবত এটাই যে তার জীবনের সব থেকে ভুল সিদ্ধান্ত এরকমও মনে হচ্ছিল মনীশের। তার মনে শুভ্রার সম্বন্ধে যে সন্দেহ অস্পষ্টভাবে উঁকি দিচ্ছিল এখন সেটাই যেন দৃঢ় হল।...অপর্ণা যেমন কোন এক টেররিস্ট ছোকরার সঙ্গে 'লভ'-এ জড়িয়ে পড়েছিল; এই মেয়েও সেরকম কোনও পুরুষের সঙ্গে প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। সে কারণেই মণীশকে সে মেনে নিতে পারছে না। বোধহয় পারবেও না কোনওদিন। কিন্তু এখন উপায়ই বা কী? মনীশ যেন সেই মুহূর্তে চোখের সামনে অন্ধকার দেখছিল। যে তাকে পছন্দ করে না, করতে পারবে না কোনওদিন, ভালোবাসতেও পারবে না স্বাভাবিকভাবে; সেই মেয়ের সঙ্গে সে কীভাবে কাটাবে দাম্পত্যজীবন? কীভাবে? তাহলে কি তার জীবনটাই রসাতলে গেল? বিদ্যুতের গতিতে এত সব প্রশ্ন যাতায়াত করছিল মনীশের মনে। সে অনুভব করল সে ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছে। তার কপালে ফুটে উঠেছিল ঘামের বিন্দু। তার হাত দুটো কাঁপছিল। কী করবে সে? কী করবে? এখনই কি ঘরের দরজার খিল খুলে ছুটে বাইরে যাবে? তারপর বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বলবে যে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে! যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে আমার কোনওদিনই বনিবনা হবে না। ঐ মেয়েটি আমাকে কোনওদিনই স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে না, ভালোবাসতে পারবে না আমাকে কোনওদিন কারণ ও অন্য কোনও পুরুষকে ভালোবাসে। এখন আমার কী উপায় হবে বলে দাও তোমরা! বিয়ের প্রথম দিন থেকেই অশান্তি আমি সহ্য করতে পারব না কিছুতেই। তোমরা এমন কিছু ব্যবস্থা করো যাতে আমরা দুজনে আলাদা হয়ে যেতে পারি। যেন অনিচ্ছুক স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমাদের

সারাজীবন কাটাতে না হয়...। কে যেন ক্ষোভে, আক্ষেপে চিৎকার করে উঠতে চাইছিল মনীশের বুকের ভেতর! কিন্তু চিৎকার করেই বা কী লাভ? মনীশ যেহেতু শিক্ষিত সে একটি পরিণত, যুক্তিবাদী মনেরও অধিকারী। তার মনে হ'ল, চেঁচামেচি করে কোনও লাভ নেই। তাতে তাদের পরিবারের বদনাম হতে পারে। মনীশের বাবা এবং মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে। মনীশের জীবন তীব্র অশান্তিতে ছারখার হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। এই আবেগপ্রবণ, অবুঝ মেয়েটিকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক। মনীশ কি পারে না ভালোবাসা দিয়ে এই মেয়েটির মন জয় করতে? নিশ্চয়ই পারে। চেষ্টা করলেই পারে। সেই কাল্পনিক এবং অচেনা পুরুষটির প্রতি মনীশ তীব্র ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করল। মনে মনে সে নিজেকেই বলল—নাহ, আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। ভালোবাসা দিয়ে প্রেম দিয়ে আমি এই মেয়েটির মন জিতে নেব। কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থাটা হয়তো পালটে যাবে। সে আজ মনীশের উপস্থিতি মেনে নিতে পারছে না, তাকে সামনে দেখলেই প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে; হয়তো অচিরেই এমন একটা দিন আসবে যখন মনীশের সঙ্গ পেতে মেয়েটি পাগল হয়ে উঠবে। এরকম ভেবে মনীশ তাকাল খাটের ওপাশে বেনারসি ও বিবিধ অলঙ্কারের ভারে জবুথবু হয়ে বসে থাকা শুভ্রার দিকে। মনীশের দিকে পিছন ফিরে, দেয়ালের দিকে মুখ করে শুভ্রা পাথরের মতো কঠিন হয়ে বসে আছে। মনীশ ভাবল কী বলা উচিত। কিছু একটা বলতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে না। হতাশ হলে চলবে না। আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। ভালোবাসার চেষ্টা করতে হবে ওকে। ভালবাসা দিয়ে জয় করতে হবে ওকে। করতেই হবে...।

—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?....রাগ করবে না? ভীষণ বিনীতভাবে মনীশ বলে। কোনও উত্তর পায় না। খাটের এপাশে বোকার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মনীশ। দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশ বড় নিঝুম লাগছে। আড়ি-পাতা মেয়ের দল নিশ্চয়ই হতাশ হয়ে যে যার বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। শুধু কি এ-ঘরেই তারা দুজনে জেগে আছে? মনীশ এবার আর প্রশ্ন করার ঝুঁকি নেয় না। গলায় নরমভাব বজায় রেখেই বলে—আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কেন এমন ব্যবহার করছ সুবু! আসলে তোমার বাড়ির জন্যে, বাবা মায়ের জন্যে, দাদুর জন্যে খুব মন কেমন করছে....।

—সুবু বলে আমাকে আপনি ডাকবেন না। ও নামে আমাকে দাদু ছাড়া কেউ ডাকে না। —শুভ্রা যেন ফুঁসে ওঠে।

—কেন তোমার দাদু ছাড়া ঐ নামে তোমাকে আর কেউ ডাকতে পারে না?

—নাহ....পারে না।

—কিন্তু ঐ নামটা যে আমারও খুব প্রিয়.....।

—একেবারে ন্যাকামি করতে যাবেন না আমার সঙ্গে!

ন্যাকামি শব্দটা মনীশের মাথায় যেন ইটের টুকরোর মতো বিঁধে যায়। রাগে তার চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। সত্যিই রেগেমেগে সে বোধহয় একটু জুতসই জবাব দিয়েই বসত, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার কে যেন তার মনের মধ্যে কথা বলে ওঠে—মেজাজ হারিয়ো না মনীশ! এ মেয়ে অন্য ধাঁচের। মেজাজ দেখিয়ে, শাসন করে এ মেয়েকে তুমি বশে আনতে পারবে না। একে জিততে হবে ধৈর্য দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। এরকম মনে হতেই মনীশের মুখে ফুটে ওঠে হাসির রেখা। সে কোমলভাবে বলে—আচ্ছা তুমিই তা হলে বলো তোমাকে কী নামে ডাকব?

—আহা ঢং দেখে বাঁচি না! —শুভ্রা হিসহিসিয়ে বলে—কোনও নামে ডাকতে হবে না আমাকে! ওসব ছল-চাতুরি করে আসলে তো গায়ে হাত দেবার ধান্দা! একটা কথা আপনাকে আমি জানিয়ে

দিচ্ছি আপনি আমার কাছে আসার চেষ্টা করবেন না, আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না! যদি জোর করে আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেন তাহলে আমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করব। সেটা আপনার কিংবা এ বাড়ির কারোরই বোধহয় ভালো লাগবে না....।

—জোর করে আমি তোমাকে কিছুই করার চেষ্টা করব না। আমি পশু নই। অসভ্য নই। একজন শিক্ষিত মানুষ। আমি তোমার ওপর জোর খাটাতে যাব কেন? তোমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই তুমি আমার কাছে এসো। আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমার সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করে চলেছ? তোমাকে আমি জোর করে বিয়ে করতে যাইনি! তোমার দাদুই তো অভিভাবক হিসেবে এ বিয়েতে মত দিয়েছেন....।

—আপনি এ বিয়েতে রাজি হলেন কেন? আপনি তো কাটোয়া গিয়েছিলেন অপর্ণাদি-কে বিয়ে করতে। যখন তাকে পেলেন না তখন আমাকে বিয়ে করলেন। এ যেন বাজার গিয়ে জিনিস কেনা! একটা জিনিস পাওয়া হল না তো অন্য একটা জিনিস পছন্দ করা। মেয়েদের আপনারা কী ভাবেন? শুধু উপভোগের সামগ্রী?

শুভ্রার এই কথার তোড়ের সামনে পড়ে মনীশ যেন কয়েক মুহূর্ত অসহায় বোধ করে। তারপরই তার সম্বিত ফেরে। সে তাড়াতাড়ি শুভ্রার দিকে তাকিয়ে বলে—এ কথাটা বোধহয় ঠিক বলছ না। আমি কিংবা আমরা জোর করে তোমাকে বিয়ের ব্যাপারে রাজি করাইনি। যাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম তাকে পাওয়া গেল না, একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তোমার দাদু তোমাকে এ-বাড়ির বউ করার প্রস্তাব দেন তোমার দাদুকে। তোমার দাদু সেই প্রস্তাবে রাজি হন। তবেই তো আমাদের বিয়ে...

—আপনাকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই আমি! এ বিয়ে আমি মেনে নিতে পারিনি। আপনাকে আমি স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারব না কোনওদিন। আপনি আমার কাছে ঘেঁষতে চাইবেন না! তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধাব আমি! আমি আপনাদের বাড়িতে একদিনের জন্যেও থাকতে চাই না। সম্ভব হলে আগামিকাল আমাকে দাদুর কাছে রেখে আসতে পারবেন?

মনীশ বলল—তা কীভাবে সম্ভব? বিয়ের পর আটদিনের মাথায় স্ত্রীকে বাপের বাড়ি দিয়ে আসতে হয় শুনেছি। আগামিকালই তুমি হাওড়ায় যেতে চাইলে আমার বাবা-মা তা মেনে নেবে কেন? তুমি তো শুনেছি এডুকেটেড। অনেক কেতাব পড়েছ? তুমি এরকম অযৌক্তিক কথা বললে মেনে নেব কীভাবে? মনীশের স্বরে অসহায়তার সুর স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। শুভ্রা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভাবতে থাকে এরপর কী বলবে। ক্রমশ রাত ঘনিয়ে আসে। অনেক দূর থেকে অস্পষ্টভাবে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। খাটের একধারে চুপচাপ বসে থেকে মনীশের হাই ওঠে। সে খামোকা মশার কামড় খায়। সে বুঝতে পারে না এই মেয়েটিকে কীভাবে জিতে নেবে? কেমন কাটবে তার বিবাহিত জীবন? সুখী হবে তো সে? এই মেয়েটিকে নিয়ে সুখে ঘরকন্যা করতে পারবে তো? বেশ কিছুক্ষণ বাদে মনীশ বলে—আমি মাত্র তিনদিন—সামনের রবিবার পর্যন্ত এখানে আছি। তারপর আমায় হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে। সামনে পরীক্ষা। অনেকদিন বাড়ি আসব না। তখন দেখো তোমার মন কেমন করবে আমার জন্যে...। অনেক আশা করে ছিল মনীশ। এ কথার কোনও উত্তর পাবে। কিন্তু কোনও উত্তর আসে না। ক্রমশ খুব ক্লান্ত লাগে মনীশের। ঘন ঘন হাই ওঠে। একসময় সে মশারি না ফেলে, মশার কামড় অগ্রাহ্য করে খাটের একপাশে কাত হয়। এবং ঘুমিয়ে পড়ে। মনীশের সাহস হয়নি তাই। সাহস করে সে যদি শুভ্রার কাছে যেত, বুঝত নিঃশব্দে কাঁদছিল শুভ্রা। অঝোরে কাঁদছিল...।

পঞ্চান্ন

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই শুভ্রার। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। খাটের যে প্রান্তে সে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে ছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন যেন নিজের অজান্তেই, সেদিকে একটা জানলা। লম্বা গরাদের জানলা। গত রাতে বউ-এর সঙ্গে প্রথমবারের জন্যে ঘনিষ্ঠ হবার তীব্র বাসনায় মনীশ যখন একে একে ঘরের জানলা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং দরজার ছিদ্রে কাগজের মন্ড আটকে বাইরে থেকে আড়িপাতার কোনও সুযোগই বিন্দুদের দলকে দিতে চায়নি তখন তার এদিককার জানলাটাও বন্ধ করার কথা মনে হয়নি এই কারণে যে, এটি ছিল আসলে নিরাপদ। ঐ জানলার ওপাশে কোনও অলিন্দ নেই, দাঁড়াবার জায়গাও নেই; ওটি বাড়ির পেছনে বাগানের দিকে উন্মুক্ত। গত রাতে আকাশ ছিল নির্মেঘ। অজস্র তারা দৃশ্যমান ছিল এবং ভাঙা হলেও চাঁদের মুখও ছিল উজ্জ্বল। গতরাতে এই ঘরে ফুলের পাপড়িতে ছত্রাকার বিছানায় শুভ্রাকে একা পেয়ে মনীশের মনে কত রোমান্টিকতাই না উথলে উঠেছিল। এরকমও ভেবেছিল মনীশ যে, এই বাগানের দিকের জানলা যার কাছাকাছি দাঁড়ালেই অনন্ত আকাশ, তারারাজি, এবং চাঁদের হাসিমুখ দৃশ্যমান, সেখানেই তারা ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে দুজনে এবং দু-একটা ভালবাসার কথা তার বউয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অতি সঙ্গোপনে উচ্চারণ করবে। কিন্তু হায় মনীশের কপাল! ফুলশয্যার রাত তার যে মর্মবেদনার মধ্যে কেটেছে তা কহতব্য নয়। এই দুঃখ, এই বেদনা মনীশ কারও কাছে হয়তো খুলে বলতেও পারবে না।

যাই হোক, এখন ভোর, যাকে কাকভোর বলা যায় ঠিক সেরকমই। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। ফলে এই জানলা পূব-মুখো হলেও উদিত সূর্যের আভাস পাঁশুটে-রং মেঘস্তরের নীচে অদৃশ্য। তবে ঠান্ডা বাতাস বইছিল। হয়তো বৃষ্টিও হতে পারে। খোলা জানলা দিয়ে বাগানের গাছপালা থেকে ভেসে আসা বাতাসই বস্তুত শুভ্রার ঘুম হঠাৎই ভাঙিয়ে দিয়েছে। সে কোথায় আছে, কেন আছে তা বুঝে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল শুভ্রার। তারপরই সে ত্রস্ত ভঙ্গিতে উঠে বসল। খোলা জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকাল। গাছের পাতার ঘনত্বে তার চোখ স্থির হল। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বিশ্রি লাগল। তারপরই শুভ্রার মনে হল সেই মিনসে কোথায় গেল?...সেই কেলে মিনসে?....তার ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নিয়ে সেই মিনশে তার গায়ে হাত দেয়নি তো? অপবিত্র করেনি তো তাকে? ভাবতেই শিউরে উঠল শুভ্রা। পুরুষরা সব পারে। বিশেষত মনীশের মতো গ্রাম্য এবং হ্যাংলা পুরুষরা। তার চোখের দৃষ্টিকেই প্রথম থেকে অপছন্দ হয়েছে শুভ্রার। মনীশের দৃষ্টিতে শুভ্রা অনুভব করেছে লোভ; যদিও তা সত্যি নাও হতে পারে। আসলে প্রথম দর্শন থেকেই তো শুভ্রা পছন্দ করেনি মনীশকে। ওরকম মিশকালো পুরুষের সঙ্গে (যতই তার গুণ থাকুক, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক, কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে নম্র হোক); কোনওরকম শারীরিক সম্পর্কের কথা সে ভাবতেই পারে না। ভাবলেই তার গলার কাছে যেন বমি উঠে আসে।

নিজেকে পরীক্ষা করে শুভ্রা আশ্বস্ত হয়ে যে সে ঠিক আছে। তার কুমারীত্ব অন্তত অটুট আছে। তখন মুখ ফিরিয়ে দেখল, মনীশ খাটের একেবারে ও-প্রান্তে, কিনারায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। সে যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে তা বোঝা গেল তার মৃদু নাসিকাগর্জনে। ঐ লোকটার এত বিশ্রিভাবে নাক ডাকে নাকি?...ম্যাগো!... এতকাল শুভ্রার ধারণা ছিল যাদের বয়স কম তাদের নাক গর্জন করে না। মামা বাড়িতেও সে দেখে আসছে সেরকমই। ক্ষীরোদমামার নাক ডাকে, তা তো ডাকবেই, সে তো বয়স্ক। কিন্তু কলেজ-পড়ুয়া, মেজমামা অসিতবরণের তো

নাক ডাকতে শোনেনি সে কোনও দিন। আর বারিদবরণের নাক ডাকার প্রশ্ন নেই। সে তো আসলে শুভ্রার থেকেও বয়সে দু-বছরের ছোট। এরকম নাক ডাকে যার, তার সঙ্গে সে সারাজীবন কাটাবে?....ছোঃ! এ বিয়ে সে মানে না। এই কেলে লোকটিকে সে পছন্দ করে না। ওর সঙ্গে তো সে সহবাস করেনি। সুতরাং সে পালিয়ে যাবে এখনই এ-বাড়ি থেকে। পালিয়ে গিয়ে দাদুর সামনে হাজির হবে প্রথমে। তারপর ঘোষণা করবে যে মেমারিতে এই চাষাভুষোর বাড়িতে, এই কুৎসিত-দর্শন, কেলে মিনসের সঙ্গে যে বিয়ে তার দেওয়া হয়েছে; সেই বিয়েকে সে অগ্রাহ্য করে, মানে না।...পালাতে হবে, পালাতে হবে....কে যেন শুভ্রার মনের ভেতর বার বার বলতে থাকে।....এই কাকভোরেই, যখন সারা বাড়ির সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন, নজরদারি করার জন্যে কেউ নেই, এমনকী গতকাল থেকে এ-বাড়িতে তার ছায়াসঙ্গী বিন্দুরও কোনও খোঁজ নেই; তখনই তাকে পালাতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে। চিরকালের জন্যে। মনে মনে শুভ্রা এই প্রথম তার ঠাকুরকে ডাকে—ঠাকুর আমাকে সাহায্য করো। এই বাড়ি থেকে যেন আমি পালিয়ে যেতে পারি। আর যেন কোনওদিন আমাকে এ বাড়িতে আসতে না হয়। এ বাড়িতে এই প্রথমবার আর অবশ্যই এই শেষবার।

কিন্তু কীভাবে পালাবে সে? কোনদিক দিয়ে কোথায় পালাবে? এই বাড়িট' বড়, এবং ছড়ানো। একের পর এক উঠোন আর দরজা। সেসব দরজা খোলা পাবে? দরজাতে ।ক এরা রাতে তালা চাবি লাগিয়ে রাখে? ....এত সব ভাবনা-চিন্তা করার কোনও সুযোগ নেই। এখনই 'ঠাকুর ঠাকুর' বলে বেরিয়ে পড়তে হবে। তারপর কপালে কী আছে দ্যাখা যাক। কিন্তু.....শুভ্রার মনে অন্য এক চিন্তা আসে। তার শরীরে অনেক অলঙ্কার। বেশ কিছু এ-বাড়ির উপহার। সেসব গয়না-গাঁটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? তাহ'লে তো এরা তাকে চোর অপবাদও দিতে পারে একদিন! ....নাহ, এরকম গাঁইয়াদের থেকে সে অপবাদ শুনতে যাবে কেন? সময় হাতে বেশি নেই। এখনই বাড়ির লোকজন জেগে উঠবে। তার আগেই পালাতে হবে তাকে। নিজের গায়ের গয়নাগুলোর দিকে চকিতে একবার তাকায় শুভ্রা। এই বিছেহার সেই বড়মামা লোকটা দিয়েছিল। এটি নিয়ে যাওয়া যায় না। সন্তর্পণে সেটি খুলে বিছানাতে রাখে শুভ্রা। আঙুলের বেশ কয়েকটি আংটি এদের। তাও, খুলে রাখে সে। মাথার টিকলি সতীশ যা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন তাকে, তাও খুলে রাখতে হয়। এটি খুলে রাখার মুহূর্তে অবশ্য হাত কাঁপে মৃদু। এ-বাড়িতে এই বয়স্ক মানুষটিকে তার আদৌ খারাপ লাগেনি। মানুষটিকে মনে হয়েছে বুঝদার, বিচক্ষণ, সহানুভূতিসম্পন্ন। তবুও এই মানুষটির সঙ্গে তো আর সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাঁর দেওয়া অলঙ্কারও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। অতএব...। একে একে শ্বশুরবাড়ির সব অলঙ্কারই শুভ্রা খুলে রাখে শরীর থেকে। মেয়েদের চোখ অলঙ্কার আর শাড়ি চিনতে কখনও ভুল করে না। সেই মানসিক টালমাটাল অবস্থাতেও শুভ্রা শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া যাবতীয় অলঙ্কার খুলে বিছানায় রাখে। এমনকী তার ডান হাতের মধ্যমায় বিয়ের ছাদনাতলায় মনীশের পরিয়ে দেওয়া হিরের আংটিটি পর্যন্ত। মনীশকে সে স্বামী-হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। সুতরাং তার পরিয়ে দেওয়া আংটিরও কোনও মূল্য নেই তার কাছে। আর বাকি গয়নাও গা থেকে খুলে নিতে হবে। এভাবে দামি গয়না-গায়ে এত ভোরে রাস্তায় বের হলে লোকজনের সন্দেহ হতে পারে। তাহলে কী করা যায়? এদিক ওদিক তাকাল শুভ্রা। ঐ তো তার সুটকেশ। যাতে আরও কিছু শাড়ি আছে, গয়নাও বোধহয় আছে দু-একটা। এছাড়া আলতা-সিঁদুর, মাথার চিরুনি (সোনা-বাঁধানো) এরকম সব টুকিটাকি জিনিসপত্রও আছে। ঐ সুটকেশ তার নিজের, একেবারে নিজের, এমনকী অপরেশকাকুরও দেওয়া নয়। মনীশের সঙ্গে তার বিয়ে হবে এটা ঠিক হয়ে যাবার পরই দাদু নিজে কাটোয়ার বাজারে গিয়ে এই সুটকেস

কিনে এনেছিলেন।

শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া যাবতীয় গয়না বিছানার একপাশে হেলায় পড়ে রইল। অন্যান্য গয়না অতি দ্রুত শুভ্রা ভরে ফেলল সুটকেশে। অতি সন্তর্পণে, প্রায় নিঃশব্দে। যাতে আচমকা কোনও শব্দে মনীশের ঘুম না ভেঙে যায়। তারপর মনে হল, পরনের বেনারসিটাও ছেড়ে অন্য কোনও সাধারণ শাড়ি পরে নেওয়া উচিত। কারণ ঝলমলে এই বেনারসি বড় বেশি চোখে পড়তে পারে লোকজনের। তারপরই শুভ্রার মনের ভেতরে কে যেন বলল—সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি কোরো না, এখনই বেরিয়ে পড়ো। ভোরের আলো ভালো ভাবে ফুটে উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়ো। তা না হলে এ বাড়ির লোকজন জেগে উঠবে। তখন এভাবে পালিয়ে যাবার উপায় থাকবে না। গাঁয়ের মানুষেরা জুতো ব্যবহার করে না তেমন। বিশেষত মেয়েরা তো একেবারেই না। সে কারণেই এ-বাড়ি থেকে কোনও জুতো উপহার পায়নি শুভ্রা। কিন্তু তার নিজের জুতো তো আছে। দাদুর কিনে দেওয়া জুতো, বকলস লাগানো জুতো। যা মেমসাহেবের পায়ে শোভা পায়। এই ঘরেরই খাটের নীচে তা পড়ে আছে। বেনারসী পরনেই থাকে। গয়না-বোঝাই স্যুটকেশ হাতে, জুতো জোড়ায় পা গলিয়ে নেবার মুহূর্তে তার, শুভ্রার মনে হয় জুতোর হিলের খট্‌খট্‌ শব্দও তো নিঃশব্দ ভোরবেলায় অনেকের ঘুম ভাঙাতে পারে। সাবধানের যেহেতু মার নেই, তাই জুতো-জোড়া এক পলকে হেঁট হয়ে পা থেকে খুলে নেয় সে। তার মানে তার দু-হাতই এখন জোড়া। কী আর করা যাবে। জুতো জোড়া তো বাইরের রাস্তায় বেরিয়েই পায়ে গলিয়ে নেওয়া যায়।.... নাহ একটিবারের জন্যেও ঘুমন্ত মনীশের দিকে তাকায় না শুভ্রা। পা টিপে টিপে ঘরের দরজা নিঃশব্দে খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে একতলাতে। দরজা তো খোলাই। বন্ধ নয়। তাহ'লে আর অসুবিধে কী? একতলার ঢাকা দালান পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে শুভ্রা উঠোনে নামে। উঠোন পেরিয়ে যে দরজা তাও তো খোলা! সেই খোলা দরজা দিয়ে সে বাড়ির বাইরে আসে। কাঁচা মাটির পথ। দু-ধারে ঝোপ-ঝাড়। পাখ পাখালির কলরব। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপট থেকে থেকে। আকাশে জড়ো হয়েছে আরও কালো মেঘ। নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। কিন্তু বৃষ্টি নামার আগেই তো তাকে যেভাবে হোক স্টেশনে পৌঁছতে হবে। স্টেশন কোনদিকে? কিছুই জানে না। তবুও যেতে হবে। আর ফেরার উপায় নেই। পায়ে জুতো গলিয়ে নিয়েছে শুভ্রা। ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছে। বৃষ্টি আগেও হয়েছে। গতকালের আগের দিন দুপুরে যখন শুভ্রা গাড়িতে কাটোয়া থেকে মেমারি এসে পৌঁছেছিল তখনও বৃষ্টি হয়েছিল। রাস্তায় কাদা ছিল। গাড়ি থেকে নেমে সেই কাদা মাড়িয়ে শুভ্রাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে হয়েছিল। তারপর আর তেমন বৃষ্টি হয়নি। কাদা শুকিয়ে আছে। সেই আবুড়া-খাবুড়া রাস্তা দিয়ে হাই-হিল জুতো পায়ে, হাতে সুটকেশ নিয়ে হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। তবু হাঁটতে তাকে হবেই। এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে দূরে—যত দূর পারা যায়।

ছাপান্ন

কাকভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে পুকুরে স্নান করে নেওয়া অভ্যাস মনোরমার। তারপর গরদের শাড়ি পরে তিনি তাঁর শিবঠাকুরের মাথায় জল দেন। এর পরের কাজই হ'ল, চিৎকার-চেঁচামেচি করে বাড়ির সকলের ঘুম ভাঙানো। আজকেও বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সব দরজা হাট করে খুলে রেখে পুকুরের ঠান্ডা জলে অবগাহন করছিলেন মনোরমা। তিনি জানতেও পারলেন না তাঁর সংসারে, বিশেষত মনীশের জীবনে কী বিপর্যয় ঘটে গেল। পালঙ্কের নরম বিছানায় শুয়ে

সতীশ তখনও নাসিকাগর্জন করে যাচ্ছেন। গতকাল উৎসবের বাড়িতে খাটাখাটুনি তো একটু হয়েছে। তাই আরও গভীর ঘুমে রাতটা কেটেছে। ভোরেও ঘুম ভাঙছে না। ভাঙেও না কোনওদিন, যতক্ষণ না স্ত্রী এসে ডাকাডাকি করেন। আর মনীশ? তারও ঘুম ভাঙেনি। সে ঘুমিয়েই যাচ্ছে। একটু পরেই ঘুম ভেঙে যাবে মনীশের। আর আবিষ্কার করে দুঃখ পাবে যে, সে স্ত্রী-পরিত্যক্ত।

আকাশ ক্রমশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে আসছে। বাতাস বইছিল শনশন। এখন তাও থেমে গেছে। এখনই কি বৃষ্টি শুরু হবে? কিন্তু বৃষ্টি শুরু হবার আগেই শুভ্রাকে একটা কোনও গাড়িতে উঠে পড়তে হবে। স্টেশনে তাকে যেভাবে হোক পৌঁছতেই হবে। কিন্তু মাটির রাস্তা পেরিয়ে এখন হাইওয়েতে উঠে পড়লেও শুভ্রা বুঝে উঠতে পারল না সে কীভাবে স্টেশনে পৌঁছবে। তাহ'লে কি হেঁটে যাবে? কতক্ষণ হাঁটবে? কোনদিকেই বা হাঁটবে? আচ্ছা, কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? কাকে জিজ্ঞেস করবে? এত ভোরে রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। দূরে মাঠের দিকে তাকালে দু-একজনকে চোখে পড়ছে অবশ্য, তবে তারা বোধহয় চাষ-আবাদের কাজে ব্যস্ত আছে। তাদের কেউ কেউ কৌতূহলি চোখে শুভ্রার দিকে তাকালেও বুঝছে না কিছু। হয়তো অবাক হচ্ছে এটা ভেবে যে, এত ভোরে একজন মেয়েমানুষ, রীতিমতো সাজগোজ করে, স্যুটকেস হাতে একা একা কোথায় চলেছে? কোনও মেয়ে বা মহিলাকে সুটকেস হাতে একা রাস্তায় হাঁটতে তারা কোনওদিনই হয়তো দ্যাখেনি। তাই অবাক হচ্ছে বটে। কিন্তু কাছে এসে মেয়েটিকে প্রশ্ন করার সাহস এদের কারোরই নেই। হয়তো অনেক পেছনে কর্তাটি আছে। কে বলতে পারে? সুতরাং মনের কৌতূহল মনে চেপে রেখে তারা নিজেদের কাজে মন দিতে চেয়েছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে তারা প্রকৃতই খুশি। জুন মাস শেষ হতে চলল তবুও তেমনভাবে বর্ষার দেখা নেই। বর্ষা আসতে বিলম্ব হলেই বাংলার কৃষকেরা চিন্তায় পড়ে। কেননা বর্ষার করুণার ওপরই তো নির্ভরশীল তাদের জীবন।

দুরু দুরু বুকে শুভ্রা হাঁটছিল পাকা সড়ক ধরে। ইতিমধ্যে বালি-বোঝাই দুটো দৈত্যাকৃতি লরি সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে গেছে পাশ দিয়ে। কিন্তু কোনও বাসের দেখা নেই। শুভ্রা হাঁটছে যত দ্রুত পারা যায়। এখনই যদি বৃষ্টি এসে যায় তাহ'লে ডাহা ভিজতে হবে। পরনের বেনারসি ভিজে একসা হয়ে যাবে। বৃষ্টিতে সেভাবে কোনওদিন ভেজা হয়নি শুভ্রার। যদিও বৃষ্টির দিনে রাস্তাঘাটে কিংবা মাঠে সে মনের আনন্দে ভিজতে দেখেছে অনেক ছেলেমেয়েকে। তার মামাবাড়িতে আছে একটা বিরাট আলিসা-ঘেরা ছাদ। বর্ষাকালে বৃষ্টির দিনে তার কতবার সাধ হয়েছে ঐ ছাদে দাঁড়িয়ে সে ভিজবে। কিন্তু কোনওবারই তা সম্ভব হয়নি। বাদ সেধেছে দাদু কিংবা দিদা কিংবা ক্ষীরোদমামা। আজ যদি হঠাৎই ঝেঁপে বৃষ্টি আসে তাহলে তাকে ভিজতে হবে ঠিক। কিন্তু এখন তার বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে একেবারেই নেই। তার এখন সত্যিই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এভাবে ওদের বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে হঠকারিতার কাজ হল না তো? এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা জেনে গেছে যে, বাড়ির বউ নিরুদ্দেশ। সেই কেলে মিনসের ঘুম কি এখনও ভাঙেনি? এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভেঙেছে। আর ঘুম ভাঙার পর যখন সে দেখবে বউ-এর পাত্তা নেই, তখন নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তারপর যখন দেখবে যে, বউ-এর খোঁজ নেই, তখন নিশ্চয়ই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। আর তখন যদি গাড়িতে ওরা বেরিয়ে পড়ে বৌ-এর খোঁজে; তাহ'লে আর ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই শুভ্রার। সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে ওদের হাতে। তার থেকে লজ্জার আর কিছু নেই। সেটা ক্ষণিকের জন্যে ভেবেই শুভ্রার বুক কেঁপে উঠল। এতটা চলে এসে যদি ওদের হাতে ধরা পড়ে যেতে হয় তাহ'লে তার চেয়ে আপসোস আর লজ্জার কী আছে? কিন্তু তবুও তো হেঁটে যেতে হবে। চেষ্টা করতে হবে স্টেশনে পৌঁছবার।

দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল যেন! তার মানে বৃষ্টি এলো বলে! হায় ভগবান! এবার বোধহয় বৃষ্টিতে সত্যিই ভিজতে হবে। আশেপাশে কোনও দাঁড়াবার আড়াল নেই। বাড়িঘর নেই। শুধু নিস্পৃহ পিচ-রাস্তা যতদূর চোখ যায় শুয়ে আছে। কী উপায় হবে? তাহ'লে কি তার পালিয়ে যাওয়া হবে না? ধরা পড়ে যেতে হবে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে? তারপর ওরা তার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবে? বউ-কে কি ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখবে ওরা?....ইস কী লজ্জা! তখন তাকে সবাই ছি ছি করবে! দাদুর কানে খবরটা পৌঁছলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হবে?

টিপটিপ বৃষ্টি সত্যিই শুরু হয়েছে। মাথা ভিজছে শুভ্রার। শাড়ি ভিজছে। এখন সে কী করবে? কী করার আছে হেঁটে যাওয়া ছাড়া? হঠাৎ শুভ্রা শুনল একটা গাড়ির আওয়াজ। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। দেখল পেছন দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি আসছে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঐ গাড়িতে তাকে খুঁজতে বেরোয়নি তো? ভাবতেই বুক কেঁপে উঠল শুভ্রার। তবুও যা থাকে কপালে, এরকম মরিয়া ভঙ্গিতে সে বাঁ-হাত প্রাণপণে নাড়ছিল। গাড়িটা থামবে না এটা যেন মনে-মনে ভেবেই নিয়েছিল সে। কিন্তু ঘ্যাঁ-শ-স্-স্ শব্দে ব্রেক কষল গাড়িটা। থেমে গেল। শুভ্রা দেখল সামনের জানলা দিয়ে মুখ বের করে একজন তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। শুভ্রা দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়িটার দিকে। নাহ.... যে তাকে ডাকছে সে একজন মাঝবয়সী পুরুষ। থলথলে, গোলপানা মুখ, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। নাকের নীচে বুরুশ-গোঁফ। লোকটি শুভ্রাকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবে মা? কোন্‌দিকে?

—স্টেশনে যাব। আমাকে একটু তুলে নিন দয়া করে...।

—তুমি কোন্ বাড়ির বউ মা? কোথায় যাবে? —লোকটি প্রশ্ন করে।

—সব আপনাকে জানাব।....আমার বড় বিপদ! আপনি দয়া করে আমাকে গাড়িতে তুলে নিন....শুভ্রা কাতরভাবে অনুরোধ করে। গাড়ির পেছনের আসনে এক বয়স্ক মহিলা এবং এক বাচ্চা মেয়ে বসে আছে শুভ্রার চোখে পড়ে। সে এবার মহিলার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে—আমাকে একটু গাড়িতে তুলে নিন মা....আমি স্টেশনে যাব। আমাকে দয়া করে স্টেশনে নামিয়ে দেবেন? বধূর সাজে সুন্দরী শুভ্রার সেই সকাতর আবেদনে কী যে ছিল! মহিলার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে আসে, যদিও তিনি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে চালকের পাশে বসে থাকা বয়স্ক লোকটিকে বলেন—কে কেন এসব কতা পরে হতে পারে না বুঝি?....এখন তুলে নাও তো ওকে! আহা গো সোনার বন্ন! নিচ্চয়ই বিপদে পড়েচে! তুলে নাও বলচি! হাঁ করে ওকে অতো দ্যাকার কী আচে!

মহিলার পক্ষ থেকে এটা তো অনুরোধ নয়, আদেশ। বোঝা যায়, দৈনন্দিন জীবনে ঐ বয়স্ক পুরুষ সম্ভবত এই মহিলার দ্বারাই চালিত হন। তিনি তাড়াতাড়ি চালককে নিচু স্বরে নির্দেশ দেন। সিড়িঙ্গে লম্বা লোকটি (চালক) তাড়াতাড়ি নিজের আসন থেকে নেমে এসে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ধরে।

—এসো বাছা এসো—মহিলা শুভ্রাকে ডাকেন। শুভ্রা যেন পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পায়। সুটকেস-হাতে দ্রুত উঠে পড়ে গাড়িতে।

—এসো বাছা বসো—ও পুঁটি একটু সরে বোস লো— ওকে বসতে দে....। সেই বাচ্চা মেয়েটির নাম পুঁটি। গায়ের রং কালো বটে তবে চোখদুটি ডাগর। বয়স দশ-এগারো হবে। মাথার দুপাশে দুটো বিনুনি। চোখে কাজল। পরনে ফুলছাপ ফ্রক। সেও বেশ অবাক হয়ে দেখছিল শুভ্রাকে। একটু সরে যায় মহিলার দিকে। শুভ্রা বসে জড়োসড়ো হয়ে। হাতের সুটকেশ কোলের ওপর রাখে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আর শুভ্রা গাড়িতে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হয়ে

গেছে। যেন এতক্ষণ শুভ্রাকে ভেজাবে না বলে অপেক্ষায় ছিল। বেশ তোড়ে বৃষ্টি পড়ছে। বাইরেটা ঝাপসা। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আছে। গাড়ির চালে অবিরাম বৃষ্টি পতনের শব্দ ছাপিয়ে শুভ্রার কানে এল সেই বয়স্ক লোকটির ভারী গলা—তুমি ইস্টিশানে যেতে চাও ভাল--আমরাও তো তাই যাচ্চি। সেখানে তোমাকে নামিয়ে দেবখন। কিন্তু....উনি থামলেন। যেন কিছু ভেঁবে নিলেন। শুভ্রা এতক্ষণে অনুমান করে নিতে পেরেছে যে, এরা দুজনে সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী। আর পুঁটি নামের এই কচি মেয়েটা এদের কে হতে পারে?.... মেয়ে? ....এত বয়স্ক মানুষদের এত কমবয়সী মেয়ে কি হবে? তাহ'লে কি নাতনি?... কর্তা যেখানে থেমেছিলেন, গিন্নি ঠিক সেখান থেকেই কথাটা তুলে নিলেন—হ্যাঁ বাছা এবার বলো তো? তোমার বাড়ি কোথায়? মনে হচ্চে তো সদ্য বিয়ে হয়েচে! শ্বশুরবাড়ি কোতায়? এত ভোরে একা একা ইস্টিশনের দিকে যেতেচ.....কীরকম সন্দেহ লাগচে.....শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে যেতেচ নাকি? ....শুভ্রা আঁতকে উঠে বলে—নাহ পালিয়ে যাব কেন?....আসলে....আসলে আমার বাবা খুব অসুস্থ....গতকাল বিকেলেই টেলিগ্রাম এসেছিল ....আমার বাপের বাড়ি কলকাতায়. ...তাই বাবাকে দেখতে যাচ্ছি।.... কথাগুলো, সেই মিথ্যে কথাগুলো যে কীভাবে, সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসছিল শুভ্রার মুখ দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে সে নিজেই রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মিথ্যে কথা বলা তো তার কোনওদিনই তেমন অভ্যাস নেই। কিন্তু তার কথাগুলো কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল ওদের কাছে? কেননা বয়স্ক ব্যক্তি ঘাড় ঈষৎ নাড়তে নাড়তে বললেন—বাবার অসুখের খবর পেয়ে কলকাতায় যাবে....তা একা কেন যাবে? তোমার স্বামী যাবেন না? ওঁরা একা একা তোমাকে এত ভোরে বাড়ি থেকে বেরোতে দিলেন? এরকম তো হবার কতা নয়। কী জানি বাপু....কীরকম যেন মনে হচ্চে...।

—ওমা-নাহ-আমি মিথ্যে কথা বলব কেন?.....শুভ্রা কীরকম সহজভাবে বলে যেতে থাকে; —আসলে আমার স্বামীও কলকাতায় চাকরি করেন। আর ওর বাবা—মানে শ্বশুরমশাই বাতের ব্যথায় বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না। বাড়িতে আর কোনও বয়স্ক মানুষ নেই। শুধু শাশুড়ি-মা। উনি এভাবে আমাকে একা ছাড়তে চাননি। খুবই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাবার অসুখের খবর পেয়ে চুপ করে থাকা যায়—বলুন? তার ওপর আমি আমার একমাত্র মেয়ে। টেলিগ্রামটা পেয়ে কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। আজ ভোর হতেই শাশুড়িমায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি,—যেভাবে হোক স্টেশনে যাব, সেখান থেকে ট্রেন ধরে হাওড়া স্টেশনে। ভগবানকে ডাকলে ভগবান ঠিক দেখেন। স্টেশনের রাস্তাঘাট চিনি না। আন্দাজে হাঁটছিলাম। আপনাদের দেখা পেয়ে গেলাম। আপনারাও সেই স্টেশানে যাচ্ছেন। দয়া করে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। এসবই ভগবানের দয়া...।

আশ্চর্য! কী নিখুঁত অভিনয়! কী সহজভাবে, এতটুকু হোঁচট না খেয়ে, একের পর এক মিথ্যে বলে যাওয়া! শুভ্রা নিজেকে যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। নাকি তার এতদিনকার সাহিত্যপাঠ কাজে লেগে গেল? তার পড়া অজস্র গল্প-উপন্যাসের কোনও চরিত্রের ভাষাতেই কি সে এভাবে বানিয়ে কথা বলতে পারছে? কর্তা এখন চুপ করে গেছেন। সম্ভবত নিজের মনে শুভ্রার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে চাইছেন। কিন্তু গিন্নি বোধহয় বিশ্বাস করছেন শুভ্রার কথা। তিনি গলায় সমবেদনার সুর ফুটিয়ে বললেন—আহা গো তাইতো! এক মেয়ে বাবার অসুখের কতা শুনলে কি বাড়িতে বসে থাকতে পারে? তো হ্যাঁগা কাদের বাড়ির বউ বাছা তুমি? তোমার শ্বশুরমশাইয়ের নাম কী?

—শ্বশুরমশাইয়ের নাম.....? শুভ্রার ঘাম হতে থাকে।

—শ্বশুরের নাম ও তো নাও জানতে পারে! তোমার স্বামীর নাম কী? —এ প্রশ্ন কর্তার।

—দুর বাবু! তুমি না একটা কী যেন!....স্বামীর নাম মেয়েরা মুখে আনতে পারে বুঝি?—গিন্নি খেঁকিয়ে ওঠেন। কর্তা চুপসে যান। আর শুভ্রা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—হ্যাঁগা মা তোমার কদ্দিন বিয়ে হয়েচে? দেকে তো মনে হচ্চে একেবারে নতুন বউ? —গিন্নির প্রশ্ন।

—বেশিদিন নয়। এই কয়েকদিন...।

—বিয়ে করেই ছেলে কলকেতার আপিসে কাজ করতে গেল? কদিন তো ছুটি নিলে পারত?

—কী করবে বলুন? ওর তো সাহেবদের আপিসে চাকরি। সাহেবরা একেবারে ছুটি দিতে চায় না যে...।

—কলকাতা কোন্ আপিস?—সামনে থেকে কর্তার প্রশ্ন ভেসে আসে।

—ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি.....পার্ক স্ট্রিটে শুনেছি। —কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলে নিজেই অবাক হয়ে যায় শুভ্রা। আশ্চর্য! দাদুর অফিসের নামটা ঠিক সময়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো তো!

—ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি..... সে তো সাইকেল কোম্পানি....কর্তা বিড়বিড় করতে থাকেন। আর এই সুযোগে বুদ্ধিমতী শুভ্রা কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সে গিন্নির দিকে তাকিয়ে বলে—আপনারাও কি কলকাতা যাবেন?

—নাহ মা।....আমরা এই মেমারি ইস্টিশান পর্যন্ত যাব। আমাদের ছেলে আর বউমা বাড়িতে আসচে। ছেলে ভাগলপুরে চাকরি করে। ছুটিতে আসতেচে। আমরা থাকি দুর্গাপুরে। ছেলে আর বউমাকে মেমারি ইস্টিশান থেকে দুর্গাপুরে নিয়ে যাব তো তাই যেতেচি।...আর এই পুঁচকিটা কে জানো? —আদরে খুকির গাল টিপে দেন গিন্নি।

শুভ্রা কিছু বলে না। গিন্নির মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে।

—এর নাম হ'ল পুঁটি। আমাদের নাতনি। বড় লক্ষ্মী মেয়ে! ভাগলপুরে সব হিন্দি ইস্কুল। তাই ওকে ওর বাবা-মা আমাদেব কাছে রেখে গেচে। ও দুর্গাপুরে একটা ইস্কুলে কেলাস থিরিতে পড়ে.....।

—ওহ বাহ! —শুভ্রা অস্ফুটে বলে। তার ভীষণ ক্লান্তি লাগছিল। বৃষ্টি যেমন দুরন্ত ঘোড়সওয়ারের মতো অতর্কিতে এসেছিল, আবার কখন যেন থেমে গেছে। মেমারি স্টেশান আর কতদূর? বর্ষার রাস্তা তাই বোধহয় গাড়ি সাবধানে ছুটছে। শুভ্রা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। আর কত দূরে স্টেশন? হে ভগবান আর কতদূর? পাশে গিন্নি বকবক করেই চলেছে। নাতনির গুণপনার কথা বলছিল। ছেলের কথা বলছিল। বউমার কথা বলছিল। শুভ্রার কানে কিছু ঢুকছিল। কিছু ঢুকছিল না। তারপর কখন যেন চলন্ত গাড়ির দুলুনিতে শুভ্রার দুই চোখ বুজে এল। একসময় তার ঘুম ভেঙে গেল কানের কাছে চিৎকারে। কর্তা বাজখাঁই গলায় বলছিলেন—ওগো মা ইস্টিশান এসে গেচে! এবার নামতে হবে....। শুভ্রা ধড়মড় করে উঠে বসল। গাড়ির দরজা চালক খুলে ধরেছিল। স্যুটকেশ হাতে নিয়ে সে নেমে পড়ল। দেখল গিন্নিও নেমেছেন। পুঁটিও নেমেছে। চোখ কচলে নিয়ে শুভ্রা দেখল, হ্যাঁ স্টেশনই বটে। ধূসর ওভারব্রিজ, এত ভোরে প্রায় খাঁ খাঁ করছে প্লাটফর্ম চত্বর। এই প্লাটফর্মেও একটা ডালপালা মেলে দেয়া একটা গাছ চোখে পড়ল শুভ্রার। সেই গাছের নীচে কুন্ডুলী পাকিয়ে কুকুর শুয়ে আছে। সব স্টেশনেই বোধহয় এরকম গাছ আর গাছের নীচে কুকুর থাকে। সামনেই একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কি হাওড়া যাবে? কর্তাকে কিছু বলতে হল না। তিনি নিজেই স্টেশন -চত্বরে জমে থাকা জল-কাদার আওতা

থেকে নিজের ধুতির কোঁচা সামলে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেলেন অদূরে অনিশ্চতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা টিকিট চেকারের দিকে। কীসব কথাবার্তা বললেন। তারপর হনহনিয়ে ফিরে এসে শুভ্রাকে জানালেন—এটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। হাওড়া যাবে। উঠে পড়ো মা!

তারপর একটু ভেবে বললেন—ওহ তোমার তো টিকিট কাটতে হবে! ...পয়সা আচে?...শুভ্রার বুকটা ধক্ করে উঠল। পয়সাকড়ি তার সঙ্গে কিছুই নেই। ...উপায়? কর্তা শুভ্রার মুখের দিকে তাকিয়েই যা বোঝার বুঝেছেন। সাঁ করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এলেন। টিকিট শুভ্রার হাতে গুঁজে দিয়ে কর্তা বললেন—উঠে পড়ো মা....সিগন্যাল ডাউন হয়েচে... ট্রেন ছাড়বে.. ।

শুভ্রার চোখে জল এসে গেল। এত দয়াও মানুষের মনে অপরের জন্যে থাকে? সে ঢিপ্ করে প্রণাম করল গিন্নিকে আর কর্তাকে। অস্ফুটে বলল—আপনাদের ঋণ আমি কোনওদিনই কি শোধ করতে পারব? গিন্নি বললেন—সাবধানে যেও মা...। কর্তা আবার তাড়া দিলেন—এসো এসো—ঐ সামনের কামরাতে উঠে পড় মা...।

শুভ্রা কামরায় উঠে পড়াব সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন হুইসিল দিল। তারপর চলতে শুরু করল।

সাতান্ন

ট্রেন লেট করেছিল কম করে হ'লেও সাত-আট ঘন্টা। হাওড়াতে যখন পৌঁছল ট্রেনটা তখন বেলা নটা। বিশ্বদেব তল্পিতল্পাসহ স্ত্রী আব ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্লাটফর্মে নামল। তার মুখে বিরক্তি। চোখদুটো লালচে হয়ে আছে। কারণ রাতে ট্রেনে একেবারেই ঘুম হয়নি। এরকম সাধারণত হয় না বিশ্বদেবের। যেসব ভাগ্যবান মানুষ যে কোনও সময় বিছানায় শুলেই নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে; বিশ্বদেব অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন। ঝালদা থেকে সে প্রায়ই রাঁচি কিংবা পাটনা যায় অ্যারাতুন সাহেবের নির্দেশে। বেশির ভাগ সময়েই ট্রেনে যায়, মাঝে মাঝে গাড়িতে। যাতায়াতের রাস্তা বিশ্বদেব দিব্যি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। মোটরগাড়িতে গেলে তার ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারের বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়েও বিশ্বদেবের অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসেনি। পাশাপাশি বাঙ্কে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল। একসময় ট্রেনের কামরার আলো প্রায় সবই নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। চারপাশে ঘুমন্ত যাত্রীদের নাক ডাকার বিরক্তিকর আওয়াজ। বিশ্বদেবের এসব শুনতে পাওয়ার কথা নয়। ট্রেনে ওঠার পর, বিশেষত রাতের জার্নিতে, সে বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার নাসিকা গর্জন শুরু হয়। কিন্তু এই জার্নিতে সেরকম হ'ল না। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরই বিশ্বদেব বুঝেছিল যে তার মনে নানা দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ভীষণ অস্থির হয়ে আছে তার মন। একবার মনে হয়েছিল যে শরীর বোধহয় গরম হয়ে গেছে। ট্রেনে নৈশভোজনটাও তো মন্দ হয়নি। স্ত্রী সুনীতি একজন পাকা গৃহিণী। ঝালদা থেকে মোটরে পুরুলিয়ায় এসে তাদের ট্রেন ধরতে হয়েছিল। ট্রেন ছাড়ার টাইম ছিল সন্ধে সাতটা কুড়ি মিনিট। সুতরাং রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে নিতে হয়েছিল। সুনীতি সেসব ব্যাপারে খুবই বিচক্ষণ এবং দক্ষ। সে দুটো ঢাউস টিফিন-ক্যারিয়ারে প্রচুর লুচি, তরকারি এবং মিষ্টি নিয়েছিল। তার ওপর আবার অ্যারাতুন সাহেবের বাংলো থেকে চাপরাশী এসে দিয়ে গিয়েছিল অনেকটা পুডিং। এটা সাহেব এবং মেমসাহেবের ভদ্রতা। ছেলেমেয়ে নিয়ে 'বাবু' বিশ্বদেব অনেকটা রাস্তা যাবে। তাদের কিছু খাদ্যবস্তু দিয়ে দেওয়াই তো উচিত। বিশ্বদেব যেমন অফিসের কাজকে ভালোবাসে, তেমনই সে একজন রীতিমতো খাদ্যরসিক। ট্রেনে খাওয়াদাওয়াটা ভালোই হ'ল। অন্তত গোটা পনেরো লুচি সাঁটিয়ে দিল একা

বিশ্বদেবই। তার সঙ্গে তরকারি এবং মিষ্টি তো ছিলই। সাহেবের পাঠানো পুডিংটাও অনেকটা খেয়েছিল বিশ্বদেব। ছেলেমেয়েরাও মহা আনন্দে পুডিং উপভোগ করেছে। শুধু সুনীতি পুডিং স্পর্শ করেনি। সাহেবের বাংলো থেকে পাঠানো খাবার-দাবার সুনীতি স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের যথারীতি ভাগ করে দেয়। কিন্তু নিজে সেসব খাবারের কিছুই দাঁতে কাটে না। সুনীতির নাকি ঘেন্না করে। সাহেবরা গরুর মাংস খায়। শুয়োরের মাংসও খায় বলে সে শুনেছে। তার ধারণা সাহেবদের যে কোনও ধরনের খাদ্যবস্তুতেই গরু কিংবা শুয়োরের মাংসের ছোঁয়া লেগে থাকে। বিশ্বদেব কিংবা ছেলেমেয়েদের ঐসব 'অ-খাদ্য, কু-খাদ্য' খেতে সে বাধা দেয় না কখনও। সুনীতির স্বভাবই হ'ল কোনও ব্যাপারেই কারোর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে না যাওয়া। সবকিছু মেনে নেওয়া। অন্য অনেক গিন্নীদের মতন কোমর বেঁধে ঝগড়া সে করতে পারে না।

একপেট খেয়ে ঢক ঢক করে ফ্লাস্ক থেকে বেশ কিছুটা জল খেয়ে নেবার পর বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিশ্বদেব। ভেবেছিল ট্রেনের দুলুনিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে যাবে। কিন্তু ঘুম তো এলই না, উপরন্তু পেটটা কীরকম আইঢাই করছিল। পরপর কয়েকটা বাতকম্ম হ'ল। বিশ্বদেবের মনে হ'ল, বোধহয় বাথরুমে যেতে হবে। ট্রেনে বাথরুমে যাওয়া মহা ঝক্কির ব্যাপার। সঙ্কীর্ণ জায়গায় বাথরুম করা যেমন কঠিন, তেমনই জল পাওয়ার সমস্যা। বিশ্বদেব বাঁ-পাশ ফিরে শুয়ে পেটের অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে নিতে চাইল। খানিকটা স্বস্তিও পেল। কিছুক্ষণ বাদে একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতেই বুঝল, অস্বস্তিটা আসলে ঠিক শরীরের নয়,—মনের। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়ে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকার পরও ঘুম আসছিল না যে তার কারণ হ'ল, বারবার তার বড়মেয়ে শুভ্রার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। প্রথম সন্তান হিসেবে বিশ্বদেব শুভ্রাকেই বরাবর বেশি ভালোবাসে, অন্য সন্তানদের থেকে বেশি পছন্দ করে। তার পাঁচ সন্তানের মধ্যে শুভ্রাকেই দেখতে সবথেকে ভালো। বড়মেয়ের মতো গায়ের রং অন্য ছেলেমেয়েরা কেউ পায়নি। তার মতন মুখশ্রীও অন্য দুই মেয়ে পায়নি। সেই শুভ্রার বিয়ে-থাওয়া নিয়ে বিশ্বদেবের মনে যে অস্পষ্ট কোনও স্বপ্ন ছিল না এমন নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, মাত্র ষোলো বছরের মধ্যে তার বিয়ে হবে এটা বিশ্বদেব কোনওদিন ভাবেনি। আসলে সে নিজের কাছেই কয়েক বছর সময় চেয়ে নিয়েছিল। বিশ্বদেব জানে সে ঝালদাতে আর বেশি দিন চাকরি করবে না। শুভ্রা নয় মামাবাড়িতে থেকে মানুষ হচ্ছে। দাদুর পাল্লায় পড়ে বেশ কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছে। শুভ্রার বয়সী কজন বাঙালি মেয়ে দু-পাতা ইংরেজি পড়তে পারে? পড়তে যে পারে সেটা বিশ্বদেব নিজেও পরীক্ষা করে দেখেছে। হাওড়ার বাড়িতে সে একদিন মেয়েকে দেখেছিল চার্লস ডিকেনসের ডেভিড কপারফিল্ড পড়তে। মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল বিশ্বদেব। সেইসঙ্গে শ্বশুর নীরদবরণের প্রতিও যেন তার ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। এটা তো ঠিক যে, নীরদবরণের জন্যেই শুভ্রার অতটা উন্নতি। নীরদবরণের অনেক গুণ আছে। আবার দোষও কম নয়। বিশ্বদেবের মতে তাঁর চরিত্রের সবথেকে বড় দোষ হল তাঁর অহমিকা। অন্যের মতামতকে নীরদবরণ কোনওকালেই গুরুত্ব দিতে চান না। অন্যদেরও সে ভাবনাচিন্তা করবার ক্ষমতা থাকতে পারে এটাই বোধহয় তাঁর মনে আসে না। সাংসারিক যে কোনও বিষয়ে তিনিই শেষ কথা বলবেন এটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বদেবেরও শিক্ষা-দীক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব আছে। সে কারণেই শ্বশুরের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এবং ক্রমশ সেই সংঘাত নিঃশব্দে, অন্যদের অজান্তে এবং অলক্ষে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও তেমন নেই। যেন উভয় উভয়কে এড়িয়েই চলেন।

ঝালদার চাকরি ছেড়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বিশ্বদেব যে কলকাতায় চলে আসবে এটা সে অনেকদিন ধরেই ভাবছে। অন্য ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের এবার স্কুলে ভর্তি করার কথা

ভাবতে হবে। ঝালদাতে ভালো স্কুল নেই। থাকলেও সেখানে হিন্দিতে পড়াশোনা হয়। বাংলাভাষার কোনও পাঠ নেই। তাই ঝালদাতে আর বেশিদিন থাকলে অন্য ছেলেমেয়েরা মুখ্যুই থেকে যাবে। অ্যারাতুন সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও রেখেছে বিশ্বদেব। সাহেব তাকে বলেছেন যে, কলকাতার ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে আরমেনিয়ান কলেজে কিছুদিনের মধ্যে কেরানির একটা পদ খালি হতে পারে। কলেজেও একটি অফিস আছে। সেই অফিসে নানা কাজকর্মও থাকে। সেখানে বড়বাবুর পদটি একজন বাঙালি অধিকার করে আছে। তবে তার বয়স হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে অবসর নিতে পারে। তখন সাহেবের অনুরোধে কলেজ-কর্তৃপক্ষ বিশ্বদেবকে ঐ পদে রাখতে পারে। বিশ্বদেব ভেবেছিল অ্যারাতুন সাহেবের মধ্যস্থতায় চাকরিটা সে ঠিকই পাবে। তারপর স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে চলে আসবে কলকাতায়। নাহ, শ্বশুরের কাছে সে উঠবে না। একটা বাসা খুঁজে নেবে। কলকাতার কোথাও হলে ভাল। তা না হ'লে হাওড়াতে। স্কুলে ভর্তি করবে ছেলেমেয়েদের। শুভ্রার বিয়ের চেষ্টা করবে। কিন্তু নীরদবরণ এটা কী করলেন? বলা নেই, কওয়া নেই, বিশ্বদেব যে শুভ্রার বাপ, তার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার মনে করলেন না; নিজেই ঝপ্ করে বিয়ে দিয়ে দিলেন নাতনির? এ তো অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করতে মন চায়নি। টেলিগ্রামটা বারবার পড়েছিল বিশ্বদেব। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সবাইকে নিয়ে হাওড়াতে শ্বশুরবাড়ি যাবার।

চলন্ত ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে শুভ্রার বিয়ের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই রাত প্রায় কেটে গেল। কেমন হল মেয়েটার বিয়ে? জামাই কেমন? তার শিক্ষা দীক্ষা আছে? দেখতে শুনতে কেমন? তার পরিবারে কে কে আছে? শুভ্রার শ্বশুরবাড়িই বা কদ্দূর? নগদ টাকাপয়সা কত নিল পাত্রপক্ষ? এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে একসময় ভোর হয়ে গেল। ট্রেন ঢুকল স্টেশনে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে সবাইকে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসল বিশ্বদেব।....

বড়রাস্তা থেকে কিছুটা গলির মধ্যে ঢুকতে হয়। ঠিক গলি এটাকে বলা যায় না। পরপর দুটো মোটরগাড়ি চলে যেতে পারবে এমন চওড়া। সেই রাস্তার কিছুটা ভেতরে ঢুকলে বিশ্বদেবের শ্বশুরবাড়ি। ঘোড়ার গাড়ি সচরাচর এই রাস্তায় ঢোকে না। গাড়িও যে তেমন ঢোকে এখানে এমনও নয়। রবিবার বাদে প্রতিদিন এই চওড়া গলিতে অবশ্য একটা মোটরগাড়ি ঢুকবেই। সেটা হ'ল, নীরদবরণের অফিস-গাড়ি। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে কালো-রং সেই অস্টিন-গাড়ি রিপোর্ট করে নীরদবরণের বাড়ির দরজার সামনে। ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় নটা বেজে পাঁচ মিনিটে নীরদবরণ গাড়িতে ওঠেন। তাঁর পরনে থাকে স্যুট, টাই, মুখে পাইপ। গাড়ি তাঁকে নিয়ে অফিসের দিকে বেরিয়ে যায়। সোম থেকে শনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অবশ্য শরীর খারাপ হ'লে আলাদা। কিন্তু এটা বলা যায় যে, নীরদবরণের শরীর খারাপও খুব কম হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি অফিস থেকে রাতে বাড়ি ফেরেন না। বাইরে রাত কাটান। পার্ক স্ট্রিটের এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তরুণীর কাছে চলে যান নীরদবরণ। তার নাম শেলী। এই শেলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তা অন্তত বছর পাঁচ তো হবেই। শেলিকে সাধারণ মানুষ নীরদবরণের রক্ষিতা ছাড়া আর কী বলবে? কিন্তু নীরদবরণ নিজে অবশ্য সেরকম মনে করেন না। শেলী তাঁর প্রিয় বান্ধবী। শয্যাসঙ্গিনী। তার কাছে নীরদবরণ নিজের মনের কথা, দুঃখের কথা খুলে বলতে পারেন। শেলীর রূপ আছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। যদিও সে নিজের যৌবনকে নিখুঁতভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। সোনা-গলানো গায়ের রং শেলীর। খর্বকায় নীরদবরণের থেকে বেশ লম্বা। একমাথা সোনালি-চুল, ঘাড় পর্যন্ত ঢেউখেলানো। সব থেকে

বড় কথা হ'ল শেলী নিজেও সাহিত্যের অনুরাগিনী। ইংরেজি সাহিত্য তার যেন গুলে খাওয়া। সে নিজেও কবিতা লেখে ইংরেজিতে। তবে সে কবিতা কোথাও ছাপা হয় না। ডায়েরির পাতাতেই বন্দি থাকে। একমাত্র নীরদবরণই সেইসব কবিতার পাঠক কিংবা শ্রোতা। শেলীর সঙ্গে এই অবৈধ জীবনের সপক্ষে নীরদবরণের নিজস্ব এক ব্যাখ্যা আছে। গেরস্থ জীবন তিনি যাপন করেন যূথিকার সঙ্গে। যেমন সব মানুষের স্ত্রী থাকে, দাম্পত্য-জীবন কিছু একটা থাকে। কিন্তু যূথিকা লেখাপড়া প্রায় জানেন না বললেই চলে। সাহিত্য-টাহিত্য তাঁর মাথায় ঢোকে না। একসময় গানের গলা তাঁর ছিল বটে। এখন আর নেই। বিয়ে হওয়ার পর সোহাগের মুহূর্তে যূথিকা স্বামীকে গান শুনিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই গান নীরদবরণের একেবারেই পছন্দ হয়নি। সিনেমাতে গাওয়া সায়গল কিংবা কাননদেবীর গানকে নকল করতেন যূথিকা। নীরদবরণের সেসব একেবারেই ভালো লাগত না। সায়গল কিংবা ঐ কাননদেবীর গান এবং অভিনয়ের প্রতি মানুষ যে কেন এত উন্মাদ তা এখনও বুঝতে পারেননি নীরদবরণ। তিনি বাংলা ফিলম্ দেখেন না। দুর দুর, ঐ রকম ন্যাকা-ন্যাকা অভিনয় দেখা যায় নাকি? তিনি পছন্দ করেন চ্যাপলিনের কমেডি। এছাড়া সোফিয়া লরেন এবং মার্সিয়ানো মাস্ত্রিয়ানির জুটিকেও তাঁর খুব পছন্দ। যূথিকা ওসব বুঝবে না। কলকাতার মেট্রো সিনেমাতে শেলীর সঙ্গে তিনি প্রায়ই বিদেশি ছবি দ্যাখেন। শেলী তাঁর অন্যরকমভাবে বেঁচে থাকবার প্রেরণা। ওর কাছে গেলে তিনি মানসিক শান্তি পান। জীবনটাকে বড় মোহময় ও রমণীয় মনে হয়। শেলীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে নীরদবরণের কোনও বিবেকের দংশন নেই। যূথিকার প্রতি, ছেলেমেয়েদের প্রতি, সংসারের প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছেন, সেভাবেই চলবে বাকি জীবন। সকলের জন্যে এত করেন আর নিজের ভালো লাগার একটা জায়গা থাকবে না? শেলী হ'ল সেই ভালো রাখার জায়গা। শেলীর কথা যূথিকা জানেন। নীরদবরণই তাঁকে একসময় বলেছিলেন। কোনও নারীই স্বামীর এই অবৈধ জীবন সহজে মেনে নিতে পারে না। যূথিকাও প্রথমে পারেননি। অনেক অশান্তি হয়েছে একসময় এসব নিয়ে স্বামীর সঙ্গে। ক্রমশ যূথিকা বুঝেছেন স্বামীকে তিনি টলাতে পারবেন না। নীরদবরণ সম্পূর্ণ অন্য ধাতুর মানুষ। অতঃপর তিনি কবে থেকে যেন মেনে নিয়েছেন স্বামীর এই স্বেচ্ছাচারিতা। শেলীর কথা আর শুধু জানে নীরদবরণের বড় ছেলে, ক্ষীরোদ। অন্য ছেলেরা এবং মেয়েরা জানার প্রশ্ন নেই।

এখন আর সকাল নেই। বেলা দশটা বেজে গেছে। দিনটা ঘটনাচক্রে রবিবার। নীরদবরণের অফিস যাবার প্রশ্ন নেই। গতকালও অবশ্য তিনি অফিস যেতে পারেননি। সুবু-র বউ-ভাত উপলক্ষে সদলবলে মেমারিতে গিয়েছিলেন। বেশ বেলা করে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে নীরদবরণ বারান্দাতে বসেছিলেন। বেশ চড়া রোদ উঠেছে আজ। আকাশ ঝকঝক করছে আয়নার মতন। গরমেরও ভাব রয়েছে বেশ।

গলির মধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি ঢুকতে দেখে চারপাশের বাসিন্দারা এবং পথচারীরা বেশ সচকিত ও কৌতূহলী হয়ে উঠল। ক্ষীরোদবরণ সবেমাত্র বাজারে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। তার হাতে দুটো বাজারের থলি। ঘোড়ার গাড়ি তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল প্রথমে নামছে মালপত্র-সমেত বিশ্বদেব। তার পেছনে দিদি সুনীতি এবং ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। বিশ্বদেব ক্ষীরোদবরণের থেকে বয়সে কিছুটা বড়। সে বিশ্বদেবকে জামাইবাবু ডাকে না। দাদাবাবু বলে ডাকে। বারিদ এবং অসিতও বিশ্বদেবকে দাদাবাবু ডাকে। ক্ষীরোদ এগিয়ে গেল। দু-একটা মালপত্র বিশ্বদেবের হাত থেকে নিল। মুখে বলল—এসো দাদাবাবু, এসো—ওয়েলকাম!

আটান্ন

নীরদবরণও যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরও মনে হচ্ছিল কোথাও একটা মারাত্মক ফাঁক কিংবা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল অথচ তার বাবা-মা জানল না কিছু, চিনল না জামাইকে, তাকে চোখের দ্যাখা দেখলও না পর্যন্ত এটা হতে পারে না। নীরদবরণ সত্যি সত্যিই মনে মনে অস্থির হচ্ছিলেন। জামাইয়ের সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করবেন তারই ছক যেন কষছিলেন মনে মনে। তিনি ঠিক করলেন প্রথম থেকেই যাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্রেট ব্যাটে খেলবেন। কোনও ধানাই-পানাই নয়। সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে খুলে বলবেন। বিশ্বদেব যেভাবে বিষয়টাকে মেনে নেয়। নীরদবরণের কোনও ভয় বা অস্বস্তি নেই। তিনি পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী যে, ঐ সোনার চাঁদ ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে সুবু-র বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা তিনি সঠিকই নিয়েছেন। ওরা একেবারে যাকে বলে রাজযোটক। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না এটা ঠিক। কিন্তু নিজের প্রখর অনুমান-ক্ষমতা কিংবা ইনটুইশানকে ভীষণ গুরুত্ব দেন। মনিশের মুখ দেখে তাঁর মনে হয়েছে ছেলেটা ভালো, বিচক্ষণ, নিখুঁত চরিত্রের। শিক্ষিত এবং সৎপাত্র পাওয়া অতো সহজ নাকি? বউ-ভাতের দিন অর্থাৎ গতকাল সুবু তাঁকে যেসব আপত্তির কথা বলেছিল সেগুলোকে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না নীরদবরণ। মনীশ নাকি কালো, তাই মেয়ের বর পছন্দ হয়নি! শ্বশুরবাড়ির লোকজন নাকি অশিক্ষিত, মাঠে পায়খানা করে। এসব কোনও কথা হল? বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে এসব আপত্তি টিকবে? লোকে শুনলে তো হাসবে? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নীরদবরণ জানেন দু-দিন বাদেই সুবু এসব আপত্তির কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না। তখন হয়তো সে স্বামী বলতে পাগল হবে। তাই যেন হয়। নীরদবরণ নিজের মনে বিড়বিড় করেন। এই বিয়ের সিদ্ধান্তটা তাঁর একধরনের পরীক্ষা নিজেরই সঙ্গে। আজ পর্যন্ত কোনও পরীক্ষায় অকৃতকার্য হননি নীরদবরণ। এটাতেও হবার কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু বিশ্বদেব দোতলার বারান্দায় যেখানে নীরদবরণ ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অবস্থায় রয়েছেন সেখানে আসছে না কেন? এ বাড়িতে ঢুকেই তো তার সোজা আসা উচিত শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত। খুব রেগে আছে নাকি? হা হা হা হা....। আপনমনে নিঃশব্দে হাসেন নীরদবরণ। মনীশকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললেই বিশ্বদেব নিজেও বুঝতে পারবে যে তার ফর্সা, রূপসী, আদুরে মেয়ের তুলনায় জামাই এমন কিছু ফেলনা হয়নি।

বিশ্বদেব এল না। তার বদলে এল সুনীতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এবং সৌজন্যমূলক প্রণাম সারতে। সুনীতি প্রণাম করে বলল—ভাল আছেন বাবা?—খারাপ কি দেখছিস মা? তোর মেয়ের জন্যে কত ভালো পাত্তর জোগাড় করেছি জানিস? ...নীরদবরণ মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। সুবু-র ব্যাপারে তাঁর একক সিদ্ধান্তে মেয়েও কি অখুশি নাকি? কিন্তু সেরকম আদৌ মনে হল না। বরং সুনীতি হেসে বলল—ছোটবেলা থেকে বড় মেয়ে তো আপনার কাছেই মানুষ বাবা? তার ভালো-মন্দ আপনি ছাড়া আমরা কি ভাল বুঝব?...আপনি যা করেছেন নিশ্চয়ই তার ভালোর জন্যই করেছেন।....তা মা বলল বউভাত তো গতকাল হয়ে গেচে। আমরা জামাইকে দেখব কবে?

—আজকেই দেখতে পারিস। আমি গাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি। মেমারি ঘুরে আয় তোরা সবাই। ক্ষীরোদ যাক সঙ্গে। নিজের চোখে দেখে আয় জামাইকে, ওদের বাড়ি-ঘর। দেখে বলতে বাধ্য হবি যে আমি ভুল কিছু করিনি।

সুনীতি বরাবরই খুব বিনয়ী এবং স্বভাব-ভীরু। সে কোনওদিন কোনও ব্যাপারে তর্কাতর্কিতে

যায় না। সর্বদাই সব ব্যাপারে যেন সে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। আর নীরদবরণের সামনে সে কোনওদিন গলা তুলে কথা বলতে সাহস করেনি। আজও করল না। বিনীতভাবে বলল—তুমি কি আমাদের আর আমাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষতি করতে পারো বাবা? ওরকম কোনওদিন ভাববে না।

—এখন বিশ্বদেব কী বলে! তারও মেয়ে সুবু, তোর একার মেয়ে তো নয়। তার আবার নিজের মতটতও আছে কিনা...। শেষের মন্তব্যটি বিদ্রূপাত্মক। কিন্তু সুনীতি সেটা বুঝল না। তাড়াতাড়ি সে বলল—ও আর কী বলবে বাবা? তোমার মুখের ওপর কোনওদিন কথা বলেচে কি ও? তাহলে বাবা তুমি গাড়ি ঠিক করে দাও। আজই আমরা সুবুকে ওর শ্বশুরবাড়িতে দেখে আসি....?

নীরদবরণ বললেন—কাল রাত থেকে এতটা ট্রেন জার্নি করে এলি তোরা। আজকেই আবার রোড-জার্নি করতে পারবি? শরীরের ধকল হবে না?

—কোনও ধকল হবে না বাবা। সুবুকে বউ হিসেবে কেমন মানিয়েছে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এমনিতেই কতদিন দেখিনি ওকে। আর জামাইকেও তো দেখতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে। জানো বাবা তুমি আমাকে বিয়ের সময় যে নেকলেসটা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলে সেটা আমি এনেছি। ওটা দিয়ে সুবুকে আশীর্বাদ করব।

—তা না হয় করবি....গাড়িরও বন্দোবস্ত করে দেব আমি। তোরা আজই মেমারিতে চলে যেতে পারিস। তবে আজকে ফিরতে পারবি না। রাস্তা অনেকটা। তোদের আজ বেয়াই-বেয়ানের বাড়ি থেকে যেতে হবে। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সতীশবাবুরা মানুষ খুবই সজ্জন। তোদের দুজনকে পেয়ে খুব খাতির-যত্ন করবে।....জানিস তো সুবু-র শ্বশুরবাড়ির লোকজনের খুব পয়সাকড়ি আছে। রাইসমিল আছে কয়েকটা। জমি-জমা, পুকুর-টুকুরও অনেক। সুবু বেশ সচ্ছলতার মধ্যেই থাকবে।

—সবই ওর কপাল বাবা....!

—কিন্তু বিশ্বদেব একতলাতে এতক্ষণ কী করছে? ক্ষীরোদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসেছে বুঝি? স্টারে কিংবা মিনার্ভায় থিয়েটার দেখতে যাবে সেই মতলব করছে? হালকা স্বরে এরকম বলতে বলতে তিনি, নীরদবরণ নাতি-নাতনিদের এক এক করে কাছে টেনে নিতে লাগলেন। এটা ওটা জিজ্ঞেস করছিলেন। তারাও টিপ্ টিপ্ করে দাদুকে প্রণাম করে ফেলল একে একে। একসময় যূথিকা ঢুকলেন ঘরে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে যেতে এসেছেন খাবার ঘরে। এতটা রাস্তা এসেছে ওরা। হাত-মুখ ধোবে। খাবার-দাবার খাবে। বড়মেয়েকে তিনি বললেন চানটা সেরে নিতে। সুনীতি মায়ের কথায় সায় দিল। নীরদবরণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—বিশ্বদেব কোথায় গেল? সে এল না আমার কাছে? তার সঙ্গে যে অনেক কথা....। যূথিকা জানালেন—ট্রেনে নাকি জামাইয়ের ভালো ঘুম হয়নি। তার মাথা ধরেচে। তাই কলঘরে ঢুকেচে। একেবারে চ্যান করে বেরোবে।

নীরদবরণ শুধু বললেন—ওহ....তাই বুঝি?

সত্যিই তাই। বিশ্বদেবের বরাবরের অভ্যাস সকালের দিকে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নেওয়ার পরই চানটাও করে নেওয়া। গত রাতে ট্রেনে একেবারেই ভালো ঘুম হয়নি। শরীরে ম্যাজম্যাজ ভাব ছিলই। মাথাটাও ধরেছিল যেন একটু। হাই উঠছিল বারবার। চোখদুটো জ্বালা করছিল। তাই বিশ্বদেবের যদিও মন উচাটন ছিল শুভ্রার ব্যাপারে শ্বশুরমশাইয়ের কাছে খোঁজখবর নেবার জন্যে, সে ঠিক করেছিল চানঘরের পর্ব শেষ করেই একেবারে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। তাছাড়া বিশ্বদেব ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসছিল। নীরদবরণের এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নেওয়া যাবে

না। কী এমন ঘটনা ঘটল যে রাতারাতি মেয়েটার বিয়ে দিতে হল? মেয়ের বাবা-মাকে জানানো হবে না? তাদের মতামত নেওয়া হবে না? পাত্রকে একবার বিশ্বদেব আর সুনীতি চোখের দ্যাখা দেখবে না? এরকম সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার কে দিয়েছে নীরদবরণকে? এরপর যদি কোনও অঘটন ঘটে, পাত্রপক্ষ মেয়েটার ওপর অত্যাচার শুরু করে কিংবা কোনও কারণে মেয়ে-জামাইয়ে মিলমিশ না হয়, তাহলে কে তার দায়িত্ব নেবে? এসব প্রশ্নই নীরদবরণকে মুখোমুখি করতে চায় বিশ্বদেব। ঐ লোকটার বড় অহঙ্কার! শিক্ষার অহঙ্কার। ইংরেজি ভাল লিখতে পারা আর ইংরেজিতে কথা বলতে পারার অহঙ্কার। সাহেবি অফিসে বড় পদে চাকরি করার অহঙ্কার। একেবারে হিটলারি মেজাজ। হিটলার চেয়েছিল সারা পৃথিবী জয় করতে। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে হিটলার কিন্তু ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। রাশিয়ায় লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে প্রচন্ড মার খেয়েছে হিটলার-বাহিনী। মিত্র-শক্তি ক্রমশ নিজেদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। চার্চিল, রুজভেল্ট আর স্টালিন গোপনে প্রায়ই বৈঠক করছে। হিটলার একা কি এদের সঙ্গে পেরে উঠবে? বিশ্বদেব নভেল-টভেল এখন আর বেশি পড়ার সময় পায় না। কিন্তু সে নিউজপেপার আর সাময়িক পত্র-পত্রিকার পোকা। অনেক খবর রাখে। বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কোনদিকে যাচ্ছে সেদিকে সে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। তার ধারণা হিটলার অস্বাভাবিক মানসিকতার মানুষ। সে অসুস্থ। ওয়ার-ম্যানিয়াক। ইহুদিদের প্রতি তার ভয়ঙ্কর ক্রোধের কোনও কারণ পাচ্ছে না মানুষ। একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে হিটলার। নিজেই না নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিজের শ্বশুরমশাইকে ঠিক যেন হিটলারের এক অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হয় বিশ্বদেবের। কিন্তু সে তো নিজে মেরুদন্ডহীন নয়। সুনীতিকে বিয়ে করতে গিয়ে সে নিজের মাথা তো আর বিকিয়ে দেয়নি। ঐ বিয়েটার ব্যাপারেও নীরদবরণের গরজই ছিল বেশি। তিনি স্ব-প্রণোদিত হয়ে বিশ্বদেবকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সুনীতিকে বিয়ে করার সময় বিশ্বদেবের কোনও দাবি-দাওয়া ছিল না। নীরদবরণই নিজের ইচ্ছেমতো মেয়েকে যা দেবার দিয়েছেন। অতএব শ্বশুরের সামনে মুখ তুলে কিংবা গলা তুলে কথা বলার ব্যাপারে বিশ্বদেবের কোনও জড়তা বা ভীতি থাকার কথা নয়।

চান সেরে সত্যিই নিজেকে ফ্রেশ লাগছিল। স্যুটকেশ থেকে ধুতি আর শার্ট একজোড়া বের করে চাপিয়ে নিল বিশ্বদেব। বড় শ্যালক ক্ষীরোদ বাজার চলে গেছে। মেজ শ্যালক অসিতবরণকে বাড়ি ঢুকে দেখেছে বিশ্বদেব। তারপর আর দেখতে পাচ্ছে না। তার কলেজ-টলেজ থাকতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছে অসিত। সে বরাবরই ভালো ছাত্র। ছোট শ্যালক বারিদবরণের সঙ্গে একতলার ঘরেই দ্যাখা হয়ে গেল বিশ্বদেবের। এই ছেলেটি এখনও স্কুলে পড়ছে। সামনের বছর স্কুল-ফাইন্যাল দেবে। শুভ্রার থেকে বছরখানেকের বড়ই হবে হয়তো। বারিদবরণ পড়াশোনাতে অসিতবরণের মতন অতটা ভালো নয়। তবে বছর বছর পাস করে ক্লাসে উঠে যায়। নীরদবরণের এই ছেলেটি তার বাবার গুণ বোধহয় কিছুটা পেয়েছে। প্রচুর ইংরেজি বই পড়ে ছেলেটি। একেবারে পোকা যাকে বলে। সে কারণেই শুভ্রার সঙ্গে বারিদের গলাগলি ভাব। বিশ্বদেব যতটা খবর রাখে শুভ্রাও খুব নভেল পড়ে কিন্তু এত কম বয়সে সেই কোন্ ধ্যারধেরে গোবিন্দপুর মেমারিতে বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটার। আর কি বেচারা নভেল-টভেল পড়ার সময় পাবে? এখন থেকে তো হেঁশেলেই দিনের অর্ধেক সময় কাটিয়ে দেবে শুভ্রা। আসলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বিশ্বদেবের যে কোনও পরিকল্পনা ছিল না এমন নয়। সে চেয়েছিল আর বছর দুই পরে গালা-কারখানার চাকরি ছেড়ে একেবারে কলকাতায় চলে আসবে। তারপর দেখেশুনে বড় মেয়েটার বিয়ে দেবে। ছেলেদের ভাল স্কুলে ভর্তি করবে। দুই মেয়েকেও কিছুটা

পড়াবে। স্কুল-ফাইন্যাল পর্যন্ত অন্তত। তারপর তাদেরও বিয়ে দেবে। অ্যারাতুন সাহেব তাকে কথা দিয়েছেন যে, আর্মেনিয়ান কলেজে তিনি বিশ্বদেবের কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। সাহেবের কথার দাম আছে। বিশ্বদেব তার অনেক পরিচয় পেয়েছে। ভেবে তো রেখেছিল অনেককিছু। কিন্তু নীরদবরণ হঠাৎ যেন শুভ্রার বিয়েটা দিয়ে সব ঘেঁটে দিলেন। শ্বশুরবাড়িতে কেমন আছে শুভ্রা? বিশ্বদেবের মনটা একমুহূর্ত হু হু করল। আজকেই মেমারিতে সকলকে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

একতলার ঢাকা দালানে বিশ্বদেবের ছেলেমেয়েরা সারি দিয়ে খেতে বসেছে মাটিতে চাটাইয়ের আসনে। সুনীতি যথারীতি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। বিশ্বদেব মনে মনে হাসে। তার স্ত্রী বরাবর রান্নাঘরেই যেন বেশি স্বস্তি পায়। যূথিকা সিঁড়িতে বসে নাতি-নাতনিদের খাওয়া-দাওয়া তদারকি করছেন। বিশ্বদেব দেখল তার ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকের পাতে ফুলকো লুচি আর তরকারি। মামাবাড়ির মজাই আলাদা। যূথিকা বিশ্বদেবকে দেখে ঘোমটা টানলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গো জামাই, তোমাকেও লুচি তরকারি মিষ্টি দিই? বিশ্বদেব জানাল সে এখন দোতলায় যাচ্ছে। ওখানে চা পাঠিয়ে দিলেই হবে। জলখাবার সে একটু পরে খাবে। যূথিকা বুঝলেন। জামাই এখন মেয়ের বিয়ে নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যাচ্ছে। একটা ঝগড়াঝাঁটি না বেধে যায়। শ্বশুরের মেজাজ কড়া। আর জামাইও কিছু কম যায় না। সেও বেশ রাগী। দুজনে এখন চেঁচামেচি শুরু করে দেবে না তো? ক্ষীরোদটাও নেই। বাজারে গেছে। সে থাকলে অবস্থার কিছুটা সামাল দিতে পারত বোধহয়। যূথিকা শান্তিপ্রিয় মানুষ। যা হবার হয়েছে। সুবুর বিয়েটা নিশ্চয়ই বেশ ভাল ঘরেই হয়েছে। পাত্তর তো খুব পণ্ডিত। বিদ্যাই তো আসল। মেমারি থেকে গতকাল ঘুরে এসে ক্ষীরোদ যেরকম গল্প করল তাতে তো ওদের বেশ অবস্থাপন্ন এবং ভদ্দরলোক বলেই মনে হল। শুভ্রা নিশ্চয়ই সুখী হবে। আটদিনের মাথায় নতুন জামাই আর শুভ্রা তো আসবেই এখানে। তখনই সব জানা যাবে। যা হয়েছে হয়েছে। নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করে লাভ কী বাপু! যূথিকা এরকম ভাবছিলেন। কিন্তু জামাইকে আগাম কিছু বলার সাহস তাঁর নেই।

দোতলাতে উঠে প্রথমেই যে ঘরটা সেখানে অসিতবরণ আর বারিদবরণ থাকে। এখন একজন নেই। বারিদ বিছানায় আধশোয়া হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে কী একটা বই পড়ছে। আজ রবিবার। স্কুলের পাট নেই। বিশ্বদেবের মনে হল ওর সঙ্গে একটু কথা বলে যাওয়া উচিত।

—কীরে বারিদ? কী বই পড়ছিস?—বিশ্বদেবের গলা শুনে বারিদ উঠে বসল। বলল—একটা নভেল। দারুণ!

—কী নভেল?

—ন্যুট হামসুনের হাঙ্গার। নরওয়ের লেখক। মার্ভেলাস বই।... বিশ্বদেব বইটা নেড়েচেড়ে দেখল। নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপন্যাস।

—দাদাবাবু?

—কী রে?

—তুমি যে আমাকে বলেছিলে রয় এমার্সনের বই কিনে দেবে?

—হ্যাঁ দেব।... দেখি কলেজ স্ট্রিটে যেতে হবে।.... হ্যাঁরে বারিদ তুই তো মেমারিতে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলি। কেমন দেখলি?

—দারুণ দাদুবাবু। খুব বড়লোক ওরা। জমিদার মনে হল গ্রামের। আর যা খাওয়াল না?....এত্ত বড় বড় রবারের বলের মতন লেডিকেনি, সীতাভোগ, চন্দ্রপুলি।....সুবু-র কপালটা ভাল দাদাবাবু।

খুব ভাল বাড়িতে ওর বিয়ে হয়েছে।

—বলছিস? —বিশ্বদেব কপাল কুঁচকে ভাবছিল। তারপর বলল—তুই পড় বই। আমি একটু ও-ঘরে যাই।

নীরদবরণ বারান্দা থেকে নিজের ঘরের ইজিচেয়ারে এসে অর্ধশয়ান। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। আসলে বিশ্বদেবের জন্যেই বসে ছিলেন। পর্দা সরিয়ে বিশ্বদেব ঘরে ঢুকল। নিজের উপস্থিতি জানাবার জন্যে কাশল দুবার। বিশ্বদেবকে দেখে নীরদবরণ ঈষৎ উঠে বসলেন।

বললেন—এসো বিশ্বদেব। বোসো ঐ চেয়ারটাতে...।

ঊনষাট

বিশ্বদেব জানে তার শ্বশুরের যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে। এবং সেই প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরেই তিনি অনেকসময় অন্যায্য কাজ করেও জিতে যান। কেউ তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে যেতে চায় না। তিনি যে ভুল করেছেন কিংবা করতে পারেন সেটা তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিতে সাহস করে না। ফলে নীরদবরণের ধারণাই হল বোধহয় যে তিনি যা করেন সবসময় ঠিকই করেন। কিন্তু বিশ্বদেব অন্তত বোঝে যে, নীরদবরণ সবসময়েই তাঁর জোরালো ব্যক্তিত্বের সুযোগ নিয়ে থাকেন। স্ত্রীকে, ছেলেদের এবং মেয়েদের তিনি প্রতিমুহূর্তে দাপিয়ে রাখেন। আর শ্বশুরের এই ডমিনেট করার ব্যাপারটাই সে মেনে নিতে পারেনি কোনওদিন। প্রয়োজনমতো প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে কারণেই নীরদবরণ জামাইকে কিংবা জামাইয়ের এই প্রতিবাদী আচরণকে মেনে নিতে পারেন না। হয়তো কবে থেকে যেন মনে মনে বিশ্বদেবকে অপছন্দ করতেও শুরু করেছেন। বিশ্বদেবও এ-ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরও অপছন্দ করলে তারা ঠিক বুঝতে পারে। সে কারণেই বিশ্বদেব এতক্ষণ ধরে নিজের মনকে প্রস্তুত করছিল। সে ঠিকই করে রেখেছে সে প্রথম থেকেই শ্বশুরকে আক্রমণ করার রাস্তা নেবে। তারপর কী হয় দ্যাখা যাক।

ইজিচেয়ারের বিপরীতে কিছুটা দূরত্বে একটা চেয়ার। এ বাড়ির আসবাবপত্রগুলো বেশ দামি। খাট, আলমারি এসব তো সেগুন কাঠের। এমনকী চেয়ার-টেবিলগুলোও সেগুনকাঠের। চেয়ারটাতে গদিও আছে। বিশ্বদেব চেয়ারে বসল। সচেতনভাবেই সে আজ এ-ঘরে ঢুকে শ্বশুরকে নমস্কার করল না। ঝালদা থেকে এ-বাড়িতে ঢুকে অবশ্য শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণামটা সে করে। আজ যথারীতি যূথিকাকে সে প্রণাম করেছে। কিন্তু নীরদবরণকে না। তাতে কি নীরদবরণের মুখটা একটু গম্ভীর হল? হোক না। বিশ্বদেব তো এটাই মনে মনে চেয়েছে। শ্বশুরকে সে আজ স্বস্তি দেবে না। বরং বুঝিয়ে দেবে যে, তার সঙ্গে পরামর্শ না করে, তাকে না অবহিত করে শুভ্রার বিয়ে দিয়ে নীরদবরণ ঠিক কাজ করেননি। এরকম যদি চলতে থাকে বিশ্বদেব সেটা কোনওমতেই বরদাস্ত করবে না। তার ছেলেমেয়ে, তার সংসার এসব ব্যাপারে তার মতামত, তার সিদ্ধান্তই তো গুরুত্ব পাওয়ার কথা।

—কী এমন ঘটল যে, আমাকে না জানিয়ে, আমার মতামত না নিয়ে আপনি এত বড় সিদ্ধান্তটা নিলেন? আমার মেয়ের বিয়ে এভাবে হোক আমি চাইনি।—বিশ্বদেব বলল। তার কথা শুনেই অবশ্য নীরদবরণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন না। শুধু বিশ্বদেবের কথাটা শুনে তাঁর মুখ আরও গম্ভীর ও থমথমে হয়ে গেল। তিনি সামনের গোল টেবিল থেকে নিজের পাইপটা তুলে নিলেন। একটা দেশলাই-কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাইপের মুখটা পরিষ্কার করতে লাগলেন। তারপর একসময় পাইপের দিকেই নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নীরদবরণ জামাইয়ের উদ্দেশে বললেন—তুমি

শুধু শুধু চিন্তা করছ।....সুবু-র বিয়েটা ভালো ঘরেই হয়েছে।

—কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কী দরকার ছিল?

—কোন্ সিচুয়েশনে ডিসিসানটা আমি নিয়েছি তুমি জানো না। সেটা শোনার মতো ধৈর্য আছে?

—কিছুটা আমি শুনেছি ক্ষীরোদের মুখে। আপনার বন্ধুর মেয়ে যার সঙ্গে পাত্রের বিয়ে হবার কথা ছিল সে কোন্ টেররিস্টের হাত ধরে পালিয়েছে এই তো?....আপনার বন্ধু পাত্রপক্ষের কাছে অপমানিত হত, তাই বন্ধুর মুখ সেভ করতে আপনি আমার মেয়েকে ভিকটিমাইজ করবেন কেন?

—বি-শ্ব-দে-ব! সক্রোধে চেঁচিয়ে উঠলেন নীরদবরণ। এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে, বিশ্বদেবও ঈষৎ কেঁপে উঠল। চোখ লাল করে নীরদবরণ বললেন—মাইন্ড ইওর ল্যাংগুয়েজ! সুবুকে আমি ভিকটিমাইজ করেছি এটা বলছ কেন?

—বলছি তার কারণ হল আপনার এরকম স্পট ডিসিসানের ব্যাপারে আর কোনও যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েরা লগ্নভ্রষ্টা হলে দুশ্চিন্তার ব্যাপারে। তাদের নাকি নতুন করে বিয়ে দিতে অসুবিধে হয়। কিন্তু ছেলেদেরও আবার লগ্নভ্রষ্ট হবার ব্যপার আছে নাকি? ঐ ছেলেটার বিয়ে নয় সাময়িকভাবে ভেস্তে যেত। তো যেত যেত! তাকে সেভ করার জন্যে আপনি সুবু-কে ওর হাতে গছিয়ে দিলেন এটা আমি আদৌ মেনে নিতে পারছি না। এটা আপনার ইউনিলেটারাল ডিসিসান। অ্যান্ড আই ডোন্ট অ্যাপ্রুভ অব ইট....। কথাটা বলার মুহূর্তে বিশ্বদেব সতর্ক ছিল যেন তার গলা কেঁপে না যায়। নীরদবরণ এত জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যে, যূথিকা ছুটে এলেন দোতলার এই ঘরে। তিনি ক্রনিক হাঁপানির রুগী। যদিও এখন গ্রীষ্মকাল; কিংবা গ্রীষ্ম, বর্ষার মাঝামাঝি সময় বলা যায়, এই সময়টা হাঁপানি-রুগীরা কষ্ট কম পায়, তবুও যূথিকার শরীরটা যেহেতু ভালো যাচ্ছে না, প্রায়ই ভুগছেন, তিনি দ্রুত দোতলাতে উঠে আসার ফলে হাঁপাচ্ছিলেন। বিশ্বদেব অবশ্য শাশুড়ির সামনে ভদ্রতা করল। তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বলল—আসুন মা—বসুন।

—তুমি বোসো বাবা। আমি শুধু দুটো কতা বলতে এসেচি। নীরদবরণ স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর কপাল কুঁচকে আছে। ফর্সা মুখ ক্রমশ লাল হচ্ছে। যূথিকা স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর বিশ্বদেবের উদ্দেশে বললেন—বাবা তোমাকে একটা কতা বলব?

—বলুন?

—দেখো যা হবার হয়েচে। সুবুর বিয়েটা যখন হয়ে গেচে, তখন সেসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি করাটা কি ভাল? ক্ষীরোদের মুখে সব শুনে আমারও মনে হচ্ছে সুবুর বিয়েটা ভাল হয়েচে। তুমি আর সুনীতি মেমারিতে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসো না সুবু কেমন আছে! তোমাদের আজই যাওয়া উচিত।

নীরদবরণ বললেন—জামাইয়ের অডাসিটি দ্যাখো যূথি? আমাকে বলে কি না আমি সুবুকে ভিকটিমাইজ করেছি! 'অডাসিটি' এবং 'ভিকটিমাইজ'-এই দুটো ইংরেজি শব্দেরই মানে বোধগম্য হল না যূথিকার। কিন্তু তিনি প্র্যাকটিক্যাল। তিনি জানেন, শ্বশুর আর জামাই দুজনেই সমান। একেবারে যাকে বলে কাঠে-কাঠে। এদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে থামায় কার সাধ্য। যূথিকা আবার বিশ্বদেবকে বললেন—বাবা তোমরা তাড়াতাড়ি দুটি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আজই মেমারি ঘুরে এসো। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে একদিন না হয় থেকেই গেলে। নাতি-নাতনিরা আমার কাছে থাক। ওরা নয় দু-একদিন বাদে যাবে। তোমাদের সঙ্গে ক্ষীরোদও যাক। হ্যাঁগো তুমি ওদের

একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে তো? —শেষ প্রশ্নটি যূথিকা করলেন স্বামীকে।

—দেব না মানে? আলবাত দেব....। নীরদবরণ বললেন। পাইপটা ধরিয়ে নিলেন। দমকে দমকে ধোঁয়া বের হতে লাগল পাইপ থেকে। সারা ঘর ভরে গেল কড়া তামাকের গন্ধে। পাইপ দাঁতে চেপে নীরদবরণ বললেন—তুমি খামোখা রাগ করছ বিশ্ব। হ্যাঁ ডিসিসানটা আমি তড়িঘড়ি নিয়েছি এটা আমি মানছি। কিন্তু আমি আবার রিপিট করছি আমার ডিসিসান খারাপ হয়নি। মনীশ ছেলেটি, —মানে যার সঙ্গে সুবুর বিয়ে হয়েছে,—সত্যিই ভাল ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। এই তো আমাদের বাড়ির কাছে শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ওর আর হস্টেলে থাকার দরকার নেই। আমার বাড়িতে থাকবে। সুবুও এখানে থাকবে। ওকে আমি ঘরজামাই করে রাখব। আর কী চাও তুমি? হা হা হা? এখনও তোমার রাগ পড়েনি?...হা হা হা হা। ঘর কাঁপিয়ে নীরদবরণ হাসছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির কাজের মহিলা ট্রেতে চায়ের কাপ-প্লেট সাজিয়ে ঘরে ঢুকল। নিচু হয়ে সে নীরদবরণের সামনে গোল-টেবিলে চা নামিয়ে রাখল। তার সঙ্গে বিস্কুটের প্লেট। বিলিতি বিস্কুট। নীরদবরণ পার্ক স্ট্রিটের সাহেব পাড়া থেকে কিনে আনেন। বিশ্বদেবের দিকেও চায়ের কাপ বাড়িয়ে মহিলা বলল—দাদাবাবু—এই নিন। বিশ্বদেব চা নিল। চুমুকও দিল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে চায়ের খুবই প্রয়োজন ছিল।...

বিলিতি বিস্কুটের স্বাদই আলাদা। বিশ্বদেব যখন এ-বাড়িতে আসে এই বিস্কুট তাকে দেওয়া হয়। নীরদবরণ কোন্ এক সাহেবি দোকান থেকে নিয়ে আসেন। তার ছেলেমেয়েদেরও এই বিস্কুটটা খুব প্রিয়। বিশ্বদেব জানে সে যখন সকলকে নিয়ে ঝালদাতে ফিরে যাবে তখন অনেক রকম জিনিসপত্তরের সঙ্গে যূথিকা এই বিলিতি বিস্কুটও দু-তিন প্যাকেট দিয়ে দেবেন। অ্যারাতুন সাহেবের বাংলো থেকেও নানা খাবার-দাবার বিশ্বদেবরা পেয়ে থাকে। সাহেবেরও খুব দরাজ হাত। তবে সেসব খাবারের মধ্যে অন্যরকম বিস্কুট, কেক, চকোলেট এসব থাকে। কিন্তু এই ধরনের ঝাল-মিষ্টি বিস্কুট থাকে না। এটা একেবারে যাকে বলে—ফাদার-ইন-ল'জ স্পেশাল। বিস্কুট চিবোনোর পর চায়ে চুমুক দিল বিশ্বদেব। আহ! যথারীতি দার্জিলিং টি। জিভে দিলেই বোঝা যায়। মাথাটা ছেড়ে যাচ্ছিল বিশ্বদেবের। রাগটাও যেন গলছে ধীরে ধীরে। নীরদবরণ একটু আগে যা জানালেন সেই প্ল্যানটা অবশ্য খারাপ নয়। জামাই যখন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, তখন সে তো হস্টেল থেকে এখানে-শ্বশুরবাড়িতে এসেই থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সুবু-কেও আর মেমারির গ্রামে গিয়ে থাকতে হয় না। সে এই হাওড়াতেই থাকতে পারে। অবশ্য এই বাড়িটা তো বিশ্বদেবের শ্বশুরবাড়ি। এটা বিশ্বদেবের জামাইয়ের শ্বশুরবাড়ি হয় কীভাবে?... আরে ঐ হল আর কী! যখন বিশ্বদেব ঝালদার তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতায় কিংবা এই হাওড়ার কোথাও বাসা নেবে, তখন বড় মেয়েকে আর জামাইকে নিজের কাছেই রাখবে। এখন নীরদবরণের এই বাড়িতেই থাকাথাকি চলুক। পরের কথা পরে হবে। যূথিকা বুঝেছেন জামাইয়ের মেজাজের পারদ কিছুটা নেমেছে। ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে জামাই। তেমন কিছু বলছে না। কী যেন ভাবছে। আর নীরদরণের দিকে তাকিয়ে যূথিকা বুঝলেন, তিনিও নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। জামাই আর শ্বশুর মুখোমুখি হলেই এটা-সেটা নিয়ে খটাখটি লেগে যায়। বরাবর এটা যূথিকা লক্ষ করেন। কেন এমন হয়? যেন দুজন দুজনকে সহ্য করতে পারে না। অথচ, নীরদবরণ নিজেই পছন্দ করে এই জামাইকে এ বাড়িতে এনেছিলেন।

বাড়ির হুলো বেড়াল পুঁটি ইতিমধ্যে দোতলাতে উঠে এসেছে। বোধহয় বিস্কুটের গন্ধ পেয়ে। পুঁটি যূথিকার প্রিয়! নীরদরণেরও প্রিয়। শুভ্রাও খুব ভালোবাসত পুঁটিকে! বেড়ালটা তার পায়ে পায়ে ঘোরে। বিছানাতে যখন মেয়েটা শুয়ে থাকে, পুঁটি তার পায়ের কাছে চুপটি করে শুয়ে

থাকে। পুঁটি নির্দ্বিধায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডাকল—ম্যাও। নীরদবরণ বললেন—এ বেটি আবার কোথা থেকে জুটল? ওর খেল তো শুরু হবে বাজার থেকে মাছ এলে। যতক্ষণ মাছ কোটা হবে ও চুপচাপ বঁটির সামনে বসে থাকবে। কাটা মাছের নাড়িভুড়ি, পটকা সব খাবে বলে। সুবু আবার ওকে বেশি প্রশ্রয় দিত। এখন বেটি সুবুর অভাব খুব ফিল করবে।

যূথিকা বললেন—সুবুর অভাব বলচ কেন? বিয়ের পর নাতনি আর জামাই তো এ বাড়িতেই থাকবে শুনলুম? নীরদবরণ বললেন—তা বটে। আসল কথাটা ঠিক তোমার কানে গেছে।...হ্যাঁ আমি সেরকমই ভেবেছি।...কী বিশ্বদেব তুমি আমার প্ল্যানটা রেকমেন্ড করছ তো? ভালো পাত্রের সঙ্গে সুবু মায়ের বিয়েটাও হল আবার জামাইও হাতের মধ্যে রইল। সুবুকে ছেড়ে সত্যিই আমরা থাকতে পারব না। সারা বাড়ি যেন আলো করে ছিল মেয়েটা। সকাল থেকে আমারও কীরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

পুঁটি ঘরের মাঝখানে বসে হাই তুলছে আর ডাকছে—ম্যাঁও। ক্রমশ যেন এ ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। নীরদবরণ বললেন—ক্ষীরোদ বাজারে এত দেরি করছে কেন? নিশ্চয়ই তাসুড়েদের আড্ডায় বসে গেছে। এত ইরেসপনসিবল! যতক্ষণ না বাড়িতে মাছ ঢুকবে, পুঁটি মাছের গন্ধ পাবে ততক্ষণ ও এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে আর ম্যাও ম্যাও করে যাবে। যূথিকা বললেন—তাসের আড্ডায় বসবে কেন? আজকে মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনিরা এল। তাই দেখেশুনে বাজার করছে ক্ষীরু। তুমি সব সময় ছেলেটার দোষ ধরো!

নীরদবরণ বললেন—রান্না তো তাড়াতাড়ি সারতে হবে।... অবশ্য সুনীতি যখন এসে গেছে আর চিন্তা রান্নাবান্নার ব্যাপারে ও তো একাই একশো।

—কেন? রান্না তাড়াতাড়ি সারতে হবে কেন?—জানতে চাইলেন যূথিকা।

—সেটা জামাইকেই জিজ্ঞেস করো। ওরা তো আজ দুপুরে মেমারি রওনা দেবে। মেয়ের বাবা-মা তার শ্বশুরবাড়িতে যাবে না? কী বিশ্বদেব আজই যাবে তো? আমি একটা গাড়ি হায়ার করে দেব।

—সে নয় যাওয়া যায়।...কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবছি...।

—আবার কী কথা?

—দেখুন সুবু-র বিয়েটা যেভাবে হল, সেটা কিছুটা অ্যাবনরমাল সারকামসনেটসেস—তাই না?

—অ্যাবনরমাল বলবে না আনপ্রেসিডেনটেড সারকামসট্যানস বলবে?—নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ সেটাও বলা যায়। কিন্তু সুবু-র যে বিয়ে হল সেটা আমাদের আত্মীয়স্বজনদের তো জানাতে হবে? একটা সোশ্যাল ফাংশান তো করতে হবে। সকলকে বুঝিয়ে বলতে হবে কীভাবে, কোন অবস্থায় ওর বিয়ে দেওয়া হল। ব্যাপারটা সকলের জানা দরকার। তা না হলে বুঝতেই পারছেন...নানান কথা উঠবে। আত্মীয়স্বজনদের তো জানি। সবাই যেন ছিদ্র খোঁজার জন্যে বসে আছে।

—তুমি সকলকে নিয়ে একটা রিসেপশনের কথা বলছ?—পাইপটা বোধহয় নিভে গিয়েছিল। সেটা আবার ধরিয়ে নেবার ফাঁকে বললেন নীরদবরণ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ...সেরকমই।

—হ্যাঁ সে তো করতেই হবে। তবে সেটা আমরা করব নিজেদের তাগিদে। আত্মীয়স্বজনদের মুখ কিছুতেই বন্ধ করতে পারবে না। ওরা ক্রিটিসাইজ করবেই। অপরের নর্দমার ময়লা খুঁটে

বের করতে না পারলে তো ওদের ভাত হজম হবে না। ওসব কথা ছাড়ো। এখন দ্য কোয়েশ্চন ইজ—কবে রিসেপশনের আয়োজন হবে? কোথায় হবে? যূথিকা বললেন—আটদিনের মাথায় তো ধুলো পায়ে মেয়ে আসচে এ-বাড়িতে। জামাইও আসবে। দুজনেই কয়েকদিন নিশ্চয়ই থাকবে এ-বাড়িতে। তখন ঐ নেমতন্নের ব্যাপারটা সেরে ফেললেই তো হয়? নীরদবরণ একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন—এই প্রস্তাবটা খারাপ নয়। তবে দিন-তারিখটা একটু ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে।

যূথিকা বললেন—বলাই পুরোহিতকে ডাকলেই তো হয়? সেই পাঁজি-টাজি দেখে দিনক্ষণ স্থির করে দেবে। নীরদবরণ সায় দিলেন—সেটাও হয়। বলাই তো এ-বাড়ির সব কাজই করেছে। তবে আমি একটা কথা ভাবছি।... বিশ্বদেব আর সুনীতি তো আজই মেমারিতে যাচ্ছে। ওরা সতীশবাবুদের সঙ্গে অনুষ্ঠানের তারিখটা নিয়ে কথা বলে আসতে পারে। এ ব্যাপারে ওঁদেরও একটা মতামত থাকতে পারে। যূথিকা জিজ্ঞেস করলেন—ওরা দুজনে মেমারিতে যাবে? নাকি ওদের সঙ্গে ক্ষীরুও যাবে?

—নিশ্চয়ই ক্ষীরোদ তো যাবেই।-বিশ্বদেব বলল।—আর ছেলেমেয়েদের এখন নিয়ে যাচ্ছি না। অনেকটা ট্রেন-জার্নি করে এসেছে ওরা। আবার অনেকটা গাড়ির জার্নি ওদের সহ্য নাও হতে পারে।

—ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি ভাবছ কেন? ওরা এখন সুনীতির মায়ের সেফ কাস্টডিতে। নীরদবরণ যূথিকার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষীরোদ ঢুকল ঘরে। যূথিকার দিকে তাকিয়ে বলল—মা তাড়াতাড়ি নীচে যাও। মাছ-টাছ অনেক আনা হয়েছে।

—কী মাছ আনলি?—যূথিকা জিজ্ঞেস করলেন।

—ভেটকি মাছ এনেছি। দাদাবাবু তো ভেটকিটা পছন্দ করে। আর বড় বড় গলদা চিংড়িও আছে। নারকেলও এনেছি। নারকেল-কুরো দিয়ে চিংড়ির মালাইকারি খাসা হবে। দিদি (সুনীতি) তো এসে গেছে। আর চিন্তা কী? দিদি মালাইকারিটা খাসা রাঁধে। আর দই-মিষ্টিও এনেছি।

—আমি এখনই নীচে যাচ্ছি। কাজের লোককে দিয়ে মাছগুলো তো আগে কেটেকুটে পরিষ্কার-টরিস্কার করিয়ে রাখি।

যূথিকা নীচে নেমে গেলেন। পুঁটিও ঠিক বুঝেছে। সেও যূথিকার পায়ে পায়ে নীচে নেমে গেল। নীরদবরণ বললেন—ক্ষীরোদ তোমাদের খাওয়া-দাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে।

—কেন বাবা?

—বিশ্বদেব আর সুনীতি আজ মেমারি যাবে। গাড়িতে। আমি ভাড়া গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে হবে।

—আজ?...মেমারি?...আজ সন্ধের দিকে যে আমার রিহার্সাল ছিল। একটা নতুন পালা নামাচ্ছি আমরা। ডি. এল. রায়ের মেবার পতন।

—তোমার ঐসব ওয়ার্থলেস কাজের সময় পরেও পাওয়া যাবে।—মুখ বেঁকিয়ে বললেন নীরদবরণ। ক্ষীরোদবরণ চটে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল। বিশ্বদেব বলল—রিহার্সাল পরেও দিতে পারবে। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো ক্ষীরোদ। তা না হলে জমবে না। আর বারিদবরণকেও নিয়ে যাই। ওর অবশ্য একদিন স্কুল-কামাই হবে।

—অন্য সময় হলে আপত্তি করতাম,—নীরদবরণ বললেন, —এখন করব না। ক্ষীরোদ বলল—আজ দুপুরের দিকে মেমারি রওনা দিলে পৌঁছতে তো রাত হয়ে যাবে। সতীশবাবুদের বাড়ি আমাদের থেকে যেতে হবে।

—তা তো হবেই;—নীরদবরণ বললেন,—তোমরা রাতে সে বাড়িতে থাকলে সতীশবাবুরা খুশিই হবে।

—তাদের বাড়ি গণ্ডগ্রামে, ইলেকট্রিসিটি নেই, তবে দোতলার ঘরগুলো বড় বড়। হাওয়া খেলে। আর মাটির বাড়ি তো। সন্ধের পর এমনিতেই ঠাণ্ডা। ক্ষীরোদ মন্তব্য করল।

বিশ্বদেব কিছু বলল না। ইলেকট্রিসিটি তো ঝালদাতেও নেই। সে তাতে অভ্যস্ত। কিন্তু হাওড়ার এ-বাড়িতে তো আলো-পাখা সবই আছে। সুবু তাতেই অভ্যস্ত! ওরই নিশ্চয়ই থাকতে অসুবিধে হচ্ছে। অবশ্য কদিন আর। নীরদবরণ যে মতলব ভেঁজেছেন তাতে তো সুবু আবার এ-বাড়িতেই থাকতে পারবে। পাইপ টানা শেষ। সেটি টেবিলে নামিয়ে রেখে নীরদবরণ উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন যে তিনি চানটা সেরে নেবেন এবার। বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদ দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। এখন একতলার সদর-ঘরে কিছুক্ষণ দাবা খেলা যেতে পারে।

এরকম সময়ে সুনীতি রীতিমতো হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে এল তার দুই চোখ বিস্ফারিত। শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন। তার দিকে তাকিয়েই তিনজন বুঝল সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

—কী হল তোমার? —বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করল।

—ওগো .... ওগো একী সর্বনাশ হল আমাদের? —সুনীতি যেন আর্তনাদ করল।

—কী হয়েছে বলবি তো? —ওরকম করছিস কেন? নীরদবরণ ধমকে উঠলেন।

—সুবু শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেচে ...!

—সেকি? কোথায় সে? —ক্ষীরোদ বলল।

—একতলার দালানে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাস না হয় নিজের চোখে তোমরা দেকে এসো ...। —সুনীতি কান্নাভেজা স্বরে বলল।

—এ তো আনাবিলিভেবল? —নীরদবরণ অস্ফুটে বললেন। তারপর সবাই দুদ্দাড় শব্দে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

ষাট

সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নামছিল সুনীতি। তার পেছনে ক্ষীরোদ। তার পেছনে বিশ্বদেব। সকলের শেষে ভারী শরীর নিয়ে ঈষৎ হেলতে দুলতে নীরদবরণ। এরকম পরিস্থিতিতে যে পড়তে হবে তা, কোনওদিন কল্পনা করেননি তিনি। একী বিচিত্র কাণ্ড! ফুলশয্যার পরদিনই বউ শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এল একা? কেন পালিয়ে এল? নানারকম অনুমান এবং চিন্তা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতন নীরদবরণের মনে যাতায়াত করছিল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কি খারাপ ব্যবহার করেছে শুভ্রার সঙ্গে? গতকাল ওদের বাড়িতে গিয়ে তো তেমন কিছু মনে হয়নি? নীরদবরণের অভিজ্ঞ চোখ কি সতীশবাবু আর মনীশকে চিনতে ভুল করল? নাকি অন্য কোনও কারণ? ... ফ্রয়েড গুলে-খাওয়া নীরদবরণের একঝলক অন্য একটা কথাও মনে হল। সেরকম যদি হয় তাহলে তো ... ইটস্ অ্যা ম্যাটার অফ টাইম ...। সব ঠিক হতে সময় লাগবে। সিঁড়ি দিয়ে সকলে দালানে নেমে এসেছে। একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে সেখানে। যূথিকাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বেরিয়ে এসেছে বাড়ির চাকর এবং চাকরানি। এমনকী এ-বাড়ির পোষ্য বেড়াল বুঁচিও গোলমালের আভাস পেয়ে যূথিকার পায়ের কাছটিতে জড়োসড়ো হয়ে বসে থেকে সম্ভবত পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে। শুভ্রাকে দেখে বুঁচির পিঙ্গল চোখদুটো বুঝি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনুষ্যেতর

প্রাণীদেরও কি ইনস্‌টিংকট কাজ করে? বুঁচি যেন বুঝে নিয়েছে এখন হাওয়া খারাপ। এখন এ-বাড়ির দিদিমণির কাছে ঘেঁষা বারণ।

একপলক শুভ্রাকে সবাই যেন চোখ দিয়ে পরখ করে নিল। পরনে বেনারসি। ব্লাউজ। দু-হাতে কয়েকগাছা করে সোনার চুড়ি। দু-হাতের কয়েকটি আঙুলে আংটি। কানে সোনার গোলপানা মাকড়ি। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। মুখমণ্ডলে চন্দনের ফোঁটাগুলো অবশ্য দ্যাখা যাচ্ছে না। সেসব আজ কাকভোরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বার আগেই শুভ্রা মুছে ফেলেছিল। হাতের নতুন চামড়ার স্যুটকেশটা সে পায়ের কাছে নামিয়ে রেখেছে। মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। কপালের সিঁদুরের টিপ ধেবড়ে গেছে। অপরাধীর মতন মুখ মাটির দিকে নামিয়ে দালানের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্রা। যূথিকা এগিয়ে গিয়ে তার হাতদুটো ধরলেন। স্নেহের স্বরে বললেন—আয় মা আয় ঘরে আয়। কী হয়েচে? এভাবে চলে এলি কেন? লোকে যে ছি ছি করবে! তোর বাবা-মা এই তো এসে পৌঁছল। আজ বিকেলেই তো ওরা তোকে দেখতে যেত। কী এমন হল যে পালিয়ে এলি প্রভাবে। যাই হোক সেসব কতা পরে শুনব। এখন ঘরে আয়। চোখে-মুখে জল দে। পেছন থেকে একেবারে সামনে এগিয়ে এসে নীরদবরণ বজ্রকঠিন স্বরে বললেন—দাঁড়াও, ওসব জল-টলের কথা পরে। আগে আমি জানতে চাই তুমি পালিয়ে এলে কেন? তুমি আজ যা করেছ তাতে মুখুজ্যেবাড়ির সম্মানে কালি লেগেছে! হাউ ডেয়ার ইউ? এভাবে একা একা পালিয়ে আসার সাহস কোথা থেকে এল তোমার? শুভ্রা এবার মুখ তুলে তাকাল দাদুর দিকে। তার চোখে কোনও ভয় ছিল না। কণ্ঠস্বরে জড়তাও ছিল না। অকম্পিত স্বরে সে দাদুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল—আমি অনেকবার তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি আমার অপছন্দের কথা। তুমি কান দাওনি। এমন কী গতকাল দুপুরেও আমি তোমাকে বলেছি আমাকে ও-বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে। তুমি আমার কথাও কান দাওনি। তাই আমি নিজেই পালিয়ে এলাম। ও-বাড়িতে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। শুভ্রার কথাগুলো সুনীতির বুকে যেন ধক্ করে এসে লাগল। বিশ্বদেবের দিকে চকিতে একবার তাকাল সে। শুভ্রার কথাগুলো শুনে নীরদবরণের ফর্সা মুখ রাগে আক্ষরিক অর্থেই লাল হয়ে উঠল। বোমা ফাটার মতন তিনি ফেটে পড়লেন—তোমার অপছন্দটাই কি সব নাকি? তুমি যে এ তো ছেলেমানুষ তা তো বুঝিনি! সংসারের কতকগুলো নিয়মকানুন আছে। সামাজিকতা বলে একটা বস্তুও আছে। আমি তোমাকে অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তুমি শুনতে চাওনি। তুমি যে এতটাই ইমম্যাচিওর তা তো বুঝিনি? আমার শিক্ষা-দীক্ষা কোনওকিছুই দেখছি তুমি নিতে পারোনি। ওয়ার্থলেস! ফুল! বেরিয়ে যা তুই এ-বাড়ি থেকে। তোর মুখ দেখতে চাই না আমি ...। গেট আউট আই সে! ...

শুভ্রা কাঁপছিল। আবেগে কিংবা রাগে। রক্তবর্ণ চোখে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে। তার ঠোঁটদুটি কাঁপছে। এখনই কি সে ভেঙে পড়বে? নাহ ভেঙে পড়ল কোথায়? অদ্ভুত জেদি মেয়ে সে। স্যুটকেশ ঝপ্ করে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শুভ্রা অস্ফুটে বলল—ঠিক আছে। এ বাড়িতে যখন জায়গা নেই আমি চলেই যাচ্ছি। তবে মেমারিতে ওদের বাড়িতেই আমি ফিরব না। নাতনির বাক্য শুনে যূথিকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—ওমা কোতায় যাবি লো? তোর কি মাথাটা বিগড়ে গেচে নাকি? ...স্বামীর দিকে ফিরে হাউমাউ করে তিনি বললেন—ওগো তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কী কতা বলচ খেয়াল আচে? অতো দূর থেকে মেয়েটা এভাবে চলে এলো ... আগে কী হয়েচে ওর মুখে সব বেত্তান্ত শুনবে তো? তুমি ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো? ... আয় মা আয় ... ঘরে আয় ... ওরকম রাগ করতে নেই। কী হয়েচে বল দিকিনি আমাকে ...।

একগুঁয়ের মতন ঘাড় গুঁজে শুভ্রা বলল—নাহ এ বাড়িতে আমার জায়গা নেই। এখানে আমি আর থাকব না।

এবার যেন কথা বলা সমীচীন বোধ করল বিশ্বদেব। এগিয়ে এসে সে শুভ্রার স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে একজন চাকরকে ডেকে বলল—এটা রেখে দিয়ে এসো ভেতরের ঘরে।

তারপর শুভ্রার দিকে তাকিয়ে তার বাবা বলল—নাটক-নভেল পড়ে পড়ে তোমার মাথাটাই তো বিগেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। লাইফ ইজ নট ফিকশান। ইটস হার্ড রিয়ালিটি। যাঁরা তোমাকে দিনের পর দিন নাটক-নভেল পড়িয়ে গেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। ... এই কথাগুলো বিশ্বদেব নীরদবরণকে ঠেস্ দিয়ে বলল। নীরদবরণ খোঁচাটা অনুভব করেননি তা নয়। কিন্তু এখন তিনি কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। বিশ্বদেব যূথিকা আর সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল--সুবুকে ভেতরের ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আগে ও একটু রেস্ট নিক তারপর সব কথা শোনা যাবে। সুবু যাও—মা আর দিদুর সঙ্গে ঘরে যাও। সেই মুহূর্তে শুভ্রা যেন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারল না। বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল—বাবা আমি ঐ কালো ছেলের সঙ্গে থাকতে পারব না। কিছুতেই না! দাদু আমার কথা শোনেনি। জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে!

—কালো ছেলে?—বিশ্বদেব অবাক চোখে তাকাল শ্বশুরের দিকে।

যূথিকা বললেন—ওগো ওসব কতা এখন থাক। আগে মেয়েটা মুখে জল-টল দিক।

সুনীতি বলল—আয় মা ঘরে আয়। কোনও চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বোগাস! ডিসগাসটিং!—বলতে বলতে চটি ফটফটিয়ে নীরদবরণ সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে উঠতে লাগলেন।

এরপর বহুক্ষণ সারা বাড়ি থমথমে হয়ে রইল। রান্নাঘরে যূথিকা নেই। সুনীতিও নেই। আর ক্ষীরোদের স্ত্রী আভা তো তাই গত সাতদিন বাগবাজারে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। এমনকি শুভ্রার বিয়ের ব্যাপারটা সে টেলিফোনে শুনেছে মাত্র। শ্বশুর এবং স্বামীর সঙ্গে তার মেমারিতে ভোজ খেতে যাওয়া হয়নি। রাঁধুনিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যূথিকা একতলার ঘরে বড় মেয়ে এবং জামাইয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে শুভ্রার মুখে বিয়ের ব্যাপারে তার আপত্তির কথা শুনছেন। শুনে যে খুব স্বস্তি পাচ্ছেন তা নয়। এসব কী বলছে মেয়েটা? নাতজামাইয়ের গায়ের রং কালো আর বাড়িতে পায়খানা নেই, মাঠে পায়খানা করতে যেতে হয়; —শুধু এই কারণে নাতনি ফুলশয্যার পরের দিন সকালে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে পালিয়ে এলো এতটা রাস্তা? এ তো শুনেই ভয়ে তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। ওগো এ কী ডাকাবুকো মেয়ে গো? এতটা রাস্তা একা আসতে বুক কাঁপল না ভয়ে? যদি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ত তাহলে কী না হতে পারত! আর এভাবে পালিয়ে আসাটাও কি ঠিক হল? এরপর শ্বশুর-বাড়িতে মেয়েটা মুখ দেখাবে কীভাবে? নাতজামাই তো শোনা গেছে খুব বিদ্বান মানুষ। সে আবার স্ত্রীকে নেবে তো? একী বিপদে পড়া গেল! যূথিকা ভয় পাচ্ছিলেন। একজন অভিজ্ঞ নারী হিসেবে তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ নীরদবরণের উদ্বেগের কারণ যেন সম্যক উপলব্ধি করতে পারছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে তখনই শুভ্রা এবং তার বাবা-মায়ের সামনে মুখ খুলতে চাইছিলেন না যূথিকা। তিনি বরাবরের নির্বিরোধী, শান্ত মানুষ। শুধু দৈনন্দিন সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। আর তেমন কোনও সাতে-পাঁচে থাকেন না। তার ওপর বড়-জামাইকে যূথিকা যেন একটু ভয়ও করে চলেন। নীরদবরণের মতন বিশ্বদেবেরও বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব আছে এমন মানুষদের যূথিকা যেন একটু ভয় পান, এড়িয়ে চলেন।

অবশ্য যেসব কথা ভাবছিলেন যূথিকা সেসব কথাই হঠাৎ মেয়ে এবং স্বামীর সামনে সুনীতিই বলে ফেলল। এ কারণেই বড় মেয়েকে তিনি অন্য সব সন্তানের থেকে বেশি পছন্দ করেন। এ মেয়ে ঠিক তার মায়ের মতন। নিজেকে সংসারের ঘেরাটোপের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পছন্দ করে। যূথিকার মতনই চুপচাপ, কষ্টসহিষ্ণু। সুনীতির ভাবনাচিন্তার গতিও যেন যূথিকার মুখ চেয়ে চলে। সুনীতি বেশি কথা বলে না বটে, কিন্তু আজ তো বলল! শুভ্রা যখন কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলছিল যে, সে মেমারিতে শ্বশুরবাড়িতে কিছুতেই ফিরে যাবে না তখন সুনীতি তার হাতটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে কোমলভাবে বলল মেয়েকে—কিন্তু মা সবই তো বুঝলুম। কিন্তু এটা তুই কী করলি?

—কী করলাম মা?

—এ বাড়ির মেয়ে হয়ে তুই শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এলি? এ তো আমি কল্পনাও করতে পারি না মা ...!

—আমি ও বিয়েতে মত দিইনি মা। দাদু জোর করে আমাকে—

—সে যাই হোক। বিয়ে যখন হয়েচে তখন তো তোমাকে শ্বশুরঘরেই থাকতে হবে মা। আর কোথায় যাবে তুমি? আমাদের কাচে এসে তুমি কিছুদিনের জন্যে থাকতে পারো কিন্তু আবার তো সেই স্বামীর কাচেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে ...।

—ফিরে যেতে হবে মানে? জোর-জবরদস্তি নাকি? ঐ কেলে লোকটাকে আমি স্বামী-টামি হিসেবে মানতে পারব না। এই আমি জানিয়ে দিলাম!

—সুবু ভদ্রভাবে কতা বলবি! আমরা মেয়েবা স্বামীর সম্বন্ধে খারাপ কতা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে ভয় পাই। তুমিও আর করবে না। অসভ্যতার একটা সীমা আচে।

—তুমি কি বলতে চাইছ মা?

—এটাই বলতে চাইছি যে, তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়াবে না। আর চানটা সেরে নাও। তারপর খেতে দিচ্চি খেয়ে নাও। ঘুমিয়েও নাও একটু। অনেক ধকল গেচে তোমার শরীরের ওপর দিয়ে। তারপর বিকেলে আমাদের সঙ্গে মেমারিতে যেতে হবে তোমায়। শ্বশুরবাড়িতে আমরাই রেখে আসব তোমাকে। জামাইকে আশীর্বাদ করে আসব। বেয়াই আর বেয়ানের সঙ্গে আলাপটাও হয়ে যাবে।

সুনীতি এই কথা বলতে পারার কারণে যূথিকা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই কথাগুলো তো তিনিও বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন কোথায়? সুনীতি যেভাবে গুছিয়ে কথাগুলো বলতে পারল যূথিকা সেভাবে পারতেন না। কিন্তু সুনীতি তো পেরেছে। তাইলেই হল। ওরকম গুণী নাতজামাই কালা না গোরা তাতে কী আসে যায়? পুরুষমানুষের আবার রং। পুরুষমানুষের শরীর-স্বাস্থ্য আর গুণটাই হল আসল। এই কচি মেয়েটা আজ সেটা বুঝছে না। একদিন ঠিকই বুঝবে। আপাতত যূথিকা মেয়ের কথার অনুসরণেই নাতনির দিকে তাকিয়ে বললেন—যা মা—চানটা করে কিছু খেয়ে নিবি চল। আহা গো, ওরকম চাঁদপানা মুখ একেবারে শুকিয়ে গেচে!

কিন্তু তারপর যা ঘটল সবাই চমকে উঠল। শুভ্রা হঠাৎ কীরকম উন্মাদিনীর মতন ব্যবহার শুরু করল। তার চোখদুটো ঘুরছিল বনবনিয়ে। নিঃশ্বাস পড়ছিল জোরে জোরে। ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ দেখাচ্ছিল। নিজের দুই হাত মুঠি করে শুভ্রা তার মাথায় ঘুসি মারছিল আর কীরকম গোঙানির মতন করে বলছিল—আবার যদি আমাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও তোমরা তাহলে ... তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে তোমরা ... আমি গলায় দড়ি দেব কিংবা আগুনে পুড়ে মরব!

—সুবু! কী বলচিস পাগলের মতন! —সুনীতি তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠল। যূথিকা নাতনির রুদ্র মূর্তি দেখে থরথর করে কাঁপছিলেন। সুনীতি বিশ্বদেবের দিকে তাকিয়ে বলল—ওগো তুমি এখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো! কিছু করো ... কিছু একটা বলো! হ্যাঁগো আমাদের ওরকম ফুটফুটে মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল? একী সর্বনাশ হল গো আমাদের? —সুনীতি এবার আর স্থির থাকতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না সবসময়েই সংক্রামক। মেয়েকে কাঁদতে দেখে যূথিকাও কেঁদে ফেললেন। বিশ্বদেবের যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরল। সে শান্ত করার চেষ্টা করছিল মেয়েকে। বলছিল—সুবু এই সুবু! ওরকম করছিস কেন মা? আমরা তো আছি। তোর এত ভয় কীসের? —নিজের মেয়েকে পরম স্নেহে প্রায় বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল বিশ্বদেব। ধীরে ধীরে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল আর আবেগ-কাঁপা স্বরে বলছিল—সুবু ও সুবু! অত রাগছিস কেন মা? তুমি কত বড হয়েছ, কত বড় বড় বই পড়েছ, তোমার শিক্ষা-দীক্ষা আছে। তুমি এরকম ব্যবহার করলে তো আমরা খুব কষ্ট পাব মা ...।

কান্না-ভেজা স্বরে শুভ্রা বলল—বাবা তুমি আমাকে কেন এখানে রেখে গিয়েছিলে? আমি না হয় সেই বিদেশে সেই গাড়োলের দেশেই থাকতাম। তোমরা কেউ আমাকে একটুও ভালবাসো না। দাদু-দিদাও আমাকে ভালবাসে না ... না হলে ওরকম একটা কেলে বরের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়?

বিশ্বদেবের মনে হচ্ছিল তার মেয়ে সেই দশ বছর আগেকার ছোট্ট অবুঝ খুকি হয়েই আছে। তার বয়স বাড়েনি। তার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই হয়নি। বিশ্বদেবও তো আবেগপ্রবণ মানুষ। সে তাই প্রাণপণে মেয়েকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল—আর তোকে ছেড়ে থাকব না রে মা। এবার তুই আমাদের সঙ্গে ঝালদাতে থাকবি।

—নিয়ে যাবে বাবা আমাকে ঝালদাতে? সত্যি? এখন সত্যিই একটা বাচ্চা মেয়ের মতন ব্যবহার করছিল শুভ্রা। গালে অশ্রু রেখা, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল—সত্যি নিয়ে যাবে বাবা ঝালদাতে? কবে যাবে?

—এইতো যাব কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে যাবো। তুই যাবি, আমাদের জামাইও যাবে।

এই কথা শুনে শুভ্রা যেন আবার ফুঁসে উঠল।

—জামাই? ও গেলে আমি যাব না বাবা!

—কেন যাবি না মা? —তুই তো এখন ম্যারেড। জামাইয়ের সঙ্গে ছাড়া তোর কি এখন একা একা কোথাও যাওয়া উচিত?

—আমি ওর সঙ্গে কোথাও যাব না বাবা ...

—কেন মা?

—ও তো রাক্ষসের মতন কালো।

—কালো তো আমিও মা। ... তোমার মা ফর্সা। কিন্তু আমি তো কালো?

—তুমি কিছুই কালো নও। সেই ভূতটাকে তুমি দেখেনি!

—সুবু! —সুনীতি ধমকে উঠল; —আবার ওরকম অসভ্যের মতন কতা বলচিস? শুভ্রা ঠান্ডা চোখে মায়ের দিকে তাকাল।

—যা বলছি ঠিক বলছি মা! তোমরা জেনে রাখো। ঐ লোকটার সঙ্গে আমি কোনওদিনই একসঙ্গে থাকব না।

—ওমা এ কী অলক্ষুণে কতা গো! বিয়ে হয়েচে একসঙ্গে থাকবি না মানে? এতক্ষণ বাদে

যূথিকা কথা বললেন ;—ওরকম বলতে নেই মা। ওরকম জেদ করতে নেই। মেয়েমানুষদের অনেককিছু মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয়। ওরে প্রথম প্রথম ওরকম মনে হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে তাদের স্বামীরাই তো সব। স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কী আচে?

যূথিকার এসব কথা কানে ঢুকছিল না যেন শুভ্রার। সে রাগত চোখে সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল—আবার যদি ওদের বাড়িতে আমাকে পাঠাও আর ঐ লোকটার সঙ্গে একঘরে আমাকে থাকতে হয় তাহলে আমার মরা মুখ দেকবে তোমরা এই আমি বললাম। শুভ্রার মুখ থেকে এই কতা শুনে সুনীতি চমকে তাকাল। যূথিকা গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। ক্ষীরোদ ছুটে ঘরে এসে বলল—কী হল কী আবার? কান্নাকাটি কীসের? দাদাবাবু তুমি চুপ করে বসে আছ?

সুনীতি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বদেব বলল—আর কোনও তর্কাতর্কি নয়। অনেক হয়েছে। এবার কিন্তু আমি সত্যিই চেঁচামেচি শুরু করব। সারারাত ট্রেন জার্নির ধকল গেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে আমার পক্ষে...। শুভ্রা যেন তার বয়সটা ভুলে গেছে। এগিয়ে এসে বিশ্বদেবকে জড়িয়ে ধরে বলল—বাবা আমি ওদের বাড়িতে আর ফিরে যাব না। তোমার কাছে থাকব।

—আচ্ছা মা তাই হবে।—বিশ্বদেব মেয়েকে বলল।

—ওগো এসব কী বলচ তুমি?—সুনীতি যেন আর্তনাদ করে উঠল ;—ওকে ওরকম প্রশ্রয় দিয়ো না। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না? বাবা-মায়ের কাছে থাকবে? না বাপু এসব আমার মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না।

স্ত্রীর প্রতি বিশ্বদেব ভীষণ রুষ্ট হয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিশ্রিভাবে বলল—আহ থামো তো! সুবুর ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও! তোমাদের এসব নিয়ে কথা বলতে হবে না।

স্বামীর ধমক খেয়ে সুনীতি যেন কীরকম জড়োসড়ো হয়ে গেল। আর যূথিকাও কথা বাড়াতে সাহস করলেন না। নিজের স্বামীকে তো তিনি ভয় করেন। জামাইয়ের সঙ্গেও বেশি কথা বলতে সাহস পান না। কখন কী বেফাঁস বলে ফেলেন। স্বামী আর জামাই দুজনেরই তো হিটলারি মেজাজ।

বিশ্বদেব মেয়েকে স্নেহের সুরে বলল—সুবু মা তুমি চান করে খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নাও। তোমাকে দেখে খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে।

—বাবা আমাকে ঝালদাতে নিয়ে যাবে তো?

—হ্যাঁ মা যাব। এখন যা বলছি করো। তোমার রেস্ট দরকার।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ্বদেব সিঁড়ি ধরে উঠে লাগল।

ক্ষীরোদ জানতে চাইল—দাদাবাবু এখন একটা দাবার গেম হয়ে যাবে নাকি?

বিশ্বদেব বলল—পাগল নাকি? দেখছ ঘরে আগুন জ্বলছে এখন দাবা খেলব?

—তাহলে এখন কোথায় চললে? তোমার তো চান সারা হয়ে গেচে?

—তা হয়েছে বটে। কিন্তু এখন আমাকে বোঝাপড়া করতে হবে।

—বোঝাপড়া? কার সঙ্গে?

—বাবু নীরদবরণ মুখুজ্যের সঙ্গে।

—হয়ে গেল!—ক্ষীরোদ বলল ;—এবার ভীম আর দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ শুরু হবে।...ওহ্ আজ কার মুখ দেকে উঠেছিলুম। যূথিকা অস্ফুটে হাহাকারের সুরে বললেন—হে মা! এ কী গন্ডগোল শুরু হল গো আমার বাড়িতে?

একষট্টি

উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিশ্বদেব সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বড় ঘরে উঠে দেখল, নীরদবরণ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর চোখ ঘরের কড়িকাঠের দিকে স্থির। কপালে কুঞ্চন। খুবই চিন্তান্বিত মনে হ'ল তাঁকে। কিন্তু বিশ্বদেদের এখন ওসব দিকে মনোযোগ দেবার মতন মানসিক অবস্থা নেই। সে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। নীরদবরণ তখনও তাকে দেখতে পাননি। তাই দুবার গলা খাঁকারি দিল বিশ্বদেব। নীরদবরণ তাকালেন। তাঁর কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল।

—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ। বলতেই এসেছি।—বিশ্বদেবের গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। যদিও সে প্রাণপণে নিজেকে সাহসী করে তুলতে চাইছে। শ্বশুরের ঐ বানানো ব্যক্তিত্বের সামনে সে আর কুঁকড়ে থাকবে না। সে আজ যা মুখে আসে তাই বলবে লোকটাকে। শুভ্রার এই ক্ষতি কেন করলেন উনি। কী দরকার ছিল ভালভাবে খোঁজখবর না নিয়ে রাতারাতি মেয়েটাকে ওভাবে পরের হাতে গছিয়ে দেওয়ার? কী এমন অসুবিধে হচ্ছিল নীরদবরণের মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখার জন্যে? যদিবা অসুবিধে হচ্ছিল, উনি তা বিশ্বদেবকে বললেন না কেন? সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেব বড়মেয়েকে নিয়ে যেত। রাখত নিজের কাছে ঝালদায়। সেটা করলেই বোধহয় ভাল হত। এভাবে নীরদবরণের স্বেচ্ছাচারিতার কিংবা হঠকারিতার শিকার হতে হত না মেয়েটাকে। এখন এই যে অশান্তিতে পড়ল সবাই, তার জন্যে কে দায়ী? কে আবার ডোরাকাটা স্লিপিং-স্যুট পরনে মেকী সাহেব সেজে থাকা ঐ অহঙ্কারি লোকটাই এসব অশান্তি আর কেলেঙ্কারির জন্যে দায়ী। বিশ্বদেব তাঁকে আজ আর রেয়াত করবে না।

—কী বলতে চাও?—ইজিচেয়ারে নিজের শরীরটাকে একটু তুলে সোজা হয়ে বসলেন নীরদবরণ।

—বলতে চাই যে, আপনি কাজটা ভুল করেছেন।

—মানে....হোয়াট ডু ইউ মিন?

—মেয়েটা আমার। আপনার কী অধিকার আছে আমার সঙ্গে আলোচনা না করে, আমাকে না জানিয়ে, আমার কনসেন্ট না নিয়ে আপনি ওর বিয়ে দিয়ে দিলেন? আপনি নিজেকে কী ভাবেন? এই বিয়েটা দিয়ে আপনি অন্যায় করেছেন।...ইট'স আ গ্রেট ব্লান্ডার....পারহ্যাপস দি হিমালয়ান ব্লান্ডার।

বিশ্বদেবের এই কথাগুলো শুনে নীরদবরণের দারুণ ক্রোধে ফেটে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে সংযত রাখলেন। অভিজ্ঞ তো তিনি কম নন। তিনি বুঝতে পারছেন যে, পরিস্থিতি অন্যরকম। এইসব ছেলেছোকরারা সেসব বোঝে না। অবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করার মতন মানসিক পরিণতি এবং ধৈর্য এদের আছে নাকি? আজকালকার ছেলেছোকরারা অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। উত্তেজিত হয়ে দু-কথা শুনিয়ে দেয়। নীরদবরণ ভুল করেছেন—এতবড় অভিযোগ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর শত্রুও করতে পারবে না। বিশ্বদেব তো কোন ছার! এখুনি বোমার মতন ফেটে পড়ে তিনি বিশ্বদেবকে ভয় পাইয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে নীরদবরণ অতি মৃদু স্বরে বললেন—আমি ভুল করেছি এরকম তোমার মনে হল কেন?

—ভুল নয় তো কী? যে মেয়ে বাইরের লোকের কাছে তো নয়ই এমন কী ঘরের লোকের কাছেও মুখ তুলে কথা বলতে চায় না কিংবা সাহস করে না, সেই মেয়ে ফুলশয্যার পরদিনই

একবস্ত্রে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এল! এ তো অবিশ্বাস্য! নিশ্চয়ই ঐ শ্বশুরবাড়ি ওর স্যুট করছে না?

—শ্বশুরবাড়ি স্যুট করছে না?—এই কথাটার পুনরাবৃত্তি করে নীরদবরণ ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।—বাংলাদেশের মেয়েরা আজকাল বোধহয় শ্বশুরবাড়ি স্যুটেবল মনে না করলেই সেখান থেকে পালিয়ে আসে? আচ্ছা, কথা শোনালে তুমি যা হোক! ঐ মানভূমে কুলি-কামিন আর বিহারীদের সঙ্গে থেকে থেকে তোমারও বুদ্ধিশুদ্ধি দেখছি ওদের মতন হয়ে যাচ্ছে...।

—সুবু যে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে তার আর কী কারণ থাকতে পারে? ও অন্যভাবে মানুষ। আপনার কাছে থেকেই ওর নাক উঁচু হয়ে গেছে। দু-পাতা ইংরেজি পড়তে শিখিয়ে আপনি দেখছি ওর ভাল কিছু করেননি। ক্ষতিই করেছেন। ওরকম সফিসটিকেটেড স্বভাবের মেয়ে কখনও মেমারির মতন ধ্যাড়ধাড়া গোবিন্দপুরের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে? বিয়ে দেবার আগে এসব আপনার ভাবা উচিত ছিল। আপনি ভাবেননি। না ভেবেই আপনি আমার মেয়েকে ওদের হাতে গছিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটা সেখানে একরাতও কাটাতে পারল না। সেখানকার পরিবেশ এতটাই বিশ্রি। এটা আপনার ভুল ছাড়া কী বলব?

—বিশ্ব তুমি কিন্তু অভিযোগগুলো বাস্তব অবস্থাটা না বুঝেই করে যাচ্ছ। সতীশবাবুদের বাড়ি আমি গেছি। তাদের মাটির বাড়ি হতে পারে, যদিও দোতলা বাড়ি। ওদের ইলেকট্রিসিটি নেই সেটাও মানছি। কিন্তু ওদের বাড়ির পরিবেশ এতটা মিজারেবল নয় যে সুবু একটা রাতও কাটাতে পারবে না। তুমি নিজে যাও ওদের বাড়ি। নিজের চোখে দেখে এসো। তুমিও নিশ্চয়ই কনভিনসড হবে যে সতীশবাবুরা গ্রামের অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত এবং যথেষ্ট ভদ্র।

—তাহ'লে মেয়েটা এভাবে পালিয়ে এল কেন? এক ধরনের ডেসপারেসন থেকে ও এই কাজ করেছে এটা বুঝতে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধে হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হ'ল—হোয়াই শি হ্যাজ অ্যাক্টেড সো ডেসপারেটলি? তাহ'লে কি জামাই ওর সঙ্গে কোনও কারণে খারাপ ব্যবহার করেছে? আর আমার অভিমানী মেয়েটা সে কারণেই অত দূর থেকে এভাবে পালিয়ে আসতে পেরেছে?....সামথিং ইজ ডেফিনিটলি রং দেয়ার....তাছাড়া এরকম হতে পারে না।

—বিশ্বদেব তোমাকে একটা কথা বলি। সেটা শুনে তুমি আবার কিছুক্ষণ আগে যেরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে সেরকম উত্তেজিত হয়ে পড়বে না তো?

—কী কথা বলতে চান?

—বলতে চাই যে, আমাদের সুবু-মা বোধহয় নিজেই একটু অ্যাবনরম্যাল! শি ইজ অ্যান অ্যাপল অব মাই আইজ... কিন্তু তবুও এ কথাটা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি।

—কী বলছেন?.... সুবু অ্যাবনরম্যাল?

—হ্যাঁ বিশ্বদেব, সুবু তোমার মেয়ে। সে আমার নাতনিও। একেবারে ছোট থেকে ও আমার কাছেই মানুষ! শুনলে তোমার হয়তো রাগ হতে পারে। তোমার ইগোতে লাগতে পারে। তবুও আমি তোমাকে বলছি সুবুর ধাত যতটা চিনি তুমি বোধহয় তা চেনো না। কিন্তু বিয়ের পর আমিও ওকে দেখে অবাক হচ্ছি। আমিও বুঝতে পারিনি ওর মধ্যে এ-ধরনের অ্যাবনরমালিটি গ্রো করেছে। আমি দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

—আপনি কী বলতে চাইছেন খুলে বলুন। আমার মেয়েকে আপনি এভাবে ব্লেম দেবেন এসব আমি মেনে নিতে পারব না।

—সুবু শ্বশুরবাড়ি থেকে কেন পালিয়ে এসেছে—তা কি জানো?

—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ওর ভাল লাগেনি।

—মোটেও তা না।....আই হ্যাভ স্টাডিড হার। আই নো দ্য রিজন।

—কী কারণ বলুন?

—মনীশকে সুবু-র পছন্দ হয়নি। তার কারণ মনীশের গায়ের রং কালো। ভূ-ভারতে এরকম কথা কেউ শুনেছে? প্রথম থেকেই ও এই কথা আমাকে বলে আসছে। আমি প্রথমে পাত্তা দিইনি। হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি। ভেবেছি এসব ছেলেমানুষের মনের বিকার। কিন্তু তারপর ব্যাপারটা আমি সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হয়েছি। এরকম শুনেছ কখনও? যে মানুষের গায়ের রং কালো বলে সবকিছু তার খারাপ। মনীশের গুণগুলো ও দেখল না? কত রিজনেবল ছেলে! ধীর, স্থির, ভদ্র। এডুকেটেড। হাইলি এডুকেটেড? আজকের দিনে চট করে ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তুমি পাবে? সুবু-র তো কোনও ফরম্যাল এডুকেশান নেই। মনীশ তো আরও শিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। তাই না? বি. ই. কলেজ থেকে পাস করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হলে মনীশ কত বড় চাকরি পাবে একবার ভেবে দেখেছ? এর পরও তুমি বলতে পারবে আমি তোমার মেয়ের ক্ষতি করেছি? জাস্ট বি রিজনেবল বিশ্বদেব।....বি রিজনেবল অ্যান্ড থিংক অব দ্য প্রস অ্যান্ড কনস্ অব দ্য ম্যাটার।

এতক্ষণ কথা বলতে বলতে দৃশ্যত নীরদবরণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। আর উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে তিনি সামনের চৌকো টি-টেবল থেকে পাইপটা তুলে নিলেন আবার। পাইপে নতুন তামাক ভরে ধরিয়ে নিলেন। আর বিশ্বদেবও হঠাৎ গুম হয়ে গেছে। কিছু যেন ভাবছিল সে। তার মুখ রীতিমতো চিন্তামগ্ন।

গলার স্বরে কিঞ্চিৎ প্রফুল্লতা মিশিয়ে নীরদবরণ বললেন—ওয়েল ইয়াং ম্যান ইউ লুক ওরিড। দিস ইজ নট দ্য টাইম অব থটস; দিস ইজ দ্য টাইম অব অ্যাকশনস।

—তাহলে আমার এখন কী করা উচিত?

—তোমার কী করা উচিত?.....নীরদবরণ তাকালেন বিশ্বদেবের দিকে।—তুমিই ভেবে নাও তোমার কী করা উচিত.....।

—আপনি ওভাবে বলছেন কেন? ক্রাইসিসে পড়লে আপনার অ্যাডভাইস তো আমরা নিয়ে থাকি.....

—কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে সবাই যেন আমাকে দোষারোপ করছে....

—দেখুন একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই। আপনি যেমন নিজেকে স্ট্রেটফরওয়ার্ড মনে করেন আমিও তেমনি নিজেকে মনে করি। আমি এখনও বলছি আমার এবং আপনার মেয়ের কনসেন্ট না নিয়ে একদিনের নোটিশে সুবুর বিয়ে দেওয়াটা আপনি ঠিক কাজ করেননি। কিন্তু যা হয়ে গেছে বারবার তার পোস্ট-মর্টেম করে তো কোনও লাভ নেই। এখন বলুন এই পরিস্থিতিতে মেয়ের বাবা হিসেবে আমার কী করা উচিত?

—মেয়েকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো উচিত। ওর মাথা থেকে এই আইডিয়া তাড়িয়ে দেওয়া উচিত যে, চেহারাতে হ্যান্ডসাম হলেই মানুষ কাজে-কর্মে হ্যান্ডসাম হয় না। মানুষের বিদ্যা, মেধা, ভদ্রতাবোধ, দায়িত্ববোধ, সততা এসবই হল আসল কথা। এখন সুবু এক ধরনের ইলিউশনের মধ্যে আছে। ইমিডিয়েটলি ওর এই ইলিউশন ভেঙে দিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে। ও যখন বুঝতে পারবে মনীশ ছেলেটা খারাপ নয়, তখনই ওর ম্যাচিওরিটি প্রকাশ পাবে। তার আগে নয়—নেভার।

—আমি আর ওর মা সুবুকে নিয়ে আজ বিকেলেই তাহ'লে মেমারিতে রওনা হচ্ছি।

—দ্যাট উইল বি আ ভেরি গুড ডিসিসান। নীরদবরণের পাইপ থেকে ঝলকে ঝলকে ধূম্র উদগীরণ হচ্ছে। সারা ঘর কড়া তামাকের গন্ধে ম ম করছে। একটু স্মোক করার জন্যে বিশ্বদেবেরও মন আনচান করছিল। কিন্তু এখানে তো তা সম্ভব নয়। একতলাতে বৈঠকখানায় বসতে হবে। ক্ষীরোদ অনেকক্ষণ থেকে ঘুরঘুর করছে। দাদাবাবুর সঙ্গে বসে ধূমপান করবে। দাবাও চলবে কিছুক্ষণ। বিশ্বদেব এ-বাড়িতে এলে ক্ষীরোদই বোধহয় সবথেকে বেশি খুশি হয়। খুব আড্ডাবাজ মানুষ ক্ষীরোদ। বিশ্বদেবকে সে প্রাণের কথা মনের কথা খুলে বলে। কলকাতায় এলেই দাদাবাবুকে নিয়ে ক্ষীরোদ কলকাতায় থিয়েটার দেখতে যাবে। তারপর স্যাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট ওড়ানো তো আছেই। কিন্তু এবারে যা পরিস্থিতি তাতে তো এখনও ক্ষীরোদের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা দেবার মতন মনের অবস্থা নেই।

—তাহ'লে তোমরা কখন রওনা হবে? সেইমতো আমি গাড়িটাকে আসতে বলব।—নীরদবরণ জানালেন।

—এই ধরুন খাওয়াদাওয়া করে দুপুর একটা নাগাদ.....বিশ্বদেবের কথা শেষ হ'ল না। তার আগেই এ-ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং........নীরদবরণ এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন।

—হ্যালো...?

বিশ্বদেব উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

নীরদবরণ বলছিলেন—হ্যাঁ সতীশবাবু বলুন বলুন...নমস্কার।

....অ্যাঁ আপনি মেমারি থানা থেকে ফোন করছেন?....আরে না না অত দুশ্চিন্তা করবেন না।.....শি ইজ আ মিয়ার চাইল্ড.....একেবারে ছেলেমানুষ! আমাদের জন্যে খুব মন কেমন করেছে আর স্যুটকেশ নিয়ে পিটটান দিয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ... রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার করেছে মেয়েটা! খুব ডাকাবুকো আছে কী বলেন? না না অন্য কোনও ব্যাপার নয়। ম্যাটার ইজ ভেরি সিম্পল।.... হ্যাঁ আপনার বউমা নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছেছে। ভোরবেলার ট্রেন ধরে চলে এসেছে। ভেরি ড্রামাটিক। যা হোক আমরা ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওর বাবা-মা আজ সকালে আমার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। ওরাই ওদের মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে। ...কী বললেন? ...একটু জোরে বলুন, ঠিক শুনতে পাচ্ছি না। বউমার বাবা-মাকে আসতে হবে না? তাহলে...

ঠিক এই মুহূর্তে ফোনটা কেটে গেল।

—ড্যাম গড!—নীরদবরণ আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। বিশ্বদেবের বুকটা ভয়ে কীরকম ঢিপঢিপ করছিল। কী বলছে সতীশবাবুরা?

সুবুকে আর ঘরে নেবে না বলছে নাকি? বিশ্বদেব বেশ ঘাবড়ে গেল। নির্বাক টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে নীরদবরণ ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করতে যাবে বিশ্বদেব এমন সময় আবার ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো... কে সতীশবাবু? ...হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন! ...কী বলছেন?....

মনীশ নিজেই আমাদের বাড়ি আসছে? অলরেডি রওনা হয়ে গেছে? সো কাইন্ড অব ইউ। আপনি কিছু ভাববেন না। ও প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আসছে তো? বিকেল চারটে নাগাদ পৌঁছবে? ঠিক আছে হাওড়া স্টেশনে আমার বড় ছেলে ক্ষীরোদ মনীশকে রিসিভ করবে। ওরা দুজনেই দুজনকে চেনে। আর মনীশকে এখন ছাড়ছি না। ও দুদিন আমার এখান থেকে যাক। বউকে নিয়ে কলকাতায় একটু ঘুরুক। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।.... আচ্ছা সতীশবাবু ঠিক আছে। আবার বলছি। আপনাদের মতো ভদ্র আর সজ্জন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পেরে আমি নিজেকে অনারড় মনে করছি।

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন নীরদবরণ। পাইপ বোধহয় একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল। বারবার না টানলে নিভে যায়। পাইপ আবার টেবিলে রেখে দিলেন নীরদবরণ। বিশ্বদেবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন—শুনলে তো? জামাই নিজেই আসছে সুবু-কে নিতে। এরকম ভদ্রতা আশা করতে পারো? ওরা যদি বলত ওরকম অসভ্য স্বভাবের মেয়েকে ঘরে তুলব না? অসভ্যতা করেনি কি ও? এভাবে ফুলশয্যার পরের দিনেই পালিয়ে আসা; ছি ছি ছি! যাই হোক জামাইকে আদর আপ্যায়ন করার জন্যে রেডি হও। আর পারো তো মেয়েকে বোঝাও।.... এখন ক্ষীরোদকে দরকার। ক্ষীরোদ....ও ক্ষীরোদ! ....নীরদবরণ হাঁকতে হাঁকতে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। ক্ষীরোদ একতলার একটা ঘরে একা বসে গ্রামাফোন রেকর্ডে কে এল সায়গলের গান শুনছিল। নীরদবরণের ডাক তার কানে পৌঁছতে গান বন্ধ করে ক্ষীরোদ সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে উঠে এল।

—কিছু বলছেন বাবা?—ক্ষীরোদ জানতে চাইল। তার পরনে ধুতি আর টুইলের শার্ট। গলায় একটা সরু সোনার হার চকচক করছে। আর তার টেরিটিও আজ এই রবিবারের সকালবেলাতেও বেশ বিন্যস্ত। যেন এখুনি সে কোনও বিয়েবাড়ির উৎসবে চলে যেতে পারে। ক্ষীরোদ সবসময়েই একটু সেজেগুজে ফিটফাট থাকতে ভালবাসে। সে থিয়েটারের লোক। মাঝে মধ্যেই থিয়েটারের পার্ট করে। তবে তা সবই পাড়ার থিয়েটার। কলকাতার থিয়েটারের স্টেজে অভিনয় করার একটা স্বপ্ন ছিল ক্ষীরোদের। ছিল কেন, এখনও আছে। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছে কোথায়? থিয়েটারের পাড়া এমনকী যাত্রাপাড়াতেও অনেক ঘুরেছে ক্ষীরোদ। যদি কোনও দলে ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু কোথাও তেমন সুযোগ পায়নি। ঐ-পুজো-পার্বণ উপলক্ষে পাড়ার থিয়েটারে ক্যারেকটারের রোলে অভিনয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ক্ষীরোদকে। এর একটা কারণ অবশ্য আছে। ক্ষীরোদকে দেখতে এমন কিছু খারাপ নয়। গায়ের রং ফর্সা। খুব একটা মোটা নয়। দোহারা চেহারা। মুখশ্রীও খারাপ নয়। কিন্তু মুশকিল হল, তার হাইট আর ভয়েস নিয়ে। ক্ষীরোদের উচ্চতা মেরে কেটে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আর সে প্রায় বামাকণ্ঠী। এরকম অ-পুরুষালী চেহারা নিয়ে সে থিয়েটারে আর কতদূর এগোতে পারবে? তবে ক্ষীরোদ অভিনয়টা খারাপ করে না। সাধারণত ফিমেল-পার্টেই তার অভিনয় ভাল খোলে। গত পুজোয় পাড়ার ক্লাবে 'থেটার' হয়েছিল 'সীতার বনবাস'। স্বয়ং সীতার রোলে ক্ষীরোদ যাকে বলে একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নীরদবরণ বড় পুত্রের এই অভিনয়ের নেশা এবং ক্ষমতাকে একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁর ধারণা ক্ষীরোদটা যে পড়াশোনায় বেশি দূর এগোতে পারল না আর জীবনে দাঁড়াতেও পারল না, তার অন্যতম কারণ হ'ল তার এই থিয়েটারের নেশা। ক্ষীরোদ কোনও চাকরি-বাকরি করে না। নীরদবরণই তাকে বউ-বাজারে একটা সাইকেলের দোকান করে দিয়েছেন। নিজে নামী- সাইকেল-কোম্পানির সেলস-ম্যানেজার হওয়ার সুবাদে তিনি দোকানে বেশি কমিশনে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম দামে মালপত্র, সাইকেলের স্পেয়ার-পার্টস সাপ্লাই দেবার ক্ষেত্রে ছেলেকে ভেতর থেকে ভালই সাহায্য করেন। যদিও দোকান চালাবার ব্যাপারে ক্ষীরোদের তেমন মন নেই। সপ্তাহের অর্ধেক দিনই সে দোকানে যায় না। দুজন কর্মচারী রেখেছে। তাদের দিয়েই কাজ চালায়। আর নিজে থিয়েটারের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ছেলেকে অপছন্দ করার এটাও একটা বড় কারণ নীরদবরণের কাছে। আজ অবশ্য ক্ষীরোদকে দেখে তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল না। বরং বেশ মোলায়েম স্বরে নীরদবরণ বললেন—এসো ক্ষীরোদ, বোসো ঐখানে। বিশ্বদেব কিছুক্ষণ আগে যে চেয়ারটাতে বসে শ্বশুরের সঙ্গে বাদানুবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল, সেটিকেই আঙুল দিয়ে দেখালেন নীরদবরণ। ক্ষীরোদ অবশ্য বসল না। বাবার মুখোমুখি সে পারতপক্ষে হতে চায় না। সামনাসামনি পড়লেই

তো শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ শুনতে হয় ক্ষীরোদকে। সুতরাং নীরদবরণের মৃদু নির্দেশকে তেমন পাত্তা না দিয়ে ক্ষীরোদ আবার বলল—আমাকে কি কিছু বলবেন?

—বলার জন্যেই তো ডেকেছি!.... ওরকম ডিসট্যান্ট লুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? যেন বাড়িতে যা ঘটছে সে ব্যাপারে তোমার কোনও ইনভলভমেন্ট নেই।

—যা ঘটছে তা এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে ঠিক যেন খেই রাখতে পারছি না। —ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে ক্ষীরোদ বলল। ছেলের এই কথায় নীরদবরণ বেশ কৌতুক অনুভব করলেন। যদিও মুখের গাম্ভীর্যে কোনও ভাবান্তর হল না।

—শোনো সুবু এখনও ইমম্যাচিওর। ও পাগলামি করছে। ওকে বোঝাতে হবে তোমাদেরই।

—ওর বাবা-মা তো বোঝাচ্ছে। মা-ও দেখলুম ওদের সঙ্গে আছে। —ও ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চা মেয়ে তো! অচেনা লোকজন, অচেনা পরিবেশ। তাই বোধহয় প্রথম প্রথম একটু ঘাবড়ে গেছে।

—কারেক্টলি সেইড! নীরদবরণ উত্তেজিতভাবে বললেন।

...আমিও ঠিক এটাই বলতে চাইছি। ছেলেমানুষ। একটা ভুল না-হয় করে ফেলেছে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই কথায় ক্ষীরোদ আর কী উত্তর দেবে? সে শুধু ঘাড় নাড়ল। শুধু এই কথা বলার জন্যেই কি তাকে নীরদবরণ ডেকেছেন?

—শোনো তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি...।

—কী কাজ? —ক্ষীরোদ ভেতরে ভেতরে চমকাল। দায়িত্ব-টায়িত্ব সে একেবারেই নিতে চায় না।

—তোমাকে এখুনি একবার বাজার যেতে হবে।

—এই তো কিছুক্ষণ আগে বাজার থেকে ফিরলুম।

—আবার যেতে হবে। ভাল মাছ, দই, মিষ্টি এসব আনতে হবে। সুবুর হাজব্যান্ড মনীশ আসছে এ-বাড়িতে। কয়েকদিন থাকবে।...থাকুক। সুবু-র সঙ্গে একটু ফ্রিলি মেলামেশা করুক। ওদের দুজনের মধ্যে কমিউনিকেশন আর আনডারস্ট্যান্ডিংটা ভাল হওয়া দরকার। তুমি তো খুব থিয়েটার দেখে বেড়াও। ওদের দুজনকে আগামিকাল একটা থিয়েটারে নিয়ে যাও। স্টারে কী চলছে?

—দেনা-পাওনা। শিশির ভাদুড়ির দারুণ অ্যাকটিং।

—হ্যাঁ। সেটাই দেখাবে। শিশির ভাদুড়ি অ্যাকটিংটা খারাপ করে না। আর এখন বাজার থেকে মাছ নিয়ে এসো আবার বেশি করে। একটু বেলা হয়ে গেছে। ভাল মাছ পাওয়া যাবে?

—যেতে পারে। গলদা চিংড়ির সাপ্লাই আজ ভাল। আমি এক কেজি এনেচি। দাদাবাবুরা এসেচে বলে। তাহলে আরও এক কেজি আনি?

—ইয়েস। আর ভীম নাগের দই আর সন্দেশ।

—ঠিক আছে।

ক্ষীরোদ মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। বাজার করতে তার খুব ভাল লাগে। বাজারের টাকা থাকে যূথিকার কাছে। ক্ষীরোদ মায়ের থেকে টাকা নিল। তারপর বাজারে বেরিয়ে গেল। বেরোবার সময় দেখল, সুবুকে হাত নেড়ে নেড়ে কীসব বলছে বিশ্বদেব। সুনীতি আবার রান্নাঘরে ঢুকেছে। ক্ষীরোদের যেমন বাজার করার নেশা। সুনীতির তেমনই রান্নার নেশা। ইতিমধ্যে সারা বাড়িতে সবাই জেনে গেছে যে, নতুন জামাই আসছে। থাকবে কদিন।

এ বাড়িতে প্রথম এসে মনীশ দৃশ্যত বেশ খুশি। এত আদর-যত্ন যে পাওয়া যায় তার ধারণাই ছিল না। শুধু স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ হল না। মনে হচ্ছিল যেন, শুভ্রাই তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে। একবারও জিজ্ঞেস করা হ'ল না বউকে যে একা একা এতটা ট্রেন-জার্নি করে আসতে তার কি এতটুকু ভয় করল না? কিন্তু একান্তে কথা বলার সুযোগ পেলে তবে তো? দোতলার যে ঘরে মনীশ বিশ্রাম নিচ্ছিল সেখানে একবার কী একটা কাজে এসেছিল বটে শুভ্রা। মনীশের বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। এবার কি দু-একটা কথা বলা যাবে? কিন্তু মনীশ তার কোনও সুযোগই পেল না। ঝাঁ করে একবার ঘরে ঢুকে তাক থেকে কী একটা জিনিস নিয়েই শুভ্রা আবার বেরিয়ে গেল। উঠে গিয়ে তাকে সম্বোধন করার কোনও সুযোগই পেল না মনীশ। কেন এরকম করছে মেয়েটা? মনীশ তাকে অন্তত দু-একটা ভালবাসার কথা বলতে চায়। জানাতে চায় যে, সে মেমারি থেকে পালিয়ে এসেছে বলে তারা কেউ কিছু মনে করেনি। মনীশের মা, মনোরমা অবশ্য বেশ রাগারাগি করেছেন। মেয়ের স্বভাব-চরিত্র ভাল না এরকম মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু সতীশবাবু স্ত্রীকে অনেক করে বুঝিয়েছেন। দাদুর অত্যন্ত আদরের নাতনি বলে হয়তো ওরকম করে ফেলেছে। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনীশও আস্থা হারায়নি। তার ধারণা এই পাগল-পাগল বউকে সে ঠিকই ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনতে পারবে। শুধু যা সুযোগের অপেক্ষা। নীররবরণের কথামতন অনেকে একসঙ্গে স্টার-এ 'থেটার' দেখতে যাওয়া হল। ক্ষীরোদ, বিশ্বদেব, শুভ্রা আর মনীশ। সুনীতিকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল ক্ষীরোদ। কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। মা অর্থাৎ যূথিকার সঙ্গে বিকেলে বসে বসে সুনীতি নাকি জামাই আর অন্য সকলের জন্যে লেডিকেনি আর চন্দ্রপুলি বানাবে। থিয়েটারটা বেশ ভালই। শিশির ভাদুড়ির অভিনয় মনীশ আর শুভ্রা দুজনেই প্রথম দেখল। তারা মুগ্ধ। তারপর হাতিবাগানে দ্বারিক ঘোষের দোকানে রাধাবল্লভী, ছোলার ডাল আর মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফেরা। তারপর যূথিকা আর সুনীতির তত্ত্বাবধানে আবার একপ্রস্থ ভোজন।

রাত বাড়লে সকলে শুতে গেল। মনীশ যে ঘরে শুয়েছে সেখানে মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে সুনীতি পাঠিয়ে দিল। তারপর বিশ্বদেব আর সে চওড়া খাটের বিছানায় কাঠ হয়ে একবুক উদ্বেগ নিয়ে শুয়ে রইল। আবার মেয়েটা কী পাগলামি শুরু করে! শুভ্রা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর মিনিট পনেরো কেটে গেল। সব নিঃশব্দ। সুনীতি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল। সারাদিন বড্ড খাটাখাটুনি গেছে। ঘুমও চলে এল চোখে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল ছিল না সুনীতির। হঠাৎ বোধ করল যে বিশ্বদেব তাকে ঠেলছে, ডাকছে! ধড়মড় করে উঠে বসল সুনীতি।

—কী হল গো?

—শুনতে পাচ্ছো?—চাপা স্বরে বিশ্বদেব বলল।

—কী?

—শোনো না। সুবু কীরকম গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করচে....!

—চেঁচামেচি করছে? ওমা কেন?—সুনীতি কান পেতে শুনল। হ্যাঁ ঠিকই। শুভ্রা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

.....বেরোও....বেরিয়ে যাও তুমি! ....কেলটে ভূত কোথাকার! শুধু আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা না? আমার সঙ্গে একেবারে অসভ্যতা করার চেষ্টা করবে না তুমি! যাও আমি এ-ঘরে শোব না। আমি বোন আর ভাইদের সঙ্গে শোব!

সুনীতি আর বিশ্বদেব মশারি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল দালানে আলো জ্বলছে। নীরদবরণ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ উদ্বেগে যেন রক্তশূন্য...!

বাষট্টি

দোতলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটিতে শুভ্রা আর মনীশের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ঘর থেকেই গভীর রাতের নৈঃশব্দ খানখান করে শুভ্রার গলা বারবার ভেসে এসে সবাইকে যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছিল।—যাও বেরিয়ে যাও এ-ঘর থেকে! আমি জানি ঠিক আবার অসভ্যতা করবে! বেহায়া লোক কোথাকার! শুধু গায়ে হাত দেবার চেষ্টা। যাও—বেরিয়ে যাও!...আচ্ছা ঠিক আছে আমিই চলে যাচ্ছি! —এরকম চেঁচাতে চেঁচাতে শুভ্রা নিজেই ছুটে এগিয়ে চলে এল। আলুথালু বেশবাস! শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। কীরকম উন্মাদিনীর মতন লাগছিল তাকে। বিশ্বদেব আর দেরি করল না। এগিয়ে গিয়ে দু-হাত চেপে ধরল শুভ্রার।

—কী হল রে মা! ওরকম করছিস কেন?

—বাবা আমি ঐ অসভ্য লোকটার সঙ্গে একঘরে থাকব না। কিছুতেই না! যদি জোর করে আমাকে ওর ঘরে আবার পাঠাও তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে এই আমি বলে দিলাম.....।

—হ্যাঁরে এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে? তুই তো এরকম অসভ্য ছিলি না? কী হয়েছে? ঐ লোকটা ঐ লোকটা কাকে বলছিস? ও তো তোর স্বামী!

—স্বামী বলে আমি ওকে মানি না!....কেলটে ভূত!

—সুবু তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস!—সুনীতি বেশ জোরে ধমকে উঠল। —মনীশের সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েচে। তুই ওকে ওভাবে দুর ছাই করতে পারিস না!

—আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েচি? তোমরা জোর করে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছ।

—বিয়ের সময় এভাবে আপত্তি জানাসনি কেন? তখন তো বেশ ভাল মেয়ের মতন সুড়সুড় করে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলি। কেন? এখন তো এরকম অসভ্যতা করে তুমি পার পাবে না।—এই কথাটা বলল বিশ্বদেব। সে রীতিমতো রেগে গেছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন।

—আমি অনেক আপত্তি করেছি। দাদু শোনেনি। আমি আর কত আপত্তি করব? তোমরা আমার মা-বাবা। তোমরাই তো আমার কাছে ছিলে না। নিজের মেয়েকে তোমরা দিনের পর দিন মামার-বাড়িতে রেখেছ কেন?

—এর পরও কি আপনি বলবেন যে, মেয়েটার ভাল বিয়ে দিয়েছেন?—নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে বিশ্বদেব বলল। এই প্রশ্নের সামনে নীরদবরণ যে খুব একটা ভড়কে গেলেন তা নয়। তিনি আশ্চর্য শীতল স্বরে বললেন—দোষটা আমার নয়। বিয়েরও নয়। দোষটা তোমার মেয়ের। এতদিন ওকে নিজের হাতে মানুষ করেছি। ওর মধ্যে যে এতটা অ্যাবনরমালিটি আর একসেনট্রিসিটি আছে তা কোনওদিন বুঝিনি। তোমরা বারবার বললেও আমি মেনে নিতে পারব না যে, আমার সিলেকশান কিংবা আমার ডিসিসান ভুল হয়েছে। আমি লজ্জা পাচ্ছি মনীশের কথা ভেবে। সে বেচারীর মনের অবস্থা কীরকম একবার বোঝার চেষ্টা করো। বিশ্বদেব তুমি তো মেয়ের কথাই শুধু শুনছ; মনীশের কথা তো শুনলে না? বলতে বলতে নীরদবরণ বারান্দা দিয়ে হেঁটে দক্ষিণ দিকের ঘরের সামনে গেলেন। তাঁর পরনে সিল্কের স্লিপিং-গাউন। যূথিকা কী করবেন বুঝতে না পেরে কাঁদতে বসে গেলেন। সুনীতি মেয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কীসব কথা বলছিল। সম্ভবত বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর অবশ্য-কর্তব্য বিষয়ে মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল। একতলার একটি ঘরে ক্ষীরোদ একা শোয়। এটা বাড়িতে বেশি লোকজন চলে আসার কারণে অস্থায়ী ব্যবস্থা। দোতলার দক্ষিণ প্রান্তে ক্ষীরোদ আর আভার ঘরটিই আসলে মনীশদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী নেই। তাই ক্ষীরোদ একতলার ঘরে একা শুয়েছে। তারও ঘুম পাতলা। তাই চেঁচামেচি শুনে

সে নিজেও উঠে এসেছে দোতলায়। একতলার আর একটি ঘরে নীরদবরণ আর অসিতবরণ দু-ভাই পাশাপাশি শোয়। তাদের ঘুম অবশ্য ভাঙেনি।

ঘরের সামনে এসে অনিশ্চিতভাবে নীরদবরণ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ঠিক পেছনেই বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদ। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে ঘরে আলো জ্বলছে। নীরদবরণ মৃদুভাবে ডাকলেন—মনীশ বাবা মনীশ! প্রথমে সাড়া পেলেন না। কয়েক মুহূর্ত বাদে অবশ্য মনীশ বেরিয়ে এল। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা আর গেঞ্জি। বিশ্বদেব তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। একটা সতেজ গাছকে কুড়ুলের কোপ দিলে যেমন বিবর্ণ হয়ে যায় ঠিক সেরকম লাগছিল তাকে। সে এসে দাঁড়াল নীরদবরণের সামনে। মিনমিন করে বলল—আমি যে কী দোষ করেছি বুঝতে পারছি না।.... ও যে কেন আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে। আমার অপরাধ হল আমার গায়ের রং কালো। মানুষকে দেখতে কেমন হবে সে ব্যাপারে কি মানুষের কোনও হাত আছে? —বলুন? বিশ্বদেব কী বলবে বুঝতে পারছিল না। যদিও সে কিছু বলাব আগেই নীরদবরণ বললেন—তোমার কোনও দোষ নেই। সব দোষ আমাদের মেয়ের। দিস ইজ ভেরি আনফরচুনেট। কিন্তু তবু তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে মনীশ। অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। সুবুর এই পাগলামি—পারমানেন্ট কিছু নয়। এটা টেমপোরারি ফেজ। তোমাকে বোঝাতে হবে ওকে। আমরাও বোঝাবার চেষ্টা করছি। তুমি আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকো মণীশ। আমরা সুবুকে বুঝিয়ে এ-ঘরে পাঠাবার চেষ্টা করছি। তুমি কিছু মনে কোরো না। লাইফ ইজ নট আ বেড অব রোজেজ। জীবনে এরকম সমস্যা হবে। আবার সমাধানও পাওয়া যাবে।

—আমার মনে হয় ভোরবেলাতেই আমি বাড়ি ফিরে যাই। আপনাদের মেয়েকে আপনারা বোঝান। ও যখন ইচ্ছে করবে তখনই না হয় যাবে। —মনীশের স্বর এই প্রথম কীরকম বেসুরো লাগল।

বিশ্বদেব তাড়াতাড়ি বলল—না না ভোরবেলাতেই চলে যাবে কেন? বেলা হলে খাওয়াদাওয়া করে যাবে। আর একা ফিরে যাবে কেন? সুবুও যাবে। আমি সুবুকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি এ-ঘরে।

ক্ষীরোদ ফস্ করে বলল—কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে কর্ণার্জুন পালটাতে বেজায় ভিড় হচ্ছে। চলো মনীশ আমরা সবাই আজ বিকেলে ওটা দেখে আসি। তারপর পরশুদিন সুবুকে নিয়ে তুমি মেমারি ফিরে যাবে।

মনীশ উত্তর দিল না। নীরদবরণ কটমট করে তাকালেন ক্ষীরোদের দিকে। যার মন যেখানে ছোটে। এই মাঝরাতে ক্ষীরোদের পালাগানের কথা মনে এল! আর কী হবে? রাস্কেলটার আর কোনও ভাবনাচিন্তা আছে নাকি? শুধু বাড়িতে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে আর 'থেটার' দেখে বেড়াবে?

বিশ্বদেব আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ঘরের মাঝখানে মনীশ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আহা বেচারা! বিশ্বদেবের মনে হল সত্যিই ছেলেটা অতি ভদ্র এবং বিনয়ী। শিক্ষার ছাপও ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট। বিশ্বদেবেরও কিন্তু মনীশকে এক নজর দেখেই বেশ পছন্দ হয়ে গেছে। সুবু কিন্তু ভাল স্বামীই পেয়েছে। কিন্তু কেন যে ও এমন খাপছাড়া ব্যবহার করছে! গায়ের রং কালো এটা কোনও ব্যাপার নাকি? বড় জীবনের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন সংসারজীবন যাপনের ক্ষেত্রে এগুলো কি ম্যাটার করে? সুবু ভুল করছে! অসভ্যতা করছে! ওকে বোঝাতে হবে। যদি না বোঝে তো জোর খাটাতে হবে। নতুন বিয়ে হয়েছে, কোথায় এই গভীর রাতে বরের পাশে শুয়ে একটু খুনসুটি করবে, বরের আদর খাবে; তা নয় কী পাগলির মতো আচরণ করছে মেয়েটা! শুধু শুধু নিজের জীবনকে জটিল করে তুলছে। সেই সঙ্গে অন্যদেরও চিন্তা আর উদ্বেগে ফেলে দিচ্ছে।

নাহ, এসব মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্বদেব দেখল নীরদবরণ ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে চলেছেন। শাশুড়িকে দেখতে পেল না। সম্ভবত তিনি নাতনিকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। বিশ্বদেবেরও তাই করা উচিত। এখনই পাঠিয়ে দেওয়া উচিত সুবুকে জামাইয়ের কাছে। জামাইয়ের পা ধরে ক্ষমা-টমা চেয়ে নিতে হবে ওকে। তারপর আর কী কী করতে হবে সেটা ওকে বুঝে নিতে হবে। সব মেয়েই ওসব ঠিক সময়ে বুঝে যায়। ক্ষীরোদ যেন বিশ্বদেবের চিন্তাস্রোত উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে নিচু স্বরে বলল—চলুন দাদাবাবু, আমরা সবাই মিলে সুবুকে বোঝানোর চেষ্টা করি। সত্যিই ও বড় অবুঝপনা করছে....। —তাই চলো ক্ষীরোদ—। দোতলার যে ঘরে বিশ্বদেব আর সুনীতির শোবার ব্যবস্থা হয়েছে সেই ঘর এখন হাউসফুল বলা যায়। শুভ্রা খাটের একধারে দাঁড়িয়ে আছে আর তাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে সুনীতি এবং যূথিকা। এখন বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদ এসে ঢুকল এ-ঘরে। বিশ্বদেব আর নিজের মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। চেঁচিয়ে বলল—সুবু তুমি যে এত অসভ্য মেয়ে তৈরি হয়েছ তার খোঁজ যে আমি রাখিনি কেন সেটা ভেবেই আমার আপসোস হচ্ছে।

—কী অসভ্যতা করেছি আমি?—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে শুভ্রা বাবার মুখের দিকে তাকাল।

—সেটা কি আমাকে নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে?

—হ্যাঁ বলতে হবে। একটা মেয়ের জীবন নিয়ে তোমরা এভাবে ছিনিমিনি খেলবে তা তো আমি মেনে নিতে পারি না!

সুনীতি বলল—আস্তে কথা বল সুবু.....বাবার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে?

বিশ্বদেব বলল—ছিনিমিনি খেলা মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আমার মত না জেনে দাদু আমাকে ওদের হাতে গছিয়ে দিয়েছে।

এবার ক্ষীরোদ বলল—গছিয়ে দিয়েছে মানে? এ-বাড়িতে বাবাই হল সবথেকে বিচক্ষণ মানুষ। তিনি যা করেছেন ঠিক করেছেন। ঘটক লাগিয়ে অনেক সম্বন্ধ করে বিয়ে দিলেও হয়তো মনীশের মতন এত শিক্ষিত জামাই পাওয়া যেত না। দাদু ভালো বুঝেই এ বিয়ে—

—যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আমার পছন্দের ব্যাপারটা তোমরা একেবারেই পাত্তা দিতে চাইছ না। এটা অসভ্যতা নয়?

যূথিকা বললেন—বাবা! মেয়ের কতা শোন! তুই তো এভাবে কতা বলতিস না সুবু! ও ক্ষীরু তুই একটা ওঝা ডাকার ব্যবস্থা কর বাবা! এ মেয়েকে ভূতে ধরেচে.....।

—বোঝো ঠ্যালা!—ক্ষীরোদ বলল;—এতো দেকচি জল অন্য খাতে গড়িয়ে যাচ্ছে! এর মধ্যে আবার ভূত-টুত ঢুকে গেল কেন?

শুভ্রা সত্যি পাগলির মতনই দু-পাশে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল আর সমানে বলছিল—ঐ কেলে মিনসের সঙ্গে আমি থাকব না থাকব না থাকব না! ওর সঙ্গে আমি এক বিছানায় শোব না শোব না শোব না....।

বিশ্বদেব এগিয়ে এসে আচমকা চুলের মুঠি ধরল মেয়ের। তারপর রাগে গরগর করে বলল—আবার যদি জামাইকে কেলে মিনসে বলবি তো চুল টেনে উপড়ে নেব! আর এক মুহূর্তও এ ঘরে থাকা অ্যালাও করব না আমি। যা এখুনই ও ঘরে মনীশের সঙ্গে শুতে যা! এর ফলে আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। এরপর শুভ্রার যে চেহারা দেখল সবাই তা তারা কোনওদিনই দেখেনি। জোর করে, এক ঝাপট দিয়ে বিশ্বদেবের মুঠো থেকে নিজের চুল ছাড়িয়ে নিতে চাইল শুভ্রা। এত জোরে ঝাঁকানি দিল যে, তার অত সুন্দর চুলের ঝাড় থেকে কিছু চুল বিশ্বদেবের হাতে বসে গেল। আর কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই শুভ্রা দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগল।

সুনীতি আর্তনাদ করে উঠল—কোথায় যাচ্ছিস? ওরে ও সুবু! মেয়ে কি পাগল হয়ে গেল না কিরে বাবা?

—তোমরা যদি এভাবে জোর করো তাহলে আমি গলায় দড়ি দেব.... গলায দড়ি দেব! —উঁচু গলায় বলতে বলতে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ক্ষীরোদ যে ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল শুভ্রা। সুনীতি মাথা ঠুকতে লাগল দরজায়। ডুকরে কেঁদে উঠে ভাঙা স্বরে বলতে লাগল—ও সুবু দরজা খোল মা! ওরকম করতে নেই। স্বামী যেরকমই হোক তাকে মেনে নিতে হয়।...আচ্ছা ঠিক আছে তোকে কেউ জোর করবে না। তুই আর আমি পাশাপাশি শোব। তারপর যখন তোর ইচ্ছে হবে তুই জামাইয়ের কাচে যাবি।

—ওগো তুমি কোতায়? একবার এসো। আমাদের সুবু গলায় দড়ি দিচ্চে....! যূথিকা চেঁচিয়ে নীরদবরণকে ডাকছিলেন। নীরদবরণ কান যেন পেতেই ছিলেন। যূথিকার ডাকে আর চেঁচামেচির বহর দেখে তিনি সম্ভবত চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। নীচে নেমে এসে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছিলেন একটানা—সুবু দরজা খোল মা! তোকে মেমারি যেতে হবে না। তুই এ বাড়িতেই থাকবি। কোথাও যেতে হবে না তোকে। আমি কথা দিচ্ছি। আয়াম গিভিং ইউ মাই ওয়ার্ডস।

এত হই-হট্টগোলের ফলে বাড়ির সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে এসেছে বারিদবরণ আর অসিতবরণ। এ-বাড়ির চাকর-চাকরাণীরাও ঘুম থেকে উঠে উঁকিঝুঁকি মারছে। একতলাতে নেমে এসেছে মনীশও। তার মুখ ফ্যাকাশে। চোখের দৃষ্টিতে অস্থিরতা। আর বিশ্বদেবের যেন মনে হল, মনীশের আয়ত দুই চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। হঠাৎ তার মনীশের জন্যে খুব দুঃখ হল। সত্যিই বিশ্বদেবের মনটা হু-হু করে উঠল মনীশের কথা ভেবে।

তেষট্টি

এরপর কী হ'ল? অনেক কিছুই হ'ল। অশান্তি হ'ল অনেক। সেসব কথা বিশদভাবে বলে আর কী হবে? সংক্ষেপে বলি। সেদিন রাত থেকে সেই যে গোঁ ধরল শুভ্রা, যে সে কিছুতেই মনীশের সঙ্গে ঘর করবে না; তাকে কেউ নড়াতে পারল না। নীরদবরণ, বিশ্বদেব, যূথিকা, সুনীতি কেউ চেষ্টার ত্রুটি রাখল না শুভ্রাকে বোঝাতে। কিন্তু তার মাথায় তখন বিচিত্র এক পাগলামি চেপেছে। হ্যাঁ, পাগলামিই তো, অস্বাভাবিকতাও বলা যায়। আদর করে যখন নানা বই পড়তে দিতেন নীরদবরণ তাঁর নাতনিকে মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর 'সুবু' অনেক পড়াশোনা করবে, রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী হয়ে উঠবে, বউ হয়ে যে বাড়িতে যাবে, সেই বাড়িতে সুখ-শান্তি উপচে পড়বে; তখন কি একবারের জন্যও তিনি ভেবেছিলেন যে, মেয়ের ভিতরে আসলে এক ধরনের অস্বাভাবিকতার বীজও গোপনে বেড়ে উঠছে? নীরদবরণ পন্ডিত মানুষ। অনেক বইপত্র পড়েছেন। কত ইংরেজি কেতাব তিনি ঘাঁটলেন; মনস্তত্ত্বের কত বই। কিন্তু শুভ্রার এই মানসিক অসুস্থতা বিষয়ে কোনও বই আলোকপাত করতে পারল না। অফিসে ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন এরকম কোনও মানসিক রোগের কথা তিনি শুনেছেন কিনা। ম্যাকেঞ্জি সব শুনে-টুনে গুম হয়ে বসে ছিলেন বহুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে ইংরেজিতে জানালেন যে, ইংরেজ মেয়ে পুরুষদের ব্ল্যাকদের প্রতি একধরনের অসহিষ্ণুতা, অপছন্দ আছে বটে; কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার; —দ্যাটস অ্যা রেসিয়াল এ্যাভারসান; ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে বা বেঙ্গলিদের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ নট অ্যাপ্রোপিয়েট।

একদিন ম্যাকেঞ্জির বাড়িতে পানভোজনের আয়োজন হয়েছিল। শুধু দুজন। ম্যাকেঞ্জি নিজে আর নীরদবরণ। মদের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আর রোস্টেড হ্যাম খেতে খেতে শুভ্রার ব্যাপারটা নিয়ে কথা হচ্ছিল। ম্যাকেঞ্জি বললেন যে, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লেখাপত্র পড়ে দেখতে পারেন নীরদবরণ। মানুষের যৌনবাসনাকে ভিত্তি করে তার মনের জটিল অলিগলি কিংবা গোলোকধাঁধাঁর বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রয়েড। কালো মনীশের প্রতি শুভ্রার সেই ভয়ংকর ঘৃণার কারণ ফ্রয়েডের রচনার মধ্যে নীরদবরণ পেলেও পেয়ে যেতে পারেন। তখন নীরদবরণ ম্যাকেঞ্জিকে জানিয়েছিলেন যে, ফ্রয়েডের অনেক রচনা তিনি পড়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তর জানতে পারেননি। তখন ঘাড় নেড়ে ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন—ইয়েস আই আনডারস্ট্যান্ড...দ্য প্রবলেম অব ইওর গ্র্যান্ডডটার ইজ সামথিং এক্সট্রা অর্ডিনারি। পারহ্যাপস ইট ইজ অ্যা ইউনিক কেস বাই—ইট সেলফ।...এনিওয়ে হাউ ইজ শি লিভিং নাও? ম্যাকেঞ্জির এই প্রশ্নটাই নীরদবরণের মনের যন্ত্রণা আবার বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজকাল তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন। তীব্র এক অপরাধবোধে ভোগেন। চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি দুটো জীবনে অশান্তি ডেকে আনলেন। শুভ্রার জীবনে। আর মনীশের জীবনে। দুজনের কাছেই যেন তিনি সংকুচিত হয়ে থাকেন। ওদের মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে পাবেন না। আর তাকাতে পারেন না নিজের মেয়ে-জামাই সুনীতি আর বিশ্বদেবের দিকে। সুযোগ পেলেই বিশ্বদেব আজকাল তাঁকে কথা শোনায়। বলে—আপনি আমার মেয়ের জীবন নষ্ট করলেন। শুধু আমার মেয়ের জীবন কেন, মনীশের জীবনও। ওরা দুজনে কোনওদিনই একসঙ্গে থাকতে পারবে না।

মনীশ হয়তো দু-চার বছর অপেক্ষা করার পর আবার কোথাও বিয়ে করে নেবে। কিন্তু সুবু-কে বাড়িতেই পুষতে হবে আমাকে। কে ওকে বিয়ে দেবে? একবার বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েকে আবার কীভাবে বিয়ে দেব আমি? ও তো আর বিধবা নয়। আমাদের নিজেদের জীবনও ছারখার হয়ে গেল। বাড়িতে বিবাহিত মেয়ে পুষে রেখে কোনওদিন শান্তি পাব আমি? নীরদবরণ একসময় ভেবেছিলেন বিশ্বদেবকে পরামর্শ দেবেন আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ঠুকে দিতে। যে স্বামী-স্ত্রী একরাতও সহবাস করেনি; এক ঘরে এক ছাদের নীচে রাত কাটায়নি; তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই তো হয়। কিন্তু মুখ ফুটে জামাইয়ের কাছে প্রকাশ করতে পারেননি। সেই কথা। তাছাড়া কোর্ট-কাছারিতে অনেক ঝামেলা। পাড়া-প্রতিবেশীরা জেনে যাবে, আত্মীয়স্বজনরা জেনে যাবে; সে আর এক কেলেঙ্কারি। সুতরাং অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি। শুধু বিশ্বদেব আর নীরদবরণের মধ্যে তিক্ততা বেড়েই গেছে। এখন নীরদবরণের মনে হয়, সেই বিয়ের রাতে কাটোয়ায় অপরেশের বাড়িতে ওরকম একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত বোধহয় না নিলেই ভাল হত। পান-ভোজনের আসরে পরপর কয়েক পেগ স্কচ উড়িয়ে দেবার পর জড়ানো স্বরে নীরদবরণ বন্ধু তথা বস্ ম্যাকেঞ্জিকে নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন—দিস ডেজ আই সাফার—ট্রিমেনডাসলি সাফার ফরম আ সেনস অব গিলট....।

—হোয়াই?...হোয়াই ইউ থিংক ইওর সেলফ টু বি রেসপনসিবল ফর দ্য ডিসঅ্যাসটার?

—বিকজ ইট ওয়জ আই হু টুক দ্য ডিসিসান। ইট ওয়জ আই হু ম্যারেড মাই গ্র্যান্ড ডটার টু দ্যাট ব্ল্যাক বয়।

কিন্তু বারবার ম্যাকেঞ্জির কাছে বা সংগোপনে নিজের কাছে অপরাধ স্বীকার করলেই কি আর অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতিদিন হাওড়ার বাড়িতে অশান্তি যেন লেগেই রইল। একদিন সতীশবাবু মেমারি থেকে নীরদবরণের বাড়ি এসে খুব অপমান করে গেলেন। তার আগে অবশ্য আরও কিছু ঘটনা আছে। মনীশ অনেক ধৈর্য ধরেছিল। চেষ্টা করেছিল শুভ্রাকে

বোঝাতে যে সে ভুল করছে। সেদিন রাতের পাগলামির পরও মনীশের আশা ছিল শুভ্রার বোধোদয় হবে। সেই কারণেই সে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে না গিয়ে আরও দুদিন রয়ে গেল নীরদবরণের বাড়ি। কিন্তু তাতে অবস্থার উন্নতি কিছুই তেমন হল না। সারাদিন শুভ্রা মনীশকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগল। কখনও সে রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকে। মা-এর কাছে গিয়ে আবদার করে বলে যে, সে নতুন কোনও একটা রান্না শিখবে। সুনীতি উৎসাহিত হয়ে বিপুল উদ্যমে মেয়েকে রান্না শেখাতে লেগে যায়। তার সঙ্গে চলে ফিসফিস করে তার উপদেশ। সুনীতি বলে—ওরকম ব্যবহার করতে আচে মা? স্বামীই তো মেয়েদের সব রে! সে কালো হোক আর ধলা হোক। বিয়ের পর স্বামী ছাড়া মেয়েদের কী আচে? আমরা আর কতদিন? দাদু—দিদু কদিন? আমরা না থাকলে তোকে কে দেকবে? তখন তো মনীশই তোকে দেকবে রে? এসব একটু বুঝতে চেষ্টা কর মা? তুমি এখন বড় হয়ে গেছ। স্বামীকে সোহাগ দিয়ে ভারিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে তবে না? তোর আদর-সোহাগ পেলে মনীশ বেচারা বর্তে যাবে। ছেলেটা খুব ভালো সুবু। ওর চোখ দুটোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। আর অসভ্যতা করবি না সুবু? আজ থেকে মনীশের সঙ্গে একঘরে ঘুমোবি?

—ছাড়ো তো মা?...তারপর কী বলো? চিংড়ি মাছের মালাইকারিতে আর কী কী উপকরণ লাগবে? তেল, মশলা, গরমমশলার ফোড়ন আর যেন কী?

—ওমা ভুলে গেলি? নারকেল কুরো?—সুনীতি মেয়েকে বলে। শুভ্রার কৌশল সরল সুনীতি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শুভ্রা আসলে কথার অভিমুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সে কোনও প্রতিশ্রুতিতে যায় না। সুনীতিও রান্না শেখাবার উল্লাসে কখন যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। মেয়ে নিজে থেকে রান্না শিখতে চাইছে এটা তো বেশ ভাল কথা। উপাদেয় সব রান্না করে মনীশকে খাওয়াবে তবে তো মনীশের টান বাড়বে। স্বামীকে নিজের বশে আনার এর থেকে ভাল কৌশল তো সুনীতির জানা নেই।

শুভ্রার যখন রান্নাপাঠ চলে, মনীশ একা একা দোতলার ঘরে বসে ক্লান্ত হ'য়ে যায়। পরদিন সোমবার। সকাল ন'টা নাগাদ অফিসের গাড়ি আসে। স্যুট-টাই-শোভিত নীরদবরণ গট্‌মট্ করে অফিসে বেরিয়ে যান। বারীদবরণ চলে যায় কলেজে। সে প্রেসিডেন্সি কলেজে জীববিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছে। খুবই ভাল ছাত্র। ম্যাট্রিকে হাওড়া জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে তার স্কুল থেকে সোনার মেডেল পেয়েছে। আর সকলের ছোট অসিতবরণ এখনও স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি। দু-বছর বাকি আছে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে। অসিতবরণও সাড়ে দশটা বাজলে স্কুলে বেরিয়ে যায়। বিশ্বদেব কোন্ এক বন্ধুর বাড়ি গেছে। তাহলে মনীশ কার সঙ্গে কথা বলবে? সে দোতলার ঘরে বসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকার পুরনো একটা সংখ্যাব পাতা উলটে যাচ্ছিল বেজার মুখে, এমন সময় ক্ষীরোদ ঢুকল ঘরে।

—কী বাবাজীবন কী করচ?

—এই আর কী...মনীশ হাতের বইটার দিকে ইঙ্গিত করে। বোঝাতে চায় যে সে কিছু একটা পড়ছিল। ক্ষীরোদ একবার আড়চোখে পত্রিকার দিকে তাকায়।

—ওহ মডার্ন রিভিউ?...রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এডিটর? বাপরে? যা দাঁতভাঙা ইংরেজি? আর কী সব শক্ত শক্ত প্রবন্ধ। দুর দুর?—ক্ষীরোদ ফস্ করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। দেশলাইকাঠিটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দেয়। ক্ষীরোদ সিগারেট ফোঁকে আর ভাবে এই ছেলেটাকে, মানে এ-বাড়ির জামাইকে কি সে সিগারেট অফার করবে? ক্ষীরোদের অত বড় ছোট বাচবিচার নেই। সে মানসিকভাবে খুবই আধুনিক।

—তুমি স্মোক করবে?

—আজ্ঞে নাহ। মনীশ লজ্জা পায়। আমি স্মোক করি না। কিন্তু ওর ঠোঁটে হালকা-কালো প্রলেপ দেখেই ক্ষীরোদ বলে দিতে পারে যে মনীশ ধূমপানে অভ্যস্ত। আর শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হয়ে সিগারেট খাবে না? আরও কত কী খায় কে জানে?...এবার কী কথা বলা যায়? সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ভাবে ক্ষীরোদ। আসলে তার এখন সময় কাটাবার সমস্যা। এক একরৈখিক আলস্যময় জীবন ক্ষীরোদের। এ বাড়ির কাজ বলতে সে যেটা করে সেটা হল বাজার। খুব মন দিয়ে বাজার করে ক্ষীরোদ। এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে কতরকম জিনিসপত্তর যে কিনে আনে। মুখে স্বীকার না করলেও নীরদবরণ পর্যন্ত ক্ষীরোদের বাজার করা পছন্দ করেন। বাজার করে ফেরার পর অনেকটা সময় ক্ষীরোদের কিছু করার থাকে না। বই-কাগজ পড়ার ধৈর্য তার নেই। সে বেরিয়ে যায় তাসের আড্ডায়। তারপর বেলা করে বাড়ি ফিরে, চান-মধ্যাহ্নভোজন সেরে গড়পড়তা বাঙালির প্রিয় দিবানিদ্রা সেরে নেয়ে। তারপর বিকেলের দিকে বউ-বাজারে দোকানে গিয়ে বসে। দোকানে চুপচাপ বসে থাকা ক্ষীরোদের একেবারেই পছন্দ নয়। সাইকেল আর পার্টসের দোকান। খারাপ চলে না। নীরদবরণের দয়ায় মালপত্র ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি অফিস থেকে বেশি কমিশনে পেয়ে যায় ক্ষীরোদ। যদি সে মন দিয়ে ব্যবসাটা দেখত তাহলে রমরম করে চলত দোকান। কিন্তু দোকানে মন কোথায় ক্ষীরোদের? সে কর্মচারীর হাতে দোকানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে হাতিবাগানের থিয়েটার পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। পকেটে যথেষ্ট পয়সা থাকলে আর সুযোগ থাকলে সে কোনও না কোনও থিয়েটারে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ে। শিশির ভাদুড়ি এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর এমন কোনও থিয়েটার নেই যা এখনও পর্যন্ত ক্ষীরোদ দেখেনি। তার অনেক স্বপ্ন ছিল নিজে একজন বড় অভিনেতা হবে। কিন্তু সুযোগ মিলল কোথায়? আর একটা কারণে ক্ষীরোদের নিজের প্রতি অভিমানে আছে। ঈশ্বর তাকে এত খর্বকায় করলেন কেন? তার গলার স্বরও তো স্ত্রীলোকের মতন। এসব কারণেই ক্ষীরোদকে আজীবন ফিমেলের রোলে পার্ট করে যেতে হবে।

—কী ব্রাদার খুব দুশ্চিন্তায় আছো মনে হচ্চে?

উত্তরে মনীশ কিছু বলে না। শুধু হাসে। সত্যিই তো সে দুশ্চিন্তাতেই আছে। কিন্তু সে-কথা কি মুখ ফুটে কাউকে বলা যায়?

—অতো দুশ্চিন্তা কোরো না হে? আমাদের সুবু সত্যিই খুব ভাল মেয়ে। ও লেকাপড়া জানে। স্বভাবচরিত্রও ভাল।...আমার কী মনে হয় জানো?

—কী মনে হয় মামাবাবু?

—মনে হচ্ছে সুবু আসলে একটু ঘাবড়ে গেচে। আসলে ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে গেচে, ও ঠিক তাল রাখতে পারেনি।...তুমিই বলো না? ও দাদুর সঙ্গে গেল নেমতন্ন খেতে বিয়েবাড়িতে, সেখানে গিয়ে বসে পড়তে হল বিয়ের পিঁড়িতে। এতো একেবারে শরৎ চাটুজ্যের নভেলের মতন। ...যাই হোক অত দুশ্চিন্তা কোরো না। সুবু একটু ঘাবড়ে গেচে মনে হয়। তারপর দেখবে তোমার এমন ন্যাওটা হয়ে যাবে না, স্বামী ছাড়া আর কাউকে চিনবে না।...আজ বিকেলে কী করচ?—এই প্রশ্নে মনীশ যেন চিন্তায় পড়ে যায়।

—আজ বিকেলে?...কী আর করব?

—তাইলে চলো।...আজ একটা থেটার দেকে আসি।

—কী থিয়েটার?

—সীতা।...মেন রোলে কে অ্যাকটিং করেচে জানো?

—কে?

—শিশির ভাদুড়ি।...স্টারে হচ্চে। যাবে নাকি?

—শুধু আমি আর আপনি?—মনীশ যেন ইতস্তত করে। ক্ষীরোদ বুঝতে পারে। হা হা করে হাসে। শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দেয়।

তারপর বলে—বুঝিচি। বউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও। তা ভাল তো। সুবুও চলুক। তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো না। তাহলে খুশি হবে।...আসলে ব্যাপারটা কী জানো তো? ক্ষীরোদ কথা থামিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নেয়। কেউ শুনতে পেলে ব্যাপারটা খারাপ হবে। অবশ্য এখন তো দোতলাতে কেউ নেই। নীরদবরণ অফিসে বেরিয়ে গেছেন। বিশ্বদেব বেরিয়েছে। কোথায় গেছে ক্ষীরোদ জানে না। কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে দাদাবাবুর। তাদের কাছেও আড্ডা দিতে যেতে পারে। আর একতলার রান্নাঘরে এখন তো মহাযজ্ঞ চলছে। সেখানে যূথিকা আছেন, সুনীতি আছে, সুবুও আছে। দুজনে মিলে প্রাণপণে রান্না শেখাচ্ছেন শুভ্রাকে। বউ-এর রান্নার হাত যদি উত্তম হয়, তাহলে স্বামীর মন পেতে অসুবিধে হয় না। এরকম এক সনাতন ধারণা থেকে যূথিকা আর সুনীতি উঠে পড়ে লেগেছে শুভ্রাকে কয়েকটা দরকারি রান্না শিখিয়ে দেবার জন্যে। আশেপাশে কেউ নেই এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ক্ষীরোদ আবার এসে বসল ভাগনি-জামাইয়ের মুখোমুখি। যেখানে একটু আগে কথা শেষ করেছিল সেখান থেকেই শুরু করে আবার—আসলে ব্যাপারটা কী জানো তো? সকলের ক্ষেত্রে সবকিছু একরকম হয় না। এই যেমন তোমার ব্যাপারটা...

—ঠিক বুঝলাম না মামাবাবু...

—আবার বলচি না।...তোমার উচিত ওর সঙ্গে আস্তে আস্তে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করা।

—চেষ্টার তো শেষ রাখিনি মামাবাবু। কিন্তু আপনার ভাগনি তো আমাকে যেন সহ্য পারছে না। আমাকে দেখলেই চটে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে এখনও ভাল করে একটা কথা বলেনি। আমার অপরাধ কী?...না আমি কালো।

—আরে নাহ! দুর! তোমার গায়ের রং কালো আর তার জন্যে সুবু তোমাকে সহ্য করতে পারচে না, আমার মনে হয় ব্যাপারটা সেরকম নয়। অন্য কোনও কারণে ও ওরকম রাগারাগি করচে।—ক্ষীরোদ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলে।

এবার ক্ষীরোদ মনীশের দিকে ঝুঁকে আসে। অভিভাবকের ভঙ্গিতে তার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলে—শোনো ভায়া একটা কতা তোমাকে বলি। নারীচরিত্র বড় জটিল। সহজে তল পাওয়া যায় না। সুবু-র আসল সমস্যাটা কোথায় সেটা তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। আর কেউ তা বুঝতে পারবে না। তুমি তো ভায়া প্রাপ্তবয়স্ক। সব কি খুলে বলা যায়? বুঝলে না?...ক্ষীরোদ একবার চোখ টিপে হাসে। তারপর বলে—যাক আজ রাতে দেখবে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ভাবতে হবে না। মনটাকে ফ্রি রাখো ভায়া। চলো আজ তাহ'লে থেটার দেকে আসি। দুজনেই যাই। থেটার থেকে বেরিয়ে ফাউল কাটলেট খাব। রহিমের দোকানে। অপূর্ব টেস্ট!

থিয়েটার দেখতে যাবার জন্যে শুভ্রাকে অনুরোধ করতে সাহসে কুলোল না মনীশের। অগত্যা ক্ষীরোদকেই কথাটা সকলের সামনে পাড়তে হ'ল। যদিও শুভ্রা জানাল যে, তার শরীরটা সকাল থেকে যেন ম্যাজম্যাজ করছে। সে থিয়েটার দেখতে যাবে না। হাওড়া থেকে শ্যামবাজার কিংবা হাতিবাগান বহুত দূর। শুভ্রার শরীরে বইবে না। ক্ষীরোদ একটু জোরাজুরি করতে যাচ্ছিল। কিন্তু শুভ্রার সমর্থনে এগিয়ে এলেন যূথিকা। তিনি বললেন শরীর যখন খারাপ বলছে সুবু তখন জোর করা ঠিক না। শরীরের আর দোষ কোথায়? যে মেয়ে কস্মিনকালেও বাড়ির বাইরে তেমন পা দেয়নি, সে মেমারি থেকে হাওড়া চলে এল একটানা ট্রেনে! হয়তো মনের ঝোঁকে করে ফেলেছে।

কিন্তু তার ধকল তো শরীরে পড়বেই। তার থেকে ও বাড়িতে বিশ্রাম নিক। টুকটুক করে দু-একটা রান্না শিখে নিক। আখেরে ওর লাভই হবে।

মনীশকে একাই যেতে হল ক্ষীরোদের সঙ্গে। বিশ্বদেবকে একবার অফার দিয়েছিল ক্ষীরোদ। —দাদাবাবু চলুন—জামাইকে নিয়ে থেটার দেকে আসি।.....যে সে থেটার নয়, শিশির ভাদুড়ির সীতা! কিন্তু বিশ্বদেব যেতে চাইল না। জামাইয়ের সঙ্গে রোজরোজ 'থেটার'? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না?

ক্ষীরোদের সঙ্গে কোথাও গিয়ে অবশ্য লাভ আছে। তার হাত খুবই দরাজ। যাবার সময় এবং ফেরার সময়—দুবারই ট্যাক্সি। থিয়েটারও অপূর্ব লাগল মনীশের। শিশির ভাদুড়ির অভিনয় সে আগে খুব একটা দেখেনি। এককথায় অনবদ্য। তারপর হাতিবাগানের মোড়ে রহিমের দোকানের ফাউল-কাটলেটও অপূর্ব লাগল মনীশের। বাড়ি ফেরা। আবার একপ্রস্থ খাওয়া দাওয়া। তারপর রাত আরও বাড়লে ঘুমোতে যাবার পালা। তখনই আবার বিপত্তি বাধল শুভ্রা। ....আবার সে গোঁ ধরল দোতলার ঐ ঘরে মনীশের সঙ্গে সে শুতে যাবে না। সুনীতি তাকে অনেক বোঝাল। বিশ্বদেব বোঝাল। কিন্তু কারও কথাতে কান দিচ্ছে না শুভ্রা। সে দিদুর সঙ্গে একতলার একটা ঘরে শোবে। 'ঐ লোকটার' সঙ্গে কিছুতেই এক বিছানায় শোবে না। একসময় বিশ্বদেব মেজাজ হারাল। তাকে ক্ষীরোদ বুঝিয়ে-সরিয়ে নিয়ে না গেলে হয়তো সে চড়-থাপ্পড় দিয়েই বসত মেয়েকে। মনে একরাশ দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তার বোধ নিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে নীরদবরণ চুপচাপ বসেছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে যূথিকা বললেন—হ্যাঁগা একী কাণ্ড গো? মেয়ে যে আবার জেদ ধরেচে নাত-জামাইয়ের সঙ্গে শোবে না!

নীরবরণ বললেন—জেদ ধরলেই তো হবে না। ওর বাবা-মাকে বোঝাতে বলো। দরকার হলে জোর খাটাতে হবে। এসব তামাশা তো চলতে দেওয়া যায় না।

—কারোর কতা মেয়ে শুনচে না। ওর বাবা—মায়ের কতাও নয়। তুমি একবার চলো.....।

—আমি? এসব ব্যাপারে আমার ইনটারফিয়ার করা কি ঠিক হবে?

—তোমাকেই বোঝাতে হবে। তোমার কতা সুবু ফেলতে পারবে না.....।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীরদবরণ একতলাতে নামলেন। টিমটিমে আলো জ্বলছে একতলার দালানে। যেন একটা নাটকের মঞ্চে শুভ্রা দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে সুনীতি, যূথিকা আর ক্ষীরোদ। বারিদবরণকেও দ্যাখা গেল এককোণে। উদ্বেগে বিশ্বদেব ঘামছিল। এ কী বিচিত্র সমস্যায় পড়ল সে! এই মেয়ে যে সত্যিই পাগলামি শুরু করেছে। একে কীভাবে স্বামীর ঘরে সহবাসে পাঠানো যাবে? তাহ'লে তার ধারণাই ঠিক। এই বিয়ে একেবারেই সুখের হবে না। ওদের দুটো জীবন অশান্তিতে ছারখার হয়ে যাবে। আর তা যদি হয় তার জন্যে আর কেউ নয়; একমাত্র নীবদবরণই দায়ী। তাঁকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবে না বিশ্বদেব। নীরদবরণ শুভ্রার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—তুমি কী চাইছ?

চৌষট্টি

শুভ্রা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নীরদবরণের দিকে। তার চোখে ঝলসাচ্ছে রাগ। নীরদবরণ থমকে গেলেন। এই মেয়েকে তিনি চেনেন না। একি তাঁরই নাতনি সেই সুবু যাকে তিনি কোলেপিঠে করে বড় করে তুলেছেন নিজের মেয়ের মতন। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। অনেক সময়েই মনে হয়েছে, সুবু তাঁর নাতনি নয়, একেবারে কোলের মেয়ে। কিন্তু এখন সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে; যার

চোখের দৃষ্টি থেকে ধেয়ে আসছে বিদ্যুৎ; এ তো তাঁর সেই অতি চেনা সুবু নয়; এ তো শুভ্রা, ওকে তিনি ঠিক চিনতে পারছেন না। আবার নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন—বারবার তুমি কেন এরকম ব্যবহার করছ? তুমি কী চাও?

শুভ্রা দাঁতে দাঁত ঘষটে বলল—এসব অশান্তির জন্যে তুমিই দায়ী।

—আমি দায়ী? ... তুমি কী বলছ খেয়াল আছে?

—কেন খেয়াল থাকবে না। এ বিয়ে আমি করতে চাইনি। তুমি জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছ? তুমি আমার ক্ষতি করেছ...?

সুনীতি এগিয়ে এসে বলল—সুবু তুই কাকে কী বলচিস?

বাবার মুখের ওপর তুই এত বড় কথাটা বলতে পারলি?

—ঠিকই বলছি আমি। দাদু আমার ক্ষতি করেছে। যে বিয়ে আমি করতে চাইনি সেই বিয়ে আমাকে করতে হয়েছে শুধু ঐ লোকটার জোরাজুরির জন্যে। ... তুমি ... তুমি একটা হিপোক্রিট!

—আমি হিপোক্রিট? কেন? ... হোয়াই? নীরদবরণ যেন গর্জে উঠলেন।

—কারণ তুমি আমাকে শিখিয়েছ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে; কিন্তু আমার বিয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো কাজ করেছ। আমার মতামতকে গুরুত্ব দাওনি, নিজের মতামতকে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছ। ... আই হেট ইউ ফর দ্যাট? নীরদবরণ নিজের চোখকে এবং কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁর মাথা যেন ঘুরছিল। পা কাঁপছিল। তবুও নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তিনি। শুভ্রার দিকে আরও এক পা এগিয়ে এসে আরও উঁচু স্বরে বললেন—আমি তোমার কাছে শেষ জানতে চাই তুমি মনীশের ঘরে যাবে কি না?

—নাহ, যাব না। আমি থাকব না ওর সঙ্গে!

—দেন ইউ গো টু হেল! এই কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে নীরদবরণ সপাটে একটা চড় কষালেন শুভ্রার গালে। এত জোর ছিল সেই চড়ে যে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা সুনীতি শুভ্রাকে জড়িয়ে না ধরলে সে বোধহয় টাল খেয়ে পড়েই যেত। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল শুভ্রা। সুনীতির বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। বারবার বলতে লাগল—তোমরা আমার কেন এরকম সর্বনাশ করলে মা? আমি ঐ লোকটার সঙ্গে কিছুতেই থাকব না... কিছুতেই না! তোমরা যদি জোর করো তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে! নীরদবরণ আর দাঁড়ালেন না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। সারা বাড়িতে নেমে এল শ্মশানের স্তব্ধতা।

পরের দিন ভোরের ট্রেনেই মনীশ ফিরে গেল মেমারিতে। তারপর সে আর এ বাড়িতে আসেনি। সতীশবাবু এসেছিলেন। একা নয়। আরও কয়েকজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে। তিনি দেখা করতে চেয়েছিলেন শুভ্রার সঙ্গে। কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভীষণভাবে অপমানিত হলেন। কারণ শুভ্রা তিনি বাড়িতে পা দেবার সময় থেকে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে বসেছিল। বিশ্বদেব, সুনীতি, যূথিকা, ক্ষীরোদ কারও অনুরোধেই সে দরজা খোলেনি। নীরদবরণ হাত জোড় করে বলেছিলেন সতীশকে—আমি হেল্পলেস। আমি পারলাম না। আমি ভাবিনি এরকম হবে। একজন আত্মীয় রেগেমেগে বলেছিল—আপনাদের মেয়ে যে পাগল সেটা গোপন করেছিলেন কেন? এখন মনীশের জীবনটা কীভাবে কাটবে বলুন তো? নীরদবরণ কাঁপা স্বরে বলেছিলেন—পাগল ও নয়। ওর মতন সুস্থ মেয়ে বোধহয় হয় না। তবুও কেন জানি না ও এরকম ব্যবহার করছে। ...সতীশের হাতদুটো ধরে নিজের পিঠ বাঁকিয়ে বিনীতভাবে নীরদবরণ বলেছিলেন—সব অপরাধ আমার এটা আমি স্বীকার করছি সতীশবাবু। আপনারা আবার ছেলের বিয়ে দিন। আমরা কোনও আপত্তি করব না।

সতীশ বলেছিলেন—আমরা এখন কোনও সিদ্ধান্ত নেব না। আমরা অপেক্ষা করতে চাই। বউমাকে দেখে আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল বউমা আমাদের রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। ... আমার ধারণা ও সাময়িক এরকম ব্যবহার করচে। তবে ওর মন ঘুরবে। ও নিজের ভুল বুঝতে পারবে। আমার মনীশ যে কত ভালো ছেলে সেটা ও একসঙ্গে না থাকলে বুঝতে পারবে না। আমি অপেক্ষা করতে চাই। আমরা অপেক্ষাই করব।

সতীশবাবুরা চলে যাবার পর নীরদবরণ দোতলার ঘরে বাড়ির সকলকে ডাকলেন। সবাই—বিশ্বদেব, সুনীতি, যূথিকা, ক্ষীরোদ; এমনকী অসিতবরণ এবং বারিদবরণকেও। শুধু শুভ্রাকে ডাকলেন না। অবশ্য ডাকলে সে বোধহয় আসতও না। সেই রাতের ঘটনার পর থেকে শুভ্রা দাদুর মুখোমুখি হয়নি। নীরদবরণও সম্ভবত নাতনির মুখোমুখি হতে চাননি।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল নীরদবরণ কী বলেন শোনার জন্যে। তিনি দুবার কেশে গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—তোমাদের সকলকেই জানাচ্ছি ক'দিন থেকে বাড়িতে যা ঘটছে তাতে আমি খুব টায়ার্ড ফিল করছি। আমি আজ রাতে আর বাড়ি ফিরব না। ক'দিন একটু অন্য কোথাও বিশ্রাম নিতে চাই।

—বিশ্রাম মানে? আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন? বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করল।

—নাহ....ঠিক বেড়াতে নয়। কলকাতাতেই থাকব। আমি কোথায় থাকব সেই ঠিকানা ক্ষীরোদ জানে। কী ক্ষীরোদ জানো তো?

ক্ষীরোদ ঘাড় নেড়ে বলল—জানি। কিন্তু আপনি বাড়ি ছেড়ে সেখানে সেই ট্যাঁশ মেয়েটার সঙ্গে থাকবেন। এটা কি অনাচার নয়? আমাদের পারিবারিক সম্মানের কথা মনে আছে তো? মায়ের কথাটাও ভাববেন না? মায়ের পক্ষে এটা তো অসম্মানজনক! নীরদবরণ যূথিকার দিকে তাকালেন—কী গো? ক্ষীরোদ যা বলছে তা কি ঠিক? আমার আর একটা জীবন আছে। সেটা তো তুমি জানো। তুমি অনেকদিন আগেই মেনে নিয়েছ। দু-রকম জীবন কি মানুষের থাকতে পারে না? সেই মেয়েটার সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকি বলে আমি কি তোমাকে কোনওদিন অসম্মান করেছি? সংসারের দায়িত্বকে অবহেলা করেছি? যূথিকা মৃদুস্বরে বললেন—ছিঃ! তোমার ঐ বেলেল্লাপনার কথা সকলকে ডেকে এভাবে না বললে কি হত না? আমি জানতুম। ক্ষীরোদ জানত। তাতে তোমার আশ মিটছিল না বুঝি? নিজের লাম্পট্যের কথা নিজের ছেলেমেয়েকে ডেকে এভাবে বলতে তোমার লজ্জা করল না?

—নাহ লজা করল না। কারণ আমার ঐ দ্বিতীয় জীবনটা আর গোপন রাখতে চাই না। সবাই জানুক। তাতে আমার লজ্জা নেই। আমি এখন থেকে ভেতরে আর বাইরে একরকমই থাকতে চাই। আমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই।... তোমার, তোমাদের কোনও ভয় নেই। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আমি যতদিন বেঁচে থাকব পালন করে যাব। এবার থেকে আমি মাঝে মাঝে এ-বাড়ি থাকব। মাঝে মাঝে ও-বাড়ি। সংসার চালানোর টাকাপয়সা ক্ষীরোদকে দিয়ে যাব। অসুবিধে হলে ও যোগাযোগ করবে। বিশ্বদেব বলল—ও বাড়ি মানে? আপনি কি আর কোনও সংসার পেতেছেন নাকি? অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া করেছেন?

নীরদবরণ উত্তর দিলেন—আহ্ বিশ্বদেব! আর কোনও প্রশ্ন কোরো না। তোমরা সব যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। ... শুধু একটাই আক্ষেপ রয়ে গেল। সুবুর বিয়ের ব্যাপারে তোমাদের কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করে একা ডিসিসান নিয়ে বোধহয় আমি ভুলই করলাম। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করব তাও জানি না। অপরাধবোধ আমাকে প্রতি মুহূর্তে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমি রাতে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছি না। আমি এখন একটু ঘুমোতে

চাই। একটু শান্তি চাই। এ বাড়িতে থাকলে আমার ঘুম আসবে না। আমি শান্তি পাব না। তাই আমি একটু বাসাবদল করতে চাই। তোমরা আমাকে যাই ভাবো আমি এখন থেকে আমার ইচ্ছেমতন জীবন কাটাব। তোমাদের আমি আর কিছু উপদেশ দিতে চাই না। শুধু সকলের জন্যে শুভেচ্ছা ছাড়া আমার আর কিছু জানাবার নেই। প্রায় ষাট বছর বয়স হতে চলল আমার। আমি জানি জীবন কীরকম। আমি জানি মানুষ সর্বশক্তিমান নয়। তার অদম্য আত্মবিশ্বাসও তাকে সুখী করতে পারে না; যদি ভাগ্য তার সহায় না হয়।... হ্যাঁ, শেকসপিয়রের নাটকে সেই বুড়ো এবং সর্বস্বান্ত রাজার মতন আমিও গলা খুলে বলতে চাই— As flies to wanton boys, are we to the gods; they kill us for their sports ... ।

আজ অফিসে অনেক কাজ ছিল। নিজের চেম্বারে বসে নীরদবরণ জমে থাকা সব কাজ সারলেন। তারপর মিটিং-এও যেতে হল। মিটিং করলেন ম্যাকেঞ্জি সাহেব। সেলস-সুপারভাইজারদের সঙ্গে মিটিং। নীরদবরণ হলেন এই অফিসের চিফ সেলস ম্যানেজার। তাঁকেও থাকতে হল মিটিং-এ। সুপারভাইজাররা যা রিপোর্ট পেশ করল তাতে দেখা গেল কোম্পানির সেলস-পজিসন ঊর্ধ্বগতি পেয়েছে কয়েক মাসে। মফঃস্বলে ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি সাইকেলের বিক্রি বেড়েছে। চাটগাঁ এবং যশোর থেকেও স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছে ঘনঘন অর্ডার আসছে। লন্ডনে মূল কর্তৃপক্ষের অবস্থান এই কোম্পানির। ম্যাকেঞ্জি সাহেব জানালেন সেখানে তিনি বিক্রির ঊর্ধ্বগতি বিষয়ে একটা বিশদ রিপোর্ট পাঠাবেন। কর্তৃপক্ষ খুশি হবেন। ক্যালকাটার এই অপিসের প্রতি তাদের খুবই আস্থা। সবশেষে মিটিং-এ নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ম্যাকেঞ্জি সাহেব সরাসরি নীরদবরণের খুব প্রশংসা করলেন। সাইকেলের বিক্রি গ্রামে-গঞ্জে-মফঃস্বলে কীভাবে ক্রমশ বাড়ানো যায়, এ ব্যাপারে নীরদবরণ অনেক নতুন এবং চমকপ্রদ পরামর্শ দিয়ে গেছেন বরাবর কোম্পানিকে। বিশেষত কোম্পানির সাইকেলের গুণাবলী বর্ণনা করে বাংলা ভাষায় লিফলেট ছাপানো এবং তা আলতা-বিক্রেতাদের মাধ্যমে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিনব আইডিয়া প্রথমে নীরদবরণের মাথাতেই তো এসেছিল। ...আ সেলসম্যানেজার শুড বি লাইক ডায়নামিক, ইমাজিনেটিভ অ্যান্ড রিয়েলি ইউজফুল অলওয়েজ টু হিজ এমপ্লয়ার। অ্যান্ড বাবু নীরদবরণ ইজ জাসট লাইক দ্যাট। আই ওপেনলি প্রেজ হিম অ্যান্ড উইশ হিম আ ব্রাইট ফিউচার।... সবাই করতালি দিল। আর নীরদবরণ ভাবছিলেন, আর ফিউচার! আটান্ন বছরে একটা মানুষের ফিউচার আর কী এমন থাকতে পারে? বড়জোর তিনি চিফ সেলস ম্যানেজার থেকে কোম্পানির জয়েন্ট অ্যাডভাইসার হবেন; আরও অনেক মাইনে বাড়বে; প্রায়ই দিল্লি-বোম্বে যেতে হবে; চাইলে বিলেতও ঘুরে আসা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মনে মনে তিনি ভীষণ ক্লান্ত। উন্নতির স্বপ্ন আর দেখতে ইচ্ছে করে না। মানুষ জীবনে যত প্রতিষ্ঠিতই হোক আসল কথা হল সুখী হওয়া। টাকা আরও উপার্জন করে আর কী হবে? অনেক টাকা উপার্জন করেন তিনি। মাইনে না হয় আরও কিছু বাড়বে। নিজের পরিবারকে আরও ভাল রাখা যাবে। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ আরও বানানো যাবে। মদ্যপান করা যাবে দুশ্চিন্তাহীনভাবে। কিন্তু এসবে লাভ কী? জীবনে যে সুখ অর্জন করতে পারলে মন-মেজাজ প্রতিমুহূর্তে ফুরফুরে থাকে, সেই সুখ তো অধরাই থেকে গেল! চোখের সামনে সুবু ঘুরে বেড়াবে। বিয়ে হয়েও যে বিবাহিত জীবনযাপন করতে অপারগ। শ্বশুরবাড়িতে যাবে না, স্বামী-সঙ্গ করবে না, হাওড়ার বাড়িতেই থাকবে। ওকে দেখলেই নীরদবরণের মনে হবে তিনি একটা বিরাট ভুল করেছেন। তাঁর ভুল সিদ্ধান্তের জলজ্যান্ত শিকার সুবু। আচ্ছা ওর ভবিষ্যতটাই বা কী হবে? একজন বিবাহিত মেয়ে চিরকাল অবিবাহিত

সেজে নীরদবরণের বাড়িতে থেকে যাবে? ওর কি আর বিয়ে হবে না? কীভাবে হবে? হিন্দু মতে একজনের কি দুবার বিয়ে হতে পারে? হতে পারে যদি আগেকার বিয়ে আদালতের আদেশে নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু আদালতে যাওয়া যাবে কীভাবে? সুবুকেই যেতে হবে? রিট পিটিশানে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ কী দেখাবে সুবু? যে তার স্বামী কালো। গায়ের রং কালো বলেই তার প্রবল অপছন্দ স্বামীকে! আর সেই রিট পিটিশান পড়ে বিচারক কী করবেন? হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বেন নিজের চেয়ারে?

—হাই বাবু! ইউ লুক অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড!—ম্যাকেঞ্জির ডাকে সম্বিত ফেরে নীরদবরণের। সত্যিই তো! কখন শেষ হয়ে গেছে মিটিং! সভাকক্ষ ফাঁকা। শুধু নীরদবরণ আর ম্যাকেঞ্জি বসে আছেন।

—নো স্যার ইট'স অলরাইট। বললেন নীরদবরণ।

—ইউ লুক পেল বাবু; ... পেল অ্যান্ড পেনসিভ? হোয়াই? হ্যাজ এনিথিং রং হ্যাপেনড?

—নো, নো, নট অ্যাট অল। এভরিথিং ইজ অলরাইট। তাড়াতাড়ি বললেন নীরদবরণ। কী হবে নিজের দুঃখের কথা সাহেবকে বলে? সাহেব হয়তো বিষয়টা তেমন উপলব্ধি করতেও পারবে না। ও কি বুঝবে সুবুর সমস্যা? সাহেবরা অবশ্য কালো মানুষদের ডার্টি নিগার বলে গালাগাল দিয়ে থাকে। অনেক বছর ধরে সাদা চামড়ার মানুষেরা কালো চামড়ার মানুষদের শোষণ ও শাসন করে আসছে। কালোদের তারা ব্রাত্যই ভাবে। ইন্ডিয়াতেও তো তাই। এই কলকাতাতেও। গায়ের রং কালো হবার জন্যে সাহেবদের প্রধান ক্লাব রয়্যাল হাউসে নীরদবরণ এখনও সদস্যপদ পাননি। ম্যাকেঞ্জি অন্যরকম। কিন্তু সব সাহেব তো ওর মতন নয়। তারা ভীষণ বর্ণবিদ্বেষী। কিন্তু সুবু-র সমস্যাটা কি সেরকম? সুবু তো ইউরোপিয়ান নয়। ভেতো বাঙালি। তবুও কালো মনীশকে সে পছন্দ করবে না কেন? এ কী অস্বাভাবিকতা! এ কী ধরনের মনের রোগ? এই মনের রোগ সারাবার ওষুধ কী..? এসব চিন্তা মনে আসছিল বটে। কিন্তু বেশি ভাবা গেল না। ম্যাকেঞ্জি বলল—চলো বাবু.....নাও ইট'স লাঞ্চ টাইম। লেটস হ্যাভ লাঞ্চ অ্যান্ড সাম ড্রিংকস........। নীরদবরণও যেন সুবুর চিন্তা থেকে মনে মনে অব্যাহতি চাইছিলেন। কিন্তু ভোমরার গুঞ্জনের মতন একই চিন্তা বারবার মনে ঘুরে ঘুরে ধেয়ে আসছিল। ম্যাকেঞ্জির দিকে তাকিয়ে হেসে নীরদবরণ প্রত্যুত্তরে বললেন—ইয়েস — আই অ্যাম ফলোয়িং ইউ উইথ প্লেজার....।

পঁয়ষট্টি

পার্ক স্ট্রিটের এই বারে প্রায় নিয়মিত আসেন ম্যাকেঞ্জি এবং নীরদবরণ। এখানকার বারটেন্ডার থেকে বাটলারেরা প্রত্যেকেই ওদের দুজনকে চেনে। এমনকী দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানও অনেকদিন এই যুগলকে দেখছে। দুজনকেই ভারিক্কি স্যালুট ঠুকল সে। ওঁরা ভেতরে ঢুকে গেলেন। এখন এই অফিসপাড়ায় লাঞ্চ-টাইম। তাই প্রায় সব টেবিল-চেয়ারই ভর্তি। ভেতরে ভ্রমরের গুঞ্জন; সবাই কথাবার্তা বললে যেমনটা শোনায়। একজন অল্পবয়সী, সুদর্শন, ইংরেজ বাটলার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল ম্যাকেঞ্জির দিকে। দুজনকে বসিয়ে দিল কোণের দিকে একটা ফাঁকা টেবিলে। এখানে এলে এরকম কোণের টেবিল দেখেই বসেন ম্যাকেঞ্জি। একটু যেন প্রাইভেসি থাকে। আবার বারের ভেতরে অন্যান্য কাস্টমারদের দিকেও মাঝে মাঝে নজর করা যায়। খাবার এবং পানীয়ের অর্ডার দেওয়া হল। শুরু হল খাওয়া এবং গল্প। ম্যাকেঞ্জি হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বললেন—সো নীরোদবাবু আয়াম গোয়িং টু লিভ ইওর কানট্রি....।

—সে কী? — নীরদবরণ যেন তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। মনে হল ভুল শুনেছেন। হাতের কাঁটাচামচ থেমে গেল।

—চলে যাচ্ছেন মানে? ফর এভার?

—ইয়েস ফর এভার। লন্ডনে থাকব। সেখানে থেকেই কোম্পানির কাজ দেখাশোনা করব। তোমার সঙ্গে ফোনে মাঝে মাঝে কথা হবে।

—হোয়াই সাচ আ ডিসিসান?

—বিকজ আই ওয়ান্ট টু সেটল, আই ওয়ান্ট টু ম্যাবি....!

—বিয়ে?—নীরদবরণ চমক খেলেন। ম্যাকেঞ্জি অন্তত সাত-আট বছরের বড় নীরদবরণের থেকে। তার মানে ম্যাকেঞ্জির বয়স এখন চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি তো বটেই। এত বয়সে বিয়ে? নতুন করে সংসার পাততে চলেছেন ম্যাকেঞ্জি? বুড়ো বয়সে এরকম ভীমরতি কেন? অবশ্য বাঙালিদের ক্ষেত্রে যা স্বপ্নেও ভাবা যায় না; ইংরেজ কিংবা ইউরোপিয়ানদের ক্ষেত্রে তা সত্যিই সম্ভব। সত্তর বছর বয়সেও ওরা বিয়ে করতে পিছপা হয় না। দেখা যায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ হয়তো তিরিশ বছরের যুবতীকে বিয়ে করে বসল এবং তারপর দিব্যি ঘরসংসার করতে লাগল।

ম্যাকেঞ্জি বোধহয় নীরদবরণের চিন্তাসূত্র আঁচ করতে পেরেছেন। হেসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন—কী বাবু? তোমার কাছে খবরটা খুব সারপ্রাইজিং তাই না?

—হ্যাঁ সারপ্রাইজিং তো বটেই। ... আমি তোমাকে কনফার্মড ব্যাচেলর বলেই ভেবে নিয়েছিলাম। এতদিন বাদে যে তুমি আবার বিয়ে করবে তা ভাবিনি। কাকে বিয়ে করছ?

—আমি বিয়ে করব এলিজাকে যাকে আমি গত ত্রিশ বছর ধরে ভালোবেসে আসছি। এলিজাও আমাকে খুব ভালোবাসে। উই আর মেড ফর ইচ আদার।

—ত্রিশ বছর ধরে ভালোবাসছ? হোয়াই ডিড নট ইউ ম্যারি হার আরলিআর? তোমরা বিদেশিরা তো ঘন ঘন বিয়ে কর আর ঘন ঘন বিয়ে ভেঙে যায়। তোমার ব্যাপারটা একটু একসেপশনাল মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ ঠিকই... একসেপশনাল। ইউ আর কারেক্ট। এতদিন কেন আমি এলিজাকে বিয়ে করিনি জানো?

—কেন?

—এলিজার বাবা আমাদের সম্পর্ককে কোনওদিন মেনে নিতে পারেনি। ... হি নেভার লাইকড মি...আই ডোন্ট নো হোয়াই। কিন্তু আমার প্রতি এলিজার ভালোবাসাতেও কোনও খাদ নেই। শি ইজ ক্রিপলড ইউ নো?

—আঁা ক্রিপলড? .... ইউ মিন ইওর ফিঁয়াসে ইজ ডিসএবলড?

—ইয়েস ডিসএবলড। জন্ম থেকেই এলিজা তাই। ওর ডান পাটা ছোট এবং সরু। তার কোনও গ্রোথ হয়নি। এলিজার মা নেই। শি লস্ট হার মাদার ইন চাইল্ডহুড। বাবা বিশাল এক খামারের মালিক। খুব বড়লোক ওরা। কিন্তু এলিজা প্রতিবন্ধী বলেই ওর বাবা বিয়ে দিতে চায়নি। ভদ্রলোকের ধারণা ছিল, বিয়ে হবার পর এলিজাকে তার হাজবান্ড নেগলেক্ট করবে। তাড়িয়ে দেবে। ডিভোর্সের মামলা করবে। তাই ওর বাবা মি. টম হ্যারিসন মেয়েকে নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছেন বরাবর। আমার সঙ্গে মি. হ্যারিসনের অনেক তর্ক হয়েছে। আমি তাকে বারবার বোঝাতে চেয়েছি যে, আমি এলিজাকে সত্যি ভালোবাসি; আমি তাকে নেগলেক্ট করব না। আমার এসব কথা এলিজাও বিশ্বাস করে। কিন্তু ওর বাবা আমার কোনও কথা, যুক্তি কোনওদিন শুনতে চাননি। ওঁর ধারণা ছিল, এলিজাকে ভালোবাসা-টাসা সব বোগাস; আমি আসলে ওঁর সম্পত্তির জন্যে

এলিজার সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে যাচ্ছি। অনেক চেষ্টা করেও আমি মি. হ্যারিসনকে বোঝাতে পারিনি যে, আমি মনেপ্রাণে একজন সৎ প্রেমিক। — একটানা কথা বলার পর ম্যাকেঞ্জি থামলেন। এক টুকরো মাংস মুখে পুরে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিলেন। কপাল কুঁচকে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

পরপর দু-পেগ হুইস্কি একটু দ্রুত শেষ করে দিয়েছেন নীরদবরণ। তাঁর মাথা ঈষৎ ঝিমঝিম করছিল। যদিও মেজাজটা আবার ফুরফুরে হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগেকার সেই মনমরা ভাব, বিষণ্ণতা কোথায় যেন অন্তর্হিত।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তো এতদিন বাদে যখন বিয়ে করতে চলেছেন, তখন নিশ্চয়ই মি. হ্যারিসন আপনাকে বুঝেছেন?

—ওহ নো! .... মি. হ্যারিসন ইজ নো মোর। তিনি মারা গেছেন। সাডেন হার্ট অ্যাটাক। কার্ডিয়াক ফেলিওর।

—আই সি...।

—একমাস আগে এলিজা আমাকে তার বাবার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। তাতে লিখেছে এবার কি আমরা বিয়ে করতে পারি? আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছি ও ইয়েস। আমি ইন্ডিয়া ছেড়ে ফিরে আসছি। আর যাব না। এবাব এলিজা আর আমি সুখী স্বামী-স্ত্রী হয়ে জীবনের বাকি সময়টা একসঙ্গে কাটিয়ে দেব।

ম্যাকেঞ্জির কথাগুলো শুনতে শুনতে নীরদবরণ সত্যিই চমৎকৃত হচ্ছিলেন। এই লোকটার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করছেন। কোনওদিন বুঝতে পারেননি ও এতবড় প্রেমিক। একজন প্রতিবন্ধী মেয়ের জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করল সারাজীবন। কী দরকার ছিল ম্যাকেঞ্জির এভাবে অবিবাহিত থেকে অপেক্ষা করার? এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরে ইচ্ছে করলে সে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে ভালোবেসে এবং বিয়ে করে সুখে থাকতে পারত। কিন্তু সে প্রতিবন্ধী এলিজাকেই সত্যিকারের ভালোবাসে। আর কাউকে জীবনে পেতে চায় না। এলিজাকেই চায়। এরকম প্রেমের কথা এতকাল নভেলেই পড়েছেন নীরদবরণ। ম্যাকেঞ্জি তাঁকে কী শোনাচ্ছে?

—আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমি কবিতা লিখি? ম্যাকেঞ্জি বললেন। তাঁর ভারী এবং ফর্সা মুখ মদের প্রভাবে লাল টকটকে দেখাচ্ছে।

—ও ইয়েস। নীরদবরণ ঈষৎ জড়ানো স্বরে বললেন। — তোমার কবিতা তুমি আমাকে শুনিয়েছ তো?

—হ্যাঁ শুনিয়েছি। আমার সব কবিতাই আমি এলিজার কথা ভেবে লিখেছি। আর সে কারণেই আমার সব কবিতাই প্রেমের কবিতা। গত রাতেও একটা লিখেছি। শুনবে? নীরদবরণ উত্তর দেবার আগেই ম্যাকেঞ্জি নিজের শার্টের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করলেন, তারপর নিচু স্বরে পড়তে লাগলেন—

No one so much as you
Loves this my clay,
Or would lament as you
Its dying day.

You know me through and through
Though I have not told,
And though with what you know

You are not bold.

None ever was so fair
As I thought you :
Not a word can I bear
Spoken against you.

—বাঃ বাঃ মারভেলাস! —নীরদবরণ বললেন। তুমি যে এত ভালোবাসতে পারো তা আগে বুঝিনি।

—ভালোবাসতে সবাই পারে না বাবু। ... ভালোবাসতে পারা এক ধরনের আর্ট। এক ধরনের প্রতিভা। ম্যাকেঞ্জি হেসে বললেন। — আই বিলিভ যে শুধু একজনকে ভালোবেসেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

তাই কি? হবে হয়তো। নীরদবরণ অনেক কিছু নিয়ে ভেবেছেন, ভাবেন। কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে কোনওদিন কিছু ভাবেননি। যূথিকার সঙ্গে তাঁর কোনওদিনই ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল না। দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসার জায়গা খুব কম। এটা নীরদবরণের বরাবরের ধারণা। তাহলে শেলীকে কি তিনি ভালোবাসেন? ঠিকমতো বলতে গেলে নীরদবরণ শেলীর শরীরকে ভালোবাসেন। সেদিন অফিস ছুটির পর নীরদবরণ আর বাড়ি ফিরলেন না। তাঁর গাড়ি এসে দাঁড়াল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক দোতলা বাড়ির সামনে। ঘন ঘন ডোর-বেল বাজাতে লাগলেন তিনি। তাঁর যেন তর সইছিল না। খানিক বাদে যে দরজা খুলল সে শেলী নিজে। নীরদবরণকে দেখে বলল—ওয়েলকাম...

ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের এই পাড়াটাকে বলা হয় ফিরিঙ্গি-পাড়া। কলকাতার এই অঞ্চলেই সাহেব-মেমরা থাকে। শুধু এই অঞ্চল নয়। ইংরেজ পরিবাররা পার্ক স্ট্রিটেরও অনেকটা অংশ জুড়ে বসবাস করে। বিলিতি অফিস, হোটেল-রেস্টুরেন্ট এবং মিশনারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও বেশির ভাগ এখানেই। শেলী যে দোতলা বাড়িটাতে থাকে সেটা আসলে একটা মাঝারি মাপের হোটেলের পেছন দিক। হোটেলের পাশ দিয়ে সরু গলি। সেদিকেই বাড়ির প্রবেশপথ। এতবড় বাড়িতে উপরে-নীচে অনেক ঘর। সেগুলোর অধিকাংশ ফাঁকাই পড়ে থাকে। কারণ শেলী একাই থাকে এ-বাড়িতে। ঠিক একা নয় অবশ্য। একজন মুসলমান মহিলা, যাকে প্রৌঢ়া বলা যায়, নাম নাসরিন, সেও থাকে। নাসরিন এ-বাড়িতে হোল-টাইমার। অনেকদিন থেকে শেলীর সঙ্গে আছে। সেই যখন শেলীর স্বামী বেঁচে ছিল তখন থেকে। নাসরিন সারা বাড়ির দেখাশোনা করে, ঘরকন্নার কাজ করে এবং রান্নাও করে। শেলী বাড়িতে আর থাকে কতক্ষণ। সে মিশনারি হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে। মাসের পনেরো দিন দিনের বেলা তার ডিউটি থাকে। আর বাকি পনেরো দিন নাইট-ডিউটি। শেলীর জীবনযাপনকে যদি সংসার বলা যায় তাহ'লে সেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব বস্তুত নাসবিনের।

শেলীর কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাঠককে দিয়ে রাখা ভালো। শেলীকে পুরোপুরি ইংরেজ বলা যায় না। তার বাবা ছিল ইংরেজ, মা পাঞ্জাবি। ঠিকমতো বলতে গেলে শেলীকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলাই ভালো। তার চেহারাতে মা এবং বাবা—দুজনেরই প্রভাব আছে। শেলী মাথায় খুব একটা লম্বা নয়। তাকে খর্বকায়ই বলা যায়। তবে গায়ের রং সমুদ্রের ফেনার মতো। আর মুখশ্রীতে এক অদ্ভুত কমনীয়তা আছে; যা ভারতীয় মেয়েদের মুখের ধাঁচে পাওয়া যায়। তার কেশদাম কালো; চোখের তারা কালো, নাক টিকোলো; মুখশ্রীতে তীক্ষ্ণ অহঙ্কারের আভাস।

বছর পাঁচ আগে শেলীর স্বামী মারা গিয়েছিল। সেও ঠিক ইংরেজ নয়, আর্মেনিয়ান; নাম

রবার্ট অ্যান্টনি। রবার্ট ছিল পেশায় পাইলট। কলকাতা থেকে কায়রো যাচ্ছিল রবার্টের প্লেন। সেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল প্লেন। তাতে দুশোর মতন যাত্রী ছিল। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সেদিন খুব বেশিদূর যেতে পারেনি প্লেনটি। উড়িষ্যার জঙ্গলে ভেঙে পড়েছিল। পাইলটসহ সব আরোহীদেরই মৃত্যু হয়েছিল। স্বামী মারা যাবার পর শেলী আর বিয়ে করেনি। নীরদবরণের সঙ্গে কোনও এক সূত্রে তার আলাপ হয়। চেহারাতে বেঁটেখাটো এবং স্থূলকায় হলেও নীরদবরণকে শেলীর ভাল লেগেছিল। হয়তো তার মা ভারতীয় বলেই নীরদবরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল শেলী। ক্রমে নীরদবরণ শেলীর সঙ্গে লিভ-টুগেদার শুরু করেন। এই সম্পর্কের তেমন কোনও পরিণতি হয়তো নেই; দুজনেই সেটা বোঝেন। বোধহয় তাদের সম্পর্কের সূত্র একটাই। সেটা হল ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা দৈহিক যেমন, তেমনই হৃদয়েরও। মেজাজে, আদবকায়দায় যে সাহেবিআনা রপ্ত করেছেন নীরদবরণ তা শেলীর পছন্দ। আর নীরদবরণের পছন্দ শেলীর মনীষা। ইংরেজি সাহিত্য যেন গুলে খেয়েছে সে। শেলী, কীটস, বায়রন; এমনকী টেনিসন এবং ব্রাউনিং-এর কবিতা ঘনঘন মুখস্থ বলতে পারে শেলী। তার কাছে এলে, কয়েকদিন থাকলে নীরদবরণের মন এবং আত্মা যেন স্বস্তি পায়। যূথিকা প্রায় নিরক্ষর। তাঁর সঙ্গে মামুলি সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া আর কী কথা বলবেন নীরদবরণের মতন বিদগ্ধ মানুষ? শেলী তাঁকে দেয় মনের আরাম যা সাংসারিক জীবনে নীরদবরণ কোনওদিন পাননি, পাবেনও না। শেলীর সঙ্গে এই অবৈধ সম্পর্কের কথা নীরদবরণ যূথিকার কাছে গোপন করেননি। এমনকী বড় ছেলে ক্ষীরোদও তার খবর রাখে। একসময় এসব নিয়ে স্বামীর সঙ্গে অনেক অশান্তি করেছে যূথিকা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। নীরদবরণের একটাই কথা ;—সাংসারিক সব দায়দায়িত্ব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবেন। আবার শেলীর সঙ্গে সম্পর্কও রাখবেন। যূথিকাকে তা মেনে নিতে হবে। সময় সবকিছু মানিয়ে নেয়। স্বামীর এই দ্বিতীয় জীবন যূথিকাও কবে থেকে যেন মেনে নিয়েছে।

নীরদবরণ যে আজ আসবেন তা শেলীকে খবর পাঠাননি। কিছুই না। ফোনেও শেলীকে খবরটা জানানো যেত। কিন্তু নীরদবরণ ইচ্ছে করেই খবর দেননি। হঠাৎ চলে এসে তিনি শেলীকে আসলে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছেন। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীরদবরণ দোতলার ঘরে এলেন। এটা এ-বাড়ির ড্রয়িং-রুম। মেঝেতে পুরু কার্পেট। জানলায় ভারি পর্দা। উঁচু সিলিং। ফ্লুরোসেন্ট আলো। ইলেকট্রিক ফ্যান। শো-কেস। দেয়ালে কয়েকটা অয়েল-পেন্টিং। সবই পুরনো কলকাতার। উনিশ শতকের। ইংরেজ শিল্পীর আঁকা। পুরু গদি-আঁটা সোফা, সেন্টার-টেবিল। সোফার ওপর বসে নীরদবরণ বললেন—হঠাৎ চলে এলাম। খুব অবাক হয়েছ শেলী?

—তা একটু অবাক তো হয়েছি। আমি জানি তুমি সারপ্রাইজ দিতে পছন্দ কর। অফ কোর্স তুমি একটু রিস্ক নিয়েছ....।

—রিস্ক? হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আজ তো হস্‌পিটালে আমার নাইট-ডিউটি থাকতে পারত। তাহলে তো আজ তুমি আমাকে পেতে না। ফরচুনেটলি আমার আজ ডে-ডিউটি ছিল।

—তুমি না থাকলে আমি চলে যেতাম। আমার নিজের বাড়ি তো আছে?

—সেটা তো আছেই। এ বাড়িটাকে যে তুমি নিজের বাড়ি মনে করো না তা তো আমি জানি। এই কথাগুলো বলার সময় শেলীর গলা কি একটু বুজে এল? নীরদবরণ তাড়াতাড়ি বললেন—এই পৃথিবীতে মানুষের কোনও চিরস্থায়ী বাড়ি নেই। জানো তো আমাদের এক কবি আছেন। তাঁর নাম ডি. এল. রায়। তিনি লিখেছেন—হেসে নাও দুদিন বই তো নয়। আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো শেলী?

—কী...ডার্লিং?

—হিউম্যান লাইফ ইজ ওভারশ্যাডোড বাই ডেথ। তবুও আমরা বেঁচে থাকার জন্যে কী চেষ্টাটাই না করি। কিন্তু মৃত্যু তো যখন-তখন আসতে পারে। অ্যাট এনি টাইম ডেথ ক্যান অ্যাটাক ইউ আনঅ্যাওয়ারস।

শেলী বলল—তুমি তো সোজা অফিস থেকে আসছ ডার্লিং? ইউ নিড সাম রেস্ট, সাম গুড ফুড। ইট ইজ নট হাই টাইম ফর ফিলজফিক্যাল ডিসকাসন।

নীরদবরণ হাসলেন। সত্যিই তাঁর বেশ ক্লান্ত লাগছে। খিদেও যেন পাচ্ছে একটু।

তিনি বললেন—শেলী আজ রাতে এখানে থাকব। তোমার অসুবিধে নেই তো?

—ওমা অসুবিধে হবে কেন? ইট উইল বি মাই প্লেজার। ডার্লিং তুমি টয়লেটে যাও। ফ্রেশ হয়ে এসো। দেন হ্যাভ সাম ফুড।

—ফুড নয়। আই ওয়ান্ট ড্রিংকস। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ডু ইউ হ্যাভ স্টক?

—আই হ্যাভ ইট এনাফ।

—ড্রিংকস-এর সঙ্গে বিফ-কাবাব। ওহ ফ্যানটাসটিক জমবে। তারপর ডিনারে পরোটা অ্যান্ড সাম চিকেন, ইফ পসিবল।

—এভরিথিং ইজ পসিবল। তুমি টয়লেটে যাও ডার্লিং। আমি নাসরিনকে বলি রান্না শুরু করতে।

ঘণ্টাখানেক পরে দুজনে এই বাড়ির ছাদে গিয়ে বসল। এই ধরনের ছাদকে অবশ্য টেরাস বলা হয়। সারি সারি টবে অনেক গাছ টেরাস জুড়ে। মাঝখানে চেয়ার-টেবিল। আশেপাশে উঁচু হর্ম-সারি। মাথার ওপর নীল আকাশের চাঁদোয়া। সেখানে অপার্থিব আলো নিয়ে জ্বলছে নক্ষত্ররাজি। পরপর দু-পেগ টানার পর ভেতরটা যেন জুড়িয়ে গেল নীরদবরণের। প্লেটে গরুর মাংসের কাবাব। মাঝে মাঝে তার টুকরো মুখে দিচ্ছেন তিনি। শেলীও পরপর দু-পেগ খেল। সে আর খাবে না। একবারের জন্যে দু-পেগের বেশি মদ শেলী পান করে না। কয়েকদিনের মধ্যেই বোধহয় পূর্ণিমা। আকাশে প্রায়-ভরন্ত চাঁদ ভেসে যাচ্ছে মেঘের ভেলায়। শেলী ভারি গাউন ছেড়ে একটা স্বচ্ছ নাইটি পরে নিয়েছে। হালকা গোলাপী রং নাইটির। নীরদবরণ তাকিয়ে দেখছিলেন শেলীকে, তার ভাস্কর্যের মতন শরীরকে। চল্লিশ বোধহয় অনেকদিনই পেরিয়ে গেছে শেলী। তবুও তার স্তনের গড়ন কী আঁটোসাঁটো। যেন দুটো রসে ভরপুর বাতাবি লেবু অধোমুখ হয়ে আছে। নীরদবরণ ঈষৎ জড়ানো গলায় বললেন—কাম শেলী কাম ক্লোজার... মেক মি ইমমরট্যাল উইথ আ কীস...।

শেলী হাসল। বলল—এটা তো ক্রিস্টোফার মার্লোর ডক্টর ফস্টাস নাটক থেকে রিসাইট করছ; কিন্তু তার আগে দুটো কথা আছে সেটা বললে না? আসলে লাইনটা হচ্ছে—সুইট হেলেন মেক মি ইমমরট্যাল উইথ আ কিস। আমি কি তোমার হেলেন নই?

—তুমি আমার হেলেন-ক্লিওপেট্রা, দিয়োতিমা সব। এই বলে নীরদবরণ শেলীর কপালে চুম্বন করলেন। তারপর নাকে, ঠোঁটে, বুকের বিভাজিকায় এবং অবশেষে দুই স্তনের উপত্যকায় প্রবলভাবে আশ্রয় পেতে চাইলেন। শেলী অনেকক্ষণ নীরদবরণের মাথা তার দুই স্তনের ওপর চেপে ধরে রইল। ঠিক মা যেমন শিশুকে আদর করে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে বলল—ডার্লিং আজ তোমাকে খুব ওরিড মনে হচ্ছে। হ্যাজ এনিথিং ব্যাড হ্যাপেনড?

—তুমি কীভাবে বুঝলে আমি ওরিড?

—অল ওমেন হ্যাভ আ স্পেশাল ইনস্টিংক্ট।

নীরদবরণ সোজা হয়ে বসলেন। পেগে চুমুক দিলেন। একটা সিগারেট ধরালেন। কী যেন ভাবলেন একটু।

তারপর বললেন—আমি নিজের কাছে আজ ডিফিটেড শেলী।

—কেন? কী হয়েছে?

—আমি একটা ডিসিসান নিয়েছি যা হয়তো ঠিক হয়নি। শুভ্রার বিয়ের ব্যাপারটা নীরদবরণ সংক্ষেপে বললেন। সব শুনে শেলী বলল—ইটস, আ পারফেক্ট এগজামপল অব দ্যাট এজ-ওল্ড, প্রোভার্ব।

—হুইচ প্রেভার্ব?

—ম্যান প্রপোজেস অ্যান্ড গড ডিসপোসেজ....।

—ওসব কথা থাক শেলী। সংসার থাকলেই সেখানে কমপ্লিকেশন থাকবে। তুমি আমাকে একটা কবিতা শোনাও।

—আর ইউ রিয়েলি ইনটারেসটেড? দেন লিসেন—

And Come I may but go I must
And if men ask you why
You may pin the blame
On the stars or the Sun
The white Road, and the sky?

—বাহ বিউটিফুল! — নীরদবরণ শেলীর ঈষৎ ভারি কোমর জড়িয়ে আবৃত্তি করলেন—বঁধূ ছাড়িয়া না দিব তোরে/মরম যেখানে রাখিব সেখানে/ হেন মোর মনে করে। তারপর রাত আরও গভীর হল। কিন্তু নীরদবরণ আর শেলীর চোখে যেন ঘুম নেই। তাদের আনন্দের ভৃঙ্গার যেন উপচে পড়ছিল।

প্রায় সাতদিন নীরদবরণ হাওড়ার বাড়িতে যাননি। একদিন অফিসে বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদ এসে হাজির। বিশ্বদেব জানাল যে সে পরেরদিনই ঝালদাতে ফিরে যাচ্ছে। সবাইকে নিয়ে। আর শুভ্রাকেও সে ঝালদাতে নিয়ে যাচ্ছে। নীরদবরণ শুনলেন। কিছুই বললেন না। যেন শুভ্রার ব্যাপারে তিনি সব আগ্রহ হারিয়েছেন। কিংবা শুভ্রার প্রসঙ্গ এলেই তিনি বোধহয় কুঁকড়ে যান। পরাজয়ের বেদনা আবার তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। ক্ষীরোদ নীরদবরণের কাছে সংসার-খরচের কিছু টাকা চাইল। পার্স থেকে হাজার টাকা বের করে দিলেন নীরদবরণ। বিশ্বদেব কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—একটা কথা আপনাকে বলি। শাশুড়ি-মায়ের শরীর কিন্তু দিনদিন ভেঙে যাচ্ছে। তার ওপর আপনি তাঁকে মানসিক কষ্ট দিচ্ছেন। আপনার এবার বাড়িতে ফেরা উচিত। অন্য সময় হলে নীরদবরণ রেগে উঠতেন। আজ কিছু বললেন না। হয়তো বিশ্বদেব ঠিকই বলছে।

ছেষট্টি

১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে অহিংস-নীতির অনুসারী গান্ধীজি হঠাৎই জঙ্গি কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। প্রকাশ্যে গান্ধীজি ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এইভাবে—ইংরেজ তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও। হয় ভগবানের কাছে নয়তো অরাজকতার কাছে আমাদের ছেড়ে চলে যাও।...'Boundless anarchy is preferred to disciplined lawlessness.'। এটা গান্ধীজির বিখ্যাত উক্তি। 'সুশৃঙ্খল অরাজকতার তুলনায়

কল্পনাহীন নৈরাজ্য বরঞ্চ শ্রেয়।'

এদিকে জাপান ক্রমশ ব্রিটিশ কোণঠাসা করে ফেলছে সরাসরি যুদ্ধে। সিঙ্গাপুর, মালয় আর ব্রহ্মদেশ জাপানের আগ্রাসনের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। গান্ধীজি এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের মনে ভয় ধরে গেল ব্রিটিশ বোধহয় জাপানিদের আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তাঁরা দাবি তুললেন ক্ষমতা হস্তান্তরের। গান্ধীজি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, সেই সময়টাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুনভাবে শুরু করার পক্ষে আদর্শ। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজি-রচিত প্রবন্ধগুলি সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগল। তার ফল হ'ল সাধারণ মানুষ ক্রমশ স্বাধীনতার জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

চতুর ব্রিটিশরাজ সিঁদুরে মেঘ দেখে রীতিমতো ভয় পেল। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বিলেত থেকে এদেশে এসে পৌঁছলেন স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস। ব্রিটিশ সরকারের দূত হয়ে তিনি এসেছিলেন। উদ্দেশ্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। উভয় পক্ষ বৈঠকে বসল। দফায় দফায় চলল আলোচনা। কিন্তু লাভ কিছু হল না। কারণ রাজনৈতিক জটিলতার সমাধানসূত্র হিসেবে ক্রিপস যে প্রস্তাব দিলেন তা জাতীয় কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। ক্রিপস মিশন ভেস্তে গেল। তাতে গণ-আন্দোলনের ধিকিধিকি আগুনই যেন আরও জ্বলে উঠল। কংগ্রেস প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে আদৌ আগ্রহী নয়। সুতরাং সরাসরি সংগ্রামে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নেতারা এবং আন্দোলনকারীরা, সবাই তখন যেন ফুঁসছে।

দেশের আবহাওয়া রীতিমতো উত্তপ্ত। রাস্তাঘাটে ইংরেজদের দেখলেই যেন মানুষের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর বিরক্তি। এরকম সময়েই ১৯৪২-এর ৮ অগাস্ট বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হল। সেই অধিবেশনে আলোচনার মূল বিষয় ছিল, বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীব পূর্ণ স্বাধীনতার সম্ভাবনা। এই অধিবেশনেই কংগ্রেস সেই ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের মূল কথা হ'ল, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের জন্যে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং জাতীয় সরকারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অনুরোধ করে গান্ধীজিকেই। দেশবাসীর কাছে গান্ধীজি আবেদন রাখলেন সমবেতভাবে সেই আন্দোলনের শরিক হবার জন্যে। তিনি ডাক দিলেন—ডু অর ডাই, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।' শুরু হয়ে গেল ঐতিহাসিক অগাস্ট বিপ্লব।

'দ্য নেকেড ফকির'—গান্ধীজীর নেতৃত্বে হইহই করে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে আর ব্রিটিশ সরকার চুপচাপ বসে মজা দেখবে, তা কি হতে পারে? নিজেদের দমন-নীতি যথারীতি চালু করে দিল তারা। ৮ই অগাস্ট 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল কংগ্রেস। আর তার পরদিন—৯ই অগাস্ট গান্ধীজি, নেহরু, আবুল কালাম আজাদ ও অন্য আরও প্রথম সারির নেতাদের একে একে জেলে ভরে দিল ব্রিটিশ সরকার। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং নানা প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলি সকলকেই বে-আইনি ঘোষণা করল ব্রিটিশ সরকার। এসব ক্ষেত্রে বরাবর যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। বাড়াবাড়ি শুরু করল ইংরেজ-পুলিশ। এলাহাবাদে কংগ্রেসের প্রধান অফিসের দখল নিয়ে তালাবন্ধ করে দিল তারা। ব্রিটিশের সেই পরিকল্পিত দমন-নীতির বিরুদ্ধে সারা দেশ প্রতিবাদে গর্জন করে উঠল। নানা জায়গায় কাতারে কাতারে মানুষ বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। শোভাযাত্রা, হরতাল শুরু হল। সরকারও কিছু কম যায় না। রাতারাতি ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমিতি সব নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কিন্তু আইন করে কি বিদ্রোহী জনতাকে

রোধ করা যায়? দিকে দিকে শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। হাসপাতালে কাজ বন্ধ। স্কুল-কলেজে তালা। কারখানায় লক-আউট। ছাত্ররা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আন্দোলনকারীদের। নির্বিচারে লাঠিচার্জ শুরু কবল পুলিশ। তরুণদের তাজা রক্তে ভিজে উঠল রাজপথ।

নীরদবরণ সেদিন সকালে অফিসের গাড়িতে যাচ্ছিলেন অফিস। ডালহৌসির মোড় তাঁর সামনের দিকে এগোবার উপায় নেই। সারি সারি গাড়ি নিথর দাঁড়িয়ে। পুরোপুরি ট্রাফিক জ্যাম। তখনও নীরদবরণ জানেন না গান্ধীজি, নেহেরু এবং অন্যান্যদের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর। খবরের কাগজ-দ্য স্টেটসম্যান তাঁর হাওড়ার বাসায় সকালেই চলে আসে বটে ; কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া সাতসকালে তাঁর তা উলটে দ্যাখা হয় না। সংবাদপত্র পড়বার একটা ধরাবাঁধা সময় আছে নীরদবরণের। সেটা হ'ল অফিসে লাঞ্চ টাইমের পর লাঞ্চের জন্যে অনেকটা সময় ধার্য আছে। লাঞ্চ খেতে খেতে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতে বেশ লাগে তাঁর।

—গান্ধীজি নেহরু অ্যারেস্টেড? তাজা খবর? তাজা খবর? একজন হকার হাতের সংবাদ পত্রগুলো মাথার ওপর তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। তার চারপাশে মুহূর্তে ভিড় জমে গেল কৌতূহলি ক্রেতাদের। সামনের চকচকে কালো আস্টিন থেকে একটা সাদা, বলিষ্ঠ হাত বেরিয়ে এল হকারের দিকে। শ্বেতাঙ্গের হাত। হকার সংবাদপত্র এগিয়ে দিল। পয়সাও বুঝে নিল। নীরদবরণ ততক্ষণে তাঁর সংবাদপত্র চোখের সামনে মেলে ধরে পড়তে শুরু করেছেন। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর। গান্ধীজি ব্রিটিশের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন—কুইট ইন্ডিয়া। সারা দেশ আন্দোলনের আগুনে জ্বলছে। হঠাৎ নীরদবরণ কান পাতলেন। একটা হট্টগোল বেশ কিছুক্ষণ ধরে অস্পষ্টভাবে কানে ভেসে আসছিল বটে। এখন সেই গোলমাল ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। গাড়ির ড্রাইভার রহমান অনিশ্চিতভাবে চুপচাপ বসেছিল। নীরদবরণ তাকে জিগ্যেস করলেন—কীসের জন্যে এত জ্যাম?

—বলতে পারচিনে স্যার। রহমান বলল। মনে হচ্ছে এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে কোনও মিছিল আসচে।

—একবার নেমে দ্যাখো তো?

নীরদবরণের নির্দেশমতো রহমান গাড়ির দরজা খুলে নামল। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তাকে আর দ্যাখা যাচ্ছে না। নীরদবরণ বেশ গরম অনুভব করছিলেন স্থাণুবৎ গাড়িতে বসে। জুলাই মাস। এতক্ষণ 'মনসুন' এসে যাবার কথা। কিন্তু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। বৃষ্টিরও দ্যাখা নেই। সকাল থেকেই আকাশে জ্বলন্ত গোলক যেন সব ভস্ম করবার জন্যে উঁচিয়ে আছে। ভস্ম কেউ না হক ; অন্তত চাপা, বিজবিজে গরমে ভাজা ভাজা তো হচ্ছে। নীরদবরণের মনে হচ্ছিল টাইয়ের ফাঁসটা একটু আলগা করে দেন। দিলেনও। অফিসে ঢুকে নিজের চেম্বারে চেয়ারে বসবার আগে টয়লেটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার ধোপদুরস্ত করে নেওয়া যাবে। রহমান এসে খবর দিল কার্জন পার্কের কাছে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

—কী ধরনের গোলমাল?

—স্বদেশিরা মিছিলে লিয়ে আসতেচে স্যার? তারা বড়লাটের সঙ্গে দ্যাখা করতে চায়।

—বড়লাটের সঙ্গে দ্যাখা?...নীরদবরণ বিড়বিড় করলেন ;—ধুর? ইমপসিবল?...বড়লাটের কাছে এভাবে পুলিশ ঢুকতে দেবে?

—মেলা পুলিশ নামিয়েচে স্যার?

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে স্যার...পুলিশ লাঠি হাতে ব্যারিকেড করে দাঁইড়ে আচে। স্বদেশীরা ব্যারিকেড ভাঙলেই লাঠিচার্জ শুরু হবে।

—তাহ'লে তো ট্রাফিক জ্যাম কাটবে না? অফিসে পৌঁছব কীভাবে?

—অফিস কি স্যার হবে আজ? সারা দেশ জুড়ে তো স্বদেশিরা হরতাল ডেকেচে? গান্ধী লোকটার ক্ষ্যামতা আচে স্যার। পুলিশ হাজতে থেকে এক একটা বকুনি ঝাড়তেচে আর স্বদেশিরা রে রে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেচে? রহমানের এই বকবকানিতে নীরদবরণ তেমন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। তিনি ব্যাজার মুখ করে বসে রইলেন। আবার জানতে চাইলেন রহমানের কাছে—আচ্ছা, ইডেন গার্ডেনসের পাশ দিয়েও তো আমরা বেরিয়ে যেতে পারি।

—পারতুম স্যার! এখন আর পারব না আজ্ঞা?

—কেন?

—আমাদের আগে যেসব গাড়ি দাঁইড়ে আচে তাদের দু-একজন ডেরাইভারকে জানলুম যে ওদিকেও পুলিশের ব্যারিকেড। কাউকে আসতেও দিচ্চে না, যেতেও দিচ্চে না...।

—ভাল ঝামেলায় পড়া গেল তো?...ডিসগাস্টিং। কী আর করা যায়? নীরদবরণ খবরের কাগজেই চোখ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেভাবে কিছু পড়ছিলেন কি? বরং ভাবছিলেন। এত বড় বড় নেতাদের ধরে ধরে জেলে পুরে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার? এটা কি ঠিক কাজ করল? দেশে আগুন জ্বলে গেছে। সে আগুন কবে নিভবে? সত্যিই কি স্বাধীনতা আসবে আমাদের? সে স্বাধীনতার রকম কেমন হবে? ইংরেজরা চলে যাবে দেশ ছেড়ে? কলকাতা ছেড়ে? তাহলে পার্ক স্ট্রিটে কারা থাকবে? হোটেল এবং বারগুলো কি বন্ধ হয়ে যাবে? কোট-প্যান্ট-টাই ছেড়ে কি ধুতি-পাঞ্জাবি বা ধুতি-শার্ট পরে বাইরে বের হতে হবে? সাহেবরা এ-দেশ ছেড়ে গেলে তাদের কোম্পানিগুলোও নিশ্চয়ই পাততাড়ি গোটাবে। তাইলে কি নীরদবরণের মতন মানুষেরা বেকার হয়ে যাবে? হতে পারে না...হতে পারে না।...বিড়বিড় করছিলেন নীরদবরণ। নো-ইট কানট বি-ইট কানট বি? ব্রিটিশদের অনেককিছু ভালবেসে ফেলেছেন নীরদবরণ। তাদের নিয়মানুবর্তিতাকে ভালবেসেছেন। তাদের সাহিত্য, ভাষা, খাদ্য, মদ্য এমনকী নারীদেরও ভালবেসেছেন। ব্রিটিশরা চলে গেলে এত বড় দেশ চালাবে কারা? স্বদেশিরা? কে প্রাইম মিনিস্টার হবে? ঐ গান্ধীজি? ধুর ধুর ঐ টাকামাথা, নিকেলের চশমা-পরা লোকটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না নীরদবরণ। লোকটা নাইস ইংলিশ লিখতে পারে বটে। কিন্তু কখন যে কী বলে তার ঠিক থাকে না। ধর্ম আর রাজনীতিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইছে লোকটা। তাই কখনও হয়? নীরদবরণের বিশ্বাস ধর্মের বাণী আর রাজনীতির আদর্শের মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। দুটোর কোনওটাকেই অবশ্য তিনি পছন্দ করেন না। তিনি ধর্মভীরু নন। বলা যায় নাস্তিক। আবার, রাজনীতি যারা করে তাদের 'লেসার মর্টাল' (Lesses Mortal) বলে মনে করেন।...আচ্ছা তর্কের খাতিরে ধরা যাক দেশের চেহারা রাতারাতি বদলে গেল। ব্রিটিশ ভারত ছাড়ল। স্বদেশিরা এল গভর্নমেন্টে। তাহ'লে কী হবে? ঐসব অশিক্ষিত, সংকীর্ণমনা লোকগুলো কি এত বড় একটা দেশ চালাতে পারবে? এরা তো নিজেদের মধ্যে খালি ঝগড়াঝাঁটি করে। এ ওকে দেখতে পারে না। ও একে। এভাবে এই দেশ চলবে? ধুর ধুর? গান্ধীজি লোকটা গদিতে বসলে সবাইকে শুধু হাঁটু পর্যন্ত খদ্দর পরাবে আর চরকা কাটতে হবে সারাদিন। বরং নেতাজি লোকটা যদি এদেশে এখন থাকত, তাহ'লে কিছু কাজের কাজ হত। ব্রিটিশসিংহ যদি কাউকে, কোনও ইন্ডিয়ান কিংবা বাঙালিকে এখনও ডরায় তো সে হ'ল এই লোকটা—সুভাষচন্দ্র বসু—নেতাজি। সত্যি ঐ একজনকেই নীরদবরণও মনে মনে যথেষ্ট সমীহ করেন। প্রকৃত শিক্ষিত লোক। ইংরেজিতে বলতে কইতে

পারে। আর তেমনই ডাকাবুকো। ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করেছিল বলে ইংরেজ প্রফেসর গুটেনের মুখে ঘুসিই মেবে বসেছিল? এরকম সাহসই তো চাই। ওসব অহিংস নীতি; —নন-ভায়োলেন্স—সবই তো দুর্বলের উচ্চারণ। ব্রিটিশ ওতে ভয় পায় না। তুমি আমাকে একটা থাপ্পড় মারলে আমি অন্য গাল এগিয়ে দেব। এটা ফিলজফি হতে পারে। কিন্তু এই নীতিতে ব্রিটিশকে এ-দেশ থেকে তাড়ানো যাবে না। গান্ধীর এই নীতিকে একেবারেই সমর্থন করেন না নীরদবরণ। অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাস্তায় ভারতের স্বাধীনতা আনতে চাইছেন সুভাষ। ইংরেজের পুলিশও তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। তাদের নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে পারেনি। তাদের নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছেন বিদেশে সত্যিই কি অ্যাডভেঞ্চারের জীবন? কোনও ভেতো বাঙালির পক্ষে যে এসব সম্ভব তা তো সুভাষচন্দ্রের কীর্তিকলাপের আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। কোথাও আত্মগোপন করে আছেন তিনি? কেউ বলে জার্মানিতে, কেউ বলে ইটালিতে আবার কেউ বলে জাপানের অধীশ্বর তোজোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাইছেন। মণিপুর কিংবা বার্মা সীমান্ত দিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে ভারতে ঢুকতে চাইছেন। জাপান নাকি তাঁর পেছনে আছে। এসব কি সত্যি? কে জানে? কতরকম উড়ো খবর কানে আসে। সংবাদপত্রেও অনেক খবর প্রকাশিত হয়। কোন্‌টা যে ঠিক সত্যি বোঝা যায় না। সুভাষের ব্যাপারে সবাই, সারা দেশবাসী সম্ভবত বিভ্রান্ত। কিন্তু মনে মনে তিনি সুভাষকেই পছন্দ করেন। মাঝে মাঝে রেডিওতে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ শোনেন। ওফ কী ইংরেজিই না জানে লোকটা? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা মডার্ন রিভিউ-তে নীরদবরণ সুভাষের দু-একটা লেখা পড়েছেন। পড়ে লোকটার ইংরেজি স্টাইলের তারিফ করেছেন তিনি মনে মনে।

—স্যার এবার গাড়ি মনে হয় আগাচ্চে।

—রহমান জানাল।

—এগোচ্চে? ডু ইউ থিংক সো? তাহ'লে তুমিও এগোও।

রহমান ঠিকই বলেছে। কার্জন পার্কের কাছে অবরোধ বোধহয় উঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ। গাড়িগুলো চলতে শুরু করেছে। রহমানও গাড়িকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নীরদবরণ স্বস্তি বোধ করলেন। পাইপটা ধরিয়ে নিলেন। কড়া তামাকের গন্ধ গাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ পুলিশকে বেশ তৎপর হয়ে উঠতে দ্যাখা গেল। একজন লালমুখো গোরা সার্জেন্ট রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কীসের নির্দেশ দিচ্ছে। আর পুলিশরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী লাঠি হাতে ছোটাছুটি করছে। তাদের পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাঁকি প্যান্ট, সাদা উর্দি, পায়ে ভারী জুতো আর মাথায় লাল পাগড়ি।

লাইন ধরিয়ে শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে সব গাড়ি। সামনের দিকে বেশ কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল নীরদবরণের। একজন যুবকের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে পুলিশ। তার ওপর বোধহয় লাঠিচার্জ হয়েছে। মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে নামছে কপাল বেয়ে। কিন্তু তাতেও যেন ভ্রুক্ষেপ নেই যুবকের। সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো। কুইট ইন্ডিয়া। কুইট ইন্ডিয়া। মৃদুভাবে চলন্ত গাড়ির জানলায় পাইপ-মুখে নীরদবরণের সঙ্গে যেন চকিতে একবার দৃষ্টিবিনিময় হল যুবকের। নীরদবরণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কীরকম এক অপরাধবোধে ভরে উঠল তাঁর মন। ঐ যুবক বাঙালি, ইন্ডিয়ান, স্বাধীনতার জন্যে রক্ত ঝরতে দিচ্ছে তার শরীর থেকে। পুলিশ তাকে মেরেছে। হাজতে নিয়ে যাচ্ছে, তাতেও তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে কিন্তু বীরদর্পে বলে চলেছে—কুইট ইন্ডিয়া। এই আবেগের সবটাই কি মিথ্যে? আন্দোলনকারীদের চাপে পড়ে সত্যিই কি ব্রিটিশ এবার ভারত ছাড়বে? রহমান বলল—সামনে বোধহয় মিছিলের ওপর পুলিশ

বেধড়ক লাঠিচার্জ করতেচে স্যার। খুব গোলমাল হচ্চে। ...কান পেতে শুনলেন নীরদবরণ। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে। অবরোধ তুলে দিয়েছে। রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে চাইছে। ফলে লেগে গেছে গোলমাল। রাস্তায় পুলিশে পুলিশ ছয়লাপ। কানে আসছে সমবেতস্বরে উদাত্ত গর্জন—কুইট ইন্ডিয়া কুইট ইন্ডিয়া। হুড়োহুড়ি, ছোটাছুটি। নির্বিচারে লাঠিচার্জ করছে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের অনেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ছে। তাও ক্ষান্ত দিচ্ছে না পুলিশ। লাঠি চালিয়ে যাচ্ছে। উঃ কী মর্মান্তিক দৃশ্য! নীরদবরণ আর দেখতে পারলেন না। আতঙ্কে চোখ মুদে ফেললেন। স্বজনদের ওপর পুলিশের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে রহমানও যেন একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। থেমে গিয়েছিল তার গাড়ি। হঠাৎ লালমুখো সেই গোরা সার্জেন্ট লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—হে ড্রাইভার হোয়াই সো স্লো? মুভ ফরওয়ার্ড মুভ ফরওয়ার্ড? পিছে সে বহুত গাড়ি হ্যায় জানতা নেহি? আরও কী যেন সব বলে যাচ্ছিল সার্জেন্ট। পাইপ-মুখে নীরদবরণ তার দিকে কটমট চোখে তাকালেন। তাঁকে নজর করেই সার্জেন্ট বোধহয় গলার স্বর নরম করল। বলল—বাবু, প্লিজ আসক ইওর ড্রাইভার টু মুভ ফরওয়ার্ড আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি এগেইন ট্রাফিক জ্যাম। নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন—ডু ইউ থিংক ইট'স সেফ টু মুভ ফরওয়ার্ড? দ্য প্রসেসনিস্টস হ্যাভ প্রবাবলি ইরেকটেড আ ব্যারিকেড দেয়ার...।

—নো বাবু।...ইয়েস ইউ আর কারেক্ট। দে-দ্য বাসটার্ডস ইরেকটেড আ ব্যারিকেড, বাট উই হ্যাভ ব্রোকেন থ্রু দেম। নাও দ্য রোড ইজ ক্লিয়ার। ইউ মে গো ফরওয়ার্ড সেফলি।

প্রথামতো নীরদবরণ গোরা সার্জেন্টের উদ্দেশে 'থ্যাংক ইউ' ছুড়ে দিলেন বটে; কিন্তু আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে উচ্চারিত 'বাসটার্ডস্' শব্দটি শুনে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেল যেন। যারা আন্দোলন করছে তাঁরা তো তাঁর দেশেরই মানুষ। ওদের বেজন্মা বলা মানে সমস্ত ভারতবাসীকেই তো তাই প্রতিপন্ন করা। রাগে হাতদুটো নিস্‌পিস্‌ করে উঠল নীরদবরণের। বুকের মধ্যে কেমন জ্বালা করে উঠল। একেই কি পরাধীনতার জ্বালা বলে? এখন কলকাতার রাজপথ আবার পুরোপুরি পুলিশদের দখলে। বিক্ষোভকারীরা রীতিমতো ছত্রভঙ্গ। তারা শুধু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে—পূর্ণ স্বরাজ চাই। উই ওয়ান্ট এনটায়ার ফ্রিডম। ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো? কুইট ইন্ডিয়া। মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ। জওহরলাল নেহরু জিন্দাবাদ। ...লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লাল-পাগড়ি-ধারী পুলিশ' বিক্ষোভকারীরা পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে না। পালিয়ে যাচ্ছে না। এরকম ইঁদুর-বেড়াল খেলা কতক্ষণ চলবে? সারা দেশে যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা নিভবে কবে? চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক পুলিশ-ভ্যান (যেন অতিকায় কালো যতদূতের মতন। —উপমাটা হঠাৎই মনে হল নীরদবরণের) ছুটে যাচ্ছে। প্রতিটি গাড়ি বিক্ষোভকারীদের দিয়ে বোঝাই। তারস্বরে স্লোগান দিচ্ছে তারা—কুইট ইন্ডিয়া। কুইট ইন্ডিয়া। বেলা সাড়ে দশটার সময়েও কীরকম অবসন্ন বোধ করতে লাগলেন নীরদবরণ। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঠোঁটের পাইপ কখন নিভে গিয়েছিল। কার্জন পার্কের গুলতানি পেরিয়ে গাড়ি এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে গেছে। এবার পার্ক স্ট্রিট ধরবে। তারপর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে বাঁক নিয়েই নীরদবরণের অফিস। আই নিড সাম ড্রিংকস—ওয়ান অর টু সিপস অ্যাট লিস্ট টু রিভাইভ মাইসেলফ?—বিড়বিড় করছিলেন বাঙালি সাহেব।

সাতষট্টি

কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত ধরে বিশ্বদেব আনমনে হাঁটছিল। এখন বেলা একটা বাজে। আজ অনেক ভোরে হাওড়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বিশ্বদেব। এক কাপ চা আর দুটি মাত্র বিস্কুট গলাধঃকরণ করে। জরুরি কাজেই বেরিয়ে ছিল সে। এত সকালে বিশ্বদেবকে বাড়ি থেকে বের হতে দেখে সবাই একটু অবাকই হয়েছিল অবশ্য। বিশেষত যূথিকা, সুনীতি আর ক্ষীরোদ। আর কারোর সঙ্গে বিশ্বদেবের তেমন কথাবার্তা হয় না। ঐ তিনজন ছাড়া এ-বাড়িতে আরও তিনজন আছে। স্বয়ং বাড়ির কর্তা—নীরদবরণ আছেন। আর আছে অসিতবরণ এবং বারিদবরণ। নীরদবরণের সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় হয় না বললেই চলে। বিশ্বদেব সচেতনভাবে তাঁকে এড়িয়ে যায়। কী কথা বলবে? শ্বশুরকে দেখলেই বিশ্বদেবের মনে হয় যে, তার অত সুন্দরী, ফুটফুটে, বুদ্ধিমতী বড় মেয়েটার জীবনকে অসুখী করার জন্যে দায়ী তিনি। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছাকেই তিনি বরাবর গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। অপরের মতামতকে গ্রাহ্য করতে চাননি কখনও। কী দরকার ছিল সাত-তাড়াতাড়ি কাটোয়ার ঐ কেলটে ছোকরাটার সঙ্গে সুবুর বিয়েটা দেওয়ার? মেয়েরা লগ্নভ্রষ্টা হয় শোনা গেছে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও যে এসব নিয়ম চালু আছে তা বিশ্বদেবের জানা ছিল না। কাটোয়ায় বিয়ে করতে গিয়ে মনীশ দেখল পাত্রী বাড়ি থেকে পালিয়েছে তার প্রেমিকের সঙ্গে। বিয়ে না করে সে ফিরে আসতে পারত। আবার অন্য কোনও পাত্রীপক্ষের সঙ্গে তার সম্বন্ধে হতে পারত। হত তো হত? নীরদবরণকে কে দায়িত্ব দিয়েছিল তাঁর নাতনির সঙ্গে জোর করে মনীশের বিয়ে দিতে? সুবু নাকি অনেক ওজর আপত্তি তুলেছিল। মনীশের মতন মিশমিশে কালো ছেলেকে সে বিয়ে করবে না, সে গ্রামে গিয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু নীরদবরণ নাতনির এসব আপত্তিতে কান দেননি। নিজের ব্যক্তিত্বের জোর খাটিয়েছেন সুবুর ওপর। অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে মেয়েটাকে বাধ্য করেছেন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। আর তার ফল যে কী মর্মান্তিক সে তো নিজের চোখে দেখেছে সবাই। এখন এর শেষ পরিণতি কী? সুবু কি শেষ পর্যন্ত স্বামীর ঘর করতে চাইবে? এখনও তাকে যা দেখেছে বিশ্বদেব তাতে এটুকু বলতে পারে যে, সুবুর মন ফিরবে না। মনীশের সঙ্গে সে মেমারিতে যাবে না। থাকবে না সেখানে। সতীশবাবুরা কিন্তু সুবুকে ফিরিয়ে নিতে এখনও আগ্রহী। মাঝে মাঝে দুপুরের দিকে ফোন আসে বাড়িতে। এখন দুপুরবেলা বিশ্বদেব দোতলার বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা এসব পড়াশোনা করে। দুপুরে গড়পড়তা বাঙালির মতন ভরপেট খেয়ে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে নাক ডাকাবার অভ্যাস, কোনওকালেই নেই বিশ্বদেবের। সে ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান ভঙ্গিতে বসে টুকটাক পড়াশোনা করে। একতলার ঘরে ক্ষীরোদ নিশ্চিন্তে দিবানিদ্রা দেয়। তার পাশের ঘরে সুনীতি আর যূথিকা ; মা আর মেয়ে দুপুরের নিরিবিলিতে গুজুর গুজুর-ফুসুর ফুসুর করতে করতে কখন যেন ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করে। সুবু এখন এ-বাড়িতে নেই। সে শেওড়াফুলিতে তার মাসিমার বাড়ি কদিন বেড়াতে গেছে। সুনীতিরা দু-বোন। ছোটবোনের স্বামী নরেন ;—সুবুর মেশোমশাই জোর করে তাকে নিয়ে গেছে নিজের বাড়ি। নরেনদের এক ছেলে এক মেয়ে। সুবু তাদের দুজনের থেকেই বড়। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব ধরে, এখানে সেখানে বেড়িয়ে কয়েকদিন কাটাক না মেয়েটা। একটু তো চেঞ্জ হবেই। মানসিকভাবে সুবুও নিশ্চয়ই ভাল নেই। শুকনো মুখ নিয়ে এ-বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কীরকম একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব। শেওড়াফুলিতে কদিন বেড়িয়ে এলে তার ভালই হবে। সুতরাং বিশ্বদেবও আপত্তি করেনি আরও দুজন অধিবাসী এ-বাড়িতে আছে। অসিতবরণ আর বারিদবরণ দু-ভাই। অসিত তো

সকালের দিকে কলেজে বেরিয়ে যায়। আর বারিদ স্কুলে। তাদের সঙ্গে আর কতক্ষণ কথা বলার সুযোগ পায় বিশ্বদেব।

ঠিক দু-দিন আগে দুপুরের দিকে দোতলার বৈঠকখানার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছিল। সাধারণত এ-বাড়ির টেলিফোনটি মূক থাকতেই ভালবাসে নীরদবরণ বাড়িতে থাকলে অবশ্য প্রায়ই টেলিফোন ব্যবহার হয়। তিনি নানাজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। দুপুরবেলা আচমকা টেলিফোন বেজে ওঠায় বিশ্বদেব প্রথমে চমকে উঠেছিল। তারপর দোনোমনো করছিল। কার ফোন হতে পারে? রিসিভার তুলবে নাকি ওটা বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে নিজে থেকেই থেমে যাবে? তারপরই মনে হ'ল, অফিস থেকে নরেন ফোন করে সুবুর খবরাখবর দিতে পারে। তুলব না তুলব না করেও বিশ্বদেব রিসিভার তুলে জিগ্যেস করেছিল—হ্যালো? কে বলছেন?

—কী মশাই আপনারা সব কেমন আচেন? ফ্যাঁশফেঁসে গলায় এরকম প্রশ্ন শুনে বিশ্বদেব থমকে যায়। কার গলা? চেনা চেনা মনে হচ্ছে তবুও যেন ঠিক মনে পড়ছে না।

—কে কথা বলচেন?

—আমি মেমারি থেকে সতীশ মুখুজ্যে কতা বলচি। মশাইয়ের নামটা জানতে পারি কি?

—বিশ্বদেব ভট্টাচার্য...।

—...বিশ্বদেব?...ও হো হো আপনি তো স্বয়ং বেয়াই। ঝালদাতে-কর্মস্থলে ফেরেননি এখনো?

—আজ্ঞে না।

—তা ভালই তো।...আমার মামণি কেমন আচে?...মামণি?...সুবুর কথা জানতে চাইছে। বিশ্বদেব ঢোক গিলতে থাকে। কী বলবে সে?

—আমার মা-মণি একেবারে সাক্ষাৎ নক্ষী। তার অভাবে আমার বাড়ি খাঁ খাঁ করতেচে বেয়াই মশাই? আমার অবস্থাটা আপনারা বুঝুন একটু। মা-মণিকে পাঠিয়ে দিন। আর যদি বলেন তো—থেমে যান সতীশবাবু। বিশ্বদেব রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপচাপ থাকে।

—হ্যালো...হ্যালো...ও-প্রান্ত থেকে সতীশবাবু চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন।

—হ্যাঁ শুনচি তো...

—বেয়াই মশাই বলচেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে একটা কতা বলি।...যদি আমার মা-নক্ষীকে আপনাদের পৌঁছে দেবার অসুবিধে থাকে, তাহলে আপনার জামাই আর আমি গিয়ে না হয় ওকে নিয়ে আসব। বলুন কবে যাব? আজই যদি বলেন তো আজই...

—সতীশবাবু আপনাকে একটা কথা বলি।...শুনুন মন দিয়ে।

—হ্যাঁ—বলুন বলুন?

—আমার মেয়েকে আমি আর আপনাদের ওখানে পাঠাব না। আপনি আর অনুরোধ করবেন না আমাকে প্লিজ...।

—পাঠাবেন না?—বিশ্বদেব স্পষ্ট শুনল সতীশবাবুর গলার স্বর ভেঙে গেল। খুব খারাপ লাগছিল তার। ভদ্রলোক আসলে বেশ আবেগপ্রবণ এ ব্যাপারে কোনও ভুল নেই।

—পাঠাবেন না?...বিবাহিত মেয়েকে বাড়িতে বসিয়ে রাখবেন? এটা ঠিক কাজ হচ্ছে না বেয়াইমশাই। আপনারা শিক্ষিত মানুষ একটু ভেবে দেখুন...

—অনেক ভেবেছি। আর ভাবতে চাই না। আমার মেয়েকে আপনাদের বাড়িতে পাঠালে ও একেবারেই অ্যাডজাস্ট করে থাকতে পারবে না।...পারবে না আই অ্যাম শিওর। আমার মেয়ে

একটু অন্য টাইপ। এটা তার দোষ না গুণ সেটা এখনও বলার সময় আসেনি।

—বেয়াইমশাই? বেয়াইমশাই? আপনি ভুল করচেন? ভুল করচেন? হা ভগবান?...বিশ্বদেব বুঝতে পারছিল সতীশবাবু সত্যিই একেবারে ভেঙে পড়েছেন। রীতিমতো কাঁদছেন। কান্নাকাটি, বিশেষত পুরুষের কান্না একেবারেই পছন্দ নয় বিশ্বদেবের। এসব লাভও কিছু নেই। বিশ্বদেব ঠিকই বুঝেছে। শুভ্রা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তুমুল অশান্তি বাধাবে। মনীশের সঙ্গে ও ঘর করতে পারবে না। ওদের দুজনের মনের মিল হবে না। ভাঙা খেলাঘর জোড়া লাগবে না কখনো। সুতরাং তার সিদ্ধান্তই সঠিক।...তাহ'লে শুভ্রা কী করবে? সারাজীবন বাড়িতে বসে থাকবে? ওর নিজের সংসার হবে না? সন্তানসন্ততি হবে না? বিবাহিত জীবনের স্বাদ ও কি কখনও পাবে না? এসব গূঢ় ও জটিল প্রশ্ন নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চায়নি বিশ্বদেব। যা হয় হবে দেখা যাবে। শুভ্রা, সুবু বিশ্বদেবের প্রথম সন্তান। বড় ফুটফুটে মেয়েটা। দুধে-আলতা গায়ের রং। তার সবথেকে রূপসী মেয়ে। তাকে কাঁদতে দেখলে বিশ্বদেবের মনটা যেন আঁকুপাকু করে ওঠে। সুবুর চোখে জল সে একেবারে সইতে পারি না। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়েটা আবার শুধু কাঁদবে। খাবে না। জলস্পর্শ করবে না। স্বামীর সঙ্গে সহবাস করবে না। দুঃখ পাবে। শুধুই দুঃখ পাবে। দুঃখ পেতে পেতে মেয়েটার সোনার বরণ কালি হয়ে যাবে। এসব একেবারেই সহ্য করতে পারবে না বিশ্বদেব। তার ওপর যেরকম উগ্রচণ্ডী মেজাজ? হয়তো ক্ষেপে গিয়ে গলায় দড়ি-টড়ি দিতে গেল। কিংবা আগুনে পুড়ে মরতে গেল। সেই বিষম পরিণতির কথা ভাবতে বসলেই বিশ্বদেব শিউরে ওঠে। তার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। বুকের মধ্যে অস্বস্তি হয়। তার থেকে এই ভাল। তার এই সিদ্ধান্ত ;—মেয়েকে নিজের রাখা কী হবে পরে ভাবা যাবে। এখন তো মেয়েটা বাপ-মায়ের কাছে শান্তিতে থাক্। নাহ-সত্যিই তাই ;—সুবুর চোখে জল দেখলে বিশ্বদেবের বুকে যেন শক্তিশেল এসে বিঁধে যায়।

একদিন নীরদবরণ প্রসঙ্গটা নিজেই উত্থাপন করেছিলেন জামাইয়ের কাছে। বেশ কিছুদিন পার্কস্ট্রিটের বাড়িতে সেই 'বদ' মাগীটার কাছে কাটিয়ে আসার পর বিশ্বদেবের শ্বশুরমশাই আবার হাওড়াতে নিজের ডেরায় ফিরে এসেছিলেন। একদিন সকালে অফিস বেরোবার আগে স্যুট-টাই পরণে নীরদবরণ ব্রেকফাস্ট সারছিলেন দোতলার বৈঠকখানায় বসে। দু-পিস্ টোস্ট, ডিমের পোচ আর একটা আপেল। বাঙালিদের মধ্যে নিয়মিত ফল-টল খাওয়ার চল তেমন নেই। নীরদবরণ সাহেবদের থেকে ফ্রুটস খাবার অভ্যাসটা রপ্ত করেছেন। ব্রেকফাস্টে তো বটেই। এমনকী অফিসের লাঞ্চের সময়ও তিনি কোনও না কোনও ফল নেন। নীরদবরণ ব্রেকফাস্ট সারছিলেন। একটু দূরে, ঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটা বেতের মোড়ায় ম্রিয়মান ভঙ্গিতে বসেছিলেন যূথিকা। শাশুড়িকে স্বামীর সামনে এরকম জবুথবু এবং বিনীত ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখলেই বিশ্বদেবের গা-পিত্তি যেন জ্বলে যায়। স্বামী চিরটাকাল লাম্পট্য করে বেড়াল। তার জন্যে লোকটার কোনও অপরাধবোধ নেই। কিন্তু যূথিকাকে দেখলে মনে হয় অপরাধটা যেন তিনি করেছেন। সে কারণেই একমাথা ঘোমটা টেনে সঙ্কুচিত হয়ে আছেন স্বামীর সামনে। বিশ্বদেব আজকাল নীরদবরণকে এড়িয়ে চলে। একেবারে মুখোমুখি হতে চায় না। মনে মনে তার ভয় হয় নিজেকেই। নীরদবরণের বেঁটে-খাটো, সঙ-চেহারাটা দেখলেই বিশ্বদেবের মনে যত রাজ্যের খারাপ কথা ধেয়ে আসে। সেসব কথা উচ্চারণ করা মানে আবার ঝগড়া বিবাদ। আবার বাড়িতে অশান্তি। আসলে বিশ্বদেব দোতলার ঘরে এসেছিল স্টেটসম্যানটা নিতে। সে ভেবেছিল, নীরদবরণ চানঘরে গেছেন। ঘরে ঢুকতে গিয়ে শ্বশুরকে বহাল তবিয়তে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে সে ফিরে যাচ্ছিল? নীরদবরণ তাকে ডাকলেন—ওহে যাচ্ছো কোথায়? শোনো...

—আমাকে বলছেন?—প্রশ্নটা করেই তার মনে হল বোকামি হয়ে গেল।
—হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আর তো কেউ ধারে-কাছে নেই?
—বলুন?
—কী ডিসিসান নিলে?
—কী ব্যাপারে?
—সুবু-র ব্যাপারে।
—কী ডিসিসান নেব?
—ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে?...নাকি পাঠাবে না?

—পাঠাব না। এ বিয়ে সুবু-র পক্ষে সুখের হতে পারে না। বিশ্বদেব খেয়াল রেখেছিল কথাটা বলার সময় তার গলা যেন একটুও কাঁপে না। নীরদবরণ থমকে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত থেমে গিয়েছিল। খাবার নিয়ে মুখ নাড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তিনি বলেছিলেন—সুবুর ব্যাপারে এটাই কি তোমার ফাইন্যাল ডিসিসান?

—হ্যাঁ।

—...কাজটা ভাল করছ না বিশ্ব। বিয়ে হয়ে যাবার পর মেয়েকে বাবা-মায়ের কাছে দীর্ঘদিন থাকতে নেই। এতে মেয়েরা আনহ্যাপি হয়ে পড়ে।

—সুবু-র লাইফ যদি আনহ্যাপি হয়ে যায় তার জন্যে দোষী আপনিই। বিশ্বদেব বলেছিল।

কথাটা শুনে মুহূর্তে নীরদবরণের চোখদুটো যেন জ্বলে উঠেছিল। তারপরই তিনি যেন কুঁকড়ে গেলেন। মিনমিন করে বলতে শুরু করেছিলেন—আমাকে দোষারোপ তুমি করবে জানি। ভুল আমি করে ফেলেছি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলার সুযোগ আমি নিজেই তোমাদের কাছে এনে দিয়েছি। বাট বিলিভ মি? আমি সুবুর অনিষ্ট করতে চাইনি। আমি ওর মঙ্গলই করতে চেয়েছিলাম। মনীশ ছেলেটাকে দেখে আমাব ইনটুইশান বলেছিল এ সুবুর হাজবান্ড হবার পক্ষে উপযুক্ত। দে আর মেড ফর ইচ আদার। আমার ইনটুইশান কি তাহলে ভুল বলেছিল?

—আমি অতশত বুঝি না। আপনার মতন ওরকম শিক্ষার বড়াইও আমি করি না। ইনটুইশান, ফেট, প্রভিডেন্স, কোইনসিডেন্স ওসব করতে ভালবাসি। যা হোক সুবুর অসুখী জীবনের জন্যে আমি আপনাকেই চিরকাল দোষ দেব। আর আমার একটা রিকোয়েস্ট আপনার কাছে। আপনি আমাদের জন্যে, সুবুর জন্যে অনেক ভেবেছেন। আর ভাবতে হবে না। আমাদের ভাবনা আমাদেরই ভাবতে দিন।

এই কথা বলে বিশ্বদেব আর দাঁড়ায়নি। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এসেছিল।

আর মাত্র কয়েকদিন বিশ্বদেবরা আছে হাওড়ায়। ঝালদার অ্যারাতুন সাহেবের কাছে বিশ্বদেব দু-সপ্তাহের ছুটি চেয়েছিল। আজ নিয়ে দশদিন হল। আর চারদিন বাদেই ফেরার পালা। সে ঠিক করেছে শুভ্রাকেই এবার ঝালদাতে নিয়ে যাবে। ওখানে গালাকুঠিতে কয়েকদিন কাটাক মেয়েটা। হয়তো মনটা আবার ঠিক হয়ে যাবে। বড় মেয়েকে দিবারাত্র বিশ্বদেব হাসি-খুশি দেখতে চায়। অবশ্য ঝালদাতে আর কতদিন আছে বিশ্বদেব তার ঠিক নেই। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের ভাল শিক্ষা-দীক্ষা দরকার। মানুষ হওয়া দরকার। শুভ্রার জীবনটা তো কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল? ঝালদা থেকে চলে আসতে হ'লে তো আর বেকার হয়ে চলে আসা যাবে না? চাকরি-বাকরি হাতে থাকা দরকার। কলকাতায় চাকরির ব্যাপারে অ্যারাতুন-সাহেব তাকে সাহায্য করবেন কথা দিয়েছেন।

ঝালদার চাকরি সে ছেড়ে দেবে শুনে অ্যারাতুন প্রথমে হইচই করে উঠেছিলেন।...নো নো

বাবু দ্যাট কানট বি? আই কানট থিংক অব দ্যাট। উইদাউট ইওর অ্যাসিসট্যান্স আই উইল বি সিম্পলি হেল্পলেস। এই ফ্যাক্টরির শুরু থেকে তুমি আছ। ...তোমার ইনড্রাসট্রি আসনেস, তোমার অনেস্টি এবং প্রুডেন্স-কে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি বাবু। কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? তুমি চাও তো আমি তোমার স্যালারি আরও ফিফটি রুপিস ইনক্রিজ করে দিচ্ছি। তোমার বাংলোটা আরও ফারনিশ করে নাও। সোফাসেট পুরনো হয়ে গেছে। চেঞ্জ দেম?— এরকম অনর্গল বলেই যাচ্ছিল সাহেব। বিশ্বদেব অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করেছিল, বুঝিয়েছিল।...সাহেবের দৌলতে দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকবার সুযোগ-সুবিধা এখানে প্রচুর। কিন্তু সেটাই সব নয়। স্কুল এখানে ভাল নেই। থাকলেও সেখানে হিন্দি মিডিয়াম। সেখানে পড়ে ছেলেমেয়েরা বাংলা-ভাষা ভালভাবে শিখছে না। ইংরেজিটাও উত্তমরূপে শেখার সুযোগ কম। এ অবস্থা চলতে পারে না। ছেলেমেয়ের শিক্ষার কথা ভেবেই বিশ্বদেবকে কলকাতায় ফিরতে হবে। অ্যারাতুন-সাহেবের কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। অ্যাকাউন্টস আর মামলা-মকদ্দমার কাজ যে বিশ্বদেব একেবারে একা দেখত তা নয়। পান্নালাল বলে একটি যুবককেও সে কিছুদিন আগে ঝালদার গালা কারখানাতে কাজে লাগিয়েছে। পান্নালাল তার এক বন্ধুর ছেলে। হাসনাবাদে বাড়ি। অজ গাঁয়ের ছেলে হলেও ম্যাট্রিক পাস। আই এস' সি পড়তে পড়তে পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে বাড়িতে বসেছিল। বন্ধুর মুখে তার দুরবস্থার কথা শুনে বিশ্বদেব জানতে চেয়েছিল পান্নালাল সুদূর ঝালদাতে গিয়ে কাজ করতে পারবে কিনা। সে তো একপায়ে খাড়া। তার বাবা (বিশ্বদেবের সিটি কলেজের বন্ধু) কোনও আপত্তি করেনি। সেই পান্নালালকে আজ ক-বছর এই গালা কারখানাতে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে বিশ্বদেব। যদি বিশ্বদেব এখানকার চাকরি ছেড়ে দ্যায় তাহ'লে অ্যারাতুন-সাহেবের কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। পান্নালাল সব ঠিক ম্যানেজ করে দেবে। বিশ্বদেবের কথায় শেষমেশ সাহেব আস্থা রাখতে পেরেছেন। সাহেব যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং যুক্তিবাদী। ছেলেমেয়ের শিক্ষার সপক্ষে বিশ্বদেবের একের পর এক যুক্তি তাঁরও মনে বেশ ধরেছিল। বিশ্বদেব সাহেবকে বলেছিল, এতদিনের কর্মচারী হিসেবে সে শুধু সাহেবের কাছে একটা 'ফেরার' চায়।

সাহেব বলেছিলেন—কী ফেরার?...স্পিক আউট বাবু?

—আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে আপনাকে।

—চিঠি? কাকে চিঠি লিখব?...হোয়াই?

—কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আরমেনিয়ান কলেজের ফাদারকে একটা চিঠি পেলে ফাদার না করতে পারবেন না।

—নিশ্চয়ই লিখে দেব।...ডোন্ট ওরি বাবু। তোমার মতন কর্মী পেলে আরমেনিয়ান কলেজের ভাল হবে। ওখানকার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট লাভবান হবে।

সাহেব চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ঠিকই। সাহেবের সেই চিঠি নিয়ে বিশ্বদেব আজ সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আরমেনিয়ান কলেজের ফাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটে আরমেনিয়ান কলেজের গথিক স্থাপত্যের লাগোয়া, পেছনদিকে দোতলা, প্রশস্ত হোস্টেল। আর সেই হোস্টেলের পশ্চিমদিকে ফাদার জোসেফের বাংলো। ভেতরদিকে না এলে ঠিক বোঝা যায় না কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছবির মতন সাজানো সুন্দর একটা বাংলো আছে। ফাদারের বাংলোতে পৌঁছতে এলে কলেজের গেট পেরিয়ে, হস্টেলের পাঁচিল বাঁ-দিকে রেখে কিছুটা হেঁটে আসতে হবে। কলেজের গেটে চাপকান-পরলে, মাথায় পাগড়ি খানসামা মোতায়েন ছিল। বাইরের লোক চট করে ঢুকতে পারে না কলেজের প্রাঙ্গণে। অ্যারাতুন সাহেবের চিঠিটা ছাড়পত্র হিসেবে কাজ দিল। খানসামা কি ইংরেজি পড়তে পারে? লম্বা-চওড়া লোকটার থুতনিতে

ছাগলদাড়ি দেখে বোঝা গেল জাতে মুসলমান। বিশ্বদেবের মুখে সব শুনে, অ্যারাতুনের চিঠিটাতে একবার চোখ বুলিয়ে গালা-কারখানার সিলমোহর ইত্যাদি পরখ করে লোকটা বলল—আপ যাইয়ে। ফাদারের বাংলোর সামনে ছোট এবং নিচু কাঠের গেট। বিশ্বদেব এদিক-ওদিক তাকিয়েও ধারে-কাছে কাউকে দেখতে পায়নি। অগত্যা নিজেই গেট খুলে নুড়ি-বিছানো সরু রাস্তায় যেইমাত্র পা রেখেছে অমনি ঘাউ ঘাউ ঘাউ। কুকুরের ডাক। বিলিতি কুকুর যে সে তো ডাক শুনেই বোঝা যায়। আর এগোনো ঠিক হবে না। অনিশ্চিতভাবে বিশ্বদেব দাঁড়িয়ে গেল। নুড়ি-বিছানো রাস্তার দু-পাশে ফুলের বাগান। হরেকে রকমের ফুল ফুটে জায়গাটা আলো করে রেখেছে। বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার পরনে পাজামা আর শার্ট। এও একজন ভৃত্য বলে মনে হল। তার হাতে সাহেবের চিঠিটা ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বদেব অপেক্ষা করছিল। সে শুনতে পাচ্ছিল মিহি গলায় কেউ একজন কুকুরটাকে বলছে—প্লিজ জিমি ডোন্ট শাউট। বী কোয়ায়েট...।

পাজামা-শার্ট পরনে লোকটা খানিক বাদেই ফিরে এসে জানাল—আসুন-ফাদার ডাকতেচেন।

বাংলোতে ঢুকেই সামনে বেশ বড় ও চওড়া পারলার। সোফাসেট ও ছোট ছোট চেয়ারে সাজানো। বাড়ির ভেতরেও এখানে সেখানে রঙিন টবে বাহারি ফুলের গাছ। একটা সোফায় বসেছিলেন ফাদার। তাঁর ঠিক পেছনের দেয়ালে আটকানো ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রিস্ট। তাঁর চোখে জলবিন্দু ঝরে পড়ছে। আচমকা দেখলে সত্যি বলে মনে হয়। ফাদার কৃশকায়, ফর্সা, কালো গাউন পরনে, চোখে চশমা, মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল। বিশ্বদেবকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বিদেশি ভদ্রতা। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েলকাম মাই সান। বিশ্বদেবও হাত জোড় করে বাঙালি কায়দায় নমস্কার জানিয়েছিল। কথাবার্তা হয়েছিল ইংরেজিতেই। ফাদার জানিয়েছিল যে, অ্যারাতুন সাহেবের চিঠি তিনি পড়েছেন। হ্যাঁ তাদের কলেজের অফিসে একজন লোকের দরকার। বিশ্বদেব ঠিক সময়েই এসেছে। শুনে বিশ্বদেবের বুকটা আনন্দে ভরে গিয়েছিল। তার জীবনে অনেক কিছুই ঠিকঠাক মেলে না। আবার মাঝে মাঝে মিলেও যায়। সে দেখেছে তার চাকরির ভাগ্য খারাপ নয়। ঝালদার গালা-ফ্যাক্টরিতেও চাকরিটা এক কথায় হয়ে গিয়েছিল। ফাদার জানালেন তাঁদের অফিসে যে বাঙালি বাবু সব কাজকর্ম, বিশেষত অ্যাকাউন্টসের কাজ দ্যাখাশোনা করে। তার বেশ বয়স হয়ে গেছে। শরীর বোধহয় আর টানতে পারছে না। প্রায়ই কামাই-টামাই করে। চার্চের বোর্ড, যা কলেজ, হস্টেল এবং অফিসের কাজকর্মও সুপারভাইজ করে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ঐ লোকটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। এতসব বলার, পরই ফাদার জানতে চেয়েছিলেন যে বিশ্বদেব ঠিক কবে থেকে কাজে জয়েন করতে পারবে। এ তো একেবারে হাতে চাঁদ পেয়ে যাওয়া? সে অবশ্য আবেগতাড়িত হয়ে বেফাঁস কথা বলার লোক নয়। বিশ্বদেব ফাদারকে জানাল যে, কয়েকদিনের মধ্যেই সে ঝালদা ফিরে যাচ্ছে। অ্যারাতুন সাহেবের, চাকরিতে ইস্তফা দিয়েই সে পাকাপাকিভাবে কলকাতা ফিরে আসবে এবং ফাদারের কলেজে জয়েন করবে। ফাদার বললেন—ভেরি গুড। উই শ্যাল ওয়েট ফর ইউ। বাট ডু জয়েন অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল। ফাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্বদেব যখন আবার রাস্তায় নামল তখন তার বুকে আনন্দের আবেশ। অ্যারাতুন সাহেবের চিঠি যে এভাবে ম্যাজিকের মতন কাজ করবে সেটা তার ধারণায় ছিল না। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখল নানা জায়গায় জটলা। ফিসফাস গুজগুজ চলছে। বেশ কিছু দোকানপাটের ঝাঁপও নামানো। কোথাও গোলমাল হয়েছে কি? বিশ্বদেব ঠিক বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ দেখল একতাড়া খবরের কাগজ উঁচিয়ে একজন ছোকরা হকার চিৎকার করে যাচ্ছে—জোর খবর জোর খবর। গান্ধী গ্রেপ্তার। নেহরু গ্রেপ্তার। বিশ্বদেব এগিয়ে গিয়ে একটা কাগজ কিনেছিল। যুগান্তর। এক নিঃশ্বাসে প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে সব জানতে পারল। সমস্ত বড়

নেতাকেই ব্রিটিশের পুলিশ জেলে ভরে দিয়েছে। তার মানে কি দেশে আগুন জ্বলবে? এইসময় সুভাষচন্দ্র বসু লোকটা যদি এদেশে থাকত তাহ'লে বেশ জমে যেত। ওকেও নিশ্চয়ই হাজতে পুরে দিত ইংরেজ। কোথায় যে উধাও হয়ে গেল লোকটা? ওর আবির্ভাবের জন্যে অনেক বাঙালির মতন বিশ্বদেবও মনে মনে অপেক্ষা করছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা যদি দীর্ঘদিন ব্রিটিশের হুকুমে হাজতের মধ্যে বন্দি থাকে তাহলে মনে হয় সত্যিই দেশে আগুন জ্বলবে। সেক্ষেত্রে ট্রেন ঠিকমতো চলবে তো? বিশ্বদেবকে কর্মস্থলে ফিরতেই হবে। তারপর সেখান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চিরকালের মতন বাস উঠিয়ে, অ্যারাতুন সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কলকাতায় চলে আসবে। নাহ হাওড়াতে শ্বশুরবাড়িতে উঠবে না। যদিও ও-বাড়িতে ঘর অনেক। এবং নীরদবরণ, যূথিকা, ক্ষীরোদ ও অন্যান্যরা যে খুশিই হবে বিশ্বদেব সপরিবারে ও বাড়িতে থাকলে তা সে জানে। কিন্তু তবুও...। শ্বশুরের সঙ্গে এক বাড়িতে এক ছাদের নীচে চিরকাল বাস কবাটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না। কারণটা হল, শ্বশুরের সঙ্গে তার একেবারেই বনিবনা হবে না। আর এখন সুবুর এই আকস্মিক বিয়ের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে শ্বশুরের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা বেশ কমেই গেছে বিশ্বদেবের। তার থেকে সে আলাদা বাসা নেবে। শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি অল্প ভাড়ায় ছোটখাটো একটা বাড়ির সন্ধান করার জন্যে সে ক্ষীরোদকে চুপিচুপি বলেছিল। ক্ষীরোদ প্রথমে দাদাবাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। তাদের বাড়ি থাকতে দাদাবাবু-দিদি ভাড়া বাড়িতে থাকতে যাবে কেন? সেটা ভাল দ্যাখাবে না আদৌ। অনেক যুক্তিটুক্তি দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে বিশ্বদেব শালাবাবুকে আশ্বস্ত করেছিল। ক্ষীরোদ রাজি হয়েছে বাড়ি দেখতে। তার অনেক জানাশোনা। সে নিশ্চয়ই একটা ভাড়াবাড়ি খুঁজে দিতে পারবে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই বিশ্বদেবের কানে এল যে, এসপ্লানেডে ও ডালহৌসি অঞ্চলে পুলিশের সঙ্গে জনতার খন্ডযুদ্ধ বেধে গেছে। বাস ট্রামও ঠিকঠাক চলছে না। অগত্যা বিশ্বদেব চেনাশোনা অলি-গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বউ-বাজার এলাকায় পড়ল। সর্বত্র একটা থমথমে পরিবেশ। হুশহাশ পুলিশ-বোঝাই কালো ভ্যান ছুটে যাচ্ছে। ছোটখাটো মিছিলও চোখে পড়ল। পুলিশের গাড়ি দেখলেই মিছিলকারীরা এ-গলি সে-গলি উধাও হয়ে যাচ্ছে। আবার জমা হচ্ছে রাস্তায়। স্লোগান দিচ্ছে—ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো? ভারত ছাড়ো? ভারত ছাড়ো? গান্ধীজি জিন্দাবাদ? নেহরুজি জিন্দাবাদ? আমরা চাই স্বাধীনতা? স্বাধীনতা...স্বাধীনতা?

হাঁটতে হাঁটতে একসময় খিদে অনুভব করল বিশ্বদেব। করবেই তো। সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। সামান্য চা-বিস্কুট ছাড়া পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি। বউ-বাজারে ভীম নাগের দোকানে ঢুকে বেশ কয়েকটা ঢাকাই-পরোটা খেল বিশ্বদেব। ঢাকাই পরোটা বরাবরই তার খুব পছন্দের খাবার। মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিটে এসে পৌঁছল বিশ্বদেব। এখানেই আসবে ভেবে রেখেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের রেলিং-এ পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরবে কিছুক্ষণ। কলেজ-জীবনে এখান থেকে অবিশ্বাস্য কম দামে কত বই যে কিনেছে। ইচ্ছে ছিল আজও কিনবে। নিজের জন্যে কয়েকটা। আর কনিষ্ঠ শালা বারিদবরণের জন্যে দু-একটা ক্লাসিক ইংরেজি বই। দাদাবাবুর কাছ থেকে সে কয়েকটা বই উপহার পাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

পুরনো বইয়ের দোকানে এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বদেব এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'টেলস ফ্রম শেকসপিয়র'। চার্লস ল্যামের লেখা। দেখেই আনন্দে ভরে গেল বিশ্বদেবের মন। ঐ বইটা কিনতে হবে। বারিদের জন্যে। নিজের জন্যেও। কী অপূর্ব ইংরেজি? আরে রয় এমার্সনের একটা 'সিলেকটেড এসেস'-ও তো আছে। ঐ বইটাও কিনবে বিশ্বদেব। এমার্সনের

বিষয়ে সে নানা পত্র-পত্রিকাতে নানা প্রবন্ধ পড়েছে। লোকটা আমেরিকার। ব্রিটিশ নয়। তাতে কী হয়েছে? চিন্তা-ভাবনায় একজন মনীষী। আমেরিকাবাসী নাকি ঐ লেখককে অন্যতম গুরু হিসেবে মান্য করে। দুটো বই হাতে তুলে নিয়ে বিশ্বদেব জানতে চাইল দাম কত। কিন্তু বই-বিক্রেতা বিশ্বদেবের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অস্ফুটে বলল—আরে বাপরে বাপ? কী ধোঁয়া? কোথায় আগুন লেগেছে? বিশ্বদেবও তাকিয়ে দেখল। কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে কিছু একটা হয়েছে। গোলমাল, হইচই-এর শব্দ কানে আসছে। আর সত্যিই ঝলকে ঝলকে ধোঁয়ার চাপ-চাপ কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। পরপর স্লোগান দিচ্ছে অনেক মানুষ। স্লোগানগুলো পরিচিত বটে বিশ্বদেবের। সেই ইংরেজকে হুমকি ভারত ছাড়ার জন্যে। দেশকে স্বাধীন করব কিংবা মরব। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ডু অর ডাই।

একদল লোক পড়ি-মড়ি করে ছুটে আসছিল। তারা বলছিল—দোকান বন্ধ করুন। দোকান বন্ধ করুন। কলেজ স্ট্রিট বাজারের সামনে ট্রামে আগুন লেগেছে। ঝটপট সারি সারি দোকানের ঝাঁপ পড়তে শুরু হল। পুলিশ-বোঝাই একটা গাড়িকে ওদিকেই ছুটে যেতে দেখল বিশ্বদেব। কিন্তু সে কোন্‌দিকে যাবে? চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ হয়ে বড়বাজার হয়ে হাওড়া ব্রিজ পৌঁছবার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু এখন তো ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। গণ্ডগোল লেগেছে ভীষণ। পুলিশ গুলি চালাতেও পারে। বই কেনা মাথায় উঠল বিশ্বদেবের। সে আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল অর্থাৎ বউ-বাজারের দিকেই হাঁটতে লাগল। ওদিক দিয়েও হাওড়া ব্রিজ পৌঁছনোর রাস্তা আছে। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বদেবের মনে হ'ল এর আগে কি আন্দোলনকারীরা কলকাতায় ট্রামে কিংবা বাসে কি আগুন দিয়েছে?...সম্ভবত না।...এরকম এই প্রথম।

আটষট্টি

কলকাতার অবস্থা এখন রীতিমতো অশান্ত। 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে',—'do or die'—গান্ধীজি যে আওয়াজ তুললেন তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশকে স্বাধীন করার উন্মাদনা নিয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুরোপুরি অহিংস আন্দোলন যে হচ্ছে তা বলা যাবে না। ব্রিটিশের পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে আন্দোলনকারীদের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে, ধরপাকড় চলছে নিরন্তর, স্বদেশিদের ভিড়ে জেলখানাগুলো ভর্তি। কোথাও কোথাও মানুষ প্রতিবাদও করছে। ইট-পাটকেল ছুড়ে আহত করছে পুলিশদের। আমেদাবাদে একটা বড় গণ্ডগোলের খবর পাওয়া গেল। অহিংস আন্দোলনকারীদের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করলে খেপে গেল তারা। আন্দোলনকারীদের নিক্ষিপ্ত ইটের টুকরো এক গোরা সার্জেন্টের চোখে ঢুকে গেলে সে সাংঘাতিকভাবে আহত হল। তখন পুলিশের মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। গুলি ছুড়ল পুলিশ। তাতে দুজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হল। পুলিশের গুলিতে দুজন স্বদেশির মৃত্যুর খবর পেয়ে অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে এবং অবশ্যই কলকাতায় আবার আগুন জ্বলে উঠল নতুন করে। কার্জন পার্কের কাছে আবার স্বদেশিদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। গুলি চলল। তবে কোনও হতাহতের খবর সংবাদপত্রগুলো দিতে পারেনি।

শুধুমাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন নয় ; 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন অন্য একদিকে মোড় নিল। বিদেশি জিনিসপত্র বয়কট করার ডাক দিল কংগ্রেসিরা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আচমকা জড়ো হয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা। কিছুক্ষণ পথচারীদের উদ্দেশে গরম গরম বক্তৃতা চলে। তারপর আগুন জ্বালিয়ে তাতে নিক্ষেপ করা হয় বিদেশি বস্ত্র, বিদেশি আসবাবপত্র হাতের কাছে যা পাওয়া যায়। হাজরার

মোড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তীদেবীর নেতৃত্বে বিদেশি জিনিস পোড়ানো হল। সেই নিয়ে কলকাতায় মহা উত্তেজনা। ব্রিটিশের পুলিশ যেন মরিয়া হয়ে ধর পাকড় বাড়িয়ে দিল। সারা শহর জুড়ে উত্তেজনা। কখন যে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের মারামারি লেখে যাবে, পথ অবরোধ হবে, দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাবে, কারফিউ জারি করবে প্রশাসন তা সুত্যিই বলা মুশকিল। রাস্তায় বের হলে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফেরা যাবে কী না তাও বলা মুশকিল। নীরদবরণ অবশ্য প্রতিদিন অফিস করছেন। অফিসপাড়াতেই গণ্ডগোলটা বেশি হয়। কার্জন পার্ক থেকে ধর্মতলা—এটাই হল স্বদেশীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের আসল জায়গা। এখানে মিছিল করলে, বিদেশি বস্ত্র পোড়ালে তা চট করে খবর হয়ে রাজভবনে এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পৌঁছে যাবে। নড়েচড়ে বসবে ব্রিটিশ।

হাওড়া থেকে নিয়মিত অফিস করা কঠিন ; কখন কোথায় গণ্ডগোল বেধে যাবে, রাস্তায় গাড়ির চাকা বন্ধ হয়ে যাবে তা কে বলতে পারে ;—এই অজুহাতে নীরদবরণ পরপর কয়েকদিন নিজের বাড়িতে ফেরেননি। শেলীর বাসায় থেকে গেছেন। আর শেলীর বাসায় থাকা মানেই বেশ হুহুঙ্কারে বেঁচে থাকা। মুখরোচক খাবার আর মদের প্রাচুর্যে জীবনকে মনে হয় রঙিন, ফুরফুরে, স্বর্গীয়। বিছানাতেও শেলী বরাবর দামাল, অশান্ত। নীরদবরণের ভোগের পেয়ালা যেন কালায় কানায় পূর্ণ এখন। স্ত্রী যূথিকা তাঁকে যে সুখ দিতে পারেননি, সেই দুর্লভ ইন্দ্রিয়-সুখ শেলীর কাছ থেকে পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। বিছানায় উত্তেজনার চরম মুহূর্তে শেলীকে শান্ত করতে, বস্তুত, আজকাল হিমশিম খেয়ে যেতে হয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া নীরদবরণকে। যেন একমাত্র বিছানাতেই তিনি আজকাল অনুভব করেন যে, তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে, যৌবনক্ষমতাও চলে যাচ্ছে যেন ক্রমশ।

একদিন রাতে যা ঘটল তাতে আত্মবিশ্বাসে যেন একটু চিড় ধরল নীরদবরণের। ঘরে মিউজিক চলছিল। নীরদবরণের অনুরোধে শেলী নাচছিল মোৎজার্টের মিউজিকের তালে তালে। সেদিন অনেক মদ্যপান করেছিলেন নীরদবরণ। আর পাইপ টানছিলেন ঘন ঘন। হঠাৎ বিষম এক জ্বালা অনুভব করলেন গলার কাছে। যেন কোনও বিষাক্ত পোকা তাঁর গলনালীতে হঠাৎ দংশন করেছে। তীব্র জ্বালা? ছটফট করছিলেন নীরদবরণ। মনে হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যাবেন। অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন—ওহ ওহ? What a pain? সোফা থেকে ঈষৎ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। শেলী তা লক্ষ করে ছুটে এল। দু-হাত বাড়িয়ে ধরল নীরদবরণকে। উদ্বেগের স্বরে বলল—কী হল ডার্লিং? Any problem?

—...feeling a severe pain in my throat...

—...in your throar?...Why...?

—I feel like vomiting....কষ্টে বললেন নীরদবরণ।

শেলী তাঁকে ধরে ধরে বেসিনের কাছে নিয়ে এল। মনে হচ্ছিল গলায়-আলজিভের কাছে কে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে! হড়হড় করে বেসিনে বমি করলেন নীরদবরণ। বমির সঙ্গে উঠে এল নানারকম খাবারের টুকরো। অ্যালকোহলের তীব্র গন্ধ বমিতে!

বেশ কিছুক্ষণ বমি করার পর কোনওরকমে বিছানায় যেতে পারলেন নীরদবরণ। মিউজিক বন্ধ করে দিয়েছে শেলী। ঘরে ঝপ্ করে নেমে এসেছে বিষণ্ণ নির্জনতা। যে কোনও পুরুষের পক্ষেই একজন নারীর প্রকৃত ভালবাসা পাওয়া দুর্লভ। নীরদবরণ সেই সৌভাগ্যর অধিকারী। যূথিকাকে বিয়ে করা ইস্তক তাঁর মনে ক্ষোভ জমে আছে। যূথিকা তাঁর যোগ্য নয়। ওরকম সাধাসিধে, গ্রাম্য-স্বভাবের, আটপৌরে মেয়েকে বিয়ে করে তিনি ভুল করেছেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত

নীরদবরণ। কিন্তু যূথিকার থেকে যা পাওয়া হয়নি শেলীর কাছে এসে সেই অভাব মিটে গেছে। নীরদবরণ বিবাহিত শেলী জানে। এই বাঙালি সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের পরিণতি কী হতে পারে তা নিয়ে শেলী মনে হয় তেমন চিন্তিত নয়। সে সত্যিই ভালবাসতে জানে। মন-প্রাণ দিয়ে নীরদবরণকে সে ভালবাসে। নীরদবরণ সেই ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারবে কি না এটা না ভেবেই।

বমি অনেকটা হয়ে যাওয়ার পর নীরদবরণ একটু সুস্থ বোধ করছিলেন। গলার জ্বলুনিটাও যেন ক্রমশ কমে আসছে। ধবধবে সাদা বিছানায় ট্রাউজার আর শার্ট পরেই নীরদবরণ শুয়ে পড়েছিলেন। কোটটা তিনি আগেই খুলে রেখেছিলেন। শেলী তাঁর মাথাটা নিজের কোলে নিয়ে বসে ছিল। নরম আঙুলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ঝুঁকে পড়ে নীরদবরণের কানের কাছে মুখ নিয়ে শেলী জিগ্যেস করল—এখন কেমন বোধ করছ ডার্লিং?

—বেটার...মাচ বেটার। আমি ভাবচি...মৃদু স্বরে বললেন নীরদবরণ।

—কী ভাবছ?...নাউ ইজ নট দ্য টাইম ফর থটস...হ্যাভ রেস্ট...ট্রাই টু হ্যাভ আ স্লিপ...নীরদবরণ কথা থামিয়ে দিলেন বটে। কিন্তু তিনি ভাবছিলেন এরকম অস্বাভাবিক জ্বালা গলায় কেন অনুভব করলেন? আগে কোনওদিন এরকম অনুভব করেননি। তার পরই মনে হ'ল হয়ত বায়ুর এবং অম্বলের প্রভাবেই ওরকম জ্বালা করে উঠেছিল গলায়। শেলীর কাছে নানারকম ওষুধ মজুত থাকে। সে নীরদবরণকে এনজাইম ধরনের ওষুধ দিল। সেটা খেয়ে যেন নীরদবরণ আরও সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তখন তাঁর দৃঢ় ধারণা হ'ল, নানারকম গুরুপাক ভোজন এবং মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পেটে যাওয়ার ফলেই চড়া অম্বলের প্রকোপ এবং তা থেকেই গলায় অসম্ভব বেদনা। গলায় আর কোনও অস্বস্তি ছিল না, কিন্তু তবুও কেন যে ঘুম আসছিল না? নীরদবরণ ফিসফিস করে ডাকলেন—শেলী?

—ইয়েস মাই ডার্লিং?

—রিসাইট আ পোয়েম প্লিজ...

—আ পোয়েম?

—ইয়েস...সেন্ড মি টু স্লিপ বাই রিসাইটিং আ পোয়েম।

—ইয়েস দেন লিসন...আবৃত্তি করতে লাগল শেলী—

Oh lift me from the grass?
I die? I faint? I fail?
Let thy love in Kisses rain
On my lips and eyelids pale.
My check is cold and white, alas?
My heart beats loud and fast ;--
Oh? press it to thine own again,
Where it will break at last.

—Oh! beautiful!—নীরদবরণ অস্ফুটে বললেন।—So press thine heart to mine!—বাচ্চা ছেলের মতন ব্যবহার করছিলেন তিনি। শেলীর ঢলো-ঢলো স্তনে হাত দিয়ে বারবার ইঙ্গিত করছিলেন। এই বুড়ো খোকার আবদার শেলী বুঝল। সে নিজের বুকের জামা, ব্রা সব খুলে পূর্ণশশীর মতন স্তনদ্বয় উন্মুক্ত করে দিল। নীরদবরণ দাঁত দিয়ে বাদামি স্তনবৃন্ত আলতোভাবে কামড়ে ধরে বললেন—here his my heaven and hell as well! শেলীর সরু-সরু

শিল্পী-আঙুল নীরদবরণের পাতলা হয়ে আসা চুলে বিলি কাটছিল। বোধহয় সত্যিই স্বর্গসুখ অনুভব করতে করতে নীরদবরণ একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঊনসত্তর

একদিন ম্যাকেঞ্জি নীরদবরণকে জানালেন যে, তিনি জাহাজের টিকিট কেটে ফেলেছেন। আর তিনদিন বাদেই রওনা দেবেন লন্ডন। শুনে নীরদবরণের মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজ একত্রিশ বছর নীরদবরণ এই কোম্পানিতে আছেন। প্রথম দিন থেকেই ম্যাকেঞ্জিসাহেবের সঙ্গে কাজ করছেন। ম্যাকেঞ্জি তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসার। নীরদবরণ কেমন কাজ করছেন; তাঁর পারফরম্যান্সের যাবতীয় খতিয়ান ম্যাকেঞ্জিই রাখতেন ; এই সাহেবের বদান্যতায় তিনি দু দুটো প্রোমোশান পেয়েছেন। ঢুকেছিলেন মামুলি সেলস-অফিসার হয়ে। এখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেলস ম্যানেজার। ম্যাকেঞ্জির ঠিক নীচে। শোনা যাচ্ছে, ম্যাকেঞ্জি তাঁর দেশে ফিরে গেলে এই অফিসে সেলস ম্যানেজারের পদটিতে উন্নীত হবেন স্বয়ং নীরদবরণ।

দীর্ঘ একত্রিশ বছরে ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে কীরকম একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। কাজ, কাজ আর কাজ ; এভাবেই তো সারা জীবন কেটে গেল নীরদবরণের। এখন, জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন নিরিবিলিতে বসে ভাবেন তিনি, তখন বোঝেন যে, অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে তাঁর; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সঙ্গে। মনের কথা কজনকে বলতে পেরেছেন নীরদবরণ? যূথিকা তাঁর স্ত্রী ; কিন্তু মনের সঙ্গী নয়। সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে শেলীর সঙ্গে তাঁর মনের মিল হয়। এখন যূথিকার সঙ্গে কোনও মুহূর্তই যেন আর ভাল লাগে না। যূথিকা নেতাহই সামাজিকভাবে তাঁর স্ত্রী। মনের কোনও কথাই স্ত্রীকে খুলে বলতে পারেননি নীরদবরণ। স্বামী হিসেবে তিনি শুধু কর্তব্যটুকু করে গেছেন। কিন্তু শেলীর সঙ্গে সম্পর্কটা অন্যরকম। শেলী যে শুধু তাঁর সংরাগ এবং কামনার ভার বহন করে তাই নয়। তাঁর সঙ্গে বন্ধুর মতন মিশতে পারে। নীরদবরণ রসিকতা করলে শেলী তা বুঝতে পারে। সমমানের রসিকতা করে আনন্দ দেয় নীরদবরণকে। আর ইংরেজি সাহিত্যেরও অনেক কিছু কণ্ঠস্থ শেলীর। যৌবন এবং মনীষা যেন সমানুপাতিক ভাবে শেলীকে সমৃদ্ধ করেছে। এরকম যদি হত ; বাকি জীবনটা শেলীর সঙ্গেই কাটিয়ে দেওয়া হত ; তাহ'লে বেশি হত। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? সামাজিকতার বিধিনিষেধকে তো এড়ানো সম্ভব নয়। তাঁর অবৈধ জীবনের কথা স্ত্রী জানে, ক্ষীরোদ জানে, আর জানে বিশ্বদেব। অবশ্য তারা কেউই সেই জীবনকে অনুমোদন করে না। যূথিকা স্বামীর এই ব্যভিচার (?) মেনে নিয়েছেন নিরুপায় হয়ে। ক্ষীরোদ শেলীর কথা উঠলেই যেভাবে তাকায় তাতে বোঝা যায় সে ব্যাপারটা নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট। আর জামাই বিশ্বদেব যে মনেপ্রাণে পাক্কা মরালিস্ট তা শ্বশুরের চেয়ে আর কে ভাল জানে? সুতরাং ইচ্ছে না থাকলেও নীরদবরণকে দু-রকম জীবনের অমিলের সঙ্গে লড়াই করতে হয় বরাবর। এক এক সময় আজকাল মানসিক ক্লান্তি অনুভব করেন। এই মুখ আর মুখোশের খেলা হয়তো সারাজীবনই খেলে যেতে হবে তাঁকে।

শেলীর সঙ্গে যেমন, তেমনই ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে তাঁর। কত কথা যেন ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে হত! আর হবে না। এই যে ম্যাকেঞ্জি চলে যাচ্ছেন তিনি আর ইহজীবনে হয়তো ইন্ডিয়াতে আসবেন না। তাহ'লে অফিসে, লাঞ্চ-পিরিয়ডে কার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবেন নীরদবরণ! ক্রমশ তিনি যেন বড় বেশি একা হয়ে যাবেন।

ম্যাকেঞ্জিকে একটা ফেয়ারওয়েল-ডিনার দেবার ইচ্ছে হ'ল নীরদবরণের। কিন্তু ম্যাকেঞ্জিকে

সেই প্রস্তাব দিতে তিনি তাতে পুরোপুরি রাজি হলেন না। বলা যায় আংশিক রাজি হলেন। ম্যাকেঞ্জি বললেন—বাবু হোয়াই ইউ উইল পে ফর দা এনটায়ার ইভেন্ট?

—বিকজ আই উড লাভ টু ডু ইট...।

—নো নো দ্যাটস নট আ ওয়াইট প্রোপোজাল। লেট আস শেয়ার ইট ফিফটি ফিফটি। নীরদবরণ সাহেবের এই প্রস্তাবে হাসলেন। জিগ্যেস করলেন যে, হঠাৎ কী এমন হল যে তাঁর আর্থিক সামর্থ্যের ওপর ম্যাকেঞ্জির এরকম অনাস্থা জন্মাল?

—ওহ বাবু-ইউ হ্যাভ টোটালি মিসআনডারস্টুড মি! এর আগেও তুমি আমাকে খাইয়েছ। ইউ অফারড মি সামপচুয়াস লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার সো অফেন। আমি তা জানি। কিন্তু আমি চাইছি এই লাস্ট সাপার টুগেদার ব্যাপারটাকে মেমোরেবল ভরে রাখতে।...অ্যাজ আই হ্যাভ প্রোপোজড লেট আস শেয়ার দি একসপেনডিচার। আই শ্যাল পে ফর দ্য ফুড ; ইউ পে ফর দ্যা ড্রিংকস! ওকে?

—ওকে। ওকে।—নীরদবরণ এক কথায় রাজি।

ফেয়ারওয়েল ডিনারের স্থান ঠিক হল ম্যাকেঞ্জির বাসস্থানেই। নীরদবরণ তিনটে বড় ব্ল্যাক নাইটের বোতল নিয়ে হাজির। তিনি জানেন ডিনারের পালা চুকতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। তাই যূথিকাকে বলে এসেছেন সেদিন রাতে আর বাড়ি ফিরবেন না। কোথায় রাত কাটাবেন নীরদবরণ, এটা যূথিকা জিগ্যেস করতে সাহস পাননি। কিংবা জিগ্যেস করা অবান্তর ভেবেছেন। নীরদবরণ বাড়ি ফিরবেন না রাতে এটা শুনলে যূথিকা বরাবরই শুধু গম্ভীর হয়ে যান। মুখে কিছু বলেন না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ কীরকম উতলা হয়ে গেলেন। বললেন—ওগো তুমি বাড়ি না থাকলে আজকাল আমার কীরকম ভয় ভয় করে!

নীরদবরণের ভুরুতে কুঞ্চন। তিনি বিরক্ত মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুখে কথা নেই। অন্য সময়ে স্বামীর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকিয়েই যূথিকা ভয় পেয়ে যান। মনের কথা মনেই থেকে যায়। মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেন না। কিন্তু আজ সেরকম হ'ল না।

—বিশ্বাস করো তুমি না থাকলে আমার কীরকম ভয় করে। বুকটা ধড়ফড় করে!

—তাহ'লে তোমার কোনও রোগ হয়েছে। ডাক্তার দেখাতে হবে দেখছি?

—না গো রোগ নয়। এ বাড়িতে তুমি না থাকলে গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আর মনে হয়...

—কী মনে হয়?—তীক্ষ্ণ চোখে নীরদবরণ দেখেন স্ত্রীকে।

—বললে তুমি আবার রাগ করবে বুঝি!

—তাহ'লে বলতে হবে না।

—ঐ তো রাগ করচ!...তুমি বাড়ি না থাকলে আমার মনে হয় হঠাৎ যদি আমি মরে যাই? তাহ'লে তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না?

—কী আবোল-তাবোল বকছ? সিম্পলি রাবিশ!

—বিশ্বাস করো আজকাল এরকম মনে হয়। কেন যে মনে হয়?

এ তো স্রেফ যূথিকার 'পেটি (petty) সেন্টিমেনটালিটি'। নীরদবরণ স্ত্রীর এই উতলা আবেগকে তেমন পাত্তা দিতে চান না। তিনি গম্ভীর হয়ে নিজের অ্যাটাচি গুছিয়ে নিয়েছিলেন। কিছু জামাকাপড় এবং সিল্কের একটা স্লিপিং-গাউন (যেটা সম্প্রতি শেলী তাঁকে প্রেজেন্ট করেছে) শেলীর বাড়িতেই রাখা আছে। সেখানে রাত কাটাবার কোনও অসুবিধেই নেই। দোতলার বারান্দা দিয়ে ক্ষীরোদ চলে যাচ্ছিল। কী মনে হতে তাকে ডাকলেন নীরদবরণ।

—ওহে তোমার সাইকেলের দোকান কেমন চলছে?

—ঐ চলচে একরকম।

—তুমি সময় দিতে পারো? নাকি কর্মচারীর হাতে ছেড়ে দিয়েছ সবকিছু? থিয়েটার দেখা আর থিয়েটার করাই তো তোমার একমাত্র কাজ।

—সবকিছুই করতে হয়। দোকান দেখি, আবার থেটাব করি আর দেখিও। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ওগুলো ছাড়তে পারব না।

—তোমার তো আজকাল বেশ বোলচাল হয়েছে দেখছি?

—আপনি আমাকে যতটা নিষ্কর্মা ভাবেন ততটা আমি নই।

—হুঁ। সময়ই সেটা বলতে পারবে। যাক শোনো—

—বলুন?

—আমি আজ রাতে ফিরব না। মায়ের দিকে একটু নজর রেখ। ওঁর নাকি আজকাল রাতের দিকে বুক ধড়ফড় করে..।

—সেকি মা? তুমি তো বলনি আমাকে একথা? ক্ষীরোদ উদ্বেগের স্বরে জিগ্যেস করে।

—আরে বাবা! আমি কি সেভাবে বলিচি? তোর বাবা কী বুঝতে কী বুঝল...! যূথিকা নিজেকে আরও গুটিয়ে নেন। তিনি যা বলতে চেয়েছেন নীরদবরণ বোঝেননি। লোকটা কোনওদিনই বুঝল না তাঁকে।

রাত আটটা নাগাদ নীরদবরণ হাজির হলেন ম্যাকেঞ্জির বাড়ি। খাবার-দাবার সাজিয়ে ম্যাকেঞ্জি তাঁরই অপেক্ষায় বসে ছিলেন। পান-ভোজন আর গল্প চলল ঘণ্টা তিনেক।

ম্যাকেঞ্জি বললেন—ইউ কাম টু লন্ডন। আমি কলকাতা ছাড়ার পর তুমিই পুরোপুরি সেলস-ম্যানেজার হবে। কোম্পানির হেড-কোয়ার্টার্স লন্ডন। তুমি একবার সেখানে আসবে না? লন্ডনে এলে নো হোটেল বিজনেস, তুমি আমার ওখানে থাকবে। আমি আর আমার স্ত্রী এলিজা খুব আনন্দ পাব। আমার স্ত্রী ডিসএবলড্ বটে, কিন্তু দেখবে সে কত হসপিটেবল!

—লেটস সি হোয়াট হ্যাপেনস। নীরদবরণ অন্যমনস্কভাবে বলেন। তারপর বিড়বিড় করে বলেন—আই শ্যাল ফীল লোনলি, ভেরি লোনলি মি. ম্যাকেঞ্জি...! দুজনের গ্লাসেই মদ নিঃশেষিত। বোতল থেকে ম্যাকেঞ্জি নিজের গ্লাসে ঢাললেন। নীরদবরণের গ্লাসেও। দুজনে চুমুক দিলেন।

—বাবু তোমাকে একটা কথা বলব?

—ইয়েস।

—এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ লোনলি।...ইচ ওয়ান অব আস ইজ ডেসটিনড টু বি লোনলি। একমাত্র মানুষ নিজের চেষ্টায়, নিজের উদ্যোগেই নিজের একাকিত্ব কিছুটা হলেও কাটাতে পারে। তুমি কাজের মানুষ, কাজ নিয়ে থাকো; ইউ আর আ গুড রীডার, বই পড়। লাইক সাম গ্রেট থিংকারস আই অলসো বীলিভ দ্যাট বুকস, ওনলি বুকস মে বি দ্য রিয়েল ফ্রেন্ডস অব আস। আর যখনই মনে হবে, রাইট লং লেটারস টু মি। তোমার চিঠি পেলে আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেব। চিঠি লিখতে আমার খুব ভাল লাগে বাবু!...বাই দ্য ওয়ে হোয়াট অ্যাবাউট ইওর গ্র্যান্ড ডটার বাবু? হাউ ইজ শি?

—শি হ্যাজ বিন আ পেন ইন মাই নেক...

—ওঃ মাই গড! ডোন্ট সে সাচ ওয়ার্ডস...

—আমার নাতনিকে দেখলে মনে হয় আমি জীবনে হেরে গেছি।

—ওহ টেক ইট স্পোর্টিংলি বাবু! আর ইউ গোয়িং টু ম্যারি হার এগেইন?

—আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু নাতনি রাজি নয়। তার বাবাও নয়।

—ইনডিড আ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন। বাট আই টেল ইউ টাইম উইল হিল এভরিথিং। শোনো বাবু একটা কথা বলি...তোমাদের দেশের সিচুয়েশনও চেঞ্জ হয়ে যাবে।

—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—ইউ উইল গেইন ফ্রিডম ভেরি শর্টলি।

—তোমরা...আই মিন দ্য ব্রিটিশ উইল লাভ আওয়ার কানট্রি অন দেয়ার ওন?...

—হয়তো তা নয়।...মে বি দি ইংলিশ উইল বি প্রেশারাইজড টু লিভ ইন্ডিয়া?

—প্রেশারাইজ্‌ড?

—ইয়েস প্রেশারাইজড। টেক ইট ফ্রম মি বাবু—দিস কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট রিঙস দ্য ডেথ-টোল অব দি ইংলিশ হিয়ার ইন ইন্ডিয়া।...একদিকে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, অন্যদিকে দি অ্যাটাকিং প্ল্যান অব সুভাষ বোস ফ্রম আউটসাইড অ্যান্ড অলসো দ্য স্পোরাডিক ডিসটারবেনসেস ক্রিয়েটেড বাই দ্য টেররিস্টস ;—অল দিজ ফ্যাকটরস মে ওয়ার্ক ফর দ্য ডাউনফল অব দি ইংলিশ...।

—আপনি নিজে একজন ইংলিশ ম্যান হয়ে এসব বলছেন? এটাই আমার খুব আশ্চর্য লাগে।

—শুধু আমি একা বলছি না মি. নীরদবরণ ; আমার মতন এডুকেটেড অ্যান্ড এনলাইটেনড যে কোনও ইংলিশ সিভিলিয়ানই দেয়ালের লিখন পড়তে পারছে।...দ্য ডাউনফল অব দি ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া ইজ, অ্যাজ আই সে, ইমিনিন্ট।

—কিন্তু আমি একটা কথা বলতে চাই সাহেব...

—ইয়েস বলো ...নাইট ইজ স্টিল ইয়াং...

—আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, ইংরেজ আমাদের যেমন শাসন করেছে তেমনই আমাদের এই দেশটার অনেক উন্নতিও করেছে। আজকের এই ক্যালকাটা সিটি, ইটস মেমোরিয়ালস, বিল্ডিংস, রাস্তাঘাট সবকিছু তো ইংরেজদের তৈরি। আমাদের দেশ যদি এতদিন ইংরেজদের শাসনে না থাকত তাহ'লে আমাদের কূপমণ্ডুকতার অন্ধকার কোনওদিন কাটত না। অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকর সব কুসংস্কার থেকে আমরা মুক্ত হতে পারতাম না। আমাদের সাহিত্য মানে ঐ রাধাকৃষ্ণের পাঁচালি আর কবিগানগুলোই থাকত। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে পেতাম না। হয়তো টেগোরকেও পেতাম না।

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছ নীরদবরণ ; বাট স্টিল দি এসেন্স অব ফ্রিডম ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। যে মানুষের স্বাধীনতা নেই সে তো একজন কনডেমনড সোওল! অত্যধিক মদ্যপানের ফলে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের থলথলে, লাল মুখ আরও রক্তবর্ণ হয়ে গেছে। আর নীরদবরণের চোখদুটো জড়িয়ে আসছে। তাঁর মাথা পাথরের মতন ভারী লাগছে। তবুও নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন নীরদবরণ। তিনি সাহেবের দিকে দু আঙুল তুলে জড়ানো স্বরে বলতে লাগলেন—ইউ! দি ইংলিশ তোমাদের দান আমি ভুলব না। তোমরা আমাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়েছ, ভদ্রলোকের পোশাক পরতে শিখিয়েছ, সুস্বাদু খাবার খেতে শিখিয়েছ, বিশুদ্ধ সাহিত্য পড়তে শিখিয়েছ! আই শ্যাল রিমেন ইনডেটেড টু ইউ ফর-এভার। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তোমার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। সেলসের চাকরি কীভাবে করতে হয় তা আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছি। তুমি চলে গেলে আমি খুব একা হয়ে যাব...খুব একা!

—জানি জানি বাবু! আই শ্যাল অলসো মিস ইওর কালারফুল কমপানি। কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে—নাথিং ডুয়িং। এসো আমরা দুই মাতাল হাত ধরাধরি করে একটু নাচি। লেট আস

মেক দিস নাইট রিয়েলি মেমোরেবল।

ম্যাকেঞ্জির বাড়ির চাকরবাকরগুলো শুধু দেখল ; আর কেউ সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পেল না। দুই মাতাল প্রৌঢ় হর্ষ কিংবা বিষাদে হাত-ধরাধরি করে নাচছিলেন। গ্রামাফোনে বাজছিল শ্যোঁপার অনন্যসাধারণ মিউজিক। তারপর একসময় শেষ হল নাচ। দুজনে দুজনকে শুভরাত্রি জানালেন।

নীরদবরণ গাড়িতে এসে হাজির হলেন শেলীর বানিতে। ধড়াচূড়া খুলে বিছানায় শোয়ার পর নীরদবরণ আবার অনুভব করলেন গলায় সেই তীব্র জ্বালা। যেন একটা ভোজালির অগ্রভাগ দিয়ে কেউ তাঁর গলার কাছটা ভেতরদিক থেকে কুরে কুরে দিচ্ছে। ঘুম আসছিল না। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় দাঁতে দাঁত টিপে নীরদবরণ সহ্য করতে লাগলেন সেই ভয়ানক জ্বালা।

শেলীকে ডেকে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না। কী হয়েছে তাঁর গলায়? মাঝে মাঝে এরকম জ্বালা করে কেন? বিশেষত মদ্যপানের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে এই জ্বালাটা কষ্ট দেয় তাঁকে। কেন? কী রোগ হল আবার? এবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। এরকম ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুম এসে গেল। অত্যাধিক মদ্যপান আবার ঘুমকেও ডেকে আনে তাড়াতাড়ি। ঘুমের মাঝে সেদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখলেন নীরদবরণ। দেখলেন তিনি অচেনা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। জায়গাটা পাহাড়ী অঞ্চল। এরকম কোনও জায়গায় আগে আসেননি নীরদবরণ। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ দেখলেন দূর থেকে সুবু ছুটে আসছে তাঁরই দিকে। হাত নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইছে সুবু! কী বলতে চাইছে বুঝতে পারছেন না নীরদবরণ। ছুটে আসছে...ছুটে আসছে সুবু! হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন সুবু বলছে—দাদু! দাদু! তুমি পেছনদিকে তাকিয়ো না! তুমি সামনের দিকে হেঁটে এস দাদু!...কেন এরকম বলছে সুবু? এই ভেবে পেছন দিকে তাকিয়েই মাথা ঘুরে গেল নীরদবরণের। পেছনে তো অতলস্পর্শী খাদ! ঠিক এক পা পেছনদিকে নড়লেই মৃত্যুর বিশাল হাঁ-এর মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে নীরদবরণকে। ভয়ে কেঁপে উঠলেন নীরদবরণ। আর ঠিক সেই সময়ে তাঁর ঘমুটাও ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসলেন নীরদবরণ। পাশে শেলী ঘুমের অতলে। মশারি তুলে বাইরে এলেন নীরদবরণ। দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। ভোর হয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে ফুরফুরে। আকাশ চকচকে, নীল। ইংরেজি অগাস্ট মাস। বাংলায় ভাদ্র। তার মানে শরৎকাল শুরু হয়েছে। বাঙালির উৎসবের মাস। নীরদবরণ ভাবলেন, সুবুর সঙ্গে অনেকদিন কথা বলা হয়নি। রাগ করে তিনিই ওর সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। আজ হাওড়ার বাড়িতে ফিরে যাবেন। বিশ্বদেব বলেছিল সবাইকে নিয়ে, এমনকী সুবুকেও, ঝালদা ফিরে যাবে। কবে যাবে? কবে যেন ঠিক খেয়াল হল না। শুধু এটুকু খেয়াল হল এই মুহূর্তে যে, ম্যাকেঞ্জি আজ ট্রেনে বোম্বাই রওনা হবেন। সেখান থেকে জাহাজ ধরবেন লন্ডনের। তাঁকে আজ হাওড়া স্টেশনে 'সি-অফ' করতে হবে।

দুপুর দুটো বেজে পনেরো মিনিটে বোম্বে-মেল ছাড়ল। ম্যাকেঞ্জিকে সি-অফ করে নীরদবরণ গাড়িতে এসে বসলেন। চালক জিগ্যেস করল কোথায় যাবে? অফিসের দিকে কি? নীরদবরণের কী মনে হল, তিনি জানালেন যে চেতলার দিকে যাবেন। চেতলাতে তাঁর এক বন্ধু থাকেন, এম বি বি এস ডাক্তার। বঙ্কুবিহারী দত্ত। সংক্ষেপে ডঃ বি. বি. দত্ত। কলেজে ডাক্তারি পড়তে যায়। ডাক্তার হিসেবে তার ভালই পসার। ওর কাছে গিয়ে নিজের গলাটা পরীক্ষা করাতে হবে আজকেই। আজ হাতে সময় আছে। ম্যাকেঞ্জিকে সি-অফ করে বেশ বিষণ্ণ লাগছে। কাজে আজ আর মন বসবে না।

কালীঘাট মন্দিরকে ডানদিকে রেখে গাড়ি যখন চেতলার দিকে ছুটছে হঠাৎ এক মহিলাকে

দেখে চোখ আটকে গেল নীরদবরণের। আরে! অপর্ণা না? অপরেশের মেয়ে! এই কালীঘাট পাড়ায় ও কী করছে? রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে কেন?...এই রোখকে! রোখকে! গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন নীরদবরণ। চালক গাড়ি থামাল। দ্রুত নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। হ্যাঁ ঠিকই চিনতে পেরেছেন তিনি। রাস্তার ও-প্রান্তে ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কাটোয়ার অপর্ণা! অনেক রোগ হয়ে গেছে মেয়েটা! কীরকম বিষণ্ণ দৃষ্টি! পরনে রঙিন শাড়ি। দুই হাতে রঙিন কাচের চুড়ি। নীরদবরণের জহুরী দৃষ্টি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব লক্ষ করেছে। এখানে অপর্ণা কী করছে? কেমন আছে ও? ব্যস্ত রাজপথ দিয়ে গাড়ি যাতায়াত করছিল। নীরদবরণ রাস্তা পার হয়ে যেতে চাইছেন অপর্ণার কাছে। হঠাৎই তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল অপর্ণার। তাঁকে কি অপর্ণা চিনতে পেরেছে? নীরদবরণ দেখলেন অপর্ণা দ্রুত পেছন ফিরল, তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা গলিতে ঢুকল। তখনও রাস্তা পার হতে পারেননি নীরদবরণ। তিনি হাঁক দিলেন—অপর্ণা! অপর্ণা! দাঁড়াও তোমার সঙ্গে কথা আছে। কিন্তু অপর্ণা বোধহয় তাঁর ডাক শুনতে পায়নি। গলির ভেতরে তাঁকে হেঁটে যেতে দেখেছেন নীরদবরণ। অবশেষে চলমান গাড়ির ফাঁক সামনে নীরদবরণ রাস্তার এ-প্রান্তে আসতে পারলেন। গলির মধ্যেও ঢুকলেন। গলিটা ভীষণ সরু এবং অপরিষ্কার। এখানে সেখানে আবর্জনা, খাবারের উচ্ছিষ্ট। ঘেয়ো কুকুর, বিষণ্ণ বেড়াল এবং সুযোগসন্ধানী কাকেদের সমাহার। এই গলিতে কোথায় থাকে অপর্ণা? সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে নীরদবরণকে। তাঁকে দেখে সরে পড়ল কেন? মুখোমুখি হতে চায় না? গলির ভেতরে কিছুটা ঢুকেই অবশ্য গলির স্বরূপ ধরা দিল নীরদবরণের চোখে। গলির দুধারে ভাঙাচোরা বাড়ি। আর সেই বাড়ির দরজাতে দরজাতে মহিলাদের দঙ্গল। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে জটলা করছে। কেউ কারোর চুল বেঁধে দিচ্ছে কিংবা উকুন বেছে দিচ্ছে। বিকট সাজগোজ করে, ঠোঁটে গাঢ় রং মেখে একজন কেলটে ছুঁড়ি দাঁড়িয়েছিল। নীরদবরণের দিকে তাকিয়ে ছুঁড়ি চকিতে চোখ মারল। হাড়-হিম-করা এক স্রোত যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল নীরদবরণকে। এখানে অপর্ণা থাকে? তবে কী...?

ডঃ বি. বি. দত্ত বেশ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন নীরদবরণের গলা। বারবার আলজিভের কাছে আলো ফেলে দেখলেন। তারপর গম্ভীরভাবে তিনি বললেন—মনে হচ্ছে রোগটা ভালই বাধিয়েচ ভায়া! গলার এক্সরে করতে হবে।...

সত্তর

কলকাতা শহরে জোর গুজব জাপানিরা বোমা ফেলবে। প্রথমে মানুষ ভেবেছিল এটা গুজবই। কিন্তু ক্রমশ খবরের কাগজগুলোর হেডলাইনস দেখে মনে হল, যা আশঙ্কা করা হচ্ছে তা সত্যিই। প্রায়ই রাতে নাকি আজকাল কলকাতার আকাশে জাপানি বিমান উড়ে আসছে। ক্রমে আপৎকালীন ভিত্তিতে জাপানি বোমার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আয়োজন শুরু হয়ে গেল। সারা পৃথিবীতেও তখন যুদ্ধ চলছে। সারা পৃথিবীতে বলা হয়ত ঠিক হল না। অন্তত সমগ্র ইওরোপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হিটলারের একচেটিয়া অভিযান চলল। পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র ক্রমে ক্রমে নতিস্বীকার করেছে হিটলারের অমিতবিক্রম সেনাবাহিনীর কাছে। শোনা যাচ্ছে, ব্রিটিশ, আমেরিকা এবং রাশিয়া জোট গড়ছে, মিত্রশক্তির জোট। ক্ষমতার ভারসাম্যটা এরকম দাঁড়াল। একদিকে ব্রিটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স। আর একদিকে জার্মানি ও জাপান।

মণিপুর, ইম্ফল এবং কোহিমায় জাপান ব্রিটিশকে ভাল মার দিয়েছে। এবার নাকি কলকাতার আকাশ দখল করতে চাইছে তারা।

সারা শহরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্ল্যাক-আউট ঘোষণা করা হয়েছে। সন্ধে হলেই আজকাল রাস্তা শুনশান হয়ে যায়। মানুষজন ঢুকে পড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে। শহরের সব গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে আলো জ্বালানো হয় না। আলো জ্বাললেও জানলা বন্ধ রাখা হয়। যাতে আলোর শিখা বাইরে দেখা না যায়। রাতের আকাশে শত্রুপক্ষ (জাপানি) যখন বিমানে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তখন যেখানে আলোর শিখা চোখে পড়বে, সেখানেই মানুষের বসতি আছে অনুমান করে তারা বোমা ফেলতে পারে। তাই এই সতর্কতা। আজকাল প্রতি থানায় প্রায়ই সাইরেনের মহড়া শুরু হয়। জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা টের পেলেই সাইরেন বাজিয়ে সতর্কতা জারি করা হবে। রাত হলেই এখন শহরে নেমে আসে নিঃসীম অন্ধকার। যাদের উঁচু বাড়ি এবং বাড়িতে ছাদ আছে, তারা সন্ধে নামলেই সবাই ছাদে এসে জড়ো হয়। ছেলে, বুড়ো, মহিলারা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে যদি জাপানি উড়োজাহাজের দেখা পাওয়া যায়। মাঝে মধ্যে যেইমাত্র আকাশে দেখা যায় কোনও উড়োজাহাজ আসছে, তার পেটের লাল-নীল আলো জ্বলছে আর নিভছে দেখলেই একটা গুঞ্জন ওঠে—ঐ ঐ ঐ ঐ আসচে আসতেচে? কিন্তু তেমন কিছু ঘটে কোথায়? রাতের আকাশের দিকে তাকালে কি কিছু বোঝা যায়? কতরকম বিমান দমদম বিমানবন্দরে যাতায়াত করে নিত্যদিন। তাদের দেখলেই কি বলে দেওয়া যায় বোমারু বিমান? কিন্তু হাওয়ায় হাওয়ায় গুজব ভাসে। রেডিওর খবরে কিংবা সংবাদপত্রগুলোতে বলা হয় যে, কলকাতার আকাশে নাকি আজকাল জাপানি বোমারু-বিমান হানা দিচ্ছে। ব্রিটিশের অ্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফট কামান নাকি তাদের সঙ্গে সঙ্গে হটিয়ে দিচ্ছে। তবে এভাবে আর কতদিন চলবে? একদিন না একদিন জাপানিরা কলকাতায় বোমা ফেলবেই ফেলবে। আর সেই বোমার আয়তন এবং ধ্বংস-ক্ষমতা নাকি ভয়ানক। কেউ বলে এক একটা বোমার ওজন নাকি একশো কিলোগ্রাম কিংবা তারও বেশি। এই শহরের কোথাও যদি সেই বোমা বর্ষণ করা হয়, তাহলে চারপাশের পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে বাড়িঘর যা আছে সেসব নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে; মানুষ, প্রাণী সবকিছু চোখের নিমেষে অক্কা পাবে। আর সেই ভয়ানক পরিণামের কথা ভেবে মানুষ নাকি দলে দলে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। যার যেখানে যাবার উপায় আছে সে পালিয়ে যাচ্ছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর যার যেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে সেখানে চলে যাচ্ছে। কলকাতা শহরকে ধ্বংস করাই নাকি জাপানিদের লক্ষ্য। গ্রাম-বাংলার দিকে তাদের অতটা নজর নেই।

বোমার গুজব ছড়িয়ে পড়ার অনেক আগেই বিশ্বদেব কলকাতা ছেড়েছে। ঝালদাতে তার কর্মক্ষেত্রে কাজে জয়েন করেছে। এবারে বলা যায় গোটা পরিবারকেই ঝালদাতে নিয়ে গেছে বিশ্বদেব। সুনীতি, আর এক মেয়ে এবং দুই ছেলে তো ছিলই তার সঙ্গে শুভ্রাকেও নিয়ে গেছে। যেদিন বিশ্বদেব সপরিবারে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরল, সেদিন ছিল রবিবার। নীরদবরণ বাড়িতেই ছিলেন। সকালবেলা দোতলার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিশ্বদেব গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকেছিল ঘরে। নীরদবরণ চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। কাগজ মুড়ে রাখলেন। বুঝলেন কিছু বলতে এসেছে জামাই।

—এসো...বোসো। চা চলবে?

—চা? ঘণ্টাখানেক আগে হয়েচে।

—তাহ'লে এখন আর একবার চলবে। আমারও একটু চা নিতে ইচ্ছা করছে।

এ বাড়িতে হোলটাইমার একজনই। হাবুর মা। রান্নাঘরে যূথিকার ছায়াসঙ্গিনী। স্ত্রীকে ডাক

দেবেন ভেবেও নিজেকে সামলে নিলেন নীরদবরণ। যূথিকার শরীরটা কদিন ধরে মোটেও ভাল যাচ্ছে না। এখন তো গরমকাল উধাও। বর্ষাও প্রায় শেষ। শরতের শুরু। এই সময় হাঁফানি রুগীরা তেমন কষ্ট পায় না। তাদের কষ্ট পাওয়ার সময় হল শীতকাল। যূথিকা বরাবরের হাঁফানি-রুগী। কিন্তু ইদানীং তিনি ঐ রোগে কষ্ট পাচ্ছেন না। এমনিতেই শরীরটা যেন তাঁর ভেঙে পড়েছে। কয়েকদিন জ্বরে বেশ কষ্ট পেলেন। তারপর থেকে সর্দি লেগেই আছে। আর খুকখুকে কাশি। অল্পেতেই আজকাল হাঁফিয়ে ওঠেন যূথিকা। বেশি একতলা-দোতলা করতে পারেন না। যখনই সুযোগ পান বিছানায় শুয়ে থাকেন। বিশ্রাম নেন। চায়ের জন্যে তাই নীরদবরণ স্ত্রীকে ডাক দিলেন না। গলা তুলে বললেন—হাবুর মা আছ? শোনো এদিকে। বিশ্বদেব বললেন—হাবুর মাকে তো রান্নাঘরে দেখলাম। আমি নীচে যাব? ডাকব ওকে?

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ও আমার গলা ঠিক শুনতে পেয়েছে। আসবে এখুনি।

ঠিকই অনুমান নীরদবরণের। হাবুর মা, বিধবা, সাদা থান পরনে, একমাথা ঘোমটা টেনে এসে হাজির দোতলার ঘরের চৌকাঠে; —কিছু বলচেন দাদাবাবু?

—চা করো তো দুকাপ। বেশি সুগার মানে চিনি দেবে না। আর দুধ কম দেবে। দুধ আর চিনি একগাদা দিয়ে চায়ের শরবত বানিয়ে ফেলো না যেন...।

—আচ্ছা দাদাবাবু। নির্দেশ পালন করতে হাবুর মা চকিতে উধাও।

—তারপর বিশ্বদেব খবর কী? গোছগাছ হয়ে গেছে?

—প্রায়।

—হ্যাঁ। শুনেছি। কাল সুনীতি বলছিল বটে।

—আপনি বোধহয় শুনেচেন ... সুবুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

—দেখা যাক। যতদিন থাকে। ...একটু চেঞ্জ মনে হয় ওর দরকার।

—হুঁ। ...সতীশবাবুরা কি আর ফোনটোন করেছিল?

—আজ্ঞে না। আমি চাই না ওরা আর ফোন করুক।

—মানে? —ভ্রু কুঁচকে তাকালেন নীরদবরণ।

—আমি বুঝে গেচি সুবু ওদের বাড়িতে মানিয়ে নিতে পারবে না। যদি জোর করে ওকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠাই তাহলে রাগের মাথায় কিংবা উত্তেজনার বসে সুবু ভয়ংকর কিছু একটা করে ফেলতে পারে। তখন আমাদের আফসোসের সীমা থাকবে না। —বেশ দৃঢ় গলায়, সোজাসুজি ভঙ্গিতে বিশ্বদেব বলছিল। নীরদবরণ চুপ করে ছিলেন। শুনছিলেন। ইতিমধ্যে হাবুর মা দু-কাপ চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দিলেন উভয়েই।

আবার বলল বিশ্বদেব—ভুল তো যা হবার হয়েই গেচে। এখন আর তা শোধরাবার উপায় নেই।

কথাটা শক্তিশেলের মতন বুকে বিঁধল নীরদবরণের। বিঁধবেই তো। তাঁকে উদ্দেশ করেই তো বিশ্বদেব কথাটা বলেছে। যতদিন বেঁচে থাকবেন এই অভিযোগ আকারে-ইঙ্গিতে শুনতে হবে নীরদবরণকে। এর হাত থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। বিশ্বদেব কি বুঝল যে সরাসরি কথাটা বলে শ্বশুরের মনে হয়ত আঘাত দেওয়া হয়ে গেছে। তাই কি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে সে বলল—

—শুনলাম আপনার গলায় নাকি কী ট্রাবল হচ্ছে?

—এই কথা তোমার কানেও গেছে?

—হ্যাঁ। যাবে না? ক্ষীরোদের মুখে শুনলাম। ঠিক কী হয়েচে আপনার?

—ধুস! তেমন কিছু নয়। নাথিং সিরিয়াস...।

—তবুও ...শুনি?

—আমার এক বন্ধু আছে, ডাক্তার, তার সঙ্গে কনসাল্ট করেছিলাম

—ট্রাবলটা ঠিক কী?

—তেমন কিছু নয়। ...অ্যান ইনফেকশন ইন দ্য থ্রোট...।

—গলায় ইনফেকসান? ...খেতে-টেতে গেলে বোধহয় লাগচে?

—ঐরকমই আর কী। এক্স-রে করানো হয়েছিল।

—রিপোর্ট কী বলছে?

—সামান্য একটু ঘা মতন হয়েছে। ওষুধ-টষুধ দিয়েছে, সেরে যাবে।

—ঘা জিনিসটা তো খারাপ?

—খারাপ তো সবকিছুই বিশ্বদেব। তুমি হাঁটছ হঠাৎ পায়ে পেরেক ফুটে গেল। সেটাও তো খারাপ? ঠিকমতো মেডিসিন পড়লে সব কিছুই সেরে যায়।

—ঠিকমতো মেডিসিন চলছে তাহলে?

—নিশ্চয়ই। ডঃ বি বি দত্ত—আমার বন্ধু বন্ধু খুবই রিলায়েবল ডাক্তার। রোরিং প্র্যাকটিস ওর। ওই তো ওষুধ দিয়েছে।

—সাবধানে থাকবেন। আমি যাই...অনেক গোছগাছ বাকি।

—থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাঁ সব গুছিয়ে নাও।

নিজের অসুখের কথা অবশ্য কিছুটা বললেন নীরদবরণ, সবটা খুলে বললেন না। তাঁর বন্ধু ডাক্তার তাঁকে মদ এখনই পুরোপুরি ছেড়ে দিতে বলেছে। গলায় ঘা-এর পক্ষে অ্যালকোহল একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু চট করে এতদিনকার অভ্যাস কিংবা নেশা ছেড়ে দেওয়া অত সোজা নাকি? গলায় ঘা তো অনেককিছু থেকেই হতে পারে। শ্লেষ্মার ঘার বলেই তো মনে হচ্ছে। বন্ধু ডাক্তারকে মুখে কিছু বলেননি নীরদবরণ। বরং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন মদ্যপানের মাত্রা কমাবার। কিন্তু তেমন কিছু কমাননি। প্রতিদিনই তাঁকে তিন পেগ করে মদ্যপান করতে হয়। আর যেদিন শেলীর বাড়িতে রাত কাটান সেদিন মাত্রাটা অনিবার্যভাবেই বেশি হয়ে যায়। তাঁর গলায় রোগের কতাটা শেলীকে জানাননি। আরে দূর! দুর! মেয়েদের সব কথা বলতে আছে নাকি? ওরা পেটে কোনও কথা রাখতে পারে না। উপরন্তু ভয় পেয়ে যায়। এই ব্যাপারটা সব মেয়ের ক্ষেত্রেই সমান; সে যূথিকা কিংবা শেলী যেই হোক।

রাত সাড়ে নটায় ট্রেন বিশ্বদেবের। নীরদবরণ সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন। নিজের অফিসের গাড়িতে ওদের হাওড়া স্টেশনে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ক্ষীরোদ স্টেশনে সি-অফ করতে গেল। শুভ্রার পীড়াপীড়িতে বারিদবরণও গেল। শুভ্রা আর বারিদবরণ প্রায় মাথায় মাথায়। শুভ্রা মাত্র তিন বছরের ছোট তার থেকে। আর অসিতবরণ তো শুভ্রার থেকে দু-বছরের ছোট। এদের যাবার দিন নীরদবরণ আর নিজের অভিমান নিয়ে থাকলেন না। গাড়িতে মালপত্র ওঠাবার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব তদারকি করলেন। যূথিকা আর সুনীতি; —মা ও মেয়ে খুব খানিক কান্নাকাটি করল। যূথিকা বসলেন মেয়ের মাথায় হাত রেখে—সাবধানে থাকিস মা সবাইকে নিয়ে। আমার বড় নাতনির দিকে নজর রাখিস। যা মাথা-পাগল নাতনি আমার।

—তুমিও সাবধানে থেকো মা। এখন ভোরের দিকে ঠান্ডা পড়ে। ঠান্ডা লাগাবে না একেবারে।।

—আমার আর থাকা না থাকায় কী যায় আসে মা? বয়স তো হয়েচে ...

—ওসব অলক্ষুণে কথা মুখে আনলে আমি কিন্তু কুরুক্ষেত্রর করব মা বলে দিলুম।

ক্ষীরোদ বলল—নে নে দিদি! তোকে আর কুরুক্ষেত্তর বাধাতে হবে না। এখন চল দিকি।

যে কদিন ছিলি তোর রান্না খেয়ে মুখের স্বাদটা একটু পালটেছিল। কাল থেকে আবার সেই হাবুর মা ...

বিশ্বদেব বলল—তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারতে ক্ষীরোদ। এখানে আর তোমার কী এমন কাজ? আমার ওখানে গিয়ে রাঁচিটা একটু ঘুরে আসতে পারতে। সুবুকেও তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতাম রাঁচিতে।

—এখানে আমার কাজ নেই দাদাবাবু? কী যে বলো? দোকানটা আছে না?

বড় ছেলের কথা নীরদবরণ শুনলেন। অন্য সময় হলে ধমকে উঠতেন। এখন কিছু বললেন না। সাইকেলের দোকানটার দিকে ক্ষীরোদ একেবারে নজর দিচ্ছে না। নীরদবরণ সবই খবর রাখেন। দোকানের কর্মচারী রঘু তো এই হাওড়ারই লোক। কাছাকাছি থাকে। ক্ষীরোদের অজ্ঞান্তে নীরদবরণ রঘুকে ডেকে মাঝে মাঝে খবর নেন দোকানের। বিক্রি-বাটা ক্রমশ কমছে। তার প্রধান কারণ হল, ক্ষীরোদ প্রায় দিন দোকানে যায় না। নিজের থিয়েটার-পালা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

শুভ্রা একটু দূরে দূরে ছিল। দাদুর মুখোমুখি ঠিক হচ্ছিল না। সব অভিমান, রাগ ভুলে তিনি তাঁর সুবুকে কাছে টেনে নিলেন। তার হাত ধরে, চিবুকে চুমু খেয়ে বললেন—কীরে মা, তুই কী আমার ওপর রাগ করেই থাকবি?

বন্যার জল যেন সব বাধা সরে যাক তার জন্যেই আকুলি-বিকুলি করছিল। সুবু অপ্রত্যাশিতভাবে দাদুর বুকে মুখ রেখে বহুদিন পর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—তুমিই তো আজকাল আমায় আর ডাকো না দাদু! দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছ...

—দুর পাগলি! তোর ওপর আমার রাগ করা কি সাজে? নীরদবরণ ক্রন্দনরতা শুভ্রার মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ...সবসময় মনে রাখবি সুবু আমি প্রতিমুহূর্তে তোর মঙ্গলকামনা করি। তোর ভাল হবে। তোর কোনও ক্ষতি হবে না। জীবনে তুই সুখী হবি দেখিস!

—কী যে সব ঘটে গেল দাদু? —কান্না-ঘন স্বরে বলল সে।

—ওসব কথা থাক মা। পেছন দিকে তাকাস না। পেছন দিকে তাকালে সামনের দিকে এগোতে পারবি না। তুই তো অনেক ভাল ভাল উপন্যাস পড়েছিস তোর কি মনে হয় জীবন খুব সরল? Life is not so Simple as we want it to be! জীবনের জটিলতাকে বুঝতে হবে। তাকে ভয় করলে চলবে না। বরং পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। কদিন তোর বাবার কাছে থাক সুবু। ঝালদা তোর ভাল লাগবে। আর দু-একটা বই-টই নিয়ে যাচ্ছিস তো মা? প্রতিদিন কিছু না কিছু পড়বি। শরীর ঠিক রাখতে আমাদের যেমন শরীরচর্চা করতে হয়, তেমনই মনকে ফ্রেশ রাখতে আমাদের কিছু না কিছু স্টাডি করা উচিত। ঠিক আছে? ফেয়ারওয়েল টু বিশ্বদেব অ্যান্ড কোম্পানি। —নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন নীরদবরণ।

ওদের নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেল। যূথিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। কী কারণে যেন নীরদবরণেরও মনটা হু হু করে উঠল ...।

একাত্তর

১৯৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমা ফেলল জাপানিরা। উত্তর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ এই বোমা পড়ে। কেউ হতাহত হয়নি। তবে যে স্থানে বোমাবর্ষণ হয়েছিল, সেখন থেকে চার মাইল এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত অনেক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাস্তা ভেঙে যায়। বসেও যায়। শোনা যায়, বোমাটি নাকি খুব একটা শক্তিশালী ছিল না।

এবং যেখানে পড়েছিল তার কাছাকাছি জনবসতিও তেমন ছিল না। থাকলে কী হত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু এই একবারের বোমাবর্ষণেই কলকাতার চতুর্দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব। জোর-গুজব রটে গেল যে, জাপানিরা নাকি আরও বোমা ফেলার মতলব করছে। কলকাতা শহরকে গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নাকি তাদের শান্তি। এই গুজব প্রায় দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ায় মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রাণ বাঁচাবার দায়ে শহর ছাড়ার। শুধু শহর তো নয়; কলকাতার আশেপাশে শহরতলি থেকেও নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মানুষজন পালাতে লাগল অনেক দূরে—কৃষ্ণনগর কিংবা মেদিনীপুরে, বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়ায়; যেখানে যার মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে সেখানে। হাওড়া, বেহালা, বারাসাত কিংবা বেলুড় অথবা বালি থেকেও মানুষ দিশাহারা হয়ে চলে যেতে লাগল দূরে-মফস্বলে, দেশের বাড়িতে। বাড়ির পর বাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। সদর দরজাতে বিশাল তালা ঝুলিয়ে গৃহস্থেরা ছেলেমেয়ের হাত ধরে, বাক্স-পেঁটরা নিয়ে চলে আসেছ হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে যার যেখানে মাথা গোঁজার সুযোগ আছে সেখানে।

একদিন যূথিকা স্বামীকে বললেন তাঁর আশঙ্কার কথা। তাঁর নাকি আজকাল রাতে ঘুম হয় না। কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখেন যে, আকাশ থেকে আগুনের গোলার মতন নেমে আসছে বোমা, বাড়িঘর তাসের ঘরের মধ্যে ভেঙে পড়ছে; রক্তনদীর মধ্যে সাঁতার কাটছে নারী, শিশু, পুরুষ। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্রথমে নীরদবরণ তেমন আমল দেননি স্ত্রীর কথায়। প্রবোধ দিয়েছেন এই বলে যে কলকাতায় আর বোমা ফেলতে সাহস করবে না জাপানিরা। একদিন একটা জাপানি বিমান কোনওরকমে ব্রিটিশের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল কলকাতার সীমানায়, ফেলতে পেরেছিল খুব ছোট আকারের একটা বোমা। কিন্তু এখন ব্রিটিশের সৈন্যরা রাত্রিদিন সজাগ। জাপানিদের বোমারু বিমান রাতের আকাশে হানা দিতে প্রায়ই আসে; কিন্তু ব্রিটিশের কামান তাদের বারবার হটিয়ে দেয়। ভুবনেশ্বরের কাছে নাকি একটা এই ধরনের বোমারু-বিমান ব্রিটিশরা গুলি করে নামিয়েছে। বিমানের পাইলট এবং আরও তিনজন জাপানিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুতরাং কলকাতা এবং শহরতলির মানুষ হুজুগে পড়ে এখন স্রেফ পাগলামি করছে। এভাবে বাড়িঘর ছেড়ে, শহরকে শ্মশানে পরিণত করে, পালিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কিছুদিন বাদেই গুজব অসত্য প্রমাণিত হবে। এবং যারা পালিয়ে গিয়েছিল দূরে-মফস্বলে, তারা আবার ফিরে আসবে এখানকার বাড়িতে। নীরদবরণের কোনও ভয় নেই। ভয় ক্ষীরোদেরও নেই। সে সর্বদা হুজুগ নিয়ে থাকতে ভালবাসে। কিছুদিন আগে ক্ষীরোদ হাতিবাগানে গিয়েছিল। জাপানি বোমার চিহ্ন নিজের চোখে দেখে আসতে। সে যা দেখেছে তার থেকে অনেক বাড়িয়ে বলেছে। হাতিবাগানের মোড়ে প্রশস্ত পিচের রাস্তা নাকি ৬ ফুট নীচে বসে গেছে। মাটির তলা থেকে জল উঠছে রাস্তায়। এভাবে চলতে থাকলে অঞ্চল নাকি ভেসে যাবে! বলাই বাহুল্য এসব অতিরঞ্জন। সব কিছুকেই নিজের কল্পনার মিশেলে তিল থেকে তাল বানিয়ে পরিবেশন করা ক্ষীরোদের স্বভাব।

কিন্তু যূথিকা রীতিমতো ভয় পেতে শুরু করলেন। একদিন মাঝরাতে বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড। দোতলার ঘরে নীরদবরণ শুয়েছেন। এই দোতলাতেই আর এক প্রান্তে একটা ঘরে ক্ষীরোদের পরিবার। ক্ষীরোদ, তার স্ত্রী এবং তাদের বছর দুইয়ের শিশুসন্তান ঐ ঘরে শোয়। নীচে পাশাপাশি তিনটি ঘর। একটিতে যূথিকা শোন। মাঝের ঘরটি ফাঁকা পড়ে থাকে। শুভ্রা আসলে ঐ ঘরে থাকত। এখন শুভ্রা নেই। তাই তালাচাবি দেওয়া। আর তার পরের ঘরটি বারিদবরণ এব

অসিতবরণের জন্যে নির্দিষ্ট।

মাঝরাতে ঘুমে মগ্ন ছিলেন নীরদবরণ। আজকাল তাঁর শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। গলার ক্ষত পুরোপুরি সারেনি। ওষুধ চলছে। তবে খুব যে একটা নিরাময় হয়েছে বলা যাবে না। আজকাল আবার অন্য একটা উপসর্গ এসে জুটেছে। ঝালজাতীয় যে কোনও খাদ্যবস্তু (যেমন কষা মাংস) মুখে দিলেই খানিকবাদে গলা জ্বলতে শুরু করবে। সে জ্বলুনি বড় তীব্র! মনে হয় যেন ছুরি কিংবা ঐ ধরনের ধারাল কোনও অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় কেউ যেন আঁচড়াচ্ছে! যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে যায় নীরদবরণের। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। তাঁর বন্ধু ডাক্তার কী একটা ট্যাবলেট দিয়েছে। গলায় এরকম যন্ত্রণা শুরু হলেই ট্যাবলেটটি খেয়ে নেন নীরদবরণ। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য যন্ত্রণা কমে আসে। ওষুধের মাত্রা বন্ধু ডাক্তার আরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সেসব ওষুধ প্রতিদিন খেতে হয়। সেই ওষুধের প্রভাবেই হয়তো আজকাল ঘুমও পায় বেশ। রাতে বিছানায় শুলে তাঁর আর সাড় থাকে না।

সেদিনও রাতে মড়ার মতন ঘুমিয়ে ছিলেন নীরদবরণ। ক্ষীরোদ এসে এমন ডাকাডাকি শুরু করে দিল যে, তাঁকে ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। ঘরে আলো জ্বলছে। ক্ষীরোদই আলো জ্বেলে দিয়েছে।

—কী ব্যাপার? ...তুমি?

—একবার নীচে চলুন বাবা....

—মানে? এত রাতে?

—মা কীরকম করচে! ডাক্তার ডাকব কি না বুঝতে পারচি না।

—কীরকম করছে? —নীরদবরণের পরনে সিল্কের স্লিপিং গাউন। এই বাড়িতে একমাত্র তিনিই খালি পায়ে থাকেন না। স্লিপার পরে। এসব সাহেবি আনায় এ বাড়ির লোক অভ্যস্ত।

চটি ফট্‌ফট্ করতে করতে নীরদবরণ একতালায় নামলেন। তারপর যে ঘরে যূথিকা শোন, সেই ঘরে ঢুকলেন। সে ঘরেও আলো জ্বলছে। অসিত আর বারিদ দাঁড়িয়ে আছে। যূথিকার মাথার কাছে বসে হাবুর মা তাঁর কপালে জলপটি দিচ্ছে।

—কী হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে? নীরদবরণ জিজ্ঞেস করলেন। যূথিকা ফ্যালফ্যাল করে দেখলেন স্বামীকে। তাঁর ঠোটের দুপাশে ফেনা।

—কী হয়েছে? অসুস্থ বোধ করছ?

—মা শুধু বলচে উড়োজাহাজ আসচে...উড়োজাহাজ আসচে...বারিদ বলল।

—সে আবার কী? কী হয়েছে তোমার? আরও একটু এগিয়ে যূথিকার একটা হাত তুলে নিলেন নীরদবরণ। নাড়ি দেখলেন। দপ্‌দপ্ করছে নাড়ি। আর শরীরও কীরকম ঠান্ডা!

—আমার বমি পাচ্চে...বমি করব...

—এরকম বলচে মা। অথচ বমিও করচে না। বলল ক্ষীরোদ।

—বমি পাচ্চে অথচ বমি হচ্চে না! কী কষ্ট! যূথিকা বললেন।

—দোতলার ঘরে আমার টেবিলে একটা ছোট্ট নীল কাচের শিশি আছে। ওটা স্মেলিং সল্টের শিশি। বারিদ ওটা ছুটে নিয়ে আয় তো?—বললেন নীরদবরণ। বারিদ এক ছুটে সেটা নিয়ে এল। নীরদবরণ নিজে ছোট্ট শিশিটা স্ত্রীর নাকের কাছে ধরলেন। বললেন—জোরে নিঃশ্বাস নাও। কর্পূরের গন্ধ পাবে। একটানা কিছুক্ষণ এই গন্ধ নিলে গা-বমি ভাব কেটে যাবে। নাও তুমি নিজে শিশিটা ধর নাকের কাছে। এই আমি দেখিয়ে দিলাম। এভাবে ধরতে হয়...।

যূথিকা ঠিক পুরোপুরি শুয়ে নেই। পিঠের কাছে দু-তিনটি বালিশ দিয়ে উঁচু করে রাখা আছে।

তাতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। শিশিটা তিনি স্বামীর নির্দেশ মতো নাকের কাছে ধরে আছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি একটু স্বস্তি পাচ্ছেন। এই ঘর থেকে নীরদবরণ চলে গেছেন। এখন ঘরে যূথিকা তিন পুত্র-পরিবেষ্টিত। এত বড় বাড়িতে চারজন পুরুষ, একজন মাত্র মহিলা। শুভ্রা যখন ছিল সারা বাড়ি যেন মাতিয়ে রাখত। সে ছিল একাই একশো। এ-বাড়িতে যে মহিলার সংখ্যা কম সেটা বোঝা যেত না। এখন যায়। শুভ্রার অনুপস্থিতি সকলেই পদে পদে টের পায়।

এখন অসময়। গভীর রাত। সারা পাড়া নিশুতি। মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। দোতলার ঘরে নীরদবরণের ইচ্ছে হল পাইপে তামাক ভরতে। তারপর মনে হল, এখন চোখে ঘুম আছে। পাইপ টানলে ঘুম ছুটে যেতে পারে। তাছাড়া ...। তাছাড়া বন্ধু ডাক্তার তাঁকে জানিয়েছে যে গলার রোগটা নাকি ভাল নয়। ওষুধ চলছে। তবে থাকতেও হবে সাবধানে। অর্থাৎ মদ পুরোপুরি ছাড়তে হবে। আর ধূমপানও বন্ধ করা উচিত। গলায় চাপ যাতে না পড়ে; বারবার কাশির উদ্রেক যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখাতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিনের নেশা ছাড়া কি অতই সহজ? মদের মাত্রা কমিয়েছেন নীরদবরণ; কিন্তু পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। পারবেন কি আদৌ? আর পাইপে টান না দিলে তাঁর মেজাজই তো ঠিকমতন খোলে না।

ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন নীরদবরণ সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে। ঘরে আলো জ্বলছে। এখন চোখে আর ঘুম নেই। বরং দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যূথিকার কি শরীর ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছে? নাকি ব্যাপারটা মানসিক? কলকাতায় একটা বোমা পড়েছে। অনেকেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশ-গাঁয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গুজব রটেছে আরও নাকি বোমা পড়বে। অবশ্য তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে মাঝেমাঝে। প্রায় প্রত্যেক রাতেই জাপানিদের বোমারু বিমান ধেয়ে আসছে কলকাতার আকাশে। দুদিন আগে রাত নটা নাগাদ হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠেছিল। এরকম সাইরেন বাজলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো পটাপট নিভিয়ে দিতে হবে। আর একতলার ঘরে সেঁদিয়ে যেতে হবে সকলকে। বাইরে বের হওয়া চলবে না। কিন্তু ক্ষীরোদ, বারিদ আর অসিতের কৌতূহল বেশি। তারা ঘরে থাকার ছেলে নয়। বোমারু বিমান দেখতে অন্ধকারেই দুদ্দাড় করে ছাদে উঠে আসে। দুদিন আগের সেই রাতে নীরদবরণেরও কৌতূহল হয়েছিল। তিনিও ওদের সঙ্গে ছাদে উঠে গিয়েছিলেন। এবং ছাদে উঠেই বুঝলেন, আশেপাশের বাড়ির ছাদগুলোতেও লোকজন আছে। অর্থাৎ অনেকেরই কৌতূহল নিজের চোখে শুধু বোমারু বিমান নয়, বোমাবর্ষণও দেখবে। যদিও সত্যি বোমাবর্ষণ হলে কী হবে তা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠতেই হয়। অনেকক্ষণ আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেও নীরদবরণ কিছু বুঝতে পারেননি। পরিষ্কার, তারাভরা আকাশ। বিমান-টিমানের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু তবুও একটানা কোঁ কোঁ করে সাইরেনের বিপদ-সংকেত বেজেই যাচ্ছিল। তার মানে সত্যিই বিপদের গন্ধ পাওয়া গেছে। খানিক বাদে ক্ষীরোদ আর বারিদ বলে উঠল—ঐ! ঐ! ঐ! ঐ তো! অসিত হাততালি দিয়ে বলল—হ্যাঁ ঐ তো...ঐ তো প্লেনের আলো?

—গোঁ গোঁ আওয়াজও শোনা যাচ্চে! ...বারিদ বলেছিল—তার মানে প্লেনগুলো খুব নিচু দিয়ে যাচ্চে! ...

—এখনই যদি বোমা ফেলে কী হবে মেজদা? অসিত বলেছিল। নীরদবরণ ধমকে বলেছিলেন—এত কথা বলচ কেন? হোয়াই সো নয়েজ? এই সময় কথা বলা মানে তো বিপদ ডেকে আনা। ...তখন সবাই চুপ করে গিয়েছিল। আশেপাশের ছাদেও লোকজন কথা বলছিল না। সবাই হয়ত রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে। কিন্তু নীরদবরণ যা বলেছিলেন তা কি ঠিক? যে উচ্চতায় প্লেনগুলো যাচ্ছিল সেখান থেকে সত্যিই কি মানুষের কথাবার্তা শুনতে পাওয়া সম্ভব? আসলে এরোপ্লেন বিষয়ে নীরদবরণের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তিনি জাহাজে চেপেছেন। কিন্তু

আকাশযানে এখনও ওড়ার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি।

সেদিন অবশ্য দুটো প্লেন বিনা ঝামেলাতেই উড়ে গিয়েছিল। তাদের পেটের কাছে বিন্দুর মতন লাল আলো জ্বলছিল আর নিভছিল। সেই পেটের ভেতর থেকে বোমা-টোমা অবশ্য কিছুই বর্ষিত হয়নি। তারপর সবাই স্বস্তির শ্বাস ফেলে নীচে নেমে এসেছিল। একতলার ঘরে ঢুকে ক্ষীরোদ চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা! ওমা! ওরকম কাঁপছ কেন? তার চিৎকার শুনে নীরদবরণও নেমে এসেছিলেন দোতলা থেকে। দেখেছিলেন যূথিকা তক্তপোষের বিছানায় বসে কীরকম কাঁপছেন আর বিড়বিড় করছেন। তাঁর এক হাতের আঙুলে রুদ্রাক্ষের মালা জড়ানো।

এত ভয় পাওয়ার কী আছে? সাইরেন বাজলেই কি বোমা পড়বে? —নীরদবরণ বলেছিলেন।

—পড়েছিল তো? —কাঁপতে কাঁপতে যূথিকা বলেছিলেন। —ঐ যে হাতিবাগান না কোথায় পড়েচে? আমাদের এখেনে যা ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। একটা বোমা পড়লে আর বাঁচব কেউ? হে মাগো! চলো আমরা কোথাও চলে যাই!

—কোথায় যাবে?

—এমন কোনও জায়গায় যেখানে জাপানি মুখপোড়ারা বোমা ফেলবে না। কলকেতা তো ফাঁকা হয়ে গেল গো! ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে সেই কথাই ভাবছিলেন নীরদবরণ। এমন সময় ক্ষীরোদ এসে হাজির।

—কী হল? উনি এখন কেমন বোধ করছেন?

—কাঁপুনিটা থেমেছে। বমি ভাবটাও গেচে। তবে ঘুমোতে চাইচে না।

—সে আবার কী? ঘুমোতে চাইছে না? এ কি পাগলামি নাকি?

—মা বলচে ঘুমোলেই উনি নাকি স্বপ্ন দেখচেন!

—কী স্বপ্ন?

—অনেক উড়োজাহাজ থেকে বোমা পড়চে...

—রাবিশ! এতো পুরো ফিয়ার-সাইকোসিস!

—আপনাকে মা একবার ডাকচে...

—আর পারা যায় না। মাঝরাতে এই অশান্তি! আমারও তো শরীর বলে ব্যাপার-স্যাপার আছে...। বিরক্ত মুখে নীরদবরণ একতলাতে নেমেছিলেন।

—কী বলছ আবার?

—ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে কয়েকদিনের জন্যে জিয়ড়দা রেখে এসো...

—কোথায়? ...নিজের শ্বশুরবাড়ির নামটা নীরদবরণের ঠিক মনে থাকে না।

—জিয়ড়দা...সোনামুখী।

—সেখানে কার কাছে থাকবে? তোমার বাবা নেই মা নেই। ...এক ভাই স্বদেশি করে বেড়ায়। আর এক ভাই তো সদ্য বিয়ে করেছে? তারা তোমাকে থাকতে দেবে?

—খুব দেবে। আমার তো সে-বাড়িতে আলাদা একটা ঘর আচে। খাট-বিছানা আচে। মেয়ে আসতে পারে জেনে বাবা তো সব ব্যবস্থাই করে গেছেন।

নীরদবরণের কপালে কুঞ্চন। তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—কিন্তু তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে কেন সেই গণ্ডগ্রামে যেতে চাইছ? তুমি অনেকদিন সেখানে থাকোনি। গ্রামে থাকার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সেখানে থাকতে পারবে?

—খুব পারব। ব্রিটিশরা এই জাপানিদের মেরে তাড়িয়ে দিলেই আবার ফিরে আঁসব। সন্ধে হলেই আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। শুধু মনে হয় এই বুঝি বোমা এসে পড়ল! হে ভগবান,

কী যে হয়েচে আমার! ভাবতে একদিন সময় নিলেন নীরদবরণ। তারপর রাজি হলেন। এত ভয় নিয়ে, অনিদ্রার কষ্ট নিয়ে এখানে থাকার দরকার কী? বাপের বাড়ি ঘুরে আসুন না যূথিকা! অনেকদিন তো সেখানে যাননি। যূথিকার বাবা মারা গেছেন বছর পনেরো। মা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সে বছর তিনি হল মারা গেছেন। তখন মায়ের শ্রাদ্ধে যূথিকা গিয়েছিলেন সেখানে। ক্ষীরোদ নিয়ে গিয়েছিল। এবং শুভ্রাও দিদুর সঙ্গে গিয়েছিল। তাঁর নাকি জায়গাটা খুব ভাল লেগেছিল।

এবারও ঠিক হল ক্ষীরোদ মাকে তার মামাবাড়ি নিয়ে যাবে। যূথিকা এক শুধু ক্ষীরোদের সঙ্গে যাবেন না। শুভ্রাকেও তাঁর চাই। মেয়েটাকে অনেকদিন দেখেননি যূথিকা। তাঁর বড় মন কেমন করছে। সুবু থাকলে, যূথিকা বেশ নিশ্চিন্ত থাকবেন। 'ক্ষীরোদের বাবা' তো ঠিকই বলেছেন। বাপের বাড়িতে যূথিকার সময় কাটবে কীভাবে? তাঁর বড় ভাই পাক্কা স্বদেশি। তার পায়ের তলায় সরষে। কখন কী যে করে বেড়ায় কেউ জানে না। আর ছোটটি গ্রামেরই স্কুলে প্রাইমারি শিক্ষক। দীর্ঘ চল্লিশ বছর অবিবাহিত থেকে সদ্য গ্রামেরই এক বিধবাকে নাকি বিয়ে করেছে। সেই নিয়ে বহুত কেলেঙ্কারিও হয়েছে গ্রামে। কিন্তু ছোটভাইকে চেনেন যূথিকা। সে বড় একগুঁয়ে। যা ভাববে করবে। কারও কথা শুনবে না। ছোট ভাইয়ের বউ কেমন তা জানেন না যূথিকা। সে কারণেই সুবুকে নিয়ে যাবেন। তা না হলে সময় কাটবে কীভাবে? পরের দিনই নীরদবরণের হুকুমে ক্ষীরোদ ঝালদা রওনা হল। শুভ্রাকে আনতে।

বাহাত্তর

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বোঝা গেল কলকাতায় বোমা পড়ার গুজব কিংবা সন্ত্রাস কতদূর ছড়িয়েছে। সকাল এগারোটা নাগাদ স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা তিনজন—ক্ষীরোদ, যূথিকা আর শুভ্রা। বেলা বারোটা দশ নাগাদ বর্ধমান যাওয়ার ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে বর্ধমান পৌঁছে সেখান থেকে বাস ধরতে হবে সোনামুখীর। বাঁকুড়া জেলার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে হল সোনামুখা। খুব বর্ধিষ্ণু জায়গা। কিন্তু যূথিকার বাপের বাড়ি তো সোনামুখীতে নয়। সেখান থেকে আরও কিছুটা ভেতরে যেতে হবে—গ্রামের নাম জিয়ড়দা। ক্ষীরোদ হিসেব করেই বেরিয়েছে। তার ধারণা যদি রাস্তায় কোনও বিপত্তি না ঘটে তাহলে বিকেল সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ তারা গন্তব্য জিওরদাতে পৌঁছে যাবে। বিপত্তি যদি ঘটে তাহলে বাসেই ঘটবে। প্রথমত, গ্রামের রাস্তায় বাস ধিকির ধিকির যাবে। দ্বিতীয়ত, রাস্তার যা অবস্থা তাতে প্রায়ই বাসের টায়ার ফেঁসে যেতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে তো একেবারে অক্কা। টায়ার পালটাতে ঘণ্টাখানেক সময় যদি লাগে তাহলে বলতে হবে সত্যিই অল্প সময় লেগেছে।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। নীদবরণের একবার মনে হয়েছিল ওদের সি-অফ করতে নিজেই স্টেশনে যাবেন। তারপর মনে হল, দরকার কী আছে। ক্ষীরোদ তো আছে সঙ্গে। তার বউ আভা যথারীতি সুযোগ বুঝে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ক্ষীরোদ কয়েকদিন মামার বাড়ি জিয়ড়দাতেই থাকবে। ঠিক কদিন থাকতে হবে বলা যাচ্ছে না। বোমা পড়ার গুজব কতদিন জিইয়ে থাকবে তাও তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আবার সবটা ঠিক গুজবও নয়। এখনও শহরে ব্ল্যাক-আউট জারি আছে। গতকালও রাতে সাইরেন বেজে উঠেছিল আচমকা। ক্ষীরোদ, বারিদ আর অসিত হুড়মুড়িয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল। যদি জাপানিদের বোমারু বিমান চোখে পড়ে। কিন্তু শুধু সাইরেনে বিপদ সংকেতই শোনা গেছে। বিমান দেখা যায়নি। বোমাও পড়েনি। তবে যুদ্ধের যা গতিবিধি

তাতে জাপানিরা যে ব্রিটিশদের বেশ চাপে রেখেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর খবরের কাগজ পড়ে যা বোঝা যায় তাতে এটুকু পরিষ্কার যে, জাপানিরা প্রায়ই কলকাতার আকাশে হানা দিচ্ছে। উদ্দেশ্য বোমা ফেলে এই শহরটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। তাতে জাপানিদের ধারণা ব্রিটিশদেরই বিপাকে ফেলা যাবে। কারণ, কলকাতা হল ব্রিটিশদের রাজধানী, আসল ঘাঁটি। বোমা পড়ার ভয় যূথিকার মনে এমনই চেপে বসেছে যে, তাঁকে জিয়ড়দা পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিতে হলই। অন্তত দিন পনেরো ঘুরে আসুক না ওরা। তারপর দেখা যাক, অবস্থা কী দাঁড়ায়। সুবুও দিদুর সঙ্গে যেতে পেরে বেশ খুশি। বিশ্বদেবের সঙ্গে ক'দিন ঝালদা গিয়েই বেশ পরিবর্তন হয়েছে মেয়েটার। আবার আগের মতন উচ্ছলতা প্রকাশ পাচ্ছে তার কথাবার্তায়। উষ্ণতাও প্রকাশ পাচ্ছে। ঝালদা থেকে হাওড়ার বাড়িতে পা রেখে, নীরদবরণকে দেখেই সুবু বলেছিল—এমা! দাদু তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন? খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করছ বুঝি? নীরদবরণ যাহোক একটা উত্তর দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর শরীর বিষয়ে নাতনির এই উদ্বেগ বেশ মনে ধরেছিল তাঁর। অভিজ্ঞ নীরদবরণ বুঝতে পেরেছিলেন যেন যে মেয়েটার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। স্থান-পরিবর্তনই হয়ত এর কারণ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যূথিকার সঙ্গে মেয়েটাকে জিওড়দা পাঠানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। যূথিকাও নাতনিকে নিয়ে বেশ আনন্দে থাকবেন। বারিদ কিংবা অসিত কেউই স্টেশনে ওদের সি-অফ করতে যেতে পারল না। বারিদ ছুটল আমহার্স্ট স্ট্রিটে তার প্রফেসারের বাড়িতে কীসের পড়া-টড়া বুঝতে। আর অসিত গেল তাদের স্কুলে এন. সি. সি. প্যারেড করতে। ছুটির দিন হলেই স্কুলে প্যারেড কমপালসারি। এখন যুদ্ধের সময়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্যারেড করতে হয়, আরও নানারকম ট্রেনিং নিতে হয়। শহরে যদি সত্যিই বোমা পড়ে তাহলে যাতে স্কুলের ছাত্রা-ছাত্রীরাও ত্রাণের কাজে কোনও না কোনওভাবে সাহায্য করতে পারে। ওদের সি-অফ করতে স্টেশনে কেউ গেল না। শুধু নীরদবরণের গাড়ি গেল। স্ত্রীকে স্টেশনে মালপত্রসহ পৌঁছে দেবার কথা ভেবেই তিনি ছুটির দিনেও অফিসের গাড়িকে আসতে বলেছিলেন। যাতায়াতের জন্যে পেট্রল যা দরকার তার দাম নীরদবরণ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে চালককেও দিয়েছেন মোটা বখশিস। এতে দুশ্চিন্তা দূর হয়। কাজও ভাল হয়।

চালক রহমান আর ক্ষীরোদ মালপত্র হাতে করে নিয়ে স্টেশনে ঢুকে পড়ল। শুভ্রার হাতে একটা ছোট পুঁটলি। তাতে মেয়েদের টুকিটাকি। যূথিকার হাতে কিছু নেই। অনেক অনেকদিন বাড়ি থেকে বের হওয়া হয়নি বলেই বোধহয় স্বামীকে ছেড়ে আসতে যূথিকার মন কেমন করছিল। চলে আসার সময় সবাই যখন বাড়ির একতলাতে গুলতানি করছিল, যূথিকা দোতলায় উঠে এসেছিলেন স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে। নীরদবরণ একা ঘরে পায়চারি করছিলেন। যূথিকাকে ছাড়তে তাঁরও মনে যেন কীরকম এক অস্বস্তি হচ্ছিল। নিজের শ্বশুরবাড়ির গ্রামে তিনি খুব বেশি না গেলেও সেখানকার অবস্থা বুঝে নিয়েছেন ভালই। ওখানে পুকুরে স্নান; ধুলো ও মশা-মাছির প্রকোপ বেশি। যদিও যূথিকা ঐ গ্রামেই জন্মেছেন, বড় হয়েছেন তবুও বিয়ের পর গ্রামে থাকার অভ্যাস তাঁর প্রায় চলেই গেছে। পুকুরে চান করে, গ্রামের খোলামেলা আবহাওয়ার কারণ যূথিকার শ্বাসের টান আবার বেড়ে যাবে না তো। কিছু ওষুধ তিনি অবশ্য ক্ষীরোদের হাতে দিয়েছেন। বেগতিক দেখলে সে মাকে খাওয়াবে।

অনেকদিন যা করেন না যূথিকা, আজ স্বামীর সামনে এসে তাই করলেন। ঢিপ করে প্রণাম করলেন নীরদবরণকে। তারপর তাঁর হাতদুটি ধরে বললেন—ওগো তুমি নিজেও একটু সাবধানে থেকো। তোমার শরীরও তো ভাল নয়?

—আবার এসব আদিখ্যেতা কী হচ্ছে?

—না গো আদিখ্যেতা নয়। তোমারও শরীরটা ভাল নয়। গলাতে কীসব ব্যথা হয়। ডাক্তার দেখিও। ওষুধ খেও। আমি ওখানে চিন্তায় থাকব।

—আমাকে নিয়ে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। নীরদবরণ রাগতভাবে বললেন।

—সে আমি জানি। তোমাকে নিয়ে চিন্তা করার অন্য মানুষ আচে। —কথাটা বলে, খোঁচাটা দিয়ে যূথিকা চোখ মুছলেন; —আমারই কপাল! তোমাকে পুরোপুরি কোনওদিনই পেলুমনি...

—বেশ যাত্রা করতে শিখেছ তো দেখছি...

—নাহ যাত্রাপালা নয়। মন থেকে বলচি। সকাল থেকে শুধু মনে হচ্চে যদি আর না দেখা হয়...

—বোগাস! ...পেটি সেন্টিমেন্টস! যাও যাও তোমাদের ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে। ...

হাওড়া স্টেশনে ঢুকে তো ক্ষীরোদের চক্ষুস্থির। এত ভিড়! এ যে গিজগিজ করছে মানুষ! পা ফেলারও জায়গা নেই! এত অসংখ্য মানুষ কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলেছে? কলকাতা কি ফাঁকা শ্মশান হয়ে যাবে?

—আচ্ছা কলকাঠি নেড়েচে শালা জাপানিরা! —একজন বলল। ঠিক ক্ষীরোদের পাশেই লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। কালো, রোগা। মুখে বসন্তের দাগ। বিড়ি টানছিল।

—এরকম মজা কে কবে দেখেচে মশায়? জাপানীদের বোমার ভয়ে কলকেতা ফাঁকা হয়ে গেল ...। আবার বলল লোকটা। ক্ষীরোদের দিকে তাকিয়ে। মুচকি হাসছে। নিজের মা আর শুভ্রাকে ক্ষীরোদ প্লাটফর্মের ঠিক মাঝখানটায় আনেনি। ওধারে, কিছুটা দূরে বসিয়ে রেখেছে। যূথিকা বসেছেন নিজের টিনের তোরঙ্গের ওপর। আর বালিশ, বিছানা, মশারি জড়িয়ে যে পুঁটলিমতন হয়েছে সেটিতে বসেছে শুভ্রা। তাদের কাছাকাছি পাহারায় আছে গাড়ির চালক রহমান।

—তাহলে বলচেন এত সব লোক বোমার ভয়ে পালাচ্চে? —ক্ষীরোদ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল। যূথিকা ওদিকে আছেন। ভিড়ের মধ্যে দেখতে পাবেন না। ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল ক্ষীরোদ।

—তা নয় তো কী মশায়! আপনি বোধহয় আজই প্রথম ইস্টিশানে এলেন?

—আজই প্রথম মানে?

—গত একমাসের মইধ্যে। সেই কবে থেকে তো এই কাণ্ড চলতেচে। কলকাতায় বাসা ছাড়াও যাদের দেশগাঁয়ে জোতজমি আচে তারা বাসায় তালা লাগিয়ে চলেচে সেখানে। বেঘোরে পরানটা কে দিতে চায় বলুন?

—তা বটে। —ক্ষীরোদ সায় দিল।

—আপনি কোথায় চললেন মশায়?

—আমরা? ... সোনামুখী।

—নিশ্চয় বোমার ভয়ে?

—হ্যাঁ ... তা বলতে পারেন। আমি ঠিক ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি বলা ভুল। আমার মা...বয়স হয়েচে তো...খুব ভয় পাচ্চে বোমার। তাই ওনাকে রাখতে যাচ্চি।

—ও...। লোকটার বিড়ি শেষ হয়ে এসেছিল। সেটা ছুড়ে দিল প্লাটফর্মের ওপারে ট্রেন-লাইনের ওপর। তারপর ক্ষীরোদের দিকে তাকিয়ে অকারণেই মুচকি হাসল।

—আপনিও তো আমাদের মতন? ...বোমার ভয়ে...

—আজ্ঞে না। আমার অত মরার ভয় নেই। একদিন তো মরবই।

—তাহলে?

—আমি রোজ এই সময়টাতে ইস্টিশানে আসি মশায়। মজা দেখতে আসি।

—মজা দেখতে? —ক্ষীরোদ রীতিমতন অবাক হয়।

—হ্যাঁ। বোমার ভয়ে লোকজন এই শহর ছেড়ে পালাচ্চে এটা ভাবতে বেশ ভাল লাগে মশায়। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মজা পাই। কী বোকা এরা না?

—কেন? বোকা বলচেন কেন?

—বোকা নয় তো কী? এরোপেলেন থেকে জাপানিরা বোমা ফেললে অত হিসেব করে ফেলবে নাকি সব বোমা কি কলকাতায় পড়বে? এদিক ওদিকও তো পড়তে পারে? ...এই ধরুন গিয়ে ধানবাদ কিংবা বর্ধমান কিংবা কেষ্টনগর...। তখন কি যারা পালিয়ে যাচ্চে তারা বাঁচবে ভেবেচেন?

—তা বটে। ক্ষীরোদ মৃদুভাবে বলল। লোকটার কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই এটা বলা যায় না। আবার আর একটা কথাও তো ঠিক। যেটা ক্ষীরোদ খবরের কাগজে পড়েছে। এই কলকাতা শহরকেই জাপানিরা টার্গেট করেছে। কারণ কলকাতা হল দেশের রাজধানী। এখানে যদি বোমা ফেলে ক্ষতি-টতি করা যায় তাহলে ব্রিটিশদের মনোবল ভেঙে যেতে পারে।

—কী যে হবে বলা যাচ্চে না মশায়। লোকটা বলল।

—কীসের কী হবে?

—এই আমাদের কথা বলচি...

—মানে?

—আপনার কী মনে হয়? ব্রিটিশদের তাড়িয়ে জাপানিরা কলকাতায় ঢুকে পড়বে?

—নাহ তা কী হয়? ...অনিশ্চিতভাবে বলল ক্ষীরোদ;—ব্রিটিশদের তাড়ানো অত সহজ নয়। আমরা কম চেষ্টা করচি? গেচে ওদের নড়ানো?

—আপনি কি টেররিস্টদের কথা বলচেন মশায়? —সব কথায় মশায় জুড়ে দেওয়া লোকটার একটা মুদ্রাদোষ।

—টেররিস্টদের কথা? ...হ্যাঁ তা বলতে পারেন। তাছাড়া কংগ্রেসও তো কম চেষ্টা করচে না। দেখচেন তো এখন গান্ধীজির কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট চলচে! কত লোক অ্যারেস্ট হচ্চে তবুও কি ব্রিটিশদের নড়াতে পারচে?

—আরে ছো ছো ঐ গান্ধী বুড়োর কথা আর বলবেন না! ওসব অহিংসা-টহিংসা দিয়ে ব্রিটিশদের তাড়াবে লোকটা? দূর দূর! ওকে ব্রিটিশরা একদম চমকায় না। যখনই ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই শুরু করে অমনি পুলিশ ওকে জেলে পুরে দেয়। ওর দ্বারা কিস্যু হবে না! আজ যদি থাকত সুভাষ বোস তাহলে দেখতেন ব্রিটিশ বুঝত কত ধানে কত চাল! একমাত্র ঐ লোকটাকেই ওরা সত্যিকারের ভয় খায়। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। লোকটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল...

—অনেকে বলচে সুভাষ বোস নাকি জাপানিদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েচে। ওদের সঙ্গে মিলে ব্রিটিশদের তাড়াবে।

—ওসব বাজে কথা। সুভাষ বোস হল গিয়ে সুভাষ বোস। একাই একশো। আপনি একরকম শুনেচেন। আবার আমি কী শুনেচি জানেন?

—কী?

—সুভাষ বোস নাকি জার্মানিতে আচে! হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েচে। এবার ওরা ব্রিটিশকে শালা বেঁধে প্যাঁদাবে... লোকটা খবরটা ক্ষীরোদকে জানানোর আনন্দেই আর একটা বিড়ি ধরাল। আর ঠিক সেইসময় শোরগোল পড়ে গেল। ...টেরেন আসচে...টেরেন আসচে! ক্ষীরোদ দৌড় মারল যূথিকা যেখানে বসে আছেন সেই দিকে।

চালক রহমান আর ক্ষীরোদের যৌথ প্রচেষ্টায়, অনেক কসরত করে বর্ধমানের ট্রেনে উঠে পড়তে পারল ওরা। জায়গাও পেয়ে গেল। একটা লম্বা সিটে যূথিকা, পাশে শুভ্রা। তার পাশে একটা মাঝবয়সী লোক। নাকের নীচে ইয়া মোটা গোঁফ। কিছুটা অবাঙালিদের মতন দেখতে। কামরায় চাপাচাপি ভিড়। অসহ্য গরম। ঘামের গন্ধ। বিড়ির ধোঁয়া। নানারকম খিস্তি, টীকা-টিপ্পনি। ট্রেন চলছিল ঢিমেতালে। তার মধ্যেই ক্ষীরোদের চোখে পড়ল সেই দৃশ্য। যূথিকাদের আসনের ঠিক বিপরীত দিকের আসনে চারজনের বসার জায়গায় পাঁচজন চাপাচাপি করে বসেছে, তাদের মধ্যে ক্ষীরোদ একজন। ক্ষীরোদ দেখল, শুভ্রার পাশে বসে থাকা অবাঙালি চেহারার লোকটা তার ডানদিকের কনুইটা শুভ্রার বাঁ-দিকের কোমরের কাছে চেপে ধরেছে। বড় বিশ্রী লাগছে দেখতে। ক্ষীরোদের মনে হল শুভ্রার স্তনকেও কনুই দিয়ে ট্রেনের দুলুনির তালে তালে স্পর্শ করে যাচ্ছে লোকটা। রাগে কান-মাথা গরম হয়ে গেল ক্ষীরোদের। আশ্চর্য! সুবুটা কি কিছু বুঝতে পারছে না? দৃশ্যটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না ক্ষীরোদ। সে ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটাকে রাগের গলায় বলল—এই যে আপনি আমার জায়গায় গিয়ে বসুন তো...

—কেন? গুঁফো লোকটা মৃদুভাবে বলল।

—ও আমার ভাগনি। ওর পাশে আমি বসব।

কোনও প্রতিবাদ করল না লোকটা। সুড়সুড় করে উঠে গেল। বসল ক্ষীরোদের জায়গায়। শুভ্রার পাশে বসল ক্ষীরোদ। শুভ্রা চলন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। ও কি কিছু বোঝেনি? লক্ষ করেনি? ক্ষীরোদের কীরকম খটকা লাগছিল। সত্যিই কি শুভ্রা কিছু অনুভব করেনি?...

তিয়াত্তর

যূথিকার বাপের বাড়ির অবস্থা বরাবরই ভাল। এই অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থ তারা। যূথিকারা দু-ভাই, দু-বোন। যূথিকা হলেন সকলের বড়। তারপর এক ভাই বরেন। তার নীচে যূথিকার আর এক বোন, তার বিয়ে হয়েছে এই বাঁকুড়া জেলাতেই, তালডাংরা নামে এক অঞ্চলে। আর ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল সুরেন। যূথিকার মা-বাবা দুজনেই বহুকাল হল গত। প্রচুর জমি-জমা, মাছ-ভর্তি পুকুর ভোগ করার মতন লোকের অভাব। তার ওপর বরেন হল বরাবরই অ-সংসারী, ছন্নছাড়া। সে বিয়ে-থাওয়া করেনি। ঠাকুর-দেবতাতে খুব ভক্তি। বাড়িতে তার মন বসে না। সে তাই প্রায়ই ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়ে। একবার বেরিয়ে পড়লে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। শোনা যায় হরিদ্বারে কোন এক সাধুর পাল্লায় পড়েছে বরেন। সেই সাধু তাকে কীভাবে বশ করেছে কে জানে। একবার গৃহত্যাগ করলে বরেনের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। যখন সে বাড়ি ছেড়ে পথে নামে, তখন তার মুখের দাড়ি-গোঁফ থাকে কামানো। তারপর মাস পাঁচ-ছয় পরে বরেন যখন হঠাৎই একদিন বাড়ি ফিরে আসে, তখন তার মুখময় দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। এতদিন কোথায় ছিল জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলে না। শুধু রহস্যময় হাসে। অনেকবার জিগ্যেস করলে হয়ত তার মুখ দিয়ে বের হয়—এই একটু বাবার আশ্রমে ছিলুম। সকলে ধরেই নিয়েছে বরেন শেষমেশ সাধু হয়ে যাবে। বিষয়-আশয়ের প্রতিও তার সত্যিই কোনও টান নেই। যূথিকাদের বাড়িতে অনেক ঘর। বরেনের জন্যে একটা ঘর নির্দিষ্ট আছে। বরেন যখন থাকে না তখন সেই ঘর তালাবন্ধ থাকে।

সুরেন অবশ্য বরেনের ঠিক বিপরীত। সে বি.এ. পাশ। গ্রামেরই প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার।

খুবই সংসারী। তাদের অগাধ বিষয়-সম্পত্তি একা সুরেন সামলায়। বছর পঞ্চাশ বয়স সুরেনের। তার জীবনে একটু অন্যরকম ইতিহাস আছে। সুরেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়ের দু-বছরের মধ্যে সর্পাঘাতে মারা যায়। কোনও সন্তান ছিল না ওদের। স্ত্রী মারা যাবার পর বছর কুড়ি একা একাই কাটিয়েছে সুরেন। ধরেই নেওয়া হয়েছিল সে ওভাবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু সকলকে অবাক করে সুরেন মাত্র একবছর হল আবার দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছে। এতে পাড়া-পড়শীরা চর্চা করবার মতন একটা বিষয় পেয়েছে। কারণ সুরেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার থেকে অন্তত বছর কুড়ি ছোট। মোটামুটি সুশ্রী মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স কোনওক্রমেই তিরিশের বেশি হবে না। এই অসম বিবাহের ব্যাপারে সমস্ত যোগাযোগ নাকি সুরেন একাই করেছে। অর্থাৎ বিয়ের দিন সেই ছিল বরকর্তা এবং বর। ছোট ভাইয়ের বিয়েতে যূথিকা আসতে পারেননি। নীরদবরণের আসার প্রশ্নই নেই। তাঁর মতন সাহেবি মানুষ ঐ গ্রামে আসতেই পারেন না এটা সবাই ধরে নিয়েছে। শুধু একা ক্ষীরোদ এসেছিল ছোটমামার বিয়েতে নেমতন্ন খেতে।

এত অগাধ সম্পত্তির দেখাশোনা একা সুরেনকেই করতে হয়। পঞ্চাশ-ষাট বিঘে জমির ধান থেকে যা চাল হয় তা সুরেন নিজের সংসারের জন্যে প্রথমে হিসেব করে মজুত রাখে। তারপর বাকি চাল বিক্রি করে যে টাকা হয় তা মোট তিনভাগে ভাগ করে। এক ভাগ টাকা দাদার নামে জমিয়ে রাখে। আর বাকি টাকা দু-ভাগে ভাগ করে দুই দিদির শ্বশুরবাড়িতে পাঠায় দিদিদের উদ্দেশে। এ ব্যাপারে সুরেনের সততা সত্যিই অবিশ্বাস্য। এমনকী সে বছরে চারবার পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরায়। সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায় তা চার ভাগে ভাগ করে নিজে এক ভাগ রাখে। আর বাকি তিন ভাগ দাদা ও দিদিদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। তার এই সততার খবর নীরদবরণও রাখেন। মাঝে মাঝে মুখে তিনি বলেনও—সাচ অ্যান অনেস্ট পার্সন ইজ রেয়ারলি ফাউন্ড ইনডিড! বরেন তো সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ। টাকার প্রতি তার তেমন টান থাকার কথা নয়। কিন্তু তবুও সে ভায়ের কাছ থেকে হাত পেতে টাকাগুলো ঠিকই নেয়। তারপর টাকাগুলোর হাল যে কী হয় কেউ জানে না। সুরেন অবশ্য আন্দাজ করতে পারে যে, তার দাদা হাজার হাজার টাকা প্রতিবার সঙ্গে নিয়ে ঘরছাড়া হয়। হরিদ্বারে তার গুরুদেব সেই সাধুর হাতে টাকাগুলো সমর্পণ করে আসে সে। সাধুর আশ্রম চালাতে নাকি প্রতি মাসে অনেক টাকার প্রয়োজন।

যূথিকারা আসছেন সেই খবর আগেই পেয়েছিল সুরেন। সোনামুখী স্টেশনে সে নিজেই দুটো গরুর গাড়ি নিয়ে হাজির ছিল। হাওড়া থেকে বর্ধমানে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এসে নেমেছিলেন যূথিকারা। তারপর বর্ধমান থেকে ছোট লাইনের ছোট ট্রেনে এসেছিলেন সোনামুখী। এই ট্রেনকে মার্টিন কোম্পানির ট্রেন বলা হয়। সোনামুখী থেকে মাটির রাস্তায় গরুর গাড়িতে টিকির টিকির করতে করতে যখন জিয়ড়দা এসে পৌঁছন গেল তখন বিকেলের সূর্য পশ্চিম দিকের আকাশে প্রায় হেলে পড়েছে।

শুভ্রার একের পর এক অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ঝালদাতেও সে প্রথমবার গিয়েছিল। সেখানকার রুক্ষ পরিবেশ, সাহেবের গালা-কুঠি, পাহাড়, নদী আর খোলামেলা প্রকৃতি তার খুবই মনে ধরেছিল। আর জিয়ড়দা গ্রামে দিদুর বাপের বাড়িতেও তার খারাপ লাগছিল না। মেমারিতে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে তার সবথেকে খারাপ লেগেছিল মাঠে পায়খানা করতে যাওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু জিয়ড়দাতে সে ঝামেলা নেই। সুরেনের টাকার অভাব নেই। নিজেই মোটামুটি শিক্ষিত। সে বাড়িতে একটা খাটা পায়খানার ব্যবস্থা করেছে। হাওড়ার বাড়িতেও শুভ্রা ঐ খাটা-পায়খানাতেই অভ্যস্ত। যদিও সাহেবদের দেখাদেখি নীরদবরণ বাড়িতে একটি সেপটিক-ট্যাংক পায়খানার ব্যবস্থা করেছেন, সেটি তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না।

দিদিকে, ভাগ্নে ক্ষীরোদ আর শুভ্রাকে পেয়ে সুরেন সত্যিই খুব আহ্লাদিত। সে পুকুরে জাল ফেলে চার সের ওজনের কাতলা মাছ তুলিয়েছে। খুব তরিবতি করে রান্নাবান্না হচ্ছে বাড়িতে। যূথিকা বেশি খেতে পারেন না। কিন্তু ভাই আর ভাই-বউ-এর পাল্লায় পড়ে তাঁকেও এটা-ওটা খেতে হচ্ছে। ক্ষীরোদ পেটুক মানুষ। খেতে ভালবাসে। তার তো বেশ মজাই। গ্রামের টাটকা শাক-সবজি, ফলমূল আর পুকুরের সুস্বাদু মাছ খেতে পেরে শুভ্রার মেজাজও বেশ ফুরফুরে। তার সবথেকে পছন্দ হয়েছে সুরেনের বউকে। মেয়েটি দেখতে-শুনতে ভাল। রং ফর্সা। ব্যবহারও আন্তরিক। খুবই করিৎকর্মা। নিজে হাতে এত লোকের রান্না সামলায়। তার নাম রমা। এই মেয়েটিকে শুভ্রা বউদি বলতে পারলেই খুশি হত। কিন্তু রমা নাকি সম্পর্কে তার দিদিমা। কারণ সুরেন হল শুভ্রার মামা-দাদু। এরকম খটোমটো সম্পর্কের ব্যাপারে তার দিদু যূথিকাই তাকে ওয়াকিবহাল করেছেন। রমাকে দিদিমা বলতে শুভ্রার খুবই আপত্তি কিংবা অসুবিধে। তাই সে 'আপনি' 'আজ্ঞে' বলেই কাজ সারে। রমা খুব কথা বলে। সে সর্বক্ষণ শুভ্রার সঙ্গে বকবক করে। একদিন রাতে শুভ্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। নিজের নারীত্ব বিষয়ে শুভ্রা যেন প্রথম সচেতন হল।

এ বাড়িতে যদিও ঘরের অভাব নেই; এবং ঘরের সংখ্যার অনুপাতে লোকসংখ্যা বরাবরই কম; তবুও কে কেথায় শোবে তা যথারীতি সুরেনই ঠিক করে দিয়েছে। খোলামেলা উঠোন। তারপর লম্বা এবং চওড়া দাওয়া। টালির চাল। দাওয়া ধরে সারি সারি ঘর। মাটির ঘর কিন্তু চালা টালির নয়, টিনের। এই ধরনের টিনের চালাতে সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। দিনের বেলা রোদের প্রখর তাপে টিনের চাল গরম হয়ে থাকে। আবার সন্ধের পর অন্ধকার নামলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বিদ্যুতের বালাই নেই। পাখার সুবিধাও নেই। কিন্তু তাতে অসুবিধা হয় না অতিথিদের যারা শহুরে এবং আলো-পাখার সুবিধাভোগী। উঠোনের দক্ষিণদিকে ধানের বড় গোলার কাছাকাছি একটা বড় ঘর আছে, যার চাল খড়ের। এই ঘরটাকে সুরেন নাম দিয়েছে বসার ঘর। সত্যিই বসার ঘর হিসেবে এটি বেশ আরামদায়ক। পুরু খড়ের চাল থাকার জন্যে প্রখর গ্রীষ্মের দুপুরেও ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা। দুপুরের দিকে খাওয়াদাওয়ার পর সেই ঘরে যূথিকাকে ঘিরে বেশ মজলিশ বসে। সুরেন স্কুলে বেরিয়ে যায়। ক্ষীরোদ পুকুরের পাড়ে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে থাকে। নাহ সে তো চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নয়। তার হাতে ছিপ। সে পুকুরের শান্ত, গভীর জলে ছিপ ফেলে বসে থাকে সারা দুপুর। মাছ-শিকারী হিসেবে ক্ষীরোদ একেবারে আনাড়ি। অধিকাংশ দিনই দেখা যায় ধূর্ত মাছ চুপিচুপি এসে চার কেটে নিয়ে পালিয়েছে। ক্ষীরোদ বুঝতেই পারেনি। গতকাল অবশ্য ক্ষীরোদ কয়েকটা পুঁটি মাছ তুলতে পেরেছিল। সেই একরত্তি পুঁটি মাছগুলো ধরতে পেরেই ক্ষীরোদ এমন ভাব করছিল যেন প্রকৃতই রাঘব বোয়াল ধরে ফেলেছে। তিরতিরিয়ে কাঁপতে থাকা পুঁটি মাছগুলোকে দেখে রমা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসেছিল। ক্ষীরোদ তাকে বলেছিল—মামীমা, এই মাঝের ঝাল হবে তো? হেসে রমা বলেছিল—চারটে সরু সরু মাছ দিয়ে ঝাল আর কী হবে গো? ভেজে দেব অখন। সুবু আর তুমি খাবে।

দুপুরবেলা খড়ের ঘরের ঠাণ্ডায় যূথিকা শুয়ে থাকেন। তাঁর কাছে বসে থাকে রমা আর শুভ্রা। হাওড়ার বাড়িতে যূথিকা তো বেশি কথা বলার মানুষ পান না। তাছাড়া স্বামীর ব্যক্তিত্বের চাপে তিনি প্রায় সবসময়েই হাঁসফাঁস করেন। সেজন্যেই বোধহয় তাঁকে ম্রিয়মান লাগে। কিন্তু বাপের বাড়িতে এসে যূথিকা যেন তাঁর স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন। ভাই-বউ আর নাতনিকে তিনি যে কত গল্প শোনাতে লাগলেন! তাঁর শৈশবের গল্প, বালিকা বয়সের গল্প। একবার যূথিকার তখন

আট ন-বছর বয়স, তিনি পুকুরপাড়ের ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলার রাস্তা ধরে আসছেন। সময়টা ছিল সন্ধে। জঙ্গলের ওপারে তাঁর সইয়ের বাড়ি এক্কা-দোক্কা খেলতে যেতেন তিনি রোজ। সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরছিল বালিকা যূথিকা। হঠাৎ চমকে উঠেছিল সে। সরু মাটির রাস্তায় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা সাপ। বিষধর। বালিকাকে সামনে দেখেই সে ফোঁস করে ফণা তুলল। গ্রামের মেয়ে সাপ চেনে। সাপটা ছিল খাস গোখরো। মাত্র দুহাত দূরে বালিকা দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। বুঝতে পারছিল না কী করতে হবে। সাপটা লাফিয়ে এসে ছোবল দিতেও পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যেন দেবদূতের মতন আবির্ভাব হয়েছিল এক বড়সফ বেজির। গ্রামের লোকেরা যে জন্তুটিকে সচরাচর নেউল বলে থাকে। নেউল সাপেদের কাছে মৃত্যুরই সমান। ফণা গুটিয়ে সাপটি সরসরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পশ্চাদপসরণ করেছিল। সেই সুযোগে যূথিকার জায়গাটা পেরিয়ে আসতে অসুবিধে হয়নি। বেজি কিংবা নেউলটিকে সত্যিই দেবদূতসম মনে হয়েছিল তাঁর। এরকম কত গল্প যে যূথিকার ঝুলিতে আছে। শুভ্রা অবাক হয়ে শোনে। এতদিন দিদু তাকে এভাবে গল্প বলেনি। বাড়ির বাইরে পা ফেলে যূথিকা যেন অন্য এক যূথিকাতে পালটে গেছেন। একদিন নিজের বিয়ের গল্পও করলেন যূথিকা মজা করে। বিয়ে করতে এসে দুদিন থাকতে হয়েছিল এ-বাড়িতে নীরদবরণকে। সেই দুদিনই তিনি পায়খানায় যাননি। কারণ মাঠে পায়খানা যাওয়া তাঁর ধাতে সয়নি। আর যেহেতু তাঁর পেট পরিষ্কার হয়নি, তাই তেমন কিছু মুখে তোলেননি জামাই। শাশুড়ি যখনই থালা সাজিয়ে খাবার এনেছেন জামাইয়ের বিষণ্ণ উত্তর ছিল যে তাঁর নাকি পেট খারাপ। তাই কিছু খাবেন না। জামাইয়ের শরীর খারাপ শুনে শ্বশুর, যূথিকার বাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—তা হ্যাঁ বাবা তোমার যখন শরীর খারাপ তখন আমাদের গাঁয়ের কবিরাজ মশাইকে ডাকছি? তাঁর ওষুধ পেটে গেলেই—, শ্বশুর তাঁর কথা শেষ করতে পারেননি। তার আগেই নীরদবরণ উত্তর দিয়েছিলেন—আপনাদের কবিরাজের ওষুধ আমার রোগ সারাতে পারবে না।

—কেন বাবাজি? কেন?

—স্থান পরিবর্তন হয়েছে বলেই আমার এই ব্যামো। আপনার মেয়েকে নিয়ে একবার বাড়ি ফিরে যেতে পারলেই আমার রোগ বাপ বাপ করে পালাবে। যূথিকার বাবা ছিলেন সহজ-সরল মানুষ। তিনি নীরদবরণের কথার প্যাঁচ ধরতে পারেননি। আবার জামাইকে বেশি ঘাঁটাতেও সাহস করেননি। অবাক হয়ে কেটে পড়েছিলেন। যূথিকার মুখে দাদুর এই গল্প শুনে শুভ্রা তো হেসে কুটি কুটি। রমাও হাসছিল যদিও সে নীরদবরণকে চোখে দেখেনি এখনও। কবে দেখবে তা বলাও বেশ শক্ত।

সেদিন গল্প বলতে বলতে যূথিকা কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন রমা বলল—চলো আমাদের ঘরে খাটের ওপর শুয়ে দুজনে গল্প করি। শুভ্রা রাজি হয়ে গেল। রমা তার সম্পর্কে দিদিমা হয়। কিন্তু সেই কথা ভাবলেই শুভ্রার পেটের মধ্যে হাসির কুলকুলিয়ে ওঠে। রমাকে বড়জোর বউদি কিংবা মামিমা বলা যায়। সুরেন-দাদুর তুলনায় তার বয়স অনেক কম। ঠিক সময়ে বিয়ে করলে সুরেনের রমার বয়সী মেয়েও হতে পারত।

রমাদের ঘরে চকচকে পালিশ করা সেগুন কাঠের খাট। বেশ চওড়া। দুজন কেন তিনজন শোয়া যায়। খাটের ওপর সাদা চাদর। সেই চাদরে অনবদ্য ছুঁচের কাজ। অজস্র হরিণ বনভূমিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। রমা জানাল এটা নাকি তারই হাতের কাজ। ঘরের দেয়ালেও ফ্রেমে বাঁধানো অনেক সূচের কাজ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সবই রমার কৃতিত্ব। এরকম এক কাজ—সাদা জমিতে কালো সুতোয় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—পতি পরম গুরু। সেদিকে তাকিয়ে শুভ্রা মুখ ফিরিয়ে

নিল। চকিতে তারা মনে পড়ল মনীশের মুখ। এতদিন বাদে তার যেন এটাও মনে পড়ল সে তারও বিয়ে হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হল মনীশের মুখটা। কালো বটে লোকটা, যা শুভ্রার অত্যন্ত অপছন্দের। বরাবরই সে বাচ্চা কোলে নিতে ভালবাসে। বাচ্চা দেখলেই দু-হাত বাড়িয়ে দেয়। ফর্সা, সুন্দরী শুভ্রার বাহুডোরে বাচ্চারাও বোধহয় আসতে পছন্দ করে। কিন্তু বাচ্চার রং যদি কালো হয় তাহলে শুভ্রার বরাবরই কীরকম গা-বমি করে। কালো বাচ্চা যতই খলবলে হোক, শুভ্রা কোলে নিতে পারে না। সেই একই কারণে বোধহয় সে মনীশকেও মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু আজ এতদিন পর মনীশের মুখটা শুভ্রার চোখের সামনে নদীতে শুশুকের মতন ভুস্ করে ভেসে ওঠায় তার যেন মনে হল, লোকটার গায়ের রং কালো হতে পারে কিন্তু মুখশ্রী তো খারাপ নয়? বেশ পুরুষালি, কাটা-কাটা মুখ মনীশের। নাকের নীচে পুরু গোঁফ রাখতে পছন্দ করে সে। দুই চোখ বেশ বড়-বড়। মাথার ঘন কালো চুল উলটে আঁচড়ানো। তাতে কপাল বড় দেখায় এবং সে কারণেই যেন একধরনের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে মনীশের মুখভঙ্গিতে। নিজের অজান্তেই এই নির্জন দুপুরে শুভ্রার বুক থেকে গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠে এল। সে না হয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে মনীশ কি তার কোনও খোঁজ নেবে না? অভিমানে বুক জুড়ে দীর্ঘনিশ্বাস উঠে আসে। তারপরই মনে হয় মনীশেরই বা দোষ কী? সে তো তার সঙ্গে অসভ্যতা কম করেনি। সমানে তাকে অপমান করে গেছে। কটুকথা বলেছে। তাকে নিজের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি! এতদিন পর হঠাৎই কেন যে মনীশের কথা প্রায়ই মনে পড়ছে! মনে পড়ছে সতীশবাবুর স্নেহের কথা; সর্বদা বকবক করতে পারা অর্ধশিক্ষিতা এবং সরল বিন্দুর কথা। যত মনে পড়ে ততই কীরকম অপরাধবোধে ভুগতে থাকে শুভ্রা। মনে হয়, মনীশের সঙ্গে ব্যবহারটা সে ভাল করেনি। দাদুকে মনে ভীষণ দুঃখ দিয়েছে। দাদু তো তার ভালই চেয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার পাত্র দেখে তার বিয়ে দিয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ার! অতটুকু ছেলে আবার ইঞ্জিনিয়ার! তারা তো রাস্তাঘাট বানায়, ব্রিজ বানায়, বাড়িঘর বানায়। পারবে মনীশ ওসব বানাতে? ...আচ্ছা চাকরি পেলে মনীশ কি অনেক টাকা মাইনে পাবে? সে তো শুনেছে ইঞ্জিনিয়াররা অনেক টাকা মাইনে পায়। বিদেশেও কি যাবে মনীশ? তাকে নিয়ে যাবে? কোথায় যাবে? বিলেত? সেখানে যদি যাবার সুযোগ ঘটে তাহলে শেক্সপিয়ারের জন্মস্থানটা নিজের চোখে দেখে আসবে শুভ্রা। কোথায় বেশ জায়গাটা? দাদু বলেছিল। বেশ খটোমটো নাম। ...ও হ্যাঁ হ্যাঁ স্টাটফোর্ড-ভন-অ্যাভন। শেক্সপিয়রের নাটকগুলো এখনও পড়া হয়নি শুভ্রার। তবে এমন একটা বই সে পড়েছে যেটা পড়লে নাটকগুলোর বিষয়ে জানা যায়। দাদু তাকে পড়িয়েছে বইটা। একজন সাহেবের লেখা—চার্লস ল্যাম। বইয়ের নাম—টেলস ফ্রম শেক্সপিয়ার।

রমা শুভ্রাকে ডাকে—আয় রে সুবু আমরা এই বিছানায় একটু গড়াই। গল্প করি। আমাদের নিজেদের কত কথা আচে। সব কি ওঁর সামনে বলা যায়? —রমার ইঙ্গিত যূথিকার দিকে।

--নিজেদের গল্প মানে? —শুভ্রার প্রশ্ন শুনে রমা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিজেদের গল্প। কেন মেয়েদের নিজেদের কথা থাকতে নেই বুঝি? তোর বরের গল্প বলো শুনি?

শুভ্রা চমকে ওঠে। বরের গল্প? তার মানে রমা সব জানে? কতটা জানে?

—হ্যাঁরে তুই নাকি বরকে পছন্দ করিস না? বরের সঙ্গে ঝগড়া করিস?

—তোমাকে কে ওসব বলল দিদু?

—এসব কথা চাপা থাকে রে ছুঁড়ি? সবাই সব জানে। শোন আমি সম্পর্কে তোব দিদু হতে পারি কিন্তু বয়স আমার এমন কিছু নয়। আমার বর আমার থেকে অনেক বড়। তুই লোকের

সামনে আমাকে দিদু বলিস তাই বলবি। কিন্তু আড়ালে আমাকে রমাদি ডাকবি বুঝিচিস? রমাদি ডাকলে আমার ভাল লাগবে।

শুভ্রা চুপ করে থাকে। রমাকে তার ভাল লাগে। খুব উচ্ছল স্বভাবের। সবসময় কথা বলে। চুপ থাকতে পারে না। চেহারাটাও কী তীক্ষ্ণ! এখন আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে রমা। তার বুকের আঁচল সরে গেছে। শুভ্রা আড়চোখে তাকিয়ে দ্যাখে। কী বড়বড় মাই রমাদির! দুটো জামবাটির সাইজ। আঁচলের নীচে দেশগাঁয়ের মেয়েবউদের জামা পরার চল নেই। বাইরে বের হলে অবশ্য শাড়ির নীচে শেমিজ পরার চল আছে। আঁচল বেসামাল রমাদির, নাকি রমাদিদুর! শোয়া অবস্থাতেও মাই দুটো যেন মুখিয়ে আছে! শুভ্রার গা শিরশির করে ওঠে। রমা শুভ্রার চোখের দিকে তাকায়। তারপর খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—কী দেকচিস র‍্যা? মেয়েদের কাচে মেয়েদের আবার লজ্জা কী? এই দ্যাখ না ভাল করে! তোর মামাদাদুর খুব সখের এই দুটো! রমা সাঁৎ করে বুকের আঁচল সরিয়ে দেয়। তার প্রস্ফুটিত, উন্মুখ, অপূর্ব-সুন্দর স্তনদুটো প্রকাশ্য হয়। বৃন্তদুটো বড় বোঁদের সাইজের, টসটসে কালো।

—তোর মাইদুটোও তো বেশ বানিয়েচিস! হ্যাঁরা একটা কথা শুধোব!

—কী? —শুভ্রার বুক অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

—স্বামীর সঙ্গে তোর সব হয়েচে?

—কী আবার হবে?

—আহা ন্যাকা মাগি আমার! ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না? অ্যাই কিচ্ছুটি লুকোবি না! বল আমাকে ফুলশয্যের রাতে কবার হয়েচে?

—ধ্যাৎ! ওসব অসভ্য কথা আমার ভাল লাগে না...

—শুনেচি তোর স্বামী নাকি ইঞ্জিন চালায়?

—ইঞ্জিন চালায়? —এবার রমার কথা শুনে শুভ্রাই হেসে লুটোপাটি খায়। —ইঞ্জিন চালায়? তাই ইঞ্জিনিয়ার? ভাল বলেছ তো?

—আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। আমি কি অতশত জানি? সে যাই হোক, তা জামাইবাবাজি তোর সঙ্গে ইঞ্জিনটা কেমন চালাল?

—ধ্যাৎ আমাদের ওসব হয়নি।

—হয়নি? কেন রে?

—তাকে আমার পছন্দ হয়নি। ভীষণ কালো ও। কালো মানুষদের আমি পছন্দ করি না।

—এরকমই শুনেছিলুম লো। আর শুনে আশ্চয্যি হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আমরা তোর মাথার কোনও দোষ আচে। এখন সামনাসামনি তোকে দেখে মনে হচ্চে তুই মেয়েটা খুব ভাল। যেমন সুন্দরী তেমন বুদ্ধি! আসলে তোকে কেউ বোঝায়নি সুবু? স্বামী কালো হোক আর ধলো হোক কিচ্ছু যায় আসে না। কীসে যায় আসে জানিস? শুভ্রা রমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রমা উঠে বসেছে। ঠিক করে নিয়েছে বুকের আঁচল।

—স্বামী যদি তোকে খেতে পরতে দিতে পারে। তোকে না ঠাকায়, না মারধর করে আর রাতে আনন্দ দিতে পারে তাহলে সেই স্বামী জানবি তোর অনেক জীবনের কর্মফল। বুঝেচিস লো? এভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট করিসনি। স্বামীর সঙ্গে ঘর কর। বিয়ে হয়েচে অথচ স্বামীর ঘর করে না এমন মেয়ে সারাজীবন সংসারের বোঝা হয়ে থাকে রে!

—সে তো আমার কোনও খোঁজ নেয় না...

—তুই চাইলেই খোঁজ নেবে। তোর মতন ডবকা বউকে ছেড়ে থাকতে তার মনটাও হয়তো

আন্‌চান্‌ করচে। তুই ডাকলেই দেখবি সে চলে আসবে। তুই যাকে মামাদাদু বলিস্‌ ঐ বুড়ো মিনসে আমাকে ছেড়ে একরাত থাকতে পারে বুঝি? বুড়োর নোলা দিয়ে সপ্‌সপিয়ে জল পড়চে! আমাকে ভোগ করবে বলে তার কত না ছল! দেখবি? সেসব দেখাব?

—কী দেখাবে? —শুভ্রার মনে হয় এসব কথা এভাবে শোনা ঠিক হচ্ছে না। আবার শুনতেও ভাল লাগছে! রমার কথায় কীরকম যেন এক স্বাদ! তার ভেতরটা যেন ভিজে-ভিজে উঠছে!

ইতিমধ্যে রমা এক কাণ্ড করে। ঝপ্‌ করে উবু হয়ে মসে পড়ে সে। তারপর খাটের তলা থেকে হড়হড়িয়ে টেনে আনে এক তোরঙ্গ। ডালা খোলে তোরঙ্গের। পাতলা ধরনের দুটো বই বের করে।

—এই নে লো! এই বইদুটো ছবিগুলো দ্যাখ! রোজ রাতে শুতে যাবার আগে তোর মামাদাদুর এই ছবিগুলো দ্যাখা চাই। আমারও কি ছাড় আচে? আমাকেও দেখতে হবে।

শুভ্রাকে কিছু করতে হয় না। রমা নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বইয়ের পাতা ওলটাতে থাকে। ধূসর পাতা ছাপা বই। ধ্যাবড়া ছবি। বটতলার বই। ছবিগুলো ঈষৎ অস্পষ্ট বটে। কিন্তু কীসের ছবি তা বেশ বোঝা যায়। ...এ ম্যাগো! এসব ছবি শুভ্রা কোনওদিন দ্যাখেনি। কোনওদিন দেখবে তা কল্পনাও করেনি। কিন্তু বুঝতে তার বাকি থাকে না। গা ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু ছবিগুলো থেকে চোখ সরিয়ে নিতেও মন চায় না। প্রবৃত্তির কালো সাপ, যা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, ফণা তুলে যেন উঠে দাঁড়ায় শুভ্রার মনের গহন অন্ধকারে!

—একটা বই তুই নিয়ে যা ছুঁড়ি! ভালভাবে দ্যাখ। কাজে লাগবে।

—ধ্যাৎ ওসব অসভ্য বই কেউ সঙ্গে রাখে? দিদুর চোখে যদি পড়ে যায়?

—দিদুর চোখে যদি পড়ে যায়? ...ভেংচে পুনরাবৃত্তি করে রমা। ...চোখে পড়লে আর কী হবে? বুঝবে তুমি স্বামীর জন্যে নিজেকে তৈরি করচ! কেন? চোখে পড়বে কেন? লুকিয়ে কাজ তুই কোনওদিন করিসনি বুঝি? যা ভাই এবার কেটে পড় দিকি। আমি একটু ঘুমোব এবার।

—তাড়িয়ে দিচ্ছ বুঝি? —অভিমানে শুভ্রা ঠোঁট ওল্টায়।

—হুঁ তাড়িয়ে দিচ্চি কী? তোমার স্বামীর বিছানা যাতে রসে ভিজে যায় তার ব্যবস্থা করচি। আচ্ছা বোকা মেয়ে বটে! বোকা তো বটেই। তা না হলে নতুন বিয়ের স্বাদ না নিয়ে, স্বামীকে ছেড়ে কেউ মামার বাড়ি আর বাপের বাড়ি বসে থাকে? ...ওলো আমি তোকে সুযোগ দিতে চাচ্ছি। এখন বাড়িতে কেউ নেই। ঐ বুড়ি নাক ডাকাচ্চে। এই তো সুযোগ। যা! পাশের ঘরে চুপচাপ বসে বইয়ের পাতা উলটে ছবিগুলো দ্যাখ। পরে কাজ দেবে।

শুভ্রার কাঁধে যেন আজ অদৃশ্য শয়তান ভর করেছে! যে ঘরটিতে সে আর দিদু থাকে সেই ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর পটলচেরা চোখ মেলে বটতলার স্যাঁতসেঁতে, ধূসর, বিবর্ণ বইটার পাতা উলটে একের পর এক ছবি দেখে যেতে থাকে। ঘরময় সোঁদা গন্ধ ভাসে। সেকি ঐ বটতলার বইয়ের গন্ধ? নাকি শুভ্রার শরীর থেকে উঠে আসছে? কী ভয়ংকর কুৎসিত সব ছবি! মেয়ে-পুরুষে এরকম হয় বুঝি? স্বামী-স্ত্রীতে এরকম হয় বুঝি? ইস! কী অসহ্য অসভ্যতা! শুভ্রার নাকের পাটা ফুলে ওঠে। থরথর করে কাঁপে সে! চোখের সামনে কুয়াশা ভাসে। তারপর একসময় বইটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে—মনীশ! ওগো মনীশ! তুমি আমার খোঁজ নাও না কেন...?

চুয়াত্তর

একদিন সুরেন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে একটা দুঃসংবাদ দিল। পাশের গাঁয়ে নাকি ভীষণ ম্যালেরিয়া হচ্ছে। প্রতিদিন স্কুল থেকে সে সোজা বাড়ি আসে তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে অনেককে একসঙ্গে পাওয়া যায়। শুধু যে গ্রামের বয়স্ক মানুষদের ভিড় হয় সেখানে তা নয়। ছেলে-ছোকরারাও থাকে। চণ্ডীমণ্ডপ এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। যুদ্ধের খবর, আশপাশের গাঁয়ের খবর নিজেদের গাঁয়ের বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় গেলে তাস পেটাও যায়। মোটমাট কয়েক ঘণ্টা সময় বেশ ভালই কাটে। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যমনি হল নরেনদা। প্রায় সত্তর বছর বয়স হয়েছে লোকটার। কিন্তু দেখলে অত বয়স মনে হয় না। চেহারা সিড়িঙ্গে রোগা। হাইটও বেশ। সারা মাথা জুড়ে চকচক করছে টাক। হাতে হুঁকো। অনর্গল কথা বলতে পারে। গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ এবং চাষী। জমিজমা যা আছে তা কয়েক পুরুষ বসে খাওয়া যাবে। বিকেল চারটে থেকেই নরেনদাকে ঘিরে আড্ডা শুরু হয়ে যায়। সুরেন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে এই আড্ডায় সবাই তাকে বেশ সমীহ করে। ভদ্র, মৃদুভাষী সুরেনকে নরেনদাও বেশ পছন্দ করেন। সুরেনের মতামতের মূল্য দেন। যদিও বেশি বয়সে সুরেনের বিয়ে করা নিয়ে তার আড়ালে রসালো আড্ডাও চলে। সুরেন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় এসে দেখল, নরেনদাকে ঘিরে আড্ডা জোর জমে উঠেছে। বিষয় যুদ্ধ। সুরেনের দিকে তাকিয়ে নরেনদা বললেন—এই তো সুরেন বাবাজি এসে গেচে। ও তো খবর-টবর রাখে অনেক। ওকেই জিগ্যেস করো না?

একজন বলল—আপনি বলচেন নরেনদা তাই আমরা মুখ বুজে মেনে নেব। আবার সুরেনদাকে সাক্ষী মানা কেন?

সুরেন জিগ্যেস করল—কী ব্যাপার নরেনদা?

—ওদিকে জার্মানির হিটলারের অবস্থা তো খারাপ। তাই না? প্রথমে খুব ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করছিল। এখন দমে গেচে। কী বল সুরেন?

—মোটামুটি ঠিকই বলেচেন নরেনদা। ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর রাশিয়া এক হয়েচে। যাকে ওরা বলচে মিত্রশক্তি। অত বড় বড় তিনটে দেশ এক হওয়ায় হিটলার সত্যিই নাকি দমে গেচে। প্রথম তো খুব এগিয়ে যাচ্ছিল হিটলার, পোল্যান্ড দখল করল, চেকোস্লোভিয়াকে শেষ করে দিল, তারপর ফ্রান্সে গিয়ে ঘাঁটি গড়ল।

—ফ্রান্সের ক্যাপিটাল কী বেশ সুরেন?

—প্যারিস।

—কয়েক বছর আগে প্যারিসে জার্মানি যা বোমা ফেলেছিল ওখানকার সব নাকি ধ্বংস হয়ে গেচে...।

—হ্যাঁ। কিন্তু ফ্রান্সের রেজিসট্যান্স বাহিনীর হাতে হিটলারের সৈন্যরা কম মার খায়নি! এখন তো চার্চিল আর রুজভেল্ট ওদের সাপোর্ট দিচ্চে।

একজন বলল—চার্চিল শালা হারামি! সাহেবের বাচ্চা! ব্রিটিশের কর্তা! ওদের আমরা কেন তোল্লাই দেব? আমাদের দেশকে ওরাই তো পরাধীন করে রেখেচে! বরং হিটলার জিতলে আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। হিটলারকে ব্রিটিশরাও ভয় পায়।

—ওকি ঠিক বলতেচে? সুরেন কী বলো?—নরেনদা শুধোন।

সুরেন কিছুক্ষণ কপাল কুঁচকে ভাবল। এই গ্রামে প্রতিদিন খবরের কাগজ আসে না। তবে

তিনদিন অন্তর খবরের কাগজ পাওয়া যায়। বর্ধমান স্টেশন থেকে সপ্তাহে দুবার ছোট মার্টিন ট্রেনে কয়েকটা কাগজ আসে। খবরের কাগজ বলতে যুগান্তর। ইংরেজি কাগজ এখানে কেউ নেয় না। সুরেনও ইংরেজি পড়ে ঠিক বুঝতে পারে না। শুধু যুগান্তর কাগজ কেন, সুরেন নানা বাংলা পত্র-পত্রিকাও পড়ে। সেসব পড়ে সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সুরেন বলল—এই কথাটা ঠিক নয়। হিটলার আমাদের বন্ধু হতে পারে না। সে মানবজাতির শত্রু।

—কেন? কেন?—অনেক একসঙ্গে বলে ওঠে।

—কত নিরপরাধ অসহায় মানুষকে হিটলার প্রতিদিন মেরে ফেলচে আপনারা জানেন?

—তুমি কি ইহুদিদের মেরে ফেলার কথা বলচ? সেটা আমিও শুনিচি।—নারানদা বলেন, —একী অদ্ভুত লোক মাইরি! ইহুদিদের দেখলেই নাকি হিটলার গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়! এভাবে নাকি হাজার হাজার ইহুদিকে সে মেরে ফেলেচে!

—গ্যাস চেম্বারটা কী নরেনদা?—একজন জানতে চাইল। নরেনদা ঠিক জানেন না। তিনি সুরেনের মুখের দিকে তাকালেন।

সুরেন বলল—খবরের কাগজ আর পত্র-পত্রিকায় পড়ে আমি যা জেনেচি তা হল এরকম। যাদের বন্দি করা হয়েচে তাদের কাপড় জামা খুলে ন্যাংটো করে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘরের জানলা দরজা সব বন্ধ থাকে। তারপর একটা পাইপের সাহায্যে বিষাক্ত গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ঘরে। মানুষগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে করতে মারা যায়।

—উফ কী সাংঘাতিক!—নরেনদা বলেন।

—যে মানুষ এভাবে অন্য মানুষদের মারতে পারে তাকে কখনও বিশ্বাস করা যায় না। জার্মানিরা এদেশে এলে তারা ব্রিটিশদের থেকেও খারাপ হবে।

—আচ্ছা আমাদের সেই সুভাষ বোস কোথায় গেল? একজন জানতে চাইল।

—শুনচি নাকি কোহিমা আর মণিপুর হয়ে সুভাষ বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে দিল্লির দিকে আসচেন।—সুরেন জানাল।

—ঐ এক লোক বটে। কী সাহসী! শুনেচি সুভাষ বোস নাকি জার্মানিতে গিয়ে হিটলারের সঙ্গে দেখা করেচে? নরেনদা জিগ্যেস করলেন।

সুরেন বলল—সে কথা আমিও খবরের কাগজে পড়িচি। তার বেশি কিছু জানি না।

আড্ডা এভাবে বেশ জমে উঠেছিল। ঠিক সেইসময়ে মোহিত এল। সে এই গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার। সুরেনের সমবয়সী। জিয়ড়দা গ্রামে কোনও ভাল ডাক্তার নেই। অসুখ-বিসুখ হ'লে মোহিতের গুঁড়ো ওষুধই ভরসা। বেশ দ্রুত বোধহয় অনেকটা হেঁটে এসেছে মোহিত। তার হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। খালি পা। ধুলোয় ধূসরিত। পরনে ধুতি আর ফতুয়া। ঘামে ফতুয়াটা ভিজে জবজব করছে। একটু যেন হাঁফাচ্ছে মোহিত। তাকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হল।

নীরদদা শুধোলেন—কী হ'ল মোহিত? ওরকম হাঁফাচ্ছ কেন? কোথ থেকে আসা হচ্চে? মোহিত বলল—গোবিন্দপুর থেকে আসচি কাকা...। সেখানে দুজন মারা গেচে।

—দুজন মারা গেচে? কেন হে?

—ম্যালেরিয়ায়। আমাদের গ্রামের সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। এই রোগ খুব খারাপ। এখানেও ছড়াতে পারে।

গোবিন্দপুর হল জিয়ড়দার ঠিক পাশের গ্রাম। নীরানদা বললেন—তুমি কি গোবিন্দপুরে রুগী দেখতে গিইছিলে?

—হ্যাঁ কাকা। প্রথমে দুজন রুগীর বাড়ি থেকে কল পেয়েছিলুম তিনদিন আগে। ওষুধ দিয়েছিলুম। কিন্তু জ্বর কমছিল না। তার সঙ্গে পাতলা পায়খানা আর পিত্তি-বমি। আজ খবর পেলুম সেই দুজন রুগী মারা গেচে। আর ঐ গাঁয়ের ঘরে ঘরে জ্বর। সবাই বলচে ম্যালেরিয়া। আমারও সন্দেহ এটা ম্যালেরিয়াই।

সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরে সুরেন যখন খবরটা দিল তখন সব থেকে বেশি আতঙ্কিত হলেন যূথিকা। ম্যালেরিয়া যখন মহামারীর আকার নেয় তখন যে তা কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা তিনি জানেন। এই গ্রামে, বাপের বাড়িতে থাকতেই যূথিকা দেখেছিলেন এখানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। তখন তিনি এগারো বছরের বালিকা। আর সুরেনের বয়স তখন দু বছর। তার সেসব কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। সে কী সাংঘাতিক জ্বর! যখন জ্বর আসবে তখন কাঁপুনিতে শরীর বেঁকে যাবে। লেপ, কম্বল চাপিয়েও সেই মারাত্মক কাঁপুনি থামবে না। জ্বর উঠে যাবে চড়চড় করে। ভুল বকতে শুরু করবে রুগী। তারপর মাথায় বালতি বালতি জল ঢেলে জ্বর হয়ত নামবে কিন্তু তা সাময়িক। তারপর আবার জ্বর আসবে। এভাবে জ্বরে কাহিল হয়েই হয়ত রুগীর মৃত্যু হবে। যূথিকার মনে আছে সেবারও ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে ছাড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই সংক্রান্ত বেদনাদায়ক স্মৃতি হল যূথিকার কাকা সেবার মারা গিয়ে ম্যালেরিয়ায়। গ্রামের আরও অনেকে মারা গিয়েছিল। তারপর ঘরে ঘরে সরকারের পক্ষ থেকে বিলি করা হয়েছিল কুইনাইন। খুব তেতো ওষুধ। খেলে গা বমি করে উঠবে এমন তেতো।

যূথিকার নির্দেশে বাড়িতে জল ফুটিয়ে খাওয়া শুরু হল। সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে যা আলোচনা হয়েছিল তাই সত্যি হিসেবে প্রমাণিত হল। শুধু পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে নয়, সুরেনদের গ্রামেও ছাড়িয়ে পড়ল ম্যালেরিয়া। সবাই ভয়ে ভয়ে থাকে। কখন বাঘের মতন লাফিয়ে পড়বে ম্যালেরিয়া। সবাই ভয় পেয়ে গেল যখন পরপর কয়েকটা মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশ। বিশেষত শুভ্রাকে নিয়ে যূথিকার বড় ভয়। এখানে সবাই পুকুরে কাপড় কাচে, স্নান করে। কিন্তু শুভ্রার পুকুরে যাওয়া মানা হয়ে গেল। পুকুরের জল বালতি করে তুলে এনে ফুটিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই জলে চান সারে শুভ্রা। ক্রমশ খারাপ খবর একের পর এক আসতে থাকে। গ্রামে ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও তিন। সরকারি অফিস থেকে যথারীতি কুইনাইনের বড়ি বিলি করা হচ্ছে। আর ট্যাঁড়া পিটিয়ে মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হচ্ছে যে রাতে শোবার সময় মশারি খাটিয়ে শুতে হবে আর পানীয় জল ফুটিয়ে খেতে হবে। হাওড়ার বাড়িতে থেকে, সাহেব স্বামীর পাল্লায় পড়ে যূথিকার মশারিতে ঘুমোনোর অভ্যাস হয়ে গেছে। তিনি জানেন বাপের বাড়িতে মশারির চল নাও থাকতে পারে। তাই সঙ্গে করে মশারি নিয়ে এসেছেন। রাতে মশারি খাটিয়ে যে বিছানা করা হয় তাতে দিদিমা আর নাতনি পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোয়।

তবুও কোন্ ছিদ্রপথে ম্যালেরিয়া নামক শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটল এ-বাড়িতে! একদিন সকালে ঘুম ভাঙাব পর যূথিকার মনে হল, তাঁর শরীরটা কীরকম ম্যাজম্যাজ করছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্ষীরোদের মুখ শুকিয়ে গেল যখন বেলা বারোটার সময় যূথিকার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল। বাইরে পরিষ্কার, নীল আকাশ। ঠা ঠা রোদ্দুর। একটু হাঁটাচলা করলেই মানুষকে ঘেমে একসা হয়ে যেতে হচ্ছে। সেরকম তপ্ত আবহাওয়ায় যূথিকাকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হবে। কারণ বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন মুখে যূথিকাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে আর দুটো কম্বল এবং একটা লেপ চাপিয়েও যূথিকা ঠকঠকিয়ে কাঁপছেন। ক্ষীরোদ রীতিমতন ঘাবড়ে গেল। সুরেনকে সে জিগ্যেস করল—মামা কী করা যায়? এখনই ডাক্তার কিংবা কবিরাজকে দিয়ে মাকে একবার দেখিয়ে নেওয়া দরকার। সুরেন দু-হাতের তালুতে মাথা গুঁজে বসেছিল। সে বলল—গ্রামে তো

তেমন ভাল ডাক্তার নেই। ঐ আমার বন্ধু মোহিত আচে। সে পাস করা নয়। কলকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্যে ভর্তি হয়েছিল। বছর দুই পড়ার পর তার বাবা হঠাৎ মারা যায়। খুব গরিব ছিল ওদের পরিবার। সামান্য জমিজমা ছিল। ওর বাবা চাষ করত। বাড়িতে আর কোনও পুরুষ ছিল না। মোহিত, মোহিতের দুই বোন, বাবা-মা। বাবা মারা যাবার পর মোহিতের পক্ষে ডাক্তারি পড়া সম্ভব হল না। পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গ্রামে ফিরে এল। যাতে নিজেদের যৎসামান্য জমিতে চাষ-আবাদটা করতে পারে। ক্রমে কয়েক বছর গেলে, সংসারের অবস্থা একটু সামাল দিয়ে মোহিত একটু-আধটু চিকিৎসার কাজ শুরু করল। এই অজ গাঁয়ে কোনওদিনই কোনও ডাক্তার নেই। হসপিটাল নেই। হাতুড়ে মোহিতই এখানে বড় ডাক্তার। এখন দিদির এই অবস্থাতে তাকেই ডেকে নিয়ে আসতে হবে।

—সোনামুখীতে কোনও হাসপাতাল নেই মামা?

—নাহ ভাগনে। খুব দুরবস্থা আমাদের। হাসপাতালের সুবিধা পেতে হলে সকলকেই সেই বর্ধমানে যেতে হবে।

—তাহ'লে ঐ মোহিত ডাক্তারকেই ডাকা হোক। মায়ের জ্বরটা একেবারেই কমচে না...।

সুরেনও তেমন কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। একদিনের জ্বরেই যূথিকাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। কিন্তু মোহিতকে ধরতে পারলে তবেতো? তার এখন ভয়ানক ডিমান্ড। বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে তাকে পেল না সুরেন। সে গোবিন্দপুরে ছুটেছে। সেখানে নাকি প্রায় সব ঘরেই ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রথম দিন রাতেও চিকিৎসা হ'ল না যূথিকার। রমা আর শুভ্রা তাঁর শিয়রে বসে পালা করে জল পটি দিয়ে চলেছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যূথিকার। তিনি চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলে খোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। শীর্ন কণ্ঠে বলছেন—জ...ল...। সঙ্গে সঙ্গে হয় শুভ্রা নয় রমা যূথিকার মুখে জল দিচ্ছে। সারাদিনে তিনবার জ্বর এসেছে আর গেছে। এ তো ম্যালেরিয়া বলেই মনে হচ্ছে! এখনই কুইনিন শুরু করে দেওয়া উচিত। কিন্তু একমাত্র মোহিত ডাক্তারই তা দিতে পারে। ম্যালেরিয়ার ওষুধ তো আর মাঠে-ঘাটে বিক্রি হয় না।

পরের দিন দুপুর নাগাদ মোহিত ডাক্তার এল। তারও চেহারা দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। দুই গ্রামের যত ম্যালেরিয়া রুগী সব তার চিকিৎসার অধীন। রুগীর পর রুগী দেখতে দেখতে সে ক্লান্ত। গ্রাম থেকে কয়েকজন গেছে বর্ধমান সদর হাসপাতালে। ডাক্তার পাঠানোর জন্যে আর্জি জানাতে। হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ যদি তাদের কথায় তেমন কান না দেয় তাহ'লে খোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে তারা অনুবোধ জানাবে। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সত্যিই তা ক্রমে মহামারীর রূপ নিচ্ছে। মোহিত-ডাক্তার অবশ্য যূথিকাকে বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখল। তারপর বন্ধু সুরেনকে জানাল, তেমন ভয়ের কিছু নেই। যূথিকার নাড়ির অবস্থা ভাল। উদর, হার্ট সবকিছুই ঠিকঠাক চলছে। কুইনিনের বড়ি পেটে পড়লেই জ্বর বাপ বাপ বলে পালাবে।

চব্বিশ ঘণ্টা পর অর্থাৎ পরদিন দুপুর বারোটা নাগাদ যূথিকার জ্বর একেবারেই ছেড়ে গেল। তাঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে এল স্বাভাবিক। তিনদিন পর তিনি বিছানাতে উঠে বসলেন। যদিও নাতনি এবং রমার সাহায্য ছাড়া তিনি বেশিক্ষণ বসে থাকতে পর্যন্ত পারলেন না। একগাদা বালিশ উঁচু করে যূথিকাকে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে তুলে বসিয়ে দিল রমা। শুভ্রা তাঁকে ধরে রইল। যূথিকার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। তিনি ফিসফিস করে বললেন—খিদে পাচ্চে। যূথিকা উঠে বসেছেন শুনে সুরেন ছুটে এল। তার কাঁধে গামছা, ধুতি হাঁটুর ওপর গোটানো, শরীরে তেল জবজব করছে। সে ঘাটে যাচ্ছিল নাইতে। বিছানার সামনে উবু হয়ে বসে সুরেন শুধোল—ও দিদি এখন কেমন

বোধ করতেছ?

—ভাল।—চিঁ চিঁ করে উত্তর দিলেন যূথিকা।—বড় খিদে লেগেচে রে সুরেন।—আবার জানালেন।

—খিদে লেগেচে?...সে তো ভাল লক্ষণ? ওগো শুনচ—রমাকে ডাকল সুরেন। রমা রান্নাঘরে ছিল। ছুটে এল। তার মাথায় ঘোমটা। স্বামীর সামনে সে মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়।

—কিছু বলতেচ?

—বাড়িতে পলতা শাক আচে?

—না তো...

—আমি ছুটে যাচ্চি বাজারে। একটু পলতা শাক নিয়ে আসি। তুমি ঝটপট কড়াইয়ের ডাল বেটে ফেল। পলতার বড়া করে দাও দিদিকে। এতদিন জ্বরে ভোগার পর তেতো পলতার বড়া ভাল লাগবে খেতে। ছেড়ে যাবে অরুচির মুখ।...সুবু, তুই দিদুর কাচে বসে থাক মা। আমি এক ছুটে বাজার থেকে আসচি...।

—চ্যানটা করে যাও। ওরকম তেল গায়ে বাজার যাবে? রমা বলল।

—রাখো তো তোমার চ্যান! এতদিন পরে দিদির জ্বর ছেড়েচে, ঠেলে উঠে বসেচে! এখন একটু দেখভাল করতে হবে না?

রমা আর সুবু সত্যিই যূথিকার পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মোহিত ডাক্তার বলেছিল জ্বর ছাড়লে গা স্পঞ্জ করে দিতে উসুল-উসুল গরম জলে। মাথাটা ঠাণ্ডা জলে অল্প ধুয়ে মুছিয়ে দিতে। তাই করা হল। তারপর খাওয়ার পালা। সোনা মুগের ডাল আর গরম-গরম পলতার বড়া দিয়ে চাট্টি ভাত খেলেন যূথিকা। টাটকা মাছের ঝোলও ছিল। রমা একটু জোরও করছিল। ক্ষীরোদ তাকে বোঝাল। সবে জ্বরটা ছেড়েছে। একটু উঠে বসেছে। এসময় পরিবেশের সঙ্গে একটু সইয়ে নিতে দিতে হবে যূথিকাকে। বেশি খাওয়াদাওয়া করলে যদি হজম না হয়, পেট আলগা হয়ে যায় সে হবে আর এক বিপত্তি। যূথিকা কিঞ্চিৎ ঘোলা চোখে তাকালেন ক্ষীরোদের দিকে—হ্যাঁরে ও ক্ষীরু?

—বল মা?

—হাওড়ার খবর কী? তোর বাবার শরীর ভাল আছে? অসিত বারিদ—ওদেরই বা খবর কী? হাবুর মা রান্নাবান্না করচে তো?

—সবাই ভাল আচে মা।—ক্ষীরোদ জানাল।

—তুই কি ফোন করেছিলি?

—হ্যাঁ। সত্যিই ফোন করেছিল বাড়িতে ক্ষীরোদ। এখান থেকে ফোন করার অনেক ঝক্কি। এই গ্রামে কেন ত্রিসীমানায় কোনও ফোন নেই। সেই সোনামুখীতে সাব-পোস্ট-অফিস। সেখান থেকে ফোন করা যায় বটে। এই গ্রাম থেকে সোনামুখী যাওয়াও ঝকমারি। হয় গরুর গাড়িতে টিকি টিকি করে যেতে হবে। আর নয়তো পায়দল। আর একটা উপায়ও আছে। সাইকেল। ক্ষীরোদ অবশ্য সাইকেল চড়তে জানে না। সুরেন সাইকেলের সামনের রডে ভাগনেকে চাপিয়ে বারো মাইল রাস্তা ঠেলে সোনামুখীতে নিয়ে গেল। সেখানকার সাব-পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার তার জানাশোনা। বস্তুত সুরেনের অনুরোধেই তিনি ক্ষীরোদকে ফোন করার অনুমতি দিলেন। অনেকবারের চেষ্টায় হাওড়ার বাড়িতে লাইনটা পাওয়া গেল। দিনটা শনিবার। দুপুরবেলা। নীরদবরণ অফিসে। অসিত স্কুলে। বারিদবরণ ফোনটা ধরল। কী কারণে বোধহয় সে কলেজে যায়নি। বারিদকে পেয়ে ভালই হল। ক্ষীরোদ সব খবর জেনে নিতে পারল। এমনিতে সবাই

ভাল আছে। তবে নীরদবরণ মাঝখানে পরপর দুদিন রাতে বাড়ি ছিলেন না। কলকাতায় শেলীর কাছে ছিলেন। এই খবর শুনে খেপে গেল ক্ষীরোদ। ফোনে গালাগাল দিয়ে বলল—সেই খারাপ মাগীটাই বাবাকে খাবে! যূথিকার জ্বর শুনে বারিদ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ প্রকাশ করল। ফোনে কথা বলতে বলতে আরও খবর পাওয়া গেল। দাদাবাবু অর্থাৎ বিশ্বদেব একরকম ঠিক করে ফেলেছে যে ঝালদার চাকরি ছেড়ে চলে আসবে। অ্যারাতুন সাহেবের সহযোগিতায় সে নাকি কলকাতার আরমেনিয়ান চার্চ অ্যান্ড কলেজে অ্যাকাউন্টট্যান্টের চাকরি পাচ্ছে। বারিদ জানতে চেয়েছিল যে তারা কবে হাওড়ায় ফিরবে। ক্ষীরোদ জানিয়েছিল যে মাকে অর্থাৎ যূথিকাকে হয়ত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারণ কলকাতায় বোমা পড়ার ভয় এখনও নাকি কাটেনি। খবরের কাগজ পড়ে সে সব জেনেছে। এখনও জাপানি বিমান কলকাতার রাত্রির আকাশে হানা দিচ্ছে। যদিও তেমন কোনও বিপদ ঘটেনি। সন্ধে হলেই কলকাতা হাওড়া সর্বত্র ব্ল্যাক-আউট চলছে। মাঝে মাঝে সাইরেন বেজে উঠে সকলকে ঘাবড়ে দিচ্ছে। বারিদ হঠাৎ ফোনে জানিয়েছিল যে মাকে তার কয়েকদিন ধরে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কেন যে সে কথা বলেছিল! শুনে ক্ষীরোদের মনটা খচ্‌খচ্‌ করছিল। মা যে কবে হাওড়ায় ফিরে যাবে তা কে বলতে পারে?

—জানো মা—দাদাবাবু ঝালদার চাকরি ছেড়ে দিচ্চে?

—বিশ্বদেব চাকরি ছেড়ে দিচ্চে? ওমা কেন?

—কলকাতায় চাকরি পাচ্চে দাদাবাবু...

—কী চাকরি রে ক্ষীরু?

—সাহেবদের চাকরি। আর্মেনিয়ান চার্চ-এ।

—চার্চে তো পাদ্রী সাহেবরা থাকে। সেখানে আবার কী চাকরি?

—সে তো থাকে। আবার চার্চে একটা অফিসও আচে। সেই অফিসে।

—বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই চলে আসছে?—শুভ্রা জিগ্যেস করল।

—তাই তো শুনলাম রে...

—কোথায় থাকবে? মামার বাড়িতে?

—আবার কোথায় থাকবে?—যূথিকা বললেন ;—আমাদের হাওড়ার বাড়িতে অতগুলো ঘর পড়ে আচে? ক্ষীরোদ কিছু বলল না। সে জানে যে যাই বলুক ; দাদাবাবু তাদের বাড়িতে থাকবে না। নিশ্চয়ই আলাদা বাসা নেবে। কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেও ছিল যেন দাদাবাবু!...শ্বশুরবাড়িতে পার্মানেন্টলি থাকব? তুমি কী বলচ ক্ষীরোদ? আমাকে সে বান্দা পাওনি হে! যদি কোনওদিন ঝালদার চাকরি ছেড়ে চলে আসি তাহ'লে অবশ্যই নিজের বাসা নেব।

দুপুরবেলা ঘুমোলেন না যূথিকা। নাতনি শিয়রের কাছে বসে ছিল। আর নিজে শুয়ে শুয়ে বকবক করতে লাগলেন।

—খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম রে সুবু! আর যদি জ্বর না ছাড়ে? আর যদি তোর দাদুর সঙ্গে দ্যাখা না হয়?

—ধ্যাৎ! কী আবোল তাবোল বকছ দিদু?

—হ্যাঁ। আজকাল প্রায়ই মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচব না।

—আজেবাজে কথা বললে আমি কিন্তু উঠে যাব? যূথিকা চুপ করে যান। পরপর হাই তোলেন। এত হাই উঠছে কেন? অথচ ঘুম আসছে না! কীরকম যেন শীত-শীত করছে আবার। জ্বর আসছে কি আবার? মনের ভাব শুভ্রার কাছে প্রকাশ করতে চাইলেন না যূথিকা। বরং তাঁর মনে হ'ল আবার জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ার আগে সুবুকে জরুরি কয়েকটা কথা বলে নেওয়া ভাল।

—সুবু একটা কথা বলব? রাগ করবি না?

—কী কথা দিদু?

—হ্যাঁরে মনীশের কথা তোর একটি বারের জনেও মনে পড়ে না? প্রশ্নটা শুনে শুভ্রার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে না। সে কীভাবে স্বীকার করবে যে গত রাতেই সে স্বপ্ন দেখেছে মনীশের। সে বড় অসভ্য স্বপ্ন। আকাশের নীচে--মামাবাড়ির খোলা ও অন্ধকার ছাদে মনীশ আর সে লুকোচুরি খেলচে। সে লুকিয়ে পড়েছে ছাদের দরজার পাশে। মনীশ তাকে খুঁজছে। মনীশ তাকে দেখতে পেয়েছে। আর দেখতে পেতেই দু-হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়েছে তাকে। অত কালো মানুষটাকে শুভ্রার আর খারাপ লাগছিল না। মনীশের আলিঙ্গনে থরথর কাঁপছিল শুভ্রা। তারপর মনীশ নিজের মুখ এগিয়ে নিয়ে এসেছিল তার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভেঙে গিয়েছিল স্বপ্নটা। ভেঙে গিয়েছিল শুভ্রার ঘুম।

—কীরে উত্তর দিস না কেন? ও সুবু?

—কী উত্তর দেব?

—মনীশকে তোর মনে পড়ে না? শ্বশুরবাড়িতে যেতে সাধ হয় না?

উত্তর নেই।

—আমি তোকে বলচি সুবু!...আমার বয়স তো আর কম হ'ল না? মনীশ খুব ভাল ছেলে। ওকে অপমান করে, ওভাবে তাড়িয়ে দিয়ে তুই ভুল করেছিলি সুবু...উত্তর নেই। শুভ্রা দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল।

—আমি বলি কী যা হবার হয়ে গেচে সুবু! তুই ভুল করেচিস। কিন্তু এখনও সময় আচে। তুই মনীশের কাচে ফিরে যা সুবু। হাওড়ায় ফিরে দাদুকে বল, বাবাকে বল, বড়মামাকে বলিস ; —ওরা তোকে মেমারিতে পৌঁছে দেবে।

—শুধু আমাকে বলছ কেন? আমার কি সব দায়? সেও তো একবার আমার খোঁজ নিতে পারে?—এতক্ষণ বাদে শুভ্রা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে।...

পঁচাত্তর

সারাদিন খুব একটা খারাপ ছিলেন না যূথিকা। শুয়ে বসে কাটালেন। রমা এবং শুভ্রার সঙ্গে কতরকম গল্প করলেন। কিন্তু সন্ধের দিকে তেড়ে জ্বর এল আবার। শীত করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। দুটো লেপ আর একটা কম্বল চাপা দিয়েও যূথিকার শীত যাচ্ছিল না। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল কাঁপুনিতে। সুরেন বাড়িতে ছিল না। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা থেকে সে তখনও বাড়ি ফেরেনি। তাছাড়া সে তো বাড়ি থেকে সকালে বের হবার সময় দিদিকে ভালই দেখে গেছে। তার মনে দিদির জ্বর নিয়ে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল সেটাও দূর হয়ে গিয়েছিল বোধহয়।

সুরেন বাড়িতে নেই তাতে কী হয়েছে? রমা একাই একশো। সে খুব করিৎকর্মা মেয়ে। কোথা থেকে একটা থার্মোমিটার জোগাড় করে আনল। জ্বর দেখতে লাগল যূথিকার। তার ভাব-ভঙ্গি একেবারে ঝানু নার্সের মতন যেন। ক্ষীরোদ আর শুভ্রা অবাক হয়ে দেখছিল। রুগির জিভে ঠোকানো আছে থার্মোমিটার। ঘরের দেয়ালে একটা বিঘত সাইজের ঘড়ি আছে। সুইস ঘড়ি। অনেক পুরনো। যূথিকার বাবা কোথা থেকে জোগাড় করে এনেছিলেন। ঘড়িটার বিশেষত্ব হল, ঘন্টার ঘরে বড় কাঁটা পৌঁছলে খুব জোরে ঢং ঢং শব্দ হয়। সারা বাড়ি মাত করো দ্যায় একেবারে। শুধু বাড়ির লোকেরা নয়, আশেপাশের প্রতিবেশীরাও জানে কটা বাজল। এত জোরে শব্দ করে

বলেই ঘড়িটা নিজের শোবার ঘরে রাখেনি সুরেন। পাশের ঘরে রেখেছে। এই ঘর সাধারণত তালাবন্ধই পড়ে থাকে। বাড়িতে অতিথি এলে তাদের এই ঘরে শুতে দেওয়া হয়। যেমন এখন এই ঘরে যূথিকা আর শুভ্রার জন্যে বিছানা পাতা হয়। যদিও যূথিকা ম্যালেরিয়ার পাল্লায় পড়ার পর সুরেন শুভ্রাকে দিদুর পাশে শুতে বারণ করেছে। সে এখন বড় মামা যে ঘরে শুচ্ছে যেখানে আলাদা খাটে ঘুমোয়।

যূথিকার জিভে থার্মোমিটার চালান করে দিয়ে রমা ক্ষীরোদের দিকে তাকিয়ে বলল—ঘড়ির দিকে নজর রাখো ভাগনা। দু-মিনিট হলেই আমাকে জানাবে। ক্ষীরোদ রমার থেকে দু-তিন বছরের বড় হবে। রমা সম্পর্কে ক্ষীরোদের মামীমা। কিন্তু প্রায় সমবয়সীকে মামীমা ডাকতে তার কীরকম যেন অস্বস্তি হয়। সম্বোধনটা ক্ষীরোদ সচেতনভাবেই এড়িয়ে যায়।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়িতে দু-মিনিট হ'তেই ক্ষীরোদ বলল—হ্যাঁ হয়ে গেচে। এবার থার্মোমিটার তুলে নাও...। শুভ্রাও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেও ঘাড় নাড়ল। রমা যূথিকার জিভ থেকে থার্মোমিটার তুলে নিয়ে পারদের সূচক বোঝার চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে চমকে উঠল, মুখে বলল—একী গো! হে মা!

—কত দেখছ?—ক্ষীরোদ জানতে চাইল।

—মনে হচ্ছে একশো চার ডিগ্রি জ্বর!

—অ্যাঁ? বলচ কী? দেখি...আমায় দেখতে দাও...ক্ষীরোদ তাড়াতাড়ি রমার হাত থেকে থার্মোমিটার নিল। কেরোসিন-ল্যাম্পের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে চোখ সরু করে থার্মোমিটারের রীডিং পড়তে লাগল। মুহূর্তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে অস্ফুটে বলল—ঠিকই তো! এত জ্বর বেড়ে গেল? ভয় পেয়ে শুভ্রা যূথিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—দিদু ও দিদু তোমার কী কষ্ট? যূথিকার কানে যে কথাটা ঢুকেছে সেটা বোঝা গেল যখন তিনি মুখ দিয়ে বলতে লাগলেন—উঁ উঁ উঁ উঁ...। আর হাত দিয়ে মাথার দিকে বারবার দেখাচ্ছিলেন।

শুভ্রা বলল—দিদুর মাথায় আবার কী হল? রমা জানাল—অত জ্বর উঠেছে! মাথা নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। এখনই কিছু করা দরকার। জ্বরটাকে আর মাথায় চড়তে দেওয়া ঠিক নয়। বেশি জ্বর হলে জানো তো মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়।

ক্ষীরোদ চিন্তিতভাবে বলল—ছোটমামা আসচে না কেন? জ্বরটা যাতে কমে তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া তো দরকার? রমা বলল—তিনি এখন মস্করা সেরে কখন ফিরবেন কে জানে? মোহিত ডাক্তারকে ডাকতে হবে। ভাগনে তুমি মোহিত ডাক্তারের বাড়ি চেন?

—নাহ, আমি কীভাবে চিনব? সে তো শুনিচি গোবিন্দপুর?

—সেটা আবার কোথায়?—শুভ্রা জানতে চাইল।

—পাশের গেরাম গো পাশের গেরাম।...সে আমরা কেউই চিনি না।

—তাহ'লে উপায়?

—মিনসে আজ একটু দেরি করচে দেকচি। তবে এসে যাবে। এখন জ্বর কমাতে হলে একটা উপায়ই আচে।

—কী?

—ওঁর মাথায় জলপট্টি দিতে হবে। তাতে জ্বর কমবে মনে হয়। আমি হেঁসেল থেকে একটা বড় জামবাটিতে ঠাণ্ডা জল আনচি। আর ছেঁড়া, পরিষ্কার ন্যাকড়া। সুবু তোমাকে আমি ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেটা দিদুর কপালে দিয়ে যাও।

কপালে জল পটি পড়তে যূথিকা বোধহয় একটু আরাম পেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোঁ কোঁ

কোঁ কোঁ আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল। যা হল আসলে কষ্টের অভিব্যক্তি। সেই কষ্ট এখন একটু কমল বোধ হয়। কিন্তু জ্বর কমছে কি? রমার মনে হচ্ছিল একবার যূথিকার জিভে থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বরটা দেখে। কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। যদি দেখা যায় জ্বর কমছে না, বরং বাড়ছে। তখন কী করবে? সে জানে থার্মোমিটারের পারদ যদি একশো পাঁচ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায় তাহ'লে সত্যিই ভয় পেতে হবে। সে শুনেছে জ্বর ওরকম যদি প্রবল উঠে যায়। তাহলে মাথার শিরা ছিঁড়ে মানুষ মারা যায়।

ওদের দুশ্চিন্তা কিছুটা কমল যখন সুরেন বাড়ি ফিরে এল।

—আবার জ্বর এয়েচে দিদির? কী বলচ কী?

—হ্যাঁগো। আবার। একবার থার্ম্মিটারে জ্বর দেকেচি।

—কত?

—একশো চার।

—অ্যাঁ? বলো কী? ঠিক দেখেচ তো?

—তুমি এখন একবার দ্যাখো তো ছোটমামা। অনেকক্ষণ ধরে মায়ের কপালে জলপট্টি দেওয়া হচ্চে। এখন জ্বরটা কমতেও পারে।—ক্ষীরোদ বলল।

সুরেন এবার নিজে থার্মোমিটার নিয়ে পড়ল। যূথিকার জিভে নয়। এক হাতের বগলের নীচে সে থার্মোমিটার চেপে ধরল। আর তখনই অস্ফুটে সুরেনকে বলতে হল—এ বাবা! এতো দেখচি দিদির গা একেবারে পুড়ে যাচ্চে! আবার জ্বরটা এল কেন? এটা তো ভাল লক্ষণ নয়।

কুপির সামনে থার্মোমিটার ধরে সুরেন বলল—জ্বর তো দেখচি একশো চারেরও বেশি...

—কত ছোটমামা?

—একশো চার পয়েন্ট দুই...এখনই মোহিত ডাক্তারকে ডাকা দরকার। যেভাবে হোক ওষুধ দিয়ে জ্বরটা তো কমাতে হবে।

যূথিকার শিয়রে বসে ক্রমান্বয়ে জলপট্টি দিয়ে যাচ্ছে রমা আর শুভ্রা। ক্ষীরোদ বাইরের দাওয়ায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। সাইকেল হিঁচড়ে সুরেন বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে। গোবিন্দপুর পৌঁছতে হলে প্রায় সাত মাইল সাইকেল ঠেলতে হবে। তারপর মোহিত ডাক্তারকে বাড়িতে তাকে যদি না পাওয়া যায়? তাহলেই তো চিত্তির!

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাস্তা ধরে প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে সুরেন পৌঁছে গেল মোহিত-ডাক্তারের বাড়ি। মোহিত! মোহিত! চেঁচিয়ে ডাক দিল সে। এখন তো সবে সন্ধে সাতটা। এরই মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? অবশ্য গ্রামের দিকে তাড়াতাড়ি বিছানায় যাওয়া এবং কাকভোরে বিছানা ছাড়ার অভ্যাস অনেকেরই। দরজা বন্ধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু জানালাগুলোও সব বন্ধ। একটা জানলাও খোলা নেই। কোনও আলোর চিহ্ন নেই। ফলে বাড়ির ভেতরে লোকজন আছে কিনা, থাকলেও জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

—মোহিত মোহিত! ভাই মোহিত বাড়ি আছো?—অন্ধকার এবং খোলা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুরেন চেঁচিয়ে বারবার ডাকছিল। দিদির অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বর হু হু করে বাড়ছে। জ্বরটা কমা দরকার। এখনই কিছু ওষুধ পড়া দরকার। ওষুধ বলতে কুইনিন। কিন্তু সে তো বাড়িতে আর নেই। গতকালই ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। যূথিকাও আজ সকালের দিকে ভাল ছিলেন। বেশ সুস্থ লাগছিল তাঁকে। নিজে থেকে চেয়ে খাবার-দাবারও খেলেন। এখন ঐ কুইনিনই যদি আবার দিতে হয় তাহ'লে মোহিত-ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে দেওয়াই ভাল।

—মোহিত মোহিত মোহিত! বাড়ি আছো হে? আমি জিওড়দা গ্রামের সুরেন মাস্টার। বড়

বিপদে পড়ে এতদূর এয়েচি...

—নামটা কী বললে বেশ?...সামনের একটা জানলা ফাঁক হয়েছে এতক্ষণ বাদে। যে প্রশ্ন করছে সে বোধহয় মোহিতই।

—আমি সুরেন গো! জিওড়দার সুরেন মাস্টার!

—ওহ সুরেন? এত রাতে কী মনে করে গো?

—বড় বিপদ আমার মোহিত...ওরা দুজনে দুজনকে নাম ধরে সম্বোধন করে। কারণ দুজনেই ক্লাশ ফ্রেন্ড।

দরজা খুলল। হাতে টিমটিমে হেরিকেন। মোহিত নিজেই বেরিয়ে এল। আদুড় গা, হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি। যেরকম চেহারাকে বাঁশপাতার সেপাই বলা হয় মোহিতের চেহারা সেরকম।

—এত রাতে সুরেন আমার বাড়িতে?

—বাড়িতে কি কেউ নেই মোহিত? দোরতাড়া সব বন্ধ?

—চুপ চুপ সুরেন। অত চেঁচিয়ে কথা বোলো না। সবাই বাড়িতে আচে। কেউ কোত্থাও যায়নি। আমি আসলে লুকিয়ে বাড়িতে বসে আচি।

—লুকিয়ে?

—হ্যাঁ লুকিয়ে। আমি আর পারতেচি না সুরেন! সারা গ্রামে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। রোগীর পর রোগী দেখে দেখে আমি আর পারচি না। কাউকে ওষুধও দিচ্চি না। হাসপাতাল চলে যেতে বলচি।

—হাসপাতাল?...বর্ধমানে?

—হ্যাঁ। সে হাসপাতালের যা অবস্থা! মাত্র পঞ্চাশটা বেড। আর গন্ডায় গন্ডায় রোগী!

—কিন্তু আমার বাড়িতে যে তোমাকে একবার যেতেই হবে মোহিত ভাই?

—কেন? তোমার দিদির জ্বর কমেনি?

—কমে তো ছিল। আজ আবার সন্ধের দিকে জ্বর এসেচে। অনেক জ্বর! একশো চার ডিগ্রিরও বেশি। মাথায় জলপট্টি দেওয়া হচ্চে জ্বর কিন্তু নামচে না। আবার কুইনিনের বড়ি দিতে হবে। কিন্তু সে জিনিস তো আমার কাচে নেই। তোমাকেই দিতে হবে ভাই।

—সে না হয় দিচ্চি। কিন্তু লক্ষণ খুব খারাপ সুরেন...

—কীসের লক্ষণ খারাপ?

—ম্যালেরিয়ার রোগীর জ্বর একেবারে ছেড়ে গেল, পথ্য করল রোগী, তারপরেও যদি আবার নতুন করে জ্বর আসে, মানে যাকে ডাক্তারি ভাষায় Relapse করা বলে তাহ'লে সেটা খুব খারাপ লক্ষণ। জ্বর কি একেবারেই কমছে না?

—যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েচি তখনও নাকি কমেনি, জ্বর হু হু করে বেড়েই যাচ্ছিল, এতক্ষণে কী হয়েছে বলতে পারব না। তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে কুইনিনের বড়ি দিয়ে দাও মোহিত! আমি বাড়ি ফিরে যাই। দিদির যে হঠাৎ কী হল?

—কত বয়স হল দিদির?

—তা...চুয়ান্ন পঞ্চান্ন তো বটেই। আমার থেকে প্রায় চোদ্দো বছরের বড়। তবে জামাইবাবুর আর দিদির বয়সের ফারাক বেশি নয়।

—তোমার জামাইবাবু তো সাহেবি কোম্পানিতে বড় চাকরি করেন?

—হ্যাঁ। নিজেও এক্কেবারে পাকা সাহেব। ওসব কথা ছাড়ো মোহিত। এখন ওষুধটা দাও।

—দাঁড়াও আসচি।

মোহিত বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। হেরিকেনটা উঠোনে রেখে গেল। তাতে চারপাশটা খানিক আলো হয়েছে। সেই আলোতে সুরেন দেখল বাড়ির সিঁড়ির ঠিক মুখে একটা বাদামী রং-এর কুকুর কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে না। পিটপিট করে দেখছে সুরেনকে। কীরকম করুণ দৃষ্টি! ও কি বুঝতে পারছে সুরেনের মনের ভেতর যূথিকাকে নিয়ে এখন তোলপাড় করছে। খানিকবাদে মোহিত আবার বাইরে এল।

—এই নাও সুরেন।—একটা ছেট শিশি বাড়িয়ে দিল। কালো-কালো বড়ি। ওগুলো কুইনিন। ভীষণ তেতো। মুখে দিলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

—আর এই দুটো পুরিয়াও রেখে দাও সুরেন...

—এটা কী জন্যে?

—এখনই গিয়ে একটা পুরিয়া খাইয়ে দেবে। জ্বর তাতে নেমে যাওয়ার কথা। যদি ঘন্টাখানেকের মধ্যেও না কমে, তাহলে দু-নম্বর পুরিয়াটাও দিয়ে দেবে। তাতেও যদি জ্বর না নামে—

—তখন কী করব মোহিত?

—হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে পেশেন্টকে। বুঝতে হবে কেসটা সিরিয়াস।

সাইকেলে আবার সাত মাইল পথ। ঝড়ের গতিতে আরও কম সময়ে ফিরল সুরেন। এসে দেখল বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। যূথিকার জ্বর তো কমেইনি। বরং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল।

রমা কান্নার গলায় বলল—ওগো ওষুধ এনেচ?

—এনিচি।

—শুভ্রাও কাঁদছিল। এখন সুরেনকে দেখে যেন একটু ভরসা পেল।—ওষুধটা দাও। এখনই খাইয়ে দিই।

—এই নে। দু-ঢোক জল দিয়ে এক নম্বর পুরিয়াটা খাইয়ে দে। অত ঘাবড়ে যাচ্চিস কেন তোরা? ম্যালেরিয়া রুগীর জ্বর তো বাড়ে..

—ওগো ওঁর কাচে গিয়ে তুমি কথা বল? মনে হচ্চে জ্ঞান নেই। জ্বর তো একশো পাঁচ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেচে...

—অ্যাঁ বলো কী? যূথিকাকে দেখে চমকে উঠল সুরেন। কীরকম এলিয়ে পড়ে আছেন। বুকটা হাপরের মতো উঠছে আর নামছে।

—দিদি ও দিদি! খুব কষ্ট হচ্ছে?

যূথিকা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে শুভ্রা পুরিয়াটা খাইয়ে দিল। জলও দিল। কিন্তু যুথিকা তো হাঁ করছেন না। শুভ্রা ঘটির জল ঢুকিয়ে দিতে চাইল ওঁর মুখে। কিন্তু জল কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ক্ষীরোদ বলল—ছোটমামা মাকে এভাবে বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। হাসপাতাল কদ্দূর?

—সেই বর্ধমান যেতে হবে। সেই হাসপাতালও নাকি ম্যালেরিয়া রুগীতে বোঝাই। বেড পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

—তবুও এভাবে বাড়িতে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। কিছু একটা করতে হবে। বাবা নেই কাচে। আমি একা। মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় আমি তাঁকে কী জবাবদিহি করব?

—ঠিক বলেচ ক্ষীরোদ। মোহিতের ওষুধ কাজ করল না মনে হচ্ছে। দিদিকে বর্ধমানে নিয়ে যেতে হবে।

আশেপাশের প্রতিবেশীরা সুরেনের হাঁকাহাঁকিতে বেরিয়ে এল। একটা গরুর গাড়ি তড়িঘড়ি জোগাড় হল। ছইয়ের ভেতর মাদুর, কাঁথা ইত্যাদি দিয়ে বিছানা পাতা হল চটপট। যূথিকা ছাড়াও মোট তিনজন,—সুরেন, ক্ষীরোদ এবং শুভ্রা উঠে বসল গাড়িতে। যূথিকাকে যখন ধরাধরি করে ছইয়ের ভেতর পাতা বিছানায় শোয়ানো হচ্ছে তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। এক মুহূর্তের জন্যে চোখ খুললেন যূথিকা। ফিসফিস করে ডাকলেন সবাইকে সচকিত করে—সুবু! ...ও সুবু?

—এই যে দিদু আমি?—শুভ্রা ছুটে গিয়ে যূথিকার শিয়রের কাছে বসল।

—তুই আমার কপালটা ছুঁয়ে থাক সুবু। কিছুতেই আমাকে ছাড়বি না...।

—নাহ দিদু ছাড়ব না...। শুভ্রা কেঁদে ফেলল। কিন্তু সারা রাস্তা যূথিকার কপালে তার হাত ছুঁয়ে রইল ঘুম নেই। ক্ষীরোদের চোখে ঘুম নেই। সুরেনের চোখে ঘুম নেই। গাড়োয়ানের চোখে ঘুম নেই। এমনকী গরুদুটোর চোখেও ঘুম নেই। যখন সোনামুখী তারা পৌঁছল তখন ভোরের আলো ফুটিফুটি করছে। পাখপাখালি ডাকছে। এতটা রাস্তা অবশ্য যাওয়াই বৃথা হল। কারণ পথেই যূথিকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ছিয়াত্তর

গতকাল রাতে একটা পার্টি ছিল। মি. জন লুইস, ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির একজন এক্সিকিউটিভ তার বাড়িতে পার্টি দিয়েছিল। উপলক্ষ তাদের ফিফটিনথ্ ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। সেই পার্টিতে নিমন্ত্রিত ছিলেন নীরদবরণ। তিনি একা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাননি। শেলীকেও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে অবশ্য শেলীর আত্মসম্মানবোধ খুবই প্রবল। লুইসকে শেলী চেনে না এমন নয়। এই কলকাতা শহরে একমাত্র পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলেই বিদেশিদের আস্তানা। যারা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তারাও অধিকাংশই এখানেই আশেপাশে বসতি গড়েছে। সান্ধ্য-পার্টি এইসব বিদেশি এবং আধা-বিদেশিদের সংস্কৃতির একটা বিশেষ দিক। প্রায় প্রতি উইকএন্ডেই কোনও না কোনও উপলক্ষে, কারোর না কারোর বাড়িতে পার্টির আয়োজন করা হয়। সেখানে জড়ো হয় প্রায় সবাই। ভাবের আদানপ্রদান হয়। অবাধে মধ্যপান, নাচগান এবং খাওয়া-দাওয়া চলে। এভাবে মনের ক্লান্তি ঘোচানোর একটা রীতি আছেই। এইসব পার্টিতে এলাকার সবাই জড়ো হয় বলেই একে অপরকে চেনে। শেলীর স্বামী, সপ্রতিভ এয়ার-পাইলট, রবার্ট অ্যান্টনি যখন জীবিত ছিল, তখন সে কলকাতায় অফ-ডিউটিতে থাকলে এই ধরনের সান্ধ্য-পার্টিতে নিয়মিত যেত। সস্ত্রীক যেত। অ্যান্টনির অনেক গুণ ছিল। সে নাচতে পারত, গাইতে পারত এবং প্রচুর মদ্যপানও করতে পারত। মানুষ হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিল অ্যান্টনি। শেলী অবশ্য স্বভাবে বরাবরই স্বামীর বিপরীত। সে একটু চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। তাকে দেখে মনে হতে পারে সে যেন সবসময়েই কোনও কারণে চিন্তান্বিত। এরকম চিন্তা করার ভাব থেকেই তার মুখে একটা পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। জন লুইস বহুদিন কলকাতায় আছে। অনেক পার্টিতেই শেলী তাকে দেখেছে। সে তাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু তবুও সে লুইসের পার্টিতে যাবে কেন? লুইস তো নীরদবরণকে ইনভাইট করেছে। তাকে ইনভাইট করেনি।

—আই উইল নট গো নীরোদ—শেলী জানায়।

—হোয়াই মাই ডিয়ার?

—আয়্যাম নট ইনভাইটেড।

—হু টোল্ড ইউ সো? লুইস আমাকে বলেছে। উড ইউ লাইক টু ভেরিফাই?

শেলী চুপ করে থাকে। সে নিমন্ত্রিত কিনা এটা লুইসকে জিগ্যেস করবে? এটা খুবই হাস্যকর হয়ে যাবে না?

—তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইছ কেন নীরোদ?

—বিকজ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান টুগেদার। তুমি তো শুধু হসপিট্যাল যাও আর বাড়ি ফিরে আসো। তোমার জীবনেও তো কোনও এনটারটেইনমেন্ট নেই। আই ডু ফিল ফর ইউ শেলী...।

—আজকাল আর হইচই ভাল লাগে না নীরোদ। বাড়িতে থাকতেই ভাল লাগে। বই পড়তে ভাল লাগে।

—কী বই পড়ছ?

—ইউ নো আই প্রেফার পোয়েট্রি।

—ইয়েস আই নো।

—আমি এখন তোমাদের টেগোরকে পড়ছি। ওঁর কবিতা কে অনুবাদ করেছেন জানো?

—ইউ মীন ইন ইংলিশ?

—ইয়েস।

—জানি। ইয়েটস। শুনেছি কে একজন আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ডও রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা অনুবাদ করেছে।

—ইয়েস এজরা পাউন্ড। হি ইজ আ ডিফিকাল্ট পোয়েট। হি ইজ নট মাই কাপ অব টি।

—কবিতার আলোচনা পরে হবে। এখন সন্ধে সাতটা বাজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পার্টিতে যাব।

—আমাকে কি যেতেই হবে? কোন্ পরিচয়ে যাব? নীরদবরণ থমকে যান।

—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—কেন? আমি কী মীন করেছি তুমি বুঝছ না? আমি কোন্ পরিচয়ে যাব পার্টিতে কিংবা সোসাইটিতে? তোমার গার্ল ফ্রেন্ড হিসেবে? ইউ আর আ প্রেটি ওল্ড ম্যান? আমি তোমার থেকে বেশ ছোট। তোমার গার্ল ফ্রেন্ড বললে লোকে মুচকি হাসবে হয়তো। তারপর অবশ্য মেনেও নেবে। কিন্তু এভাবে ফ্রেন্ড হিসেবে কতকাল থাকব?

—তুমি কি বলতে চাইছ শেলী?

—পারবে তুমি তোমার স্ত্রী সেই ওল্ড ওম্যানকে ডিভোর্স দিতে? আমাকে বিয়ে করতে?

—ডিভোর্স ইজ আ ভেরি কমপ্লিকেটেড ম্যাটার ইন আওয়ার কোর্ট। তাছাড়া যূথিকার বয়স হয়েছে। এখন যদি আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই দ্যাট উইল বি আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু টু হার। দ্যাট উইল বি টু শকিং ফর হার।

—তাহলে আমি কে? ... হু অ্যাম আই? ... তোমার গার্ল ফ্রেন্ড কাম কেপ্ট?

'কেপ্ট' কথাটা শুনে নীরদবরণ চমকে উঠলেন। শেলীকে কি তিনি এতকাল রক্ষিতা হিসেবেই দেখেছেন? তাকে ভালবাসেননি? শেলীর সৌন্দর্যকে, তার মেধাকে, উচ্ছলতাকে ভালবাসেননি? যূথিকা শুধুই তাঁর স্ত্রী। যূথিকাকে ভালবাসা যায় না। তিনি একজন অ্যাভারেজ ওম্যান। আমার যোগ্য নয় যূথিকা—এটা নিজের মনে কতবার বিড়বিড় করেছেন নীরদবরণ। যূথিকা শুধুই তাঁর স্ত্রী। শেলী তাঁর বিলাভেড, প্রেমিকা। নাহ, শুধু শরীরের জন্যে নীরদবরণ শেলীর কাছে আসেন না। এখানে এলে তাঁর মনের আরাম হয়, হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়, মেধার উপভোগ্য ব্যায়াম হয়। সোফায় বসেছিলেন নীরদবরণ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল শেলী। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরের রাস্তা দিয়ে হর্ন বাজিয়ে মোটর চলে গেল। নীরদবরণের হাতে চুরুট জ্বলছিল। তিনি চুরুট সাবধানে

নামিয়ে রাখলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর উঠে গেলেন শেলীর দিকে। দু-হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর গভীর আবেগে চুম্বন করলেন। চুম্বনের আবেশে শেলীর চোখ মুদে এল।

—ডার্লিং আই লাভ ইউ...লাভ ইউ...।

—আই নো।

—দেন হোয়াই ইউ হ্যাভ আটারড সাচ ফিলদি ওয়ার্ডস? ইউ আর টু উইথড্র ... আদারওয়াইজ....

—আদারওয়াইজ? —শেলী যেন ভয় পায়।

—আমি তোমার কাছে আর আসব না।

—ওহ নীরোদ নীরোদ .... প্লিজ ফরগিভ মি? আসলে আমার মেজাজের ঠিক ছিল না। আয়্যাম সরি ফর দোজ ওয়ার্ডস।

—তাহলে তুমি স্বীকার করছ আমি তোমাকে ভালবাসি?

—হ্যাঁ করছি।

—তাহলে আমার সঙ্গে পার্টিতে চলো? আই ওয়ান্ট টু সি ইউ ইন ওয়ান অব ইওর বেস্ট ড্রেসেস টুডে ইভনিং.....

—ও.কে। আয়্যাম অল ফর ইউ।

মান-অভিমানের পালা শেষ। শেলী সত্যিই সাজতে বসে যায়। সব মেয়েই সাজতে চায়। শেলীও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে শেলী যখন সাজগোজ সম্পূর্ণ করে নীরদবরণের সামনে এসে দাঁড়াল তখন তাঁর মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নির্গত হল বাঃ শব্দটি। সত্যিই শেলীকে অপূর্ব লাগছিল। নীরদবরণ হাত নেড়ে আবৃত্তি করলেন—'Age cannot wither her, nor customs stale her infiaite variety...' কার লাইন বল তো শেলী?

—বলতে পারব না ডার্লিং.....

—অ্যান্টনি বলছে ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে। শেক্সপিয়রের নাটকে।

—আমি তোমার ক্লিওপেট্রা?

—অফ কোর্স? —নীরদবরণ আবার শেলীকে আলিঙ্গন করেন। তার ঠোঁটে চুম্বন করেন। তীব্র সংরাগময় চুম্বন। খুব দামী পারফিউম ব্যবহার করেছে শেলী। মাদকতাময় গন্ধ। সেজেগুছে বেশ। আকাশী রং স্কার্ট। আর সাদা টপ। মাথার চুল পেছনদিকে চুড়ো করে বাঁধা। শেলীর ঘন কেশদামের রং বাদামি। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ-হাতে সোনার সরু ব্রেসলেট। আর গলায় একটা নেকলেস। তেকোণা লকেটে মাতা মেরির মুখ। এই ভারী সোনার নেকলেসটি নীরদবরণই উপহার দিয়েছিলেন শেলীকে। তার বার্থ—ডে উপলক্ষে। কয়েক মাস আগে। নেকলেসটি নীরদবরণের উপহার। কিন্তু লকেটটি শেলীর। মাতা মেরীর মুখও তারই পছন্দ-অনুযায়ী।

—ইউ আর লুকিং এক্সটিমলি গ্রেসফুল? —নীরদবরণ বললেন।

—থ্যাঙ্কস আ লট।

পার্টি জমল ভালই। লুইস দৃশ্যত নীরদবরণ ও শেলীকে একসঙ্গে দেখে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত।

—ইউ আর লুকিং লাইক মেড ফর ইচ আদার? —লুইস বলল। তার স্ত্রীও বেশ সুন্দরী এবং কথা বলতে পারে খুব। এসব পার্টিতে পানীয়ের বন্যা বয়ে যায়। নীরদবরণ স্কচ হুইস্কি পেলে নিজেকে সামলাতে পারেন না। তাঁর গলায় ক্ষতজনিত অস্বস্তি, ডাক্তারের নিষেধ এসব তিনি ভুলেই মেরে দিলেন। সুস্বাদু খাদ্য সহযোগে প্রচুর পানীয় গলাধঃকরণ করে যখন শেলীকে নিয়ে গাড়িতে বাড়ি ফিরছেন তখন তিনি মাতাল হয়ে গেছেন। শেলীর উত্তুঙ্গ বুকের মালভূমিতে

তাঁর মাথা। তিনি বেশ জোরে জোরে আবৃত্তি করছিলেন—

I would spread the clothes under your feet :
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

আবৃত্তি থামিয়ে জড়ানো স্বরে জিগ্যেস করলেন—ডার্লিং কার কবিতা?

শেলী হেসে বলল—অফ মাই ফেভারিট পোয়েট—উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস।

—কী অপূর্ব কল্পনা তাই না? আমি আমার স্বপ্ন তোমার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিয়েছি তুমি সাবধানে পা ফেলো কারণ তুমি আমার স্বপ্নের ওপর দিয়ে হাঁটছ।

—নীরোদ-রিসাইট মি আ পোয়েম অব টেগোর...হি ইজ অলসো ভেরি রোমান্টিক...

—টেগোরের বাংলা কবিতা বলতে পারব। ইংলিশ ট্র্যানশ্লেসন তো মনে নেই?

—স্পিক ইট ইন বেঙ্গলি। আমি তো বাংলা বুঝি। বাংলায় কথা বলি যখন বাংলা বুঝব না কেন?

—তাহলে শোনো—

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা—
কাহারে কাঁদিয়া বলে, 'যেয়ো না, যেয়ো না?'
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা?

বুঝলে কিছু?

—কিছু কিছু বুঝেছি। ইয়েস আই হ্যাভ আনডারস্টুড সাম। দ্যা হ্যান্ডস ডিজায়ার টু এমব্রেস...

—ভেরি গুড। একসেলেন্ট ডার্লিং।

বাড়ি ফিরে ধড়াচুড়া খুলে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন নীরদবরণ। তাঁর বসার ক্ষমতা ছিল না। চোখ জড়িয়ে আসতে চাইছিল ঘুমে। কিন্তু ঘুম আসছিল না কিছুতেই। কীরকম একটা অস্বস্তি। শুধু এপাশ-ওপাশ করছিলেন। শেলী একটা হাত রাখল তাঁর কপালে—কী হল ডার্লিং এনি প্রবলেম?

—এগেইন আয়্যাম ফিলিং এক্সট্রিম পেইন ইন দ্য থ্রোট?

—পেইন?

—ইয়েস পেইন। গিভ মি এ গ্লাস অব ওয়াটার?

শেলী তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এল। নীরদবরণ বেশ কষ্টের সঙ্গে উঠে বসলেন। জল খেলেন কয়েক ঢোক। মনে হচ্ছে গলার কাছে কে যেন করাত দিয়ে ঘষছে। গলা চিরে যাচ্ছে।

—উঃ ইটস ভেরি পেইনফুল। —নীরদবরণ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। বেসিনের দিকে যাচ্ছিলেন।

—কী হল ডার্লিং? গোয়িং টু টয়লেট?

নীরদবরণ উঁ উঁ উঁ শব্দ করছিলেন মুখ দিয়ে। মুখ টিপে আছেন। মুখ খুলতে চাইছেন না। বেসিনে এসে মুখ খুললেন। বমি করছিলেন—ওয়াক ওয়াক ওয়াক—ওহ মাই গড?

শেলী নীরদবরণকে পরম মমতায় জড়িয়ে ছিল। কিন্তু বেসিনের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। অস্ফুটে বলল—ওহ মাই গড? ইউ আর ভোমিটিং ব্লাড? .... ব্লাড?

বমি করার পর গলার জ্বালা যেন অনেকটা কমল। খুব অবসন্ন লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছিল

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। এখনই পড়ে যাবেন। হাঁটু দুটো কাঁপছিল।

—হোল্ড মি টাইট মাই ডিয়ার। —ফিসফিস করে শেলীকে বললেন। শেলী তাঁকে চেপে ধরে আছেন। সঙ্গিনীর কাঁধে ভর দিয়ে নীরদবরণ বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

—জল খাবে নীরোদ? —ইংরেজিতে জানতে চাইল শেলী।

—ইয়েস।

শেলী শুধু জলই আনল না। একটা চ্যাপটা ট্যাবলেট নিয়ে এল। জলের সঙ্গে বাড়িয়ে দিল।

—হোয়াট ইজ দিস? এনি মেডিসিন?

—ইয়েস মেডিসিন। ইট উইল রিলীভ ইওর থ্রোট অ্যান্ড মেক ইউ স্লিপ....

—থ্যাঙ্ক ইউ। —নীরদবরণ জল ও ওষুধ বিনা প্রশ্নে খেয়ে নিলেন।

—ডার্লিং? ইউ শুড কনসাল্ট এ গুড ফিজিশিয়ান।

—ইয়েস আই উইল ডু।

—ইউ শুড নট টেক মাচ ড্রিংকস....

নীরদবরণ কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি ঘুমের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হঠাৎ যূথিকার কথা খুব মনে পড়ছিল। কেমন আছে যূথিকা? ভাল আছে তো? অনেকনি ক্ষীরোদ ফোন করে খবর জানায়নি।

পরের দিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। শেলী চোখ মেলে দেখল, নীরদবরণ তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন। আয়া নাসরিনকে চা বানাতে বলল শেলী। টয়লেটে গেল, দাঁত মাজল। তারপর এই বাড়ির ছাদে চলে গেল। ছাদের ধারে সিমেন্টের গোল ছোট টেবিল এবং দুটো চেয়ার করা আছে। রবার্ট শখ করে এরকম বসার জায়গা করেছিল। পাইলটের ডিউটি থেকে সে যখন ছুটি পেত এবং বাড়িতে আসত, তখন গরমের দিনে রাতে এবং শীতের দিনে সকালে ছাদে বসে চা-পান কিংবা মদ্যপানের জন্যে এরকম বসার ব্যবস্থা সে করেছিল। রবার্ট নেই। কিন্তু চেয়ারগুলো আছে। তার একটিতে শেলী বসল। এখন জানুয়ারি মাস। শীত ভালই পড়েছে। তাই সকালের রোদ গায়ে নিতে বেশ লাগছে। শেলীর গায়ে একটা পাতলা চাদরও আছে। আয়া চা দিয়ে গেল। বিস্কুটও। শেলী চায়ের কাপে চুমুক দিল। তার মনে দুশ্চিন্তা ছিল।

গতরাতে সে নীরদবরণকে রক্তবমি করতে দেখেছে। কেন এরকম হল? প্রায়ই নীরদবরণ বলেন গলায় অস্বস্তি হচ্ছে। বিশেষত মদ্যপানের পর গলাতে জ্বালার কথা তিনি বলেন। কী হয়েছে ওঁর গলায়? কোনও ভাল ফিজিসিয়ানকে দেখাচ্ছেন না কেন? ওঁর এক বন্ধুকে দেখাচ্ছেন। তিনিও নাকি ডাক্তার? শেলী যে হাসপাতালে নার্সেব কাজ করে সেটি মিলিটারিদের। তবে নীরদবরণ যদি চান, সেখানে দেখাবার ব্যবস্থা শেলী করে দিতে পারে। ঘুম থেকে উঠলে নীরদবরণকে আজই শেলী বলবেন তাঁর হাসপাতালে ভাল ই.এন.টি. ডাক্তারের কাছে একবার চেক-আপ করিয়ে নেবার জন্যে। শেলী চায়ে চুমুক দেন। নরম রোদ পিঠে, সারা শরীরে উষ্ণতার আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। চকচকে নীল আকাশ। শাসা মেঘের ভেলা। শেলী চুপচাপ বসে থাকে। নীরদবরণের কথা ভাবতে ভাবতে তার মনটা হু হু করে ওঠে। এই 'বেঙ্গলি বাবু' আর পাঁচটা ভেতো বাঙালির মতন নয়। ওর চামড়া কালো না হলে সাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যেত। মেজাজে-মর্জিতে পুরোপুরি সাহেব মানুষটা। চমৎকার ইংরেজি বলেন। ইংরেজি সাহিত্যের পোকা। বিদেশি খাবারের ভক্ত। বিদেশি মদে আসক্ত। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধলে জীবনটা বেশ মনোরম হত। কিন্তু তা কি সম্ভব? এই 'সাহেব' লোকটার একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী আছে। তাকে ত্যাগ করে আসা ওঁর পক্ষে মুশকিল। শেলী সেটা কোনওদিন চাইবে না। ঐ নিরীহ লোকটার

ঘর ভেঙে কী লাভ? তাকে শেলীও যে সুখী হতে পারবে তার কী নিশ্চয়তা আছে? তার থেকে এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে না-হয়। তারও তো বয়স হচ্ছে। আর বছর পাঁচ বাদেই শেলী সংসারের বন্ধন ছেড়ে অন্য এক জীবনে প্রবেশ করবে হয়ত। এরকমই সে ভেবে রেখেছে। সে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে। মিশনারীদের দলে নাম লিখিয়ে মানুষের সেবা করবে। দুঃস্থ মানুষের সেবা করেই হয়ত বেঁচে থাকার আনন্দ পাবে।

চা-পান শেষ। আজ শেলী হাসপাতালের কাজে যাবে না। তার অনেক ছুটি পাওনা আছে। সে কামাই প্রায় করেই না। আজ সে একটু বিশ্রাম চায়। একটু পরেই সে হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ছুটিতে থাকার কথা জানাবে। ছুটি পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধে হবে না। শেলী ছাদ থেকে অন্দরে যাওয়ার কথা ভাবছিল। এবার নীরদবরণকে ঘুম থেকে তুলে দিতে হবে। শেলী না হয় ছুটিতে থাকবে কিন্তু ঐ লোকটা তো অফিসে যাবে। নাকি যাবে না? যদি নীরদবরণও অফিসে ছুটি নেন, তাহলে শেলী একটা সিনেমা দেখার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করবে। পছন্দসই কোনও হোটেলে লাঞ্চ করলেই হবে। এরকম ভেবে শেলী নিজেই পুলকিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে নাসরিন উঠে এল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত মনে হল তাকে। উত্তেজনার ঝোঁকেই বোধহয় একটু হাঁফাচ্ছিল নাসরিন।

—ইয়েস নাসরিন হোয়াটস দ্য ম্যাটার?

—দো আদমি আয়া মাইজি।

—দো আদমি? হোয়াট ডু দে ওয়ান্ট? কাঁহাসে আয়া?

—হাওড়া সে।

—হাওড়া সে?

শেলী তাড়াতাড়ি নীচে নামল। আগন্তুক দুজনকে নাসরিন ড্রয়িংরুমে বসতে বলেছিল নিশ্চয়। কিন্তু তারা কেউ সোফাতে বসেনি। কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়েই আছে। শেলী অবাক হয়ে দেখছিল দুজনকে। একজন কে সে চেনে। ওর নাম ক্ষীরোদ। নীরদবরণের এলডেস্ট সান। আর একজনের বয়স অপেক্ষাকৃত কম। দুজনেই খর্বকায়। দুজনের পরনেই নতুন ধুতি। গায়ে জামা নেই। ধুতির মতনই দেখতে সাইজে ছোট আর এক বস্ত্র চাদরের মতন গায়ে চাপিয়েছে দুজনে। তার ওপর হালকা চাদর। দুজনের কেউই দাড়ি কামায়নি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে ওদের মুখময়। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। চিরুনি দেয়নি বোধহয়। এরকম পোশাক বাঙালিরা কখন গায়ে চাপায় শেলী জানে। .... When they are in mourning। যখন প্রিয়জন হারানোর শোকে তারা কাতর। ঐ ছেলেটিও নিশ্চয়ই নীরদবরণের আর এক পুত্র। নীরদবরণের সঙ্গে মুখের মিল আছে।

—হোয়াটস হ্যাপেনড ক্ষীরোদবাবু?

—আপনাকে বলে লাভ নেই। বাবা কোথায়?

হোয়ার ইজ মাই ফাদার? বাবাকে ডাকুন? কুইক? —বেশ রুক্ষভাবে ক্ষীরোদ বলল।

—ইওর ফাদার ইজ স্টিল স্লিপিং। হি ইজ নট ওয়েল। প্লিজ সিট ডাউন অ্যান্ড হ্যাভ সাম টি?

—চা খেতে আসিনি। বাবাকে বলতে এয়েচি এখন ফূর্তির সময় নয়। হি হ্যাজ লস্ট হিজ ওয়াইফ?

—ওহ মাই গড? ...হোয়েন? ...হাউ?

—বাবাকে ডাকুন তাড়াতাড়ি। উই আর রিয়েলি ইন এ হারি। —ক্ষীরোদ আবার রুক্ষভাবে বলল।

—কী হয়েছে শেলী? হোয়াটস দ্য ম্যাটার? হুম ইউ আর স্পিকিং টু? —বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে নীরদবরণ ড্রয়িং-রুমে এলেন। তার পরনে নাইট-গাউন। চুল উস্কোখুস্কো। খুব ফ্যাকাশে লাগছিল তাঁকে। ক্ষীরোদ এবং মেজ ছেলে বারীদবরণকে দেখে যেন চমকে উঠলেন তিনি।

—এ কী ব্যাপার? তোমরা? এসব কী পরেছ?

—এসব কখন পরতে হয় তুমি জানো না? —ক্ষীরোদের আজ কী হয়েছে? তার দু-চোখ জ্বলছে?

নীরদরণ ধপাস্ করে সোফার ওপর বসে পড়লেন। দুই হাতের চেটোয় মুখ ডোবালেন।

—মামার বাড়ির গ্রামে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। মায়েরও ম্যালোরিয়া হয়েছিল। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। ছোটমামা অনেক চেষ্টা করেচে। কিন্তু মাকে বাঁচানো যায়নি। গতকাল ভোররাতে সোনামুখী নিয়ে আসার সময় মায়ের মৃত্যু হয়। আমি গতকাল বিকেলে ফিরেচি। রাতের দিকে এ-বাড়িতে অনেকবার ফোন করেচি। কেউ ফোন ধরেনি। বুঝলুম তুমি ফুর্তিতে ডুবে আছ। খবরটা দিয়ে গেলাম। যদি পারো বাড়িতে চলে এসো। এখন আমরা চললুম।

ক্ষীরোদ আর বারিদ আর দাঁড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সারা জীবনে এই প্রথম বোধহয় ক্ষীরোদ বাবাকে প্রকাশ্যে অপমান করে কথা বলল। অন্যসময় হলে নীরদবরণ হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন। কিন্তু আজ কিছু বললেন না। দু-হাতের চেটোয় মুখ ডুবিয়ে বসে রইলেন।

সাতাত্তর

অবশেষে বিশ্বদেব সত্যিই ঝালদার পাট চুকিয়ে চলে এল। অনেকদিন, দীর্ঘ দশ বছর সে এখানে কাটিয়েছে। গালা কারখানার ধাপে ধাপে উন্নতি-উত্থান সে নিজের চোখের দেখেছে। সে জানে যে, অ্যারাতুন সাহেবের মতন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান পরিচালকের হাতে এই গালা কারখানার আরও অনেক উন্নতি হবে।

বিশ্বদেবকে বিদায় দিতে হবে বলে অ্যারাতুন সাহেবেরও মন খারাপ। এই বাঙালি বাবুকে তিনি খুবই বিশ্বাস করতেন। পুরো অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম দেখত বিশ্বদেবই। এছাড়া মামলা-মকদ্দমার জটিল বিষয়গুলোও সে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। মাসে দু-তিনবার সেই কাজে তাকে পাটনা ছুটতে হত। বিশ্বদেব চলে গেল অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যাবে। কিন্তু কী আর করা যাবে? বিশ্বদেব যখন মনস্থির করেই ফেলেছে যে ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্যে সে কলকাতায় ফিরে যাবে তখন অ্যারাতুন সাহেব তাকে বাধা দিতে চাননি। এমনকী কলকাতায় আরমেনিয়ান কলেজে কিংবা চার্চে বিশ্বদেবের চাকরিও ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন। চার্চের ফাদারকে লেখা অ্যারাতুন সাহেবের একটি চিঠিই এ ব্যাপারে আসল ছিল। বিশ্বদেবের সম্বন্ধে সেই চিঠিতে এত ভাল ভাল কথা লেখা ছিল যে, চার্চের ফাদার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পছন্দ করে ফেলেন। সবই ঠিকঠাক এগিয়ে গেল। বিদায়ের দিনটিও একদিন এসে গেল। আর সেদিনই যেন বিশ্বদেব বুঝতে পারল যে, ঐ জায়গাটার প্রতি কবে থেকে যেন তার প্রবল মায়া জন্মে গেছে?

শাশুড়ি যূথিকা মারা গেছেন আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার একদিনের মধ্যে বিশ্বদেব সপরিবার হাওড়াতে রওনা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষীরোদের মুখে সে সবিস্তারে সব শুনেছে। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার পাল্লায় পড়েছিলেন যূথিকা। ঐ রোগ হলে মৃত্যু অনিবার্য। এখন মনে হচ্ছে হাওড়ার বাসা ছেড়ে বাপের বাড়ির গ্রামে যাওয়াই কাল হয়েছিল যূথিকার।

জাপানি বোমার হাত থেকে বাঁচতে তিনি নিজের জন্মস্থানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকে তো তিনি এড়াতে পারলেন না। বোমা পড়ার ভয়টাও বোধহয় অমূলক ছিল। কোথায়? কলকাতায় তেমনভাবে বোমা তো পড়ল না? জাপানি বিমানের ঝাঁক রাতের পর রাত শুধু কলকাতার আকাশে হানা দিয়ে গেল মাঝে মাঝে। কিন্তু উত্তর কলকাতায় একটা ছোটখাটো বোমা ফেলা ছাড়া আর কোনও বড় ধরনের উৎপাত তারা করেনি। তাহলে যূথিকা কেন ভয় পেয়ে কলকাতা ছাড়লেন? যদিও মৃত্যুর মতিগতির ব্যাপারে মানুষের কোনও হাত নেই, তবুও বিশ্বদেবের ধারণা সাত-তাড়াতাড়ি অতদূরের গাঁয়ে না গেলে যূথিকার ম্যালেরিয়াও হত না আর মৃত্যুও তাঁকে অত সহজে আক্রমণ করতে পারত না। এ ব্যাপারে অবশ্য নীরদবরণের ভূমিকাকেও বিশ্বদেব ছোট করে দেখতে রাজি নয়। যূথিকাকে নীরদবরণ স্বামী হিসেবে বোঝাতে তো পারতেন! তিনি সাহস দিলে তাঁর স্ত্রী হয়ত অতটা ভয় পেতেন না। হাওড়ার বাড়িতেই থেকে যেতেন। কিন্তু নীরদবরণ তাঁর সরলমতি স্ত্রীকে বোঝাবার কিংবা সাহস জোগাবার কোনও চেষ্টাই করেননি। যূথিকাকে নিজের বাপের বাড়ির গ্রামে তিনি নির্দ্বিধায় যেতে দিয়েছেন। কেন? স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনও টানই কি কোনওদিন ছিল না? বরাবর তিনি নিজের সাদামাটা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করেছেন, উপেক্ষা করেছেন। যাবতীয় সামাজিক নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলেছেন সেই ট্যাঁশ মাগীটার সঙ্গে! মাঝে মাঝে বিশ্বদেবের মনে হয় তার শ্বশুর একটা ক্রিমিন্যাল। নিজের সুযোগ-সুবিধা নিয়েই লোকটা বরাবর ব্যস্ত হয়ে রইল। ভোগী, স্বার্থপর মানুষ। নিজের আত্ম অহমিকাকে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত করা ছাড়া তিনি আর কোনও কাজকে গুরুত্ব দেন না। হয়তো তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন যূথিকা দূরে চলে যান। সেক্ষেত্রে সেই নোংরা মাগীটার সঙ্গে তাঁর বেলেল্লাপনা আরও ভাল জমবে এটা নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন।

যূথিকার শ্রাদ্ধের দিন নীরদবরণকে দেখে মনে হয়নি তিনি শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। যখন একতলার ঢাকা দালানে যূথিকার সন্তানেরা, মূলত ক্ষীরোদই ছেলেদের মধ্যে বড় হিসেবে তাদের মায়ের শ্রাদ্ধের কাজে ব্যস্ত, তখন দোতলার ঘরে চুপচাপ একা বসেছিলেন নীরদবরণ আর পাইপ টানছিলেন। বিশ্বদেব একবার দোতলাতে গিয়েছিল। সে ঘরে ঢুকতে নীরদবরণ না তাকিয়েই বলেছিলেন—কিছু বলবে বিশ্বদেব?

—আপনি নীচে চলুন। ওখানে চেয়ার পাতা আছে। বসে থাকবেন। স্ত্রীর শ্রাদ্ধ চলাকালীন আপনার তো সেখানে উপস্থিত থাকার কথা?

—উপস্থিত থাকার কথা? ...এরকম কোনও নিয়ম আছে নাকি?

—নিয়ম হয়তো নেই।... কিন্তু সামাজিকতার বোধ থেকে তো মানুষ তাই করে...।

—আমাকে সামাজিকতা শিখিয়ো না বিশ্বদেব। স্ত্রীর মৃত্যুতে আমারও শোক হতে পারে। হওয়াটা তো স্বাভাবিকই। কিন্তু সেই শোক বহন করা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। পাবলিকের কাছে বা আত্মীয়স্বজনদের কাছে ডিসপ্লে করাটা কোনও কাজের কথা নয়। বুঝেছ?

বিশ্বদেব থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে নীরদবরণ এত সোজাসুজি কথা বলেন যে অবাক লাগে। লোকটাকে অনেকদিন দেখছে বিশ্বদেব। অহঙ্কার শুধু অহঙ্কার! ইংরেজিতে যাকে বলে ইগোইস্ট! নীরদবরণ একজন ইগোইস্ট ছাড়া আর কী? বিশ্বদেব নীচে নেমে যাচ্ছিল। নীরদবরণ তাঁকে দাঁড়াতে বললেন। সেই আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই বিশ্বদেবের। তাকে দাঁড়াতে হল। যদিও মুখে যথেষ্ট অবজ্ঞা নিয়ে সে বলল—আবার কী বলবেন?

—সুবুর ব্যাপারে কী ঠিক করলে?

—কিছু না।

—কিছু না মানে?

—কিছু না মানে কিছু না। নতুন করে আর ঠিক করার কী আছে? আপনি জোর করে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আর তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের, ওর মা আর বাবাকে।

—ভুল করছ বিশ্বদেব? ...ভেবে দেখো....

—কীসের ভুল? ভুল তো যা করার আপনি করেছেন?

—জানি চিরকাল তোমরা আমাকেই দোষারোপ করে যাবে। কিন্তু তাতে কোনও লাভ নেই। অন্তত সুবুর কোনও লাভ নেই। বিবাহিত মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত। ওর গোঁয়ার্তুমিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কথাটা ভেবে দেখবে আশা করি।

বিশ্বদেব কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

তারপর বলল—ভেবে দেখব।

শ্রাদ্ধের পরের পরের দিন নিয়মভঙ্গ। আমিষ খেয়ে এবং নিমন্ত্রিতদের খাইয়ে অশৌচের নিগড় থেকে মুক্তি পেতে হবে। আগের দিন সন্ধেবেলা নীরদবরণ ছেলেদের, মেয়েদের এবং জামাইদের ডেকে পাঠালেন।

—সবাই শোনো। উনি মানে তোমাদের মা যা যা খেতে ভালবাসতেন সেসব যেন আগামিকাল সকালের মেনুতে রাখা হয়।

—আমরা তো মেনু ঠিক করেচি। সেটা আপনি শুনুন। তারপর যদি বাড়তি কিছু বলতে হয় তাহলে হালুইকরকে বলে দিলেই হবে। —ক্ষীরোদ জানায়।

—কী মেনু করা হয়েছে শুনি?

—ভাতের সঙ্গে শুক্তো, মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল, বেগুনি, পাবদা মাছের ঝাল, কই মাছের কালিয়া, চাটনি, দই, মিষ্টি....

ক্ষীরোদ গড়গড়িয়ে বলে গেল। নীরদবরণ চোখ বুজিয়ে শুনে গেলেন। কোনও কথা বলছেন না। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। এভাবে চুপচাপ থাকার কারণই বা কী আছে? নীরদবরণের সামনে এলে বাড়ির সকলের এরকম কুঁকড়ে যাওয়া ব্যাপারটা বিশ্বদেবের একেবারেই পছন্দ নয়।

সে বলল—মেনু ঠিক আচে?

—নাহ ঠিক নেই। আরও কিছু অ্যাড করতে হবে। তোমরা তাঁর ছেলেমেয়ে হতে পারো কিন্তু কী কী খেতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন সেসব দেখছি তোমরা জানো না।

—একটা খাবারের কথা মনে পড়েচে....বলব বাবা? স্কুলবালিকাদের মতন হাত তুলল সুনীতি।

—হ্যাঁ। বল?

—পোস্তর বড়া.... খুব পছন্দ করতেন মা!

—ঠিক বলেছিস। তার সঙ্গে আরও কয়েকটা আইটেম জেনে নাও বিশ্বদেব। হালুইকরকে বলে দেবে।

—বলুন?

—মোচার ঘন্ট, কুমড়োফুলের বড়া আর লাউ চিংড়ি। এর প্রত্যেকটাই খুব প্রিয় ছিল তোমাদের মায়ের।

নীরদবরণের নির্দেশ মতো সব কটি পদই মেনুর অন্তর্ভুক্ত করা হল। বিশ্বদেবের মনে হয়েছিল আত্ম-অহঙ্কারী নীরদবরণের মনের নরম দিকের একটা পরিচয় অন্তত পাওয়া গেল। স্ত্রীকে তিনি বরাবর ছোট করে দেখেছেন। তাঁর মতামতের কোনও গুরুত্ব কোনওদিন দেননি। তাঁর দিকে নীরদবরণের এমন কিছু মনোযোগও হয়ত ছিল না। একসঙ্গে থাকতে হয় তাই থাকা। একটা

অপ্রয়োজনীয় পুঁটলির মতন যূথিকা সংসারের একপাশে পড়ে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর মৃত্যুর পর নীরদবরণ হয়ত কিছুটা ভাবছেন স্ত্রীর কথা। স্মৃতিমেদুরতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তারই নিদর্শন যূথিকার পছন্দের খাদ্যের তালিকা সকলকে ডেকে বলো।

নিয়মভঙ্গের পালা মিটল নির্বিঘ্নে। আত্মীয়স্বজনরা সবাই প্রায় এসেছিল। যূথিকার নিজের বাড়ি থেকে এসেছিল সুরেন আর রমা। বরেনের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সে হয়তো হিমালয় কিংবা হরিদ্বারে মন দিয়ে পরমাত্মার সন্ধান করে চলেছে। তার কোনও ঠিকানাই সুরেনের কাছে নেই। বোনের মৃত্যুর খবর বরেনকে দেওয়া যায়নি।

বিশ্বদেবের ঝালদাতে ফেরার ট্রেন-টিকিট কাটা ছিল। নিয়মভঙ্গের পর দিনই তাকে সপরিবারে ফিরতে হবে। দিদুর মৃত্যুতে শুভ্রাও বেশ ভেঙে পড়েছে। ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সারা বাড়ি। ওকে দেখলেই বিশ্বদেবের বুকটা আজকাল ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তার শ্বশুর হয়তো ঠিকই বলছেন। মেয়ে বিবাহিতা হলেও শ্বশুরবাড়ি যাবে না, স্বামীর ঘর করবে না এটা অস্বাভাবিক। এভাবে ওর জীবনটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু করাই বা যাবে কী? শুভ্রা যেমন মুখ ফুটে কোনওদিন বলে না সে শ্বশুরবাড়ি যাবে; তেমনই মেমারি থেকেও ওরা কোনওদিন খোঁজ নেয় না। সতীশবাবু হয়ত সত্যিই নিজেকে অপমানিত মনে করেন। মনীশকেও শুভ্রার হাতে অকারণে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। মনীশের মনও হয়তো ঘুরে গেছে। অথচ তার ঠিকানা এখন হাওড়ার এই বাড়ি থেকে কাছাকাছি। বাড়ি থেকে কাছাকাছি। এই তো শিবপুরে মনীশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। সেই বিশাল বোটানিকাল গার্ডেনের পাশে সেখানে একবার গিয়ে মনীশের খোঁজ করলে কেমন হয়? এই কথা মাঝে মাঝে মনে হয় বিশ্বদেবের। পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সংযত করে। ওদের কাছে নিজেকে নামাতে পারবে না সে। তারও আত্ম-অহমিকা কিংবা আত্মসম্মানবোধ খুব একটা কম নয়। দরকার হলে সারাজীবনই না হয় মেয়ে তার কাছে থেকে যাবে। তাই বলে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার জন্যে সে সতীশবাবুদের হাতে-পায়ে ধরতে পারবে না। তবে শুভ্রার মধ্যে এই কদিনে বিশ্বদেব কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছে। মেয়েটাকে যেন আগের থেকে অনেক চুপচাপ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আর বিনীত মনে হয়। কথাবার্তা অনেক সংযত। চড়া স্বরে কথা প্রায় বলেই না। কীরকম যেন ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়ে উঠেছে মেয়েটা। জীবন কি ওকে ক্রমশ অভিজ্ঞ করে তুলছে? মনীশের সঙ্গে ওর ব্যবহারে যে অনেক ভুল ছিল এটা কি 'সুবু' ক্রমশ বুঝতে পারছে? এই ধারণা দৃঢ় হল বিশ্বদেবের যখন স্ত্রী সুনীতি তাকে রাতে বিছানায় শুয়ে একটা খবর জানাল।

—ওগো শুনচ? অন্ধকারে বিছানায় সুনীতি মৃদুভাবে ডেকেছিল।

—কী হল?

—সুবু অনেক বদলে গেচে....

—বদলে গেচে?... মানে?

—হঠাৎ আমাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করল...

—কী জিজ্ঞেস করল?

—বলল—মেমারি থেকে ওরা কোনও খোঁজ নেয় না কেন?

—তাই নাকি? তা তুমি কী বললে?

—আমি আর কী বলব? হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। মেয়ের মতিগতি বুঝতে চেষ্টা করছিলুম।

—খোঁজ নেওয়ার কথা ও বলে কীভাবে? নিজেই তো খারাপ ব্যবহার করে তাদের তাড়িয়েচে।

এখন কত ধানে কত চাল বুঝুক! গেরস্থের ঘরে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের ওভাবে বসে থাকা যে কত অপমানের এখন বুঝুক!

—ওগো তুমি একদিন সতীশবাবুদের সঙ্গে কথা বলো....

—আমি পারব না। অপমানিত হব। ওরা যদি নিজে থেকে কোনওদিন খোঁজ নেয় দ্যাখা যাবে। সে রাতে আর কথা বেশি এগোয়নি। বিশ্বদেবের চোখে একসময় ঘুম এসে গিয়েছিল। সুনীতি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তার জানা নেই।

নীরদবরণের গলার অসুখের কথা বাড়ির কেউ তেমন জানত না। কাউকে বলার দরকার মনে করেননি নীরদবরণ। একমাত্র শেলী জানে তিনি মাঝে মাঝে কতটা কষ্ট পান গলার অজানা অসুখে। কিছুদিন আগে, যূথিকা মারা যাবার রাতেই সম্ভবত, তিনি যে শেলীর বাড়িতে বেসিনে রক্ত বমি করেছিলেন সে খবরও এ-বাড়ির কেউ রাখে না। শেলী বলেছিল ভাল কোনও ডাক্তারকে দিয়ে গলাটা এগজামিন করিয়ে নিতে। সে নিজে যে মিলিটারি হাসপাতালে নার্সের চাকরি করে সেখানেও নীরদবরণকে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু পরদিন সকালেই স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নীরদবরনের সব রুটিন ওলোটপালোট হয়ে গেল। তিনি অফিস থেকে দিন পনেরোর ছুটি নিলেন। শেলীর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করলেন। ডাক্তারের কাছেও যাওয়া হল না।

যূথিকার মৃত্যুসংক্রান্ত নিয়মভঙ্গের পরদিন দেখা গেল নীরদবরণ খুব কাশছেন। কথা বলতে তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল। গলা ভেঙে গিয়েছিল। বিশ্বদেবের ট্রেন রাতের দিকে। তার একবার মনে হয়েছিল বড় মেয়েকেও ঝালদাতে নিয়ে যাবে। আর তো কোনওদিন যাওয়া হবেই না। ঝালদা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সে তো চলেই আসছে। কিন্তু শুভ্রার মধ্যেও সে ঝালদাতে যাবার কোনও উৎসা দেখল না।

—তুমি তো চলেই আসছ বাবা। আমি আর গিয়ে কী করব?

—চাকরি ছেড়ে এখানে এসে কি এ বাড়িতেই থাকবে?

—সেরকম কোনও ইচ্ছে নেই।—বিশ্বদেব বলেছিল।

—তাহলে?

—দেখা যাক। একটা বাড়ি ভাড়া নেব। তুইও থাকবি আমাদের সঙ্গে...

—ক্ষীরোদমামা বলছিল এখন বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব সোজা। বোমার ভয়ে অনেকে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। তাই অনেক বাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে।

—ঠিকই বলেচে ক্ষীরোদ। ওকেই বলেছি একটা ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে।

সন্ধের দিকে বিশ্বদেব নীরদবরণের ঘরে গিয়ে হাজির হল। ঘরের আলো নেভানো নীরদবরণ চুপচাপ অন্ধকারে শুয়ে ছিলেন। মাঝেমাঝে কাশছিলেন। একবার কাশি শুরু হলে যেন আর থামতে চাইছিল না।

—আপনার কি শরীর খারাপ? বিশ্বদেব জিগ্যেস করল।

—তা একটু খারাপ বলতে পারো...

—ট্রাবলটা কী?

—গলায়, আলজিভের নীচে একটা ঘা হয়েছে।

—ঘা?...সেটা তো ভাল কথা নয়।...ডাক্তার দেখছেন?

—হ্যাঁ। আমার নিজেরই বন্ধু। চেতলার দিকে থাকে।

—কী বলচেন তিনি?

—বলছেন একটু সময় লাগবে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ চলছে।

—কিছু মনে করবেন না...আপনার শরীরটা কিন্তু আগের থেকে খারাপ হয়ে গেচে...

—হোয়াট ডু ইউ মিন?

—রোগা হয়ে গেছেন আপনি। মুখ চোখ বসে গেচে। ইউ আর লুকিং সিক।

নীরদবরণ কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। শরীর খারাপ নিয়ে আলোচনা তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। তাঁর দিকে কেউ মনোযোগ দিচ্ছে এটাও তাঁর পছন্দের নয়। তাও তো এরা জানে না, শেলীর বাড়িতে দুদিন গলা থেকে রক্তস্রাব বের হবার কথা। শেলীও তাঁর শরীর নিয়ে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল। সে যে মিলিটারি হাসপাতালে কাজ করে সেখানকার ডাক্তারকে দিয়ে তাঁকে চেক-আপ করিয়ে নিতে চেয়েছিল। নীরদবরণ পাত্তা দেননি। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস যে, গলার ট্রাবলটা এমন কিছু নয়। তাঁর বন্ধু-ডাক্তার যা বলেছে তাই। ওটা একটা কারবাংকল, ফোঁড়া। একটু ভোগাচ্ছে এই যা। নিয়মিত ওষুধ খেলে এবং গলাকে একটু বিশ্রাম দিলে ঠিক কমে যাবে। ধূমপান অবশ্য একেবারেই বারণ। আর মদ্যপানও নাকি বেশি করা যাবে না। ধূমপান কমিয়েছেন তিনি এটা ঠিক। কিন্তু একেবারে বন্ধ করলে হাঁফিয়ে ওঠেন। পারেন না। পাইপ টানা ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। এখন ডানহিল কিং সাইজ দশটার প্যাকেট কেনেন। সারাদিন দশটার বেশি টানেন না। আর মদ্যপান, হ্যাঁ, সেটাও যে একেবারে কমাতে পারেননি তা বলা যাবে না। বন্ধু ম্যাকেঞ্জি যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন ম্যাকেঞ্জি নেই। সঙ্গীর অভাব। সঙ্গীর অভাব হলেও মদ্যপান কমে যায়। তবে লাঞ্চের সময় কমপক্ষে দু-পেগ হুইস্কি এবং ডিনারের আগে দু-পেগ এটা প্রাত্যহিকতার মধ্যেই পড়ে। তাকে অবশ্য ঠিক মদ্যপান বলে না। মেডিকেটেড ডোজ। এটুকুতে নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতি হবার কথা নয়। বিশ্বদেব এখনও মুখের সামনে বসে আছে। ও তো আজ চলে যাবে। হ্যাঁ ভদ্রতাবশত কিছু কথা তো বলা উচিত।

—আজ তোমার ট্রেন কটায়।

—রাত সাড়ে দশটা।

—আই সি।...তাহ'লে ঝালদার পাট চুকিয়ে চলে আসছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর্মেনিয়ান কলেজে কবে জয়েন করছ?

—ফার্স্ট মার্চ।

—থাকবে কোথায়? এ বাড়িতে তো?

—আজ্ঞে না। একটা বাড়ি ভাড়া করব।

—তার কী দরকার ছিল? এ বাড়িতে এত ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। তোমার তো দুটো ঘরে হয়ে যাবে। সে ঘর তো আছে এ বাড়িতে?

—তবুও। ভাবলুম একটা বাড়ি ভাড়া করাই ভাল। ফ্রিলি থাকতে পারব। হয়তো কাছাকাছিই হবে। ক্ষীরোদ খুঁজছে ভাড়া বাড়ি।

—দ্যাখো, যা ভাল বোঝো করো। তোমার তো আবার সব ব্যাপারে নিজের মত আছে। আমি বললেই তো তুমি শুনবে না...। আজকাল আমার কথা আর কেই বা শোনে? সবাই নিজের নিজের মত অনুযায়ী চলতে চাইছে...।

এই কথাটায় খোঁচা ছিল। বিশ্বদেব সেটা গায়ে মাখল না। এই কথার উত্তর দিতে গেলেই বাদ-প্রতিবাদ শুরু হবে। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে উত্থাপন করলেন নীরদবরণও।

—যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ভাল ঠেকছে না। খবর-টবর রাখো?

—জার্মানি পিছু হঠছে।

—রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে যা মারটা খেয়েছে হিটলার, সামলাতে সময় লাগবে।

—সেদিন স্টেটসম্যানে দেখছিলাম লিখেচে যে, হিটলারের এগেনসটে স্টালিন, রুজভেল্ট আর চার্চিল এক হচ্ছে।

—হ্যাঁ। তাই যদি হয় তাহ'লে হিটলারের বিপদ। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উইল টেক আ টার্ন ভেরি সুন, নাউ হিটলার ইজ অন দ্যা ব্যাক স্টেজ।...কিন্তু আমি ভাবছি অন্য এক বিপর্যয়ের কথা...

—কী বিপর্যয়?

—মনে হচ্ছে খারাপ দিন আসছে। দুর্ভিক্ষ লেগে যাবে। বাজারে চাল-গম নাকি উধাও হয়ে যাচ্ছে। সব মজুদদারদের কারসাজি। আর চিফ মিনিস্টার ফজলুল হক এবং গভর্নর জন হারবার্ট যেভাবে ব্যাপারগুলোকে দেখছে তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ছে। দেখলে না ফিনান্স মিনিস্টার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিজাইন দিলেন? ঠিকই করেছেন উনি।

আলোচনা হয়তো আরও এগোত। কিন্তু এইসময় সুনীতি ডাক দিল—ওগো শুনচ? বিশ্বদেব বলল—যাই। আবার বেরোবার তোড়জোড় করতে হবে।

—সুবু তো থেকে যাচ্ছে? নাকি সেও ছুটছে ঝালদায়?

—নাহ—সুবু এ বাড়িতেই থাকচে...।

ঝালদা থেকে পরিবারকে নিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে আসবার আগের দিন অ্যারাতুন সাহেব লাঞ্চ খাবার নেমতন্ন করলেন সবাইকে। ফেয়ারওয়েল লাঞ্চ। সুনীতিকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া গেল না। সাহেবদের বাড়িতে কিংবা তাদের বাড়িতে রান্না খাবার সে মরে গেলেও খাবে না। ওরা যে গরুর মাংস খায়?...ম্যাগো ওদের বাড়িতে জলস্পর্শ করা যায়? জাত চলে যাবে। বিশ্বদেব অনেক বোঝালেও সুনীতি বুঝল না। এক গোঁ ধরে রইল। অন্য সব ব্যাপারে সে বড় বাধ্য। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তাকে টলানো গেল না। অগত্যা কী আর করা যাবে। বিশ্বদেবের ছেলেমেয়ের হাত ধরে সাহেবের বাড়িতে গেল নেমতন্ন রক্ষা করতে। ছেলেমেয়েরা ঐ ম্লেচ্ছ বাড়িতে খেতে যাক এটাও সুনীতি চায়নি। কিন্তু বিশ্বদেবের থমথমে মুখ দেখে সেটা বলতে সাহস পেল না।

অ্যারাতুন সাহেবের স্ত্রী কিছুদিন আগে বিলেত গেছেন ছেলেমেয়েকে দেখতে। একবার গেলে তিনি সহজে এই বুনো জায়গায় ফিরতে চান না। অ্যারাতুন সাহেব একাই ছিলেন। তাঁর বাবুর্চি সব রান্না করেছে। বিশ্বদেবের পরিবার খাবে। তাই একেবারে বাঙালি রান্না। ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, পটলের দোলমা। তার সঙ্গে অবশ্য পুডিং আছে। স্ত্রী না আসার কারণ স্বরূপ বিশ্বদেবকে মিথ্যে কথা বলতে হল। তার স্ত্রীর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। শুনে সাহেব উদ্বিগ্ন হলেন। বিশ্বদেব নিজে ও তার ছেলেমেয়েরা বেশ তৃপ্তি করে খেল। যদিও টেবিলে খেতে তাদের খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ তারা তো মাটিতে আসন পেতে খেতে অভ্যস্ত।

সাহেবের বাড়ি থেকে চলে আসার সময় তিনি ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একটা করে টফির বাক্স দিলেন। সেই টফির বাক্স খাস বিলেত থেকে আনা হয়েছে। আর বিশ্বদেবের হাতে তিনি দিলেন একটা খাম। তাতে তিন হাজার টাকা। ১৯৪৩ সালে তিন হাজার টাকার অনেক দাম।

বিশ্বদেব নিতে আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ সাহেব তো তার পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দিয়েছেন।

সাহেব শুধু বললেন—প্লিজ অ্যাকসেপ্ট, ইট বাবু। ইটস অ্যা টোকেন অব গ্র্যাটিটিউড ফর দ্য সার্ভিসেস ইউ হ্যাভ রেনডারড টু মাই ফ্যাক্টরি...।

ঝালদা থেকে সাহেবের গাড়িতে আদ্রা স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন ধরতে হবে। গাড়িতে ওঠার সময় বিশ্বদেবরা দেখল কাতারে কাতারে দেহাতী মানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে তাদের বিদায় জানাতে। এরা কেউ গালা কারখানার কর্মী, কেউ বা শুধুই এলাকার বাসিন্দা। বিশ্বদেবের চোখে জল এসে গেল। এত মানুষ তাদের ভালবাসত?...

আটাত্তর

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বাংলার শাসনভার ছিল কোয়ালিশন সরকারের হাতে। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ফজলুল হক। সরকার যে খুব ভাল চলছিল তা বলা যাবে না। জোট সরকারের কপালে স্থায়িত্ব আর কবে রইল? প্রায়ই চলছিল শরিকদের মধ্যে মতবিরোধ, গন্ডগোল। বিশেষত ফজলুল হকের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একেবারেই বনিবনা হচ্ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় খামখেয়ালিপনা এবং সিদ্ধান্তের সবথেকে বড় সমর্থক ছিলেন বাংলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মতবিরোধ এমনই তুঙ্গে উঠল যে, ১৯৪২ সালের ১৬ নভেম্বর শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সেই পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রীর চটজলদি অনুমোদন পেল এবং গভর্নর তা গ্রহণও করলেন। ক্রমশ বাংলা যে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছেন তা বোধহয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও উপলব্ধি করেননি।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর ১৪ ও ১৫ তারিখ দিল্লীতে খাদ্য-সম্মেলন (food conference) অনুষ্ঠিত হল। খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের অবস্থাটা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করাই ছিল এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। নানা রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা, সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার সারা ভারতবর্ষে খাদ্য সংক্রান্ত কোনও সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কি না সেটাই বুঝে নিতে চাইছিল। সেই সমাবেশে বাংলার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ঘোষণা করলেন—'বর্তমানে আমাদের চালের জোগান একটু কম আছে বটে, কিন্তু আগামী কয়েক মাস আমরা চালিয়ে নিতে পারব ; বাইরে থেকে চাল আমদানি করার দরকার আছে বলে মনে করি না। বরং অন্য রাজ্য থেকে গম পাঠালে ভাল হয়।'

মাত্র কয়েক মাস পর, ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ ফজলুল হকের সরকার গদি ছেড়ে চলে গেল। বাংলায় অরাজকতা চলছে। দোকানে-বাজারে চাল-গমের জোগানেও যেন ক্রমশ টান পড়ছে। কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্বে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁরা তো কোথাও কোনও সমস্যা দেখতে পাচ্ছিলেন না? ১৯৪৩-এর মে মাসের ৪ তারিখে অসামরিক দপ্তরের (Civil Supplies) একটি প্রেস নোটে ইংরেজিতে যা ঘোষণা করা হ'ল তার বাংলা তর্জমা করলে তা এরকম দাঁড়ায়—'খাদ্যশস্যের জোগানে টান পড়ার কোনও কারণ বা আশঙ্কা কিছুই নেই।'

কিন্তু প্রশাসনিক বিবৃতি যাই হোক, বাস্তব অবস্থাটা ক্রমশ যেন ভীষণ হয়ে উঠছিল। মানুষ যাতে ভয় না পায়, কোথাও জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে কোনও অশান্তির সৃষ্টি যাতে না করতে পারে, তার জন্যে প্রশাসনের মাথাব্যথার যেন অন্ত নেই। বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল, কোথাও কোনও খাদ্যশস্যের সংকট নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাস্তায় রাস্তায় কাতারে কাতারে ভুখা মানুষের

মিছিল দেখা যাচ্ছিল কেন? কেনই বা গ্রামে-গঞ্জে, শহরে কিংবা অফিস এবং আদালত-চত্বরে কান পাতলেই শুধু শোনা যাচ্ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের কাতর আর্তনাদি—ভাত দ্যাও গো...ফ্যান দ্যাও গো... —এট্টু ফ্যান...

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষ কিংবা মহামারী ঘোষণা করার কোনও উদ্যোগ নেই কিন্তু অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। রেশনের দোকানে চাল, গম মিলছে না। বাজারে কিনতে গেলে এত চড়া দাম হাঁকা হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ, বিশেষত গরিব মানুষ তা কিনতে অপারগ। গ্রাম থেকে না-খেতে-পাওয়া মানুষের মিছিল শহরে চলে আসছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দরজা-জানলা খোলা রাখতে ভয় পায় ; কারণ তাহলেই নজরে পড়বে রুগ্ণ, হতশ্রী মায়ের কোলে হাড়-জিরজিরে, নেতিয়ে-পড়া শিশু, আর কানে আসবে কাতর অনুরোধ—এট্টু ভাত দ্যাও মা...এট্টু ফ্যান...।

১৯৪৩-এর জুলাইয়ে অবস্থার আরও অবনতি হল। চাটগাঁতে প্রথম বেঙ্গল কাউন্সিল সরকার লঙ্গরখানা খুলতে বাধ্য হল। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরিদের সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য ছিল—"They can be looked after by the charitably disposed people there."। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বুভুক্ষু মানুষের ছবি ছাপা হতে লাগল একের পর এক। অমৃতবাজার পত্রিকার ছবি—মানুষ, কুকুর এবং গরু রাস্তার একই ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে। এই ধরনের ছবি ছাপবার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা লেগে গেল। হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে ছবি ছাপা হল এরকম—রুগ্ণ মা আর শিশু মৃতপ্রায় অবস্থায় ডাস্টবিনের পাশে শুয়ে আছে। আর যুগান্তরে ছাপা হ'ল এরকম এক ছবি—কঙ্কালসার মা তার কঙ্কালসার শিশুকে রাস্তার নর্দমা থেকে খাবার তুলে খাওয়াচ্ছে। সরকারিভাবে ঘোষণা না হলেও বস্তুত বাংলায় শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর মহামারী। এই মহামারী মজুতদার এবং ফাটকাবাজদের সৃষ্টি। খাদ্যশস্য গুদামে লুকিয়ে রেখে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হল। উদ্দেশ্য চাহিদা বাড়ানো এবং সেই অস্বাভাবিক চাহিদা মেটাবার ছলে বেশি বেশি মুনাফা করা। চালের দাম হু হু করে প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে। উপায়ান্তর না দেখে সরকার চালের দাম বেঁধে দিল। এক মণ চালের দাম ২৬ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। কিন্তু তাতে আর কী লাভ? ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য স্টেটসম্যানে লেখা হল যে, ২৬ টাকা কেন তার দ্বিগুণ দাম দিতে রাজি হলেও বাজারে চাল মিলছে না। কৃত্রিম অভাব যে কী ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে এই খবরই তার প্রমাণ।

একদিন বিকেলে হাওড়ায় বাস চলাচল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ একই। চালের আকাল। কন্ট্রোলের দোকানে সকাল থেকে মানুষ থলি হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। দু-একজনকে চাল দেওয়াও হচ্ছিল। হঠাৎ দোকানদার ঘোষণা করল যে আর চাল বিক্রি করা যাবে না। কেন? বিক্রি করা যাবে না কেন? দোকানে যা চাল মজুত আছে, তা দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইয়ের চাহিদা মেটানো যাবে না। তালা পড়ে গেল দোকানে। আর যায় কোথায়? অপেক্ষমান জনতা রাগে ফুঁসে উঠল। শ দুয়েক মানুষ অপেক্ষমান। এমনিতেই সকাল থেকে ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ছিল অন্তত একমুঠো চাল কিনতে পারবে এই আশায়। কিন্তু দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। দোকানের বন্ধ দরজায় পড়তে লাগল ইটের পর ইট। কেউ কেউ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে দোকানদারকে বাইরে টেনে আনতে চাইল। দুজন ছিল দোকানে। কিন্তু তাদের পাওয়া যায় নাকি? তারা ততক্ষণে পগার পার। তখন অবস্থার আরও অবনতি হল। দোকানের দরজা ভেঙে যা চাল আর গম ছিল তা লুটপাট হতে লাগল অবাধে। ইতিমধ্যে পুলিশ

এল। পরনে হাফপ্যান্ট, চাপকান আর লাল পাগড়ি। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এল তারা। কারও মাথা ফাটল, কারোর হাত ভাঙল, কেউ রাস্তায় শুয়ে কাতরাতে লাগল। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল পুলিশ। দোকানের সামনে উত্তেজনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হলেও পুলিশের লাঠি চার্জের খবর শহরের অন্যান্য জায়গাতেও দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ল। আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। মানুষ খেতে পাবে না। পয়সা দিলেও বাজারে চাল মিলবে না। আবার তার ওপর পুলিশের লাঠি খেতে হবে? এসব ক্ষেত্রে যা হয়। জনতার সব রোষ গিয়ে পড়ে প্রশাসনের ওপর। আর সেই রোষের বহিঃপ্রকাশ সেই তখন থেকেই ঘটে যানবাহন পোড়ানোয়। হাওড়ায় বঙ্গবাসী সিনেমার কাছে বাস পুড়ল একটা। একটা গোরুর গাড়িতে বাজারে শাক-সবজি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সামগ্রী তো লুঠ হলই। তার ওপর গোরুর গাড়িটাকে ভেঙে রাস্তার মধ্যিখানে ফেলে রাখা হল। গাড়োয়ান এবং নিরীহ দুটো গোরু কোথায় যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল তার খবর কে রাখে?

বউ-বাজারে সাইকেলের দোকানে তদারকিতে এসেছিল ক্ষীরোদ। ইদানীং তার উড়ু উড়ু ভাব কিছুটা গেছে। সংসারে মন হয়েছে তার। দোকানেও। তার স্ত্রী বন্দনা দ্বিতীয়বার সন্তানসম্ভবা। নাটক আজকাল সুযোগ পেলেই দেখতে ছাড়ে না ক্ষীরোদ। কিন্তু অভিনেতা হবার শখ কবে যেন তার ঘুচে গেছে। দোকানের খাতাপত্র দেখে ট্রামে হাওড়া এল ক্ষীরোদ।

হাওড়া স্টেশনে এসে ক্ষীরোদের অনুমান হ'ল কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে। কারণ রাস্তাঘাটে লোক চলাচল প্রায় করছে না। কীরকম একটা শুনসান ভাব। দোকানগুলো বন্ধ। একটাও বাস নেই। সবসময় যে ক্ষীরোদ বাসে যাতায়াত করে তা নয়। সারাদিনে এ-লাইনে কটা আর বাস চলে। চললেও তা যখন-তখন বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাড়ি ফেরার জন্যে দুটো পা-ই ভরসা। এছাড়া একটা উপায় আছে। ঘোড়ার গাড়ি। তো আজকে তারাও সব চুপচাপ সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল। হ্যাঁ তাই তো। ক্ষীরোদ তাকিয়ে দেখল। হাওড়া স্টেশনের পশ্চিমদিকে গঙ্গার ঘাটের ধারে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চাকা বন্‌ধ। কোচোয়ানরা এধার ওধার বসে বিড়ি টানছে। ঘোড়াগুলোকে যা ঘাস খেতে দেওয়া হয়েছে তারা মনের আনন্দে তা চিবিয়ে যাচ্ছে। ক্ষীরোদের জানতে ইচ্ছে হ'ল, কী এমন ঘটল যাতে সবাই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। লুঙ্গি-পরনে, খাশি গা, থুতনিতে কাঁচা-পাকা দাড়ি একজন কোচোয়ানকে জিগ্যেস করল ক্ষীরোদ—মিঞা তোমরা সব চুপচাপ বসে আছো? ভাড়া যাবে না?

—নাগো কত্তা। আজ বড় গন্ডগোল।

—কীসের গন্ডগোল?

—মানুষ খাতি পাস্‌সে না, পেটে ভাত নেই, সব চাল উধাও! তাই আজ হাওড়ার পঞ্চাননতলায় চালের দোকান লুঠ হয়েসে আজ্ঞা! পুলিশ লাঠি চালিয়েসে! ধরপাকড় করেসে! আর মানুষ থির থাকতি পারে? হালারা খাতি দিতেও পারবি না আবার পোঁদে লাঠি গুঁজে দিবি? অবস্থা খুব খারাপ গো কত্তা। আজ আর কিস্যু করনের নাই...। ক্ষীরোদ কিছুটা বুঝতে পারে। সত্যি এ কী দুঃসময় এল দেশে? দোকানে টাকা ফেললেও চাল নেই। লোকে না খেতে পেয়ে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা খারাপ সময়ের আঁচ পেয়ে আগেভাগে মণ মণ চালের বস্তা কিনে বাড়িতে মজুত রেখেছে। যেমন ক্ষীরোদের বাড়িতেও এখনও চাল মজুত আছে। উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। এই তো গতকাল সকালে তাদের বাড়ির গলিতে হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল ক্ষীরোদ। সে তখন হাতে থলি ঝুলিয়ে বাজার যাচ্ছিল। সে দেখল সারি

সারি হাড়-হাভাতে মানুষের সারি। বয়স্ক মানুষ আছে, স্ত্রীলোক আছে, বাচ্চারাও আছে। ভিখিরির কদর্য মিছিল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে চাইছিল ওরা। এট্টু ভাত দ্যাও মাগো? এট্টু ফ্যান দাও?

বাজার থেকে ফিরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল ক্ষীরোদ। হঠাৎ দরজার কাছে শুনল সেই নাকি সুরে কান্না? ভাত দ্যাও মাগো? ফ্যান দ্যাও? ক্ষীরোদ চুপচাপ বসে থাকতে পারে নি। একতলার বারান্দায় এসে ঘাড় উঁচু করে ওদের দেখছিল। নীরদবরণ তখনও অফিসে বের হননি। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলেন ক্ষীরোদ? ক্ষীরোদ? শুনছ?

—কিছু বলচেন?—ক্ষীরোদ জিগ্যেস করেছিল।

—ঐ ভিখিরিদের এক মুঠো করে চাল দিয়ে দাও? হাবুর মা কোথায়? তাকে বল, সে দিয়ে আসুক?

—অনেকজন আচে? কতজনকে আপনি দেবেন? এরপরও আসবে। একবার দিতে শুরু কবলে রোজ আসবে। শয়ে শয়ে ভিখিরি এলাকায় ঘুরচে? কতজনকে আপনি ভিক্ষে দেবেন?

—সব ব্যাপারে অত আরগুমেন্ট করো না তো? এই তোমার এক দোষ? আমি দেখেছি ওদের। আই হ্যাভ কাউনটেড দেম। দে আর এইট ইন টোটাল। প্রত্যেককে এক মুঠো করে চাল ভিক্ষে দিলে আমাদের টান পড়বে না...।

ক্ষীরোদ আর কথা বাড়ায়নি। হাবুর মাকে ডেকে সে ভিক্ষে দিয়ে ভিখিরিদের বিদেয় করতে বলেছিল। কিন্তু এভাবে ভিক্ষে দিয়ে কি এদের খিদে থামানো যাবে? এদের পেটে আগুন জ্বলছে। একমুঠো উদরে পড়লে নিমেষে ভস্ম হয়ে যাবে। একী দুঃসময় এল সারা দেশে? এদিকে যুদ্ধ, ওদিকে মহামারী? আর সুসময় কি আসবে না কোনওদিন?

ভাবতে ভাবতে ক্ষীরোদ অনেকটা হেঁটে ফেলেছে। বঙ্গবাসী সিনেমার সামনে দিয়ে সে এখন হাঁটছে। শুনসান রাস্তায় হাঁটতে ভালই লাগছে। তবে চারপাশে যে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে এটা যেন সে অনুভব করছে? দোকানগুলো বন্ধ, রাস্তায় দু-চারজন তার মতনই পথচারী, দু-পাশে বাড়ির দরজা-জানালাগুলোও বন্ধ। তবুও ক্ষীরোদের মনে হচ্ছিল আড়াল থেকে জোড়া-জোড়া চোখ তাব গতিবিধি লক্ষ্য করছে। কেন এরকম মনে হচ্ছিল কে জানে? এটা তার বিভ্রমও হতে পারে।

—বাবু শুনচেন?—কেউ একজন ডাকল।

ক্ষীরোদ চমকে তাকাল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত মালকোঁচা মেরে পরা খাটো ধুতি। ময়লা কতদিন ধুতিটা কাচা হয়নি কে জানে। আদুড় গা। হাড় জিরজিরে শরীর। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

ক্ষীরোদের বুঝতে অসুবিধে হল না, যারা ভাত দ্যাও, ফ্যান দ্যাও বলে রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করছে এই লোকটি তাদেরই একজন প্রতিনিধি।

—কিছু বলচ আমাকে? —ক্ষীরোদ জিগ্যেস করল।

—বাবু একবার আসুন আমার সনে?

—তোমার সঙ্গে? কোথায়?

—আসেন না। ডর নাই বাবু। আমি চোর-ডাকাত নই। আপনারে শুধু একটা কিছু দেখাই...

—কী দেখাতে চাও?

—আসেন না?

কী যে মনে হল ক্ষীরোদের। সে লোকটার পেছনে চলল। কাছেই একটা দোকানের রোয়াক। দোকান বন্ধ। তালা ঝুলছে। আর রোয়াকে সারি সারি ও কারা বসে আছে? ক্ষীরোদ চমকে উঠল। একজন স্ত্রীলোক। শতচ্ছিন্ন শাড়ি তার পরনে। আর সারি সারি বসে আছে তাদের মায়ের পাশে তিনটি খুকি। সাত থেকে ন বছর বয়সের হবে হয়ত। প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। যেন চিতা থেকে কয়েকটা কঙ্কালকে তুলে আনা হয়েছে। তারা সবাই একদৃষ্টের ক্ষীরোদের দিকে তাকিয়ে ছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল ক্ষীরোদের।

—এই আমার পরিবার বাবু?—লোকটা বলল। আমাদের বাড়ি ডোমজুড়। ঘরে চাল নাই। হাতে পয়সা নাই। আজ দুদিন এদের পেটে কিছু পড়েনি বাবু। খিদের জ্বালায় আমরা এতদূর চলে এসেচি। যদি কাজ টাজ কিছু পাওয়া যায়। তো কে কাজ দেবে? এখন পথেই আমাদের শোওয়া বসা। পথেই দয়ামায়া আছে। কিছু পয়সাকড়ি দ্যান বাবু। এদের যদি এট্টু মুড়ি কিনেও খাওয়াতে পারি...।

ক্ষীরোদ কোনও কথাবার্তায় গেল না। জামার পকেটে হাত ঢোকাল। আঙুলে উঠে এল দুটো টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা। লোকটার হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে ক্ষীরোদ বাড়ির দিকে পা চালাল।

বেশ কিছুদিন ধরে নীরদবরণের শরীরটা সত্যিই ভাল যাচ্ছে না। বন্ধুর ওষুধ খেয়ে গলার ক্ষতটা বোধহয় শুকিয়ে গেছে। অনেকদিন রক্তপাত হয়নি। বন্ধু আশ্বাস দিয়েছে ও কিছু নয়। ক্রমশ ক্ষত নিরাময় হবে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তবুও নীরদবরণ অনুভব করেন তাঁর শরীর ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছে। আজকাল প্রায়ই মাথা ঘুরে যায়। গলার কাছে মাঝেমাঝে, বিশেষত ভরপেট খাওয়া দাওয়ার পর চিনচিনে একটা ব্যথা হয়। ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর তখন ডাক্তার-বন্ধুর প্রেসক্রাইব করা পেন-কিলার গিলতে হয় নীরদবরণকে। এসব কথা কাউকে বলা যায় না, বলেনওনি। কাকে বলবেন? যূথিকা নেই। ক্ষীরোদ সারাদিন নিজের ধান্দায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায়। তার স্ত্রী বন্দনাও হয়েছে বিচিত্র এক মহিলা। নীরদবরণকে দেখলেই আধহাত ঘোমটা দিয়ে সরে যায় একপাশে। আগে তো প্রায়ই বাপের বাড়ি পালাত। বসে থাকত দিনের পর দিন। ইদানীং বেশ কিছুদিন এ-বাড়িতে আছে। পোয়াতি দেখলেই বোঝা যায়। ক্রমশ পেট বড় হচ্ছে। আর কয়েক মাস বাদে আবার হয়তো বাপের বাড়ি ছুটবে। কারণ বাচ্চা হবার সময় মেয়েদের তো বাপের বাড়ি থাকাই নিয়ম। বাড়িতে কথা বলার মতন লোক কোথায়? নিজের মনের কথা অবশ্য কোনওদিনই বাড়ির কাউকে বলেননি তিনি। এমনকী যূথিকাকেও নয়। এখন একটু-আধটু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কার সঙ্গে বলবেন? ক্ষীরোদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। বারিদ আর অসিত নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এখন একা একা বসে মাঝে মাঝে মনে হয় যূথিকাকে চিরজীবন বেশ অবহেলা করাই হয়েছে। সবসময়েই তিনি স্ত্রীকে অবজ্ঞা করেছেন, অসম্মানও হয়তো করেছেন। এখন মনে হয় হয়তো ভুলই করেছেন। সরল, সাধাসিধা ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি একটু সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া বোধহয় উচিত ছিল। কোনওদিন কোনও চাহিদা ছিল না যূথিকার। স্বামীর মতের অমান্য করেননি কোনওদিন। চিরকাল মুখ বুজে স্বামীর সব অত্যাচার মেনে নিয়েছেন। এমনকী শেলীর ব্যাপারেও মুখ ফুটে বলতে আসেননি কিছু। অন্য মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে কোনওদিন স্বামীর সঙ্গে অশান্তি করতে চাননি। যূথিকা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁকে নিয়ে কোনওদিন কিছু ভাবেননি নীরদবরণ। আজ তাঁর অবর্তমানে যূথিকার সদ্‌গুণগুলো যেন বড় বেশি চোখে পড়ে।

অশিক্ষিতা ছিলেন যূথিকা; কিন্তু একধরনের আভিজাত্যের অধিকারিণীও যেন তিনি ছিলেন। হাবুর মা বহুদিন এ-বাড়িতে আছে। এ-বাড়ির একজনই হয়ে গেছে কবে থেকে যেন। হেঁসেলের ভার ছিল তারই হাতে। কারণ অত্যধিক হাঁফানি থাকার জন্যে যূথিকা রান্নাবান্না অনেকদিনই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবুও সংসারের খুঁটিনাটি সবকিছু তাঁর নজরে ছিল। আড়ালে থাকতে ভালবাসতেন যূথিকা; কিন্তু তাও নিজের মতন করে সংসারটা আগলে রেখেছিলেন।

একটাই স্বস্তির কথা যে, বিশ্বদেব এখন কাছাকাছি চলে এসেছে। ক্ষীরোদের এই এলাকায় বেশ জানাশোনা। ক্ষীরোদ বিশ্বদেবকে মোটামুটি কম ভাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে দিয়েছে। এ-বাড়ি থেকে খুব দূর নয়। তবে একটু ভেতরদিকে। পায়ে হেঁটে নাকি আধঘন্টা লাগে সে বাড়িতে যেতে। নীরদবরণ বিশ্বদেবের ভাড়াবাড়িতে এখনও যাননি। তার বড় মেয়ে শুভ্রা এখন এ-বাড়ি ছেড়ে বাবা-মার কাছেই থাকে। শুনেছেন সুনীতি নতুন বাড়িতে সংসার পেতে বসেছে। বিশ্বদেব ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি কোন এক প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করেছে। মেয়ের সঙ্গে, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে অনেকদিন দ্যাখা হয়নি। সেই যূথিকার শ্রাদ্ধের সময় সবাই এ-বাড়িতে এসেছিল। কেমন আছে সুবু? কীভাবে সময় কাটায় সে? পড়াশোনার হ্যাবিট তার কি এখনও আছে না সব চুকে-বুকে গেছে? মেয়েটার জীবনটা কীরকম এলোমেলো হয়ে গেল! তার জন্যে কি নীরদবরণই দোষী? আজকাল নীরদবরণের সেরকমই মনে হয়। এটাও মনে হয় যে, বিশ্বদেব, ক্ষীরোদ, সুনীতি সবাই যেন মনে মনে নীরদবরণকেই দায়ী করে রেখেছে সুবু-র দুর্ভাগ্যের জন্যে। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না বটে; কিন্তু মনে মনে সবাই তাঁর প্রতি বিরক্ত।

একদিন রবিবার সকালবেলা হঠাৎ বিশ্বদেব এসে হাজির। সে একা এসেছে। কাউকে সঙ্গে আনেনি। এমনকী শুভ্রাকেও নয়। নীরদবরণের মনে হয়, ইচ্ছে করলে বিশ্বদেব মেয়েটাকে আনতে পারত। একবেলা না হয় থাকতই ওরা এ-বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া করত। বিশ্বদেব এবং সুনীতি কি বোঝে না যে নাতি-নাতনিদের, বিশেষত সুবুকে দ্যাখার জন্যে, তার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্যে নীরদবরণের মনে কত না উতলা হয়ে থাকে!

বেলা নটা। ব্রেকফাস্ট সেরে নীরদবরণ দোতলার ঘরে স্টেটসম্যানের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। ঘরে এসে ঢুকল বিশ্বদেব। তার পরনে সেই ধুতি আর ফুল-হাতা শার্ট। বিশ্বদেবের পোশাকের কথা ভাবলে হাসি পায় নীরদবরণের। এতদিন ধরে এত সাহেব-সুবোর সঙ্গে কাজ করে এল। এখনও সাহেবদের সঙ্গে তার নিত্য ওঠাবসা। আরমেনিয়ান কলেজ-কাম-চার্চ তো সাহেবদেরই ডেরা। তবুও জামাই কোট-প্যান্ট পরার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ পায় না। সাবানে কাচা ধুতি-শার্ট পরেই চালিয়ে দিল। —বোসো বিশ্বদেব...অনেকদিন তোমাদের খবর নেই, কী ব্যাপার?

একটা বেতের মোড়ায় বিশ্বদেব বসেছে। এ-বাড়ির কুকুর-বেড়ালগুলো যূথিকার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নিয়েছে। ওগুলো আসলে যূথিকারই বড় ন্যাওটা ছিল। যূথিকা জাপানি বোমার ভয়ে যেদিন বাপের বাড়িতে গেলেন তার কয়েকদিন পরেই কুকুরটা মারা গেল। বুড়োও হয়েছিল। নয় নয় করে এগারো বছর ছিল এ-বাড়িতে। তারপর কী বিচিত্র সমাপতন! যূথিকার মৃত্যুসংবাদ যেদিন পাওয়া গেল তার কয়েক দিন পর বেড়ালটাকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বিশ্বদেব মোড়াতে বসার পর কুকুরটা যদি থাকত নিশ্চয়ই তার ধুতি শুঁকে যেত। আর চা-বিস্কুট দিলে বেড়ালটা বিস্কুটের গুঁড়ো পাবার আশায় মিউ মিউ ডাকত আর ঘাপটি মেরে বসে থাকত। আজ তারা কেউ নেই! বিশ্বদেবের যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—চলচে একরকম। বিশ্বদেব বলল;—আপনার শরীর এখন কেমন?

—আছি একরকম। —নীরদবরণ মিথ্যে বললেন।

—গলার ব্যথা?

—সেরে আসছে।... ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করেছ শুনলাম?

—হ্যাঁ করেচি। তবে স্কুল আর হচ্চে কোথায়?

—কেন?

—রাস্তায় তো বেরনো যায় না। দেখতে পেলেই ভিখিরিরা ছেঁকে ধরবে। এত নিরন্নের দল আসচে কোথা থেকে বলুন তো? আমাদের পাড়াতে আবার ওদের জড়ে লঙ্গরখানা খোলা হয়েচে। আর সেই লঙ্গরখানা চলচে কোথায় জানেন?

—কোথায়?

—আমার ছেলেরা যে স্কুলে পড়ে সেখানে তো বটেই; আবার মেয়েদের স্কুলেও। ওরা তো এখন বাড়িতে বসে আচে। লঙ্গরখানা যতদিন চলবে স্কুল বন্ধ থাকবে।

—হ্যাঁ। কলকাতাতেও রাস্তাঘাটে কাতারে কাতারে ভিখিরি। কাগজে পড়ছিলাম কোন্ একটা মিষ্টির দোকানে ভিখিরিরা লুঠপাট করেছে।... ঠিকই বলেছ তুমি।... উই আর গোয়িং থ্রু ভেরি ব্যাড ডেজ....।

—সারা রাজ্যে ফেমিন চলছে। রাস্তায় না খেতে পেয়ে মানুষ মরে আচে। প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আচে। ওদিকে শুনচি সুভাষ বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা দিয়েচে। আর এদিকে গান্ধী নন-ভায়োলেন্স মুভমেন্ট চালাচ্চে। পরস্থিতি ঘোরাল। টোটাল অ্যানার্কি! রাজ্য-রাজনীতির আলোচনায় নীরদবরণ যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি আজকাল যেন মনে মনে ভীষণ ক্লান্ত। পরিবারের সকলের কথা শুনতে চান। পরিবারের সকলকে জড়িয়ে নিয়ে থাকতে চান। বিশেষত সুবুর খবর, তার মনের খবর জানার জন্যে তাঁর মন যেন সদা উন্মুখ হয়ে থাকে। প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন নীরদবরণ। বিশ্বদেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—সুবু-র কী খবর? আজাকাল তার ভাব-গতিক কী বুঝছ?...

—ওর ব্যাপারটা নিয়েই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এলুম।

—কী ব্যাপার? সুবু কি আবার পাগলামি শুরু করেছে?

—নাহ সেরকম কিছু নয়। বরং বলা যায় ওর টেমপেরামেন্ট যেন একটু চেঞ্জ হয়েচে।

—চেঞ্জ হয়েছে?—নীরদবরণ চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন। এখন সোজা হয়ে বসলেন। —ইউ মিন চেঞ্জ ফর দ্য বেটার?

—ইয়েস চেঞ্জ ফর দ্য বেটার। সুবু ওর মায়ের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ও মেমারিতে যেতে চায়।

—তাই নাকি? এ তো খুব ভাল খবর! কোয়াইট আনএক্সপেকটেড। আমি জানতাম ও ঠিক ওর ভুল বুঝবে। —নীরদবরণের স্বরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। তাঁর গাম্ভীর্য এক নিমেষে উধাও। আনন্দের উত্তেজনায় ফর্সা মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো তাঁর আনন্দ পাবারই কথা। সারাজীবন এমন কোনও কাজ করেননি তিনি যার জন্যে নিজের মুখোমুখি হতে তাঁর কোনওদিন অস্বস্তি কিংবা লজ্জা হয়েছে। এমনকী শেলীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে নীরদবরণ নিজের কাছেই কতকগুলো যুক্তি খাড়া করে নিয়েছিলেন। তিনি পুরুষ। ভোগী। নারীর সৌন্দর্যের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগ তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। যূথিকার মতন সামান্য নারীর পক্ষে তাঁকে তৃপ্ত করা

সম্ভব ছিল না। চিরজীবন যূথিকা ছিলেন কমজোরি, অসুস্থ। নীরবরণের সিংহসম কামভাব কীভাবে যূথিকাকে দিয়ে তৃপ্ত হবে? আর অতৃপ্তি নিয়ে বেঁচে থাকা মানে তো নিজেকেই বঞ্চিত করা। কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন নীরদবরণ? তিনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর কিংবা ঠাকুর-দেবতাতেও তাঁর কোনওদিন বিশ্বাস ছিল না। ধর্ম নিয়ে আদিখ্যেতাকে নীরদবরণ বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন। প্রকাশ্যে উপহাসও করেছেন যূথিকাকে তাঁর শিবঠাকুর কিংবা কেষ্টঠাকুর নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখে। সুতরাং একটা মাত্র জীবনে আকণ্ঠ ভোগ করতে চেয়েছেন নীরদবরণ। আর নারীর শরীরেই তো জমে থাকে আনন্দের সোমবস? শেলীকে তিনি প্রকৃতই ভালবেসেছেন। যূথিকাকে সে ভালবাসা কোনওদিন দিতে পারেননি। শেলীর মেধাকে ভাল বেসেছেন। তার শরীরকেও ভালবেসেছেন। এবং শেলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা নিজের স্ত্রীকে জানিয়েও দিয়েছেন। যূথিকা তাতে আহত হয়েছেন। অশান্তি করতেও ছাড়েননি। কয়েক বছর আগে যখন নীরদবরণ স্ত্রীকে সরাসরি, কোনও ভণিতা না করে, শেলীর কথা জানান তখন বাড়িতে সত্যিই অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল। যূথিকা পরপর দুদিন পুরোপুরি উপবাসে ছিলেন। ভেবেছিলেন কোথাও চলে যাবেন। দুশ্চরিত্র স্বামীর সঙ্গে আর থাকবেন না। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর নিজের পায়ের তলায় মাটি তো ছিল না। এদেশের মেয়েদের কাছে স্বামীই হল শেষ আশ্রয়। ক্রমশ যূথিকা স্বামীর স্বৈরাচারীকে মেনে নিয়েছেন। শুধু নিজের ভেতরে আরও যেন কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। আর নীরদবরণের সততা এখানেই যে তিনি তাঁর অবৈধ জীবনের কথা গোপন রাখেননি নিজের পরিবারের কাছে। এই কারণেই সম্ভবত দাপটের সঙ্গে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু কাটোয়াতে আকস্মিকভাবে শুভ্রার বিয়ের ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নেবার পর যা যা ঘটেছিল, তাতে জীবনে প্রথমবার নীরদবরণ থমকে গিয়েছিলেন। হোঁচট খেয়েছিলেন। অপরাধবোধ প্রতিনিয়ত কুরে কুরে যেন শেষ করে দিত তাঁকে। শুভ্রার বিয়ে দিয়ে তিনি তাহলে মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁর হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্যেই শুভ্রা আজ অসুখী। মনীশও অসুখী। দুটো জীবন বৃথা হয়ে গেল। কিন্তু আজ বিশ্বদেবের মুখে শুভ্রার মানসিক পরিবর্তনের আভাস পেয়ে নীরদবরণ সত্যিই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

—দ্যাখো বিশ্বদেব, সুবু তোমার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু আমি ওকে যতটা চিনি তোমরা হয়তো ততটা চেনো না। আমি জানতাম সুবু ওর ভুল বুঝবে একদিন না একদিন। ছেলেমানুষি করেছিল ও। এখন তা বুঝতে পেরেছে। তা তুমি এখন কী ঠিক করলে?

—সে ব্যাপারেই আপনার কাছে সাজেসানস্ চাইতে এসেছি। অনেক মাস হয়ে গেল সতীশবাবুদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। মনীশও এতদিন সুবুর কোনও খবর নেয়নি। ওরা এখন সুবুকে ঘরে নেবে তো?

—তুমি কী বলতে চাইছ?

—ধরুন সতীশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে সুবুকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললাম তাতে উনি আমাকে অপমান করলেন....

—অপমান তো একটু-আধটু সহ্য করতে হবেই বিশ্বদেব। সুবু মনীশকে দিনের পর দিন অপমান করেছে, তখন আমরা তাকে ঠিকমতন বোঝাতে পারিনি।

—সে কথা আমি ঠিক বলচি না। আমরা মনীশকে যেভাবে অপমানিত হতে দিয়েচি তাতে আমাদের তো এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই। আমি ভাবচি আরও অন্যরকম কিছু...

—কী ভাবছ?

—ধরুন সতীশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আর উনি বললেন আপনার মেয়েকে আমরা আর ঘরে তুলব না। আপনার মেয়ের মাথা খারাপ। আমার দরকার নেই মশাই পাগলি বৌমার! আমরা ছেলের আবার বিয়ে দেব....

বিশ্বদেবের কথা শুনে নীরদবরণ হা হা হা করে হেসে উঠলেন।

—আপনি হাসচেন? আমার এক কলেজের বন্ধুর ক্ষেত্রেই এরকম হয়েচে। তার বিবাহিত মেয়ে এখনও বাড়িতে বসে আচে। এখনও শ্বশুরবাড়িতে পাঠাতে পারেনি।

—কী হয়েছে শুনি?

—আমার বন্ধুর কথা শুনে মনে হয়েচে ওর মেয়েটাই আসলে বেশ ঝগড়াটে। এক একজন কোঁদলে মেয়ে থাকে না? ফুলশয্যার পরদিন থেকেই তার সঙ্গে শাশুড়ির মনোমালিন্য শুরু হয়। কয়েক দিন বাদেই জামাই স্ত্রীর হাত ধরে বাপের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে যায়। তারপর কয়েক মাস কেটে গেল। তার আর পাত্তা নেই। মেয়ের বাবা একদিন জামাইয়ের মতিগতি বুঝতে ওদের বাড়িতে যায়। তাকে অপমান করে ওরা তাড়িয়ে দিয়েচে! ওরকম ঝগড়াটে মেয়েকে নাকি তারা আর ঘরে ঢোকাতে চায় না। ছেলের বিয়ে দেবে অন্য জায়গায়।

—ইজ ইট সো ইজি? —নীরদবরণ এবার রুষ্ট হয়ে বলে ওঠেন; —দেশে আইন-কানুন নেই? তোমার বন্ধুকে থানায় যেতে বলো কিংবা কোর্টে নালিশ করতে বলো পাত্রপক্ষ বাপ বাপ বলে ছুটে আসবে।

—কিন্তু এসব ঝামেলা কি কেউ চায়? স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক পুলিশ দিয়ে কিংবা আদালতে সমন জারি করে আপনি মেটাবেন? ডাজ ইট রিয়েলি লুক গুড?

—শোনো বিশ্বদেব তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ। সতীশবাবুদের ক্ষেত্রে এরকম কিছুই হবে না।

—আপনি বলচেন?

—হ্যাঁ বলছি। জোর দিয়েই বলছি। কনফিডেন্স নিয়েই বলছি। ... দেখ বিশ্বদেব আমার বয়স অনেক হল। আমি অনেক মানুষ দেখেছি, অনেক মানুষ চিনেছি। মনীশকে আমি যেটুকু বুঝেছি, তাতে আমার বিশ্বাস ছেলেটি শুধু শিক্ষিতও নয়, স্বভাব-চরিত্রেও একেবারে আইডিয়াল। সুবু যদি শ্বশুরবাড়িতে যায়, মনীশ ওকে ফেরাবে না। অ্যাকসেপ্ট করবে। সতীশবাবুও লোক খারাপ নন। আমার বিশ্বাস ওঁরা এরকম কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

—আপনি তাহলে আমাকে এখন কী করতে বলেন?

—প্রথমে তুমি একদিন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাও। সেখানে মনীশের সঙ্গে একান্তে কথা বলো। ওর মনোভাব বোঝো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা...।

আজকাল অদ্ভুত এক একাকীত্ব-বোধ সঙ্গী হয়েছে নীরদবরণের। কীরকম এক শূন্যতার বোধ। মনে হয় জীবনটা যেন ফাঁকা মাঠের ধারে পুঁতে রাখা বাঁশের ওপর শতচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত কোনও শার্ট। যে শুধুই দুরন্ত বাতাসে ছিন্নমূল, পতপত ওড়ে। কেউ নজর করে না। বৃহত্তর জীবনের বৃত্তে যার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। আমার জীবনের তেমন কোনও মূল্য নেই। আমি বেঁচে থাকি কিংবা না-থাকি কার কী এসে যায়? মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় নীরদবরণের। নিজেকে কতবারই তো বিভ্রমে অসাধারণ ভেবেছেন। নিজের জীবনকে গড়পড়তা গেরস্থ-জীবন থেকে অন্যরকম ভেবেছেন। কিন্তু আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে মনে হয় সেসব সবই তাঁর কল্পনা; নিজেকে অতিরঞ্জিত করে দ্যাখা; নিজের কাছেই নিজেকে বড় করে দ্যাখানো আত্মঅহমিকার

প্রাবল্যে। আসলে তিনি অসাধারণ নয়। তিনি অতি সাধারণ একজন মানুষ। তাঁর জীবনকেও তিনি এমন কিছু অসাধারণ বানিয়ে তুলতে পারেননি। বিদেশি কোম্পানিতে চাকরিটা পেয়ে গেছেন, সেখানে টিকে থাকতে পেরেছেন এই যা। এক অতি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এক অতি সাধারণ পরিবারের কর্তা হিসেবে আর কী এমন অসাধারণত্ব দাবি করতে পারেন তিনি? আজকাল অফিসে কাজ করতে করতে মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বন্ধু ম্যাকেঞ্জিসাহেবের কথা বড় মনে হয়। আসলে ম্যাকেঞ্জি নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার ফলেই হয়তো তিনি বড় একা হয়ে গেছেন। ম্যাকেঞ্জির অধীনে তিনি কাজ করতেন ঠিকই। কিন্তু ম্যাকেঞ্জির ব্যবহার তাঁকে কোনওদিন বুঝতে দেয়নি যে তিনি, নীরদবরণ, তাঁর অধস্তন কর্মচারী। ঠিকমতো বলতে গেলে ম্যাকেঞ্জি ছিলেন নীরদবরণের ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। জীবনে যখনই কোনও সমস্যার সামনে পড়েছেন নীরদবরণ ম্যাকেঞ্জির পরামর্শ নিয়েছেন। একটা কথা বারবার বলতেন ম্যাকেঞ্জি যে, নিজেকে কখনও ঠকাবে না। ...ডু নট ডিসিভ ইওরসেল্ফ বাবু.... নেভার ডিসিভ ইওরসেল্ফ। তাহলে তুমি ভাল থাকবে। ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ অব ইওরসেল্ফ। নিজের বুকে হাত দিয়ে কি বলতে পারবেন নীরদবরণ যে নিজেকে তিনি কোনওদিন ঠকাননি?...

প্রতিদিন অফিস থেকে বেরিয়ে দুজনে লাঞ্চ খেতে বের হতেন চেনা রেস্তোরাঁ মোকাম্বোতে। কিঞ্চিৎ পানীয় এবং খাবার। কতরকম কথা যে বলতেন ম্যাকেঞ্জি! প্রচুর পাণ্ডিত্য তাঁর, অগাধ পড়াশোনা। ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকেই কত নতুন ইংরেজ কবি-লেখকদের নাম জানতে পেরেছেন নীরদবরণ। কত নতুন বই তিনি ধার নিয়েছেন ম্যাকেঞ্জির কাছ থেকে সেরকম কত বই এখনও তাঁর কাছে পড়ে আছে। আর ফেরত দেওয়া হয়নি। যখনই ফেরত দেবার কথা উঠেছে ম্যাকেঞ্জি বলেছেন—কিপ দ্য বুকস উইথ ইউ বাবু! দোজ বুকস উইল মেক ইউ রিমাইন্ড অব মি...। এই তো সেদিন! নিজের বইয়ের র‍্যাকে খুঁজতে খুঁজতে নীরদবরণ পেয়ে গিয়েছিলেন সেই অমূল্য বইখানি;—'আইলেস ইন গাজা'—লেখক অলডাস হাক্সলী। ওটি ম্যাকেঞ্জিরই বই। একসময় পড়ার জন্যে দিয়েছিলেন নীরদবরণকে। আর ফেরত দেওয়া হয়নি।

একসময় ম্যাকেঞ্জি বলেছিলেন নীরদবরণকে,—বাবু আমি তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। ইউ মাস্ট মি দ্য মেমোরেবল প্লেসেস অব দ্য ওয়ার্ল্ড। দুজনে রেস্তোরাঁর নির্জনে বসে বসে কতরকম পরিকল্পনা করতেন।... প্রথমে যাওয়া হবে লন্ডন—শেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখবেন নীরদবরণ। হাইড পার্ক দেখবেন। বাকিংহাম প্যালেস দেখবেন। তারপর যাওয়া হবে প্যারিসে। সেখানে দেখবেন ল্যুভর মিউজিয়াম, ইফেল টাওয়ার, বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত নাইট ক্লাব। তারপর যাওয়া হবে ইতালি। ঘোরা হবে রোম শহরে, ভ্যাটিক্যান চার্চ দেখা হবে, নেপলস যাওয়া হবে, সিসিলিতেও;—সমুদ্রের মাঝখানে স্বপ্নের দ্বীপ-সিসিলি। কিন্তু পরিকল্পনাই তো শুধু সার হল। আজ পর্যন্ত একটি বারের জন্যেও বিদেশ যাওয়া হল না নীরদবরণের। মাত্র একবারের জন্যে লন্ডনে পর্যন্ত যাওয়া হল না। মাঝে মাঝে নীরদবরণ ভাবেন, ম্যাকেঞ্জিকে চিঠি লিখবেন। বলবেন যে তিনি লন্ডনে যাবেন। একটু সুযোগসন্ধানী হলে অফিসের কাজ নিয়েই তো লন্ডন যাওয়া যায়। ইদানীং খুব ইচ্ছে হয় লন্ডন ঘুরে আসার অন্তত কয়েকদিনের জন্যে। তাঁদের সাইকেল কোম্পানির হেড-অফিসই তো লন্ডন! নিজের প্যাসেজ-মানি তো অফিস থেকেই পাওয়া যেতে পারে। এখন আর কী পিছুটান তাঁর। যূথিকা নেই। মেয়েরা বিবাহিত। অসিতবরণ আর বারিদবরণ তো তাদের দাদা ক্ষীরোদবরণের তত্ত্বাবধানেই থাকতে পারে কয়েকদিন। নীরদবরণ তো টাকা দিয়েই খালাস। তিনি আর আজকাল কতটা খোঁজখবর রাখতে পারেন ওদের? সুতরাং কয়েক

সপ্তাহের জন্যে লন্ডন ঘুরে আসাই যায়। মনে মনে ভেবে রেখেছেন নীরদবরণ সঙ্গে নিয়ে যাবেন শেলীকে। লন্ডনে ম্যাকেঞ্জি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

সেদিন শেলী একটা অদ্ভুত কথা শোনাল নীরদবরণকে। —ডার্লিং আই হ্যাভ টেকেন আ ডিসিসান।

—ডিসিসান? হোয়াট ডিসিসান?

—আমি মিশনারিদের চ্যারিটি হোমে চলে যাব।

—মিশনারিদের চ্যারিটি হোমে? ...এই জীবন ত্যাগ করে চলে যাবে শেলী?

—হ্যাঁ চলে যাব। অনেক তো দ্যাখা হল জীবনে। অনেক এনজয় তো হল। এখন মনে হয় ডিসট্রেসড পিপলদের জন্যে কিছু করি।

নীরদবরণ কোনও উত্তর দেন না। চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন শেলীর মুখের দিকে। সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে শেলী? দুস্থ মানুষের সেবা করবে? কীরকম অদ্ভুত শোনায় কানে। তারপরই মনে হয় সত্যি শেলীরও তো কোনও পিছুটান নেই। সেও তো জীবনে একা? সে স্বামীকে হারিয়েছে। মা হবার যন্ত্রণা এবং আনন্দ কোনওটাই পায়নি জীবনে। নীরদবরণের সঙ্গে এই খেলাঘরও তো স্থায়ী নয়। পারবেন কি নীরদবরণ শেলীকে বিয়ে করতে? তার সঙ্গে বৈধ পারিবারিক জীবন শুরু করতে। সে ব্যাপারেও তো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। শেলীর দিক থেকেও কোনও চাপ নেই। সেকি এই কারণে যে, শেলী সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করবে?

—তোমার কাছে তো আমার অনেক ঋণ শেলী। কীভাবে আমি তা শোধ করব?

—তাই বুঝি? হিসেব করে ফেলেছ?

—তোমাকে একটা কিছু আমি দিতে চাই শেলী....

—কী দিতে চাও?

—আমি ব্যাঙ্কে তোমার নামে কুড়ি হাজার টাকার একটা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখতে চাই।

—ওহ ওয়ানডারফুল! মিশনারিজ হোমের মাদার এমিলির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অনেক টাকার দরকার ওদের। একটা হোম চালাতে কত টাকা লাগে জানো? তোমার কোনও ধারণা আছে সেখানে কত দুঃস্থ মানুষ থাকে?

—নাহ ধারণা নেই।

—অনেক দুঃস্থ মানুষ থাকে। অন্ধ, খোঁড়া, অথর্ব, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কত মানুষ! যাদের দ্যাখার কেউ নেই, যাদের পায়ের তলায় কোনও মাটি নেই তাদের জন্যে আছেন মাদার এমিলি এবং তাঁর হোম—হোলি প্লেস। অনেক টাকার দরকার মাদারের। তা ভালই হবে। তোমার টাকাটা বরং আমি নিজে মাদারের হোমের নামে ফিক্সড ডিপোজিট করে দেব। মানুষের সেবায় কাজে লাগবে। হেসে বলে শেলী।

নীরদবরণ তাকিয়ে থাকেন তাব দিকে। বুঝতে পারেন শেলী পালটে যাচ্ছে, পালটে গেছে। পৃথিবীর সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে, শেলীই বা পাল্টাবে না কেন? কিন্তু শেলী যদি সত্যিই মিশনারিদের হোমে চলে যায়, তাহলে নীরদবরণ তাঁর জীবনের দুঃসহ একাকীত্ব থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে কার কাছে আসবেন? কে সস্নেহে তাঁর মাথা টেনে নেমে নিজের বুকে। নীরদবরণের দীর্ঘশ্বাস পড়ে...।

সেদিন অফিসে বেশ কাজের চাপ ছিল। ম্যাকেঞ্জির জায়গায় যে সাহেব এখন কাজ করছে

তার নাম জ্যাক রবার্টসন। ম্যাকেঞ্জি চলে যাওয়ায় সেই শূন্যস্থানে তার পদোন্নতি হয়েছে। লোকটা স্বভাবে ম্যাকেঞ্জির ঠিক যেন ম্যাকেঞ্জির বিপরীত। বেশ অহঙ্কারী, উদ্ধত স্বভাবের, কপাল যেন সবসময় কুঁচকে আছে। বাঙালিদের কিংবা ভারতীয়দের সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা পোষণ করে বলে মনে হয় না। কথা বললেই কীরকম ধমক মনে হয়। নীরদবরণ যে এতদিন এই কোম্পানিতে চাকরি করছেন; তার জন্যে তাঁকে একটু সম্মান দেখানো এসব রবার্টসনের ধাতে নেই। সে প্রায়ই নীরদবরণকে ডেকে তাঁর কাজের সমালোচনা করে। নীরদবরণের কাজ নাকি তার ভাল লাগছে না। তিনি বড় ধীর গতি, ফাইল ফেলে রাখেন টেবিলে। কোম্পানির সেলস ইনডেক্স যে কিছুটা নিম্নগামী ইদানীং, তার জন্যে নাকি সেলস ম্যানেজার হিসেবে নীরদবরণেরও কিছু দায় আছে। তিনি কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত নানা এজেন্সিদের সঙ্গে নিয়মিত ফলো-আপ মিটিং করছেন না। রুরাল বেঙ্গলে কোম্পানির সাইকেল আরও পপুলার করার ব্যাপারে যে উদ্যোগ নেওয়ার কথা তা নাকি তিনি নিচ্ছেন না। আজ কিছুক্ষণ আগেই রবার্টসন নীরদবরণকে তার ঘরে ডেকে তাঁর কাজের সমালোচনা করছিল। আজ আর মাথা ঠান্ডা রাখা সম্ভব হয়নি নীরদবরণের পক্ষে। আজ তিনি রবার্টসনকে দু-কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। বলেছেন, আজ প্রায় পঁচিশ বছরেরও বেশি তিনি এই কোম্পানিতে আছেন, কোনওদিন তাঁর কাজ নিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনও প্রশ্ন তোলেননি। রবার্টসনের ব্যবহার তাঁর একেবারেই ভাল লাগছে না। এভাবে নিজের কাজের সমালোচনা শুনতে তিনি অভ্যস্ত নন। এতে রবার্টসন নাকি খুব গরম হয়ে যায়। নীরদবরণকে সরাসরি বলে যে, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, কোম্পানির চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না; তাঁর এবার অবসরের কথা ভাবা উচিত। এই কথায় নীরদবরণও তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। বলেন যে, অবসর নেবার কথা তিনিও ভাবছেন। তবে রবার্টসনের হুমকিতে তিনি অবসর নেবেন না। তিনি জানতে চান, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ তাঁর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে কীরকম মত পোষণ করেন। সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ অধিষ্ঠিত আছেন সুদূর লন্ডনে। সেখানে ম্যাকেঞ্জিসাহেবও আছেন। নীরদবরণ ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে ফোনে কথা বলে তাঁর বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের মতামত জানতে চেষ্টা করবেন। ম্যাকেঞ্জির উল্লেখ করায় রবার্টসন হঠাৎ কী রকম মিইয়ে গেল। বলতে লাগল, তার কিছু মন্তব্যের জন্যে সে দুঃখিত। তবে নীরদবরণকে আর একটু অ্যাকটিভ হতে হবে।

নীরদবরণ বলেছিলেন—মে বি টুমরো আই শ্যাল সাবমিট মাই রেজিগনেশান টু ইউ!—এটা বলে তিনি আর রবার্টসনের প্রতিক্রিয়ার জন্যে অপেক্ষা করেননি। রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর সোজা চেনা রেস্তোরাঁয়। মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়ে গেছে। খিদেও পাচ্ছিল। একটা ফাঁকা টেবিল দেখে বসলেন নীরদবরণ। দরজা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কাউন্টারের দক্ষিণ দিকে। এখানে বসলে রেস্তোরাঁর নানা টেবিলে যারা বসে আছে তাদের বেশ নজর করা যায়। এখানেই তিনি ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে প্রায় নিয়মিত লাঞ্চ সারতে আসতেন। কত কথা হত দুজনের। বেশি কথা বলতেন ম্যাকেঞ্জি। খুব দক্ষ টেবল-টকার ছিল লোকটা। কত বিষয়ে যে কথা বলতে পারত! মাঝে মাঝে নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত।

রবার্টসনের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর নীরদবরণের মেজাজটা সত্যিই বিগড়ে গেছে। সত্যিই আর চাকরি করতে ভাল লাগছে না। পয়সা অনেক রোজগার করেছেন। ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি তাঁকে অনেক দিয়েছে। এখনই যদি রেজিগনেশান দেন, অসুবিধে হবার কথা নয়। ক্ষীরোদের যা হবার হয়েছে। সে নিজেরটা চালিয়ে নিতে পারবে। বারিদটা পড়াশোনায় ভাল। সেকেন্ড ইয়ার চলছে। বি. এ. পাস করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারবে। ব্যাঙ্কে বেশ ভাল টাকাই সঞ্চয়

করেছেন নীরদবরণ। তার সুদেই হেসেখেলে চলে যাবে। অসিতবরণই যা একটু ছোট আছে। আর কোনও দায়-দায়িত্ব নেই নীরদবরণের। চাকরি থেকে অবসর নিলেও অসুবিধে হবার কথা নয়। তা হলে আর গোলামি করবেন কেন? কিন্তু....নীরদবরণ ভাবলেন। চাকরি ছাড়ার আগে ম্যাকেঞ্জিসাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা হওয়া ভাল। রবার্টসন লোকটা সুবিধের নয়। তার মতন বেঙ্গলি হেটার কলকাতার অফিসে থাকলে এই অফিস লাটে উঠে যাবে। শুধু কয়েকজন সাহেব-ম্যানেজার নিয়ে কি অফিস চলবে? কর্মচারী চাই। কলকাতার অফিসে বাঙলিদের বাদ দিলে দক্ষ কর্মচারী কোথায় পাবে এরা? ফোনে যদি যোগাযোগ না হয় তাহলে রবার্টসনের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে ম্যাকেঞ্জিসাহেবকে চিঠি লিখবেন নীরদবরণ। তাতে ম্যাকেঞ্জি নিশ্চয়ই তাঁর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রবার্টসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইবেন।

এরকম নানা চিন্তায় ডুবে ছিলেন নীরদবরণ। রেস্তোরাঁর টেবিল-চেয়ারগুলো ক্রমশ ভরে উঠছে। সবাই কথা বলছে তাই গুঞ্জনের মতন শোনাচ্ছে। বাটলার এসে জিজ্ঞেস করল অর্ডারের কথা। নীরদবরণ প্রথমে হুইস্কির অর্ডার দিলেন। দু-পেগ মদ্যপানের পর তিনি হালকা লাঞ্চ নেবেন। বেয়ারা টেবিলে মদের গ্লাস, সোডাওয়াটার আর বিফ-স্টিক সাজিয়ে দিয়ে গেল। নীরদবরণ মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন। একটা বোনলেস বিফস্টিক দাঁত দিয়ে কামড়ালেন; মেজাজটা ফুরফুরে হতে শুরু করল। হালকা বিদেশি মিউজিক চলছে। নীরদবরণের কাছাকাছি টেবিলে দুজন ইউরোপীয় মহিলা আর একজন পুরুষ এসে বসেছে। তারা গল্প করছে আর মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মহিলা দুজন হেসে উঠছে। রবার্টসনের সঙ্গে তর্কাতর্কি যেন ক্রমশ মন থেকে সরে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা চিৎকারে চমকে উঠলেন নীরদবরণ। তিনি তাকিয়ে দেখলেন রেস্তোরাঁর দরজার কাছে পাগড়ি বাঁধা দারোয়ান কাদের যেন ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা শুনছে হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচি! নীরদবরণ দেখলেন দারোয়ানকে ঠেলে ধরাশায়ী করে হুড়মুড় করে রেস্তোরাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেক অনেক মানুষ। তাদের দেখে চমকে উঠলেন নীরদবরণ! এরা কারা? পিলপিল করে রেস্তোরাঁর মধ্যে ঢুকে পড়ছে ওরা! এক একটা জীবন্ত কঙ্কাল যেন! পুরুষ আছে। নারীরাও আছে। হাড়-হাভাতের একটা আস্ত মিছিলই যেন ঢুকে পড়েছে রেস্তোরাঁর মধ্যে! এরকম রুগ্‌ণ, শীর্ণ, মানুষদের মিছিলই তো আজকাল রাস্তাঘাটে বের হলেই নজরে পড়ে! যাদের মুখে শুধু একটাই বুলি—এট্টু ভাত দ্যাও মা এট্টু ফ্যান...। কিন্তু সেই কাতর অনুরোধ আজ আর ওদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে না। আজ ওদের অনেক বেপরোয়া, দুরন্ত, হিংস্র মনে হচ্ছে। একসঙ্গে অনেকে আছে ওরা। কতজনকে বাধা দেওয়া যাবে। দারোয়ানকে ধরাশায়ী করে তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে নাচছে দুজন। আর অন্যেরা এক একটা দু-চারজন মিলে দল বেঁধে গিয়ে হাতের সামনে যা খাবার পাচ্ছে তুলে নিচ্ছে! কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন রেস্তোরাঁটি হুবহু এক নরকে পরিণত হয়ে গেল। বাটলার, বেয়ারা এবং টেবিলের সুবেশ, অধিকাংশই ইউরোপিয়ান খদ্দেরদের সঙ্গে অনাহারে প্রায় অমানুষে পরিণত হওয়া ভিখিরিদের রীতিমতো খন্ডযুদ্ধ বেধে গেল। কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক! কজনকে বাধা দেওয়া যাবে! অনেকেই চেঁচামেচি করছিল—পোলিশ! পোলিশ! কল দ্য পোলিশ! কিন্তু কে কীভাবে পুলিশ ডাকবে? কারণ ভিখিরিরা সংখ্যায় ক্রমশ বাড়ছে। চলছে ঠেলাঠেলি, চড়-চাপড়, গালাগাল! তার মধ্যেই ওরা লুঠ করতে শুরু করেছে খাবার। এত সুখাদ্য সারাজীবনে ওরা দ্যাখেনি, খাওয়া তো দূরের কথা। অনেক নন্দী আর ভৃঙ্গি যেন তান্ডব শুরু করেছে রেস্তোরাঁর মধ্যে। টেবিলে টেবিলে যেসব বিদেশী পুরুষ আর মহিলারা পানীয়, মুখরোচক খাবার সহযোগে গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিল তারা প্রথমে ঐ ভিখিরির

দলকে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়ে সটকে পড়েছে। নীরদবরণের হতভম্ব ভাবটা
কাটতে তাঁরও মনে হল, এখনই পালিয়ে যাওয়া দরকার। তিনি এগোতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কীভাবে এগোবেন? যেদিকে তাকাচ্ছেন কঙ্কালসার মানুষেরা ভিড় করে আছে। তাদের কোটরগত তীক্ষ্ণ চোখ আর শ্বাপদের মতন মুখব্যাদান দেখে ভয় পাচ্ছিলেন নীরদবরণ। মনে হচ্ছে কামড়ে দেবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে উন্মত্তের মতন। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া এখনই দরকার। পুলিশ আসছে না কেন? কোথায় পুলিশ?

সাঁ্যাৎ করে কী একটা এসে লাগল নীরদবরণের কোটে। চিকেন-কাবাব নিয়েছিলেন তিনি। একজন ভিখিরি কাচের বাটিটা দু-হাতে তুলেছে, পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন নীরদবরণ। বাটি কাত হয়ে কাবাব হিলহিলিয়ে পড়ছে তাঁর কোটে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ভিখিরিটার। সে চিকেনের ঠ্যাং নিজের মুখে আস্ত পুরে দিয়েছে। একটা রাক্ষসের মতন লাগছে লোকটাকে। নীরদবরণকে ঠেলে আর একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল টোস্ট-ভর্তি প্লেটের ওপর। কাঁটা-চামচ সব পড়ে গেল মেঝেতে। মদের গ্লাস হাতের ধাক্কায় টেবিল থেকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

—গো টু হেল, ইউ ডার্টি বেগার! —নীরদবরণ বললেন। হাতের ঠেলা দিলেন লোকটাকে। তাতে লোকটা চিৎপটাং হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। নিমেষে তার সঙ্গী ভিখিরিরা খেপে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীরদবরণের ওপর। তাঁর টাই ধরে টান দিল একজন। গলায় চাপ পড়ছিল। দম আটকে আসছিল নীরদবরণের। কাশির দমক এসে গেল। কাশতে কাশতেই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। কপালটা জোরে ঠুকে গেল শ্বেতপাথরের মেঝেতে। ঠিক সেই মুহূর্তে নীরদবরণ দেখলেন লাঠি উঁচিয়ে লাল-পাগড়িধারী পুলিশ ঢুকে পড়েছে রেস্তোরাঁর ভেতর। বেধড়ক লাঠিচার্জ করছিল ওরা। ভিখিরিদের কারোর মাথা ফাটল, কারো হাত ভাঙল হয়ত, ভেসে আসছিল ওদের কাতরানি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছে পুলিশ। কিন্তু নীরদবরণের সেদিকে খেয়াল নেই। তাঁর কপালে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। আর কাশি যেন থামতেই চাইছিল না। —আর ইউ হার্ট মিস্টার? —একজন লম্বা-চওড়া গোরা সার্জেন্ট নীরদবরণকে মাটি থেকে টেনে তুলল।

—থ্যাঙ্ক ইউ—নীরদবরণ অস্ফুটে বললেন। কাশলেন—খক্‌খক্।

—উড ইউ লাইক আ গ্লাস অব ওয়াটার?—জিগ্যেস করল সার্জেন্ট।

—ইয়েস প্লিজ।

সার্জেন্ট নিজেই এক গ্লাস জল বাড়িয়ে দিল। নীরদবরণ এক নিমেষে জলটা খেয়ে নিলেন। বেশ স্বস্তি পেলেন।

—হ্যাভ ইউ অ্যারেস্টেড দোজ বেগারস?

—ইয়েস সাম অব দেম। আদারস হ্যাভ ফ্লেড।

—হাউ দে ক্যান টেক এন্ট্রি হিয়ার?

—নাথিং ডুয়িং স্যার।—সাজেন্ট জানাল; দি এনটায়ার সিটি ইজ টিমিং উইথ সাচ ফেমিন-স্ট্রিকেন পিপল! মেনি অব দেম আর ডায়িং অন্য দ্য স্ট্রিট। উই আর রিয়েলী পাসিং থ্রু ব্যাড ডেজ....।

এরপর আর বেশি কথা হয়নি। সার্জেন্ট ইংরেজ হলেও দুর্বিনীত এবং দুর্মুখ নয়। সে নিজেই নীরদবরণের হাত ধরে নিয়ে এল রেস্তোরাঁর বাইরে। নীরদবরণের নির্দেশ মতন তাঁর অফিসের গাড়িতে তুলে দিল।

—স্যার ইউ আর লুকিং সিক। ইউ নিড সাম রেস্ট।

—থ্যাঙ্ক ইউ ইয়াং ম্যান। আই কুড টেক কেয়ার অব মাইসেল্ফ। বাই-বাই।—মাথায় সত্যি যন্ত্রণা হচ্ছিল। গলার কাছেও অস্বস্তি; কোট নোংরা, ট্রাউজারে ধুলো; তা সত্ত্বেও নিজের সপ্রতিভতা হারাননি। চালক রহমান শুধোল—কোথায় যাব স্যার? অফিস—নাহ....হাওড়াতে চলো...বাড়িতে। অতি কষ্টে জানালেন নীরদবরণ।

দুপুরবেলা বাড়িতে শুধু ক্ষীরোদ আর তার স্ত্রী বন্দনা ছিল। হাবুর মা একতলায় রান্না ঘরের পাশে ভাড়ার ঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। দরজাতে কড়া নড়ছিল। জোরে জোরে নড়ছিল। হাবুর মা গজগজ করতে করতে দরজা খুলে নীরদবরণকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

—ওমা বড়বাবু অমনি? হাঁফাচ্ছেন কেন? কী হয়েচে? নীরদবরণ উত্তর না দিয়ে টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে উঠতে লাগলেন। নিজের ঘরে গিয়ে সটান বিছানয় ছেড়ে দিলেন নিজেকে। বাইরের জামাকাপড়-জুতোসহ এই প্রথম তিনি এ-বাড়ির বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

হাবুর মায়ের চেঁচামেচিতে ক্ষীরোদ আর বন্দনা ছুটে এল। বারিদবরণ যথারীতি কলেজে। অসিত স্কুলে।

—কী হয়েচে বাবা? আপনি কি অসুস্থ?

—হ্যাঁ। বিরক্ত কোরো না। বড় কাশি হচ্ছে। বিভূতি ডাক্তারকে খবর দিতে পারবে?

বিভূতি ডাক্তার এ পাড়ারই বাসিন্দা। আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষীরোদ তাকে ডেকে আনল। বিভূতি ডাক্তার নীরদবরণকে দেখেই বুঝলেন তাঁর জ্বর এসেছে। কাশছেন অনবরত। ইতিমধ্যে কোনওরকেম বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের জামাকাপড় খুলে ফেলেছেন নীরদবরণ। ধুতি আর একটা ফতুয়া এখন তাঁর পরনে।

—কাশি কমাবার মেডিসিন দাও বিভূতি। গলায় ভীষণ পেইন হচ্ছে...।

কেন যে গলায় এরকম যন্ত্রণা তা না বুঝেই ডাক্তার একটা পুরিয়া খাইয়ে দিল রোগীকে। তাতে অবশ্য কাশিটা কমল। কিন্তু রাতের দিকে নীরদবরণের অবস্থার অবনতি হল। কাশতে কাশতে গলায় রক্ত উঠে এল তাঁর। কাশিও বন্ধ হচ্ছে না। রক্তপাতও বন্ধ হচ্ছে না। আবার ক্ষীরোদ ডেকে নিয়ে এল বিভূতি ডাক্তারকে। আবার পুরিয়া। তাতে কিছুটা কমল কাশি। পরদিন সকালে নীরদবরণ কথা বলতে পারছিলেন না। ১০২ ডিগ্রি জ্বর উঠে গেল। ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে গলা দিয়ে। বিভূতি ডাক্তার আর ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি বললেন পেশেন্টকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া উচিত। রহমান মনিবের অবস্থা দেখে গ্যারেজে ফেরেনি। গাড়িতেই মশার কামড় খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। বিশ্বদেবকে ডেকে নিয়ে এল ক্ষীরোদ। বিশ্বদেব, ক্ষীরোদ আর বারিদ নীরদবরণকে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এল। তাকে পরীক্ষা করার পর একজন ডাক্তার জানালেন যে, পেশেন্টের গলায় ক্যানসার আছে। বেশ দেরি হয়ে গেছে। এতদিন পরে হাসপাতালে কেন? আরও আগে আসা উচিত ছিল। পেশেন্টকে বাঁচাতে হলে তার গলার একটা মেজর অপারেশান করতে হবে। খবরটা নীরদবরণ ও অন্যদের কাছে বিনা মেঘে ব্রজপাতের মতন শোনাল।

উনআশি

একদিন অফিসে ছুটি নিয়ে বিশ্বদেব বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যেতে বাধ্য হল। শুভ্রার আজকাল কী হয়েছে। সে সামান্য কারণে বাড়িতে অশান্তি শুরু করেছে। সারাদিন মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। ভাই-বোনদের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলে না। মা-এর সঙ্গে কত বকবক করত। আজকাল

তাও করে না। তাহ'লে গল্পের বই পড়ুক বসে বসে। বিশ্বদেব কলকাতায় পাকাপাকিভাবে ফিরে এসে আবার টুকটাক বইপত্র কেনা শুরু করেছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী সে কয়েক খণ্ড কিনে এনেছে। নিজেও পড়বে। স্ত্রী এবং শুভ্রাও পড়বে। সুনীতিরও বই পড়ার বাতিক আছে। তবে সে বইয়ের পোকা নয়। বাড়ির কাজকর্ম সেরে যদি ইচ্ছে হয় তাহলে একটু-আধটু বই খুলে বসে। তবে সুনীতির সমস্যা হল সে একটানা বেশিক্ষণ বই পড়তে পারে না। আধঘন্টা বড় জোর। তারপরই তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। বিশ্বদেবের অন্য দুই ছেলে এবং এক মেয়ে এখনও নিচু ক্লাসে পড়ে। একমাত্র শুভ্রাই এ-বাড়িতে আছে, যে বইয়ের কদর জানে। নীরদবরণ এই একটা অভ্যাস নাতনিকে করিয়েছেন। সেটা হল সাহিত্যপাঠ। বিশ্বদেব ভেবেছিল নতুন রচনাবলী হাতে পেয়ে শুভ্রা আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না। তিন খন্ডে রচনাবলী কিনেছে বিশ্বদেব। শুভ্রাকে ডেকে সে যখন বইগুলো দেখাল তখন মেয়ে খুব একটা যে আগ্রহ প্রকাশ করল তা নয়।

—বঙ্কিমবাবুর কটা উপন্যাস পড়েচিস রে সুবু?

—দুটো।

—কী কী?

—দুর্গেশনন্দিনী আর রাজসিংহ....।

—এবার তাহ'লে বাকিগুলো পড়ে ফেল। কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ...। বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধও খুব ভাল। কৃষ্ণচরিত পড়ে দ্যাখ। খুব আনন্দ পাবি। কী কল্পনা! কী ইনটেলেক্ট?

—বই-টই পড়তে আর ভাল লাগে না।—মুখ বেঁকিয়ে শুভ্রা বলেছিল।

—ভাল লাগে না? কেন রে?

—জানি না। শুভ্রা আর দাঁড়ায়নি। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বদেব একটু অবাক হয়েছিল। তারপর ভেবেছিল একটা কারণে শুভ্রার মন খারাপ থাকতে পারে। সেটা হল নীরদবরণের অসুখ। নীরদবরণের গলায় ক্যানসার ধরা পড়ার পর বিশ্বদেব নিজেই খুব ঘাবড়ে গেছে। একটা খুব বড় অপারেশান হয়েছে নীরদবরণের। তাঁর গলার ক্ষত যে ক্রমশ মারণরোগ ক্যানসারে পরিণত হবে সেটা নীরদবরণ বুঝতেই পারেননি। হাসপাতালের ডঃ সান্যাল, খুব বড় সার্জন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদের। ডাক্তার বলেছিলেন যে, প্রথম থেকে যদি নীরদবরণ গলায় ব্যথা কিংবা জ্বালা করার ব্যাপারটাকে একটু গুরুত্ব দিতেন, সরাসরি চলে আসতেন মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ; তাহলে হয়তো গলার টিউমারটি এত তাড়াতাড়ি ম্যালিগন্যান্ট হয়ে উঠত না। ঠিকঠাক ওষুধ পড়লে গলার ক্ষত হয়তো সারিয়েও তোলা যেত। কিন্তু নীরদবরণ রোগটাকে পাত্তা দেননি। তাঁর বন্ধু ডাক্তার রোগের ডায়াগনসিসই ঠিকমতন করতে পারেননি। তিনি গলার নলির কাছাকাছি ছোট্ট মুসুর দানার মতন টিউমারটিকে মারাত্মক মনেই করেননি। শ্লেষ্মার ঘা ভেবেছিলেন। সেই ভাবেই ওষুধ দিয়ে গেছেন। আর নীরদবরণ দিনের পর দিন ভুল ওষুধ খেয়ে, মদ্যপান আর ধূমপান একনাগাড়ে চালিয়ে রোগটিকে আরও বাড়িয়ে গেছেন। যে অবস্থায় নীরববরণ ডঃ সান্যালের কাছে গিয়েছিলেন তখন অপারেশান করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। নিঃসন্দেহে খুব মেজর অপারেশানই করতে হয়েছে। গলায় টিউমারটি উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ায় ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়ায় রক্তসঞ্চালন বাধা পাচ্ছিল। বাড়ির নর্দমা যেমন নোংরা-আবর্জনায় উপচে পড়লে জল চলাচলের রাস্তা বাধা পায়। ফলে দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে ওঠে। তেমনই নীরদবরণের গলার বিষাক্ত টিউমারটি রক্ত-চলাচলে বাধা

সৃষ্টি করছিল। তার ফলে রক্ত জমে মাঝেমাঝে গলা দিয়ে উপচে বেরিয়ে আসছিল। সে কারণেই নীরদবরণ কয়েকবার রক্তবমি করেছেন। ডাক্তার গলায় অপারেশান করে টিউমারটি বাদ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তারজালির একটা টিউব গলায় সরু হয়ে যাওয়া নালিতে পারিয়ে দিয়ে রক্ত চলাচল অবাধ ও স্বাভাবিক করে দিয়েছেন। এখন অপারেশানের পর নীরদবরণ ভীষণ অসুস্থ। তাঁর পথ্য যাবতীয় তরল জাতীয় খাবার। চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে। প্রায় সবসময়েই শুয়ে থাকতে হয়। কথা বলতে পারেন না। বিছানার পাশে ছোট প্যাড আর ফাউন্টেন পেন থাকে। যদি কিছু জানাতে হয় অতি কষ্টে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে কোনওরকমে লিখে জানান। জল খেতে হলে নীরদবরণ হয়তো মাথার কাছে টেবিলে রাখা জলের জাগ দেখালেন। তাতে সবাই বুঝতে পারল তিনি জল পান করতে চাইছেন। কিন্তু যদি টয়লেটের প্রয়োজন হয়, নীরদবরণ অতি কষ্টে লেখেন প্যাডের টুকরো কাগজে—পায়খানা কিংবা পেচ্ছাপ। তখন বিছানায় বেডপ্যান নিয়ে আসা হয়। হাওড়া শহরে ১৯৪৩ সালে নার্স পাওয়া ছিল অসম্ভব। বাড়ির লোকেরাই নীরদবরণের পরিচর্যা করে। নার্সের কাজ প্রায় সময়েই করে ক্ষীরোদ। এছাড়া অসিত এবং বারিদও দাদাকে এব্যাপারে সাহায্য করে। বিকেলের দিকে সুনীতি প্রায় নিয়মিত যায়। মায়ের সঙ্গে শুভ্রাও যায়। মামার বাড়িতে হেঁসেলের দায়িত্ব সামলায় হাবুর মা। মাঝে মাঝে সুনীতি বিকেলের দিকে ও-বাড়িতে গিয়ে বাবাকে ফলের রস খাইয়ে আসে। দাদুর অবস্থা দেখে শুভ্রা মনে মনে সত্যি খুব মুষড়ে পড়েছে। সে বাড়িতে একা একা বসে প্রায়ই কাঁদে। দাদুকে শুভ্রা সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তার শৈশব এবং কৈশোরের অনেকটাই নীরদবরণের সাহচর্যে কেটেছে। নাতনিকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করতে চেয়েছেন নীরদবরণ। গড়ে-পিটে নিতে চেয়েছেন।

এক রবিবার বিশ্বদেব স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সকাল থেকে শ্বশুরবাড়িতে ছিল। ক্ষীরোদকে সে বাজার করতে দেয়নি। নিজেই বাজার করে নিয়ে গিয়েছিল। নীরদবরণ এখন চিকেন সুপ খান। চিকেন সুপের পাউডার একমাত্র কলকাতায় হগ সাহেবের বাজারে মেলে। বিশ্বদেবই তা খুঁজে খুঁজে কিনে আনে। অনেকদিন পর সেদিন নীরদবরণের বাড়িতে উৎসবের আমেজ। হাবুর মা এবং সুনীতি রান্না করেছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর নীরদবরণের ঘরে ওরা চারজন বসেছিল। বিশ্বদেব, সুনীতি, ক্ষীরোদ আর শুভ্রা। বারিদ তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। অসিত একতলার ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল। খাটের বিছানায় শুয়েছিলেন নীরদবরণ। ঘুমোচ্ছিলেন কি না বোঝা যাচ্ছিল না। চোখ বুজিয়ে শুয়ে ছিলেন। মেঝেতে মাদুর পেতে ওরা চারজন বসে গল্প করছিল। প্রায় দিন কুড়ি নীরদবরণ অফিসে যেতে পারছেন না। কিন্তু সাহেবি কোম্পানি খুবই ভদ্র। একজন বাঙালি বাবুকে এক হাজার টাকা চেক দিয়ে কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন নীরদবরণের বাড়িতে। সেই বাবু একটা চিঠিও এনেছিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। সেই চিঠিতে নীরদবরণের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছিল আর জানানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে যা টাকা প্রয়োজন অফিস থেকে দেওয়া হবে। সেই চেক আর চিঠি ক্ষীরোদ দেখিয়েছিল নীরদবরণকে। শুয়ে শুয়ে সেই চিঠি পড়ে নীরদবরণের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠেছিল। তিনি অতি কষ্টে উঠে বসে প্যাডের কাগজে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে লিখেছিলেন—ডিয়ার স্যার আই ডু কনভে মাই হার্টফেলট থ্যাঙ্কস ফর দ্য জেনেরোসিটি শোন টু মি।...তারপর আরও লিখেছিলেন—আই হোপ আই শ্যাল কাম রাউন্ড সুন অ্যান্ড কুড জয়েন এগেইন। বাঙালি বাবুটি কর্তৃপক্ষকে লেখা নীরদবরণের সেই চিঠি নিয়ে চলে গিয়েছিল। সেদিন দুপুরে ক্ষীরোদ এসব কথা জানাচ্ছিল ওদের। বেশ গল্প চলছিল। এমন সময় নীরদবরণ কোঁ

কোঁ শব্দ করতে লাগলেন। সুনীতি চমকে উঠে ছুটে গেল বাবার বিছানার পাশে। জিগ্যেস করল—বাবা! বাবা! কষ্ট হচ্ছে?

ক্ষীরোদ বলল—কষ্ট না। বাবা বোধহয় কিছু বলতে চাইচেন। কিছু বলতে চাইলে বাবা ঐভাবে আমাদের ডাকেন।

—কী বলবে বাবা?—সুনীতি জিজ্ঞেস করল।

নীরদবরণ কাগজের প্যাড আর কলমের দিকে ইশারা করলেন। ক্ষীরোদ তাঁকে ধরে তুলে পিঠে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দিল। বিশ্বদেব এগিয়ে দিল কাগজ আর কলম। যন্ত্রণায় একবার মুখ বেঁকালেন নীরদবরণ। তারপর দ্রুত খস্‌খস্‌ করে লিখলেন। প্যাড এগিয়ে দিলেন বিশ্বদেবের দিকে। বিশ্বদেব পড়ল। কাগজে লেখা আছে—মনীশের খবর কী? বিশ্বদেব আর কী বলবে? সে বলল—কোনও খবর নেই। তখন নীরদবরণ আবার লিখলেন—মনীশের খবর নেওয়া উচিত। সুবুর মেমারি যাওয়া উচিত।...

কিন্তু নীরদবরণ বললেই তো আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না। বিশ্বদেবের একটাই ভয়। যদি যোগাযোগ করতে গেলে ওরা—সতীশবাবু আর মনীশ কোনও অপমানজনক কথা বলে? তাহলে বিশ্বদেবও মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না। আর সে যদি মাথা গরম করে তাহলে ওদের সঙ্গে সন্ধির সুযোগ একেবারেই হাতের বাইরে চলে যাবে। তারপর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা শুনে শুভ্রা যদি আবার বেঁকে বসে। আবার যদি সে মনীশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে? কিন্তু শুভ্রার মন তার মা কিংবা বাবা ঠিক পড়তে পারেনি। অচিরেই তা বোঝা গেল...।

শুভ্রার মনে যে কত বাষ্প আর অভিমান জমে ছিল তা বিশ্বদেব এবং সুনীতি দুজনেই বুঝল যখন অতি সামান্য কারণে মেয়েটা মেজাজ হারাল। অতি সামান্য কারণ? হ্যাঁ সামান্যই তো। চালকুমড়ো এনেছিল বিশ্বদেব বাজার থেকে। সুনীতি চালকুমড়ো রাঁধতে পছন্দ করে নারকেল কুরো দিয়ে। এই রান্নাটা বিশ্বদেবের বিশেষ প্রিয়। সকাল আটটা বেজে গেছে। বিশ্বদেব দাড়ি কামাতে ব্যস্ত। সে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় অফিস বের হয়। উনুনে ভাত ফুটছে। ডাল চাপাবে সুনীতি। তারপর চালকুমড়োর ঘন্ট রেঁধে ফেলবে। আজ শুধু এই খাবার। মাছ রোজ কেনা সম্ভব নয়। মাংস কদাচিৎ এ বাড়িতে ঢোকে। অবশ্য ভাত, ডাল, চালকুমড়োর ঘন্টর সঙ্গে আলু ভাতেও থাকবে। কাঁচা লংকার কুঁচি দিয়ে আলুভাতে। আহ, কী অপূর্ব স্বাদ!

অন্য ছেলেমেয়েরা ওপাশের ছোট ঘরে বসে পড়াশোনা করছে। এ বাড়িতে দুটো ঘর। একটুকরো দালান। বাইরে রোয়াক একফালি। আর উঠোন। উঠোনেই কুয়ো। সেটাই জলের উৎস এ-বাড়িতে। খাবার জল অবশ্য রাস্তার কর্পোরেশনের কল থেকে আনা হয়।

শুভ্রা কিছুই করছিল না তেমন। রোয়াকে একপাশে চুপ করে বসে উঠোনের জবা-গাছে চড়ুই এবং শালিকদের আনাগোনা দেখছিল। সে কী ভাবছিল কে জানে? তার চোখের দৃষ্টি ছিল বিষণ্ণ। ঠোঁট দুটি টিপে বন্ধ করা। মুখে বাক্যি নেই।

সুনীতির মনে হয়েছিল সুবুকে ডাকা উচিত। নারকেলটা ওকে দিয়ে কুরোনো উচিত। সকালবেলা একেবারে চুপচাপ অত বড় মেয়ে বসে থাকবে? সংসারের দু-একটা কাজ তো করাই উচিত। রান্নাঘর থেকে সে ডাক দিল—সুবু! এই সুবু? এদিকে একটু আয় মা? নারকেলটা একটু কুরে দে? সুনীতির ডাক কানে যাচ্ছিল বিশ্বদেবের। দেয়ালের পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে সে দাড়ি কামাচ্ছিল। কিন্তু সুবুর দিক থেকে কোনও সাড়া নেই। সে কি শুনতে পাচ্ছে না? সুনীতি বারবার ডাকছিল।

যখন তাড়াতাড়ি থাকে তখনই মনে হয়, ঘড়ির কাঁটা দ্রুততালে ছুটছে। দেয়াল-ঘড়িতে ঢং শব্দে সাড়ে-আটটা বাজল। সুনীতির রক্তচাপ বাড়ছিল। এবার বিশ্বদেব চানে যাবে। তারপরই এসে ভাত চাইবে। ওদিকে উনুনে ডাল ফুটছে। এখনই নামিয়ে সাঁতলে ফেলা উচিত। কোন্‌দিকে যাবে সুনীতি? এদিকে নারকেল কুরে ফেলার কাজটাও বাকি। ঝাঁ করে রাগ হয়ে গেল তার। তাড়াতাড়ি ডালটা উনুন থেকে নামিয়ে গামলায় ঢালল সে। তারপর কড়াইয়ে ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে ফেলল ডাল। এখনও নারকেল কুরো বাকি। ঢাল কুমড়োটাও কুটতে হবে। এত করে ডাকছে মেয়েটাকে অথচ তার সাড়াশব্দ নেই। ঝাঁ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল সুনীতির। সে দ্রুত রোয়াকে বেরিয়ে এসে দেখল উদাস দৃষ্টিতে জবা-গাছের দিকে তাকিয়ে সুবু বসে আছে। এত করে যে সুনীতি ডাকছে, তার কি কানে ঢুকছে না?

—হ্যাঁরে এই সুবু...এই?—সুনীতি ডাকল শুভ্রার সম্বিত ফিরল যেন। সে চমকে মায়ের দিকে তাকাল।

—কী হল? ওরকম চেঁচাচ্ছ কেন মা?

—ওরকম চেঁচাচ্ছি কেন? বলিহারি আক্কেল তোব? সকালে তোর বাবাকে অফিসের ভাত দিতে কীরকম তাড়া করতে হয় বুঝিস না? একটু নিজে থেকে রান্নাঘরে এসে যে হাত লাগাবি সেটা হবে না। সকালবেলা নিরম্বু বসে বসে কী আকাশপাতাল ভাবিস?

—ওরকম চেঁচামেচি করছ কেন মা? ডাকলেই তো হয় আমাকে। আমি কি কিছু করব না বলেছি?

—আর কত ডাকব? তখন থেকে ডেকে ডেকে আমার গলা শুকিয়ে যাবার যোগাড়। তোর কোনও আক্কেল নেই? দেখিস না কীভাবে একা হাতে আমাকে সংসারটা সামলাতে হয়? সকালবেলা চুপচাপ বসে আছিস। লজ্জাও করে না?

—মা ওভাবে কথা বলবে না। তুমি ডেকেছ হয়তো আমি শুনতে পাইনি। বলোতো কী করতে হবে?

—আর বলব না। আমি নিজে যা পারি তাই করে দেব। তোর বাবা শুধু ভাত ডাল আর আলুভাতে খেয়ে আজ অফিস যাবে?...কী যে মতিগতি তোর? একটা বিয়ে দেওয়া হল সেখান থেকে পালিয়ে এলি। ওরকম ধিঙ্গি আর অসভ্য মেয়েকে সংসারে পুষতে হয়নি, সতীশবাবুরা বেঁচেছে...।—এই কথাগুলো হয়ত সত্যিই বলতে চায়নি সুনীতি। কিন্তু তার মনেও তো অনেক ক্ষোভ জমে আছে। আজ পরিস্থিতির চাপে সেই ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু শুভ্রা মায়ের এই তিরস্কার সহ্য করতে পারল না। সে ছুটে গেল বিশ্বদেবের কাছে। বিশ্বদেবের দাড়ি-কামানো শেষ। সে রেজরের প্যাঁচ খুলে ব্লেড বের করে গামছায় মুছছিল।

—বাবা! বাবা!—শুভ্রা ডাকল।

—কী হল? ওরকম করছিস কেন মা?

—বাবা তুমি আজই আমাকে দিয়ে আসবে...ফুঁপিয়ে বলল শুভ্রা।

—কোথায় দিয়ে আসব?

—মেমারিতে।...আমি ওদের বাড়ি...ওর কাছে ফিরে যেতে চাই। তোমাদের সংসারে থাকতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। আমি জানি ওদের আমি অপমান করেছিলাম বলে, আমি মেমারি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম বলে দাদু মনে খুবই দুঃখ পেয়েছে। দাদুকেও আমি আর কষ্ট দিতে চাই না। এমনিতেই দাদু এখন বিছানায় শুয়ে অনেক কষ্ট পাচ্ছে। আর আমি ওঁকে

কষ্ট দিতে চাই না...।

—তুই কি সত্যিই মেমারিতে ফিরে যেতে চাস মা? মনস্থির করে বল?

—হ্যাঁ। ফিরে যেতে চাই। মনস্থির আমি করেই ফেলেছি বাবা। ওরা আমাকে অপমান করলেও আমি আর পালিয়ে আসব না। ওখানেই থাকব। ওদের বাড়িই এখন আমার জায়গা।

এবার শুভ্রা হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। বিশ্বদেব অস্বস্তি বোধ করে। যদিও মনে মনে আনন্দও পায়। এতদিনে মেয়ের মতিভ্রম ঘুচেছে। সুনীতি রান্নাঘরে ফিরে গেছে। মেয়েকে বকাবকি করে সেও যেন মুষড়ে পড়েছে। সুবুকে তো সে এসব বলতে চায়নি। হঠাৎ ওরকম কটূ কথা কেন সে বলল? অনুশোচনা হচ্ছিল তার। আর সেই গুমরানো অনুশোচনা নিয়েই সে চালকুমড়ো কুটতে বসেছিল।

রান্নাঘরে হঠাৎ বিশ্বদেব উঁকি দিল। পরনে খাটো ধুতি, কাঁধে গামছা। সুনীতি ঘুরে তাকাল।

—কী হল আবার?

—তোমাকে এত তাড়াহুড়ো করতে হবে না। আমি আজ অফিস যাব না।

—অফিস যাবে না মানে?

—অনেক ছুটি পাওনা আচে। একদিন ছুটি নেব। সাহেব তো প্রায়ই বলে আমাকে, বাবু তুমি মাঝে মাঝে ছুটি নাও না কেন? শুধু কাজ করো? তো সাহেবের কথা মেনে আজ ছুটিই নেব।

—হঠাৎ ছুটি নেবে কেন শুনি?

—বেলা করে খেয়ে-দেয়ে একটু বের হব।

—বাবাকে দেখতে যাবে?

—সে যাবখন বিকেলের দিকে।...প্রথমে একটু শিবপুর যাব।

—শিবপুর? সেখেনে আবার কী কাজ?

—শিবপুরে কে থাকে মনে নেই?

—শিবপুরে আবার কে থাকবে?

—তোমার জামাই সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

—সে যদি তোমাকে অপমান করে? তোমার মেয়ে তো তাকে কম অপমান করতে ছাড়েনি...

—দেখাই যাক না কী হয়। মনীশ শিক্ষিত ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়চে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। সে কি চট করে আমাকে কটূ কথা বলবে? যদি বলে আমি তার হাত ধরে ক্ষমা চাইব। সুবুকে নিয়ে যেতে বলব। সুবু নিজেই তো শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইচে?

—তোমার মেয়েকে আমার বিশ্বাস নেই বাবা! কখন যে ও কী চায়! ওর মনের মতিগতি বোঝা মুশকিল। আমার বাবার সঙ্গে থেকে থেকে ওর ওরকম মিলিটারি মেজাজ হয়েচে!

—চুপ চুপ! তুমি আর মেয়েকে খেপিয়ো না। ও ভুল করেছিল বুঝতে পেরেচে। এবার যখন জামাইয়ের সঙ্গে থাকতে শুরু করবে, শরীরে বিয়ের জল পড়বে তখন দেখবে ও আর বাপের বাড়ি আসতেই চাইবে না...। বিশ্বদেব চোখের ইঙ্গিত করে হাসে।

—ধ্যাৎ!—সুনীতি লজ্জা পায়।—বুড়ো হতে চললে এখনও উলটো পালটা কথা বলতে আস্‌সোয়াস্তি হয় না তোমার? সুনীতি কপট রাগে ধমকে ওঠে। বিশ্বদেব দাঁত কেলিয়ে হাসে। তার মন বলছে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়ে স্বামীর ঘর করবে নির্বিঘ্নে। খুশি মনে সে কলতলার দিকে পা বাড়ায়...।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিশ্বদেব বেরিয়ে পড়ল। ততক্ষণে বাড়ির আবহাওয়া ভালর দিকে। নিম্নচাপ কেটে গিয়ে একটু যেন রোদের ঝলকানি। শুভ্রার ভাই-বোনেরা নিজেদের মধ্যে কীসব বকবক করছিল আর খেলছিল। ওদের স্কুল যাওয়ার উপায় নেই। কারণ স্কুলের বাড়িতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের জন্যে খোলা হয়েছে রিলিফ-ক্যাম্প। প্রতিদিন দু-বেলা সেখানে অনেক লোকের রান্না হয়। পাড়ার যুবকেরা সবকিছু তদারকি করে। বিশ্বদেব অফিস যাতায়াতের রাস্তায় লক্ষ করে ওদের ব্যাপার-স্যাপার। রান্না বোধহয় এমন কিছু হয় না। দুবেলা শুধু চাল আর ডালের খিচুড়ি। ঐ খিচুড়ির মধ্যেই বড় বড় আলু দু-ভাগ করে কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। খিদের মুখে ঐ খাবারই নিরন্নদের মুখে যথেষ্ট। এই রিলিফ-ক্যাম্প খোলার ব্যাপারে পাড়ার ছেলেদের উদ্যোগ তো আছেই। সরকারি সহায়তাও আছে। এ-পাড়ার রেশন-ডিলার সাত্যকি বিশ্বাসকে থানা থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তাকে বলে দেওয়া হয়েছে বে-আইনিভাবে খাদ্যদ্রব্য মজুত করা যাবে না। এ-পাড়ার রিলিফ-ক্যাম্পে চাল আর ডাল জোগাবে সে। এছাড়া গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাড়ার ছেলেরা সাহায্য চাইবে। গৃহস্থরাও যে খুব ভাল আছে তা নয়। চালের দাম সেই যে বেড়েছিল খুব যে নেমেছে তা বলা যাবে না। বিশ্বদেবদের মতন সাধারণ গেরস্থের সংসারেও অভাব আছে। তবুও তো তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। চালও কিছু কিছু মজুত আছে প্রত্যেক বাড়িতে। সেই সঞ্চয় থেকে এক মুঠো, দু-মুঠো চাল নিরন্নদের জন্যে তো দেওয়াই যায়।

ছেলেমেয়েদের স্কুল কতদিন বন্ধ থাকবে বলা যাবে না। অন্তত যতদিন রিলিফ-ক্যাম্পগুলো চলবে। ও বাড়িতে গতকালই গিয়েছিল বিশ্বদেব। শ্বশুরকে দেখতে। তখন ছোটশালা অসিতবরণের মুখে শুনেছে তাদের স্কুলও বন্ধ। ঐ রিলিফ-ক্যাম্প খোলার কারণে। অসিত যেহেতু ক্লাস টেনের ছাত্র তাকেও ঐ ক্যাম্পে খাটতে হয়। দেশজুড়ে অশান্তি। এখনও পরাধীন ভারত। সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। হিটলার প্রথমে একতরফা আঘাত করে যাচ্ছিল। পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া কব্জা করে নিয়েছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, রাশিয়া, আমেরিকা আর ইংল্যান্ড এক হয়েছে। লেনিনগ্রাদে, রাশিয়ান ফ্রন্টে হিটলারের সৈন্যরা খুব মার খেয়েছে। যদিও ফ্যাসিস্ত-বাহিনী আবার ফ্রান্সে ঘাঁটি গেড়েছে। প্যারিস এখন প্রায় হিটলার বাহিনীর দখলে। বিশ্বদেব কাগজপত্র পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাল-হকিকত বোঝার চেষ্টা করে। সব খবর তো পাওয়া যায় না। তাও যেটুকু খবরের কাগজে পড়তে পায়। রেডিও খুলে কানে শোনে। একটা কথা ভেবে তার কৌতুক-বোধ হয়। ব্রিটেন-আমেরিকা আর রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যালায়েড ফোর্স বা মিত্র-শক্তি গঠন করে ফ্যাসিস্ত-বাহিনীকে জব্দ করতে চাইছে। অথচ তারাই আবার ভারতবর্ষে স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছে। একি বিচিত্র বৈপরীত্য!

বিশ্বদেব যখন ধুতি আর শার্ট গলিয়ে, ছাতা বগলে, ক্যাম্বিসের শু পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তখন সে দেখল সুবু আর তার মায়ের মধ্যে আবার সন্ধি হয়ে গেছে। সত্যিই নিম্নচাপ কেটে গেছে। রান্নাঘরে মা আর মেয়েতে কী যেন করছিল আর গল্প চলছিল। বাড়ির বাইরে বের হবার সময় বিশ্বদেব জানতে চাইল—কী চলচে গো তোমাদের?

—এই একটু নারকেল নাড়ু করচি।—সুনীতি বলল।

—সুবু বুঝি হেল্প করচে?

—হ্যাঁ নারকেলের সঙ্গে গুড় দিয়ে পাকটা ওকেই করতে দিয়েচি। ...শিখতে হবে তো? আর দুদিন বাদে নিজের সংসারে গিয়ে তো মোহনভোগ, নাড়ু এসব বানাতে হবে....।

সুবু বোধহয় লজ্জা পেল। সে মুখটা নিচু করেই রইল।

—আমি বের হচ্চি বুঝলে?—বিশ্বদেব স্ত্রীকে বলল। সে যেন চাইছিল স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে। সুনীতি ইঙ্গিতটা বুঝল।

—হ্যাঁ চলো.... দরজাটা দিয়ে আসি। —সে উঠে এল। উঠোনে নেমে বিশ্বদেব ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল—সুবুকে বলেচ নাকি?

—কী?

—...যে আমি মণীশের কলেজে যাচ্চি ওর সঙ্গে কথা বলতে?

—বলেচি...।

—কী বলচে মেয়ে?

—কী আর বলবে? সুবু তো চাপা স্বভাবের। তবে খুশি হয়েচে সে তো বোঝাই যাচ্চে।

—জলের মাছ জলে ফিরিয়ে দেওয়াই ভাল।

—হ্যাঁ.... দ্যাখো জামাইয়ের মতিগতি কী....। অপমানিত যে সে হয়েচে সে ব্যাপারে তো ভুল নেই। এখন যদি মেয়েকে না নিতে চায়?

—ওহ তুমি সহজে এত হতাশ হয়ে পড় কেন?

হাওড়া শহরটা ঠিক একটা গোলকধাঁধার মতন। কত যে গলি-ঘুঁজি! বিশ্বদেব অনেকদিন এই শহরে হাঁটাচলা করেছে। সে অনেক শর্টকার্ট রাস্তা জানে। এখান থেকে সে হেঁটেই শিবপুর যাবে। সেখান থেকে বোটানিকাল গার্ডেন। তার ঠিক গায়েই বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। রোদ বেশ চড়া। মে মাস চলছে। বর্ষা আসতে এখনও দেরি। ছাতা মাথায় দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে বিশ্বদেব হাঁটছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আগে কোনওদিন আসেনি বিশ্বদেব। কোন বিল্ডিং-এ ক্লাশ হয়, কোনদিকে হোস্টেল কিছুই জানে না। এটুকু শুধু খেয়াল আছে যে মনীশ হল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র এবং এখন তার সেকেন্ড ইয়ার চলছে। আচ্ছা এরকমও তো হতে পারে যে, মনীশ হয়তো এখন হস্টেলে নেই। মেমারিতে নিজের বাড়ি ফিরে গেছে। তাহলে কী করবে বিশ্বদেব? আজ বিকেলেই কি মেমারি পাড়ি দেবে? সতীশবাবুর হাতে-পায়ে ধরবে? খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?... হোক, তাও পিছপা হবে না বিশ্বদেব। বিবাহিত মেয়েকে দিনের পর দিন নিজের বাড়িতে বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না। নীরদবরণ ঠিকই বলেছেন—সুবুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাও বিশ্বদেব.... আমার কথা শোনো... নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মের না....। তাছাড়া, সুবুর মনেও এখন পরিবর্তন এসেছে। সে বুঝেছে যে সে ভুল করেছে। স্বামী কালো না ফর্সা এই ব্যাপারটা বড় জীবনের ক্ষেত্রে, সংসারের ক্ষেত্রে একেবারেই গেনী। সংসারের সুখ-শান্তি নির্ভর করে স্বামী ও স্ত্রীর মানসিক বোঝাপড়ার ওপর।

কলেজে গেটে একজন দারোয়ান। ধুতির ওপর খাকি ইউনিফর্ম। পায়ে জুতো। হাতে ছোট বাঁশের লাঠি। লোকটা বোধহয় বিহারী।

—আপ কাঁহা যাইয়েগা?

—একজনের খোঁজে এয়েচি। —বিশ্বদেব বাংলাতেই বলল।

—কিসকো খুঁজতে এসেচেন্?

—মনীশ ভট্টাচার্য। সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট। সিভিল.....।

—ঐ বাড়িতে অফসার হ্যায়। আপ ওহি যায়ে। উসকো সাথ বাতচিত করিয়ে।

হলুদ একতলা বাড়ি। ইংরেজিতে লেখা Office। এখানে নিশ্চয়ই একজন অফিসার আছে।

তার সঙ্গে কথা বলাই ভাল। এখন মনীশ হোস্টেলে না ক্লাসে আছে সেই বোধহয় বলতে পারবে। এরকমও হতে পারে যে ক্লাসে কোনও বহিরাগতের প্রবেশাধিকার নেই। এমনকী ছেলেদের হস্টেলেও বোধহয় ঢোকা যায় না। এই কলেজের প্রিন্সিপাল একজন ব্রিটিশ এটা বিশ্বদেব জানে। আর ব্রিটিশ যেখানে থাকবে সেখানে ডিসিপ্লিনের অভাব হবে না।

অফিস-সুপারিনটেনডেনটের ঘরের পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল বিশ্বদেব—আসতে পারি?

—আপনি কে?—গৌরবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার লোকটি কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

—একজন স্টুডেন্ট সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেচি....।

—ভেতরে আসুন। .... বসুন। ... স্টুডেন্টের নাম?

—মনীশ ভট্টাচার্য.... সেকেন্ড ইয়ার... সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং....।

লোকটি টেবিলে রাখা একটা মোটা রেজিস্টার টেনে নিল। পাতা উলটে দেখতে লাগল। একটা পৃষ্ঠায় এসে থামল।

—ইয়েস মনীশ ভট্টাচার্যি... সেকেন্ড ইয়ার.... আপনি কি ওর আত্মীয়?

—আমি ওর ফাদার-ইন-ল.....

—আই সি....। কিছু দরকার আছে?

—ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। অফিসার মুখ তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিশ্বদেবের মুখের দিকে। কিছু বোঝার চেষ্টা করছে কি?

—আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওদের এখন ক্লাস চলছে। মিনিট দশ এখনও কনটিনিউ করবে ক্লাস। তারপর অবশ্য এক ঘন্টা লাঞ্চ টাইম। আমি খবর পাঠাচ্ছি। ক্লাস শেষ হলে মনীশ এই অফিসে এসে আপনার সঙ্গে কথা বলবে।

—ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করচি। বিশ্বদেব বলল।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই বিশ্বদেবের। বসে থাকতে থাকতে তার ঢুলুনি এসে গিয়েছিল কখন। একে বেশ বেলা করে খাওয়া হয়েছে। অফিস যাবে না এটা মনস্থ করার পর সে অন্যদিকের তুলনায় একটু বেশিই ভাত খেয়েছে যেন আজ। নারকেল দিয়ে চালকুমড়ো, মুগ-ডাল, বেগুনভাজা তার সঙ্গে আর একটা পদ ছিল। ঘরে পাতা দই। অতি উপাদেয় রান্না সুনীতির। এই এক কপাল বিশ্বদেবের। অনেক ভাগ্য করে সুনীতির মতন স্ত্রী পাওয়া যায়। একেবারে আদর্শ গৃহবধূ বললে যা বোঝায় সুনীতি তাই। সংসারটাকে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। তেমনি হাতের রান্নার গুণ। একপেট খেয়ে রীতিমতো ভর-দুপুরে অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসতে হয়েছে। শরীরে ক্লান্তিও ছিল। তাই অফিসঘরের একটি চেয়ারে বসতে পেয়ে বিশ্বদেবের চোখে কখন যেন ঘুমের আঠা মৃদুভাবে লেগে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরল খুব কাছে, প্রায় ঘাড়ের কাছে কণ্ঠস্বর শুনে—একী আপনি? চকিতে দু-চোখ ডলে নিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বিশ্বদেব তাকাল। দেখল সামনে দাঁড়িয়ে মনীশ। আহ কতদিন বাদে দেখছেন মনীশকে? একটু যেন শুকিয়ে গেছে! নাকি বিশ্বদেবের সেরকম মনে হচ্ছে। পরনে ধুতি আর ডোরাকাটা শার্ট। ডান-হাতে ধরা বই-খাতা। একেবারে সুশীল ছাত্রের বেশ মনীশের।

—কেমন আছো তুমি বাবা?—বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করল।

—ভালো আছি। আপনারা?.... মা, দাদু....? থামল মনীশ। শুভ্রার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কি থমকে গেল? জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কি না ভাবছে?

—সবাই একরকম আছে। তবে... বিশ্বদেব থামল।

—তবে? .... কারোর কিছু?

—হ্যাঁ। সুবুর দাদুর শরীর খারাপ। ... বেশ খারাপ বলতে পার।

—কী হয়েছে ওঁর?

—ডাক্তাররা ডিটেক্ট করেচে —ক্যানসার।....

—ক্যানসার? .... ওহ মাই গড! কোথায়?

—থ্রোট-ক্যানসার মনীশ। অপারেশান হয়েচে। বাট হী হ্যাজ বিন সাফারিং।.... যাক ওসব কথা পরে হবে। আমি কিন্তু আজ এসেচি তোমার সঙ্গে জরুরি কয়েকটা কথা বলতে। এখানেই বলব?

—এখানে?..... মনীশ অনিশ্চিতভাবে অফিসঘরের চারদিকে তাকাল। সুপারিনটেনডেন্ট ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে কোথায় যেন উঠে গেছেন। কিন্তু অফিসে আরও কজন আছে। যেখানে ওদের কথাবার্তা হচ্ছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে একজন কেরানিবাবু একটা মোটা খাতায় কীসব হিসেব করছে। কিন্তু তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেই বোঝা যায়, তার চোখ ঐ খেরোর খাতায় থাকলে কী হবে; কানদুটো খাড়া হয়ে আছে এদিকেই; —এরা দুজন কী আলোচনা করছে তাই শোনার জন্যে সে বোধহয় উন্মুখ।

—আপনাকে কোথায় নিয়ে যাই বলুন তো? আমার সঙ্গে ক্যান্টিনে যাবেন? আমার সঙ্গেই না হয় দুটি ডাল-ভাত খেয়ে নেবেন?

—নাহ.... ডাল- ভাত আমি খেয়ে এসেচি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আচ্ছা ওখানে ঐ গাছতলায় বসে দশ মিনিট একটু কথা বলে নিলে কেমন হয়?

বিশ্বদেব দূরে একটা ডালপালা ছড়িয়ে থাকা বটগাছের দিকে আঙুল দেখাল। ঐ বটগাছের নীচে আবার একটা কাঠের বেঞ্চও আছে। শুধু ঐ গাছটার নীচে তো নয়। চারপাশে আরও অনেক গাছের নীচে ওরকম বেঞ্চ পাতা আছে। বোঝা যায় এখানে ছাত্রেরা ঘুরতে-ফিরতে বসে, গল্পগাছা করে। অধ্যাপকরাও হয়ত ওখানে বসে বিশ্রাম নেন, আড্ডা দেন, গল্প করেন।

—ওখানে বসবেন? ..... হ্যাঁ তা বসা যায়।

—মাত্র দশ মিনিট সময় নেব বাবা। তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাব না।

বটগাছের নীচে বেঞ্চে পাশাপাশি দুজনে বসে। কোনও গাছের পাতার ভিড়ে ঘাপটি মেরে বসে একটা কোকিল ডাকছে—কু কু কু...। এখন তো বসন্তকাল নয়? ধু ধু গ্রীষ্ম। তাহলে কোকিল ডাকছে কেন? অসময়ে কোকিল ডাকে?

ডাকে হয়তো। মনে আনন্দ হলেই ডাকে। কী কারণে আনন্দ হল আবার কোকিলের? কিংবা এরকমও তো হতে পারে। ওর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতেই হয়ত ও ডাকাডাকি করছে। কিন্তু মনীশকে বেশিক্ষণ আটকানো ঠিক নয়। ও বেচারা আবার খেতে যাবে। খাবার পর আবার হয়ত ক্লাশ।

—মনীশ তোমাকে একটা কথা বলতে এয়েচি।

—হ্যাঁ বলুন?

—সুবু... আমার মেয়ে... তোমার স্ত্রী.. এবার শ্বশুরবাড়ি যাবে বলচে।

কথাটা শুনে মনীশ যে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তা নয়। মুখ নিচু করে কী যেন ভাবছিল।

—তুমি একদিন এসে ওকে নিয়ে যাও মনীশ।

—কিন্তু....

—এতে কোনও কিন্তু থাকতে পারে না মনীশ....

—বাবার অনুমতি না পেলে আমি আপনাদের বাড়ি যেতে পারব না।... ওকেও মানে আপনার মেয়েকেও আমাদের বাড়ি ঢোকাতে পারব না।

—তোমার বাবার সঙ্গে কি আমি কথা বলব?

—আপনি বলবেন? .... আমাকে আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দিন। আগামিকাল থেকেই তো আমার কলেজে ছুটি পড়ে যাচ্ছে।

—আগামিকাল থেকে ছুটি? তাহলে ঠিক সময়ে এসেচি বলো? দুদিন বাদে এলে তো দ্যাখাই হত না।

—হ্যাঁ। আগামিকাল থেকে আমাদের সামার ভেকেশন মাসখানেকের। তারপর কলেজ খুলেই সেকেন্ড ইয়ারের ফাইন্যাল।

—তাহলে তুমি কি কালই বাড়ি যাচ্ছ?

—কাল—দুপুরে।

—আমি কীভাবে জানব তোমার বাবার মতামত?

—আমি... আমরাই জানাব।....আপনি ব্যস্ত হবেন না। বাবা মনে হয় আপত্তি করবেন না।

বিশ্বদেব কয়েক মুহূর্ত কপাল কুঁচকে ভাবে।

—ঠিক আচে মনীশ। আমি তাহলে ফিরে যাচ্চি। দরকার হলে সতীশবাবু সুবুর মামাবাড়িতেও ফোন করে দিতে পারেন....।

—কিছু একটা খবর নিশ্চয়ই থাকবে।

—তাহলে এখন আমি যাই মনীশ। ঐ ঢং ঢং ঘন্টা পড়চে....

—হ্যাঁ। লাঞ্চের জন্যে ডাকা হচ্ছে আমাদের। এই কথা বলেই মনীশ আর বিলম্ব করল না। নিচু হয়ে বিশ্বদেবের পায়ের ধুলো নিল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল বিশ্বদেব।

—সুবু নিজের ভুল বুঝতে পেরেচে মনীশ। ও অনুতপ্ত।

—আমি কালো বলে ঘেন্না করবে না বলছেন?

—ওর মতিভ্রম হয়েছিল। এখন ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

—বিশ্বদেবের কথা শুনে মনীশ ম্লান হাসল। বিষণ্ণ হাসি।

—আপনাকে একা ফিরে যেতে হচ্ছে বলে খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু এখন তো আমাদের কলেজের বাইরে যাবার নিয়ম নেই।

—নাহ তা কেন যাবে? আমি কিন্তু সত্যিই খবরের জন্যে অপেক্ষা করব মনীশ। আমি—আমরা সবাই। দরকার হলে সতীশবাবুর হাতে ধরে ক্ষমাও চাইতে পারি।

—ছি ছি ছি এ কী বলছেন? এভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

কলেজের বাইরে এসে বিশ্বদেব হাতে-টানা রিকশয় উঠল। এখন কোথায় যাওয়া যায়? শ্বশুরবাড়িতেই যাবে। নীরদবরণ কেমন আছেন কে জানে...।

বিশ্বদেব যেদিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মনীশের সঙ্গে দ্যাখা করতে গিয়েছিল তারপর একদিন কাটল। ঠিক পরদিনই বেলা নটা নাগাদ ক্ষীরোদ দিদির বাড়ি এসে হাজির। একা নয়। সঙ্গে সতীশবাবু। অফিস যাবে বলে বিশ্বদেব তৈরি হচ্ছিল। সুনীতি তাকে খেতে দেবার তোড়জোড় করছিল। দরজাতে কড়া নড়ে উঠেছিল খট্ খট্ খট্। শুভ্রার ছোটভাই দরজা খুলেছিল। মামাকে

দেখে সে উল্লসিত হল যথারীতি। কিন্তু মামার সঙ্গে বেঁটে, কালো, রোগা, টাকমাথা এই লোকটি কে? ক্ষীরোদ উঠোনে ঢুকে পড়েছে। তাকে অনুসরণ করে সতীশবাবু।

—তোদের বাবা কোথায় রে? ....মা?

ক্ষীরোদের গলা বিশ্বদেব শুনেই ঘর থেকে রোয়াকে বেরিয়ে এল। সতীশবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—আরে কী সৌভাগ্য! সতীশবাবু যে! আসুন আসুন! ওগো শুনচ?.... ক্ষীরোদ এয়েচে.... আর বেয়াইমশাইও এয়েচেন।

সুনীতিও সতীশবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে একটা কাঠের চেয়ার। বিশ্বদেব সতীশবাবুকে সেখানে বসাল। সুনীতি মাদুর পেতে দিল। বলল—বোস ক্ষীরোদ....।

—সে তো বসচি! আমার গুণধর ভাগনিটি কোথায় গেল? সুবু? কোথায় গেলি রে?

—সুবু চান করতে গেচে। —সুনীতি জানাল।

—সতীশবাবু তো আজ ভোরের ট্রেনেই মেমারি থেকে এখেনে চলে এয়েচেন রে দিদি!

বিশ্বদেব পাশের ঘরে সার্ট চড়াচ্ছিল। ভাবছিল অফিস যাবে কি না? পরশুদিন অফিস যায়নি। আবার আজ কামাই করবে? অফিসে কাজ জমে আছে অনেক। কিন্তু স্বয়ং সতীশবাবু তার বাড়িতে এসে হাজির। তাঁকে আপ্যায়ন না করে সে অফিসেই বা যায় কীভাবে? এরকম সাতপাঁচ ভাবছে যখন বিশ্বদেব তখনই ক্ষীরোদ মুখ বাড়াল।

—তুমি কি অফিস যাবার কথা ভাবচ নাকি? দাদাবাবু?

—ভাবছিলুম কী করব....

—পাগল না পেটখারাপ? —নিচু স্বরে ক্ষীরোদ বলল;—সতীশবাবু কীজন্যে এসেছেন জানো?

—কীজন্যে?

—তোমার মেয়েকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে।.... খুব ভাল মানুষ ওরা দাদাবাবু। ওদের মতন মানুষ হয় না। অত অসভ্যতা করেচে সুবু; চূড়ান্ত খারাপ ব্যাভার করেচে; মনীশকে ওভাবে অপমান করেচে; তবুও দ্যাখো ওরা সব ভুলে সুবুকে আবার নিয়ে যেতে এয়েচে।

—তুমি কী বলো ক্ষীরোদ? —নিচু স্বরে বিশ্বদেব বলল; —সুবুকে সতীশবাবুর সঙ্গে পাঠানো ঠিক হবে? এটা ওদের কোনও চাল নয় তো? মেয়েকে সেখেনে নিয়ে গিয়ে হয়তো খারাপ ব্যবহার শুরু করল।

—আমার তা মনে হয় না। মানুষ চিনতে এত ভুল হবে আমার? তুমি তো মনীশের কলেজে গিয়েছিলে? ওর সঙ্গে কথা বলেচ?

—হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

—মনিশ বাড়িতে গিয়ে বাবাকে সেকথা বলেচে। তার পরই সতীশবাবু স্বয়ং চলে এসেচে। ভোরের ট্রেনে আমাদের বাড়িতে। বাবার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন ভদ্রলোক। বাবার হাত ধরে সে কী কান্না। এটা অভিনয় ভাবলে বাড়াবাড়ি হবে।

বিশ্বদেব কী বলতে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই সুনীতি এসে হাজির হল এ-ঘরে। বিশ্বদেবকে বলল—তোমরা কী গো? উনি একা ও-ঘরে বসে আচেন আর তোমরা এ-ঘরে কী গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করচ?

—মেয়েকে রেডি করো। সতীশবাবুর সঙ্গে তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। যাবে তো?

—খুব যাবে।—মুচকি হেসে সুনীতি বলল;—এখন দুপা বাড়িয়েই আচে। ... সোয়ামি ছেড়ে

থাকার যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে বুজেচে!

ক্ষীরোদ বলল—বাবা! তলে তলে এত জল গড়িয়েচে? আমরা কিছু জানি না তো?...

অফিস কামাই করা ছাড়া উপায় ছিল না বিশ্বদেবের। বাজারে ছুটতে হল তাকে তড়িঘড়ি। সেদিন সে বাজারে যায়নি। সুনীতি সকলের জন্যে রেঁধেছিল ভাত, ডাল. ঝিঙে-পোস্ত আর ডিমের ডালনা। কিন্তু ঐ বস্তু কি অতিথিকে দেওয়া যায়? বাজার থেকে বিশ্বদেব আধসের রুইমাছ নিয়ে এল। দই, মিষ্টি। সুনীতি চটপট ভাত বসাল। মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধল মুগ-ডাল। মাছের কালিয়া। সতীশবাবু খুব তৃপ্তি করে খেলেন। ক্ষীরোদ অবশ্য আগেই বাড়ি চলে গেছে। তাকে খেয়েদেয়ে দোকানে বের হতে হবে। এখন দোকান বেশ চালু হয়েছে। ঘন ঘন অর্ডার পাচ্ছে। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ সাইকেলের চাহিদা বেড়ে গেল কেন, তার কারণ ক্ষীরোদ জানে না। কিন্তু এটা ঘটনা যে, তার দোকানে এখন ঘন ঘন অর্ডার আসছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সতীশবাবু একটু গড়িয়ে নিলেন। ওঁর পয়সা আছে। কিন্তু কোনও দেমাক নেই। সত্যিই বড় সহজ-সরল মানুষ সতীশবাবু। শুভ্রা স্নান সেরে, এলো চুলে, আটপৌরে লাল শাড়ি পরে যখন প্রণাম করতে এল, তখন সতীশবাবু তাকে আশীর্বাদ করে, চিবুকটি ধরে বললেন—এই তো মা লক্ষ্মী আমার! তুমি আমার সংসারে নেই! আমার সংসারটা যে খাঁ খাঁ করচে! ওরে আমি কী অপরাধ করেচি যে তুই দূরে দূরে থেকে আমায় এত কষ্ট দিচ্চিস? চল মা ঘরে চল—তোকে নিয়ে যেতে এয়েচি আমি! তুই গেলে তবে আমাব সংসারের শ্রী ফিরবে! —বলতে বলতে সতীশবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

শুভ্রা শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে মেমারি রওনা হবার আগে নীরদবরণের সঙ্গে দ্যাখা করতে গেল। বিশ্বদেবেরই মনে হয়েছিল শুভ্রার দাদুকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত। দাদুকে দেখে শুভ্রা চমকে উঠল। মাত্র এক সপ্তাহ আগে সে দাদুকে দেখতে এসেছিল। তখন এত রোগা মনে হয়নি! কিন্তু আজ মনে হল, দাদুর শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে! সেই ঝকঝকে লাবণ্য দাদুর কোথায় গেল? তার ওপর দাদুর বাকশক্তি প্রায় চলেই গেছে। যদি কোনও কথা বলতে হয় তাহলে অতি কষ্টে বালিশ থেকে মাথা তুলে আধশোয়া ভঙ্গিতে দাদু কাগজে অল্প কথা লিখে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেন। শুভ্রার মনে হল তার ভেতর থেকে এক দলা-পাকানো কান্না গলার কাছে উঠে আসছে! কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে সংবরণ করল সে। কেননা দাদু সতীশবাবুর সঙ্গে তাকে দেখেই ইশারায় একটু উঠে বসতে চেয়েছেন। আধশোয়া ভঙ্গিতে বসার পর ইশারায় কাগজ-পেন্সিল চেয়েছেন। তারপর কাগজে খস্‌খস্‌ করে লিখেছেন এই কথাগুলি—

সুবু মা,

তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমি সত্যই খুশি। মনিশ ও তোমার প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাই। আমি জানি জীবনে তোমরা সুখী হবেই।

তারপর ট্রেনে করে মেমারি ফেরা। পথে সতীশবাবুর কত কথা, কত গল্প। যেমন একজন বাবা নিজের মেয়েকে অনেকদিন পরে কাছে পেলে গল্প করে। মেমারিতে যখন নামল ওরা তখন রীতিমতো রাত। তাতে কী হয়েছে? সতীশবাবুর হুকুমমতো একটা অস্টিন গাড়ি স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল আর কেউ নয় স্বয়ং মনীশ। শুভ্রার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল মনীশ। তার মনে হল শুভ্রার চোখে যেন হাসির ঝিলিক! সতীশবাবু চালকের পাশে বসলেন। পেছনের আসনে মনীশ আর শুভ্রা। জানলার ধারে সরে জড়োসড়ো

হয়ে বসেছিল মনীশ। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল শুভ্রা যদি কোনও কারণে হঠাৎ রেগে ওঠে এবং তারপর বায়না ধরে সে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাবে। গাড়ি বেশ জোরে ছুটছে। বাইরে ঘুরঘুট্টি আঁধার, রাস্তার ধুলো, বুনো ঝোপঝাড়ের মন-কেমন করা গন্ধ, ঝিঁঝিদের আশ্চর্য কোরাস। আকাশে কাস্তে আকৃতির চাঁদও গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনীশ বসে ছিল। হঠাৎ তাকে চমকে উঠতে হল। একটা নরম হাত তার হাতের ওপর এসে পড়েছে! হাতটা মনীশের হাতকে চেপে ধরেছে। কিছু যেন বলতে চাইছে! মনীশ কিছু বোঝার আগেই অনুভব করল সেই নরম হাতটা তার হাতটাকে টানছে! মনীশ নিজের হাতকে আলগা করে দিল। অন্ধকারে দুই যুবক-যুবতীর একী মায়ার খেলা! মনীশ তো খেলছে না! নরম হাতটাই আসলে খেলছে! নরম হাতটা মনীশের হাতকে আকর্ষণ করছে কেবলই। কোথায় আকর্ষণ করছে? কোথায় আর? নিজের বুকের দিকে। মনীশ অকারণে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কেননা নরম হাতের মালকিন কখন যেন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নিজের শাড়ির আঁচল সরিয়ে দিয়েছে। মনীশের হাত স্পর্শ পাচ্ছিল পুরুষ্ট দুই স্তনের! জীবনে এই প্রথম মনীশ কোনও যুবতীর স্তন স্পর্শ করছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন সমুদ্রের হৃদপিণ্ডে হাত রাখছে! সংরাগে, আনন্দে মনীশ কেঁপে কেঁপে উঠছিল! নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল।

আশি

নীরদবরণের স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বিশেষত অপারেশনের পর যেন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। আজকাল তিনি প্রায় সবসময়েই বিছানায় শুয়ে থাকেন। শরীরটা যেন মিশে গেছে বিছানার সঙ্গে। খাওয়া বলতে সবকিছুই তরল। গলা ভাত, হয়তো ডাল-তরকারি মাখা; এমনকী মাছও সেদ্ধ করে ভাতের সঙ্গে মেখে দেওয়া হয়। আজকাল সুনীতির কাজ বেড়েছে। বাবার পথ্য সবটাই রান্না করে হাবুর মা। এ কাজে সে যাকে বলে এক্সপার্ট। প্রথম দিন সুনীতি অবশ্য হাবুর মাকে রান্নাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। সব সেদ্ধ করতে হবে। তেল, মশলা প্রায় চলবেই না। সেদ্ধ খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে মেখে জল মিশিয়ে তরল করে চামচ দিয়ে গলায় ঢেলে দিতে হবে নীরদবরণের। শক্ত কিংবা শুকনো খাবার গলায় লাগানো বিশেষভাবে তৈরি রবারের নল দিয়ে কোনওমতেই খাওয়ানো যাবে না। রবারের নলেই তা আটকে থাকবে। আর সেবকম হলে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে রুগীর। কারণ গলার মধ্যে লাগানো নলে খাবার আটকে থাকলে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতেও অসুবিধে হবে। তখন যন্ত্রণায় ছটফট করবেন নীরদবরণ। একী ভয়ঙ্কর কষ্ট! এভাবে কতদিন বাঁচবেন নীরদবরণ?

ডাক্তার সব্যসাচী সান্যাল, যিনি নীরদবরণের গলায় অপারেশান করেছেন, একদিন বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদকে জানিয়েছিলেন যে, যতদিন বেঁচে থাকবেন নীরদবরণ ততদিন তাঁর গলার নলিতে ওরকম কৃত্রিম নল পরানো থাকবে। এভাবে যতদিন বাঁচেন।

সুনীতির কাজ বেড়েছে এই অর্থে যে সে প্রতিদিন নিজের বাড়ি থেকে এ-বাড়িতে এসে দুপুরবেলার খাবারটা বাবাকে খাইয়ে যায়। এই দায়িত্ব তাকে কেউ দ্যায়নি। সে নিজেই এই দায়িত্বটা নিজেব কাঁধে নিয়েছে। বেলা বারোটার পর নিজের খাওয়া সেরে, ঘরকন্যার কাজ গুছিয়ে সুনীতি চলে আসে এ-বাড়িতে। বিশ্বদেব তখন যথারীতি অফিসে। আর ছোট ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে! তাদের ইস্কুল এখন আবার শুরু হয়েছে। রিলিফ-ক্যাম্প এই শহরে এখনও নানা জায়গায় আছে

বটে। কিন্তু স্কুলগুলো সব ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। পড়াশোনা শুরু হয়েছে আবার। কর্পোরেশন অফিসের বিশাল হলঘরে রিলিফ ক্যাম্প এখনও আছে। দু-বেলা পাতা পড়ে সেখানে ভিখিরি ও আর্ত মানুষদের জন্যে। এছাড়া কয়েকটা পরিত্যক্ত বাড়িতেও রিলিফ-ক্যাম্প এখনও চলছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাওয়ায় সুনীতির একটু সুবিধা হয়েছে অবশ্য। যদি তারা বাড়িতে থাকত তাহলে তাদের নিয়ে ও-বাড়িতে যেতে হত। ঠিক সাড়ে বারোটার মধ্যে সুনীতি পৌঁছে যায় ও-বাড়িতে। তারপর তরল খাবারের পাত্র নিয়ে সুনীতি খাওয়াতে বসে বাবাকে। ধরে ধরে বিছানা থেকে তোলে বাবাকে। দুটো বালিশ পিঠে দিয়ে বসিয়ে রাখে কিছুক্ষণ। আর চামচ করে তরল খাবার একটু একটু করে ঢেলে দ্যায় তাঁর গলায়। খিদে একেবারেই বোধহয় থাকে না নীরদবরণের। কয়েক ঢোক খেয়েই তিনি মুখ সরিয়ে নেন। সুনীতি জোর করতে চায়। কতরকম ওষুধ খেতে হয় এখন। একটু কষ্ট করে খেতেও তো হবে কিছু। তা না হলে শরীরটা অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করবে কীভাবে? নীরদবরণ এবং সকলের দুর্ভাগ্য যে তিনি একেবারেই কথা বলতে পারেন না। তাঁর স্বরযন্ত্র মারণ-ব্যাধিতে আক্রান্ত। বাকশক্তি লোপ পেয়েছে তাঁর। কিন্তু তবু মনের ভাব প্রকাশ তো করতে হবে। নীরদবরণের বিছানার পাশে সবসময়ে থাকে একটা প্যাড আর পেনসিল। যদি নীরদবরণ ইশারা করেন কেউ না কেউ তাঁকে প্যাড আর পেনসিল এগিয়ে দেবে। একপাশে কাত হয়ে তিনি কোনওরকমে প্যাডের সাদা কাগজে লিখবেন। দু-একটা কথা। যেমন—'জল'—অর্থাৎ তেষ্টা পেয়েছে। কিংবা—'সুপ'। অর্থাৎ 'সুপ' খেতে চাইছেন। দু-রকম সুপের পাউডার বাড়িতে আনা আছে। চিকেন আর ভেজিটেবল সুপ। এসব বিদেশি খাবার। সাহেবদের খাবার। চট করে যে কোনও দোকানে মিলবে না। ডঃ সান্যাল প্রেসক্রাইব করেছিলেন দু-রকম সুপের। এটাই নীরদবরণের পক্ষে আদর্শ খাবার। তরল এবং বলবর্ধক। সুপের প্যাকেট পাওয়া যায় হগ সাহেবের বাজারে। অন্য কোথাও নয়। একমাত্র বিশ্বদেবই জানে সেইসব সাহেবি দোকানের ঠিকানা। সে একসঙ্গে একডজন কিংবা দু-ডজন সুপের প্যাকেট কিনে নিয়ে আসে। নিজের পয়সাতেই কেনে। ক্ষীরোদ অনেকবার চেষ্টা করেছে তাকে পয়সা মিটিয়ে দিতে। বিশ্বদেব সে পয়সা নিতে রাজি হয়নি। শ্বশুরের জন্যে এটুকুও সে করতে পারবে না? নীরদবরণ সব থেকে ভালবাসেন এই সুপ খেতে। সেটা একদিক থেকে ভালই। কারণ সাহেবদের তৈরি এই খাদ্যবস্তুটি সত্যিই পুষ্টিকর।

সেদিন দুপুরে সুনীতি যখন তাঁকে খাওয়াতে চেষ্টা করছে তখন নীরদবরণ একটা কাণ্ড করলেন। কয়েক চামচ তরল খাবার মুখে নেবার পরই তিনি মুখ সরিয়ে নিলেন। খাবেন না আর। সুনীতি বলল—আর একটু খেতে হবে বাবা। এভাবে তোমার শরীর সারবে না। জানি এরকম খাবার খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু কী আর করা যাবে বলো দিকি? রোগটাও যে তোমার বিদঘুটে...। নীরদবরণের কানে সব কথাই গেল। কিন্তু তাও তিনি শুনলেন না। প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন। সুনীতি প্রমাদ গুনল। নীবদবরণ আঙুল দিয়ে দেখালেন প্যাড আর পেন্সিল। অর্থাৎ কিছু বলতে চান। সুনীতি সহজে রেহাই দিতে চায় না বাবাকে। জোর করে খাওয়াতে চায়। বাবার অবস্থা দেখে আজকাল তার চোখে জল আসে। সেই সাহেবি মেজাজের বাবার এখন কী অবস্থা! সেই ক্ষুরধার ব্যাক্তিত্ব, রাশভারী চলাফেরা সব যেন রাতারাতি উবে গেছে। অসহায় শিশুর মতন লাগে বাবাকে। আজ অনেক চেষ্টা করেও সুনীতি বাবাকে বেশি খাওয়াতে পারল না। নীরদবরণ কেবলই ইশারা করছেন খাটের পাশে নিচু টেবিলের ওপর রাখা প্যাড আর পেন্সিলের দিকে। সুনীতি আর কী করে সে হাত থেকে খাবারের পাত্র নামিয়ে রাখল। প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিল বাবার দিকে। নীরদবরণ খস্‌খস্‌ করে কী লিখলেন সাদা কাগজে?

সুনীতি পড়তে জানে। সে দেখল বাবা আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেছেন—'তোর মায়ের সঙ্গে কাল দ্যাখা হল। উনি ভাল আছেন।' সেটা পড়ে চমকে উঠল সুনীতি। এসব কী লিখেছেন বাবা? মায়ের সঙ্গে দেখা হল মানেটা কী? মাকে কি বাবা স্বপ্ন দেখেছেন? সুনীতি চেঁচিয়ে ক্ষীরোদকে ডাকল। ক্ষীরোদ সেদিন বাড়িতেই ছিল। সাইকেলের দোকানে যাবে যাবে করেও যায়নি। সুনীতির ডাক শুনে ক্ষীরোদ ছুটে এল দোতলায়।

—কী হল রে দিদি?

—দেখ বাবা কী লিখেচে...

—কী লিখেচে?

ক্ষীরোদ পড়ল। তাকাল দিদির দিকে।

—কী ব্যাপার বল তো ক্ষীরোদ?

—কী আর...মাকে স্বপ্নে দেখেচে বাবা।

—কীরকম যেন মনে হচ্চে ক্ষীরোদ?

—কী মনে হচ্চে?

—বাবা হঠাৎ মাকে স্বপ্ন দেখল কেন?

—দেকতেই পারে। এখন তো মায়ের কথা মনে পড়বেই। তবে ... ক্ষীরোদ থামল। খাটে শুয়ে আছেন নীরদবরণ। সুনীতি তাঁর মুখ ধুয়ে দিয়েছে। একটা পাতলা চাদরে ঢেকে দিয়েছে বাবাকে সুনীতি। নীরদবরণের বুকটা মৃদু তালে ওঠানামা করছে। বাবা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ক্ষীরোদ ঝুঁকে দেখল। চোখ বোজানেই রয়েছে বাবার। তবে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নাও পড়তে পাবে।

—'তবে'-বলে থেমে গেলি কেন? —সুনীতি আবার জিজ্ঞেস করল।

—এখানে বলব না। নীচে আয়।

একতলাতে নেমে এল সুনীতি ক্ষীরোদের পেছনেই। একতলার ঢাকা দালানে ওরা দুজন একা। হাবুর মাও ধারে কাছে নেই। নিশ্চয়ই ভাঁড়ার ঘরে ঘুমোচ্ছে।

—এখন বাবার মনে কী চলচে জানিস তো দিদি?

—কী?

—বাবার মনে অনুতাপ হচ্চে...

—অনুতাপ?

—হ্যাঁ। বেঁচে থাকতে মাকে বরাবর অগ্রাহ্যি করেচে বাবা। এখন নিশ্চয়ই অনুতাপ হচ্চে। মায়ের কথা ভাবচে তাই হয়ত স্বপ্নে দেখেচে মাকে। ...সুনীতি তাকিয়ে থাকে ভাইয়ের দিকে। হয়তো ঠিকই বলছে ক্ষীরোদ। সেই একটা ফিরিঙ্গি মেয়েকে নিয়ে বাবা কতদিন ধরে কী কেলেঙ্কারিটাই না করেছে! ঐ ব্যাপারটা নিয়ে মায়ের মনে খুব দুঃখ ছিল। মা কয়েকবার সুনীতিকে বলেওছিল। সুনীতির মনে পড়ে। মা বলত—আমার দুঃখ কোথায় জানিস নীতি?

—তোমার আবার দুঃখ কীসের?

—আচে রে দুঃখ আচে। এত করলাম সারাজীবন। তবু তোর বাবার মন পেলুম না। তোর বাবার মনকে জিতে নিয়েচে সাহেবপাড়ার সেই মাগী...!

একদিন অফিসে বিশ্বদেবের একটা ফোন এল। বিশ্বদেবের টেবিলে কোনও ফোন নেই। একটা বড় হলঘরে অফিস। পাঁচ-ছয় জন একসঙ্গে বসে। সবাই কেরানি। ফোন আছে নারানবাবুর টেবিলে। তিনিই সিনিয়র ক্লার্ক। বিশ্বদেব মন দিয়ে একটা ব্যালান্স-শিট পরীক্ষা করছিল। নারানবাবু

চেঁচিয়ে ডাকলেন তাকে।

—বিশ্বদেব-বাবু আপনার ফোন আচে।

—আমার ফোন? —বিশ্বদেব অবাক হল। অফিসে তাকে এরকম অসময়ে ফোন করবে কে? ক্ষীরোদ নয়তো। নীরদবরণের শরীর একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। ডঃ সান্যাল প্রায় জানিয়েই দিয়েছেন যে তাঁদের আর কিছু করার নেই। নীরদবরণ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তাঁর গলায় একটু চাপ পড়লেই রক্তপাত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে হঠাৎ দমকা কাশি এসেছিল। কাশতে কাশতে বেঁকে গিয়েছিল তাঁর শরীরটা। তারপর কাশির সঙ্গে গলার টিউব বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত। ওফ্ কী কষ্ট! চোখে দ্যাখা যায় না। আজকাল সুনীতি বিছানায় শুয়ে রাতে একা একা কাঁদে। পাশে শুয়ে বিশ্বদেব তা বুঝতে পারে। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সে। সুনীতি কাঁদতে কাঁদতে বলে—এরকম মারণ রোগ কেন হল বাবার? কেন গো? কী অপরাধ করেছিল বাবা? কারোর তো কোনও অনিষ্ট করেনি কোনদিন? কী কষ্ট পাচ্ছে বলো তো? চোখে দ্যাখা যায় না। বিশ্বদেব কী আর বলবে? চুপ করে থাকে। একটা কথা তো অস্বীকার করা যায় না। নীরদবরণ দিনের পর দিন নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার করেছেন। প্রায় প্রতিদিন মদ্যপান! শরীর সইবে কেন? এখন শরীর তার শোধ তুলে নিচ্ছে।

নারানবাবুর টেবিলে রিসিভার নামানো ছিল। বিশ্বদেব এসে রিসিভার তুলল।

—হ্যালো?

—ইজ ইট বিশ্বডেববাবু? —নারীকণ্ঠ। চোস্ত ইংরেজি।

—ইয়েস...হোয়ার আর ইউ কলিং ফ্রম?

—আয়াম শেলী ... আ ফ্রেন্ড অব নীরোদবাবু...। বুঝেছে বিশ্বদেব। সঙ্গে সঙ্গে সে আড়ষ্ট হয়ে যায়। সেই ট্যাশ মহিলা। শ্বশুরের রক্ষিতা। ঘৃণায় মুখটা বেঁকে যায় বিশ্বদেবের। মনে হয় রিসিভার নামিয়ে ফোনটা কেটে দ্যায়। কিন্তু কোথায় যেন ভদ্রতায় বাধে। এই অফিসে বিশ্বদেবের ফোন-নাম্বার সে জানল কীভাবে? তা তো জানতেই পারে। শেলী আরমেনিয়ান নয়। জাতে দো-আঁশলা—অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ; তার বাবা ইন্ডিয়ান, মা ইউরোপিয়ান ; খোদ পার্ক স্ট্রিট পাড়ায় থাকে। নীরদবরণের অফিসের সকলেই শেলীকে চেনে। তাদেরই কেউ হয়ত বলেছে শেলীকে বিশ্বদেব এখানে, আরমেনিয়ান চার্চ-এ চাকরি করে। একদিন হ্যারিসন সাহেবের সঙ্গে দ্যাখা হয়েছিল বিশ্বদেবের। হ্যারিসন সহকর্মী নীরদবরণের। বিশ্বদেবের সঙ্গেও তার আলাপ। কথায় কথায় হ্যারিসনকে বিশ্বদেব বলেছিল এখানে চাকরির কথা। হ্যারিসনের সঙ্গে নিশ্চয়ই শেলীর যোগাযোগ আছে। অন্তত থাকা অসম্ভব নয়।

—বিশ্বডেববাবু আই ওয়ান্ট টু নো...

—আয়াম নট ইনটারেসটেড টু টক টু ইউ...

—ওহ্ প্লিজ বাবু! হাউ ইজ ইওর ফাদার-ইন-ল নাউ?

—হি ইজ স্লোলি রিকভারিং—দ্যাট মাচ ক্যান বি সেড।

—প্লিজ ডু মি আ ফেভার?—শেলীর গলায় অনুনয়ের সুর।

—হোয়াট ইজ ইট?

এবার ইংরেজিতে যা বলে শেলী তার সারমর্ম হল এরকম।

—আমি একদিন ওঁর বাড়িতে যেতে চাই।

—কীজন্যে?—রুক্ষভাবে জিগ্যেস করেছিল বিশ্বদেব।

—ওঁকে আমি একটু দেখতে চাই। আমি জানি উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন...

—আপনার সেটা করা উচিত হবে না।

—কেন?

—দেখুন আমরা ভদ্র সমাজের মানুষ। আপনার সঙ্গে যে আমার শ্বশুর মশাইয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল আমরা চাই না আমাদের আত্মীয়স্বজন সেটা জানুক।

—মাত্র দশ মিনিটের জন্যে আমি যেতে চাই। ওঁকে একবার দেখব। কোনও কথা বলব না। চলে আসব।

—আমার মতামত আপনাকে জানিয়ে দিলুম। এবার যা ভাল বুঝবেন করবেন।

কথাটা বলে বিশ্বদেব আর অপেক্ষা করেনি। নামিয়ে দিয়েছিল রিসিভার। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল নারানবাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখে একরাশ কৌতূহল।

—কোনো ফিরিঙ্গি মহিলা মনে হল?

—হ্যাঁ। ঐ আর কী...বিশ্বদেব কথা বাড়াল না। নিজের চেয়ারে বসে আবার কাজে মন দিল। নারানবাবুর দিকে না তাকিয়েই সে বুঝতে পারছে ভদ্রলোক তাকে একভাবে নিরীক্ষণ করছেন। যা ভাবছেন ভাবুন। ওর কৌতূহলে জল ঢেলে দিতে চায় না বিশ্বদেব।

দিন কয়েক পরে। একদিন রবিবারে বিকেল চারটে নাগাদ এসে হাজির শেলী। বিশ্বদেব, সুনীতি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ও-বাড়িতেই ছিল তখন। একতলার বড় ঘরে প্রায় সবাই ছিল, —ক্ষীরোদ, তার স্ত্রী, বারিদবরণ, অসিতবরণ, সুনীতি, বিশ্বদেব। ছেলেমেয়েরা বাইরের দালানে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে। বিশ্বদেবরা আলোচনা করছিল নীরদবরণের শরীর নিয়ে। বাড়িতে রাখা আর বোধহয় ঠিক হবে না রুগীকে। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্তক্ষরণ হচ্ছে। ক্রমশ কেমন নির্জীব হয়ে যাচ্ছেন নীরদবরণ। সারাক্ষণই প্রায় অসাড় শুয়ে আছেন। ডাকলেও যেন শুনতে পান না। সাড়া দেন না। চোখ মেলে তাকান না। গতকাল ক্ষীরোদ ছুটে গিয়েছিল বিশ্বদেবের অফিসে।

—কী ব্যাপার গো ক্ষীরোদ?

—আজ একটু যেতে পারবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়?

—মেডিক্যাল কলেজে। ডঃ সান্ন্যালের সঙ্গে একটু কথা বলব। বাবার অবস্থা ভাল মনে হচ্চে না।

অফিসের সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিল বিশ্বদেব। সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাফ ছুটি নিয়ে চলে যেতে বলেছিলেন। বিশ্বদেব তাই করেছিল। বিকেল তিনটে নাগাদ ডঃ সান্যাল পেশেন্টদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। স্লিপ পাঠিয়ে বিশ্বদেব আর ক্ষীরোদ অপেক্ষা করছিল। একসময় ডাক পড়েছিল।

—কী ব্যাপার? বলুন পেশেন্টের কনডিশান কীরকম?

—ভাল নয় ডাক্তারবাবু।—ক্ষীরোদ বলেছিল। তারপর বলতে শুরু করেছিল রুগীর নানা অসুবিধের কথা। ডাক্তার মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর হাত নেড়ে থামতে বললেন ক্ষীরোদকে। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। মিনিট তিনেক চিন্তা করলেন ডাক্তার। তারপর বললেন—ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বিটার। তবুও সত্যি কথাগুলো আমাকে বলতে হবে।

ক্ষীরোদ আর বিশ্বদেব তাকিয়ে ছিল।

—দেখুন ভাই আমরা ডাক্তার। খুব সহজে আশা ছাড়ি না। তবুও বলছি নীরদবরণবাবু খুব মারাত্মকভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। ওর গলায় অপারেশান করে আমরা ক্যান্সারের গ্রোথ পুরোপুরি নির্মূল করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা পারিনি। ক্যান্সার ব্রেনকেও অ্যাটাক করেছে।

—এর ফল কী হতে পারে?—উত্তরটা জেনেও যেন বিশ্বদেব জিগ্যেস করল।

—ক্রমশ চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছেন উনি। এরপর লোক চিনতে পারবেন না। মেমোরি ফল করবে।

—আবার যদি বাবাকে হসপিটালে ভর্তি করে নেন ডাক্তারবাবু?—ক্ষীরোদ বলেছিল।

—লাভ কিছু নেই ভাই। বরং শেষ সময়টা বাড়িতে থাকাই ভাল।...তবুও আপনারা যখন এসেছেন আমি কয়েকটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি।

—আপনি একবার দেখবেন না পেশেন্টকে? বিশ্বদেব জিগ্যেস করেছিল।

—এই ওষুধগুলো খেয়ে কীরকম উনি থাকেন জানাবেন। তারপর দুদিন বাদে যাবো। দেখে আসব পেশেন্টকে। আমার বাড়ির নাম্বারটা রেখে দিন। অসময়ে যদি প্রয়োজন হয় আমাকে বাড়িতে ফোন করবেন।—ওষুধের প্রেসক্রিপসান এবং বাড়ির ফোন-নাম্বার নিয়ে ওরা দুজনে চলে এসেছিল। কিন্তু ওষুধ খেয়েও নীরদবরণের অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। শুধুমাত্র সকালের দিকে তিনি চোখ মেলে চেয়েছিলেন। ফলের রস খেয়েছিলেন একটু। বারবার চোখ ঘুরিয়ে দেখছিলেন। কাকে যেন খুঁজছিলেন।

—কাউকে খুঁজছেন বাবা?—ক্ষীরোদ জিগ্যেস করেছিল। নীরদবরণ ইশারায় কাগজ-পেন্সিল চেয়েছিলেন। তারপর অতি কষ্টে নিজের শরীরটাকে তুলে সাদা কাগজে একটাই শব্দ লিখেছিলেন—'সুবু'। সবাই বুঝেছিল। নিজের প্রিয় নাতনিকে খুঁজছেন নীরদবরণ। ক্ষীরোদ ছুটে গিয়েছিল ফোন করতে। মেমারিতে সতীশবাবুদের বাড়ি কোনও ফোন নেই। কিন্তু সতীশবাবুদের বাড়ির কাছাকাছি সাব-পোস্ট-অফিস। সেখানে টেলিফোন আছে। সেই ফোনের নাম্বার দেওয়া আছে ক্ষীরোদকে। সেখানে ফোন করে পোস্টমাস্টারকে অনুরোধ করল ক্ষীরোদ। সতীশবাবুদের জানিয়ে দিতে হবে যে, সুবুর দাদুর শরীর খুব খারাপ। সুবু আর মনীশ যেন চলে আসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

একতলার ঘরে সবাই গোল হয়ে বসেছে। সবাইরেই মন খারাপ। বিশ্বদেব ঠিক করেছে আজ রাতটা সবাইকে নিয়ে এ-বাড়িতে থেকে যাবে। শ্বশুরের কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।

হাবুর মা ছুটে এসে খবর দিল।—ও দাদাবাবুরা গো? একজন মেম এয়েচে এ বাড়িতে গাড়ি করে...।

—মেম?—ক্ষীরোদ আর বিশ্বদেব দুজনেই ছুটল। সদর দরজা হাট খোলা। সেখানে দাঁড়িয়ে শেলী। পরনে ধবধবে সাদা গাউন, হাঁটু পর্যন্ত। গাউন যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে স্কিন-কালারের মোজা। হাতে একটা ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতের কবজিতে যেটা ব্রেসলেট মনে হচ্ছে সেটা আসলে হালফ্যাশানের একটা ঘড়ি। নাহ শেলী যে খুব সাজগোজ করেছে তা নয়। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা স্টেপকাট চুল অবশ্য বিন্যস্ত। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ, মুখভাব কেমন যেন মলিন।

—গুড আফটার নুন...শেলী বলল,—মে আই কাম ইনসাইড? বিশ্বদেব কী বলা যায় ভাবছিল, কিন্তু ক্ষীরোদ এখন আর অত সৌজন্যের ধার ধারতে চায় না; সে রুক্ষ স্বরে শেলীকে বলল—আপনি কেন এসেছেন?...হোয়াই হ্যাড ইউ কাম...ইউ ডার্টি হার্লট!

কথাটা শুনে শেলীর মুখে রক্ত জমে এল যেন। ক্ষীরোদ দু-হাত নেড়ে তাকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দ্যায় আর কী? কিন্তু এবার বিশ্বদেব আর চুপ থাকতে পারল না। চকিতে তার মনে হল, শেলীকে এভাবে অপমান করার অধিকার ক্ষীরোদকে কেউ দেয়নি। বিশ্বদেব এগিয়ে গিয়ে ক্ষীরোদের ডান হাত চেপে ধরল।

—কী করচ দাদাবাবু? হাত ছাড়ো?

—ক্ষীরোদ ওরকম উত্তেজিত হয়ো না। আমি বলচি ইউ কীপ ইওর কুল...

—এই মহিলাকে তুমি এ-বাড়িতে ঢুকতে দেবে? ওর মতন নোংরা মেয়ে ছেলে আমাদের বাড়িকে অপবিত্র করে যাবে তুমি এটা চাও?

—এসব কী অশিক্ষিতের মতন কথা বলচ ক্ষীরোদ? তোমার খুব বেশি শিক্ষা-দীক্ষা নেই জানি ; কিন্তু কিছু তো আচে? ওঁকে ওভাবে অপমান করার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি। আমি তোমার থেকে বড় ক্ষীরোদ। তুমি আমার কথা শুনবে। তা যদি না কর আমি আমার পরিবারকে নিয়ে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। আর কোনওদিন এ-বাড়িতে আসব না। তুমি আমার গোঁ নিশ্চয়ই জানো ক্ষীরোদ?

সদর দরজার কাছে গোলমাল হচ্ছে দেখে সুনীতি, আভা, বারিদ, অসিত সবাই চলে এসেছে। সবাই অবাক হয়ে দেখছে শেলীকে। সেই চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যেও বন্দনা চুপিচুপি সুনীতিকে বলল—বাহ মেমটারে কী সোঁদর দেকতে গো! ঠিক সিনেমাতে যেমন মেমদের দ্যাখায়।

বিশ্বদেবের কথা বলার মধ্যে নিশ্চয়ই একধরনের দৃঢ়তা ছিল, ক্ষীরোদ পেছিয়ে এল। বিশ্বদেব এগিয়ে গেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় শেলীর কাছে। চৌকাঠের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে শেলী। যেন অনুমতি ছাড়া এ-বাড়িতে ঢুকতে পারে না সে।

—ইউ আর ওয়েলকাম—বিশ্বদেব বিনীতভাবে বলল,—প্লিজ কাম ইন অন। ইংরেজিতে বলল শেলী—আমি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে মি. নীরদবরণকে একবার দেখতে চাই। আমি জানি উনি খুব অসুস্থ। বিশ্বাস করুন দশ মিনিটের বেশি আমি তাঁর বিছানার পাশে থাকব না।...আই নো—ভেরি ওয়েল নো দ্যাট ইট উইল নট লুক গুড, ইফ আই স্টে লংগার হীয়ার।—আপনি ভেতরে আসুন। আমি আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্চি। কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।

ক্ষীরোদ ব্যাজার মুখে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বদেবের মুখের ওপর কথা বলে এমন সাহস তার নেই। ঘরের মেঝেতে খট্ খট শব্দ উঠছে। অভ্যাসবশত শেলী জুতোসহ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হিন্দু কিংবা বাঙালি পরিবারের নিয়মকানুন সে কিছুই জানে না। সুনীতি অস্ফুটে বলল—ও মাগো? এই মেমটা বাইরের জুতো পরে ঘরে ঢুকচে গো!

বিশ্বদেব শেলীকে বিনীতভাবে বলল—আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি?

—অফ কোর্স?

—আপনি যদি কাইন্ডলি পায়ের জুতো খুলে রাখেন।...বাঙালি বাড়িতে বাইরের জুতো আমরা খুলে ভেতরে ঢুকি। শেলী একটু থমকাল। কী যেন ভাবল একটু। তারপর বলল—ওহ ইয়েস। আই হ্যাভ গট ইট। স্যরি। দিস ইজ দ্যা ফার্স্ট টাইম আয়াম স্টেপিং ইনটু দ্য হাউস অব আ বেঙ্গলি ফ্যামিলি।

নগ্ন, শ্বেতশুভ্র পায়ে শেলী হাঁটছে। তার পাশে বিশ্বদেব। তাদের ঠিক পেছনে সুনীতি, বন্দনা, চার মাসের গর্ভবতী হবার জন্যে তার উদর ঈষৎ স্ফীত ; শাড়ি থাকলেও বেশ বোঝা যায় ; যেন এক ছোটখাটো মিছিল ; যে মিছিলের শেষে বারিদ ও অসিত দুজনেই আছে। শুধু ক্ষীরোদ

নেই। সে দু-হাতের চেটোয় মুখ ডুবিয়ে দালানের বেঞ্চে বসে আছে। সে দাদাবাবুর কথার অমান্য করতে সাহস পায়নি। কিন্তু তার এখনও মনে হচ্ছে ঐ বেবুশ্যে, ট্যাঁশ মেয়েছেলেটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দাদাবাবু ভাল কাজ করল না। ঐ মাগীর জন্যেই বাবার আজ এমন অসুখ। ঐ মাগীটার বাড়িতে রাত কাটাত বাবা ; এ বাড়িতে মা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোত না, শুধু কাঁদত, একমাত্র ক্ষীরোদই সম্ভবত জানে যূথিকার সেই গোপন দুঃখের কথা। তাছাড়া...তাছাড়া নীরদবরণের গলায় যে আজ ক্যান্সার হয়েছে তার জন্যে তো দায় ঐ মাগীটা। ওর বাড়িতে রাত কাটাতে গিয়েই তো নীরদবরণ পেগের পর পেগ মত খেতেন। অত মদ্যপান করলে, শরীরের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চালালে, মারণ-ব্যাধি তো ধরবেই কামড়ে?

দোতলায় নীরদবরণের ঘরে সবাই এসে জুটেছে। ক্ষীরোদ ছাড়া সকলে। এমনকী হাবুর মা ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে 'মেমসাহেব'-কে দেখছে। সত্যি মাগীর গায়ের রং কী? যেন দুধ আর আলতা গুলে কেউ ওর সারা শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে? মাগীর মুখটা তেমন ভাল নয়; কীরকম যেন পুরুষদের মতন; ঠোঁট দুটো পুরু এবং মোটা ; নাকটাও যেন একটু ভোঁতা; কিন্তু সব নিয়ে দেখতে গেলে মাগীকে সবাই তাকিয়ে দেখবেই। মাগী মাথায় নাটা; হবেই তো বড়বাবুও তো বেঁটে?

চওড়া খাটে পুরু গদির ওপর সাদা চাদর ; তার ওপর অয়েল-ক্লথ পাতা। শুয়ে আছেন নীরদবরণ। শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। চেনা যাচ্ছে না মানুষটাকে। শেলীর চোখ ফেটে জল আসছিল। সে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল। লোকজনের সামনে চোখের জল ফেলা তার 'এটিকেটের' মধ্যে পড়ে না। এই মানুষটাই কি তাকে ভালবাসত, আদর করত? বুকে আহ্লাদে টেনে নিয়ে সেই কবিতার লাইনটা প্রায়ই বলত? ...Sweet Helen, make me immortal with a kiss...! শেলী মনে মনে প্রার্থনা করছিল নীরদবরণের জন্যে ; তার 'ক্রাইস্ট'-কে সে আকুলভাবে বলছিল—প্রভু, আমার নীরোডবরণকে ভাল করে দাও... লেট হিম রিকভার মাই গড ... হি ইজ নট ইভেন সিকস্‌টি ... লাইফ ইজ স্টিল ইয়াং ফর হিম,—ইয়েস স্টিল ইয়াং...।

শেলী তার কথা রেখেছে। ঠিক সাত মিনিট সে নীরদবরণেব বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রার্থনা করেছিল। তারপর নেমে এসেছিল একতলায়। জুতো গলিয়ে নিয়েছিল দু-পায়ে। তারপর সবায়ের দিকে রীতিমতন হাত জোড় করে বলেছিল—নমোস্কার লেট মি টেক লিভ অব ইউ অল। বিশ্বদেব ভদ্রতা করে বলেছিল—উড ইউ লাইক আ কাপ অব টি?

—নো থ্যাঙ্ক ইউ। দিস ইজ নট দ্য প্রপার টাইম ফর টি। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। বাই...গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। শেলী গাড়ির কাছে যেতেই চালক দরজা খুলে দিল। চালকের দিকে তাকাতেই বিশ্বদেব বুঝতে পারল। এই চালকই তো নীরদবরণের গাড়ি চালাত না? ভালভাবে দেখল বিশ্বদেব। এই গাড়িটাতেই তো অফিস যাতায়াত করতেন নীরদবরণ। সেই গাড়িতেই শেলী এসেছে এ-বাড়িতে। কীভাবে? হয়ত নীরদবরণের অফিসের সাহেবকে অনুরোধ করে সে গাড়িটা নিয়েছে আজকের জন্যে। এ বাড়ি তাই বোধহয় চিনতে অসুবিধে হয়নি শেলীর।

সতীশবাবু নিজের বাড়ির উঠোনের রোয়াকে মাদুর পেতে বসেছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী কয়েকজন ছিল। টুকটাক গল্প চলছিল। বেলা এগারোটা। বেলা বারোটা পর্যন্ত এরকম মজলিশ চলবে। তারপর সবাই বাড়ির পথ ধরবে। সতীশবাবু মধ্যাহ্নভোজনে বসবেন। দোতলার ঘরে

মনীশ বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় পড়ার বসিয়ে মগ্ন ছিল। গ্রীষ্মের ছুটি আর কয়েকদিন তারপর কলেজ খুলেই তার পরীক্ষা। ছুটিতে মনোযোগ দিয়ে পড়বে এমনই তো কথা কিন্তু বউ তাকে আজকাল পড়তে দিলে তো? কী বকবকই না করতে পারে শুভ্রা। কত প্রশ্ন তার। কতরকম মজার গল্প। এই কদিনের যৌথ জীবন যেন রসে-টইটম্বুর হয়ে আছে! মেয়েকেই প্রথমে দেখে মনীশের মনে হয়েছিল বড় গুমোর। রূপের অহঙ্কারে যেন মাটিতে পড়ে না। সেই মেয়েকেই এখন যেন দেখে দেখে আশ মেটে না মনীশের। কতরকমভাবেই নিজেকে দেখাতে জানে বউ? সেসব গোপন অভিসারের কথা, শয্যাযুদ্ধের কথা ভাবলে মনী লজ্জায় কান গরম হয়ে ওঠে। পড়ার বই দেখে সে আনমনা হয়ে যায়, মুচকি মুচকি হা ভাগ্যিস শুভ্রা এখন তার সামনে নেই। বউ এখন মনোরমাকে রান্নায় সাহায্য করছে একতল রান্নাঘরে। এখানে থাকলে মনীশ নির্লজ্জের মতন চাইত শুভ্রার কাছে—দাও আমাকে চুমু দা তোমার বুকের কাপড় সরাও। ঐ অপূর্ব ভাস্কর্য আমাকে দু চোখ ভরে দেখতে দাও...।

উঠোনের খোলা দরজা দিয়ে হাঁফাতে হাঁপাতে যে বয়স্ক মানুষটি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন তি রমেনবাবু, সাব পোস্ট মাস্টার।

—অ সতীশবাবু খবর আচে...

—আরে রমেনবাবু যে? কী খবর?

—হাওড়ায় আপনার সম্বন্ধী বাড়ি থেকে খবর এয়েচে...

—হাওড়া থেকে? কী খবর?

—আমাদের বউমার দাদুর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—কে ফোন করেছিল গো?

—নাম বলল ক্ষীরোদ...

—ক্ষীরোদ? বউমার মামা? তাহলে কী নীরদবাবুর শরীর আবার খারাপ হল?

—হ্যাঁ খুব খারাপ। বলল বউমা আর জামাই যেন এখনই রওনা দেয়।

—তাই নাকি? তাই নাকি? ...ও মনীশ? ও বউমা?... সতীশবাবু ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

সেদিন বিকেলের ট্রেন ধরলে ওদের পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে যাবে। তাই পরদিন ভোর ভোর রওনা হল মনীশ আর শুভ্রা। বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেল। তদের দুজনকে দরজা খুলে দিয়েছিল বিশ্বদেবই।

—ঠিক সময়ে এসে গেচ তোমরা...।

—দাদু কেমন আছে? শুভ্রা উৎকণ্ঠার গলায় জিগ্যেস করল।

—খুব খারাপ অবস্থা। সকাল থেকে সেনসলেস হয়ে আচেন। জ্ঞান ফেরেনি। ডঃ সান্যালকে খবর দেওয়া হয়েচে। উনি আসবেন। শুভ্রার চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখন কান্নার সময় নয়। সে হুটোপাটি করে দোতলার ঘরে পৌঁছল। তাকে দেখে সুনীতি ডুকরে কেঁদে উঠল—সুবু এয়েচিস মা? আয় আয়? তোর দাদুর জ্ঞান আর ফিরচে না রে। সেই যে চোখ বুজিয়ে আচে আর খুলচে না। কী হবে রে? বাবা কি চোখ আর খুলবে না? বিশ্বদেব ঈষৎ ধমকের সুরে বলল—আহ। এখন ওরকম সিন ক্রিয়েট কোরো না! ডঃ সান্যাল তো আসচেন।

শুভ্রা দাদুর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল—দাদু। ও দাদু। আমি এসেছি। তুমি কথা বলবে না? চোখ খুলবে না দাদু?

অনেক সময় সত্যিই কি অসম্ভব সম্ভব হয়? যে নীরদবরণ ভোরবেলা থেকে এত বেলা পর্যন্ত চোখ খোলেননি, এত মানুষের ডাকে সাড়া দেননি, তিনি কি সত্যিই নাতনির আকুল ডাক শুনতে পেলেন? ক্ষীরোদ চেঁচিয়ে বলল—ঐ তো বাবা চোখ মেলে দেখছেন।

সবাই দেখছে। ঠিকই বলেছে ক্ষীরোদ। নীরদবরণ দু-চোখ মেলে তাকালেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর মানুষ যেরকম অনিশ্চিতভাবে কিংবা ঘোলাটেভাবে তাকায় ঠিক সেরকম।

—দাদু ও দাদু? আমি সুবু বলছি। তোমার কী কষ্ট? নীরদবরণ তাকালেন। ম্লান হাসির ভাব তাঁর ঠোঁটে। তিনি তো কথা বলতে পারেন না। কীভাবে তাঁর আদরের নাতনিকে নিজের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা তিনি প্রকাশ করবেন?

হঠাৎ সুনীতি বলল—বাবা বোধহয় কিছু চাইচেন?

বিশ্বদেব দেখল। জলের জারের দিকে আঙুল দ্যাখাচ্ছেন নীরদবরণ। সুনীতি ঝিনুকবাটি দিয়ে জল বাড়িয়ে ধরল তাঁর মুখে। এভাবেই তো জল পান করেন এখন নীরদবরণ। তিনি কি এখন তাঁর দ্বিতীয় শৈশবে? কয়েক ঢোঁক জল খেলেন নীরদবরণ। তারপর মুখ সরিয়ে নিলেন। আর খাবেন না। এবার ইশারা করছেন। বিশ্বদেব বুঝল--কাগজ পেন্সিল চাইছেন। সুনীতি বাবার পিঠে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে দিল। কাঁপা কাঁপা হাতে নীরদবরণ কিছু লিখলেন প্যাডের সাদা কাগজে। বিশ্বদেবের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বিশ্বদেব কিছুটা অবাক। কাগজে নীরদবরণ লিখেছেন—Macbeth....ACT IV Scene V...Tomorrow....। বিশ্বদেব কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর তার মনে পড়ল। শেকসপিয়ারের এই নাটক তার বহুবার আদ্যোপান্ত পড়া। পরাজয় আর পতন আসন্ন জেনে ম্যাকবেথের সেই নির্মম স্বগতোক্তি। নাটকের সেই অংশটুকু শুনতে চান নীরদবরণ। বুঝেছে, বুঝেছে বিশ্বদেব। সে ছুটে পাশের ঘরে গেল। এখানে এক আলমারি-বোঝাই নীরদবরণের বইয়ের সংগ্রহ। সেইসব বইয়ের মধ্যে খুঁজতে লাগল বিশ্বদেব। এই তো ম্যাকবেথ? রেক্সিনে বাঁধানো বই। সোনার জলে লেখা—Macbeth William Shakespeare...। বিশ্বদেব পাতা ওলটাচ্ছে দ্রুত হাতে। এই তো, এই তো পেয়েছে? ভগ্নহৃদয় ম্যাকবেথ নিজেকেই যেন শোনাচ্ছে পৃথিবী এবং জীবন বিষয়ে সেই অনিবার্য সত্যি কথাগুলো।

বিশ্বদেবের হাতে বইটা দেখে নীরদবরণ আবার ইশারা করছেন। শুভ্রার দিকে ইশারা করছেন?

বিশ্বদেব বুঝল। সে বলল—সুবু মা আমার। এই অংশটা দাদুকে পড়ে শোনাও...। শুভ্রা দেখল। ম্যাকবেথ নাটকটা দাদুই একসময় তাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। কী অপূর্ব, স্বপ্নের মতো ছিল দাদুর সাহচর্যে সেইসব মনোরম দিনগুলো?

শুভ্রা পড়ছে। নীরদবরণ চোখ মুদে আছেন। শুনছেন। শুভ্রা সুর করে পড়ে যায়—

> "....Tomorrow, and to-morrow, and to-morrow, creeps in this petty pace from day to day, To the last syllable of recorded time ; And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief Candle! Life's but a walking shadow ; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more : it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing."

এই পর্যন্ত পড়ে শুভ্রা তাকাল। দাদু কি শুনছেন? নাকি আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন? সে দাদুর একটা হাতে হাত ছোঁয়াল। চমকে উঠল। মনে হল হাতটা কীরকম নির্ভার পড়ে আছে!

—মা! বাবা! দেখ তো দাদু বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছে?

বিশ্বদেব ডাকল—শুনছেন? শুনতে পাচ্ছেন? সুনীতি ডাকল—বাবা? ও বাবা? চোখ খোলো? জল খাবে আর একটু? ও বাবা?

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কড়া নড়ে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল। ক্ষীরোদ ছুটে একতলায় গেল। দরজার খিল খুলল। দেখল চামড়ার ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ডঃ সান্যাল।

—আসুন-আসুন ডাক্তারবাবু?

—এখন পেশেন্ট কেমন?

—সকাল থেকে বাবা সেনসলেস ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে জ্ঞান ফিরেছিল। আবার বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

গম্ভীরমুখে ডঃ সান্যাল দোতলার ঘরে ঢুকলেন। স্টেথিসকোপ নিয়ে বুক দেখলেন নীরদবরণের। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ডান হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখলেন। তারপর হাতটা নীরদবরণের বুকে রাখা আর একটা হাতের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে রেখে বললেন—এভাবে বেঁচে থাকার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে উনি মুক্তি পেয়েছেন...। ঘরে মেয়েদের কান্নার রোল ঠল।